বিহঙ্গচারণা

ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট্., ডি. লিট্.,
বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৮৫
প্রকাশক ঃ শ্রীকান্তি রঞ্জন ঘোষ
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ শ্রীপঞ্চানন মালাকর

মুদ্রাকর—
শ্রীবাদল চন্দ্র পাল
এস. এম. প্রিন্টিং
১৯/ডি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

মনীষা-কে

অবতরণিকা

ইংরেজিতে যাকে বলে Bird-lore, বাঙলায় তাকেই বলেছি—'বিহঙ্গচারণা'। পাখিকে নিয়ে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের শেষ নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে নানা সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, মিথ ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে পাখিকে কেন্দ্র করে। এই গ্রন্থে তারই আংশিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। আমার যতদূর জানা আছে, বাঙলা ভাষায় এ ধরনের বই এর আগে লেখা হয় নি। কেবল পাখিই নয়, বিভিন্ন ধরনের মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষকে বসবাস করতে হয়, সেই সব মানবেতর প্রাণীকে অবলম্বন করেও নানা প্রকার সংস্কার-বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

'বিহঙ্গচারণা' বইটিতে আমার পটভূমিকা মূলত বঙ্গদেশ (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে অখণ্ড ও অবিভক্ত বঙ্গদেশ) বটে, কিন্তু এক শিথিল অর্থে গোটা বিশ্বই এতে গৃহীত হয়েছে। যখনই সুযোগ পাওয়া গেছে, তখনই সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্যে পৃথিবীর যে কোনো দেশের কথাই এসে গেছে। এ জন্যে পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হই নি। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থের নানা অংশে নানা দোষ-দুর্বলতা থেকে গেছে।

গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের পর-পর অধ্যায়গুলিতে এক-একটি বিষয়কে অবলম্বন করে পাখি-মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি মূল বিষয়ের প্রবেশক হিসেবে পরিকল্পিত। এই অধ্যায়েই আমার আলোচনা-সমীক্ষার দৃষ্টিকোণ, উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম—'বিহঙ্গপুরাণ' বা 'বিহঙ্গকথা'। 'বঙ্গীয়' এই বিশেষণ বাচক অভিধা থেকে এর ভৌগোলিক দিকটি স্পষ্ট হবে। 'Bird myth' ও 'Birdtale'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ রূপে 'বিহঙ্গপুরাণ' ও 'বিহঙ্গকথা' অভিধা দু'টি গ্রহণ করেছি। দুই বঙ্গের নানা জেলার লিখিত ও মৌখিক ঐতিহ্য ও উৎস থেকে মোট ৯২টি বিহঙ্গকথা এতে সংকলিত হয়েছে। সংকলনের ক্ষেত্রে যে বিন্যাস-রীতির অনুসরণ করা হয়েছে, তা এই: প্রথমে 'বিষয়' অনুসারে কথাগুলিকে বিভক্ত করেছি, পরে প্রতিটি কথার কথান্তর (যেখানে যেখানে মিলেছে), Motif, এবং সাদৃশ্য-বৈপরীত্যের কথা বলেছি। সমীক্ষার অংশ প্রাধান্য পায় নি। তার কারণ, 'Bird myths of Bengal: A Structural approach' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আমি তা করেছি, শীঘ্রই তা প্রকাশিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। অন্তত পাঁচ বছর আগেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। জনৈক প্রকাশক এটি ছাপতেও আরম্ভ করেছিলেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি ১৭৬ পাতা পর্যন্ত ছেপে আর অগ্রসর হলেন না। এমন সময়ে এগিয়ে এলেন 'বর্ণালী' প্রকাশনের শ্রীকান্তি ঘোষ মশাই। আবার প্রথম থেকে বই ছাপতে শুরু করলেন। তাঁরই তৎপরতা, কর্মদক্ষতা ও উৎসাহে এই বই শেষ পর্যন্ত বের হল। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে যে অলংকরণগুলি আছে, তা এঁকেছেন আমার ছাত্র, কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক, শ্রীপঞ্চানন মালাকার। প্রচ্ছদপটও তাঁরই আঁকা।

এই গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশনায় যাঁদের সহযোগিতাকে আমি বিশেষ মূল্য দিই, তাঁরা হলেন আমার ছাত্র-ছাত্রীবা। অযাচিত ভাবে তাঁরা তাঁদের নিজ-নিজ অঞ্চল থেকে নানা তথ্য এনে দিয়েছেন। কতো অজানা-অচেনা মানুষও আমাকে নানা বিচিত্র সংবাদ জুগিয়েছেন। গ্রন্থটি মুদ্রণকালে আমি চোখের রোগে আক্রান্ত হই। বই দেরিতে বের হবার এটিও একটি কারণ। ছাত্রছাত্রীরাই তখন প্রুফ ইত্যাদি দেখাশোনা করতেন। এঁদের মধ্যে আছেন. আমার ছাত্র ও সহকর্মী ডঃ মানস মজুমদার,—তিনি নানা ভাবে আমাকে পরামর্শও দিয়েছেন, তথ্যও জুগিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন শ্রীমান অদীপ ঘোষ। এঁদের তৎপরতা সত্ত্বেও নানা প্রকার ভুলত্রুটি গ্রন্থে থেকে গেল। পাঠক সে দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং এ বিষয়ে অন্যান্য সংবাদ জানালে বিশেষ বাধিত হব। ইতি—

বাঙলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রথযাত্রা, ১৩৯২

নির্মলেন্দু ভৌমিক

সূচীপত্র ঃ প্রথম খণ্ড

---

* এগুলি ভুলক্রমে 'নবম' ও 'দশম' অধ্যায় রূপে মুদ্রিত হয়েছে।

সূচীপত্র ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পাখি : বিহঙ্গচারণা, প্রসঙ্গ, পটভূমিকা

মানবেতর তাবৎ প্রাণীর সঙ্গেই আদিম যুগ থেকে মানুষ মিতালি পাতিয়ে এসেছে, —পাখির সঙ্গে সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ বেশি। পাখির রূপ-রঙ, তার ওড়া ও গতিবিধি, গান ও নাচ, ঋতুতে-ঋতুতে তার আসা-যাওয়া, তার পালকের কোমলতা এবং ঠোঁট ও নখের তীক্ষ্ণতা—সবই মানুষের কৌতূহলকে চিরকাল জাগিয়ে এসেছে। বিরাটকায় পাখিরা যেমন মানুষের মনে ভয়-বিস্ময়-সম্ভ্রমবোধকে জাগিয়েছে, ক্ষুদ্রকায় পাখিরা আবার কেউ কেউ মানুষের প্রীতি-মমতা আকর্ষণ করেছে।

পাখির ক'টি বিশেষত্ব মানুষকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে থাকে। প্রথমতঃ, পাখি ছাড়া আর কোনো প্রাণীই উড়তে পারে না, পাখির এই ওড়ার ক্ষমতা মানুষের মনে একপ্রকার ঈর্ষার জন্ম দিয়েছে, অবশেষে, পাখিরই দেখাদেখি, উড়োজাহাজ আবিষ্কার করে মানুষ তার সাধ পূরণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, মানবেতর সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র পাখিই পারে মানুষের মতো একটু-আধটু কথা কইতে, বা মানব-ভাষার নকল করতে। তৃতীয়তঃ, মানুষের মতো পাখিও দ্বিপদ (Biped) প্রাণী,—নিজে দ্বিপদ প্রাণী বলেই পাখির সঙ্গে মানুষ একটি আত্মীয়তা অনুভব করে থাকে যেন।

পাখির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নানা প্রয়োজনের এবং অপ্রয়োজনের অর্থাৎ শখ-শৌখিনতার। মানুষের সঙ্গে পাখির এই যোগসম্পর্কের ফলে গড়ে উঠেছে নানা সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-অভিচার-অনুষ্ঠান, সাহিত্যিক, ঐতিহ্য। তাই এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ॥

সুতরাং এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে ornithology অর্থাৎ পক্ষি-তত্ত্বের কোনো যোগ নেই। ববং বলা যায়, একজন সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানী যেভাবে পাখি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কটি লক্ষ করবেন, তাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

তবে সেই বিষয়েব মধ্যে প্রবেশ করবার আগে, বিষয়েরই অনুরোধে, পাখি সম্পর্কে পরিচিত দু-একটি তথ্যের পুনরাবৃত্তি করছি।

বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন, আনুমানিক পনেরো কোটি বছর আগে সরীসৃপ থেকে পাখির উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে পাখির যে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তা থেকেই তাঁদের এই অনুমান। এই জীবাশ্মগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল জার্মানীতে পাওয়া আর্কেওপটেরিক্‌স্‌ লিথোগ্রাফিকা (Archeopteryx lithographica) এই আর্কেওপটেরিক্‌স্‌-কে সরীসৃপ ও পাখির মধ্যবর্তী প্রাণী বলে মনে করা হয়। আদিস্তরের পাখিকে বিজ্ঞানীরা বলেন Pterodactyl, উড়ুক্কু সরীসৃপ। ময়ূর, মুরগী, পানকৌড়ি প্রভৃতি পাখির মধ্যে আজও সরীসৃপ-ভাব লুকোনো আছে। সাধারণভাবে আজও তাই পাখিকে বলা হয় 'Glorified Reptiles'.

পাখির সঙ্গে সাপের যোগ নানাভাবে আবিষ্কার করা যেতে পারে: উভয়েই অণ্ডজ প্রাণী, সাপের বৎসরান্তে খোলস-ত্যাগ পাখির-পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয়। পাখির ডিমের রঙ ও আকৃতি জীব-বিজ্ঞানেব দিক থেকে আজ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত যেসব পাখিরা গাছের কোটরে বা গর্তে ডিম পাড়ে (অর্থাৎ যেসব জায়গায় সাপ থাকে) তাদের ডিমের রঙ কেবল সাদাই হয়, যেহেতু সরীসৃপেরা সাদা রঙেরই ডিম পাড়ে। প্রাচীনকালের লোকেরা সাপের Hibernation বা শীতকালীন ঘুমের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের ফলে পাখির অদর্শনের তুলনা করতেন। হাউস-মার্টিন প্রভৃতি পাখিরা নাকি শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটায়। সাপ যেমন গর্তে চলে যায়, তেমনি কারো কারো ধারণা, বিশেষ-বিশেষ পাখি কাদা-মাটির আড়ালে চলে যায়। অবশ্য, যথার্থই কোনো কোনো পাখিকে শীতকালীন ঘুম দিতে দেখা গেছে। তবে সাপের রক্ত ঠান্ডা, আর পাখির রক্ত উষ্ণ। প্রথম দিকের পাখিদের মধ্যে জলচারী পাখির সংখ্যাই বেশি, মাছই এদের খাদ্য ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, মানুষ প্রথম বনমুরগীকে, তারপর পায়রা, হাঁস প্রভৃতিকে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করেছে। বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পাখির জাতিগত বিবর্তন ঘটেছে: বাবুই, চড়ুই, বুলবুল প্রভৃতি পাখি পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত নবাগত। কাক সে দিক থেকে আধুনিকতম (সে জন্যেই কি চালাকি বেশি!) আকৃতিগত বিবর্তন হল সাধারণভাবে বৃহদাকার থেকে ক্ষুদ্রাকারের দিকে, যদিও ব্যতিক্রম প্রচুর আছে। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং জলবায়ুর ওপর পাখির আকৃতি ও বর্ণ-বৈচিত্র্য নির্ভর করে।

প্রখ্যাত জীবতত্ত্ব-বিশারদ, সুইডেনবাসী ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮), তাঁর 'সিস্‌টেমা নেচারি' বইতে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে পাখিদের শ্রেণী ভাগ করেন।

বর্তমানে জীবিত পাখিদের ২৭টি বর্গে এবং ১৫৪ গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। জীবিত পাখির প্রজাতির সংখ্যা এখন প্রায় ৮৬০০। ভারতবর্ষে এর অনেকগুলিরই দর্শন মেলে। অস্ট্রেলিয়ার পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণাঢ্য পাখি।

পাখির প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষত্বপূর্ণ। কোনো প্রাণীরই পাখির মতো পালক নেই। তাব হাড় ফাঁপা। ল্যাজ 'হাল' বা দিক নির্দেশকের কাজ করে। গলা নানা দিকে ঘোরাতে পাবে। চোখ বিশেষত্ব-পূর্ণ। এক নজরেই পাখি অনেকটা দেখে নিতে পারে। দূরের ও কাছের বস্তুকে সমান তীক্ষ্ণতায় দেখা পাখির পক্ষেই সম্ভব। শকুন, চিল, বাজ প্রভৃতি শিকারি পাখিরা আকাশের উচ্চলোক থেকে মাটির তুচ্ছ বস্তুটিকেও দেখতে পায়; মাছরাঙা প্রভৃতি পাখি জলের ভেতর ভাসমান মাছকে মুহূর্তে চিৎ করে ঠোঁট দিয়ে তুলে নিয়ে আসতে পারে। প্যাঁচার চোখের ওপরকার আবরণ নেই, তাই চোখ জ্বলজ্বল করে। নিশাচর পাখিরা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পারে। পাখির দৃষ্টিশক্তি মানুষের মনে বিশেষ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

তেমনি পাখির কণ্ঠবর। স্বরতন্ত্রীর বিশেষত্বের জন্যেই পাখির কণ্ঠবরের বিশেষত্ব এসেছে। অনেক পাখিই সুকণ্ঠ, কেউ বা কর্কশস্বরের। পাখির কণ্ঠশক্তি নিয়েও মানুষের বিস্ময়ের অন্ত নেই। বিজ্ঞানী গ্রাণ্ট্ এলেন্ ইতর-প্রাণীর সৌন্দর্য ও কণ্ঠরবের সঙ্গে চিনি বা শর্করা জাতীয় পদার্থের সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন (দ্রঃ চিনি ও সৌন্দর্য : বিবিধ প্রসঙ্গ : দাসী, মে ১৮৯৪। পৃ. ৩৩৯)। তিনি বলেছিলেন, প্রাণিজগতে যেখানেই সৌন্দর্যের ঘটা, সাজসজ্জার ছড়াছড়ি, সেখানেই দেখা যায় সেই প্রাণী শর্করা-প্রিয়। শকুনি, চিল প্রভৃতি মাংসাশী পাখি শর্করা-প্রিয় নয়। দেখা গেছে, যে পাখির নেই রঙের সম্পদ, কণ্ঠ-সম্পদ তারই আছে।

পাখির দেহ-বর্ণ তার নিবাসভূমির সঙ্গেই মিলিয়ে হয়ে থাকে। এ হল প্রকৃতির বিধান। নিবাসভূমির গাছ-পালা ও অন্যান্য পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে পালকের রঙ হবার দরুণ পাখির পক্ষে আত্মরক্ষা করা ও শত্রুকে এড়ানো সম্ভব হয়। ডিমের রঙ ও আকৃতিও তাই। শত্রু যাতে ডিমগুলি দেখতে না পায়, কিংবা ডিম যাতে নীড় থেকে গড়িয়ে নীচে না পড়ে, সেই অনুযায়ীই পাখির ডিমের রঙ ও গড়ন হয়ে থাকে। যেসব পাখির নীড় ঢাকা থাকে, তাদেরই ডিম চক্‌চকে হয়, অন্যদের হয় না। খোলা নীড়ের ডিম আত্মরক্ষার কারণেই অনুজ্জ্বল হয়।

পাখির পরিযায়ী হওয়া আর এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ঋতু পরিবর্তনের ফলে পাখিরা দেশান্তরে চলে যায়। প্রাচীনকাল থেকে এ নিয়ে নানা বিশ্বাস চলিত আছে। কেউ বলেন পাখিরা লুকিয়ে পড়ে, কেউ বলেন চেহারা পাল্টে নতুন পাখিই হয়ে যায়। অতিরিক্ত শীত বা গরম কোনোটাই পাখির সহনীয় নয়। খাদ্যাভাব, দিন ছোটো হয়ে আসবার জন্যে খাদ্যান্বেষণে সময়াভাব, ডিম দেওয়া ও শাবক লালন ইত্যাদি নানাকারণে পাখি দেশ থেকে দেশান্তরে যাতায়াত করে। উত্তর গোলার্ধের পাখিই বেশি পরিমাণে দেশান্তরী হয়। অনেকে এর পেছনে পাখির পূর্ব-পুরুষের ভয়াল অভিজ্ঞতাকে খোঁজেন : প্লিসটোসিন যুগের হিমবাহের ফলে পাখিদের উত্তর দিক ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে চলে আসতে হয়েছিল; পূর্বাবস্থা ফিরে এলে তারা যথাস্থানে ফিরে

যায়। এখনও প্রতি শীতে শীত এলে, সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে, নিতান্ত অভ্যাস বশেই, তারা আজও দেশান্তরী হয়ে পড়ে।

পাখিদের স্থান ত্যাগ ও ফিরে আসা প্রায় পঞ্জিকার তারিখ মিলিয়ে ঘটে থাকে। একই স্থানে পাখিরা পুরুষানুক্রমে ফিরে আসে ও চলে যায়। পাহাড়, প্রান্তর ও সাগর সহজেই পাড়ি দেয়। পথ ভুল হয় না। দিনের চেয়ে রাতেই বেশি পথ পাড়ি দেয়। কেউ বলেন, ধ্রুবতারা দেখে, কেউ বলেন জ্যোৎস্নায় পথ চিনে, কেউ বলেন মেরু দেশের চৌম্বক শক্তি অনুভব করে পাখি পথ চিনে নেয়। যেসব পাখি সদ্যোজাত, তারাও পূর্ব অভিজ্ঞতা-বিহীন হয়ে পূর্ব-পুরুষের পথরেখা ধরে চলাফেরা করে। এ যে পাখির এক বিরাট ক্ষমতা, তাতে সন্দেহ নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে পাখির এই গমনাগমন থেকে ভূতাত্ত্বিকেরা এক নতুন দিকের সন্ধান পেয়েছেন। ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে প্রাচীন পৃথিবীর অনেক ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু পাখিরা তাদের পথ পরিবর্তন করেনি। পাখিদের এই পথরেখা ধরে ভূ-পৃষ্ঠের প্রাচীন রূপটি অবগত হওয়া যায়। মানসসরোবর যাত্রী কলহংসেরা জানে হিমালয়ের কোন্ সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে সেখানে পৌঁছানো যাবে, কিংবা সাইবেরিয়ার পাখিরা জানে, কোন্ গিরিসংকট দিযে ভারতে পৌঁছানো যায়।

নীড় নির্মাণেও পাখির বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। নীড়ের অবস্থান, আকৃতি ও উপকরণ – সবই পাখির আত্মরক্ষার ও বেঁচে থাকবার অনুকূলে হয়ে থাকে। মাটিতে, গাছের কোটরে, নদীর ধারে যেসব পাখি বাসা বাঁধে, তারা বর্ষা আসবার আগেই বাচ্চা বড়ো করে নেয়। ধনেশ, বাবুই, চোখ গেল প্রভৃতির নীড় বিশেষত্বপূর্ণ। বাবুই জানে, কি ভাবে নীড় তৈরি করলে ঝোড়ো বাতাসে তার নীড় গাছ থেকে খসে পড়বে না। নীড় নির্মাণে কেউ পরিশ্রমী, কেউ আসল-অগোছালো। কেউ বা শৌখিন প্রকৃতির। অস্ট্রেলিয়ার 'বাওয়ারবাডা' নানাভাবে নীড়টি সাজায়। কোনো কোনো, পাখির নীড়ের আবার সদর ও অন্দর মহল থাকে, কারো বা বৈঠকখানা। চক্‌চকে পদার্থ (যেমন ভাঙা কাঁচের টুকরো), রঙিন নুড়ি পাথর, রঙিন কাগজ, সাপের খোলস, এমন কি চুলের কাঁটা, কী না পাওয়া যায় পাখির বাসাতে। নীড় নির্মাণে কেউ-বা তাঁতী, কেউ-বা দরজি, কেউ-বা কুম্ভকার, আবার কেউ-বা খাঁটি ইঞ্জিনীয়ার। নীল সাগরের গফু পাখিরা সমুদ্রতীরে একটি গোটা উপনিবেশই গড়ে তোলে। এমন স্থান নির্বাচন করে, যেখানে কাছে-পিঠেই খাদ্য মেলে। প্রথমে এক ঝাঁক পাখি এসে স্থান নির্বাচন করে ইঞ্জিনীয়ারদের মতো, নখের আঁচড় দিয়ে সারি-সারি ঘরের নকশাটা করে নেয়। ঘরের সংখ্যা ঠিক ততগুলিই হয়, দলে যতগুলি পাখি আছে। হিসেবে কোনো ভুল হয় না॥

·৩·

পাখির ওপর মানুষ কিছু কিছু মানবিক গুণাগুণের আরোপ করেছে। এতে

মানুষ ও পাখির ভেদ-রেখা অনেকটাই ঘুচে-মুছে গেছে। পাখির 'বুলি'তে মানুষ ভাষা আরোপ করে। পাখির নামকরণেও মানবিক ভাবকে লক্ষ করা যায়। অবশ্য, পাখির আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে মানুষের জগতের সাদৃশ্য লক্ষ করবার ফলেই এটি ঘটে। তাই কোনো পাখিকে চোর, কাউকে কসাই, কাউকে অলস, কাউকে সজাগ পাহারাওয়ালা, কাউকে জেলে বা তাঁতী বা দরজি বা কুমোর, কাউকে নাচিয়ে, কাউকে কাঠুরে, আবার কাউকে ঝাড়ুদার—এইসব আখ্যা দেওয়া হয়, ঠিক মানুষের জাতি-বর্ণ-বৃত্তিকে অনুসরণ করেই।

প্রবল শত্রুর হাত থেকে নিজেকে ও শাবক-ডিম্বকে কি করে রক্ষা করতে হয়, পাখি তা ভালোভাবেই জানে। এ জন্যে ছলা-কলা-অভিনয়ের আশ্রয় নেয়, সে বুদ্ধিমান মানুষের মতোই। কেউ নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ঝোপ-ঝাড়-গাছ-পালার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, কেউ মরার ভাণ করে, কেউ অসুস্থতা বা দুর্বলতার ভাণ করে, কেউ বা বেমালুম খোঁড়া বনে যায়। শত্রু কাছে আসতেই স্বরূপ ধারণ করে। কেউ গাছের শুকনো মরা ডালের অনুকরণে গ্রীবাটিকে এমন স্থির-নিশ্চল ভঙ্গিতে তুলে ধরে যে, শত্রুর মনে হয়, বহুপূর্বেই পাখিটির মৃত্যু হয়েছে। এ সম্পর্কে পাখির অন্যতম শত্রু সাপের কথা ওঠে। জনশ্রুতি আছে, সাপের দৃষ্টিতে আছে সম্মোহনী শক্তি, সেই শক্তি দিয়েই সে পাখিকে অবশ করে, ধরে খায়। ব্যাপারটি সর্বৈব মিথ্যে। ডাল বেয়ে সাপকে নীড়ের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেই শাবক বা ডিমকে রক্ষা করবার জন্যে ডানা ঝাপটিয়ে বা সহজলভ্যতার লোভ দেখিয়ে সে সাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে ভোলাতে চায়। সাপও ভোলে। কোনো কোনো সময় তৎপরতার অভাবে সত্যিই দুর্ঘটনা ঘটে যায়, পাখি সাপের মুখে ধরা পড়ে। এক আকস্মিক ব্যাপারটি থেকেই ওপরের বহুশ্রুতির জন্ম হয়েছে।

পাখির সঙ্গে মানুষ নারীকে উপমিত করে থাকে। পাখির পালকে আছে কোমলতা, নখে ও ঠোঁটে হিংস্রতা,—নারীর চরিত্রের দুই বিপরীত দিক। আবার নারীর বাৎসল্য ও অপত্য-মমতাকেও মানুষ পাখির মধ্যেই দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছে। কাক প্রভৃতি পাখিরা অপরের সন্তান অজ্ঞাতেই পালন করে থাকে, নীড়ে ডিমের সংখ্যা অকস্মাৎ বেড়ে গেলেও তাদের অপত্য-মমতা কিছুমাত্র কমে যায় না, সব ক'টি ডিম খোয়া গেলেও একটি বরফের ডেলাকে সন্তানজ্ঞানে তা' দিতে পেঙ্গুইন-মায়ের কোনো ক্লান্তি নেই, অপত্য-স্নেহের আধিক্য বশতঃই গফুর্ পাখি প্রতিবেশিনী পাখির নীড় থেকে ডিম চুরি করে নিয়ে আসে! অনেকেরই বিশ্বাস, অপত্য-স্নেহের আধিক্য বশতঃই পক্ষি-মাতার এই চৌর্যবৃত্তি। মুরগী-মাতা নিরপেক্ষ মমতায় হাঁসের ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটায়, আপন সন্তানের সঙ্গে হংস-শাবকদেরও নিয়ে চরতে বের হয় এবং জলাশয়ের নিকটবর্তী হলে হংসশাবক যখন দল-ছাড়া হয়ে আপন সহজাত সংস্কার বশে তাতে নেমে পড়ে, তখন মনুষ্য-মাতার মতোই সন্তানের সলিল-সমাধির আশঙ্কায় কাতর হয়ে রীতি-মতো শাসন-তর্জন করে। আপন সন্তানের প্রতি পক্ষিমাতার স্নেহপরায়ণতার শেষ নেই, মুহুর্মুহুঃ খাদ্যান্বেষণে গমনাগমন করে, এমন কি, যখন অজ্ঞাতে অপর পক্ষীর সন্তান পালন করে সহজাত সংস্কারের শাসনে, তখন সেই শাবক যদি আপন আকৃতির দ্বিগুণও হয়ে পড়ে, তথাপি ক্লান্তি ও দ্বিধা থাকে না। Stork অর্থাৎ সারস জাতীয় পাখিদের

মধ্যে দেখা যায়, পরিযায়ী হবার কালে অসমর্থ বৃদ্ধ পাখিদের বহন করে নিয়ে চলেছে শক্ত-সমর্থ তরুণ পাখিরা।

মানুষ পাখির মধ্যে অপত্যমমতা এতো বেশি পরিমাণেই লক্ষ করেছে যে, অস্ট্রীচ পাখির মধ্যে এই মাতৃত্বের অভাব দেখে বাইবেলে রীতিমতো এই পাখিকে তিরস্কার করা হয়েছে।

পাখির দাম্পত্য জীবনের সংস্কার ও বাঁধনও মানুষের জগতের কাছাকাছি। ঘুঘু-কপোত, চখা-চখী এবং বিশেষ ধরনের হাঁসদের দাম্পত্য-প্রেম মানুষেরও বিস্ময় উদ্রেক করে। মোরগ তার একাধিক মুরগী-পত্নীকে নিয়ে চরতে বের হলে, বৃষ্টি আসবার সম্ভাবনা দেখলে, পত্নীদের আগেই গৃহে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। ধনেশ-পত্নীর সন্তান-সম্ভাবনা হলে সে বৃক্ষের কোটরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, মাটি এবং আপন বিষ্ঠা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে কেবল গলাটুকু বের করে রাখে, পুরুষ ধনেশই অক্লান্তভাবে সেই আসন্ন-প্রসবা ও সদ্য-প্রসূতির পরিচর্যা করে চলে। নিজের এবং পত্নীর খাদ্যের সংস্থান করতে অনেক সময় পুরুষ ধনেশ অসুস্থ ও রুগ্ন হয়ে পড়ে। অনেক পাখিই দাম্পত্য-জীবনের কর্ম-কর্তব্যকে সমানভাগে ভাগ করে নেয় : পক্ষি-মাতা আহার-সন্ধানে বের হলে সেই সময়টা পুরুষ পাখিই ডিমে তা দিতে বসে। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রজননকালে যেসব পাখি স্ত্রী-পুরুষ একই রকম আকৃতির, সেসব পাখি (যেমন ভরত ইত্যাদি) পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রণয় প্রকাশ ও পরিবার রচনায় আগ্রহী হয়। কোনো কোনো দেশে (যেমন, চীনে) মানবিক দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ পাখিদের দাম্পত্য-জীবন থেকেই গৃহীত হয়।

পাখিদের সামাজিক জীবনের নিয়ম-বন্ধন, তাদের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করবার মতো। প্রচণ্ড তুষারপাতের কালে পেঙ্গুইন পাখিরা বৃত্তের পর বৃত্ত রচনা করে সদলে আত্মরক্ষা করে, যারা বৃত্তের ভেতরে থাকে, তারা কিছুক্ষণ তুষার ঝঞ্ঝার হাত থেকে রক্ষা পাবার পর স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে, এবং যারা বৃত্তের বাইরে থাকে তারা ভেতরের বৃত্তে আশ্রয় নেয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে তারা একে অন্যকে রক্ষা করে। এ ছাড়া, মাছরাঙা পাখির লক্ষ্য-ভেদী আক্রমণ, বক ও অক পাখির ধৈর্যধারণ, গ্রীব পাখির নৌকো বাইবার ক্ষমতা, পুফিন পাখির সুশান্ত ভাব মানুষের কাছে ঈর্ষা ও আদর্শের বিষয়॥

পাখির মধ্যে মানুষ মানববৎ গুণাগুণের যেমন অস্তিত্ব লক্ষ করেছে, তেমনি প্রকৃতির নির্দেশেই পাখি আপন সংস্কার বশে মানুষের অসংখ্য উপকার সাধন করে থাকে। এতো বিচিত্র পথে পাখি মানুষের উপকার সাধন করে যে, বলা হয়, বরং মানুষকে বাদ দিয়ে পাখির চলতে পারে, কিন্তু পাখিকে বাদ দিয়ে মানুষের দিন চলা ভার।

মানুষের কৃষি, অর্থনীতি, এবং নিতান্ত দৈহিক দিকের সঙ্গে পাখি অবিচ্ছেদ্যভাবে

জড়িয়ে আছে সভ্যতার সেই আদিকাল থেকেই। আদিম মানুষ পাখির ডিম-মাংস থেকে প্রোটিন আহরণ করেছে, বৃহদাকার পাখির পালক-শুদ্ধ চামড়া গায়ে দিয়ে তীব্র শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে, বৃহদাকার ডিমের খোলা (যেমন, অস্ট্রীচ পাখির) দিয়ে তৈরি করেছে তার পাত্র, কখনো বা তার জঙ্ঘার হাড় দিয়ে (যেমন, অ্যালবাট্রস পাখির) তৈরি করেছে তামাক রাখবার 'পাউচ'।

কোনো কোনো সমুদ্র-চারী পাখির বিষ্ঠা কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে অতুলনীয় সারের কাজ করে থাকে। এই ধরনের বিষ্ঠাকে বলে 'Guano' পেলিকান, পানকৌড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক পাখিরা মূলতঃ মৎস্যভোজী। ফলে তাদের বিষ্ঠাতে থাকে ফসফোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রোজেন, যা কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক।

শিকারজীবী আদিম মানুষ তো বটেই, আধুনিক কালেও দেখা যায়, মানুষের মৎস্যশিকারের সহযোগী হয়েছে পেলিকান বা গগনভেড় পাখি। চীন, জাপান, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের জেলেরা, এমন কি, সুন্দরবন অঞ্চলের জেলেরাও পেলিকানের সাহায্যে মাছ ধরে থাকে। এই পাখির গলায় একটি আংটা পরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মাছগুলো পাখিটা খেয়ে ফেলতে না পারে, তারপর তীরে এনে গলা থেকে সেই মাছ বের করে নেওয়া হয়। এক-একটি পেলিকানের গলায় প্রায় দেড় কিলোগ্রাম মাছ ধরে। ঈগল, বাজ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদৃষ্টির হিংস্র পাখিকে শিক্ষা দিয়ে আদিম মানুষ শিকারের সহযোগী করে নিয়েছে। মোঙ্গল জাতির মধ্যে এই প্রথা খুব দেখা যায়।

যেসব দেশে অস্ট্রীচ বা উট পাখি মেলে (যেমন, অস্ট্রেলিয়াতে) সেখানে উট পাখি দিয়ে গাড়ী টানা এবং হলকর্ষণ পর্যন্ত করা হয়। উট পাখি জোরে দৌড়াতে পারে, তার গায়ে বেশ জোর আছে।

সর্প-খাদক পাখিরা সাপ খেয়ে মানুষের বিশেষ উপকার করে থাকে। ইঁদুর, শামুক যা শস্যক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতিকারক,—বক, প্যাঁচা প্রভৃতি তার বিনাশ করে থাকে। মানুষ অকারণেই বকের বদনাম করে থাকে, কিন্তু বক কৃষকের বিশেষ বন্ধু। গো-বগুলো গোরুর গাত্রস্থিত পোকা-বিশেষ খেয়ে ফেলে গোরুর স্বাস্থ্য বিধান করে। কাঠ-ঠোকরা পাখি সতেজ গাছের বিশেষ শত্রু-পোকাদের ঠুকরে খেয়ে গাছের আয়ু বাড়িয়ে দেয়।

গাছের বীজ উৎপাদনের উদ্দেশে ফুলের পুং-কেশরের পরাগরেণু সেই জাতীয় স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে পৌঁছনো প্রয়োজন। প্রকৃতির বিধানে নানা প্রাণী ও পাখি এই কাজ করে থাকে। ফুলে ফুলে বিচরণ করবার সময় পাখির ঠোঁটে, পাখায় ও পায়ে যে পরাগরেণু লেগে যায়, তাই ফলোৎপাদনের কাজ করে থাকে।

যেসব গাছে সরাসরি ফল হয়, সেসব গাছ তাদের রঙিন ফলের বাহার দেখিয়ে পাখিকে নিকটে আকর্ষণ করে। সব ফলই যদি গাছের তলায় পড়ে, তবে সেই একই স্থানে 'এতো' গাছ জন্মাবে যে, কারো পক্ষেই বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়। গাছ তাই ধরার বুকে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্যে দিকে দিকে নিজেকে বিস্তার করে দিতে চায়।

পাখিই এ কাজে তার সহায়ক। পাখির ঠোঁট, পা, পাখার সঙ্গে ফলের বীজ ছড়িয়ে পড়ে, এ ছাড়া পাখির বিষ্ঠা ও ফল ছড়াবার এক প্রকৃষ্ট পথ।

কৃষির পক্ষে পাখির অপর ভূমিকা হল, কীট-পতঙ্গ নাশ। পাখি প্রতি ঘণ্টায় প্রচুর পতঙ্গ খায়। তা ছাড়া কোনো কোনো পতঙ্গ এতো শীঘ্র বংশবৃদ্ধি করে যে প্রতিনিয়ত তাদের হত্যা না করলে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেত। পাখিই পতঙ্গাদির প্রাণ বিনাশ করে মানুষের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে।

মানুষের আজীবিকা ও ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গেও পাখি জড়িত। পক্ষি-পালন ও পক্ষি-শিকার মানুষের এক প্রাচীন জীবিকা। এদের বলা হয় 'খটিক'। পাণিনির 'অষ্ট্যাধায়ী'তে ব্যাধ অর্থে 'পাক্ষিক' ও 'শকুনিক' শব্দ দুটি মেলে। বিহার ও উত্তরবঙ্গে পক্ষি-শিকারীদের বলে 'নলুয়া'। এরা বিশেষ ধরনের ফাঁদ পেতে পাখি ধরে এবং তা বিক্রয় করে। পূর্ববঙ্গে পালিত 'ঢুপী' পাখি দিয়েই পাখি শিকার করা হয়। সেখানে নানা উদ্দেশে 'কুড়া' নামে জলজ পাখিও প্রতিপালন করা হয়। 'কুড়া' শিকারও এক জীবিকা। কুক্কুট প্রভৃতি যেসব পাখি যুদ্ধ করতে পারে, সেসব পাখিকে দিয়ে বাজী ধরে যুদ্ধ করান কিছু লোকের পেশা। অবশ্য তা কতকাংশে নেশাও বটে।

পাখির পালক ইউরোপীয়-সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দেহের শোভা ও পোষাকের সৌষ্ঠব বাড়াতে ব্যবহৃত হত। Egret বা বক জাতীয় এক ধরনের পাখির পালক এ জন্যে খুব ব্যবহৃত হত। অবিভক্ত ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে এই জাতীয় পক্ষিপালন এক কুটীর শিল্পে পরিণত হয়েছিল। এই পাখির পালক রপ্তানীই এক বাণিজ্যে পরিণত হয়। মহিলাদের রুচির পরিবর্তনে এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রণীত 'wild birds and animals' protection act'-এর ফলে আজ তা বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপে ব্যবসায়িগণ এক ধরনের পায়রার সঙ্গে অপর ধরনের পায়রার crossbreed করিয়ে নানা রঙের পায়রা সৃষ্টি করে বিশেষ অর্থোপার্জন করে থাকে। লক্কা, মুখ্খী, গলা ফুলো, জাকোবীন, সিরজী, মুনিয়া প্রভৃতি পায়রার মধ্যেই সাধারণতঃ মিশ্রণ ঘটানো হয়ে থাকে। চীনদেশে আবাবিল ধরনের এক পাখি আছে, তার লালা দিয়ে তৈরী বাসা সেখানে উপাদেয় খাদ্য বলে সমাদৃত হয়। এই পাখির বাসা নিয়ে একদা ব্রহ্মদেশ ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। 'পিকিং ডাক্' আমেরিকায় বিশেষ সমাদৃত, তা চীনের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এক সরল পথ।

প্রাচীন ভারতের নৌযাত্রীরা সমুদ্রাভিযান কালে সঙ্গে করে কাক নিয়ে যেত বলে কথিত হয়। কাক নাকি দিকচিহ্নহীন জলরাশির মধ্যে স্থলভাগ নির্দেশ করবার 'নিসর্গ-প্রতিভা'র অধিকারী। দিকহারা নাবিক কাককে উড়িয়ে দিলে, কাক যে দিকে উড়ে যেত, সেই দিকেই নিশ্চিত স্থলের উদ্দেশে তারা নৌকো বাইত। এই কাককে বলা হত 'দিশাকাক'। 'সী গাল' নামে এক সামুদ্রিক পাখি বিশেষ তেমনি ঝড় আসবার সম্ভাবনাকে আপন সংস্কার দিয়ে সহজেই বুঝতে পারে, এমন কি ব্যারোমিটারের পূর্বেও তারা তা জানতে পারে। এদের ওড়বার গতিবিধি দেখে আধুনিক কালেও জাহাজের নাবিকগণ পূর্বাহ্ণেই সাবধান হয়। তবু স্বার্থপর নাবিকগণ সমুদ্রের ওপর তেল ছড়িয়ে, ওই পাখিদের ডানায় তা লাগার ফলে তাদের ওড়বার ক্ষমতা কমিয়ে,

হত্যা করে খায়। সমুদ্রের ওপর তেল ছড়ানো এবং ওই পাখিদের হত্যা করা বর্তমানে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কয়লা-খনিতে বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার-কর্মে ক্যানারি পাখির সহায়তা উল্লেখযোগ্য। মানুষের চেয়ে আগে এরা দূষিত বায়ুর উপস্থিতি টের পায়। খনির উদ্ধারকারীরা খাঁচায় ক্যানারি পাখি নিয়ে খনিতে নামে, পাখি যদি কোনোপ্রকার অসুস্থতার লক্ষণ দেখায়, তবে উদ্ধারকারীরাও সাবধান হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনেক দিন থেকেই এই প্রথা প্রচলিত আছে।

হাতীর মতো বিশালাকায় প্রাণীকে এরোপ্লেনে করে নেওয়া এক দুঃসাধ্য কর্ম। একটি মুরগীর পায়ে দড়ি বেঁধে হাতীর সম্মুখের পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিলেই হাতী স্থির হয়ে বসে থাকে।

পাখির পালকের যে অংশ Quil, তা দিয়ে কলম প্রস্তুত হয় বিভিন্ন দেশে। দেশে বলে 'কুইলে'র কমল। সাধারণতঃ হাঁস ও ময়ূরের পালক দিয়েই তা তৈরি হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক হাঁস কলম হবার মতো আটটি পালক দেয় ; এর মধ্যে প্রত্যেক ডানা থেকে তিনটি করে বড়ো কলম হয়। পূর্ববঙ্গে পানকৌড়ির পালক দিয়ে যে কলম তৈরি হয়, তাতে খুব মিহি লেখা হয়।

বাবুই পাখির বাসা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বালিশ তুলোর বালিশের চেয়েও নরম ও আরামপ্রদ হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস। জার্মানী থেকে গ্রীম্-ভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত একটি লোককথাতেও পাখির বাসাকে বালিশ করবার সংবাদ মেলে।

মুরগীর ডাক প্রহর গণনাতে, কানাকুকোর ডাক জোয়ার-ভাটার শুরু ও শেষকে বুঝতে সাহায্য করে। বনঘুঘু নামে পূর্ববঙ্গের এক ধরনের পাখি দুপুরের নির্দিষ্ট সময়ে ডাকে। অস্ট্রেলিয়ার জ্যাকাস্ পাখি দিনে ঠিক-ঠিক সময়ে তিনবার হাসে। এই হাসি দিনের অগ্রগতি অনুধাবনে মানুষকে সাহায্য করে।

বাদুড় যদিও পাখি নয়, তবু বাদুড়ের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়, বাদুড় মশা খেয়ে ম্যালেরিয়া রোগের উৎসাদন করে। বাঙলাদেশেও বাদুড়ের সহায়তা দেওয়া হোক বলে একদা প্রস্তাব করা হয়।

আসন্ন বিপদ-আপদ দেখলে কোনো কোনো পাখি আর্ত চীৎকার করে উঠে মানুষকে সজাগ করে দেয়। সাপ দেখলে শালিক চীৎকার করে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বিশ্বাস আছে, বাড়িতে ঢুকতে গেলে দোয়েল বিশেষভাবে ডেকে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বিশ্বাস আছে, গ্রামে বাঘ বের হলে ঈগল বিশেষভাবে ডাকতে থাকে। কারো ওপর 'নজর' রাখবার প্রয়োজন হলে পাহারাদারের কাজ করবার জন্যে প্রাচীন ভারতীয় আখ্যান-উপাখ্যানে শুক ও সারীর নাম খুব পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'শুকসপ্ততি' এবং আরব্য রজনীর উপাখ্যান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ॥
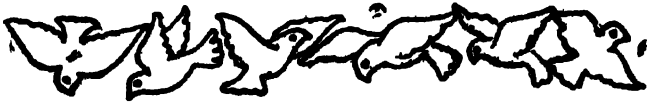
কিন্তু পাখির উপকারের সবচেয়ে আধুনিক দিক হল, দৌত্যকর্মে পাখিকে নিয়োগ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই, পাখিকে দৌত্যে নিয়োগ করবার প্রথা ছিল। প্রাচীন কথা-কাহিনী-কাব্যে পাখিকে দূতের কর্ম করতে দেখা যায়। লোকসঙ্গীতগুলিতে এখনও দেখা যায়, বিশেষ-বিশেষ পাখিকে বা নির্বিশেষ পাখিকে এই কর্মে নিযুক্ত করা হচ্ছে। বাইবেলে দেখা যায়, নোয়া তাঁর নৌকো থেকে, মহাপ্লাবনের পর, কাককে প্রথম দৌত্যে নিয়োগ করেছিলেন। চীনের Postal flag-এ আজো এক উড়ন্ত হাঁসের প্রতিকৃতি থাকে। তুরস্কের দূতেরা মাথায় পরিধান করে ঝুঁটির মতো উষ্ণীষ, হুপোরও সেই ধরনের ঝুঁটি থাকায় হুপোকে তুর্কীরা 'দূতপাখি' আখ্যা দিয়েছে। এই সেদিন পর্যন্ত বাঙলাদেশেই দেখা যেত, প্রেম-পত্র পাঠাবার জন্যে যে লেপাফা ব্যবহৃত হত, তাতে থাকত একটি ছবি. একটি পাখি মুখে করে সেই পত্র নিয়ে উড়ে চলেছে। 'কুণ্ডনিজাতক' (সং ৩৪৩) নামে জাতকের গল্পে দেখা যায়, কোশল-রাজের প্রাসাদে যে ক্রৌঞ্চী থাকত, সে দূতের কাজ করত। এই পটভূমিকায় 'হংসদূত' নামে কোনো কাব্য রচিত হওয়া কোনো দেশেই অসম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া ব্যালাড-গুলিতে দেখা যায়, সংবাদ প্রেরণের জন্যে বারবার কাক এবং কখনো কখনো চিলের নাম করা হচ্ছে, সেখানকার এক ধরনের জলজপাখি 'কুড়া' বা 'কোঁড়া'র নামও মিলছে। যেমন, 'মহুয়া' বা 'মইষালবন্ধু' পালা দুটিতে।

এইসব সাহিত্যিক সংস্কার নিতান্তই কল্পনা নয়, এর বাস্তব ভিত্তি আছে। বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা গেছে, তাতে মনে হয়, কাকই পৃথিবীর প্রাচীনতম দূত-পাখি। তারপরেই সম্ভবতঃ চিল। অতঃপর দেশ ভেদে ও অঞ্চল ভেদে এক-একটি বিশেষ পাখি।

কিন্তু প্রেম এবং যুদ্ধাদির ক্ষেত্রে দূতের কাজ করতে পারাবতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এমন কি, সাধারণ পত্রাদির আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও। কাক-চিল যে সংবাদবাহক, তা অনেকটা বা সবটাই যাদু-রহস্যের অন্তর্গত। কিন্তু পারাবতকে এ বিষয়ে রীতিমতো শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সে শিক্ষাকে গ্রহণ করতেও পারাবত সক্ষম। শোনা যায়, পারাবতের নাকি চৌম্বক শক্তি অনুধাবনের সামর্থ্য আছে; অন্ততঃ, যে স্থান থেকে প্রেরিত, সে স্থানে পুনরায় নির্ভুলভাবে যে ফিরে আসতে পারে, সে-বিষয়ে কোনো ভুল নেই। অনেকেই বলেন, স্ব-স্থানের স্মৃতি ও প্রীতিই পারাবতকে সেই শক্তি দেয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই পারাবত তাই পালিত হত। আর্য ঋষিরাও কপোত পালন করতেন। ডারউইনের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছর থেকে পারাবত মানুষের সঙ্গে বসবাস করছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে যাশুয়া পারাবতের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও রোমের লোকেরা পত্রবাহক-রূপে কপোতকে খুবই নিয়োজিত করত। হোমার বলেছেন, গ্রীকরা কপোত পালন,

করত। গ্রীস অধিকারের পর রোমানগণ কপোতবংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। রোমানদের মধ্যে কারো কারো পাঁচ হাজার কপোত ছিল, দ্রুত উড়তে পারে এমন কপোতদের বংশ-বিবরণী পর্যন্ত তারা রক্ষা করত, সৈন্যদলে কপোত নিয়োগের প্রথাও চলিত ছিল। নিজেদের গৃহের শীর্ষ দেহে কপোতের জন্যে উচ্চ বাসস্থান নির্মাণ করে দিত।

মিশর, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের নাবিকগণ স্বদেশের সন্নিকটবর্তী হয়ে পরিজনবর্গকে তাদের আগমন-বার্তা জানাত কপোতের মাধ্যমে। সিরিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পরবর্তী কালেও বীরগণ তাদের আগমন-সংবাদ জানাত এইভাবে। গ্রীসদেশের অলিম্পিক জয়ীদের নাম কপোতের মাধ্যমেই সর্বত্র রটানো হত। 'ডুয়েল' বা অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় রোমানগণ সঙ্গে কপোত নিয়ে উপস্থিত হত, এবং প্রতিযোগিতার ফলাফল এই কপোতের মাধ্যমেই প্রদত্ত হত।

গ্রীসদেশ অধিকার করবার অর্ধ শতাব্দী পর থেকে রোমানগণ কপোত দ্বারাই পত্র-বহনেব কাজ সারত। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে আরবগণ কপোতকে দিয়ে ডাক-পরিবহণের জন্যে মোসল নামে এক জায়গায় তার অফিস বসিয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীব গোড়াতেই আববের প্রধান নগবীগুলির পরস্পবেব মধ্যে কপোত দ্বারা সংবাদাদির আদান-প্রদান চলত। কপোত দ্বারা ডাক-পরিবহণ অবশেষে মিশর পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

কপোত দ্বারা সংবাদ প্রেরণকে আরবের খলিফাগণ তাঁদের রাজকার্যের এক অঙ্গরূপে বিবেচনা করতেন। বাগদাদের সুলতানদের সংবাদ প্রেরণের জন্যে যেসব পারাবত ব্যবহৃত হত, তাদের ঠোঁটে ও পায়ে বিশেষ রাজ-চিহ্নের স্বাক্ষর থাকত। এজন্যে লোকেরা কপোতকে খুব সম্মান করত, এমন কি দৈব ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করত। এশিয়ার অনেক স্থানে পারাবতকে রাজার বিদেহ আত্মাব প্রতীক বলে বিশ্বাস করা হত।

সংবাদ আদান-প্রদানে বাগদাদেব কপোত বিশেষ দক্ষ ছিল। বলা হয়, এক জোড়া বাগদাদের কপোত কোনো ওলন্দাজ বণিক সর্বপ্রথম ইউরোপে নিয়ে যায় এবং কালক্রমে সেখানেও এই প্রথা প্রচলিত হয়।

সেইজন্য ইউরোপের মধ্যে হল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম এ কাজে দক্ষতা দেখা যায়। সংবাদ দিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসা, কপোতগণের এই বিশেষ সামর্থ্য, জার্মানীই নাকি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে। কপোত দ্বারা ডাকের প্রথা ইউবোপে রাশিয়াতেই প্রথম প্রবর্তিত হয় বলে অনেকের ধারণা। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পারাবতদের শিক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অনেক সংস্থা গড়ে ওঠে। পরে ইউবোপের বিভিন্ন দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং জার্মানী এ-বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। এইসব সংবাদগুলির পরস্পরের মধ্যে ঠিক সঙ্গতি নেই।

জার্মানীর বড়ো বড়ো দুর্গে কপোত পালন করা হয়। শিক্ষিত পারাবতকে বিক্রয় করলে বা বিদেশে প্রেরণ করলে সেখানে কঠোর সাজা পেতে হয়। ফ্রান্সে কোনো বিদেশীকে পত্র-বাহক শিক্ষিত পারাবত পুষতে দেওয়া হয় না, পাছে তাতে দেশের কোনো গুপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিদেশে চলে যায়।

যুদ্ধকালে কপোত দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদানের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রণ-কপোতেরা সাংকেতিক ভাষায় লেখা সংবাদ বহন করে। ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের সময় (১৮৭০-৭১) পারাবত খুব ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও। জার্মানী ও মিত্রশক্তি, উভয় পক্ষই সংবাদ বহনকারী পায়রাদের গুলি করে নামিয়েছিল। জার্মানী আবার পায়রাদের হত্যা করবার জন্যে বাজ ও শিকরেদের নিযুক্ত করেছিল। অবশ্য এ প্রথা অতি প্রাচীন। মোঙ্গলরা বাগদাদ অবরোধ করলে পারশিকরাও পারাবতের সাহায্য নিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অস্ট্রেলিয়ার সমর বিভাগে পারাবতের পোস্ট-অফিস স্থাপিত হয়েছে। বুয়র যুদ্ধের পর ইংরেজরাও সংবাদ-বাহক কপোতদের শিক্ষিত করবার জন্যে নৌ-বিভাগে কপোত-কুলায় স্থাপিত করে। ভারতের দাক্ষিণাত্যে ও সেকেন্দ্রাবাদে এই ধরনের শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত করে। এক সময়ে ব্যারাকপুরেও কপোত নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল।

এই প্রসঙ্গেই একটি তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে এক ধরনের পাতলা কাগজে সংবাদ লিখে পারাবতের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। কিন্তু এতে অসুবিধেও ছিল। প্যারিস যখন জার্মানী-কর্তৃক আক্রান্ত এ অবরুদ্ধ, তখন পারাবতের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করতে গিয়েই 'মাইক্রো-ফোটোগ্রাফে'র সৃষ্টি হয়। এই ফোটোগ্রাফের অক্ষর এতো ছোটো যে, তা সাধারণ অক্ষরের আকৃতির ১/৮০০ ভাগ মাত্র।

পারাবত ছাড়া আবাবিল পাখিকেও যুদ্ধকালে দূত ও সংবাদবাহক রূপে প্রাচীন কালে নিযুক্ত করা হত॥

নিতান্ত প্রয়োজনের কঠোর ও গদ্যাত্মক দিক ছাড়া, মানুষের শখ-শৌখিনতা বিলাসিতা ও অবসর যাপনের সঙ্গেও পাখি জড়িত। বলা বাহুল্য, পাখির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এটি আধুনিক ও বিবর্তিত দিক, আদি ও মূল সম্পর্কের দিক প্রয়োজনের দিক। প্রয়োজনের দিকগুলোই আজ বিবর্তিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিছক শখ-শৌখিনতার দিক হয়ে গেছে।

যেমন পক্ষি-পালন বা পাখির পালক ধারণ। এককালে যে উদ্দেশে পক্ষিপালন করা হত বা পাখির পালক ধারণ, এখন বহুক্ষেত্রেই সেই প্রয়োজনের দিক অস্পষ্ট হয়ে গেছে। টিয়ে-ময়না-চন্দনা-কাকাতুয়া এখন খাঁচায় পোষা হয় নিতান্ত শখের বশেই। এক সময়ে এই শখ অবশ্য রাজা-মহারাজাদেরই একচেটিয়া ছিল। প্রাচীন ভারতেও রাজাদেরই একচেটিয়া ছিল। প্রাচীন ভারতের রাজাদের রাজোদ্যানে থাকত পক্ষিশালা, যার জের টেনেছিলেন মুঘল সম্রাট আকবর পর্যন্ত। অবশ্য সেসব পক্ষি-শালা হল বড়ো বড়ো খাঁচা, যাকে বলে Aviary, যার ফলে Aviculture-এর বিশেষ culture করা হত। শুক প্রভৃতি পাখিকে প্রাচীন ভারতের রাজারাও সম্মান করতেন,

এবং যথার্থই 'সোনার খাঁচায়' তাদের পালন করতেন। এখন পর্যন্ত পেতল প্রভৃতি ধাতুর 'দাঁড়' দেখে মনে হয়, 'সোনার দাঁড়'ও অসম্ভব কিছু ছিল না। রাজরাজড়ার সঙ্গে পাখির যে একটি আসঙ্গ ছিলই, বিভিন্ন পাখির নামকরণে তা ধরা পড়ে। রাজহাঁসকে প্রাচীনকাল থেকেই Royal bird বলা হয়। প্রাচীন কাল থেকেই নিয়ম আছে যে, যেসব বেওয়ারিশ রাজহাঁস জলাশয়ে থাকে, তারা সবই রাজার। 'বৃহৎ-সংহিতা'য় বরাহমিহির জানিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতীয় রাজবাড়িতে কুক্কুট পোষা হত। অবশ্য তা নানা 'নিমিত্ত-লক্ষণ' অনুধাবনের জন্যে।

পাখি ওড়ানো এবং বিভিন্ন পাখির যুদ্ধ দর্শন ও প্রদর্শনে বিশেষ আমোদ পাওয়া যেত ঊনবিংশ শতকের কলকাতার 'বাবু' সমাজ পায়রা ওড়াতে খুব ভালোবাসতেন। নানা রঙদার ও চটকদার পায়রা এজন্যে তারা পুষতেন, প্রাতঃকালের প্রাত্যহিক একটি কর্মই ছিল নানা সুরে শিস্, 'চুম্‌কুড়ি' ও 'টুস্‌কি' দিয়ে নানা মনোরম ভঙ্গিতে পায়রা ওড়ানো। কোন্ বিশেষ ধরনের শিস্ বা চুম্‌কুড়িতে কিভাবে দলবদ্ধ হয়ে উড়তে হবে, পায়রারাও তা জানত অথবা তা তাদের শেখানো হত। এই শিস্-চুম্‌কুড়ি থেকেই আমার মনে হয়, বাগবাজার-বউবাজারে যে শখের গানের দল, 'পক্ষীরদল' নামে তা খ্যাত বা কুখ্যাত হয়েছিল। এঁরা নাকি নানা দুর্বোধ্য-অব্যক্ত ধ্বনিতে নিজেদের মতো কথা কইতেন এবং এক-এক জনের এক-একটি পক্ষিনাম রাখতেন, রূপচাঁদ পক্ষী যাঁদের মধ্যে অমর হয়ে আছেন। বাবুদের শিস্-চুম্‌কুড়ির সঙ্গে ওই দুর্বোধ্য-অব্যক্ত ধ্বনির একটি অভ্রান্ত যোগ যে কেউ লক্ষ করবেন। এই অনুমানের সমর্থন মেলে তখনকার একটি প্রবাদ থেকে: পাখ-পায়রা-পাঁচালি, তিনে ছেলে মজালি। পাখ-পায়রার সঙ্গে পাঁচালির এই সমীকরণ উপেক্ষার যোগ্য নয়।

কেবল কলকাতাই নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই এই প্রথা ছিল। সাধারণতঃ 'গিরিবাজ' পায়রাই ওড়ানো হত। সাহাবাজপুর, রামপুর, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার গিরিবাজ প্রসিদ্ধ ছিল।

ঊনবিংশ শতকের কলকাতার বাবুদের অপর শখ ছিল, বুলবুলির লড়াই। পূর্ববঙ্গে যেমন ছিল 'কোষষ্টিক' বা 'কোড়া' পাখির লড়াই। বটের পাখির লড়াই কাশ্মীরে খুব চলিত ছিল। কুক্কুটের লড়াই প্রাচীন ভারতে এবং দেশ-বিদেশে চলিত ছিল বা আছে। কুক্কুটের লড়াই সজীব দ্যূতের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতে একে বলা হত 'সমাহ্বয়'। 'কাদম্বরী'র নায়ক চন্দ্রাপীড় বিদ্যালয় থেকে ফেরবার সময় পথে কুক্কুটের লড়াই দেখেছিলেন। 'লাবক' বা 'নাওয়া' পাখির লড়াইয়ের কথাও প্রাচীন ভারতে শোনা গেছে। কুরর্, কপিঞ্জল এবং 'বর্তিকা' পাখির যুদ্ধও চন্দ্রাপীড় দেখেছিলেন তখন।

লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বেনারস, ঢাকা এবং বগুড়ার সেরপুর অঞ্চলে লড়াইয়ের জন্য বুলবুলি পাখি পালন করা হত। পৌষ-সংক্রান্তির দিন ছিল পাখির লড়াইয়ের বিশেষ দিন এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে ওই দিন মুরগীর লড়াই হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়, বছরের সব সময়েই, হাটের দিনে, বাজী ধরে এই লড়াই অনুষ্ঠিত হয়, তবে শীতের সময়েই প্রকোপ বেশি। বুলবুলের লড়াই

সাধারণতঃ কার্তিক থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত হয়। বুলবুল তিন রকমের : 'ছেয়া', 'তায়খো' ও 'সফেদী'। 'তোয়খো বুলবুল বাঙলায় মেলে না, লক্ষ্মৌ থেকে আনিয়ে নিতে হয়। যে নির্দিষ্ট স্থানে বুলবুলকে যুদ্ধ শেখানো হয়, তাকে বলে 'টাঁহি'। এই রীতি, পদ্ধতি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল।

বালী দ্বীপের পুরুষদের প্রধান আমোদের উপকরণই হল মোরগের লড়াই। যেখানে-সেখানে যখন-তখন এই লড়াই হয়ে থাকে। অনেক টাকা এবং 'সাবং' (সেখানকার স্ত্রীলোকদের পরিধেয় বস্ত্র) এ জন্যে বাজী রাখা হয়। লোকেরা বগলে মোরগ নিয়েই ঘোরাঘুরি করে। এ শখও বটে, জীবিকাও বটে।

পাখ-পায়রার সঙ্গে পাঁচালি গানের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। চীনদেশে পায়রা দিয়ে এক ধরনের বাঁশি বাজানো হয়। বাঁশের ছোটো ছোটো বাঁশি বানিয়ে, লাউয়ের খোলে পুরে তা পায়রার সঙ্গে বেঁধে দেয়। ঝাঁক বেঁধে পায়রার দল আকাশে উড়লেই হাওয়া লেগে সেই বাঁশি বেজে ওঠে ॥

পাখিসম্পর্কে এই শৌখিনতার অপরদিক হল, নিছক অলংকরণ রূপে পাখি ও তার পালককে গ্রহণ। একথা সত্য, মূলতঃ নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণেই পাখির পালক ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবু এর নিছক শৌখিন দিকটাও অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। সৌন্দর্যপ্রিয় জাপানীরা বর্ণাঢ্য পালকের জন্যে ল্যাজঅলা 'ইয়োকোহামা' মুরগী উৎপাদন করেছে। ময়ূরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই আলেকজাণ্ডার ভারত থেকে গ্রীসে প্রথম ময়ূর নিয়ে গিয়েছিলেন বলে কথিত হয়; তেমনি, নূরজাহানই নাকি বুলবুল পাখিকে মধ্য-প্রাচ্য থেকে ভারতে প্রথম নিয়ে আসেন। তপোবনে, দেবালয়ে, উদ্যানে, কুঞ্জে, প্রাসাদে যেমন ময়ূর শোভা পেত প্রাচীন ভারতে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের শিরে থাকত শিখি-পাখা; রাজপুত বীরেরা তাদের উষ্ণীষ সজ্জিত করত তা দিয়ে।

আদিম মানুষ নানাকারণে পাখির পালক ধারণ করত বা এখনও করে। অভিজাত রাণীরাও পালক পরতেন। সাইবেরিয়ার ওঝারা বিশেষ প্রয়োজনেই পালক পরে, কিন্তু উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা কেবল প্রথা হিসেবেই তা ধারণ করে। শোষোক্ত উপজাতির লোকেরা ঈগলের পাখা বা পালক শিরোভূষণ রূপে সাধারণ এবং কোন কোন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক পোষাকে কখনো-কখনো ব্যবহার করে থাকে। চীনের সম্রাজ্ঞী 'ফিনিক্স' পাখির পালক পরতেন। চীনের অভিজাত মহিলারা ফিনিক্সের পালকে তৈরি ফিনিক্স-বৎ পাখি শিরে ধারণ করতেন শোভার জন্যে; প্রাচীন ইজিপ্টের মহিলারা শকুন-বৎ পাখিকে তেমনি ধারণ করতেন। আসামের কুকি উপজাতির লোকেরা এক ধরনের লাল পাখির পালক দিয়ে তৈরি উষ্ণীষ পরিধান করে, রাজারা তেমনি পরেন ফিঙের ল্যাজের পালক। নেফা ও নাগাভূমিতে ধনেশ পাখির পালক শিরে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু পাখির প্রতি প্রীতি বশতঃ মানুষ নিছক শৌখিনতা ও শোভার খাতিরে পালক-পরিধান বহুক্ষেত্রেই আজ পরিত্যাগ করেছে। কেবল আনুষ্ঠানিক কারণেই সে জন্যে পালক-পরিধান এখনও চলিত আছে। বিলাসের জন্যে পক্ষি-বিনাশ অনেক দেশেই নিষিদ্ধ হয়েছে। বিলেতের মিঃ জেমস্ বকল্যাণ্ড পক্ষি-সংরক্ষণে ব্রতী হন এবং পার্লামেন্টে 'প্লুমেজ বিল' উত্থাপন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ নিয়ে বিশেষ সচেতনতার ফলে আইন প্রচলিত হয়েছে, বিশেষ্ ঋতুতে যখন সেই-সেই পাখির প্রজনন-কাল, তখন তাদের হত্যা করা চলবে না। মধ্যযুগেও এমন রীতি ছিল। ইউরোপে বকশিকার এক সম্ভ্রান্ত প্রথা ছিল, কিন্তু শিকার কালে বকের ডিম নষ্ট করে ফেললে ডিম-পিছু এক পাউণ্ড অর্থ দণ্ড দিতে হত। ইংলণ্ডের এক রাণী, আলেকজেণ্ড্রা, পাখির প্রতি মমতাবশতঃ তাঁর চুলে পালক পরতেন না। শুধুমাত্র পালকের জন্যেই সিন্ধুপ্রদেশের বেরগ্রামের কাছে বক পালন করা হত, তেমনি আফ্রিকা ও শ্রীলংকায় পালন করা হত অষ্ট্রীচ পাখি।

ভারতেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়েছে। এ-বিষয়ে ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি সংবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘুড়ির সুতোয় মাছ ধরবার বঁড়শি গেঁথে একদল শিকারী চিড়িয়াখানায় আগত পাখিদের ধরবার চেষ্টা করছিল, ওই আইনে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড' অর্থাৎ বাঙলায় যাকে বলে সোহন পাখি, হিন্দীতে তোকদার, তা ভারতীয় আইন অনুযায়ী একটি সংরক্ষণীয় পাখি। সুন্দরবন অঞ্চল Bird-sanctuary হয়েছে 'পাখিরালা' বা 'পাখির আলয়' নামে।

শুধু পালক বা মাংসই নয়, পাখির সুকণ্ঠের জন্যেও অনেক সময় পাখির প্রতি মানুষ নির্দয় হয়ে ওঠে এবং সে জন্যেও আইন প্রণয়ন করা হয়। ভরত (Lark) পাখি সুকণ্ঠ, কিন্তু বিশ্বাস আছে, অন্ধ করে দিলে ভরত পাখি নাকি আরো ভালো গান গায়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অনেকেই ভরত পাখিকে অন্ধ করে দেয়। ইংলণ্ডেই এই বিশ্বাস বেশি। সেখানে আইন করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তেমনি এককালে অনেকের ধারণা ছিল, পাখির জিভ চিরে দিলে সে আরো ভালো গান গাইবে। তাদের ধারণা, পাখি জিভ দিয়ে গান গায়।

এসবই মানুষের পক্ষি-প্রীতির ফল। সেই প্রীতির ফলেই পাখির চিকিৎসাও মানুষ সযত্নে আবিষ্কার করেছে। যেমন, বসন্তকাল এসে গেলেও কোকিল যদি না ডাকে, তবে থানকুনি পাতা ছোটো ছোটো করে কেটে ছাতুর সঙ্গে তাকে খাওয়ালে তার নীরব কণ্ঠ পুনরায় সরব হবে।

পাখির খাদ্যাখাদ্য নিয়েও মানুষ অনেক গবেষণা-পর্যবেক্ষণ করেছে। যেমন, ময়নাকে মাঝে মাঝে বিম্বফল (তেলাকুচো) খেতে দিলে তার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। কান্ ওঠবার সময় ময়নাকে দুধ ও পাকা পেঁপে খেতে দিতে হয়। সোনাকান ময়নাকে আট-দশদিন দুধ-ভাত খেতে দিলে তা রূপোকান হয়ে যায়। তেমনি ছাতুর সঙ্গে ঘি-হলুদ বা তেলাকুচো খাওয়ালে রূপোকান সোনাকান হয়ে যায়।

শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিতে' আছে, রাজা নলের কাছে সুবর্ণপক্ষবিশিষ্ট এক হংস বলেছে, তারা 'স্বর্গ-গঙ্গায় স্বর্ণমৃণালের অগ্রভাগ খেয়েই সুবর্ণময় পক্ষ লাভ করেছে।

এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু সত্য নিষ্কাশন করা যায় যে, খাদ্যের সঙ্গে পাখির বর্ণের যে একটি যোগ আছে, তা মানুষ লক্ষ করেছে ॥

মানুষের এই পক্ষ-সৌহার্দ্য বহু প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। শুধু পাখির পালক বা কণ্ঠ নয়, পাখির ডিম ও মাংসের জন্যেও মানুষ পাখির সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে, এবং অবশেষে মমতায় কাত হয়।

ময়ূর এখন ভারতের জাতীয় পাখি। প্রাচীন ভারতে ময়ূর-মাংস নিশ্চয়ই বেশি করে খাওয়া হত; খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্যসম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক তাঁর প্রথম শিলালিপিতেই উল্লেখ করেছিলেন যে, রাজপুরীর অভ্যন্তরে বেশি প্রাণী হত্যা করা চলবে না, এবং খাবার জন্যে দুটোর বেশি ময়ূর হত্যা করা উচিত নয়। কৌটিল্যের সময়ে শুক, ময়ূর ও ময়না পবিত্র পাখি বলে পরিগণিত হত এবং হংস জাতীয় বিভিন্ন পাখি খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ময়ূর আলেকজাণ্ডার দ্বারাই ইউরোপে নীত হোক, কিংবা পেরিক্লিস অথবা রাজা সলোমনের দ্বারা, প্রাচীন রোমে ময়ূর-মাংস ভোজনের প্রথা ছিল। রাজকীয় ভোজ-সভায় ময়ূরের মাংস না দিলে তা অসম্পূর্ণ থাকত। শুধু খাবার জন্যেই নয়, টেবিলের শোভা বাড়াবার জন্যেও রান্না করা ময়ূর-মাংসের ওপর ময়ূরের চামড়া-পালকের আবরণ চড়িয়ে ঠিক একটি জীবন্ত ময়ূরের আকৃতি দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হত। ফ্রান্সেও অলংকরণ রূপে ময়ূর এমনভাবে ব্যবহৃত হয়।

মনু-র সময়ে পারাবত প্রভৃতি গৃহপালিত পাখির মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। তবে তিনি গৃহপালিত কুক্কুট মাংস একেবারে নিষিদ্ধ করেন নি। কুক্কুটকে অস্পৃশ্য প্রাণী বলে ঘোষণা করবার পেছনে একটি কারণ, এই প্রাণীকে সংরক্ষণ করা। জাতকের কাহিনীগুলো যখন সংকলিত হতে থাকে, তখন কুক্কুট মাংস নিষিদ্ধও হয় নি, অস্পৃশ্য বলেও চিহ্নিত হয় নি। 'শ্রী' জাতক, 'ন্যগ্রোধ' জাতক, প্রভৃতিতে কুক্কুট মাংস খাবার কথা আছে, তেমনি 'রোমক' জাতকে আছে পারাবত মাংস খাবার কথা। তবে সেই পারাবত বন্য কি গৃহপালিত, তা অনিশ্চিত। পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠে জানা যায়, বন্য কুক্কুট আর্যদের ভক্ষ্য ছিল, কিন্তু গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য বলে বিবেচিত হত। 'আপস্তম্বধর্মসূত্রে' আপস্তম্ব কুক্কুট নিষেধ করেছেন (১. ১৭ ৩২)। টীকাকার হরদত্ত মনে করেন, এ হল গ্রাম্যকুক্কুট। যেসব পাখি ঠুকরে খাদ্য খায়, গৌতমের মতে তাদের সবাই ভক্ষ্য (গৌতমধর্ম : ২. ৯. ৩৫)। আপস্তম্ব সকল মাংসাশী পাখিকেই খেতে নিষেধ করেছেন (আপাস্তম্বধর্ম : ১. ১৭. ৩৪)। রক্তপাদ ও রক্ততুণ্ড পাখি ভক্ষণ অনুচিত। তবে 'জালপাদ' অর্থাৎ যাদের পা-জোড়া, তাদের মানস ভক্ষ্য। 'রামায়ণে'র যুগে ময়ূর ও কুক্কুট খাওয়া হত, তবে তা গ্রাম্য কি বন্য, অনির্ণীত। 'মহাভারতে' মাংসাশী পাখি নিষিদ্ধ হয়েছে।

কবিদের মধ্যেও পক্ষি-প্রীতি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ময়ূর-প্রীতির কথা সুবিদিত। শান্তিনিকেতনে ময়ূর পুষতেন। ময়ূরের পুচ্ছ নিয়ে 'ভার' কবিতাটি লেখেন। 'ময়ূরের দৃষ্টি' তাঁর একটি গদ্যকবিতা। তখন ইংরেজ রাজপুরুষেরা নৃশংসভাবে ময়ূরনিধন করতেন। কাশী, গয়া, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানে শিকারি সাহেবদের অত্যাচারে ধর্মপ্রাণ অনেকেই তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ। ইংরেজ সরকারের কাছে এ নিয়ে আবেদন-নিবেদন চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে লেখেন 'চামেলি বিতান' নামে কবিতা। কবিতাটির মুখবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন: "শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো এক নদী-গর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য।"

পাখির শাবকের মাংস খাওয়া হয়। এর চেয়ে নির্মম ব্যাপার খুব কমই আছে। উত্তরবঙ্গে এখন পর্যন্ত পায়রার শাবক এক প্রিয় খাদ্যরূপে পরিচিত। কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলেও এর উল্লেখ মেলে। তেমনি সুন্দরবন অঞ্চলে শামুকখোল পাখির শাবক আহার করা হয়, এ নিয়ে ব্যবসাও চলে। ১৯৭৩ খ্রীষ্টসনের আগষ্ট মাসে গোসাবার বাজারে শামুকখোল পাখির শাবক বিক্রয় হতে দেখা গেছে। এই নিষ্ঠুর খাদ্য-ব্যবসায়ে অনেকেই বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

কোনো কোনো পাখির মাংসের মধ্যে বিশেষত্ব লক্ষ করা হয়। কোথাও মাণিকজোড় পাখির মাংস খাওয়া হয়, কোথাও বা নয়। চীনে হাঁসের মাংস খাওয়া হয়, নুন মাখিয়ে তা শুকিয়ে রাখা হয়। হাঁসের জিহ্বা ও যকৃত সেখানে এক মহার্ঘ পদার্থ। 'পিকিংডাক'-এর মাংসের গন্ধ এতোই স্বাদু যে আমেরিকায় তা খাওয়া শুরু হয়েছে। ফলে, এ পাখির মৃত্যুহারও বেড়েছে।

কলকাতার চৌরঙ্গী রোডে পাখিদের জলতৃষ্ণা নিবারণের জন্যে জলাধার ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের স্থান নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। যথার্থ পক্ষি-প্রেমিকের কাজ হয়েছে এটি।

অনেক পাখি অনেক জাতির কাছে অস্পৃশ্য, ফলে সে পাখির মৃত্যুহারও কম। সাধারণভাবে পূর্বভারতে কাক অস্পৃশ্য,—এতে কাকের জীবন বিপন্ন হয় না। কিন্তু মেদিনীপুরে 'কাক-মারা' নামে এক দক্ষিণভারত থেকে আগত যাযাবর সম্প্রদায়ের খাদ্যই হল কাক। দক্ষিণ ভারতের 'সাগালী' নামে অনার্যরা পাখি ধরে খায়। অস্ট্রেলিয়ায় শুকপাখির কেক ও কাকাতুয়ার ঝোল সাধারণ খাদ্য বলে মনে করা হয়। তেমনি পৃথিবীর বহু উপজাতি আবার পাখিকে নিজ-নিজ গোত্রের প্রতীক বা 'টোটেম' বলে মানে; তাদের কাছে নিজ গোত্রের পক্ষিহত্যা একটি 'টাবু',—অতএব এভাবেও পাখির জীবন বিপদ-মুক্ত হয়। এরই ফলে পক্ষি-পূজারও প্রচলন হয়েছে।

পাখির প্রতি মানুষের এই প্রীতির প্রতিদান মানুষ পাখির কাছেই চেয়েছে। বহু লোককথাতে তাই দেখা যায়, মানুষের দুঃখে ও মৃত্যুতে পাখি আহার-বিহার পরিত্যাগ করেছে; কিংবা পরম বিপদের সময়ে মানুষকে অযাচিত সাহায্য দান করেছে, কখনো-বা দিয়েছে প্রাজ্ঞের মতো উপদেশ।

এতদ্‌সত্ত্বেও পাখির কিছু অপকারও আছে। ফল ও শস্য, ফুলের বীজ ও শাকসব্জী

খেয়ে ফেলে পাখি মানুষের অনেক ক্ষতিসাধন করে, শুক শস্যনাশকরূপে কুখ্যাত। মানুষের উপকারী অনেক কীট-পতঙ্গও পাখি খেয়ে ফেলে, মাছ খেয়ে তার খাদ্যের অনটন ঘটায়, আগাছা-পরগাছার বংশবৃদ্ধি করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগের বীজও ছড়ায়। তবে, পাখির সামগ্রিক উপকারের তুলনায় অপকার উপেক্ষার যোগ্য॥

এই পাখিই মানুষকে নানা বিচিত্রভাবে ছুঁয়ে গেছে সভ্যতার প্রভাতবেলা থেকে। সে স্পর্শ যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। পাখিকে নিয়ে মানুষ রচনা করেছে কতো সংস্কার-বিশ্বাস, কতো কথা-কাহিনী। তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে 'Bird-lore' ও 'Bird-myth'. তাই এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

এইখানে এ গ্রন্থের পরিকল্পনাটি ব্যক্ত করা যাচ্ছে। গ্রন্থটি দ্বিধা-খণ্ডিত। এর প্রথম অংশে 'Bird-lore' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা; দ্বিতীয় অংশে, তারই অন্তর্ভুক্ত একটি দিক,—বঙ্গীয় 'Bird-myth'-এর সংগ্রহ ও সমীক্ষা।

প্রথম খণ্ডটি মোট এগারোটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হয়েছে, বর্তমান অধ্যায়টি বাদে আর দশটি। দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম 'পাখি ও ভাষা'। পাখির কণ্ঠস্বরকে মানুষ কতোখানি মানবিক করেছে; এবং পাখির নামকরণ, তার জীবন ও অন্যান্য বিশেষত্বের মধ্যে মানুষের ভাষাজ্ঞান কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। তৃতীয় অধ্যায়, 'পাখি ও সাহিত্য'—নাম থেকেই এর বিষয় স্পষ্ট। মানুষের সাহিত্যের সঙ্গে পাখির সম্পর্ক এতে ব্যক্ত করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম, 'পাখি : শিল্পশাস্ত্র কলা-বিদ্যা,' অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্প, শাস্ত্রাদির সঙ্গে পাখির যোগ-সম্পর্ক নির্দেশ। পঞ্চম অধ্যায় হল, 'পাখি : রূপক, প্রতীক ও সংমিশ্রণ'—কতো বিচিত্রভাবে পাখি বিশ্বে রূপক ও প্রতীক হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে 'composite symbol' অর্থাৎ 'সংমিশ্রিত প্রতীক' রচনা করেছে, তারই বিবরণ। ষষ্ঠ অধ্যায়—'পাখি : সৃষ্টি-তত্ত্ব ও সৃষ্টিপুরাণ,' cosmology এবং cosmogony-র মধ্যে পাখির প্রভাবকে লক্ষ করা। সপ্তম অধ্যায়ের নাম, 'পাখি ও প্রাকৃতিক জগৎ,' নাম থেকেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। অষ্টম অধ্যায় 'পাখি . দেবতা ও অপদেবতা'। নবম অধ্যায় 'পাখি : যাদু ও ইন্দ্রজাল'। দশম অধ্যায় 'পাখি : শুভাশুভ'। একাদশ বা অন্তিম অধ্যায়টির নাম হল, 'পাখি : পূর্বপুরুষ, উত্তরপুরুষ,'—অর্থাৎ মানুষ পাখিকে কিভাবে নিজের পূর্বপুরুষ এবং অধস্তন পুরুষরূপে দেখে, পাখি ও মানুষকে একাকার করে দিয়েছে, তারই কথা এখানে বলেছি।

দ্বিতীয় খণ্ডটি এরই উল্টো পিঠ! অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে পাখিকে নানাভাবে মানুষ করে নেওয়া হয়েছে; আর দ্বিতীয় খণ্ডে মানুষকে পাখি। কাহিনীর আকারে মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা সেইসব myth সংগ্রহ করে তার সমীক্ষা করা হয়েছে। এইভাবে, দুটি খণ্ড জুড়ে মানুষ ও পাখির পারস্পরিক যোগ-সম্পর্কের বিচিত্র কথা খ্যাপন করেছি।

বাঙলা ভাষায় এমন বই এই প্রথম। অগ্রজ কোনো গ্রন্থ থাকলে তার দৃষ্টান্তে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হবার সুযোগ মিলত। কিন্তু তা আর হলো কোথায় ॥

•••১০•••

পরিশেষে এই বইয়ের নামকরণ এবং আমার আলোচনার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে দু'কথা বলি।

'Bird-lore'-এর বঙ্গীয় প্রতিশব্দ রচনা করেছি—'বিহঙ্গ-চারণা'। যতো গোল ওই 'চারণা' শব্দটি নিয়ে। 'lore'-এর বঙ্গীয় বা সর্বভারতীয় প্রতিশব্দ এখন পর্যন্ত যা মিলেছে, তা সর্বজনবল্লভতা অর্জনে সমর্থ হয় নি। ফল এই হয়েছে, খুশিমতো এক একজন এর প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন, আমিও আমার মতো করে আর একটি প্রতিশব্দ সেই তালিকায় জুড়ে দিলাম। কিন্তু খুশিমতো তা করলেই চলবে না, যুক্তি থাকা চাই। আমার যুক্তি এই : 'lore'-এর প্রতিশব্দ রচনার সময় দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তা যেন এই ধরনের সকল শব্দের সঙ্গেই যুক্ত বা ব্যবহৃত হতে পারে। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় গবেষকরা কেউই সেদিকে নজর দেন নি। তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য কেবল 'Folk-lore' পদটির প্রতিশব্দ প্রদান, 'lore'-কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ শব্দরূপে মর্যাদা দান নয়। ফলে তাঁদের প্রতিশব্দ নিজ-নিজ ক্ষেত্রে আংশিক সফল ঠিকই, কিন্তু ব্যাপকার্থে নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি। 'Folk-lore'-এর প্রতিশব্দরূপে 'লোকযান,' 'লোকবিদ্যা', 'লোকবাঙ্ময়,' 'লোকবৃত্ত',[১] 'লোকসংস্কৃতি', 'লোকশ্রুতি' ইত্যাদি যাই প্রদান করা হোক না কেন, 'lore'-এর অনুবাদে ব্যাপকতা ও পূর্ণতা নেই। 'Bird-lore', 'Serpent-lore', 'Animal-lore', 'Plant-lore' বা 'River-lore'-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ রচনা করবার সময় তবে কি করা হবে? 'পক্ষি-লোকযান'? কিংবা 'সর্প-সংস্কৃতি'? নাকি 'নদী-বৃত্ত'? নাকি 'বৃক্ষ-বাঙ্ময়' কোনটা! এই কারণেই বলছিলাম lore-এর এমন একটি প্রতিশব্দ রচনা করতে হবে, যা কেবল 'Folk' শব্দই নয়, অন্যান্য সমজাতীয় সকল শব্দের সঙ্গেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কেউই করেন নি।

বরঞ্চ, বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ 'সাহিত্য' পত্রিকায় পত্রস্থ 'ধর্মের গোড়ার কথা' (বৈশাখ, ১৩২৮) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধে 'Folk-lore' পদের যে বঙ্গানুবাদ দিয়েছিলেন, —'লোক-বিদ্যা', তার মধ্যে ব্যাপকতা আছে অনেক বেশি। 'পক্ষীবিদ্যা', 'নদী-বিদ্যা', 'সর্প-বিদ্যা' প্রভৃতি প্রয়োগের মধ্যে তার প্রমাণ আছে। 'Lore' প্রাচীন

১ 'লোকবৃত্ত' পদটির বাংলায় প্রথম প্রয়োগ আমি পেয়েছি রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর লেখা এই প্রবন্ধে : 'প্রাচীন ভারতে লোকবৃত্ত ও সমাজস্থিতি' (সাহিত্য সংহিতা পত্রিকা : আষাঢ়, ১৩০৮, পৃ. ১৬৩-১৭০ এবং শ্রাবণ, ১৩০৮, পৃ. ২২৪-২৩২)। এটি 'সাহিত্য-সভা'র (১০৬/১ গ্রে স্ট্রীট) দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে 'প্রাচীন ভারতে দৈনিক ও সামাজিক জীবন' এই নামে পঠিত হয়। কিন্তু ওই নাম সভ্যগণের পছন্দসই না হওয়ায় তার নামান্তর করা হয়। এতে বোঝা যায়, 'লোকবৃত্ত' পদটি তখন এই অর্থে বেশ চালিত ছিল। অবশ্য ভারতের নাট্যশাস্ত্রে 'লোকবৃত্তিক' শব্দটি মেলে। কিছুদিন হল শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত Folk-lore অর্থে পদটি ব্যবহার করছেন।

ইংরেজীতে যাকে বলা হয়েছে lar, তার মধ্যে বিদ্যা, শিক্ষণীয় বিষয়, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কথা আছে, সে হিসেবে lore-এর অনুবাদ 'বিদ্যা' অযৌক্তিক কিছু হয় নি। বছর কয়েক আগে, নিতান্ত সাম্প্রতিককালে, বুদ্ধদেব বসু মশাই তাঁর 'মহাভারতের কথা' বইটিতে এই 'লোক-বিদ্যা' পদটি ব্যবহার করেছেন।

Folk-lore-এর অনুবাদ করতে বসে আর একটি দিকেও দৃষ্টিপাত করা উচিত। কেউ কেউ অবশ্য তা করেছেনও এবং করে ভালো কাজই করেছেন। Folk-lore-এর মধ্যে আছে একাধিক দিক। এর একদিক হলো, যে লোকসমাজ তাদের বিশ্বাস-সংস্কারগুলোকে তাদের জীবনে ও কর্মে রূপ দেয়, অনুসরণ করে ; আর একদিক হলো যে মার্জিত সমাজ সেই সংস্কার-বিশ্বাসগুলোর সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে, সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে চায়। অর্থাৎ একদিক জ্ঞানের, অপরদিক কর্মের বা অনুসরণের। Lore-এর প্রতিশব্দ 'বিদ্যা' করলে, অতএব, কেবল একদিকটাই ধরা পড়ে মাত্র, সব দিকটা নয়,—এবং সে কারণেই এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

Lore-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ সৃষ্টির জন্যে অদ্যাবধি অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মশাই বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলার গ্রাম্যছড়া' (প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) বইয়ের 'পরিচিতি'তে লিখেছেন :

" 'ফোক্‌লোর'—এই ইংরেজী শব্দটির সার্থক নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'লোক-সাহিত্য'। এখন অনেকে এ নামটির সার্থকতায় সন্দিহান হয়ে folk-lore-এর অন্য প্রতিশব্দ খুঁজছেন। কিন্তু তার কোন আবশ্যকতা নেই। 'সাহিত্য' শব্দটির মৌলিক অর্থ যদি ধরি তবে তার মধ্যে ছড়া গান বাজনা নাটক ইত্যাদি চৌষট্টি কলার অনেকগুলি এসে যায়। যে বস্তু বহুব্যক্তির সঙ্গে একত্র আস্বাদন করতে পারা যায় তাই হল 'সাহিত্য' শব্দটির প্রাচীনতম অর্থ। যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে folk-literatuie কী হবে? উত্তরে বলব, লোকনীতি, লোককথা, রূপকথা, ছড়া, নেটো ইত্যাদি বিভিন্ন রচনাবর্গের নাম থাকতে অন্য নামের প্রয়োজন কী? ইংরেজী lore কথাটির বাঙলায় মানে করলে হয় কোন বিশেষ বিষয়ে কালসূত্রে ধারাবাহিত জ্ঞান বা বিদ্যা। এ বস্তু বিশেষভাবে বাণী-বিন্যাসের মধ্যে দিয়েই এসেছে।"

ডাঃ সেনের এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে এই কথাগুলো স্বতঃই পরিস্ফুট হয় : Folk-lore-কে তিনি বাঙলায় 'লোকসাহিত্য' বলতে চান, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে, কেননা 'সাহিত্য' শব্দটির মধ্যে বহু ব্যক্তির একত্র আস্বাদনের ইঙ্গিত আছে। সে তো যে কোনো সাহিত্যেরই আছে, মার্জিত সাহিত্যেরও আছে, তবে 'লোক-সাহিত্যে' মার্জিত সাহিত্যে, তফাত রইল কোথায়। Folk-lore-এর বাঙলা যদি 'লোক-সাহিত্য'ই করা হয়, Bird-lore, Serpent-lore ইত্যাদির বাঙলা কী হবে? তখন 'পক্ষি-লোকসাহিত্য' বা 'সর্প-লোকসাহিত্য' ইত্যাদি করতে হবে। অবশ্য, E. A. Armstrong তাঁর বইয়ের নাম রেখেছেন The Folk-lore of Birds ; কিন্তু বাঙলায় তার আক্ষরিক অনুবাদ চলে না এবং ইংরেজীতে lore স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থে অন্যত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডঃ সেন লোকসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রচনাবর্গের নাম ধরে ডাকতে চেয়েছেন, সামগ্রিকভাবে তাদের একটি নামের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন এবং সেই সূত্রে folk-literature পদের

অনুবাদেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। কিন্তু যদি সামগ্রিক ও অখণ্ডভাবে সব কটি রচনাবর্গকে এক কথায় নির্দেশ করতে চাই এবং সে প্রয়োজন উদ্ভূত হতেই পারে, তখন কী করব? প্রতিটি শাখাকে নাম ধরে পৃথক করে বলতে গেলে তা অনাবশ্যক দীর্ঘ হয়ে পড়বে না কি? ডঃ সেন lore শব্দের অর্থটির মধ্যে নিহিত জ্ঞান ও বিদ্যাকে বাণী-বিন্যাসের মধ্যেই কেবল প্রতিফলিত দেখেছেন। কিন্তু আজকের লোকচারণিকেরা lore-কে প্রথমতঃ, দুভাগে ভাগ করে নিয়েছেন: Material folk-lore এবং Formalized folk-lore; বাণী-বিন্যাসের দিক কেবলমাত্র Formalized folk-lore-এর মধ্যে আছে, প্রথমটিতে তার সুযোগই নেই। এই কারণে শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ সেনের মন্তব্য আংশিকভাবে খাটে মাত্র। আজকের লোকচারণিকেরা lore-কে দুদিক থেকেই দেখেন, —লোকসমাজের অনুসরণ ও বিশ্বাসের দিক এবং শিক্ষিত সমাজের সমীক্ষার দিক। lore-কে কেবল 'বাণী-বিন্যাসে'র বাতায়ন দিয়ে দেখলে কেবল একদিক থেকেই দেখা হবে, যা অসম্পূর্ণ। ডঃ সেনের মত অনুসারে, তা হলে, 'Folk-lorist'-এর বঙ্গানুবাদ হয় হয় 'লোকসাহিত্যিক'।

রবীন্দ্রনাথ 'Folk-lore' পদের অর্থ বোঝাতে আরো দুটি পদ ব্যবহার করেছিলেন, যা অপর কেউ লক্ষ করেছেন কিনা জানি না। একটি 'লোক-বিবরণ', আর একটি 'লোক-যাত্রা'। 'শিক্ষা' গ্রন্থের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন: "বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।" প্রসঙ্গসূত্র ধরে বিচার করলে বোঝা যায়, 'লোকবিবরণ' বলতে তিনি folk-lore-কেই বুঝিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে একটি চিঠিতে (৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪) লিখেছিলেন: "এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত।" রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র যে চিঠি (২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৪) লেখেন, তাতে শরৎচন্দ্রও 'লোকযাত্রা' শব্দটি ব্যবহার করেন। অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এর অনেক আগেই তাঁর 'খৃষ্ট-যজ্ঞ' (সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) প্রবন্ধে 'লোকযাত্রা' পদটির ব্যবহার করেন। বুঝতে পারা যায়, folk-lore-এর অর্থই শব্দটি এঁরা ব্যবহার করেছিলেন।

'লোকবিবরণে'র তুলনায় 'লোকযাত্রা' পদটির ধারণক্ষমতা, প্রসারতা ও ব্যাপকতা অনেক বেশি, এই জাতীয় সকল সমাসবদ্ধ পদেরই পর পদ রূপে তা ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন, 'পক্ষি-যাত্রা', 'সর্প-যাত্রা' বা 'বৃক্ষ-যাত্রা'। 'Folk-lorist', 'লোক-যাত্রিক'। মনে হয়, যে সংস্কার-বিশ্বাস ও বন্ধনের রেখা ধরে লোকসমাজের জীবন যাত্রা নির্বাহ হয়, কবি তাকেই বলেছেন 'লোকযাত্রা'। ১৯৫৫ সালে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন Folk-lore-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ দিয়েছিলেন 'লোকযান' ('যান' বা পথের সঙ্গে 'যাত্রা'র বা গমনের ইঙ্গিতকে স্মরণে রেখে[১]), তখন কি তিনি কবি-প্রদত্ত 'লোকযাত্রা'র

---

১ পূর্ব ও উত্তর বাঙলায় এখন পর্যন্ত 'যান' ('জান') স্থানবাচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, জলপাইগুড়িতে একটি স্থান: 'কুকুর জান'। টাঙ্গাইলের কয়েকটি গ্রাম: দেওজান, বাগজান, লাউজান, কাউলজান, গোমজানী। ঢাকার একটি নদীর নাম: এলামজানী। জলপাইগুড়ির একটি নদীর নাম: 'কালজানা'। আসাম ও তৎসন্নিহিত উত্তরবঙ্গে নদীপথে, নদীর বিশিষ্ট বাঁকে, বাঁশ কেটে জল অবরুদ্ধ

দ্বারা অজ্ঞাতেই প্রভাবিত হয়েছিলেন ? অবশ্য এর মধ্যে দুই বৌদ্ধ মতবাদও লুকিয়ে আছে।

যে অর্থে কবি 'লোকযাত্রা' পদটিকে গ্রহণ করেছিলেন বলে ওপরে অনুমান করেছি, তাতে দেখা যায়, তিনি কেবল লোক-সমাজের অনুসরণের দিক থেকেই তা লক্ষ করেছেন, পণ্ডিতসমাজের সমীক্ষার দিক থেকে নয়। অতএব, সেই একই কারণে, এটিও গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করল। আসলে, কেউই অনুবাদ করবার বা প্রতিশব্দ প্রদানের কালে এইসব দিক ভেবে দেখেন নি, কেবল তাৎক্ষণিক ও বিশেষ প্রয়োজনকেই স্মরণে রেখেছেন, কখনো বা সমকালীন চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন, 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম বৎসরেই (আষাঢ়, ১৩০৮) Folk-lore-এর অনুবাদ করা হয়েছিল 'উপকথাতত্ত্ব' বলে, যেহেতু লোককথাই ভারত ও ইউরোপের যোগসূত্রের কারণ বলে সমকালে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই অনুবাদ করেছিলেন সতীশচন্দ্র বন্দ্যো যতদূর জানি, Folk-lore-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ নির্মাণের এটাই প্রথম প্রয়াস।

এইসব দিক বিবেচনা করেই আমি o.e-এর বাঙলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'চারণা' শব্দটি গ্রহণ করেছি। শব্দটির গ্রহণযোগ্যতার পশ্চাতে আমার যুক্তি এই রকম. ১. এটি লোকসমাজ ও মার্জিত সমাজ, অনুসরণকারী ও সমীক্ষক—উভয়ের দিক থেকেই প্রযোজ্য; ২. এই জাতীয় সকল শব্দের সঙ্গেই এটি ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, 'নদী-চারণা', 'বৃক্ষ-চারণা' বা 'তরুচারণা', 'সর্প-চারণা', 'ইতর প্রাণি-চারণা', 'বিহঙ্গ-চারণা', 'লোক-চারণা'। Folk-lorist, 'লোকচারণিক'। 'Folk lorology' 'লোকচারণতত্ত্ব'।

'চারণ' বা 'চারণা' শব্দটির একাধিক অর্থ অভিধানে দেখা যায়। 'চার' শব্দটির অর্থ 'প্রচার, প্রসার'; 'চারিত' শব্দের অর্থ 'সঞ্চারিত, বিস্তীর্ণ'। যখন আমরা 'গোচারণ' বা 'পদচারণা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি, তখন একটি স্থানব্যাপ্তি ও স্থান-প্রসারতাকেই মূলতঃ বুঝিয়ে থাকি। আমি সেই অর্থেই প্রথমতঃ 'চারণা' শব্দটিকে লোক-সমাজের জীবনযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বা সঞ্চারিত থাকা কিংবা প্রসারিত থাকা সংস্কার বিশ্বাস মূল্যবোধ ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি। 'চারণা' শব্দের অপর অর্থাবলীকে Folk-lore-এর সমীক্ষা-নিরীক্ষার দিকের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এইভাবে; অমরকোষের টীকায় 'চারণা' শব্দের একটি অর্থ 'কথকাদি'; 'চালনা' অপর একটি অর্থ। স্তুতি গায়ক বা কুলকীর্তি প্রচারক নটকে বলা হয় 'চারণ'। লোকজীবন, সংস্কার ও সংস্কৃতি বিষয়ে কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক 'চালনা' করা; সে বিষয়টিকে অপরের কাছে বিশদ করবার জন্যে ব্যাখ্যা করা, যেন, 'কথকতা' করা; অথবা বিষয়টির মাহাত্ম্য ও কীর্তিকথা প্রচার করা,—অর্থাৎ Folk-lore-এর সমীক্ষা-নিরীক্ষার দিকটিকে এই শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণই নির্দেশ করা যায়। এইসব কারণেই গ্রন্থের নাম রেখেছি 'বিহঙ্গ-চারণা'।

Lore-এর মধ্যে একটি বৃহত্তা ও ব্যাপকতা আছে। Myth এই Lore-এরই

করে, মাছ ধরে; এই প্রথাকে বলে 'জান' পাতা। যে করেই দেখা যাক, নদী, জল, পথ ও স্থানের সঙ্গে 'জান' জড়িত। 'যান' ও 'জান' অভিন্ন কিনা সন্দেহ থেকে যায়। 'জান' যদি সংস্কৃত-মূলে না হয় তবে অবশ্য ভিন্ন কথা।

অঙ্গীভূত একটি অংশ। Lore যেন Genus, আর Myth যেন Species,—একটি অঙ্গ, অপরটি সর্বাঙ্গ। Myth-এর বঙ্গীয় প্রতিশব্দ 'পুরাণ', প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছেন। 'বিহঙ্গ-চারণা'র একটি অংশ তাই 'বিহঙ্গ-পুরাণ' (Bird-myth),—যা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে॥

১১·

'চারণা' শব্দটিকে আমি যে অর্থে গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছি, তা লক্ষ করলেই এই গ্রন্থে আমার দৃষ্টিকোণটিকেও বোঝা সহজতর হবে। পাখি সম্পর্কে লোক-মানসে যে ভাব-ভাবনা, সংস্কার-বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মনস্তত্ত্ব ধরা পড়েছে, তার প্রত্যক্ষ দিক ও অনুসরণ রূপায়ণের দিকটি যেমন এতে গ্রহণ করেছি, তেমনি তার নিরীক্ষা-সমীক্ষাও করেছি।

সেই সমীক্ষার একদিক ভাষা ও সাহিত্যের, অপর দিক সহজ, সাধারণ, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের। আমি পক্ষিতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক, কোনোটাই নই,—সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সহজ, সাধারণ ও জনপ্রিয় দিকগুলিকেই কেবল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি; সুতরাং সে দিক থেকে আমার গ্রন্থের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমি সচেতন আছি,—পাঠকের কাছে অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করি সে জন্যে।

কেউ-কেউ Lore-কে 'বিজ্ঞান' রূপে দেখেছেন। Alexander Haggerty Krappe তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন 'The science folk-lore'. নাম থেকেই তাঁর দৃষ্টিকোণটি প্রতিভাত হচ্ছে। Folk lore-এর মূল অন্বিষ্ট বস্তু যদি লোকমানসই হয় তবে তার অন্বেষণের পথটিও সেই লোকমানসেরই অনুরূপ হওয়া উচিত, নইলে বাঞ্ছিত ফল বিড়ম্বিত হবে। তার 'বিজ্ঞান'ও প্রদর্শিত হওয়া উচিত সেই লোকমানসের বিশেষত্বকে ভিত্তি করেই। এখানেই krappe-র সঙ্গে আমার দৃষ্টিকোণের মূল তফাত। কেন পাখিরা শীতে এক অঞ্চল ছেড়ে উষ্ণতর অপর এক অঞ্চলে পরিযায়ী হয়, অবশ্যই সেটি জীব-বিজ্ঞানের একটি সংগত প্রশ্ন; সেটা পুরোই বিজ্ঞান। কিন্তু পাখির সেই চলে যাওয়া ও ফিরে আসা সম্পর্কে যে বিচিত্র, অদ্ভুত, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সংস্কারাদির জন্ম হয়েছে লোকমানসে, সেটাই Lore-এর দিক। লোকমানসে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তার যাদু ও ধর্মবিশ্বাসের এর প্রভাব প্রদর্শন, ভ্রান্তি ও বোধের অভাব বশতঃ এক প্রাণীর সম্পর্কীয় আচার-বিশ্বাসকে অন্য প্রাণীতে (অনুরূপভাবে এক পাখি থেকে অন্য পাখিতে) সঞ্চারিত করে দেওয়া—ইত্যাদির লোকচারণিকের আলোচ্য হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে Lore-এর যোগ এবং তার মধ্যে অ-বিজ্ঞানের পরিমাণটিও নির্দেশ করা প্রয়োজন। দুটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রাচীন ভারতে বিশ্বাস করা হত, দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিলেও হাঁস নীর থেকে ক্ষীরটুকু পৃথক করে তুলে [illegible] আধুনিক [illegible] এটি আলো সত্য [illegible] এর [illegible] আছে

একটি ভ্রান্ত বোধ ও দৃষ্টির বিভ্রমতা। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মশাই এ বিষয়ে আলোচনার (ভারতী কার্তিক, ১৩০৮) সূত্রপাত করেন 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' (প্রবাসী : মাঘ, ১৩০৮। পৃ. ৩৯১-৩৯২) নামে একটি বিভাগীয় রচনায় যোগেশচন্দ্র রায় মশাই এ ব্যাপারে সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। তাঁর যুক্তি এই রকম : হাঁস অণ্ডজপ্রাণী, স্তন্যপান তার স্বভাব নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যে হাঁসের এই ক্ষমতা আছে বলে উল্লিখিত হয়, সে হাঁস গৃহপালিত সাধারণ হাঁস নয়, কৈলাস-মানসসরোবর থেকে ভারতে আগত কঁড়হাঁস বা কলহংস। দুধ বলতেও গোদুগ্ধ নয়, পদ্মের মৃণালের রস। এই রস দুধের মতো সাদা, অতএব তা 'ক্ষীর' বলে কথিত, তা কলহংসের প্রিয় খাদ্য। এই রসের এমনই বিশেষত্ব যে তা জলে পড়লে কঠিন চূর্ণবৎ হয়ে যায়, মিশে যায় না ; তা ধুনো জাতীয় পদার্থ, জলে পড়লেও তা খণ্ড খণ্ড ভাবে পৃথক হয়ে থাকে। অনায়াসেই হাঁসের পক্ষে নীর থেকে এই 'ক্ষীর' তুলে খাওয়া সম্ভব।

বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিচার করলে, হাঁসের নীর-ক্ষীর-বিচক্ষণতাবোধের আর কোনো ভিত্তিই থাকে না। তা নিয়ে কোনো Lore গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ তাই এক Lore-এ পরিণত হয়েছে।

আর একটি উদাহরণ দিই, তা কোকিল সম্পর্কে। ইউরোপের 'কুকু' এবং ভারতের কোকিল সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের বিশ্বাস আছে : ইংলণ্ড ছেড়ে যাবার সময় কোকিল wagtail, Hedge-sparrow প্রভৃতির বাসায় ডিম রেখে যায়, ভারতে যেমন সাধারণতঃ কাকের বাসায় (এই রকম বউ-কথা-কও ফিঙের বাসায়, ছাতারে পাপিয়ার বাসায় ডিম দেয়)। কোনো কোকিলই বাসা করতে জানে না। কোকিলা মাটিতে ডিম পাড়ে, কোকিল কাককে ভুলিয়ে বাসা-ছাড়া করায়, সেই সুযোগে কোকিলা নাকি কাকের বাসায় ডিম রেখে আসে মুখে করে! কাকের নাকি দুটোর বেশি ডিম হয় না, কাজেই কোকিলা নিজের ডিম রেখে কাকের একটি ডিম ফেলে দিয়ে আসে! ডারউইন-এর মধ্যে এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন : সংখ্যায় বেড়ে গেলে নিজের শাবকের খাদ্যাভাব ঘটবে, এই আশংকাতেই কোকিলা একটি ডিম কমিয়ে দিয়ে আসে এবং কখনোই নাকি একটির বেশি ডিম, একই কারণে, একটি বাসায় রাখে না। উড়িষ্যাতে কোকিলকে বলে 'কোইলি' আমের আঁটিকেও বলে 'কোইলি', আমের ভেতর যতদিন না 'কোইলি' হয় ততদিন কোকিলের ডাক শোনা যায় না বা সে অঞ্চলে সে অনুপস্থিত থাকে। কেননা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিশ্বাস আছে, কোকিল পরিযায়ী পাখি, মনোরম বসন্তকালে তার আগমন ঘটে, যার ফলে সুখের দিনের অভ্যাগতকে 'বসন্তের কোকিল' বলে ব্যঙ্গ করা হয়।

এইসব বিশ্বাসের মধ্যে খাঁটি বৈজ্ঞানিক দিক কতখানি? জীব-বিজ্ঞানের মতে কোকিল আদৌ পরিযায়ী পাখি নয়, কাজেই 'বসন্তের কোকিল' এই ইডিয়মের কোনোই ভিত্তি নেই। কোকিলা সংখ্যায় অতি অল্প, প্রতি ছ'টি কোকিলের মধ্যে পাঁচটিই পুংস্কোকিল, কোকিল অত্যন্ত উদরপরায়ণ এবং এক বিশেষ্য ধরনের পোকা খাবার ফলে বদহজমের স্থায়ী রোগী, দেহের তুলনায় জননেন্দ্রিয় অতি ক্ষুদ্র। কোকিলার সঙ্গে কোকিলের আকৃতিগত তফাত, দাম্পত্য প্রেমের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে কোকিল নীড় নির্মাণ করে না। কিন্তু তাই বলে মাটিতে ডিম পেড়ে, চালাকি করে কাককে

বাসা-ছাড়া করিয়ে ডিম রেখে আসে বা কাকের একটা ডিম ফেলে দিয়ে আসে, এ সর্বৈব কল্পনা। যারা কোকিলাকে মুখে ডিম নিয়ে যেতে দেখেছেন, আসলে তা হল, প্রসবকাতরা ক্ষুধার্ত কোকিলার অন্য পাখির ডিম খেয়ে ফেলা। কাকের ডিম সংখ্যাতে বেড়ে গেলেও কাক সমান অপত্যমমতায় তা লালন করে চলে। বসন্তকালেই কোকিলের গলাবাজী বেশি বলে আমের আঁটি হবার বিশ্বাস এসে গেছে।

তা হলে দেখা গেল, বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যা অযথার্থ, তাই বিশ্বাস করা হচ্ছে, এবং তা নিয়েই Lore-এর অনুসরণের দিকটি গড়ে উঠেছে। ক্বচিৎ বৈজ্ঞানিক দিক ও Lore-এর মধ্যে একটি সংযোগ-সূত্রও লক্ষ করা যায়। লোকচারণিকের কর্তব্য হল, সেই বিজ্ঞানের পরিমাণ ও প্রকৃতি নিরূপণ করা নয় মাত্র, লোকমানসের তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা।

কেবলই দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত সাজিয়ে পর্বতাকার করাও সমীক্ষার আদর্শ পথ নয়,—যে পথ ধরেছিলেন স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার 'The Golden Bough' বইয়ের সব ক'টি খণ্ডে। এজন্যে একদা ফ্রেজারকে বিশেষ নিন্দা-সমালোচনায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফ্রেজারের পড়াশোনা ছিল অসাধারণ, বিশ্বের সকল জাতি ও উপজাতির খবরাখবর তিনি তাঁর নখাগ্রে রাখতেন। কিন্তু তথাপি উত্তরকালের লোকচারণিকেরা তাঁর মধ্যে দুটি বড়ো ত্রুটিকে আবিষ্কার করেছিলেন, যাঁরা Functionalist, তাঁরা তাঁর পাঠ-সর্বস্বতাকে ও পাঠাগার বিলাসকে, আনুষ্ঠানিক প্রত্যক্ষতার অভাবের কারণ বলে নিন্দা করেছেন; আবার কেউ বা লক্ষ করেছেন, সাদৃশ্যমূলক ঘটনার ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত সাজিয়ে তার Cumulation বা পুঞ্জীকরণটাই ফ্রেজারের গ্রন্থের লক্ষ্য হয়েছে; বিশ্লেষণের ফলে কোনো সিদ্ধান্তে আসা কিংবা প্রদত্ত বিচিত্র উদাহরণগুলোর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য আনা তাঁর লক্ষ্য হয় নি। এজন্যেই ফ্রেজারের গ্রন্থ উপন্যাস-বৎ মনোরম ও সুখপাঠ্য। এজন্যেই একদা কোনো লোক-চারণিককে তিরস্কার করতে হলে তাঁকে বলা হত 'Frazarite' হতে। এমনি করেই 'Frazarism' শব্দটি এক বিশেষ ধরনের সমীক্ষা-রীতিকে বোঝাতে থাকে। বাঙলা করে একে বলা যায়, 'ফ্রেজারিকতা'।

এ-বিষয়ে 'Man in India' পত্রিকায় একদা কিছু আলোচনা হয়ে গেছে। ভেরিয়র এলউইন লিখিত একটি গ্রন্থের ('Maria Murder and Suicide', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বোম্বে, ১৯৪৩) সমালোচনায় (Man in India: Vol. XXIV, No. 1, March, 1944, PP. 59-61) ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার মশাই লিখেছিলেন যে, ভেরিয়র এলউইন উক্ত গ্রন্থে ফ্রেজারের 'Comparative method' গ্রহণ করেছেন এবং এজন্যে তাঁকে ডঃ মজুমদার 'Frazarite' বলেছিলেন। পরের সংখ্যাতেই এলউইন 'What is Frazarism?' (Man in India: Vol. XXIV, No. 2, June 1944. PP. 132-133) নামে একটি আলোচনাতে দেখাতে চাইলেন যে, ফ্রেজারিকতা বলতে 'the habit of drawing parallels and contrasts' ঠিকই, কিন্তু কোনো কোনো সময় এরও প্রয়োজনীয়তা আছে, যদি যথার্থই তা জীবন থেকে গৃহীত হয়। নির্বিচারে কোনো উদাহরণ নেওয়া উচিত নয়। যে উদাহরণ স্বীকৃত ও মুদ্রিত, তাই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। এলউইনের এই মতবাদ

নিয়ে 'Man in India' (Vol. XXIV, No. 4. December 1944, PP. 269-270) পত্রিকাতেই J. H. Hutton, ডঃ মজুমদার ও স্বয়ং ভেরিয়র এলুউইন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। ডঃ মজুমদার ছিলেন Functionalist,—তিনি ফ্রেজারের মধ্যে স্বভাবতই দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করেছিলেন।

তা সে যাই হোক না কেন, এই আলোচনা ও বিতর্ক দ্বারা আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি ; এলুইনের মতকেই আমি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

এই ধরনের গ্রন্থের বিষয়-পটভূমিকা রূপে একটি বিশেষ ভূখণ্ড বা অঞ্চল নির্দিষ্ট থাকা উচিত। সে হিসেবে অবশ্যই এ-গ্রন্থের পটভূমিকা মূলতঃ পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গকে মিলিয়ে সমগ্র বাঙলাদেশ ; কিন্তু বিষয়ের অনুরোধে এবং বক্তব্যের পূর্ণতার জন্যে ভারত এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের কথাও তুলেছি। দ্বিতীয় অংশটি কেবলই দুই বাঙলাকে ভিত্তি করে গড়া।

'গৌরচন্দ্রিকা' এই পর্যন্ত। এবারে মূল কীর্তন শুরু করি॥

॥ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-পঞ্জী ॥

বাঙলার পাখি (দ্বি. সং ১৯৩২) : জগদানন্দ রায়

পাখির কথা (আষাঢ়, ১৩২৮) : সত্যচরণ লাহা

জলচারী (১৯৩৫) : সত্যচরণ লাহা

পশুপক্ষী (অজয় হোম কর্তৃক পরিশোধিত ও পরিবর্তিত ; ফাল্গুন, ১৩৫৬। পঞ্চম সং) : যোগীন্দ্রনাথ সরকার

বাঙলার পাখি (আশ্বিন, ১৩৮০) : অজয় হোম

চিল-ময়না-দোয়েল-কোয়েল (প্রথম সং বৈশাখ ১৩৭০। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা) : এ. কে. এম. আমীনুল হক

পাখির পৃথিবী (মাঘ, ১৩৭৮) : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পক্ষী জগৎ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। নেহেরু বাল পুস্তকালয়, ৪। ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী) : জামাল আরা লিখিত এবং ইন্দ্রাণী সরকার-কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত

পাখির পরিচয় (নভেম্বর, ১৯৭২) : নারায়ণ চন্দ

কৃষিবিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড। তৃ. সং. ১৯৬১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : রাজেশ্বর দাশগুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন (প্রথম সং. ফাল্গুন, ১৩৮৩) : ডঃ সুরেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব কোষ : নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত

ভারত কোষ : (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

শিশুভারতী : যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সম্পাদিত

বার্তাবহ কপোত (ভারতী : ফাল্গুন, ১২৯৯। পৃ. ৬৪৮-৬৫৬) : শ্রীপতিচরণ রায়

উপকথাতত্ত্ব (প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩০৮। পৃ. ৯৪-১০৩) : সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাখি (প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৮। পৃ. ৩৯৩-৩৯৯) : জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

পক্ষী বৃক্ষরক্ষী (প্রবাসী : পৌষ, ১৩২৩। পৃ. ২৮৪) : (সংবাদ)

পাখির রকমারি (প্রবাসী : কার্তিক, ১৩২৩। পৃ. ৭৯-৯৩) : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[পাখির গায়ের রঙ প্রসঙ্গে : প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩২৫। পৃ. ৪৬৮। পাখির তীক্ষ্নদৃষ্টি প্রসঙ্গে : প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫। পৃ. ১৫৪] : সত্যচরণ লাহা

বকের বদনাম (নব্যভারত : আশ্বিন, ১৩২৮। প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। পৃ. ২২৫) : সত্যচরণ লাহা

পুরুলিয়ার পাখি (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ৩১ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা। ৩২ ভাগ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা) : সত্যচরণ লাহা

রাঁচির পাখি (বিচিত্রা : মাঘ, ১৩৩৪। পৃ. ২৬৬-২৭৮) : সত্যচরণ লাহা

বক (সুবর্ণ বণিক সমাচার ; আশ্বিন, ১৩২৮। প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। পৃ. ২২৪) : সত্যচরণ লাহা

পরভৃত (প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ. ১৭৬-১৮২) : জলন্ধর দেব

পরভৃত (আলোচনা) (প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩১৯। পৃ. ৬৮৭-৬৮৮) : পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

পাখিদের প্রসাধন কার্য (প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩২৯। পৃ. ৬৩৩) : অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কেরানী পাখি (প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩৬৮। পৃ. ৫৮৭) ;

কামানের আওয়াজ ও ইতর জন্তু (প্রবাসী . ভাদ্র, ১৩২৩। পৃ. ৫২) :

ইতর প্রাণীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। পৃ. ২৩০) :

রক পাখি কি সত্যই ছিল ? (প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩২৮। পৃ. ৫৭৩-৫৭৪) :

[ম্যালেরিয়া ও বাদুড় প্রসঙ্গে : প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩২২। পৃ. ৫০৭-৫০৮] :

[যুদ্ধে পায়রার ব্যবহার : প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৩৭। পৃ. ১৫৩-১৫৬] :

[উটপাখি প্রসঙ্গে : প্রবাসী : পৌষ, ১৩৩১। পৃ. ৪০১] :

কীট পতঙ্গ ও পশুপাখির সন্তান বাৎসল্য (প্রবাসী : চৈত্র, ১৩৪৫। পৃ. ৮৭৮ ৮৮২) গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের আত্মগোপন কৌশল (প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬। পৃ. ২৪২-২৪৮) : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কোকিল (নব্যভারত : ভাদ্র, ১৩০৮। পৃ. ২৭৩-২৭৫) : বিজয়চন্দ্র মজুমদার

ময়না (সৌরভ ; অগ্রহায়ণ, ১৩২০। পৃ. ৬৪-৬৭) : শিবকৃষ্ণ সিংহশর্মা

কপোত (সৌরভ : চৈত্র, ১৩২৭। পৃ. ১৩৪-১৩৮) : শিবকৃষ্ণ সিংহ

বিহংগমের প্রণয় (সাহিত্য : আশ্বিন, ১৩০৬) : শশধর রায়

বিহগের দেশভ্রমণ (সাহিত্য : আশ্বিন, ১৩১৪) : শশধর রায়

গায়ক পাখি : ময়না (সাহিত্য : আশ্বিন, ১৩২৫) : পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

গায়ক পাখি : দোয়েল (সাহিত্য : ভাদ্র, ১৩২৭) : পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

চিল (প্রতিভা : মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২০) : পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

ময়ূর (জ্ঞান ও বিজ্ঞান : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭২। পৃ. ৫২৬-৫৩১) : জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

সাপের ইন্দ্রিয়গত বৈশিষ্ট্য (জ্ঞান ও বিজ্ঞান . জানুয়ারী, ১৯৭৩। পৃ. ১৩) : অবনীভূষণ ঘোষ

পরিব্রাজক পাখি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান : জানুয়ারী, ১৯৭৩। পৃ. ৫৫-৫৬) : স্বপনকুমার রায়চৌধুরী

চিনি ও সৌন্দর্য : (দাসী : মে, ১৮৯৪। পৃ. ৩৩৯)

পত্রবাহী কপোত : (ভারতবর্ষ : মাঘ, ১৩২১। পৃ. ৩১৫-৩২১) : অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুনন্দর জার্ণাল (দেশ : ২৭ আগষ্ট, ১৯৬৬। পৃ. ৩২৮) : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাখি, বিবর্তন এবং কয়েকটি সমস্যা (দেশ : ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭। পৃ. ৩০৯-৩১২) : সমরজিৎ কর

ভারতের জাতীয় পক্ষী (দেশ : ২৪ ফাল্গুন, ১৩৬৯। পৃ. ৪৯৭-৪৯৮): শ্রীপক্ষিরাজ পণ্ডিত

ভারতের জাতীয় পক্ষী (দেশ : ১১ মাঘ, ১৩৭০। পৃ. ১১৭১-১১৭৬) : অশোককুমার ভট্টাচার্য

ভারতের জাতীয় পক্ষী (অমৃত : ২ আগষ্ট, ১৯৬৩। পৃ. ৪০-৪১) : অমিয়কুমার মজুমদার

প্রাণিজগতে গতিবেগ (আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮ জানুয়ারী, ১৯৭৩) : সুনীলকুমার নাগ

The Book of Indian Birds (7th Revised edition, 1964) : Salim Ali

Encyclopedia of Chinese Symbolism and Art Motives (The Julian Press, Inc., New York, 1960) : C. A. S. Williams.

Bihar Peasant Life (2nd and Revised edition, 1926): G.A. Grierson.

The folk-lore of Birds (collins) : St. James's place, London, 1958) : E. A. Armstrong.

Food and drink in ancient India (Man in India : Vol. XV. No. I. Jan-March 1934. PP. 15-38) : Jogesh Ch. Roy.

Birds that helped to win Wars (The Modern Review for May, 1936, P. 578).

On the identification of the animals and plants of India which were known to early Greek authors (The Indian Antiquary : Nov. 1885, PP. 303-311) : V. Ball, M. A., F. R. S.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাখি ও ভাষা

পাখির কণ্ঠস্বরে এবং তার দৈহিক বর্ণ-বৈভবে মানুষ চিরকাল মুগ্ধ হয়ে এসেছে। কোনো কোনো ভাষা-বিজ্ঞানী মনে করেন, পশু-পাখির কণ্ঠধ্বনিই মানুষকে ভাষা-সৃষ্টিতে প্রাণিত করেছে। নানা তত্ত্ব ও মতবাদও এ-বিষয়টিকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক গবেষকের কাছে কোনো বিষয়ই স্বাধীন বা নিরপেক্ষ নয়। তাই নৃ-বিজ্ঞানী ভাষা বিজ্ঞানকে এবং ভাষা বিজ্ঞানী নৃ-বিজ্ঞানকে অনেক সময়েই তাঁদের আলোচনার অঙ্গীভূত করে নেন। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকে Folk-lore বা 'লোক-চারণা' নামে যে নতুন বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে, কালক্রমে তা সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি বিষয় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সেই সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের সূত্র ধরেই Folk-lore-এর সংগে ভাষাবিজ্ঞানেরও একটি যোগ স্থাপিত হয়েছে। এ কাজ সম্ভবতঃ প্রথম আরম্ভ করেন জার্মানীর গ্রীম-ভ্রাতৃদ্বয়। 'Bird-lore' এবং 'Bird-mythology' সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানীরা বেশ আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বকে বিহঙ্গচারণার অঙ্গীভূত করে আলোচনা করতে এখনও দেখা যায় নি।

পাখির সুর ও স্বরকে নিসর্গ-জগৎ থেকে সরাসরি এবং অবিকৃতভাবে রেকর্ড করে নিয়ে তার ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে পক্ষি প্রেমিকরা নানা চমকপ্রদ গবেষণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ইউরোপ এবং আমেরিকায়। টার্নবুল্ তাঁর 'Bird music' বইতে পাখির ডাকের সুর নিয়ে মনোরম আলোচনা করেছেন। E. A. Armstrong-এর নামও এ-বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এঁরা পাখির ভাষাকে নিছক 'পাখির ভাষা' রূপেই দেখেছেন, মানবিক ভাব ও ভাষার আলোকে তার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেন নি। পাখির কণ্ঠস্বর, দৈহিক রূপ ও রঙ, তার অভ্যাস-সংস্কারকে নিয়ে মানুষ কিভাবে পাখির নামকরণ করেছে, অথবা, তা অবলম্বন করে আপন ভাষা-সম্পদ বাড়িয়ে নিয়েছে, তা নিয়ে আজও কেউ আলোচনা করেছেন কি না, জানি না।

এই অধ্যায়ে আমার আলোচ্য বিষয় তাই এই তিনটি :

১. পাখির কণ্ঠরবের প্রকৃত ও বাস্তবদিকের ধ্বনি-অনুযায়ী রূপটি নির্দেশ করা। এর মধ্যে পাখির নিজস্ব মনোভাব; স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও যৌগিক স্বরের অস্তিত্ব ও

উপস্থিতিকে লক্ষ করা ; পাখির রবের মধ্যে মানুষের 'অর্থপূর্ণ' ভাষা আরোপের চেষ্টা ও তার ফল নির্দেশ ; এবং তার মধ্যে লোকমানস ও মনস্তত্ত্বকে লক্ষ করা ।

২. পাখির কণ্ঠস্বর, তার দৈহিক বিশেষত্ব, খাদ্যাভ্যাস, নীড়নির্মাণ ও অন্যান্য শীল-সংস্কারকে অবলম্বন করে লোকমানস কি ভাবে পাখির নামকরণ ও নামচয়ন করেছে, তার সুদৃষ্টান্ত বিবৃতি প্রদান ; একই নাম দিয়ে একাধিক পাখিকে নির্দেশ করবার প্রবণতা ও প্রথাটি লক্ষ করা ; বিদেশী নামের পাখির নামানুবাদ ; বিশিষ্ট পক্ষি-প্রেমিক এবং সাহিত্যিকদের দ্বারা পাখির নামকরণ করবার প্রয়াস, ইত্যাদি ।

৩. পাখির অনুষঙ্গে মানুষের ভাষা : পাখির আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে অথবা, তার অনুষঙ্গে বিভিন্ন বস্তু, প্রাণী, ফুল, ফল, তরুলতা, স্থান ও নদীর নামকরণ ; রূপক-উপমা-সৃষ্টিতে, ইডিয়ম ও অন্যান্য ভাষাগত দিকে পাখির প্রভাবকে নির্দেশ করা ।

যথাক্রমে বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা করছি ॥

··২

কিন্তু সে আলোচনায় রত হবার পূর্বে, ভূমিকা হিসেবে, 'পাখি' এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বাচক শব্দগুলি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন ।

সংস্কৃত 'পক্ষী' থেকে কাব্যে 'পংখ' এবং 'পাংখ' মেলে । স্ত্রীলিঙ্গে তেমনি 'পংখনী' । 'পক্ষী' শব্দ থেকেই আসাম ও তৎসান্নিহিত উত্তরবঙ্গে 'পাখি', 'পোখি' ; পূর্ববঙ্গে এর অপিনিহিতি-জাত রূপ হল, 'পইখ' । অতঃপর, 'পাইক', 'পৈক', 'পেইক' (কুমিল্লা), 'হৈক' (নোয়াখালি) । পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ডেও 'পাইখ' মেলে । 'পাখি' থেকে পূর্ববঙ্গেই অপিনিহিতিতে, 'পাইক' এবং তদ্ধিতান্ত 'পাইকা' । পশ্চিমবঙ্গে পক্ষ > 'পাখ', পূর্ববঙ্গে 'পাগ' ।

সহচর শব্দরূপে, পশ্চিমবঙ্গে, 'পাখ্-পাখালি' মেলে । এটির প্রাচীন রূপ, 'পক্ষ পাখাড়ি' । কবি গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' আছে : 'পাখ কান্দে পাখুড়ী কান্দে, কান্দে রাজ-তোতা ।' পূর্ববঙ্গে এর বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায় : 'পাইখ-পাখালী', 'পাউখ-পাখালী,' 'পাইক-পহল,' 'পোক-পাকালী' । এ ছাড়া রাজশাহীতে 'পাখালি' < পক্ষ + আলি । একই অর্থে পশ্চিমবঙ্গে 'পাখী জুখী' বা 'পাখি-টাখি', পূর্ববঙ্গে 'পাখি-পুখি' ।

'পাখি' শব্দের প্রতিশব্দরূপে যেসব শব্দ মেলে তার মধ্যে পাখির জন্ম, বৃদ্ধি ও দৈহিক বিশেষত্ব ধরা পড়ে । ডিমরূপে ও শাবকরূপে পাখির দুবার জন্ম বলে তাকে বলা হয় 'দ্বিজ' । নীড়ে তার বৃদ্ধি, তাই 'নীড়জ', 'নীড়োদ্ভব' । উড়তে পারে, তাই 'খগ', 'খেচর' । 'গৃধ্র', 'শকুনী,' 'শকুন্ত,' 'সুপর্ণ' প্রভৃতি প্রতিশব্দ পাখির এক-একটি বিশেষত্ব-বোধক ।

পাখির 'পাখনা', কুমিল্লায় 'পায়না' ; রঙপুর, জলপাইগুড়িতে, 'পাখেনা' । পাখনার সমার্থক অপর শব্দ ডানা, ডেনা < ডয়ন < ডয়না ; হিন্দী 'ডৈনা' ; মৈথিলী 'ডেন' ।

প্রান্ত উত্তরবঙ্গে সহচর শব্দ : 'ডেনা-পাখেনা'। আর একটি শব্দ ডাফনা (সিলেট), ডাবনা, (খুলনা)<দাবনা, অর্থপ্রসারে। ময়ূরের 'পেখম' বোঝাতে 'প্যাখক', ফেকম্,' 'ফ্যাকম্' (উত্তরবঙ্গে), ফেক্‌না <পাখ্‌না। ফেঁকা<পেখক। পাখির দেহের ছোটো ও কোমল পালককে বলে 'পর' ; শব্দটি ফারসী। 'পর' আছে যার, সেই 'পরী'। এর থেকে অপিনিহিতিতে, পূর্ববঙ্গে, 'ফইর' ; সহচর-শব্দে, 'পাখ্‌-ফইর'। পক্ষ-বোধক তৎসম শব্দ 'দেহকোষ'। পাখির ডানা ও পুচ্ছের বড়ো পালককে ইংরেজিতে বলে quil, বাঙলায় 'কইল' : যেমন, 'কুইলের কলম'। কইল-কে বাঙলায় 'বীরের পালক'ও বলে। পাখির বার্ষিক পালক-মোচনকে বলে 'কুরিচ' খাওয়া<'কুর্চ'।

পাখির ডানার ঝাপটাকে বলে 'পাখসাট' বা 'পাকসাট'। এই অর্থে 'ডানামারা' পদটি পেয়েছি। উড়তে সক্ষম পাখি, 'উড়ানকর' (রঙপুর)। পূর্ববঙ্গে 'ওড়া'র প্রতিশব্দ 'উড়াল দেওয়া', 'উড়ান দেওয়া', 'উড়া দেওয়া', 'উড়কা দেওয়া', 'উড়ামারা'। শিকারি পাখির 'ছোঁ' মারাকে সিলেটে বলে চংগল <ফারসী 'চংগল'। রঙপুরে মেলে 'ছোঁই'। রঙপুর থেকেই সংগৃহীত 'গোপীচন্দের গানে' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সং. ১৯৬৫) পাওয়া যায় : 'চিলার নাকান ভোঁরি ছান্দে।' কিংবা, 'চিলার নাকান ভুমক ছাড়ে।' পাখির নিম্নাভিমুখী গতিকে বলে 'নিডীন'। 'সণ্ডীন' হল পাখির গতিক্রিয়া-বিশেষ।

পাখির ওড়বার বিশিষ্ট ভঙ্গিকে যথাযথরূপে ব্যক্ত করবার জন্যে মানুষ ধ্বন্যাত্মক শব্দের আশ্রয় নিয়েছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লোক-ভাষাতেই বেশি, সুতরাং এর মধ্যে লোকমানসের প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন, ছোটো পাখির উড়ে যাওয়া 'ফুড়ুক', 'ফুড়ুন্' বা 'ফুড়ুৎ' করে উড়ে যাওয়া। কিন্তু বড়ো পাখির উড়ে যাওয়া : 'হুশ' বা 'হুস্-উশ' করে উড়ে যাওয়া। দ্রুত ও শীঘ্র উড়ে যাওয়া, 'ফুক্' করে উড়ে যাওয়া। জলপাইগুড়ির একটি লোকসঙ্গীতে : 'ফুৎ করি উড়াইল তিতিলি পাখি।' আমেজন বোঝাতে, চট্টগ্রামে : 'টোনা পৈকে খালি ফুরুত্-ফুরুত্ করে।' আকস্মিকতা বোঝাতে, সিলেটে : 'চটৈ (চড়ুই) পট করি উড়ি যায়।' অন্যত্র পাই : 'ভুটুৎ' বা 'ভুড়ুক' করে উড়ে যাওয়া। পাখির পক্ষ-বিধূনন : ডানা 'ফড়্-ফড়্' করা। পাখির উড়ে যাওয়াকে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষায়, সামান্য অতীতকাল বোঝাতে বলা হয়, 'উড়াইল্'।

হাঁস-মুরগীর চামড়াকে বলে 'চাম্‌ড়ি' (রাজশাহী), রঙপুরে 'চামুড়ি'।

কোনো কোনো পাখির মাথায় crest বা ঝুঁটি থাকে। নানা অঞ্চলে তার নানা নাম ও উচ্চারণ : চাঁডি (কুমিল্লা), চুটে (কুমিল্লা, সিলেট),<চুটি<হিন্দী চোটী<সং চূড়া। কুমিল্লাতে 'চুড়ি'ও মেলে। টয়া (পাবনা)<সং তুঙ্গ। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে একে স্ত্রীলোকের খোঁপার সঙ্গে উপমিত করা হয়। যে পাখির ঝুঁটি আছে, তাকে বলে খঁপাতি খোঁপাতি<খোঁপা+তি। একই অর্থে 'খোঁপানাশী' ও 'খোঁপাচুলী' চলিত আছে। মোরগের ঠোঁটের নীচের অংশ, যা নোলকবৎ ঝুলে থাকে, নোয়াখালিতে তাকে বলে লোলক<নোলক। চন্দনা পাখির গলবেষ্টনী বা পক্ষময় কৃষ্ণবর্ণ রেখাকে বলে কাঁটি, কাঁটী, কাঁঠি<সং. কণ্ঠিকা, সাদৃশ্যে।

পাখির (এবং পশুর) সঙ্গমেচ্ছা : চ'মুদি (মৈমনসিংহ)। হাঁস-মুরগীর রতিকর্ম :

ঘাগ্ (বাকেরগঞ্জ)<যোগ। পাখির খাদ্য : আদর<আধার<আহার। মুরগীর বিষ্ঠা : চাউদি (রঙপুর)। মোরগের লাল বিষ্টা : চি'রকা (সিলেট)।

যে হাঁস-মুরগী ডিম দেয় : আণ্ডালু (পূর্ববঙ্গ) প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে, ডিমা<ডিম্ম<ডিম্ব। মৈমনসিংহে মেলে 'গশি'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ডিমে তা' দিতে বসা : ওসম (<উষ্ম) বসানো। ডিম তা' দেবার সময় মুরগী যে শব্দ করে, পূর্ববঙ্গে তাকে বলে 'কড়কড়ানি'। সেখানকার একটি প্রবাদ : আণ্ডা পাড়ে না, মুরগীর কড়কড়ানি সার। পাখির শাবক বোঝাতে, ছ্যাওনা (রাজশাহী)<শাবক+না। মুরগীর বাচ্চা বোঝাতে, টিলুলি (রাজশাহী)। দ্বিতীয়বার প্রসূতা কুক্কুটীর প্রথমবারের শাবক বোঝাতে নিম্নবঙ্গে পাই : 'দোপিলে'। সন্তান অর্থে 'পোলা' শব্দের প্রভাব এখানে স্পষ্ট।

কচি হাঁস-মুরগী-পায়রা বোঝাতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম-সন্নিহিত উত্তরবঙ্গে 'ডেকি' শব্দ পাই। যেমন, ডেকি পাঢ়ো, ডেকি হাঁস। কিশোর ও নবযুবক অর্থে আসামে ডেকা<সং. ডিক্কর শব্দটি চলিত আছে।

শিক্ষিত ও গৃহপালিত পাখিকে পূর্ববঙ্গে বলে 'পুষনিয়া', 'পোষনিয়া', 'পোষণ্যা' পাখি। পায়রা বসবার উঁচু মাচাকে পশ্চিমবঙ্গে বলে 'ব্যোম'। প্রাচীনভারতে একে বলা হত 'বিটঙ্কবেদিকা'; পায়রার বাসস্থানকে বলা হত, 'কপোত পালিকা'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে বলে 'খমা'<খাম, স্তম্ভ অর্থে। টীয়ে-ময়নার দাঁড়কে সেখানে বলা হয় আয়রা<আড়া। পাখির পিঞ্জরকে বলে, পিঞ্জিরা।।

৩...

পাখির কণ্ঠরবকে যথাযথ ভাষা-ভঙ্গিতে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ মোট তিনটি উপায় অবলম্বন করেছে : ১. ধ্বন্যাত্মক (onometopoetics) এবং অনুকার শব্দের প্রয়োগ; এগুলোর মধ্যে পাখির ডাকের প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত দিক নেই; অনেক সময় নামধাতুরূপে এগুলোর ব্যবহার; ২. পাখির কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির প্রতিধ্বনিরূপে অর্থহীন শব্দসমষ্টি দিয়ে তাকে প্রকাশ করা; এটেই পাখির কণ্ঠরবের প্রকৃত ও বাস্তব দিক; ৩. পাখির কণ্ঠরব অনুযায়ী মানবিক ভাষা আরোপ; এর পুরোটাই কাল্পনিক দিক। ক্রমান্বয়ে এই তিনটি দিকের আলোচনা করছি।

নির্বিশেষভাবে পাখির ডাক বোঝাতে বাঙলায় কিছু শব্দ মেলে। গাইয়ে-ডাকিয়ে পাখিরা শাবক অবস্থায় বোল ফোটবার আগে যে অব্যক্ত আওয়াজ করে, তাকে বলে 'রেচ'। একই অর্থে ধ্বন্যাত্মক 'কপ্‌চা' বা 'কপ চান' (to chatter) শব্দ চলিত আছে। ইংরিজি chirp, twitter প্রভৃতি শব্দও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 'কপ্‌চান' শব্দের অর্থগত পরিবর্তন হয়েছে, এখন মানুষের 'বাগ বিস্তারকে' এই শব্দ দিয়ে নির্দেশ করা হয়।

পূর্ণবয়স্ক পাখির ডাককে নির্দেশ করতে পাওয়া যায় : 'কিচ্-কিচ্', 'কিচ্-মিচ্', 'কিচি-মিচি', 'কিচির-মিচির'। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে (তৃ-সং, ১৩১৮) আছে, 'পক্ষীর কিলকিলি'। অন্যত্র 'কিলকিলা' মেলে। মৈমনসিংহের কথ্য ভাষায় পাখির ডাক বা রব বোঝাতে 'চির্‌চিরানি' চলিত আছে,—একই অর্থে চট্টগ্রামে মেলে ডোররন

<ভুকরন, ভুকরানো। প্যারিচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' লিখেছেন: 'পক্ষীসকল চুকুবুহু চুকুবুহু করিতেছে।'

পাখির ডাক বোঝাতে 'কাকলী' ও 'কূজন' শব্দ দুটি খুবই পরিচিত। কয়েকটি শব্দ অবশ্য এক একটি বিশেষ পাখির ডাককেই নির্দেশ করে। যেমন: 'কেকা', ময়ূরের ডাক। 'কুহু', কোকিলের ডাক। 'ঘুৎকার', পেচকের ডাক। 'কেংকার' বা 'ক্রেংকার', হাঁস ইত্যাদির ডাক। কোকিলের 'কুহু' থেকে 'কুহুরণ' পাই। মধ্য-যুগীয় বাঙলা সাহিত্যে কোকিলের 'হুংকার' খুব ব্যবহৃত হয়েছে। 'ডানা' বইতে বনফুল ফিঙের 'ঝনৎকারের' কথা বলেছেন একাধিকবার। তিনি কাঠঠোকরার 'ক্রেংকারধ্বনি'র কথাও বলেছেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন, ডাহুকের 'মকমকি'।

পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ডের উপভাষায় কোকিলের ডাককে বলে 'কুহকা', কাক-মুরগীর ডাককে বলে 'গগা'। লোকসাহিত্যে পাখির ডাকের ধ্বন্যাত্মক রূপ খুব পাওয়া যায়। কয়েকটি এই:

পশ্চিমবঙ্গ: কুক্‌ড়োটা কট্‌কটাইল্য। ঘুগু চু, পাঁড়ু চু, পাইখ ডাকে। আয় রে পাখি ল্যাজ্‌ঝোলা, খাবিদাবি কল্‌কলাবি। 'কুল্‌কুলাবি'ও মেলে, মেদিনীপুরে। ছাতারে কচ্‌বচ্‌ কচ্‌বচ্‌ করে। প্যাঁচা হুম্‌-হুম্‌ করছে। কোঁকড়-কোঁকড় কুঁক্‌ড়ো ডাকে।

পূর্ববঙ্গ: কাহা কাহা কাক ডাকিল। কাউয়ায় করে কলমল্‌ কল্‌মল্‌, কোকিলায় কাড়ে রা। গাছের আগায় মোরগ ডাকে কুক্‌-কুরো-কুক্‌। আড়াই কুড়ি ডিম লইয়া কোড়াল কথা বলে—টাব্‌-টাব্‌-টাব্‌। কুক্কু-রুক্‌-কুক্‌ মোরগ ডাকে। কুক্‌কুরুত্‌থু (সিলেটে)। কুরুক্‌-কুক্‌। ধেছুয়া ধেছুরুত্‌ লাতুরির বিয়া। জালালী কৈতর-পাক্রুম্‌-পাক্রুম্‌ করে। ফেচ্‌কুনারা ফেচুত্‌-ফেচুত্‌ ডাকের (সিলেটে)। কুতুরু-কুতুরু ময়না। টেঁও টেঁও করে টিয়া ডাকে। কুড়াপক্ষী লেখ্‌খ্যা থুইছে টুল্লুব্‌-টুল্লুব্‌ করে (নেত্রকোণা)। ধেছুয়া বলে তুরুৎ-তারাৎ। পায়রার 'কুম্‌কুম্‌' (মৈমনসিংহ), 'কুম্‌কুমি' (সিলেট)। চেউ, চেউ-চেউ (সিলেট), মুরগীর বাচ্চার ডাক।

উত্তরবঙ্গ: ভারেয়া রে ভুরুৎ। কুকুয়া রে কুক্‌, রে মোর কুকুয়া রে কুক্‌। ঝেঁচু করে ঝাঁটাউ-ঝাঁটাওঁ। ঝাটাওঁ-ঝাটাওঁ-ও মেলে। বাঙার গাছের টুনিকোনা টিউ-টিউ করে। ঢাল্‌কাউয়া -'কাক্‌খান্‌-কাক্‌খান্‌' করে। ঘুগুয়ে করে ঘুক্‌। কবুতরটা জুগ্‌-জুগ্‌ করছে (রাজশাহী)।

এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বাঙলা সাধু ভাষায়, উপভাষায় এবং কবিতার ভাষায় নাম-ধাতুরূপে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওপরে দেওয়া দৃষ্টান্তের মধ্যে তার পরিচয় আছে। আরো কয়েকটি এই:

পূর্ববঙ্গের একটি ব্যালাডে পাই: কাউয়া করে কলরব, কোকিলা কুসরে। 'কুসরে' অর্থাৎ কুহু+স্বর করে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পাই: 'কুয়িলী কুহরে'। ঝাড়খণ্ডে, কোকিল কুহকে। মাইকেল লিখেছেন, 'কুহরে কপোত'। উপভাষায় 'কুহরে' থেকে 'কুহলে' পাই। কুমিল্লার হাঁস-মুরগীর ডাক বোঝাতে পাওয়া যায়, খোরাইরা<কুহর+ইয়া। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে মাইকেল লিখেছেন, 'কূজনিল পাখি'।

নামধাতুর অন্যান্য দৃষ্টান্ত: পাখিটা 'ধড়্‌ফড়াচ্ছে' বা 'ফড়্‌ফড়াচ্ছে'। কাকটা

কাগাচ্ছে। চিলটা চিল্লাচ্ছে। 'এক টুনিতে টুনটুনাস'। মুরগীটা কোঁকড়াচ্ছে। মুরগিগড়া গগায় (ঢাকা)। জলপাইগুড়ির লোকসঙ্গীতে : তুই রে কাগা কুলকুলাছিত…। পারোর মতন হোকর মনটা সোদায় বাঁকুরে (বকম্‌-বকম্‌ করে)। দিনাজপুর ও রঙপুরে : আড়া ট্যাট্রেরাইল্‌ (ট্যার-ট্যার করে ডাকল)। রঙপুরে : চারি খোপে বাকে (বক্‌-বকম্‌ করে) মা মোর চারি খোপের বইতর। রাজশাহীতে : ম্যাটা ঘুঘু ডিমা পাড়ে, ডাউক কর্‌কর্যায়।

পাখির ডাকের ধ্বন্যাত্মক রূপ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই মেলে। মধ্য ভারতের দুটি দৃষ্টান্ত : 'গুগুজু-গুগুজু' (পঁ্যাচা)। 'কুরুল-কুরুল' (ময়না)। আসামের লোহতা নাগাদের ভাষায় শালিকের ডাকের ধ্বন্যাত্মক রূপ 'কিওন-কিওন' (Kyon, Kyon). আসামের তিরাপ ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের অধিবাসীদের ভাষায় : মুরগীর সকালের ডাক 'বু-বু' সন্ধ্যার ডাক 'নোক্‌-নোক' ।

ইংরেজিতে এই ধরনের ধ্বন্যাত্মক শব্দ : cluck-cluck (মুরগী)। 'Cock-a-doodle-doo' (মুরগী)। Tu-whit, Tu-whoo (পঁ্যাচা)॥

পাখির কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির প্রতিধ্বনিরূপে, অর্থহীন শব্দ ও শব্দ-গুচ্ছ দিয়ে তা প্রকাশ করবার প্রয়াস ও প্রবণতা প্রধানতঃ পক্ষি-প্রেমিক ও পক্ষিতাত্ত্বিকদের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁরা বিজ্ঞান ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে পাখির ডাকটিকে নিখুঁত, প্রকৃত ও স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত করে থাকেন। এজন্য এই ধ্বনি-গুচ্ছের মধ্যেই পাখির কণ্ঠস্বরকে অবিকৃত ও যথার্থরূপে মেলে।

এক-একটি বিশেষ পাখির এক-একটি বিশেষ 'বুলি' আছে। কিন্তু যাথাযথরূপে তা নির্দেশ করা সহজ নয়। একই পাখির বুলি বিভিন্ন জনের কানে বিভিন্ন রকম শোনায়। ব্যক্তিগত ভাব তাতে প্রকট হয়ে ওঠে। তবে এটি অপ্রধান ও অপরিচিত পাখি সম্পর্কে যতখানি সত্যি, অতিপরিচিত পাখি সম্পর্কে ততখানি নয়। যেমন, কাকের 'কা-কা' রব সকলের কানে একই রকমের ধ্বনির সৃষ্টি করবে। তবে মজা এই, কোকিল যদিও পরিচিত ও প্রধান পাখি, তবুও এর ডাক বোঝাতে কোথাও 'কু' আবার কোথাও 'টু' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। তথাপি এক-একটি পাখির বুলির ধ্বনিরূপ এক-একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকেই। পক্ষিতাত্ত্বিকেরা একদিকে নিজের কানে শোনা ধ্বনিরূপকে, অপরদিকে অঞ্চল বিশেষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথাগত ধ্বনিরূপকে—দুটোকেই গ্রহণ করে থাকেন। 'The Book of Indian Birds' বইতে প্রখ্যাত পক্ষিতাত্ত্বিক সালিম আলি ভারতের প্রায় সব প্রধান পাখির বুলির ধ্বনিগত রূপটি নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যেও দেখা যায়, মোটামুটিভাবে উত্তর ভারতের ভাষা-উপভাষা ক্রিয়াশীল হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে ভিত্তি করে বিভিন্ন পাখির অর্থহীন 'বুলি'গুলি নির্দেশ করা যাচ্ছে। তুলনার জন্যে কয়েকটি বিদেশি 'বুলি'ও দেওয়া গেল।

অক্-অক্ (Auk Auk) : সিন্ধু-চিল, চর নিকোবর।

আংগাক্-আংগাক্-আংগাক্ : হাঁস। ডানা : বনফুল।

আঃ, হাঁ-আঃ ও হো-হো, হোহো : উৎক্রোশ, পাবনা।

উকু কুক্ উকু কুক্-উকু কুক্ : হুপো। 'ক'য়ের স্থানে 'প'ও পাওয়া যায়। ডানা : বনফুল।

up up up : হুপো, জার্মানীতে।

Ewe-Ewe : কারবানক (curlew), গ্রেট ব্রিটেনে।

ও সি হোয়াইটি—ও হোয়াইট : কস্তুরা (Thrush).

ক্-ক্-র্-ক্কর্ : গাই-বগ্লা।

কক্, কক্, কক্ : মুরগী।

কক্‌রিং-কক্‌রি-কক্‌রিং : হাঁড়ীচাঁচা। পুনশ্চ : কুঅক্‌রিং, কুঅক্‌রিং, কুঅক্‌রিং। ডানা : বনফুল।

কট্ কট্-কট্-কট্-কট্-কট্। কর্-র্-র্-র্-র্-র্ : কাঠঠোকরা।

কা কা : কাক।

কাচ্-কুচ্ : নীলকণ্ঠ, মধ্যভারত।

কির্‌রিক্-ক্রেক-রেক্-রেক্ : কোড়া<কোর্যাণ্টক। ডানা : বনফুল।

কু-ইল। কু-উ। কুহু : কোকিল। ডাঃ ব্লানফোর্ড লিখেছেন : "It has another call like ho-yo uttered by the male alone."

কু-উ উর্, কু-উ-উর্ : পাতকুয়া, পাতকো, হাওড়া।

কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কক্-কক্-কক্ : ডাহুক। পুনশ্চ : কো-কোয়াক্, কোয়াক্-কোয়াক্।

কু-কুক্-কুক্-কুক্। কুক্-কুক্-কুক্-কু : কোকিল।

কুক্-কুক্-কুক্। কোঁক্-কোঁক-কোঁক্ : উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, 'কোঁক্' বা 'কুক্' পাখি।

কুক্-কুরু-কুক্ : মুরগী, পূর্ববঙ্গ।

কুঁঘু : প্যাঁচা (বাদুড়ও), খুলনা-যশোহর।

কুট্-কুট্ : কুক্কুভ, 'যমকুলি' পাখি, কুমিল্লা।

কুটা-রো, কুটা-রো : বসন্তবৌরি, পূর্ববঙ্গ।

কুটুর্-কুটুর্ : বুলবুলি।

কুটুলুত্-কুটুলুত্-কুটুলুত্। পুনশ্চ : টোকোলোত্-টোকোলোত্-টোকোলোত্ : বসন্তবৌরি, 'চূড়াকুটী' পাখি, জলপাইগুড়ি।

কুড়ুরুক্-কুড়ুরুক্-কুড়ুরুক্ : ছোটো বসন্তবউরি। ডানা : বনফুল।]

কুলু-কুলু-কুলু-কুলু : কোকিল, ফরিদপুর।

কেঁক্-কেঁক্ : হাঁস। তুলনীয়, ইংরিজি cackling.

কোক্-লি, কোক্-লি : হাঁড়ীচাঁচা।

কোয়াক্-কোয়াক্ : ডাহুক।

কোয়ারকো-কোয়ারকো। কোয়াঙ্কো-কোয়াঙ্কো : চখাচখী।

ক‍্যা-ক্যা। চ্যা-চ্যা : শালিকের কাতর শব্দ।

ক্যাক্-ক্যাক্, ক্যাক্-ক্যাক্, ক্যা : হাঁড়িচাঁচা।

ক্যাচ্ ক্যাচ্-ক্যাচ্-ক্যাচ্ : হাঁড়ীচাঁচা।

ক্লীল্-লো, ক্লীল্-লো। পুনশ্চ : চিল্-লো, চিল্-লো : চিল।

গগল্‌ডিং। ঘকল্‌ডিং। ঘোকল্‌ডিং : 'চোখ গেল' পাখি, রঙপুর-কোচবিহার-দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি।

gaa-gaa-gaa : কালো-গলা ডাইভার পাখির ডাক, উজ্জ্বল আবহাওয়া দেখলে ডাকে, নরওয়েতে।

গাত্-গাত্ : হাঁস, সিলেট।

gah-rah-gah : সারস, নিউ সাউথ ওয়েলস্।

গ্না-গ্না-গায়া-গায়া : দাঁড়কাক, কখনো-কখনো।

গুপ্-গুপ্-গুপ্-গুপ্ : কানাকুকো (crow-pheasant)। গুর্-র্-র্-র্-র্-টুব্-টুব্-টুব্-টুব্-টুব্ : কোড়া, পাবনা-যশোহর।

গুহুম্ : প্যাচা, রঙপুর।

gour gour gah gah বা Ku Ku burra : 'কুকুবুরা'র ডাক, অস্ট্রেলিয়া।

ঘু-ঘু। ঘুঘুঘু-ঘু। ঘুঘুর-ঘু। ঘুঘুর-ঘুক্ : ঘুঘু।

ঘ্যাচা-ঘ্যাচা-ঘ্যাচা-ঘ্যাচা : হাঁড়ীচাঁচা।

চিকিচিকি-চিকিচিকি : প্যাচা।

চিঁ চিঁ। চিঁউ চিঁউ : পাখির শাবকের ডাক।

চিচিৎ : শ্যামা পাখির ডাক। পুনশ্চ : 'চচ্চ'। 'চিক্-চিক্'।

চিত্ ফ্যাদেরেত্-চিত্ ফ্যাদেরেত্ : 'শ্বেতফরিত' পাখি, জলপাইগুড়ি-দিনাজপুর।

চিড়িং চিড়িং : ছোটো বাজের ডাক, পূর্ববঙ্গে যাকে বলে 'টুকীবাজ' বা 'কৈতরীবাজ'।

চিন্ চিন্। চিপ্-চিপ্ : টুনটুনি।

চিরিপ্ চিরিপ : চড়ুই।

চিহিঁ চিহিঁ : বড়োবাজের ডাক, পূর্ববঙ্গে যাকে বলে 'হাঁড়ীভাঙা' বা চিরুয়ালী।

চি-হুইট্, চি-হুইট্, চি-হুইট্। চু-কির্, চু-কির্, চু-কির্, চু-কির্। টু-হুইট্, টু-হুইট্, টু-হুইট্ : টুনটুনি। ডানা : বনফুল। তুলনীয়, ইংরিজি twittering.

চ্যা, চ্যা : ঝুস্ শালিক বা ভশ্ শালিকের ডাক।

ঝেঁ-চু-চু-চু : ফিঙে, জলপাইগুড়ি।

টাংক্-টাংক্-টাংক্-টুক্-টুক্-টুক্-টুক্ : ছোটো বসন্তবউরি।

টাস্-টাস্ : হাঁস, পূর্ববঙ্গ।

টি-টি : চাতক।

টিউ-টিউ : 'বোটোই' বা বর্তক, জলপাইগুড়ি।

টি-টিহি, টি-টিহি (জলপাইগুড়ি)। টি-টি-ট্টি-হু (সুন্দরবন, আবাদ অঞ্চল)। টিটি, টিট্টি-ই-টি, টিট্টি-ইটি : টিট্টিভ, টিটি, তিতি। সংস্কৃতে টিট্টিভের ডাককে দুন্দুভির ধ্বনির সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে।

টিট্‌টির-টিট্‌টির-টিট্‌টির : বুলবুলি।
টিঁয়া-টিঁয়া-টিঁয়া। টেঁইয়া (চট্টগ্রাম)। ট্যা-ট্যা, ট্যাক্‌-ট্যাক্‌ : টিয়ে।
টি-শ্‌ টি-শ্‌, টি-শ্‌ : 'মহাবারিক', জলপাইগুড়ি।
টিউ : বেনেবউ।
টু (পাবনা-ফরিদপুর)। টু-উ, টু-উ (জলপাইগুড়ি) : কোকিল।
টুইজ্‌-টুইজ্‌ : টুনটুনি।
টুক্‌-লি, টুক্‌-লি : হাঁড়ীচাঁচা।
Turkatrae-turkatrae : সুন্দর আবহাওয়ায় কালো-গলা ডাইভারের ডাক, নরওয়েতে।
টুরু-টুরু। ট্রু-টুরু-টুরু : বুলবুলি।
টুল-টুল্‌ : 'টুলটুলী' পাখি, জলপাইগুড়ি-নদীয়া।
Tengo-Tengo : ময়ূরের ডাক, মধ্যভারতের বৈগাদের ভাষায়।
টোউইট্‌-টোউইট্‌ : টুনটুনি।
ট্যাক্‌-ট্যাক্‌ : নীলকণ্ঠ।
ঠঙ্‌-ঠঙ্‌-ঠঙ্‌-ঠঙ্‌-ঠঙ্‌ : বসন্তগুড়গুড়ি।
ঠ-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌ : কাঠঠোকরা। তুলনীয়, ইংরিজি, Tap-tap-tap.
ঠাক্‌-ঠাক্‌-ঠাকলাস্‌ : 'যমকুলি', পূর্ববঙ্গ।
দুতুম্‌। দুত্তুম্‌। ধুত্তুম্‌ : হুতোমপ্যাঁচা, পূর্ববঙ্গ।
ধু-ধু : প্যাঁচা, বগুড়া।
নীম্‌-নীম্‌, নীম্‌-নীম্‌ : 'নীমপ্যাঁচা', পূর্ববঙ্গ।
পাগাউ-পাগাউ-পাগাউ-পাগাউ : বউ কথা কও।
পি-পেহা, পি-পেহা : পাপিয়া।
পুঁট্‌-লি, পুঁট্‌-লি : এই নামীয় পাখির ডাক, নদীয়া।
Plui-Plui : কাঠঠোকরা, মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে।
পোকর-পোকর-পোকর-পোকর : বউ কথা কও, জলপাইগুড়ি।
পে-পে-পে : 'সাতভাই' পাখির ডাক, কোলদের মধ্যে প্রচলিত।
প্যাঁক-প্যাঁক : হাঁস।
ফক্‌-ফকার : মুরগী, রাজসাহী।
ফ্যাচ্‌-কুচ্‌। ফেচুত্‌-ফেচুত্‌ : ফিঙে, পূর্ববঙ্গ।
বক্‌-বকম্‌-বক্‌। বক্‌-বকম্‌-বকম্‌। বক্‌-বক্‌-বক্‌-বকম্‌-কম্‌ : পায়রা। রংপুর থেকে সংগৃহীত 'গোপীচন্দ্রের গানে', বাকম্‌।
Bad-bad-bad-bad : ময়ূরের পাখার আওয়াজ, মধ্য ভারতের ভাষায়।
বুদ্‌-বুদ্‌-ভু-তুম্‌-বুদ্‌ : ভূত্‌-ভূতুম। (ফরিদপুর)। ভূতুম্‌-নিতুম্‌-ভূতুম্‌ নিতুম্‌ (চট্টগ্রাম)। হুত-হুতুম্‌-হুত, হুম্‌-হুম্‌ : ভুতুম্‌ বা হুতোম প্যাঁচা।
Varra-vi-varra-vi : আবহাওয়া খারাপ দেখলে কালো-গলা ডাইভার পাখির ডাক, নরওয়েতে।
ভুড়ুৎ-ভুড়ুৎ : 'ভারেরা' অর্থাৎ ভরত, জলপাইগুড়ি।

রাডিয়ো-রাডিয়ো : শালিক।

হা-টি-টি-টি। (খুলনা-যশোহর)। হো-টি-টি (মুর্শিদাবাদ)। হো-টি-টি (রাজশাহী) : হটিটি।

হাঁশাক্-শাঁক, হাঁশাক-শাঁক, পাঁক-পাঁক : হাঁসের সঙ্গমকালীন ডাক, জলপাইগুড়ি।

হোকল্-কল্কলি . 'বাঙকুয়া পাখি'র ডাক, জলপাইগুড়ি।

হোম্-হোম্ : হাঁস, খুলনা।

হোশ্-হোশ্ : হাঁস, খুলনা-বরিশাল।

পাখির ডাকের নির্বাচিত কিছু নিদর্শন এখানে উপস্থিত করা হল, অবশ্যই এ তালিকা নিঃশেষ নয়। তথাপি, এটি লক্ষ করলে কয়েকটি কথা মনে হয়। যেমন,

১ একই পাখির অঞ্চল ভেদে ডাকের বিভিন্নতা ;

২. একই পাখির মানসিক অবস্থার ভেদে ডাকের বিভিন্নতা ;

৩. স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির প্রায় সব ক'টিই পাখির ডাকে প্রতিফলিত হয়েছে। অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু এবং নাসিক্য বর্ণ পর্যন্ত এতে পাওয়া যায় ;

৪ এই তালিকাতে পাখির ডাকের প্রারম্ভিক বর্ণরূপে প্রাধান্য পেয়েছে কণ্ঠ্য বর্ণগুলি। তারপরই উল্লেখযোগ্য হল মূর্ধন্যবর্ণগুলি ; ওষ্ঠ্যধ্বনির ব্যবহার বেশ কম ;

৫. দ্বিস্বর (Dipthongs) লক্ষ করা যায়। এবং যৌগিক স্বররূপে তিন স্বরধ্বনির মিশ্রণ (Tripthongs)ও দুর্লভ নয় ;

৬. অন্তে স্বরান্ত অক্ষর (Syllable)-এর চেয়ে হলন্ত অক্ষরের প্রাধান্য অনুভূত হয় ;

৭ যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিমাণ কম নয় ;

৮. একই ধ্বনির আম্রেড়ন এক বিশেষ ব্যাপার ;

৯ দু মাত্রা থেকে দশ মাত্রা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ডাক পাওয়া যায়। মাত্রা ভাগ করবার মধ্যে তাল ও ছন্দ-জ্ঞান পরিস্ফুট হয়েছে। সবচেয়ে দীর্ঘ ডাকটির ছন্দোলিপি করলে, এই দাঁড়ায় :

৩ ২ | ৩ ২ | ২ ২
হাঁশাক-শাঁক | হাঁশাক-শাঁক | পাঁক-পাঁক ।

এ ডাকের ছেদ ও যতি-বিভাগ বিশেষভাবে শ্রবণ আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত-ভাবে আমার মতে 'বউ কথা কও' পাখির ছন্দ-বোধ সবচেয়ে বেশি, ডাকের ছন্দটিও কঠিন। প্রথমে একমাত্রা, তারপর দুমাত্রা, শেষে আবার একমাত্রা। মোট চার মাত্রায় ডাকটি সচরাচর শেষ হয়। যখন এ পাখি ডাকে, তখন সাধারণতঃ চারবার এক সঙ্গে ডাকে। চারমাত্রা করে চারবার ডাকলে ষোলো মাত্রার 'ত্রিতাল'-এর আভাস মেলে। তেমনি বসন্তবউরির ডাকের মধ্যে পাই দ্রুত দাদ্রা-র আভাস। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর একটি গানে 'বউ কথা কও' পাখির ডাককে কাহারবা তালে এবং অপর একটি গানে 'চোখ গেল' পাখির ডাককে একতালে আবদ্ধ করেছেন। নজরুলের কৃতিত্ব এই, নৈসর্গিক জগতে 'চোখ গেল' পাখি ঠিক যে সুরে ও ছন্দে ডেকে থাকে, তিনি তাকে অবিকৃত রেখেই গানের তালের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন :

গা -া ধা ⁝ র্সা পা -া ⁝ গা -া ধা ⁝ র্সা পা -া
চো ০ খ্ গে ল ০ চো ০ খ্ গে ল ০

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' গানটিতে রবীন্দ্রনাথও কোকিলের কুহুরবকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুরে সমর্পিত হবার পর তা কোকিলের না হয়ে রবীন্দ্রনাথেরই হয়ে গেছে॥

পাখির অর্থহীন কণ্ঠধ্বনির অনুযায়ী মানুষ তাতে মানবিক ভাষা আরোপ করেছে নানা কারণে। তবে, মূল কারণ হল, পাখির বাক্-ক্ষমতা দর্শনে তাকে মানবিক করে নেবার প্রবণতা।

আরো এক কারণ এর পেছনে আছে। পক্ষিতাত্ত্বিকেরা পাখির বিভিন্ন মানসিকতা অনুসারে পাখির ভাষারও বিভিন্নতা লক্ষ করেছেন, যেমন হয় মানুষের। সালিম আলি তাঁর পূর্বোক্ত বইতে, কোনো কোনো পাখির বুলিতে মানবিক ভাব আবিষ্কার করেছেন। কস্তুরা বা Malabar whistling Thrush-এর ডাক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : "In breeding season male has a rich and remarkably human whistling song, rambling aimlessly up and down the scale,…", (P. 16). কখনো বা তিনি পাখির ডাকের মধ্যে পেয়েছেন মানুষের প্রশ্ন-প্রবণতাকে। যেমন, তুরুতি-তুইয়া বা common wood shrike-এর ডাকে : "*weet-weet* followed by a quick interrogative whi-whi-whi-whi ?" (P. 20.)

পাখির ডাকের মধ্যে মানবিক ভাষা আরোপের চেষ্টা বিশ্বের সকল দেশেই দেখা যায়। সব দেশই নিজের দেশের ভাষা, সংস্কার, বিশ্বাস অনুয়ায়ী তা আরোপ করে। সেইজন্যে একই পাখির বুলি অনুযায়ী দেশ ও ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা দেখা যায়। এই ভাষা আরোপকে মোট চারটি দিক থেকে লক্ষ করা যায় : ১. পাখির ভাষাকে অর্ধেক অবিকৃত রেখে, বাকি অংশে মানবিক ভাষা আরোপ ; ২. মানুষের কৌতুক-প্রবণতা ; ৩. এক-একটি দেশের নৈসর্গিক জগৎ, সেখানকার লোকমানসের নানা বিশ্বাস-সংস্কার, এবং 'মিথ্'-এর প্রভাবে ভাষা আরোপ ; পরিমাণে এটিই সর্বাধিক ; ৪. লোকমানস ও লোকঐতিহ্যকে স্বীকার করে অথবা নিজস্ব কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করা ভাষা, বিভিন্ন লিখিত সাহিত্যে যা মেলে।

পাখির কণ্ঠে আরোপিত এই মানবিক ভাষাকে লৌকিক ও সাহিত্যিক—দু'দিক থেকে দেখা যেতে পারে। সাহিত্যিক ভাষা, বলা বাহুল্য, মার্জিত ও বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। মানবিক জগতের প্রায় সকল প্রকার মনোভাবই এই ভাষাতে প্রতিফলিত হয়।

পাখির কণ্ঠস্বরের অর্ধাংশ অবিকৃত রেখে বাকি অংশে অর্থময় শব্দ গুচ্ছ জুড়ে দেবার একটি নিদর্শন মেলে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'তে, শালিকের ডাকে : ফড়িং সঙ্গে সঙ্গে চারিজনং / চকিৎ কাট্ কাট্ কাট্ গুরুচরণ।

মৌখিক ভাষাতেও এই ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, 'ঘোকলডিং' ('চোখগেল') পাখির ডাক অবলম্বনে জলপাইগুড়িতে : ঘোকলডিং/বিচা চুল্‌কা, চাউল দিম্‌। চিলের ডাক অবলম্বনে, জলপাইগুড়ি-দিনাজপুরে : 'মুই টিং-শিলিলিত্‌'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গেই মেলে মুরগীর ডাককে ভিত্তি করে : কুরুরুক্‌ কুরুক্‌ !/আতি পহাইল্‌ রে তুরুক !/চ্যাট খা রে তুরুক। ফিঙের ডাক অবলম্বনে, মৈমনসিংহে : ফেচ্‌চুয়া রাজা ফেচ্‌কুচ্‌। ফিঙে : বা 'ঝেঁচু'র ডাক অবলম্বনে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে : ঝেঁ-চু-চু চু !/বাঁশের গোড়ত্‌ হাগি থুইছে/কাঁয় ফেলাবে গু !/বান্দী-চেউড়ী বাড়ীত্‌ আছে/তাঁয় ফেলাবে গু। কখনো মেলে : ঝেঁ-চু-চু-চ্যাট্‌ ! ছড়াটির কথান্তর রাজশাহীতে পাওয়া যায় (দ্রঃ রাজশাহীর ছড়া [বাঙলা একাডেমী, চৈত্র ১৩৭০] : আলমগীর জলিল। পৃ. ৭১)। মেদিনীপুরে ফিঙেকে বলে 'ঢেঁচু'। ঝাড়গ্রাম মহকুমার অঞ্চল-বিশেষে বালক-বালিকারা ফিঙের ডাকের তালে-তালে ছড়া কাটে : ঢেবচু-চু-চু/এ্যাত রাইতে আলি বহনাই (ভগ্নীপতি)/ঢ্যাঁকশালতায় শু' (শুয়ে থাক)/ঢেঁকিভাতে-লড়া-পড়া কদাল চড়চাড়ি/ভাত খায়েঁ) লও ভাত খাঁয়ো লও কুটুম/ নতুন তরকারী। এইসব দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়, আগে পরে কিছু অংশে পাখির ডাকটিকে অবিকৃত রেখে অবশিষ্টাংশে মানুষের ভাষা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মানবিক ভাষা জুড়ে দেওয়া হয়েছে পাখির ডাকের তাল-সুর-ছন্দকে অনুসরণ করেই। ধ্বনিই এখানে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করেছে। ছড়াগুলো ঠিক ওই সুর ও ছন্দ রক্ষা করেই বলা হয়, শুনলে মনে হয়, যেন ঠিক পাখিটাই ডাকছে। পাখির ডাকের মধ্যে, বিশেষ করে প্রারম্ভিক অংশে, একটি ঝোঁক বা শ্বাসাঘাতের আয়োজন থাকে,—এইজন্যে স্বভাবতঃই ছড়ার ছন্দের সঙ্গে এর একটি যোগ দেখা যায়। পাখির ডাক অবলম্বন করেই ইতর প্রাণীকে নিয়ে ছড়া সংখ্যায় বেশি। কৌতুক-প্রবণতা ও অনুকরণের প্রয়াসও অবশ্য এখানে স্পষ্ট।

বিদেশেও এই ধরনের ছড়া মেলে। The oxford dictionary of Nursery Rhymes (Reprinted, 1952) গ্রন্থে এই ধরনের দু-একটি ছড়া দেখা যায়। যেমন, একটি মোরগ-মুরগীর ডাক অনুযায়ী ছড়া (PP. 125 126) :

Cock : Lock the dairy door,
Lock the dairy door !
Hen : Chickle, chackle, chee,
I haven't got the key !

এই গ্রন্থেরই আর একটি ছড়াতে (P. 154) ঘুঘুর ডাক অবলম্বনে মেলে : The dove says, coo, coo, what shall I do ?

নৈসর্গিক জগৎ এবং লৌকিক জগতের সংস্কার-বিশ্বাস ও জনশ্রুতিমূলক কাহিনী-ঘটিত ভাষাই পরিমাণে বেশি। বাঙলাদেশে 'চোখ গেল' এই উক্তিতে কোনো নৈসর্গিক সত্যের প্রতিফলন নেই ; কিন্তু মহারাষ্ট্রে যখন সেই একই পাখির ডাক 'পাওষ আলো' (বর্ষাকাল এলো) শোনা যায় তখন তা বর্ষাকালের সূচক। এই ধরনের এবং সংস্কার ও কাহিনীমূলক উক্তিগুলোর বিশেষত্ব এই :

অনেক সময়েই দেখা যায়, দুটি পাখিতে জোড়া বেঁধে ডাকছে। বেশির ভাগ

ক্ষেত্রেই এই জোড় নারী-পুরুষের। কিন্তু মানুষের কল্পনায় এই জোট স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও ভাই-ভাই, ভাই-বোন এবং বোন-বোন, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, বউ-শাশুড়ী, দুই বন্ধু অর্থাৎ যে কোনো সম্পর্কেরই হতে পারে। এদের একটি ডাককে প্রশ্ন, অপরটির ডাককে তার উত্তর বলে কল্পনা করা হয়। ফলে এই ধরনের সংলাপ আরোপের মধ্যে একটি প্রশ্নোত্তর প্রবণতা দেখা যায়, যা মানবিকতারও সূচক।

যেমন, হুতোমপ্যাঁচা ও স্ত্রী-হুতোমপ্যাঁচার ডাক নিয়ে সংলাপ। ২৪ পরগণার সংস্কার অনুযায়ী পুরুষ হুতোম বলে: 'হুঁ হুঁ, আমারও হবে; হুঁহুঁ, আমারও হচ্ছে।' আর স্ত্রী হুতোম বলে: 'হুঁ হুঁ, আমি ছিলুম, তাই হচ্ছে।' অন্যত্র পুরুষ হুতোম বলে: 'বুঝলি, বুঝলি'। স্ত্রী হুতোম জবাব দেয়, 'বুঝলাম, বুঝলাম'। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পুরুষ হুতোম বলে: 'তুই থুলি না মুই থুলি।' স্ত্রী পাখিটি বলে, 'তুই থুলি'।

এই রকম প্রশ্নোত্তর-প্রবণতা চখা-চখীর নৈশ কণ্ঠরবের ওপরে আরোপ করা হয়েছে, গোটা ভারতবর্ষেই। সেই সংলাপের উত্তরভারতীয় রূপটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এইভাবে নির্দেশ করেছেন: সূর্যাস্তের পর চখা বলে: 'চক্বী, মই আঁউ?' পরপার থেকে চখী উত্তর দেয়: 'নাঁহি নাঁহি চকা'। তারপর নিজেই বলে: 'চকা, মই আঁউ?' চখা তখন বলে: 'নাঁহি নাঁহি চকী।'

এক জোড়া হলদে পাখির মধ্যে জলপাইগুড়িতে স্ত্রী পাখিটি বলে: 'নহ, নহ, আজিকার দিনটা নহ'। পুরুষ পাখিটির উত্তর: 'না নহঁ, না নহঁ'। মধ্য বাঙলায় পুরুষ হলদে পাখি বলে: 'এ বাড়িতে একটা হোক।' স্ত্রী পাখিটি তখন বলে ওঠে: 'এ বাড়িতে একটা খুকু হোক।' চব্বিশ পরগণায় পুরুষ গুয়ে-ন্যাকড়া পাখি বলে: 'আমার সুতো কে নিলে?' 'গুয়ে-নেকড়ী' তার উত্তর দেয়: 'আমি, আমি'।

ঢাকা জেলায় 'প্যাঁকো' নামে এক ধরনের পাখি ভাই সেজে দিদিকে বলে: 'ছোড়্‌দিদি রে ভাত দে'। দিদি-পাখি তখন বলে: 'তিনি কোথায়?' ভাই পাখি তখন বলে: "'তিনি প্যাঁকো'। পূর্ববঙ্গেই অপর এক পাখিকে দুই ভাই সাজতে দেখা যায়। একটির উক্তি: 'ভাই সহদেব।' অপরটির উত্তর: 'আমারে এট্‌টা বউ দেও!' ইউরোপের আলবানিয়াতে একজোড়া কোকিলের মধ্যে ভাই-কোকিলের ডাক: 'Gjaw, Gjaw,' অর্থাৎ 'কোথায়, কোথায়'। বোন্‌-কোকিলের ডাক: 'কুক্‌-কুক্‌', অর্থাৎ 'এই যে, এই যে'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে কোকিলের টু-ডাককে এখনও ভাই-বোনের লুকোচুরি খেলা বলে মনে করা হয়।

পাখির সংলাপের মধ্যে মানুষ এখানে মানবিক প্রশ্নোত্তর-প্রবণতাকে লক্ষ করেছে। এই কথোপকথনে দেখা যায়, কখনো একটি অপরটির বিরোধিতা করছে, কখনো বা করছে সমর্থন, কখনো দিচ্ছে জিজ্ঞাসার উত্তর। এই প্রশ্নোত্তর কেবলমাত্র প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকে অনেক সময়, উত্তর দেবার প্রতিপক্ষ সেসব ক্ষেত্রে নেপথ্যলোকে উপস্থিত। তখন দুই পাখি নয়, কেবল একটি পাখিরই উক্তি। যেমন:

'কি ফল পাকলো?' 'হজ কতোদূর, হজ কতোদূর?' (পূর্ববঙ্গে 'চোখ গেল'র ডাক')। *'পিউ কাঁহা?' 'পীর কি হইল্‌?'* (উত্তরবঙ্গে 'চোখ গেল'র ডাক। *'কা করেয়ো কুমার?'* (পশ্চিমভারতে কুকোর ডাক)। *'দেশের কি হবে?'* ('অন্নদামঙ্গলে'

ভারতচন্দ্র)। 'ঝি দিবি, না বউ দিবি?' (চব্বিশ পরগণায় হুতোম প্যাঁচার ডাক)। "কী উত, কী উত?' (নোয়াখালিতে হাঁড়ীচাঁচার ডাক)।

জলপাইগুড়ি থেকে পাওয়া ঘুঘুর ডাকানুযায়ী একটি ছড়াতে দেখা যায়, প্রথমে প্রশ্ন, তারপর বিস্ময়বোধ : ঘুঘু ঘুকু, কিসের দুখ?/চৈন্দ পুত, তাঁহো দুখ!

একটি পাখির একা-একাই প্রশ্ন করা এবং তার বিস্ময়, কখনো বা স্বগতোক্তি বা আত্মোক্তিতে রূপ নেয়। এর মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ, বেদনা, বিস্ময়ের স্মৃতি কাজ করে। যেমন: পূর্ববঙ্গে কুকোর ডাক : 'পুৎ-পুৎ-পুৎ-পুৎ-পুৎ'। হাওড়া জেলায় ডাহুকের ডাকে : কোয়াক-কোয়াক, কুড়িক-কুড়িক। কিংবা উত্তরবঙ্গে 'হাঁড়িয়া-কুকুয়া' অর্থাৎ হাঁড়ি-চাঁচার ডাক : 'পোঁৎ-পোঁৎ-পোঁৎ'। আসামের লোহতো নাগাদের ভাষায় হরিয়াল পাখি তার সন্তান-শোকে এই বলে বিলাপ করে 'O, o, a Kaw, a Kaw, ow'. সিংহলেও পাখি-বিশেষ তার পুত্র-শোক প্রকাশ করে এইভাবে : Mimal latin daru no Pabaru Pu-Pu-Pu. কিংবা, আর একটি পাখির বিলাপ : Hut Purwar, Hut Purwar.

কখনো দেখা যায়, বিশেষ একজনের নাম উল্লেখ করে তারই উদ্দেশে কিছু বলা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অনুজ্ঞা এবং অনুবোধের ভাবই বেশি, কচিৎ কোনো খবরের বিবৃতি। যথা: 'বউ কথা ক'। বউ কথা কহ (ভারতচন্দ্র)। 'বউ কথা কো'। 'ও বউ, হলুদ তোল'। 'বউ সরষে কোট্'। 'বউ সষ্ষে কোট্'। বউ সোরষা কুট্ (পূর্ববঙ্গ)। উত্তরভারতে দোয়েল পাখির ডাক, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে : সীতারামজী, রোটি ভেজো। নবীজী, রোটি দে দো। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুঘুর ডাক : গোপাল ঠাকুর (বা ঠাকুর গোপাল) ওঠো, ওঠো। সূর্য ঠাকুর, ওঠো, ওঠো। পূর্ববঙ্গে 'প্যাঁকো' পাখির ডাক : 'ছোন্দিদি রে ভাত দে'। মেদিনীপুরে ঘুঘুর (কপুতু বা কপোত) ডাক : পুতু, উঠ না, উঠ না, তিল পুরিল। উড়িষ্যায় : উঠ রে চিতু, পুর-পুর পুর-পুর। উঠ রে পুত, চাল পুরিল। ফরিদপুরে : মা-মা, চাইলে-ডাইলে পুর-পুর। মুরগীর ডাক : কংস রে, ওঠ্ ওঠ্। কংস রে, সার্ সার্। জলপাইগুড়িতে পাখি বিশেষের ডাক : জ্যাঠো গে ফির্-ফির্ ফির্-ফির্। পূর্ববঙ্গে 'কুড়াল' পাখির ডাক : বন্ধু রে, নীল চক্ষু দিলাল/হাঃ হাঃ হাঃ। 'চৈতার বউ' অর্থাৎ 'পাপিয়া'র ডাক অবলম্বনে মৈমনসিংহে পাওয়া যায় :

১. চৈতার বউ গো, ও চৈতার বউ!
টেকা দে গো, টেকা দে গো!
তোর পোলা নে গো, তোর পোলা নে গো!

২. চৈতার বউ গো, টাকা দে গো
কাঁঠাল পাকে, লোকে দেখে।

৩. চৈতার বউ লো ছাতু দে লো ;
পচা ছাতু খামু না লো!...

কখনো বা কারো নামোচ্চারণ না করেই অনুজ্ঞা ও অনুরোধ পাওয়া যায় কাট্‌টল পাগ্ (চট্টগ্রাম)। 'কাফল পাক্‌কো' (উত্তর ভারত)। ফটিক দে (বর্ধমান)। মেঘ কর্, মেঘ কর্ ; মেঘ হ', মেঘ হ' (ফরিদপুর)। 'বউ কথা কও' পাখির ডাক

অবলম্বনে বিহারের মোতিহারী-চম্পারণ জেলাতে : চল্ চল্ কলকত্তা চল্ / চল্ চল্, পটনা চল্ / চল্ চল্, বনারস চল্। ঘুঘুর ডাককে ভিত্তি করে পূর্ববঙ্গে পাওয়া গেছে : ইতি ঝি পুরুর-পুরুর/টুক্‌লে-বাক্‌লে টুকাইয়া তুল !/ টুক্‌লে-বাক্‌লে টুকাইয়া তুল্। দাঁড় কাকের ডাক : খা খা। পাতিকাক : কা কা কাণা হও, কাণা হও। জলপাইগুড়িতে পাখি বিশেষের ডাক : বাঁশ কাট্‌-বাঁশ কাট্। রাঢ়ে পাখি বিশেষের ডাক : লুটে লুটে নে। মধ্যভারতে ময়ূরের ডাক : টেয়ো টেয়ো (অর্থাৎ 'দেখ দেখ')। ফটিক জল। এই অর্থে 'তফিক্', 'শোভিগ্' (বিহারে)।

পাখির ইচ্ছা-বোধক উক্তি : গেরস্থ বউয়ের খোকা হোক (মেদিনীপুর)। গেরস্থের খোকা হোক। খোকা হোক। একটা পুকা হোক। পুকাপুকি হোক (পাবনা)। তোর খঁপাটুলী হোক ; তোর প্যাট উঁচল্ হোক (জলপাইগুড়ি)। চ্যাট্‌কাটা ঘুটুলু হোক, চ্যাট্‌কাটা হোক (ঐ)। পিরিতি হোক (ঐ)। কৃষ্ণ প্যোকা হোক (বীরভূম)। রাঢ় বঙ্গেই মেলে : কৃষ্ণের পোকা হোক। যক্ষ্মাকাশ হোক (হাওড়া)। ঘর পুড়ুক ছাই খাই ; ঘর পোড়ে—ছাই খাই (মধ্যবঙ্গে)।

নির্দেশাত্মক বাক্য : কাঁঠাল পাইক (সিলেট)। ইষ্টিকুটুম্। কটুমাইল, কুডুমাইল, কুটুমআলি (পূর্ববঙ্গ)। 'মোর পিহা'। পিয়, পিয়। পিয়ু, পিয়ু। পিউ-পিউ। পাপ দেহ (বর্ধমান)। পুঁটলী-পুঁটলী (নদীয়া)। ইউসুফ খু, ইউসুফ খু (পাঞ্জাব)। নিম্ নিম্ (পূর্ববঙ্গ)। ঢাকা চোর, ঢাকা চোর। হিটায় মোর টক্, হিটায় মোর টক্। বাও ঘাও গে, বাও ঘাও (জলপাইগুড়ি)। চোখ গেল। সংস্কৃত প্রবাদ অনুসারে মদীয়ক নামে এক ধরনের পাখির ডাক : 'মদীয়, মদীয়'।

ঠাকুর দেবতার নামোচ্চারণ : গোপাল ঠাকুর, ওঠো, ওঠো (ঘুঘুর ডাক)। 'রাধামাধব' (এই নামীয় পাখির ডাক, চট্টগ্রাম)। রঘু-রঘু-রঘু-রঘু (ঘুঘুর ডাক)। কৃষ্ণ গোকুলে। খোদারাম খোদারাম (বসন্তবউরির ডাক, পূর্ববঙ্গ)। 'শোভন, তেরে কুদরত্' (উত্তর ভারতে, তিতির জাতীয় পাখির ডাক)।

একই পাখির ডাক ভিন্ন মানসিকতার জন্যে ভিন্ন রকম শোনায়, বুলিও সেই মানসিকতা অনুযায়ী আরোপিত হয়। এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেয়েছি দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি থেকে। 'শ্বেতফরিত' (শ্বেতপত্র ?) নামে এক ধরনের ফেজাণ্টের ডাকের ধ্বন্যাত্মক রূপ হল, 'চিত্‌ফ্যাদেরেত্'।

একজন বৈষ্ণব, একজন মুসলমান এবং একজন তরকারীওলা একদা রাস্তার ধারে গাছের তলায় বিশ্রাম করছিল। এমন সময় পাশের ঝোপ থেকে শোনা গেল, 'চিত্‌ফ্যাদেরেত্'। অমনি বিশ্রামরত তিনজন নিজেদের বৃত্তি ও মানসিক বিশেষত্ব অনুযায়ী সেই ডাকের অনুকরণে ভাষা আরোপ করে বলল, চিতফ্যাদেরেত ! রাম-লক্ষ্মণ-দশরথ ![১] আল্লা-নবীন-হজরত ![২] মইচ-পিঁয়াজ-অদরথ ![৩]

ওপরে সংকলিত বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা গেল, পাখির কণ্ঠরবের অনুযায়ী মানুষ যেসব ভাষা আরোপ করেছে, তা বিভিন্ন মানসিকতার দ্যোতক।

১ রাম-লক্ষ্মণ-দশরথ। বৈষ্ণবের উক্তি। ২ আল্লা-নবীন হজরত। মুসলমানের উক্তি। ৩ মরিচ-পেঁয়াজ আদ্রক। তরকারীওলার উক্তি।

বাক্যগুলির মধ্যে এই ক'টি মনোভাব লক্ষ করা যায় : নির্দেশাত্মক (Indicative) মনোভাব, অনুজ্ঞা (Imperative), যাচঞা-প্রার্থনা (Optative, Precative), বিস্ময় (Interjection), প্রশ্ন-জিজ্ঞাসামূলক (Interrogative), সম্মতি জ্ঞাপক (Assertive), অসম্মতি-জ্ঞাপক (Negative) প্রভৃতি। অনুজ্ঞা ও অনুরোধের ভাবটিই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

এই ধরনের ভাষা আরোপের উদাহরণ ইংরিজিতেও প্রচুর মেলে। কয়েকটি এই : Brain-fever ; Orange-Pekoe ; Cross-word-puzzle ; Pity-to-do-it ; Did-he-do-it ; Pray-did-he-then ; Wet-my-lips ; Dick-be-quick ; Who-O ; Whip-Poor-will ; Heugh-heugh heugh ; Humility ; Bow-you gwai-gwai (অর্থ 'O my Poor red feet !' অস্ট্রেলিয়াতে) ; জার্মানীতে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করে কাঠঠোকরা বলে, 'giet-giet' (giess-giess) ; মধ্য প্রাচ্যে প্যাঁচার উক্তি : Ya-hu-ya-hu, অর্থাৎ "I love no other friend but Him (Hu), and there is none in my heart except Him (Hu)." চীনদেশে প্যাঁচার ডাক, 'Dig-dig'.

বাঙলা ও ভারতীয় পাখির রবে আরোপিত ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় পাখির রবে আরোপিত ভাষার তুলনা করলে দেখা যায়, বাঙলা ও ভারতীয় ভাষার বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তা পরিমাণেও ব্যাপক।

কবি-সাহিত্যিক, পক্ষি-প্রেমিকের মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব কল্পনা ও রসবোধ দিয়ে ভাষা আরোপ করেছেন। যেমন, 'ডানা' বইটির সব ক'টি খণ্ডেই বনফুল করেছেন। ফিঙের বুলিতে : 'কিরে মেকি, কি মেকি, কি মেকি, কি'। 'ও বউ হলুদ তোল'। বটের পাখির ডাকে : 'ঠিক তো ঠিক'। হাঁড়িচাঁচার বুলিতে : 'খুকু নেই, খুকু নেই, খুকু নেই'। অজয় হোম একটি পাখির বুলিতে ভাষা দিয়েছেন : 'বেবি কই এলি'।

পাখির কণ্ঠরবে যে ভাষা আরোপিত হয়ে থাকে, তার পেছনে একদিকে লৌকিক স্মৃতি-ধারা, জনশ্রুতি ও সংস্কার এবং অপর দিকে খাঁটি পৌরাণিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল থাকে। নৈশ বিচ্ছেদকাতর চখা-চখীর যে সংলাপটি পূর্বে সংকলিত হয়েছে, তা যতখানি লৌকিক স্মৃতি-শ্রুতি আশ্রিত, অনেকেই সন্দেহ করেন, তার মধ্যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যই তার চেয়ে বেশি পরিমাণে বর্তমান। এই রকম, উদ্ভটশ্লোকে কাকের রব সম্পর্কে আছে,

তিমিরারিস্তমোহন্তি ভয়সন্ত্রস্ত মানসাঃ।
'বয়ং কাকা বয়ং কাকা' ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ ॥

এবং ডাহুকের রব সম্পর্কে,

প্রাবৃট্‌কালে সুখীভূত্বা কোবা কুত্র ন গচ্ছতি।
ইতি বদতি দাত্যূহঃ কোবা কোবা কবা কবা ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত 'গোবিন্দ লীলামৃত' (দ্বাদশসর্গ,১০১ শ্লোক) গ্রন্থে :

কৃষ্ণং বিনা সুলীলঃ কো বা ব্রজবনমৃতে কবা লীলা।
ভণ্যতঃ ইতি দাত্যূহৈঃ কোবা কোবা কবা কবা বিরুতৈঃ ॥

বিদেশি সাহিত্যেও এর উদাহরণ প্রচুর। তার মধ্যে কেবল একটি উদাহরণ দিই।

টি. এস. এলিয়ট তাঁর 'ওয়েস্টল্যান্ড'-এর তৃতীয় পর্বে নাইটিঙ্গেল (গ্রীক ফিলোমেলা) পাখির ডাককে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাময় জীবনের অব্যক্ত ধ্বনিরূপে গ্রহণ করেছেন :

Twit twit twit
Jug jug jug jug jug jug
So rudely forc'd
Tereu···

এখানে 'tuit tuit' যেন 'ইটিস ইটিস'-এর আভাস, 'Jug jug' যেন 'হায়-হায়' বা 'ঠিক-ঠিক', 'tereu-tereu' যেন 'টেরেউসে'র নামোচ্চারণের চেষ্টা। পাখির ডাক এখানে ইমেজিষ্ট কবির কাব্যের উপকরণ ॥

···৬···

এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মোট তিনটি দিক থেকে পাখির কণ্ঠস্বরকে পর্যবেক্ষণের যে পরিকল্পনা আমরা উপস্থিত করেছিলাম, এতক্ষণে তা সাঙ্গ হল। এইবার, মানুষ কতো রকমভাবে যে পাখির নামকরণ করেছে এবং তার মধ্যে যে ভাষাগত দিকটি আছে, তারই বিচিত্র কথা বলি। এখানেও পাখির কণ্ঠস্বরকেই প্রথমে বেছে নিচ্ছি।

অনেক সময়ে পরিচিত বা গৃহপালিত পাখিকে ডাকবার বা তাড়াবার জন্যে মানুষ নিজেই পাখির ভাষার অনুকরণ করে থাকে। অনুকার শব্দরূপে এগুলো উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ একদিকে পাখির ভাষায় মানুষ যেমন মানবিক ভাষা আরোপ করে, অপরদিকে নিজেও সে পাখির ভাষার অনুকরণ করে।

চট্টগ্রামে পায়রাকে ডাকবার অনুকরণাত্মক শব্দ হল, 'কৈত্-কৈত্-কৈত্'। অবশ্য, এটি সর্বৈব অনুকার শব্দ কিনা, সন্দেহ করি। কেননা, পূর্ববঙ্গে পারাবত অর্থে ফারসি কবুতর > কৈতর শব্দই অধিক চলিত, এবং কৈতর > কৈত্ হওয়া বিচিত্র নয়। তথাপি, প্রয়োগক্ষেত্রে যে এটি ধ্বন্যাত্মক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। হাঁসকে ডাকবার জন্যে পূর্ববঙ্গেই শোনা যায় : 'আয়-আয়-আয়-চৈ-চৈ-চৈ'। কিংবা, 'তৈ-তৈ-তৈ'। ঢাকার একটি ছড়াতে পাওয়া যায় : আয় রে আমার সাধের হাঁস—তৈ তৈ-তৈ। এই ডাক থেকে শেষে পাখিটিরই নাম হয়ে গেছে তাই। যেমন, মৈমনসিংহে 'চৈ' বা পাবনার 'চোই' বলতে হাঁসকেই বোঝায়। এখানে শব্দের অর্থগত পরিবর্তন হয়েছে। রাজশাহীতে আবার অর্থের সংকোচনের ফলে 'চৈ' বলতে কেবল পাতিহাঁসকেই বোঝায়।

পাবনা-রাজশাহীতে 'টি-টি' অর্থে মোরগ-মুরগী, যেহেতু ওই শব্দ করেই মোরগ-মুরগীকে ডাকা হয়। লক্ষ করবার বিষয় এই, 'টিটি' পাখি বলতে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলেই 'ফটিক জল' পাখিকে বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গের 'হো-টি-টি' পাখির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অবাঞ্ছিত পাখিকে তাড়াবার জন্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'হুশ্'। পূর্ববঙ্গে কোথাও-কোথাও 'পুশ্' বা 'পু-শ' পাওয়া যায়। সিলেটে 'চিল' শব্দটিই চিলকে তাড়াতে প্রযুক্ত হয় : 'চিলু কৈতে চিল উড়ি গেলু গি'।

এই প্রসঙ্গে যাস্ক ও ঔপমন্যবের দুই বিরুদ্ধ মতবাদের কথা মনে পড়ে যায়। আদিম মানুষ ভাব ব্যক্ত করত ভঙ্গি ও ইশারা দিয়ে ; ক্রমে যখন শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে, তখন পশু-পাখির রব থেকেই তা গ্রহণ করে। সংস্কৃতে 'কাক' বা 'কুক্কুট' কিংবা ইংরেজীতে 'কক্', 'কুকু' বা 'ক্রে', সব পক্ষি-নামই তাদেরই কৃত ধ্বনি অনুযায়ী প্রদত্ত হয়েছে। এই মত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে যাস্ক প্রচার করেছিলেন। কিন্তু ঔপমন্যব তাঁর বিরোধিতা করে বলেন, 'কাক' প্রভৃতি নাম ধ্বনি অনুযায়ী হয় নি, হয়েছে পাখিটির কোনো গুণ বা বিশেষত্ব অনুসারে। যেমন, 'কাক' হল 'অপকালয়িতব্য' অর্থাৎ যে পাখি তাড়িত হবার উপযুক্ত। 'তিত্তিরি' অর্থ যে লম্ফ দেয় ('তর' ধাতুজ) অথবা যার অঙ্গে চিত্রবৎ ছোটো ছোটো দাগ আছে॥

যে পাখি যে বুলি আওড়ায় অর্থাৎ মানুষ তার যে বুলিটি কল্পনা করে নেয়, সেটাই সে পাখির নাম হয়ে যায় অনেক সময়।[১] এই নামকরণ দু' রকমের : অর্থবোধক শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দিয়ে পাখির নামকরণ ; দ্বিতীয়তঃ, পাখির ডাকের ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় জুড়ে বা না জুড়ে তার নামকরণ। প্রথম ধরনের নামকরণের উদাহরণ ঃ ইষ্টিকুটুম। কাঁঠাল পাখি। খোকা হোক পাখি। চোখ গেল। টাকা চোর। বউ কথা কও। ফটিক জল। রাধামাধব।

অর্থহীন, প্রত্যয়হীন, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যা পাখির নাম হয়ে গেছে, এবার তার দৃষ্টান্ত দিই। অনেক সময় প্রত্যয় হয় অব্যবহৃত, নয় নিশ্চিহ্ন : ওয়াক। কাক। কুক্, কোঁক। গুড়গুড়। ঘুঘু। 'চিত্‌ফ্যাদেবেত্'। টিটি। টু-পাখি (পাবনা-ফরিদপুর)। ডুক্ পাখি (জলপাইগুড়ি)। ধুদু, ধুধু, ধুতুম্। হট্টিটি, হোট্টিটি। হুতোম। হুদ্‌হুদ্।

অনেক পাখির নামেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গের প্রত্যয়টি স্পষ্ট বজায় আছে। যেমন,

আড়া-কেচ্‌কেচানী (ত্রিপুরা) : ছাতারে। <আরা, আড়=ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল+কেচ্‌কেচ্+আনিয়া।

উলুক উলুক : <উদ+ √লোক+অ (অচ্)-ক, নিপাতিত, ধ্বন্যাত্মক (?)

কটকটে : কট্‌কট+ইয়া। কীটখাদক পাখি বিশেষ। নীল রঙের হলে, নীল কট্‌কটিয়া।

১ এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকজনক তথ্য স্মরণ করা যেতে পারে। মুরগীকে ইংরিজিতে 'কক্', ওরুবা ভাষায় 'কোকলো', ইবো ভাষায় 'ওকোকো', জুলু ভাষায় 'কুকু', এবং ফিনিস ভাষায় 'কক্কো' বলে। সহজেই বোঝা যায় মুরগীর ডাক অনুযায়ী এই নাম হয়েছে। পারাশিরা মুরগীকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। কাজেই মুরগীর ডাক অনুসারে মুরগীর নাম সংজ্ঞা দিলে মুরগীর খুব অসম্মান হবে বলে তারা মনে করে।

কর্‌করা : কর্‌কর্‌+আ। সারস বিশেষ।

কাক : কা-কা রবকারী কাক+ইয়া, উয়া, ওয়া>কাইয়া, কাউয়া, কাওয়া। উত্তরবঙ্গে, কাউহা।

কাশ্‌কুশি, কাহাকুহি (ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল), ক্যাচকাও : হাঁড়িচাঁচা, বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত। একই অর্থে উত্তর কাছাড়ে মেলে 'কাশ্‌কুর্‌শি'।

কুইক্যা (চট্টগ্রাম) : প্যাঁচা। <কুক্‌+ইয়া।

কুও (খুলনা) : কোকিল। কু+আ, স্বরসঙ্গীতিতে।

কুকা (জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গলে', উত্তরবঙ্গে) : কোকিল। <কুক্‌+আ। একই অর্থে, কুকি<কুক্‌+ই।

কুকা, কুকু (সিলেট), কুকুয়া, কুকুয়্যা (মৈমনসিংহ), কুকো (খুলনা), কুখা : <কুক্কুভ। 'কুম্ভ' এইরূপ রবকারী। বিদ্যাপতিতেও পাওয়া যায়।

কুরর্‌, কুরইল্‌ (হিন্দী), কুরয়া (হিন্দী), কুরল, কুল্লো, কুড়ল (মুর্শিদাবাদ) কোবল : মৎস্যাশী পাখি বিশেষ।<√কুর শব্দ+অর্‌ (ক্রণ)-ক, কুরল।

কুরগাল, কুরগাইল্যা, কুরুইল্লা (পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে) : ঐ। <কুরর+গাল+ইয়া।

কেকা, কেকী ঃ <কে+ √কে শব্দ+অ (ড)-ক+স্ত্রী আ (টাপ্‌) ; ধ্বন্যাত্মক। কেকা+ইন্‌ (ইনি)।

কেইচ্‌কা (রঙপুর) : ফিঙে। <ক্যাঁচ+কা।

কেচ্‌কেচিয়া, কেচ্‌কেচ্যা (মৈমনসিংহ) : ছাতারে। <কেচ্‌কেচ্‌+ইয়া। হিন্দী, কাচ্‌বাচিয়া।

কেচোরি সারো (জলপাইগুড়ি) : শালিক বিশেষ। <কেচ্‌+রিয়া+সারিকা।

কের্‌কেটা (ঝাড়খণ্ডে) : <কের্‌কেট্‌+আ। 'কেরকেট্যা'ও মেলে।

কোকয়া (উত্তর বিহার) : হাঁড়িচাঁচা। <কক্‌কক্‌+য়া।

কোকিল : < √কুক্‌+ইল (ইলচ্‌)-ক, ধ্বন্যাত্মক (?)।

খকিয়া (চট্টগ্রাম) : চাতক। <√খক্‌+ইয়া।

গজ্‌গজে : বেলে পাখি। <গজ্‌গজ্‌+ইয়া।

গুড়গুড়ো, গুড়গুড়ি, গুড়গুড়ো (পশ্চিমবঙ্গ), গুরগুরৈয়া (নোয়াখালি) : ছোটো পাখি বিশেষ। <√গুড়গুড়+আ, ই, ইয়া। চড়ুই অর্থে হিন্দী 'গোরয়া'র প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। তুলনীয়, 'বুরবুইর‍্যা' (ঢাকা)।

ঘর্ঘব, ঘর্ঘবক : প্যাঁচা। <ঘর্ঘর+অ (অচ্‌)।

ঘেচ্‌ঘেচায়া (উত্তরবঙ্গ) : ফিঙে। <ঘেচ্‌ঘেচ্‌+ইয়া।

ঘোঙ্গাই (হিন্দী) ঃ ছাতারে। ঘং ঘং+আই।

চিল্‌হা, চিলা (উত্তরবঙ্গ), চিলু (সিলেট) : চিল। <চিল্ল+আ, উ।

ঝেঁচু (উত্তরবঙ্গ) : ফিঙে। <ঝেঁচ্‌+উ। ফেঁচ্‌>ঝেঁচ্‌ হতে পারে। তুলনীয়, ফেঁচু। 'ঢেব্‌চু' (মেদিনীপুর)।

টিটাহি, টিটি, টিটিহারী : টিট্টিভ। টিটি, টিট্টি+√ভণ্‌+অ (ড)-ক। টিট্টিভ>টিটিহ। হিন্দী, টিটিহ, টিটিহা। মৈথিলী, টিটিহী। মারাঠী, টিটবী।

টিয়া, টিয়ে টে, (খুলনা), টেঁইয়া (পূর্ববঙ্গ), টেয়া : <টি+ আ। হিন্দী, টুংইয়া। মারাঠী : টিংয়া। বাঙলার কোনো অঞ্চলে পাই, 'টুই'।

টুনটুনি, টুনি (পূর্ববঙ্গ), টুনিয়া (উত্তরবঙ্গ), টোনি (বাকরগঞ্জ), টোনা (চট্টগ্রাম), <টুনটুন+ই। সং টুণ্টুক। <টুন+ই, টুনি।

টুল্‌টুলী (জলপাইগুড়ি); পাখি বিশেষ। টুল্‌টুল্‌+ই।

টেটারি (ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গলে') : নীলকণ্ঠ জাতীয় পাখি। >টেটা+কারী।

ট্যাক্‌ট্যাকা (খুলনা-যশোর), ট্যাটট্যারা (রাজশাহী), ট্যার্‌ট্যারা : নীলকণ্ঠ। <ট্যাক্‌ট্যাক্‌+আ, রা।

ট্যাক্‌সোনা, টেস্‌কলা (রূপরামের 'ধর্মরাজের গীতে , টেস্‌কনা (মাণিক গাঙ্গুলীর 'শ্রীধর্মমঙ্গলে'), টেস্‌কোনা (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে), ট্যাশ্‌কোনা-, ট্যাশ্‌টেশে (খুলনা) : নীলকণ্ঠ। <টেক্‌, টেস,+কোনা, সোনা।

ট্যাম্‌টিমে (খুলনা) : ছোটোপাখি বিশেষ, টুনটুনি। <ট্যাম্‌ট্যাম+ইয়া।

টোটক (ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গলে') : নীলকণ্ঠ বিশেষ। <টোট্‌+ক।

ঠুক্‌ঠুকিয়া : বাচ্‌কা (Night Jar)। <ঠুক্‌ঠুক্‌+ইয়া।

ডম্‌না, ডমনা (জলপাইগুড়ি) : বুলবুলি। <ডম্‌+না। স্ত্রীলিঙ্গে ডুমনী, ডুম্‌নী।। 'ডোম্‌না'ও মেলে।

ডুপি (কুমিল্লা), ডুফি (মৈমনসিংহ), ডুবি (কুমিল্লা), ডুহি (ঐ), ঢুপি, ঢুপী (পূর্ববঙ্গ) : ঘুঘু। <ডুপ্‌-ডুপ+ই। ঢুপ>ডুপ ?

তিতির, তিত্তির, তিত্তিরি ; তিথির, তিঠির, টিটিরি, টিঠিরি (উত্তরবঙ্গে) : <তির্‌তির+ই। তিত্তিরি>তিতই মেলে। উত্তরবঙ্গে এতে ব্যাপকভাবে মূর্ধন্যীভবন ঘটেছে। মহাপ্রাণতা তো আছেই।

পাপিয়া, পাপিহা : <'পিয় পিয়' বা 'পিউ পিউ' রবকারী। হিন্দী, পপীয়া। শব্দটি সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও প্রচুর মেলে।

পিচ্ছা ('দ্বাদশ শতকের বাঙলা শব্দ' : যোগেশচন্দ্র রায়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৬, ২য় সংখ্যা) : ফিঙে। <ফেঁচ্‌+আ।

পুক্‌পুকি (রাজশাহী) : প্যাঁচা। <পুক্‌পুক্‌+ই।

পেঙ্গা : কস্তুরা (Thrush) বিশেষ। <পেঙ্গ্‌+আ।

পেচক : < √পচ্‌+অক (বুন)-ক।

প্যাচকুলা (মৈমনসিংহ), ফেউচ্যা, ফেচুয়া, ফেঁচু (জঙ্গীপুর), ফেচো, ফেক্‌কা (বগুড়া), ফেছ্‌কি (মৈমনসিংহ), ফ্যাইচ্‌কা (ঐ), ফ্যাচ্‌কা (পাবনা), ফ্যাচ্‌সা (মৈমনসিংহ), ফ্যাছকুনা (সিলেট), ফ্যাচ্‌কোনা (ঐ : ফিঙে : দ্রঃ পূর্বে 'পিচ্ছা'। <ফেচ্‌ফেচ্‌+ইয়া, উয়া, কা, কুনা, সা। শব্দটির বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায় বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে : হ্যাঁচ্‌চা (নোয়াখালি), হ্যাচ্‌চোয়া (সিলেট)। ধেচুয়া, ধেচুয়া, ধেছুয়া, ধৈচ্চজা (চট্টগ্রাম এবং অন্যত্র)। ঝেঁচু, ঝেঁসু (উত্তরবঙ্গ, সকারী ভবনে)। আসামে ফেচাই<ফেচ্‌+আই।

ফিঙা, ফিঙ্গা, ফিঙে : <সং. ফিঙ্গক, ধ্বন্যাত্মক। বাঁকুড়ায় স্বরসঙ্গীতিজাত রূপ, ফেঙ্গা। সেখানে অপর একটি নাম মেলে, 'ধ-ফেঙ্গা'।

বাক্কা : কস্তুরা (Thrush) বিশেষ ! <বাক্ক্ + আ । কিংবা বাচ্কা > বাক্কা ।

বুলবুল্, বুল্বুলি, বুল্বুল্যা (পূর্ববঙ্গ) : <ফারসি বুলবুল, ধ্বন্যাত্মক ।

ভুচেং, ভুচুঙ্গা : ফিঙে । <ধ্বন্যাত্মক । 'বাচাঙ্গা'ও মেলে ।

ভেদ্ভেদে (পশ্চিমবঙ্গ) : ছাতারে । <ভেদ্ভেদ + ইয়া ।

ভোঁতল : (২৪-পরগণা) হুতোম প্যাঁচা । <বুদ্বুদ্ > ভুত + অল্, ভুতল, ভোতল, ভোঁতল ।

হুড় হুড়ে (পশ্চিমবঙ্গ) : পাখি বিশেষ । <হুড়্হুড়্ + ইয়া ।

হুতুইশা (চট্টগ্রাম), হুতুমধুমা (বরিশাল) : হুতোম প্যাঁচা । <হুতুম + ধুমা, শা ।

হুদ্হুদ্, হুদ্তবাজ : ঐ । <ধ্বন্যাত্মক । 'হদ্হদ্'ও মেলে । <আরবি হদ্হদ্ তুলনীয় ।

হুপো : <হুপ্ হুপ্ + উয়া ।

হুঁহুঁয়ে (নদীয়া) : হুতোম প্যাঁচা । <হুঁহুঁ + ইয়া ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পক্ষি-নাম ভারতের সর্বত্রই দেখা যায় । দৃষ্টান্ত হিসেবে উত্তরভারতের কয়েকটি পাখির নাম করা যায় : করয়ালা । কাচ্বাচিয়া । কিল্কিলা । কুকা । কোরুটিয়া । কৌয়া । ঘোঙ্গাই । চিল্চিলা । ডুম্রী । তিতার । তুর্তিতুইয়া । থির্থিরা । শাউবেগী । হদ্-হদ্, হুদ্-হুদ্ ।

আমাদেব উপস্থাপিত তালিকায় ছাতারে ও ফিঙের নাম সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মেলে । প্রত্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে 'ইয়া', তারপর 'উয়া' ॥

কিছু-কিছু পাখির নামকরণের মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বরের প্রত্যক্ষ দিক নেই বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে বর্ণনার মাধ্যমে তার উল্লেখ করা হয় । সবুজ রঙের বুলবুলি জাতীয় এক ধরনের পাখির নামই হয়ে গেছে 'হরবোলা', হিন্দীতে 'হরেওয়া' (এখানে 'হরিৎ' শব্দের প্রভাবও থাকতে পারে), যেহেতু এ পাখি হরেক রকমের 'বোল' বলতে এবং অন্য পাখির রব নকল করতে পারে নিখুঁতভাবে । এই ধরনের পক্ষিনামের অন্যান্য উদাহরণ এই :

অত্যূহ, দাত্যূহ, দাত্যৌহ : 'অতিশয় বিতর্ক' অর্থাৎ অত্যন্ত কলরবকারী যে পাখি ।

অলি : গুঞ্জন-সমর্থ ভ্রমর, তাব থেকে কাক, কোকিল ।

উৎক্রোশ : উচ্চরবে ডাকে যে ।

কলকণ্ঠ (বহুব্রীহি) : কোকিল, পারাবত, হংস ইত্যাদি ।

কলঘোষ : কোকিল ।

কলবিঙ্ক : কল+বিঙ্ক (রব ?) : চটক, চড়ুই।
কলহংস : কলকণ্ঠ হংস।
কলাপী : 'কল'+আপী (প্রাপক) : ময়ূর।
কহ্ব : 'কে' অর্থাৎ জলে হ্বয়তে, শব্দং কুরুতে, বক।
কাকল : 'কা' যার 'কল' (শব্দ) : দ্রোণকাক, দাঁড়কাক।
কালকণ্ঠ : 'কাল' অর্থাৎ বর্ষায় যার বা যাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।
কুহূকণ্ঠ : কণ্ঠে যার 'কুহূ' রব, কোকিল।

কৃকবাকু (বাজসনেয়ি সংহিতায় [২৪/৩৫] এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় [৫/৫/১৮] এর উল্লেখ আছে) : যে 'কৃক্' এই শব্দ করে। সম্ভবতঃ, মোরগ।

কৈরব : 'কে' অর্থাৎ জলে রবকারী, হংস।
তরস্বান : গরুড়।
ধ্বাঙ্ক্ষ, ধ্মাঙ্ক্ষ : √ধ্বাঙ্ক্ষ (ঘোররব) + অ (অচ্)-ক : কাক।
বসন্ত-গায়ক : কোকিল।
বহুস্বন : পেচক।

বৃষরব (ঋগ্বেদে [১০/১৪৬/২]-এর উল্লেখ আছে,) : যে বৃষের মতো রব করে। অনেকের অনুমান, রাজধনেশ পাখির (হিন্দীতে যাকে বলে বনরাও<বনরাজ) আওয়াজ অনেকটা বৃষের মতো, সে পাখিই এ পাখি।

মধুকণ্ঠ, মধুগায়ন : কোকিল।
সুধাকণ্ঠ : কোকিল।
হারিকণ্ঠ : 'হারি' অর্থাৎ মনোহর কণ্ঠ যার, কোকিল॥

পাখির আকৃতিগত ও দৈহিক বিশেষত্ব মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে নাড়া দিয়েছে। ফলে, অনেক পাখির নামকরণে লোকমানস ওই দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। উদাহরণ দিচ্ছি :

পাখির ডানা-পাখা-বোধক : শতচ্ছদ : শত বা বহু পক্ষ যার, বহুব্রীহি, কাষ্ঠকুটি পাখি। শতপত্র : বহু পক্ষ যার, বহুব্রীহি, বক, শুক, ময়ূর। সুপর্ণ : শোভন পক্ষ যার, বহুব্রীহি, গরুড়। স্বর্ণপক্ষ (বহুব্রীহি), গরুড়। পরপাঁউ বা পরপণ : পায়ে 'পর' অর্থাৎ পালক আছে যার, পায়রা বিশেষ।

পাখির সর্বাঙ্গ বোধক : চন্দনা, চন্দনীয়া : সর্বাঙ্গে চন্দনের মতো ছিঁটে-যুক্ত টিয়ে বিশেষ। চন্নাশালিক (পূর্ববঙ্গ) : <চন্দনা, সমীভবনে, বিট্সারিকা। চন্দ্রকবান্ : যার সর্বাঙ্গে চন্দ্রের ছাপ আছে, ময়ূর। চিওনিমনা, চিত্তালিমনা (চট্টগ্রাম) <চিত্র+লি+মদনিকা, পাখি বিশেষ। চিক্কন, চিট্কন্, চিট্কুনী (জলপাইগুড়ি) : <চিত্র+মদনিকা, খঞ্জন। 'চিত্র পক্ষী' : কোকিল, টিট্টিভ। 'চিত্রবল্লই' জলপিপি। নধা বোটোই (জলপাইগুড়ি) : <নধর বর্তক (?)। নীলাঙ্গ : নীল অঙ্গ যার, বহুব্রীহি,

নীল সারস। পত্রিঙ্গা : <পত্র+অঙ্গিকা, পাখি বিশেষ। বিচিত্রাঙ্গ : বিচিত্র অঙ্গ যার, চাতক-চাতকী, ময়ূর ইত্যাদি। শারঙ্গ : শার অঙ্গ যার, বিচিত্রাঙ্গ। স্বর্ণকায়, হেমাঙ্গ : গরুড়।

অনেক পাখির গায়েই spot বা ফোঁটা আছে। এই ফোঁটা বহুশঃ 'তিল' রূপে গণিত হওয়ায়, শব্দটির সঙ্গে নানা প্রত্যয় যোগ করে পাখির নাম দেওয়া হয়েছে : তিল্লা কোকিল, স্ত্রী কোকিলের গায়ে খয়েরির ওপর সাদা ছিটে থাকে বলে। এই রকম : তিলে বাবুই, তিলে ময়না। তিলে ঘুঘু, তিলুয়া ঘুঘু, তৌলিয়া ঘুঘু। তেলে মুনিয়া।

তিলের বদলে 'ফোঁটা' মনে করায় পাই : ফুট্‌কি মাছরাঙা <ফোঁটা+কিয়া। তিল ও ফোঁটা পরীদের গায়ে থাকে, এই বিশ্বাস থাকায়, জলপাইগুড়িতে পাই, পইরি ঘুঘু : <ফারসি পর+ইয়া।

পাখির মাথা ও ঝুঁটি নিয়ে নাম : গোলাবশির (Pink-headed Duck). রাঙা মুড়ি (Dun bird, এক ধরনের Pochard) : পূর্ববঙ্গ ও আসামে দেখা যায়, এদের পুরুষগুলোর মাথা-ঘাড়-গা খয়েরি বলে এই নাম। লালশির (Red-crested Pochard) সব ক'টি সমাস লক্ষ করবার মতো।

পাখির crest বা ঝুঁটিকে ভিত্তি করে, নানাভাবে পাখির নামকরণ করা হয়েছে। ঝুঁটিকে 'চূড়া', 'শিখা', 'খোঁপা', 'জটা' ইত্যাদি রূপে কল্পনা করবার জন্যে এখানে কল্পনার বৈচিত্র্য এসেছে।

খোঁপা : খোঁপাঢুলী (জলপাইগুড়ি, রঙপুর, দিনাজপুর,) : খোঁপা দোলায় যে পাখি। এই রকম, খোঁপালাসী, খোঁপানাসী : লাস্যময় খোঁপা যে পাখির। খ'পাতি সারো : ~খোঁপা+তি, স্বরসঙ্গতিতে, যে সারিকার ঝুঁটি আছে। এসব ক্ষেত্রে পাখিকে নারীরূপে কল্পনার আভাস আছে। তেমনি, ঝুঁটি, জট, শিখার মধ্যে আছে পাখিকে পুরুষ বলে কল্পনা করার ইঙ্গিত।

চূড়, চূড়া : অঙ্গারচূড়ক : জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চূড়া যার, অনেকের মতে বুলবুলি। অগ্নিচূড় : অগ্নিবৎ চূড়া যার, কুক্কুট। কটাচূড় : ডাহুক। তাম্রচূড় (কবিকংকণ চণ্ডীতে) : রক্তবর্ণ চূড়াযুক্ত, কুক্কুট। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : তাম্রচূড়া। মদনচূড় : সারস জাতীয় পাখি। স্বর্ণচূড়, স্বর্ণচূড়ক : চাষ, কুক্কুট।

জট : জটিয়া বক (রঙপুর থেকে সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের গানে)।

ঝুঁটি : ঝুটকুলি : <ঝুঁটি+কোকিল, পূর্ববঙ্গে। ঝোঁট্‌ ময়না, ঝোঁটসারো (উত্তরবঙ্গ)। জুইট্যা হালিক, ঝুট্যা ময়না (পূর্ববঙ্গ)। ঝুস্‌ শালিক<ঝুঁট্‌ শালিক; সমীভবনে।

টিকি : টিকি ময়না (পূর্ববঙ্গ)। মদনটাক, মদনটিকি : সারস বিশেষ।

ধ্বজা : ধ্বজী : ধ্বজ বা শিখা আছে যার, ময়ূর।

শিখা : শিখাবল, শিখাবলা : ময়ূর। শিখণ্ড : শিখা বা চূড়া থেকে শিখাবান্‌, কুক্কুট, ময়ূর। শিখরিণী, শিখরী : কোযষ্টি, কোড়া। তাম্রশিখী : কুক্কুট।

শৃঙ্গ : শৃঙ্গী জীবঞ্জীব (Horned Pheasant, Tragopan).

কখনো বা ঝুঁটিকে লাল রঙের ফুল বলে কল্পনা করা হয়। যেমন, যে শকুনের মাথায় ফুল সদৃশ লাল চামড়া থাকে, তাকে বলে 'ফুল শকুন' (মেদিনীপুর)।

পাখির চোখকে ভিত্তি করে পাখির নাম ও বিশেষণ : অহরদৃক্ : গৃধ্র। উজ্জ্বলাক্ষী : রাজসারিকা, সারিকা। একাক্ষ, একদৃক্ (বহুব্রীহি) : কাক। ধূম্রলোচন : কপোত। "যোজনদৃষ্টিঃ" : গৃধ্র। রক্তদৃক্, রক্তদৃশ্, রক্তদৃষ্টি : কপোত। সহস্রলোচন : ময়ূর। শুক্লনেত্রান্ত, শুক্লাপাঙ্গ (বহুব্রীহি) : ময়ূর। হরিনেত্র, হরিলোচন : পেচক। 'শকুন' শব্দের মূল অর্থ : 'দূরদর্শনে সমর্থ'। হিন্দী গোলাবচশম (yellow-eyed Babbler) : এক ধরনের ছাতারে। নামান্তর : বুলালচশম।

পাখির কানকে অবলম্বন করে পাখির নাম ও বিশেষণ : কানধরা (white-eared crested Bulbul). কাংড়া, কাংরা বুলবুল <কানধরা (?)। কানঠুঁটী : Flammingo. কানালা : সাদা হুড়হুড়ে। কানাকুকো, কানাকুয়ো <কর্ণ (?)। কর্ণরেখা অনুযায়ী ময়নার নাম : সোনাকানী ময়না, রূপোকানী ময়না।

পাখির নাক অনুযায়ী নাম : নক্তা, নাক্তা, নাক্টা (স্বতোমূর্ধন্যীভবন), নকী হাঁস, নাকী হাঁস (Comb Duck) : নাকের ওপর খানিকটা মাংস স্তূপীকৃত হয়ে থাকে বলে এই নাম। বক্রনাসিক : পেচক।

পাখির ঠোঁট ও মুখকে ভিত্তি করে নাম : উল্টো-ঠোঁটী (Avocat) : বকখালিতে দেখা যায়। গালগোপ্পো (ঢাকা) : গাল-ফোলা যার, পেচক বিশেষ। চামচ পাখি, চামচবাজা : পাখি বিশেষ। দর্বিদা (বাজসনেয়ি সংহিতায় [২৪/৩৪] এর উল্লেখ আছে) : 'দর্বি' অর্থাৎ হাতার মতো মুখ, চামচ পাখি। বাগ্‌গুদ : বাক্ বা মুখ যার বিষ্ঠাত্যাগ স্থান, বাদুড়। রক্তুতুণ্ড : শুক পাখি। ঠোঁটের গড়নের বিশেষত্বের জন্যেই ইংরেজিতে পাখি বিশেষের নাম cross-bill. তালচঞ্চু বা তালচোঁচ (Martin) পাখি সম্পর্কে একটি সন্দেহভাজন লোক-নিরুক্তি পাওয়া যায় : এ পাখির মুখের হা এতোই বড়ো যে, একটি তালও তাতে ঢুকে যেতে পাবে !

ঘাড় ও গলাকে ভিত্তি করে পাখির নাম ও বিশেষণ : কাঁচিচরা (পূর্ববঙ্গ), কাঁচি-চোরা (চট্টগ্রাম), কাসিচোরা (কুমিল্লা, সকারীভবনে) : 'কাঁচি' বা কাস্তের মতো গলা যার বাঁকানো, বক। গলগণ্ডী : হাড়গিলে। ঋল্লকণ্ঠ : পারাবত। ডিয়াল্যা (চট্টগ্রাম) : <দীর্ঘলিয়া, মূর্ধন্যীভবনে, দীর্ঘগ্রীবা যার, কাঁক। ধুকড় (উত্তরবঙ্গ এবং হিন্দীতে , ধুকড়িয়া, ধোকাড়িয়া, (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে) :<ধোতকট, গলদেশ থলের আকৃতি যার। নলখাগ বগুলা (উত্তরবঙ্গ) : যার গ্রীবা নলখাগড়ার মতো দীর্ঘ, কাঁক বিশেষ। নীল-কণ্ঠ : খঞ্জন, চটক, টেস্‌কোনা, ডাহুক, ময়ূর। বিশকণ্ঠী : 'বিশ' অর্থাৎ মৃণালের মতো ধবল কণ্ঠ যার, বলাকা। রক্তগ্রীব : কপোত বিশেষ। মণিকণ্ঠ : চাষ পাখি। শিতিকণ্ঠ : ডাহুক, ময়ূর। শুক্লকণ্ঠক : ডাহুক। শ্যামকণ্ঠ : ময়ূর। স্কন্ধ : দীর্ঘ স্কন্ধ হেতু এই নাম, কাঁক। হংসস্যাচি (তৈত্তিরীয় সংহিতায় এর উল্লেখ আছে) : এক ধরনের দিকহাঁস, হিন্দীতে যাকে বলে সিঙ্‌পুর, সন্তরণ কালে যারা গলদেশ ধনুকের মতো 'স্যাচি' অর্থাৎ বাঁকা করে এবং পুচ্ছ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে (?)।

পাখির পুচ্ছকে ভিত্তি করে নাম ও বিশেষণ : কোলপুচ্ছ (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে) : কোল পুচ্ছবৎ যার, উত্তরপদ লোপী বহুব্রীহি। ঢেঁকিল্যাজা : ঢেঁকির মতো ল্যাজ যার, বহুব্রীহি, হাঁড়িচাচা। তুলা পুটপুটী (রাজশাহী), তুলা ফুগ্‌দি :<তুলা + হিন্দী ফুদকি, ফুদকি >ফুগ্‌দি, টুনটুনি। তুলোডাকি (কুমিল্লা), তুলা ফুডুকি : <তুলা +

ফ্ৎকি>ফটকি>ফড়কি, টুনটুনি। নীল পিচ্ছ : শ্যেন। পোন্নাচানি (চট্টগ্রাম) : <পোঁদ+নৃত্য+আনি, খঞ্জন। ফিতে বুলবুলি (নদীয়া) : ফিতের মতো দীর্ঘ ল্যাজ যার। লক্কা : <আরবি 'চওড়া' অর্থে, যে পায়রার ল্যাজ চওড়া। লক্কা> লখাও মেলে। লেইঞ্জ (সিলেট) : লঞ্জা>লেঞ্জ+ইয়া, বুনো হাঁস বিশেষ। ল্যাজঝোলা : ল্যাজ ঝুলে পড়ে যার। ল্যাজে কাঠি : ল্যাজ কাঠির মতো দীর্ঘ ও সরু যার। সুঁইয়া : ল্যাজ সুঁচালো যার।

পাখির নখ ও পা অনুসারে নাম ও বিশেষণ : চরণায়ুধ : যার চরণ যুদ্ধাস্ত্র, কুক্কুট। রক্তপাদ, রক্তপাদী : কাদম্ব, শুক প্রভৃতি পাখি। সহস্রপাদ : কারণ্ড জাতীয় পাখি। সোনাজঙ্ঘা, জঙ্ঘিল (Painted stork) : যার জঙ্ঘা সোনালী। লালঠেঙ্গী (Stilt : বাটান জাতীয় পাখি।

পাখির দৈহিক বিশেষত্বগুলি আপাদমস্তক লক্ষ করে পাখির যতো নাম ও বিশেষণ প্রদত্ত হয়েছে, আমরা তার একটী অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে উপস্থিত করলাম। দেখা গেল, এইভাবে নামকরণের মধ্যে সমাস-বদ্ধ পদই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাসের মধ্যে আবার বহুব্রীহি সমাসের বহুত্ব লক্ষ করা যায়।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাখির আকৃতিগত আয়তনকে নির্দেশ করবার জন্যে বিশেষণ-বাচক কিছু শব্দ মেলে। কয়েকটী এই :

কানী<কনিষ্ঠ : উত্তরবঙ্গে ছোটো বক বোঝাতে 'কানী বগুলা' পাওয়া যায়। বককে প্রায়শই 'কানা', 'আন্ধা' (হিন্দী) ইত্যাদি বলা হয়, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবার জন্যে। এই বিশেষণ প্রদানের পেছনে একটি [illegible] কাজ করে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্রার্থে 'কানী' শব্দের ব্যবহারে নতুনত্ব আছে।

খোরালি < ক্ষুদ্র+লি : খোরালি আস (ছোটো হাঁস, কুমিল্লা)। চট্টগ্রামেও মেলে।

পাত, পাতিয়া, পাতি, পুঁই, পুই : পাত+ই, ইয়া। পাতকুয়া (পশ্চিমবঙ্গ)। পাতি কাউহা, পাতি পাঢ়ো, পাতি সারো, পাতিয়া ঘুঘু (উত্তরবঙ্গ)। পুই সারো (ঐ)।

হুতা : সূত্রবৎ শীর্ণ। হুতাটুনি (মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম) : ছোটো টুনটুনি।

এ ছাড়া, সরাসরি 'ছোটো' শব্দ প্রয়োগ করেও ক্ষুদ্রার্থ জ্ঞাপন করা হয় : ছোটো বসন্ত। ছোটো বেনে বউ। ছোটো মাছরাঙা। ছোটকি লাটোরা (Bay-backed shrike). 'দুর্গা টুনটুনি' মানে ছোটো টুনটুনি, তবে কি 'দুর্গা' শব্দ এখানে ক্ষুদ্রার্থক? তেমনি বৃহদর্থে 'বড়ো' শব্দ পাই : বড়ো দিঘর (pintail Duck) বড়ো পাত্রিঙ্গা। বড়ো বসন্ত। বড়ো বেনে বউ।

অন্যান্য শব্দ : গোদা : গোদা চিল, বড়ো চিল। ঢালি : ঢালি বক, বড়ো বক, সুন্দরবন অঞ্চলে। রাম : রামগাংরা (Indian gray tit) রাম ঘুঘু। রাম চকা : বড়ো চক্রবাক (?)। রাম ঝংকার : সোনা জঙ্ঘা। রামসর (ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল')। রামশালিক (Black-necked stork), (মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল')। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও সম্ভাষণে কুক্কুট অর্থে 'রামপাখি' খুবই ব্যবহৃত হয়।।

১০···
দৈহিকবর্ণও পাখির নামকরণের মূলে রয়েছে। সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

অসিতগ্রীব : ময়ূর। অসিতাপাঙ্গ : চকোর। কপিঞ্জল : "কপিরিব ঈষৎ পিঙ্গল," গৌরতিতির, তিত্তিরি, চাতক প্রভৃতি। কাগজী : কাগজের মতো সাদা পারাবত। কাজলা, কাজলী, কাজুলী (S'aty-headed parakeet) : মূলতঃ কজ্জলাভ, শুক জাতীয় পাখি বিশেষ। মতান্তরে, মদনা বা ময়না। উড়িষ্যায় কাজলিপাতি : ফিঙে। কাজলা লাটোরা : হিন্দীতে Shrike বিশেষ। কাজলা-ভোমরা : মধুপায়ী ছোটো পাখি বিশেষ।

কাল : কোকিলের বিশেষণ। কালিক : কাল+ইক, ক্রৌঞ্চ, কোঁচ বক। কালো কটকটে (Indian Black-necked-Fly-catcher). কালো তিতির (Black partridge). কালো দোচরা (Black Ibis). কালো বগলা (Indian Reef Heron). কালো বুলবুল (Common Bulbul). কালো পাপিয়া (pied crested Cuckoo).

কৃষ্ণ : কাক, কোকিল। কৃষ্ণ সারিকা : সারিকা বিশেষ। খয়রা, খয়রা, বগলা : বক বিশেষ। জরদ ফুটকি : <জরদ+ফুৎকি। দুধরাজ : শা বুলবুল। দুধিয়া লাটোরা বা সফেদ লাটোরা (Grav Shrike, হিন্দী)। ধলি বগা (চট্টগ্রাম) : ধলা বক<ধবল। ধূসর : কপোত। ধৌলি ফিঙে (white-bellied Drongo), হিন্দীতে ধাপুরি।

নীল কটকটে (Blue Fly-catcher, নীল বগলা (Black Bitten). নীল মোর (Monal Pheasant). নীল শর (Mallard). নীলকণ্ঠ : খঞ্জন, চকো, টেসকোনা, দাত্যূহ, ময়ূর। নীলকান্ত : হিমালয়ে মেলে, খুব উঁচুতে ওঠে, ম্যাগপাই জাতীয়। নীলক্রৌঞ্চ : নীল বক। নীলাঙ্গ (বহুব্রীহি) : নীল সারস।

পড়া মুনিয়া : পোড়া দাগ আছে যার। পোড়া সারো (উত্তরবঙ্গ) : সারিকা বিশেষ। পিঙ্গলা (বিহার) : সংস্কৃতে পিঙ্গলা, প্যাঁচা বিশেষ। পিলামন : হলুদরঙের Lapwing জাতীয়। বভ্রু : 'পিঙ্গলবর্ণ', কপিঞ্জল, চাতক।

মাটিয়া ঘুঘু (উত্তরবঙ্গ) : মাটি রঙের ঘুঘু। মাটিয়া লাটোরা। মাট্যা ঘুঘু (রাজশাহী)। মেটে চিল (পশ্চিমবঙ্গ)। রক্তকণ্ঠী জীবঞ্জীব (Blood Pheasant). রাঙ্গারায়মণি (ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গল')।

লাল গৌড়িয়া (Cinnamon Sparrow). লাল ঘুঘু, গোলাপি ঘুঘু (Red Turtle dove). লাল বক. লাল বিগুরি (white-eyed pochard). লাল ময়না (যশোর-খুলনা)। লাল মাছরাঙা (Ruddy Kingfisher). লাল মুনিয়া (Indian Red Munia). লালমোহন : মাথা-লাল টিয়ে বিশেষ। লালশর, লালশির (Pink-headed Duck). লাল 'আড়া' (উত্তরবঙ্গ) : লাল 'আড়া'।

শিতিকক্ষী (তৈত্তিরীয় সংহিতায় [৫ ৫/২০] এর উল্লেখ আছে) : যার কক্ষদেশ শ্বেত বর্ণ, এক ধরনের গৃধ্র। শুক্ল বায়স : শ্বেতকাক, বক। শ্বেত কুল্যা (সুন্দর বন) : <শ্বেত+কুরর+ইয়া। শ্বেত গরুৎ : "শুক্লপক্ষ যুক্ত," হংস। শ্বেতচ্ছদ (বহুব্রীহি) : 'শ্বেতপক্ষ' হংস। শ্বেতপত্র : শ্বেত হংস। 'শ্বেত ফরিত' 'শ্যাত ফরিত' (উত্তরবঙ্গ) : <শ্বেতপত্র। শ্বেতরাহিত : গরুড়। শ্যাম : কোকিল, কৃষ্ণসারিকা। শ্যাম ঘুঘু। সাদা দোচরা (white Ibis). সিতকণ্ঠ : দাত্যূহ। সিতচ্ছদ, সিতধ্বজ : হংস। সোনাচড়া, স্বর্ণচাতক : চাষ, চাস। সোনামুখী দইয়ল (মৈমনসিংহগীতিকা)।

হরিতাল, হরিতালক : >হরিয়াল, হরেল, হিন্দী হারিল। হরি (পীতবর্ণ), তা৭ তাল (প্রতিষ্ঠা) যাতে, বহুব্রীহি। নামান্তর : হারীতপক্ষী, হরীতক। মূর্ধন্যীভবনের ফলে হৈট্টাল (জলপাইগুড়ি)। হরিৎবসন্ত (Common Indian Green Barbet).

হলদে পাখি। হলুদ পাখি। হলদিয়ারাম, হলদিগ্রাম (জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-রঙপুর-দিনাজপুর)। হলদিবনা (রাঢ়ে), হলদিয়া (জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল')। হলুদগুড়ো (মেদিনীপুর)। হলুদকুটুম (মধ্য বাঙলা)। হলুদিয়া পক্ষী (ঢাকা), হলেদ্যা চরৈ (চট্টগ্রাম), হোলদিআম (জলপাইগুড়ি)। অলদি পক্ষী, অলুদ পাখি (পূর্ববঙ্গ)। উড়িষ্যাতে, হলদিয়া বসন্ত। হলুদে বসন্ত (Barbet). হিন্দী, পিল্লক, জর্দক। উত্তর বিহারের সারণ জেলাতে : পিরোতা।

হীরামন, হীরেমন, হীরেমন তোতা । <হরিৎ+মদন। পুরুষ কাকাতুয়ার রঙ সবুজ হয় বলে বলা হয়, হীরামোহন<হরিৎ+মোহন ॥

১১

খাদ্য অনুযায়ী পাখির নামকরণের নিদর্শন এই :

অনম্বু : চাতক। অস্থিভক্ষ : হাড়গিলে। অহিভুক : ময়ূর। আমিষ-প্রিয় : কঙ্ক। ক্রব্য ভোজন : গৃধ্র। ক্রব্যাদ্, ক্রব্যাৎ (মাংস ভক্ষক) : শ্যেন।

গুয়েন্যাকড়া, গুয়েন্যেকড়ী (চব্বিশ-পরগণা) : বিষ্ঠা-কীটপ্রিয় শালিক, বিট্-সারিকা। গুয়োশালিক (পূর্ববঙ্গ)। গুবরে শালিক, গোবরে শালিক : শুকনো গোবর উল্টে পোকা খায় বলে এই নাম। গৃহবলিভুক্ : কাক, চটক, বক ইত্যাদি। চকোর : চন্দ্রকর পান করে বলে কল্পিত। তুতী : ফারসি শব্দ। কিন্তু Folk-etymology : শীতকালে এদেশে তুঁতে ফল খেতে আসে বলে এই নাম। দাড়িম্বপ্রিয়, দালিম প্রিয় : শুক। নাগাশন (বহুব্রীহি) : গরুড়, ময়ূর।

পুষ্করসদ (বাজসনেয়ি সংহিতায় [২৪/৩১] এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় [৫'৫/১৪] এর উল্লেখ মেলে) : কমল-খাদক পক্ষি-বিশেষ। ফুলচুকী, ফুলচুকী (হিন্দী).

ফুলটুকী (মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল'), ফুলটুসী (Honey bird): ফুলের মধু খায় বলে এই নাম। কোনো কিছু মাটির থেকে কুড়োনোকে পূর্ববঙ্গে বলে 'টোকানো'। পশ্চিমবঙ্গে 'ফুলটুকী'র মধ্যে কি পূর্ববঙ্গের 'টোকানো' শব্দের প্রভাব আছে? কিংবা ফুলঠুকী (ফুল ঠুকরে খায় যে >ফুলটুকী হওয়াও বিচিত্র নয়। বিট্-সারিকা : <বিষ্ঠাসারিকা। ভাট্শালিক : <ভাত্সালিক। বাউত্তা হাশিক ঢাকা), বাতুইরা হাইল্কা (কুমিল্লা , ভাত্তুয়া ময়না (চট্টগ্রাম) :<ভাত+উয়া, তা।

মচ্ছরিয়া (হিন্দী) : <মক্ষিকা+রিয়া, Fly-catcher. মদ্গু : নিমজ্জমান মাছ খায় বলে এই নাম, পানকৌড়ি। মাচাড়, মাছাড় <মৎস্যাদ, চিল-কুরর জাতীয় পাখি। মাছাড়>মাচাল, মাছাল, মাসাল (খুলনা)। মাসুরা (সিলেট) : <মাছ+উরা। হিন্দী, মাছ-রাঙা, মাছমৌরল। মৎস্যরঙ্ক, মৎস্যরঙ্গ, মৎস্যাশন, মৎস্যাশী, মীনরঙ্ক, মীনরঙ্গ : মাছরাঙা। মাইছরাঙা (ত্রিপুরা)। মাদেরেঙ্গা, মাদেঙ্গা, মাজেঙ্গা (জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রঙপুর)। মাছট্যাংগা (রাজশাহী)। মাস্সুয়া রাণা (চট্টগ্রাম): <মাছ+উয়া+রাণা ('রাজা' অর্থে : মৎস্যরাজ), অথবা রাজা<রাণা। ওড়িয়াতে, 'মাছরঙ্কা' ('রঙ্কু' শব্দের অর্থ 'গরীব', 'রাজা'র ঠিক বিপরীতার্থক শব্দ । মৌটুসী (তুলনীয়, ফুলটুসী), মৌচুষী, মধুচুষকী (রাজশাহী), মধুচুষী (উত্তরবঙ্গ , মধুচুষা : <মধু+চুষ্+কিয়া।

সর্পাশন (বহুব্রীহি) : গরুড়, ময়ূর। শকর-খোরা (হিন্দী) : <শর্করাখোর, মধুপায়ী পাখি বিশেষ। শশঘ্ন, শশঘাতক, শশঘাতী, শশাদ, শশাদন : শ্যেন (শশ : মৃগবিশেষ, খরগোস)।

শামকল, শামুকাল (বগুড়া), শামুককুড়া (রঙপুর), শামুককেঁচা, শামুককেচ্চা (মৈমনসিংহ), শামুকখোর, শামুকভাঙা, শ্যামখোল (মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল'): <শামুক+আল, কুড়া, খোর, ভাঙা। শামুকখোঁচা>শামুককেঁচা, শামুককেচ্চা। শংখোল (খুলনা)<শামুকখোল। হামোক কাসা (কুমিল্লা), হোক্কাসা (চট্টগ্রাম) <শামুক খোঁচা। হাড়গিলা, হাড়গিলে (পশ্চিমবঙ্গ) : হাড় গিলে খায় যে। হাড়-গোরল উত্তরবঙ্গ : <হাড়গিলা+গরুড় - গরুল ॥

…১২…

তেমনি, বাসস্থান ও পরিবেশ অনুযায়ীও পাখির নামকরণ হয়েছে।

অরণ্য : আড়া কেচ্কেচানি (ত্রিপুরা) : <আড়া (অর্থ : ঝোপ-জঙ্গল) কেচ্কেচ্+আনিয়া, ছাতারে। আরণ্য-কুক্কুট। বনকপোত। বন কাউয়া। বন কাক। বনতিতির।

জল : অম্বুকুক্কুট। উদাত্যূহ। কড়া, কড়ুহা (উত্তরবঙ্গ), কোড়া, কোরা, কোত্তা (মারাঠী) :<কোযষ্টিক। কারণ্ডব : <করণ্ড (জল)+ √বা গতি+অ (কর্তৃ)-ক।

কৈরব : 'কে' অর্থাৎ জলে রবকারী হাঁস। জল থেকে কাদার কথা এসেছে : কাদা-খোঁচা (Snipe). কাদোঘুকা (উত্তরবঙ্গ), কাদোচেরেখা (ঐ) : <কর্দমক+ঘুক্ +আ। কাদা-মাটি দিয়ে, ভাণ্ডের আকারে যে নীড় নির্মাণ করে, তাকেই বলে 'ভাণ্ডিক' পাখি।

গঙ্গাচিল, গাংচিল, গাংচিলহা (উত্তরবঙ্গ), গাংচিলা (ঐ) : <গঙ্গা+চিল্ল+আ, হা। গাংচাষা : <গঙ্গা+চষ্+আ। গাংটিটি, গাংটিটিরি (রঙপুর), গাং তিতই (গঙ্গা তিতই), গাংতিতি : <গঙ্গা+তিত্তিরি, মূর্ধন্যীভবন। গাংলি (উত্তরবঙ্গ) : <গঙ্গা+লিয়া। গাংশালিক। গোনর্দ : "জলে শব্দ কারক," সারস।

জলকাক। জলকুক্কুভ। জলকুক্কুট। জলপায়রা। জলপিপি, জলপিঁপি। জলবায়স। "জলমঞ্জরী" : জলপিপি। 'জলমদ্গু'। জলমোরগ। জলরঙ্কু। জলতিতির।

নীরপতত্রী : জলচারী পক্ষিসমূহ। নদীয়া সারো (উত্তরবঙ্গ) : <নদী+য়া+শারিকা (সারিকা)।

পানকৌটি, পানকৌড়ি : <পানিকক্কুট। পানপায়রা : <পানি+পারাবত। পানি-কয়াড়ি (উত্তরবঙ্গ), পানিকাউর (পাবনা), পানিকাউড়ি, পানিকাক, পানিকোয়াড়ি (উত্তরবঙ্গ), পানিখাউড়ি (নেত্রকোণা) : <পানকৌড়ি। পশ্চিম ভারতে, পানিমুরগী। পানি কুমড়ি (খুলনা, যশোহর)। পানিসিপ্টী (জলপাইগুড়ি) : যে জল 'সাপটে' বেড়ায়। পুষ্করাহ্ব : সারস।

বালিহাঁস, বেলেহাঁস : <বারিহাঁস। বাইল্যা আস (পূর্ববঙ্গ)। বিলমোরগ। বিলসোনা।

সমুদ্র কাক। সরসিক : <সরস+ইক, সারস। সরঃকাক : <সরঃ+কাক, হংস। সলিল বায়স। সারস : সরঃ অর্থাৎ জলাশয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সিন্ধু শকুন। pheasant : <'phasis' নদী থেকে।

গাছ, ফল, তৃণ : আম পাখি (Mango bird) : ইউরোপীয়গণ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর ভারতের 'বউ কথা কও' পাখির নাম, যেহেতু আম পাকবার সময় এ পাখির ডাক শোনা যায়। কলাপাখি (বাখেরগঞ্জ) : সবুজ রঙের পাখি বিশেষ, উলুধ্বনির মতো ডাক। কাঠ-কোটারিয়া (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে), কাঠ-কেঠোরিয়া, কুটরীয়া, কুঠুরে : <কাঠ+কোটর+ইয়া। কাঠঠোকর (খুলনা), কাঠঠোকারে (পাবনা)। কুটুরে প্যাঁচা, কুটুরে শালিক : <বৃক্ষ কোটর+ইয়া। কাশীবগুলা (উত্তরবঙ্গ) : কাশের মতো শুভ্র বক। খুটাকাটা, খুটাকাটী, খুটাকাটু (জলপাইগুড়ি, রঙপুর, দিনাজপুর) : <কাষ্ঠ খুটা+কাট্+আ, ঈ, উ, কাঠঠোকরা। খুরুলি (সিলেট), খুরুলে (খুলনা) : <খোড়ল (গাছের গর্ত, কোটর)+ই, ইয়া, হুতোম প্যাঁচা। গাছ কুরাইল্যা (ঢাকা), গাছ কুরুলে (খুলনা) : <গাছ+কুড়াল+ইয়া, কুঠারসদৃশ চঞ্চু দিয়ে যে গাছ কাটে, কাঠঠোকরা। তালচঞ্চু, তালচটক, তালচাটা, তালচোঁচ (pulm swift) : তাল+চঞ্চু, চটক। শুধু 'তালপাখি' নামও মেলে। ধানচড়াই : ধান খেকো চড়ুই। বাঙ্গাটুনি (চৈতন্যচরিতামৃত) : <বার্তাকন, বেগুন+টুনি। বাঁশ ঘুঘু : বাঁশবনে বসবাসকারী ঘুঘু। রোপণাকা (ঋগ্বেদে [১/৫০/১২] এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে [৩. ৭.

৬. ২২] এই নাম পাওয়া যায়) : 'যে বাসা নির্মাণের জন্য তৃণ উপড়োয়,' বাবুই। লাউজালি (গোপীচন্দ্রের গান)।

গোরু : গাই-দোয়েল (বগুড়া)। গাইবক, গাইবগলো, গো বক, ধেনু-বক : Cattle Egret. গো-ভাগাড়ে শকুন। গো-সাদি (বাজসনেয়ি সংহিতায় [২৪/২৪] এর উল্লেখ মেলে) : গো, গরু ; 'সাদি', যে বিশ্রাম দেয়, উপবেশন করায়, শালিক।

গ্রাম, গৃহ : গরচা'রা (ঢাকা) : ঘরচড়ুই (?)। গৃহ-কপোত। গৃহবাজ (Turtle Pigeon). 'গৃহবাজ'কে অনেকে বলেন, 'গিরিবাজ'<গিরি (পাহাড়) + বাজ (শ্যেন)। 'গিরিয়াবাজ'ও শোনা যায়। তবে অধিকাংশই মনে করেন,, গিরি, গেরো<গৃহ, গৃহপালিত পারাবত বিশেষ। গৃহ-কুক্কুট। গৃহ-শুক : ক্রীড়ার্থে পালিত শুক। গ্রামকুক্কুট। শনচড়া (চট্টগ্রাম), শাইনচড়া (সিলেট, বাখেরগঞ্জ) : ঘরের চালের 'শণ' + চটক।

ধুলো, মাটি : ধুলাচটা, ধুলাচাটা, ভরতপাখির গোত্রের ; পুরুষদের রঙ কালো হয় বলে এই নাম হয়। মাটিয়া সারো (উত্তরবঙ্গ) : সারিকা বিশেষ। মাট্যা ঘুঘু। মেটে চিল।

বসন্ত : বসন্তকোকিল : সর্বাঙ্গে শ্বেতবিন্দুযুক্ত কোকিল বিশেষ। বসন্তরোগের গুটিকা এবং বসন্তকালে কোকিলের আগমন, এই দুই দিক এখানে মিশে গেছে। বসন্তবউ (ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গল'), বসন্তবউড়ি, বসন্তবউরি :<বসন্ত + বধূ + টি, Crimson breasted Barbet, Copper smith. 'বসন্ত-গুড়গুড়ি'ও পাওয়া যায়। রাঢ়ে : কুক্-বসন্ত। বসন্ত-গায়ক : বসন্তকালের গায়ক কোকিল। বসন্ভেড়, বসন্তভাট, বসন্তভেড় : বসন্তকালের 'ভাট' বা গায়ক, পালক সবুজ, গেরুয়া মাথা, গায়ক পাখি বিশেষ। বসন্তসখ, বাসন্ত : কোকিল।

রাত্রি : তামস, নিশাট : পেচক।

শ্মশান : যমকুলি : <যম + কোকিল। শ্মশান কুলি ॥

১৩·

পাখির ওড়বার ভঙ্গি ও বিশিষ্টতা থেকেও পাখির নামকরণ করা হয়েছে।

অলিক্লব (অথর্ববেদে [১১/২/২/ ; ১১/৯/৯] এর উল্লেখ মেলে) : যে অলির মতো গমন করে, কোকিল (?)। এই রকম : জাঙ্ঘমদ : 'যার দ্রুতগতি আছে'।

ওখোলিয়া চম্‌কো (দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি) : <রাখাল + ইয়া + চমকা, ঝোপঝাড়ে চুপ করে বসে থাকে, কেউ নিকটে এলে (রাখালদেরই আসতে হয় বেশি) হঠাৎ ওড়ে, সে চম্‌কে ওঠে। 'নোখোলিয়া চম্‌কা' নামও শোনা যায়। নামান্তর : 'খেরুপী', মূর্ধন্যীভবনে, 'ঢেরুপী'। 'ভড়কা' (যা মানুষকে 'ভড়কে' দেয় ?) বা,

বনচাহা (Solitary snipe) সম্ভবতঃ এই পাখিই। 'ওয়াক্' বা 'কোয়াক' বক : ওড়বার সময় এই ধরনের আওয়াজ হয় বলে।

কপোত : 'ক' (বায়ু) তার পোত-তুল্য, পোত যার, বহুব্রীহি। গগনবেড় (Pelican) : গগনবেড় দিয়ে চক্রাকারে ওড়ে, তাই এই নাম। সংস্কৃতে বলে 'প্লব'। যোগেশচন্দ্র রায়-বিদ্যানিধি মশাই এ পাখিকে বলেছেন, 'গগনভেরী' (বাঙ্গালা শব্দকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২০)। সত্যচরণ লাহা এর প্রতিবাদ করেছেন ('জলচারী', ১৯৩৫, পৃ. ৮৮)। গরুড় : 'যে গুরুভার নিয়ে উড়েছিল'। চক্রবাক্ : চক্রাকারে উড়ে 'চক্র' শব্দ উচ্চারণ করে যে। চাকদয়াল বা চাখদয়াল : <চক্র। ভালো নাচে বলেই কি একে 'নাচন' বলে ?

বাতাসী (Swift) : বাতাসে পাখা না কাঁপিয়ে ভেসে বেড়ায় যে, বাতাসের সঙ্গে মিতালি যার, বাতাসের মতো দ্রুতগতি যে। বাচ্‌কা : ওড়বার সময় এই আওয়াজ হয় বলে। ভুঁইদম্‌কা (জলপাইগুড়ি) : <ভূমি + দমক্ + আ, ল্যাজ দিয়ে ভূমিকে 'দমন' করবার চেষ্টা করে যে, খঞ্জন। লাটকন, লাটকুনা (মেদিনীপুর) : এটি হিন্দী নাম। রাত্রে বেলায় গাছের ডালে পাখা দিয়ে 'লট্‌কে' (ঝুলে) থাকে, তাই এই নাম।

ইংরেজিতেও এই ধরনের নামকরণ মেলে Red Start : (হিন্দী থির্‌থিরা) : ওড়বার সময় পুচ্ছদেশের লাল অংশ বেরিয়ে পড়ে বলে ॥

···১৪··

পাখির গায়ের রঙ, তার আকৃতি-প্রকৃতি ও কণ্ঠস্বর, তার অভ্যাস ও আচরণ ইত্যাদির সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করে মানুষ পাখির নামকরণ করেছে। এর মধ্যে Folk psychology-টিকে বেশ ভালো করেই বোঝা যায়। মানবিক গুণ ও ভাব আরোপের প্রয়াস এর মধ্যে খুব বেশি। এই ধরনের কিছু উদাহরণ পূর্বে প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যেও দেখা যাবে। কাজেই এখন যে উদাহরণ দিচ্ছি, তার মধ্যে কিছু-কিছু পুনরুক্তি দেখা দিতে পারে।

কাজলভমরা (উত্তরবঙ্গ) : কাজলের মতো কালো এবং ভ্রমরের মতো ছোটো ও কালো পাখি বিশেষ। কাজলা, কাজলি, কাজুলি প্রভৃতি। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

কাট্‌টল পাগ, কাট্‌টল পাগানী ; কাঁঠাল পাইখ, কাঁঠাল পাখি (পূর্ববঙ্গ) : পাকা কাঁঠালের মতো রঙ যে পাখির, এবং কাঁঠাল পাকবার সময় যার ডাক শোনা যায় বেশি, 'বউ কথা কও' পাখি। কাঠকুড়ুলে (খুলনা), কুড়ুলের মতো ঠোঁট দিয়ে গাছ কাটে যে, কাঠঠোকরা। 'কুড়াইব্যা', 'গাছ কুড়াইল্যা' প্রভৃতি একই অর্থে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কাদোখোঁচা, কাদোখুকা (উত্তরবঙ্গ) : কাদা খোঁচায় যে, কাদাখোঁচা। কাস্তেচরা, কাস্তেচোরা, কাচিচোরা (পূর্ববঙ্গ) : কাস্তের মতো গলা বাঁকা যার, বক। কোটওয়াল, কোতোয়াল (দক্ষিণ ভারত) : কোটাল বা পুলিশের মতো অন্যান্য পাখির ওপর যে খবরদারী করে, ফিঙে।

খুন্তেবক (Spoon bill) দর্বিদা, চামচবাজা, প্রভৃতির জন্যে পূর্বে দ্রষ্টব্য। ঠোঁট খুন্তী বা চামচের মতো বলে এই নাম। গয়লাবুড়ী : জবুথবু হয়ে বুড়ীর মতো বসে থাকে বলে, ছোটো বসন্তবউরি। গাং-চষা (Indian Skimmer) : এর ঠোঁট যেন লাঙলের মতো নদী 'চাষ' করে মাছ তুলে নেয়। গোদাচিল : পালকের প্রাচুর্য হেতু মনে হয় পায়ে 'গোদ' হয়েছে, তাই বড়ো দেখায়। চন্দনা, চন্দনীয়া : সর্বাঙ্গে চন্দনের ছিটেযুক্ত বলে মনে হয়। গুপীগলা, নেপালী ভাষায় 'গানগুলা' : গোপদের মতো গলায় পৈতের দাগ থাকে বলে এই নাম। গলারাখি (রাঢ়ে)।

চোজভরা : <সূঁচ + ভরা, বাবুই। বাবুই যেন সূঁচ দিয়ে (ভ'রে) তার বাড়ি তৈরি করে। ইংরেজিতে এইজন্যে বলে 'Weaver bird', (ঠিক যেন ঠোঁট দিয়ে পাতা সেলাই করে টুনটুনি বাড়ি তৈরি করে বলে তাকে বলে 'Tailor bird'). ছুতার পাখি, সুতার পাখি (মারাঠীতে) : <সূত্রধার, কাঠ কাটে বলে কাঠঠোকরা পাখিকে বলে।

'ঢাডোয়া' (জলপাইগুড়ি) : <সং ঢুনড্ + উয়া, অন্বেষণ করবার জন্যে যে মানুষের মতো পা-পা করে হাঁটে, শালিক।

ঢেঁকিল্যাজা : ঢেঁকির মতো পেছনে চওড়া ল্যাজ যার, হাঁড়ী চাঁচা।

'তিল' : যেসব পাখির গায়ে spot বা বিন্দু-চিহ্ন থাকে সেগুলিকে 'তিলে'র সঙ্গে উপমিত করা হয়। উদাহরণের জন্যে পূর্বে দ্রষ্টব্য। ত্যালসারো (জলপাইগুড়ি) : <তৈল + সারিকা, মাথায় ঝুঁটিঅলা, 'তিল' চিহ্নযুক্ত এবং তৈলচিক্কণ পাখি বিশেষ। ত্রিশূল (Pintail Duck) : রঙ সাদা ও ধূসর, মাথায় বাদামী রঙের ত্রিশূলবৎ চিহ্ন আছে, দিক্ হংস।

দইয়ার, দইয়াল, দবিয়ল দরিয়াল : <দধি + আল, দয়েল। দহিয়াল <দধিয়াল। দধিকুল (ঢাকা) : <দধি + কোকিল। দইখল, দইগল। দোয়েল পাখির গায়ের সাদা অংশকে দইয়ের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। দগ্ধকাক : দ্রোণকাক। পোড়া রঙ যেন। দুদবগা (মৈমনসিংহ) : দুধের মতো সাদা বক। দুধরাজ (সুন্দরবন) : সাদা, সরু ল্যাজ, ছোটো পাখি বিশেষ।

ধোবিন্ (Wag-tail) : খঞ্জন। জগদানন্দ রায় লিখেছেন : "…ইংরাজীতে ইহাদের "লেজ-নাড়া" পাখি বলে এবং হিন্দুস্থানীরা বলে "ধোবিন্"। ধোবারা যেমন কাপড় আছড়ায়, এই পাখিরা সেই রকমে লেজগুলোকে উঁচু নীচু করিয়া নাচায় বলিয়া তাহাদের ঐ নাম হইয়াছে।"—পৃ. ৩৪। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ সরকার অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "অনেক সময় নদী বা ঝিলের ধারে ধোপারা যেখানে পাটার উপর কাপড় কাচে, তাহার নিকটে কাচার সময় ইহাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এইজন্যই বোধহয় হিন্দীতে ইহাদের ধোবিন্ বলে।"—পৃ. ২১১।

নরুণচেরা : বাঁশপাতি। ল্যাজ যেন নরুণ দিয়ে চেরা (?)। নলঘাগ বগুলা (উত্তরবঙ্গ) : কাঁক। খাগ>ঘাগ। নল খাগের মতো দীর্ঘ গ্রীবা যার। নলঘোগা (সুন্দরবন) : পূর্বে দ্রষ্টব্য।

পোড়াসারো (জলপাইগুড়ি) : <পোড়া + সারিকা, শালিক। ঘাড়ের ওপর ঘন কালো অংশ দেখে মনে হয় পুড়ে গেছে।

বাঁশপাতা, বাঁশপাতী (Indian bee-eater): (ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গলে')। বাঁশ-পাতার মতো দেখতে বলে পাখিটির এই নাম হয়েছে। 'বাঙ্কুয়া পোখি': (জলপাই-গুড়ি)। নামান্তর: 'হোকল কলকলী'। এ পাখি যখন উড়ে যায়, তখন মনে হয় বাঁশের বাঁকে করে কে যেন ভার বহন করে চলেছে।

বিস কণ্ঠিকা: 'বিস' অর্থাৎ মৃণালবৎ কণ্ঠ যার।

বুড়ীপাখি (Purple Moorhen): কাম বা-কায়েম পাখি।

ভরত, ভরদ্বাজ: বনফুল লিখেছেন, এ পাখি দেখতে "অনেকটা বাঘের গায়ের মত। তাই বোধহয় সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্রাট।"

মাণিকজোড়: দুটি পা এক জোড়া মাণিকের মতো লাল বলে। দৈহিক বিশেষত্বের জন্যে ইউরোপীয়রা এ পাখিকে গোমাংসের লম্বা ফালি বলেন: 'The Beef-steak bird."

রক্তদৃক্, রক্তদৃশ্, রক্তদৃষ্টি: কপোত। চোখ লাল বলে। রক্তপাদ, রক্তপাদী: কাদম্ব, শুক প্রভৃতি।

লোহার জং: Stork বিশেষ, কৃষ্ণকণ্ঠ, পা লাল। লোকনিরুক্তি: লোহাতে যেন 'জং' বা মরচে ধরেছে। কিন্তু জং<জংঘা।

শংখচিল, শাঁকচিল, শাঁখচিল: শংখের মতো শুভ্র বলে।

শাঁখারি মুনিয়া: White breasted Munia.

শাহ্ বুলবুল, শা-বুলবুল (Paradise Fly-catcher): স্বর্গীয় বা রাজকীয়, শোভাময় পাখি। 'শাহ্' (ফারসি): রাজা, সম্রাট। শা-বাজ, শাহী-বাজ ইত্যাদিও পাই।

সন্ন্যাসী পাখি (চট্টগ্রাম): পিঠের অর্ধেক অংশ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত ছাইরঙ, চোখ হলুদ রঙের, মাথায় ঝুঁটি আছে। জঞ্জালের মধ্যে সমস্ত শরীরটি ঢুকিয়ে দিয়ে কেবল মুখটি বের করে থাকে। যখন জঞ্জাল থেকে বের হয়ে আসে, তখন সন্ন্যাসীর মতো দেখতে লাগে। সন্ন্যাসীরা গেরুয়া বসন পরে এবং গায়ে গঙ্গামাটি দেয়। এই পাখিগুলোকেও তেমনি লাগে। একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে।

সাত ভাই, সাত ভাইয়া, সাত ভাইরা, সাত ভেয়ে, সাতসতী, সাত সয়ালি (Seven sisters): পাঁচ-সাতটি পাখি একত্র থাকে বলে তাদের সাত ভাই, বোন বা সতীরূপে কল্পনা করা হয়। ছাতারে পাখি।

Cinnamon sparrow: দারুচিনির মতো দেখতে বলে, লাল গোঁড়িয়া।

সিপাহী বুলবুল: সিপাহীদের মাথায় যেমন লাল পাগড়ি থাকে, এই পাখির লালঝুঁটি দেখে তাই মনে হয়।

সুঁইচোনা (জলপাইগুড়ি), সুঁইচোরা, সুঁইপাখি: ল্যাজ সুঁচের মতো সরু বলে এই নাম। পূর্ববঙ্গে সুঁচবাওই: বাবুই বিশেষ। ওড়িয়াতে 'ছুঁচমুনিয়া': টুনটুনি।

স্যাকরা পাখি (নদীয়া): বসন্তবাউড়ী। এদের ডাক শুনে মনে হয় স্যাকরা টুকটুক শব্দ করে গয়না তৈরি করছে। ইংরেজী: Coppersmith bird.

স্বর্ণচাতক, সোনাচড়া : চাষ বা চাস পাখি। স্বর্ণবৎ রঙের জন্যে এই নাম।

লায়ারবার্ড (Lyre-bird) পুচ্ছদেশ বীণাযন্ত্রের মতো বলে।

হাইড়্যাকুলি (পূর্ববঙ্গ): হাঁড়ীচাঁচা। <হাঁড়ী+ইয়া+কোকিল। এর ডাক শুনে মনে হয় কেউ হাতা দিয়ে হাঁড়ী চাঁচছে। কখনো মনে হয় হাতা দিয়ে হাঁড়ী 'খোঁড়া' হচ্ছে। এইজন্যে নাম হাঁড়িখুঁড়ি, আড়িকুড়ি (নোয়াখালি)। কখনো মনে হয় হাতা দিয়ে হাঁড়ী 'ঘষা' হচ্ছে। জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গলে'র 'দেবখণ্ডে' পাই: 'হাঁড়ি ঘসা'। হাঁড়ির প্রতিশব্দ 'পাতিল' বলে পূর্ববঙ্গে মেলে, 'পাতিল চাঁচা'।

এ ছাড়া পাখির দৈহিক আকৃতি ও বর্ণ নিয়েও অনেক উপমান-উপমিত দেখা যায়॥

·১৫·

কতকগুলো পাখির নামের মধ্যে এক-একটি গুণ বা ভাব বা ইতিহাস ধরা পড়েছে। কয়েকটি উদাহরণ এই:

ভক্তিভাব ও পৌরাণিকতা অনেক পাখির নামকরণে ক্রিয়াশীল হয়েছে। টিয়া, ময়না, শালিক ইত্যাদি পাখিকে 'আত্মারাম' এবং 'গঙ্গারাম' বলা হয়। ভক্তের 'আত্মা সদৃশ' রাম, কৃষ্ণ, গঙ্গা ইত্যাদির নাম এসব পাখি সর্বদা উচ্চারণ করে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। পূর্ববঙ্গে একটি পাখির নাম 'রাধামাধব' হলুদ পাখি বা চন্দ্রগোকুল (oriole) পাখির নামান্তর 'কৃষ্ণগোকুল' পাখি। এ পাখির ডাকে যে ভাষা আরোপ করা হয়েছে, তা এই: 'কৃষ্ণ গোকুলে'। অবশ্য, মাঝে মাঝে বিপরীত উক্তিও মেলে। যেমন রাঢ়ে, 'কৃষ্ণের পোকা হোক'। রাজশাহীতে এক ধরনের পোষা পারাবতের শ্রেণীর নাম 'গোবিন্দ'। এক ধরনের চিলকেও পক্ষিবিশারদরা 'গোবিন্দ' আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'শংকর চিল', 'চণ্ডীচিল' (চণ্ডীর বার্তাবহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর), 'ঠাকুর চিল' (হাওড়া), 'ফতাচিল' (আরবি ফাতিহা। বাঙলায় অন্যত্র ফয়তা="পীর প্রভৃতির কাছে প্রদত্ত পূজার উপচার" কোরাণের প্রথম অধ্যায় বা 'সুরত: প্রার্থনা। মৈমনসিংহ) প্রভৃতি নাম লক্ষ করবার। 'ব্রাহ্মণী চিল,' 'বামুন শকুন', 'বামুন পাখি' (খুলনা, যশোহর) প্রভৃতির মধ্যে দেবত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব আরোপিত। 'বনফুল' 'ব্রাহ্মণীময়না'র নাম উল্লেখ করেছেন। ইংরেজিতে Brahminy Duck, Brahminy Myna বলার রেওয়াজ আছে। 'ব্রাহ্মণীচিল'কে সংস্কৃতে বলে 'ক্ষেমংকরী', যা দুর্গার নামান্তর। চিল বিশেষকে 'ভগদত্ত' বলা হয়, যিনি একজন পৌরাণিক রাজা ছিলেন। ছোটো বসন্তবউড়ীর নামান্তর হল—'ভগীরথ'।

তাপস যেমন একাগ্রভাবে তপস্যা করে চলেন, মাছ ধরবার জন্যে বকও তেমনিভাবে বসে থাকে। এইজন্যে বককে 'তাপস' বলে। 'তপস্বী' বলতে চটক পাখিকেও বোঝায়। গেরুয়া রঙের বলে চট্টগ্রামের পাখি বিশেষের নাম 'সন্ন্যাসীপাখি'। কারণ্ডব-কে পশ্চিমে বলে 'বাবাজী'।

বিশেষ এক ধরনের পায়রাকে পূর্ববঙ্গে বলে 'জালালী পায়রা' বা 'জালালী কৈতর।' 'জালাইল্যা পায়রা' বা শুধুই 'জালাইনা' (পাবনা) নামও পাওয়া যায়। প্রখ্যাত সাধক শাহ্ জালাল-এর সঙ্গে আরব দেশ থেকে এ পায়রা এদেশে এসেছে বলে বিশ্বাস থেকে এ নাম হয়েছে। আরবি 'জালাল' শব্দের অর্থ হল 'দিব্য'। 'হোসেনী বুলবুল' নামও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য।

কাঠঠোকরা জাতীয় এক ধরনেব পাখিকে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে বলে 'সহদেব পাখি'। কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চু ও চরণযুক্ত গেঁড়িহাঁসকে সংস্কৃতে বলে 'ধার্তরাষ্ট্র'। দুটি নামের মধ্যেই মহাভারতের অনুষঙ্গ আছে। তেমনি, রামায়ণের অনুষঙ্গ পাই এখানে : জাটাই, জাটাউ, জটায়ু, যার আয়ু জট (সংহত ও প্রচুর), বহুব্রীহি। গরুড়কে 'কাশ্যপ নন্দন' বা 'কাশ্যপেয়' বলাতে পৌরাণিক প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়েছে। তেমনি কাককে 'শক্রজ' বলাতে। ছোটো বসন্তবউরিকে 'ভগীরথ' বলে।

পৌরাণিক বা কিংবদন্তীমূলক কাহিনীকে স্মৃতি রূপে রেখে পাখির নাম নির্দেশ করবার প্রবণতা ইউরোপেও দেখা যায়। যেমন : ইউরোপের কোনো কোনো অঞ্চলে কাঠঠোকরাকে বলে, 'Birds of Madonna'. গ্রীসে ময়ূরকে বলে, 'Avis Junonia'—দেবী জুনোর প্রিয় পাখি বলে।

দেব-দ্বিজ প্রসঙ্গের বিপরীতে পাই এই নামগুলি : ডোমচিল, ধাঙড় চিল ইত্যাদি। ধনেশ পাখি খুব বেশি পরিমাণে খেতে পারে বলে একে বলা হয়েছে : 'Pigs of the bird class'. চিল বিশেষকে রংপুরে বলে 'ধোপানি চিলা'। হিন্দীতে একে বলে 'ধোবিয়া চিল'। বসন্তবউরিকে বলা হয়েছে 'স্যাকরা পাখি।'

কোনো কোনো পাখিকে চতুর, কাউকে বা বোকা বলা হয়েছে। চোরপাখি ⟨.চতুর ? 'মেধাবী' বলতে শুক, সারিকা প্রভৃতি পাখিকে বোঝানো হয়ে থাকে। পাখি বিশেষের নাম 'ডোডো' (মাদাগাসকার, নিউজিল্যাণ্ড)। পোর্তুগীজ ভাষায় 'ডোডো' শব্দের অর্থ 'হাঁদারাম'। অত্যন্ত সহজেই এ পাখিকে ধরা যায় বলে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। আজ এ পাখি লুপ্ত। প্যাঁচার আকৃতিগত গাম্ভীর্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক লক্ষ করে কুটুরে প্যাঁচাকে ইংরেজীতে বলে : 'Wise owl'. 'রসিক' বলতে সারসকে বোঝায়।

আবার কখনো 'নিষ্ঠুর বলে কল্পনা করে 'ক্রূর' বলতে শ্যেন ও কাঁক পাখিকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'খর' শব্দে কাক, কাঁক ও কুররকে বোঝায়। কখনো প্রেমিক : 'কোক'.—যে বিচ্ছেদ গ্রহণ করে।

কোনো কোনো পক্ষিনামের মধ্যে চৌর্যবৃত্তির কথা আরোপিত হয়েছে : কংকণ-হারিকা (Ibis bill). কাঁচিচোরা, কাস্তেচোরা (তুলনীয় : 'কাচিয়াতোরা')। সুঁইচোরা। জলপাইগুড়িতে মেলে 'সুঁইচোনা'। হাঁড়ীচাঁচার নামান্তর 'টাকাচোর'। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে' (বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৫১) পাওয়া গেছে : 'নাছচোরা'। চোর পাখি (Nut hatch).

কোনো পাখিকে 'অন্ধ' বা 'কানা' বলা হয়। যেমন, 'অন্ধকাক' : পানকৌড়ি। 'আন্ধা বগ্‌লা'। কানা বগ্‌লা। কানী বক। কানা কুকা। কানা কুহা (পাবনা)।

কানা কোকা (ঢাকা)। কানা>ক্যালা, ক্যালাকুকা (রাজশাহী)। কানা হরালি (<শারালি)। 'অবশ্য 'কানা' শব্দের সঙ্গে যোগ থাকাও সম্ভব, পূর্বেই তা বলেছি।

পাখির সাহস ও মমতার কথাও এই প্রসঙ্গে ওঠে। ভীরু পাখিকে শৌর্য প্রদর্শন ক'রে রক্ষা করে কোটালের মতো, তাই ফিঙেকে বলে 'কোটওয়াল' বা 'কোতোয়াল' পাখি। stork-এর মমতা অসাধারণ। তরুণ পাখিরা বৃদ্ধ ও বয়স্ক পাখিদের বহন করে নিয়ে যায়। হিব্রুভাষায় stork শব্দের অর্থ হল Mercy বা pity. ইংরেজীতে শব্দটি এসেছে গ্রীক 'Storage' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল Natural affection. সুইডেনের লোকবিশ্বাস এই : যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন এ পাখি 'Styrka' অর্থাৎ 'Strengthen' বলে যিশুকে শক্তি ও ধৈর্য নিয়ে যন্ত্রণা সইতে বলে : তার থেকেই পাখিটির নাম হয় 'Stork'.

সুইডেনের লোকেরা বলে, আবাবিল বা swallow পাখি যিশুকে বলেছিল, 'Svala' অর্থাৎ 'Console' ; তার থেকেই এ পাখিকে সুইডেনে বলে 'The bird of consolation.'

পাখির জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটিত কয়েকটি নামকরণও এই সঙ্গে মনে পড়ে। বাদুড় অণ্ডজ নয়, স্তন্যপায়ী ; অথচ উড়তে পারে, এই অর্থে পাখি। উত্তরবঙ্গে বাদুড়কে এজন্য বলা হয় 'আ-ডিম্মপক্ষী'। ধ্বাঙ্ক্ষপুষ্ট, পরপুষ্ট, পরভৃত : কোকিল। বলিপুষ্ট, বলিভুক্, বলিভোজন : কাক।

কয়েকটি পাখির নামকরণ থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় এগুলিকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নারী। যেমন, গয়লাবুড়ী। 'চিড়াকুটী' (উত্তরবঙ্গ)। চৈতার বউ। 'নিতাই বাওয়ালির মা' (Moorhen, সুন্দরবন)। বানিয়ার বহু (উত্তরবঙ্গ)। বেনাবউ, বেনে বউ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসন্তবউড়ীকে লিখেছেন : 'বসন্তবাউরী'। বুড়ী পাখি। সহেলি। সাতসায়ালি (ইংরেজীতে seven sisters). সদাসোহাগী (Fly catcher). লক্ষ্মীপ্যাঁচা।

'গৃধিনী'কে লৌকিক উচ্চারণে 'গিন্নী' শকুন বলা হয়। আসলে ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মেই গৃধিনী>গিন্নী হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু গৃধিনীর কানের দু পাশে লাল ঝালর আছে, সেই হেতু এক সধবা গৃহিণী>গিন্নীর প্রতিরূপ এর মধ্যে ধরা পড়েছে। শঙ্খবৎ শুভ্র চিলকে বলা হয়, "মা শঙ্খেশ্বরী"।

চন্দনা, কাজলা, ফুলটুসী, মদনা—টিয়ে পাখির এই রকমফেরগুলোর সব ক'টিই নারীরূপের।

তেমনি পুরুষরূপও পাই। যেমন 'সাত ভাই' (ছাতারে)। বসন্তসখ, বসন্ত-সখা : কোকিল। এই অধ্যায়ের নবম পরিচ্ছেদে আরো উদাহরণ দিয়েছি। সামান্য কয়েকটি পাখি পাই যাদের নামের মধ্যে মৃত্যুর প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে : কালপেঁচা। যমকুলি। এই রকম শ্মশানকুলি (সিলেট)। যমঘুঘু। যমদূত পাখি॥

··১৬···
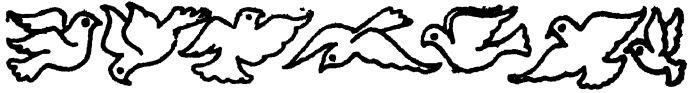
প্রত্যেক পাখিরই এক-একটি নিজস্ব বিশিষ্ট আচরণ বা অভ্যাস থাকে। পাখির সেই 'শীল', 'সংস্কার' ও 'আচরণ'কে মুখ্য করে বহুশঃ পাখির নামকরণ করা হয়।

অন্ধতা : অন্ধকাক : কাকাকার পক্ষী, পানকৌড়ি। দিবান্ধ : প্যাঁচা।

কাম ও প্রেম : কামদূতী : কোকিল, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। কামান্ধ : কামোদ্দীপন দ্বারা অন্ধতা-কারক, কোকিল। কামি, কামিক (মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র) : <কাম+ইক, কারণ্ডব বা কাম পাখি। নামান্তর 'কায়েম'। কামী : "কামপরায়ণ" : চক্রবাক, পারাবত, চটকা, সারস। কামিনী : "কামাতিশয়যুক্তা" ; চক্রবাকী। কামুক : চটক, চটকা, কপোত। মৈথুনী : সারস।

চঞ্চু দ্বারা কর্তন ও ছেদন : কাঠঠোকরা (সংস্কৃতে কাষ্ঠকুট্ট, দার্বাঘাট। ওড়িয়াতে 'কাঠহণা')। কলাচোষা : বাদুড়। কাদাখোঁচা। কাদোঘুকা। খুটা-কাটা, খুটা-কাটী, খুটা-কাটু।

প্রার্থনা ও প্রিয়তা : গুহবলিপ্রিয় : কাক, বক ইত্যাদি। জ্যোৎস্নাপ্রিয় : চকোর। নর্তনপ্রিয় : ময়ূর। রণপ্রিয় : শ্যেন। 'মেঘনাদানুলাসী' · মেঘ শব্দে নৃত্যকারী, ময়ূর। চাতক : ৲চত্ প্রার্থনা+অক (স্বূল) ক,-মেঘজল-প্রার্থী।

বিচরণ : কাদম্ব : যারা সমূহে বিচরণ করে ; কলহংস, বালিহাঁস ইত্যাদি। চর : খঞ্জন। ঢাড়োয়া : শালিক। দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বচারী · মিথুনচর, চক্রবাক। নটুয়া, নোটো (মেদিনীপুর) : খঞ্জন।

ভয় : কাকভীরু : প্যাঁচা, পঞ্চমী তৎপুরুষ। দিবাভীত : প্যাঁচা।

রাত্রি ; জাগরণ : অতিজাগর : কঙ্ক। স্থূলার্থে যে কোনো ধরনের বক। উষাকর, উষাকল : কুক্কুট। নক্তচার, নক্তঞ্চার, নিশাটন : প্যাঁচা। নিশাবেদী, 'নিশামানজ্ঞ' : কুক্কুট। নু-জাগর : সারারাত নিজে জেগে অন্যকে জাগায় যে, টিট্টিভ। রাতিচরা : নিশাচর পাখি বিশেষ। 'গোপীচন্দ্রের গান' : আ'চরা<রাতচরা, সমীভবন। শয়াণ্ডক : 'যে শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকে', কাক।

লুণ্ঠন ও চৌর্য : কলাচোরা (পূর্ববঙ্গ) : বাদুড়। কাচিচোরা, কাস্তেচোরা (পূর্ববঙ্গ) বক। চোরপাখি (Nuthatch). বিহগতস্কর : গৃধ্র। লুণ্টক : <লুণ্ঠক, কাক। সুঁইচোরা, হুইচোরা। টাকাচোর (হাঁড়ী চাঁচা)। চৌর্য থেকে হারানো : ধনহারা পাখি (মুর্শিদাবাদ) : হুতোম প্যাঁচা।

শত্রুতা ও বিদ্বেষ : অহিদ্বিট, অহিবিদ্বিট, অহিমার, অহিরিপু : ময়ূর। উলূকজিৎ : কাক। কপোতারি : শ্যেন, শয়চান। ক্রূর : শ্যেন, কঙ্ক। খগান্তক : পাখিদের যমতুল্য, শ্যেন, বাজ। নাগান্তক : গরুড়, ময়ূর। বায়সারাতি, বায়সান্তক, কাকারি : পেচক। সর্পারাতি, সর্পারি : গরুড়, ময়ূর।

বিচিত্র : আত্মঘোষ : কাক, কুক্কুট। উৎপাদশয়, উৎপাদশয়ন : টিট্টিভ। রাতে একেই বলে ঢেঁকিপাখি। [illegible] ([illegible]) : পানকৌড়ি।

কণ্ঠধ্বনির বিশিষ্টতার জন্যে অন্যান্য অভ্যাস ও আচরণজাত পাখির নামকরণের উদাহরণ আগেই দিয়েছি ॥

·১৭·

ঐশ্বর্য-বোধক কিছু শব্দ, পাখির নামের আগে বা পরে যোগ করে অনেক সময় পাখির নামকরণ করা হয়। এর মধ্যে পাখি সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কখনো বা পাখির রূপগুণ ধরা দিয়েছে।

অধিপ : খগাধিপ : গরুড়।

ইন্দ্র, ঈশ, ঈশ্বর : দ্বিজেন্দ্র, নীড়জেন্দ্র : গরুড়। ধনেশ। ধনেশ্বর (বগুড়া), ধলেশ্বর (যশোহর) : ধনেশ। শকুনীশ্বর : গরুড়।

পতি : খগপতি, দ্বিজপতি : গরুড়। গৃধ্রপতি : জটায়ু। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মাইকেল লিখেছেন : 'ধায় বাজপতি'।

মণি : খগমণি : গরুড়।

মহা : মহাপ্রাণ : দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। মহাবারিক (উত্তরবঙ্গ) : গরুড়। মহাবীর : কোকিল, গরুড়। মহালাট (হিন্দী) : হাঁড়ীচাঁচা।

রাজ, রাজা : রাজহাঁস। মৈমনসিংহের একটি বিয়েব গানে পাই 'রাজাঁস'। অন্যত্র পাই রাধাঁস>রাদাঁস>রাজহাঁস। রাজা সারস : ময়ূর। জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গলে' : 'বাজসারোই'। রাজশকুন (King Vulture). কেশরাজ, কিশেরাজ, কৃষ্ণরাজ, খেসরাজ (Hair crested Drongo). পেঙ্গরাজ।

'ভৃঙ্গরাজ'কে অনেকে মনে করেছেন 'বিহঙ্গরাজ' থেকে আগত। ভৃঙ্গরাজ>হিন্দী ভাংগরাজ, বাঙলায় ভিমরাজ। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন "ভিংরাজ"। দুধরাজ : শা' বুলবুল। রাজধনেশ। হিন্দী বনরাও<বনরাজ। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে আছে : পাথ কান্দে, পাখুড়ি কান্দে, কান্দে রাজতোতা। সিংহলে চিলকে বলে 'রাজালিয়'। মাছরাঙার ইংরেজী 'King fisher' শব্দের মধ্যেও এই রাজ-আসঙ্গ ধরা পড়ে।

খগরাজ, দ্বিজরাজ, পক্ষরাজ : গরুড়। মাইকেল লিখেছেন, "পক্ষিরাজ বাজ"। গৃধ্ররাজ : জটায়ু। দৈবাজা (যশোর), টুনটুনি। দৈরাজ (পাবনা), দৈরোজ (ফরিদপুর) : দয়েল। বুটরাজ (পাবনা) : নদীর পাড়ে থাকে, পাখি বিশেষ। জগজ্জীবন ঘোষাল লিখেছেন, 'ভৃঙ্গরাজ'। সুপর্ণরাজ : গরুড়।

রাজা>রায় : খগরায় : গরুড়।

রাম : বৃহদর্থে 'রাম'-এর ব্যবহারের উদাহরণ আগেই দিয়েছি। 'হলদিয়ারাম' (উত্তরবঙ্গ) : হলুদ পাখি। রামগাঙরা।

শা, শাহ, শাহী : ফারসী শাহ : রাজা, সম্রাট। শা' বাজ (The crested

Hawk eagle). শা-বুলবুল (Paradise fly-catcher). শাহীবাজ। শাহীবুলবুল।

শাহ্-এর সংস্পর্শে 'সুলতান' এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'সুলতানা' পাই। দুধরাজ পাখির নামান্তর 'সুলতানা'। তেমনি সুলতান টিট কিংবা, হোসেনী বুলবুল।

এ ছাড়া 'গরুড়' বোঝাতে 'বিনায়ক' ও 'স্বামী' শব্দ দুটি পাই। 'বি' অর্থ পাখি, তার নায়ক, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। পাখিদের 'স্বামী' অর্থে কেবল 'স্বামী' : গরুড়॥

·১৮

পক্ষি-নামবাচক তৎসম শব্দগুলি বহু ক্ষেত্রে তদ্ভব শব্দে পরিণত হয়ে গেছে। অনেক সময় পরিবর্তন এতোদূর গড়িয়েছে যে, সহজে বা সহসা তাদের তৎসম রূপটি ঠিক ঠাহর করা যায় না। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সেই পরিবর্তন লক্ষ করা এক উপাদেয় বিষয়। প্রসঙ্গতঃ উপভাষার কথাও ওঠে। একই তৎসম শব্দ ঔপভাষিক বিশেষত্বের জন্যে একাধিক পরিবর্তন লাভ করে। কয়েকটি অতি-পরিচিত পাখি সম্পর্কে এ ব্যাপার ব্যাপকভাবে ঘটেছে। হিন্দী ও ফারসী পক্ষি-নামও বিচিত্র পরিবর্তন লাভ করেছে। নীচে এই সব পরিবর্তনের কিছু নিদর্শন দেওয়া গেল।

অক্কা (রঙপুর) : <উৎক্রোশ, বাজ। উৎক্রোশ>উক্শা (বরিশাল)> ওক্শা (রাজশাহী)>অক্কা, সমীভবনে।

আচ্চরা (রঙপুর থেকে সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের গানে) :<রাতচরা, সমীভবনে।

কইলা : কালি, ফিঙে। কচল বক (রাঢ়) : <ক্রৌঞ্চ+ল।

কদ্মা (কোচবিহার), কদ্মা সুর (রঙপুর) :<কাদম্ব : (?), Indian crane.

কাইমা (দিনাজপুর) :<কাম+ইয়া, কাম বা কায়েম পাখি।

কাক, দাঁড়কাক : বাঙলা 'কাক' শব্দটি মূলতঃ ধ্বন্যাত্মক। হিন্দী 'কবা' 'কৌয়া', প্রত্যয় যোগের ফলে। 'কাক' শব্দের সঙ্গে 'ইয়া' এবং 'উয়া' প্রত্যয় যোগের ফলে এর বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মহাপ্রাণতার ফলে সেখানে নতুনতর পরিবর্তন আসে। খুলনা ও যশোহরে কিছু-কিঞ্চিৎ স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতির আভাস আসায় শব্দটির আর এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

কবা (পাবনা), তুলনীয়, হিন্দী 'কবা'। কাইয়া (ফরিদপুর) :<কাক+ইয়া। কাউও (খুলনা) :<কাক+উয়া, ও। কাউয়া, কাউহা, কৌহা (উত্তরবঙ্গ)। কাউ :<কাক+উ। কাগা (মৈমনসিংহ) : <কাক+আ। কাগু (ফরিদপুর) : <কাগ+উ। 'কাগু ডাকে কা কা'। কেগো (খুলনা)। কায়া (রাজশাহী) ; <কাগা। কেয়া (ঢাকা) : <কাক+ইয়া, এয়া। পূর্ববঙ্গে কা-কা>কায়া-ও মেলে। কেয়ো (যশোহর, খুলনা)। পাতি কওই (যশোহর)।

হিন্দী 'ঢড়কোবা' এবং বাঙলা 'দাঁড়কাক' এই শব্দ দুটি মিলে নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছে 'দাঁড়কাক' অর্থে। হিন্দী 'কবা' শব্দটির ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে সামান্য নয়। যেমন : ডালকৌয় (বীরভূম), ঢাট্‌কাউয়া, ঢাট্‌কাউহা, ঢাল কাউহা, ঢ্যাল কাউয়া ঢোল কাউয়া (উত্তরবঙ্গ), ঢোর কাউয়া (চট্টগ্রাম), ঢাঁট্‌কাক, দাওকাক (যশোহর), দোরা কাইয়া (চট্টগ্রাম), দোরা কাউয়া (ঢাকা, কুমিল্লা, মৈমনসিংহ), দুরা কাউয়া (সিলেট), ধরা কাইয়া (রাজশাহী), ধুরা কাউয়া (মৈমনসিংহ), ধুড়া কাক, ধোড়কাক (ত্রিপুরা), ধুর্‌য়্যা কাওয়া। দাঁড়কাক<দণ্ডকাক (?), দ্রোণকাক।

কাঁক : <কঙ্ক। কাঙ্গা (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)<কঙ্ক+আ। অন্যত্র 'কান্ঘা'ও মেলে। যেমন, উত্তরবঙ্গে, মহাপ্রাণতার ফলে।

কোকিল : কোইল, কোয়েল। কইল, কৈল (খুলনা)। কোয়াল (কুমিল্লা)। তুলনীয় তেলেগু 'কোয়াল'। কোকিল+আ>কোকিলা (কাব্যে, ব্যক্তি নামে)। কয়লা, কোইলা, কৈল্যা (চট্টগ্রাম), কোয়লা, কোয়েলা। তুলনীয়, হিন্দী 'কোইলা', 'কোয়লা'। মৈথিলী : 'কোইলা'। কুকিল, কুহিল, কুহিলা, কোহিল, কোহিলা। কুকিলী, কুইলী, কুলি, কুল্লী (ঢাকা, সিলেট)। কাব্যে : কোংকিল, কোংকিলা, কোংখিলা। কুংখিল, কুংখিলা। কুহুলি (দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি)<কুহু+লি। কোয়েলিয়া।

কৌতর, কৈতর : <ফারসি কবুতর। পূর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কবুতর>কউতর, কউতোর, কৌতর, কৈতর কৈতার, কোতোর (ঢাকা)। কোতরি (যশোহর, খুলনা) :<কবুতর+ই। কোত্যার (ফরিদপুর), কোতৈর (পাবনা), কৈতের (রঙপুর)। কবিতর<কবুতর। কহোতোর, মহাপ্রাণতার ফলে। এই অর্থে সংস্কৃত 'কপোত' শব্দেরও নানা পরিবর্তন হয়েছে : কোপ্‌তু (মেদিনীপুর)<কপোত +উ। কোপুতো (ময়নামতীর গানের ওড়িয়া রূপান্তর গোবিন্দচন্দ্রের গীতে)।

কুকড়া, কুকড়ো :<কুক্কুট। মধ্য স্বরাগমে : কুকুড়া, কুখুড়া। কুফ্‌রা (ফরিদপুর), কুর্‌কো (পাবনা, মৈমনসিংহ, বর্ণবিপর্যয়ে), কুহ্‌রা (পাবনা), কুহ্‌ড়ো (যশোহর)। কুইড়ো (যশোহর, খুলনা), কুইকর‍্যা (ঢাকা), কুইর্‌ক্যা (মৈমনসিংহ, বর্ণবিপর্যয়ে)। কুইকুড়ি (পাবনা) কুক্কুটী। কুঁরি (চট্টগ্রাম)। কুক্কুট+ইয়া>: কুঠ্যা (ঢাকা), কুড়া (নোয়াখালি), কুরা (চট্টগ্রাম)। কুরা পাইক (মৈমনসিংহ), কুরাইক (মৈমনসিংহ) <কুক্কুট+পাখি।

কুথা, কুথী (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) :<কুক্কুভ।

কুরর : >কুরল, কুড়ল (পূর্ববঙ্গ)। কুরুয়া (সিলেট), কুরুয়া (রঙপুর, নোয়াখালি) : <কুরর+উয়া। কুইরা (মৈমনসিংহ)<কুরর+ইয়া। কুরর>কুরল> কুরন (বগুড়া)। কুড়ল>কুড়াল, কোড়ল, কোড়াল। কুড়াইল্‌ইয়া (খুলনা), কুড়াইল্‌লা (নোয়াখালি), কুড়ল্যা, কুরেল্যা (চট্টগ্রাম), কোরাইল্যা : <কুরল+ইয়া। কুল্‌লো : <কুরল+উয়া। কুর্‌রা :<কুরর+আ। কুরগা : <কুরর+গা। কুরকাল (নোয়াখালি), কুরগাল (চট্টগ্রাম), কুরপান (কুমিল্লা, নোয়াখালি), কুরবাল (চট্টগ্রাম) : <কুরর+আল, কাল, প্যান। কুরগাইল্যা<কুরগাল+ইয়া।

কুটুমমনা (টাঙ্গাইল), কুটুমমনা : <কুটুম+মনা, সমাজের জোগ।

কেউসসা (ঢাকা) : <পেচক+উয়া>পেউচ্‌চা>পেউস্‌সা।

কেঁচা (রঙপুর) : <পেঁচা।

কোড়া, কোরা (পূর্ববঙ্গ) : <কোষষ্টিক। কড়্‌হা, কর্‌হা, কোড়্‌হা, কোঢা (উত্তরবঙ্গ)।

কোঁচবক, কুঁচবক : <ক্রৌঞ্চ। হিন্দী, কোঁচা, কুঁজ। কোঁচল (মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গলে') : <ক্রৌঞ্চ+ল। করচিয়া বক, কুরচে বক, কোরচে বক (পশ্চিমবঙ্গ)।

গিন্নী : <গৃধিণী। গিরধনী (চট্টগ্রাম)। 'গিদ্ধিনী'।

গেউড়ী (দিনাজপুর, মালদহ) : <হিন্দী গোরয়্যা। টেউড়ী, টেউরি, (জলপাইগুড়ি), টেউংরি টেঁউরি, (রঙপুর) : <গেউড়ী (?)। গোমরা <গেউড়ী (?)।

গোরল (উত্তরবঙ্গ) : <গরুড়।

চক্‌বা (চট্টগ্রাম), চকা, চকোয়া (উত্তরবঙ্গ), চখা, চখোয়া (উত্তরবঙ্গ) : <চক্রবাক। চখোয়ার (উত্তরবঙ্গ)।

চচ, চস (উত্তরবঙ্গ) <হিন্দী চোঞ্চা (?), বাবুই।

চটা (মেদিনীপুর), চটঁ (সিলেট), চড়া (যশোহর), চরা (সিলেট, ঢাকা) : <চটক। চটুই, চড়ই, চড়াই, চড়ুই, চোটুই : <চটক। চঁঐর্‌গা (চট্টগ্রাম) চৈড়্‌গা (নোয়াখালি) : <চড়ুই+গা। চৈর্য্যা (ঢাকা) : <চড়ুই+আ। চয়ুয্যা (কুমিল্লা), চৈয়্‌য়া (চট্টগ্রাম) : <ফারসি চুযহ্‌=ছোটো পাখি, অর্থপ্রসারে চড়ুই।

চন্দনা, চন্দনীয়া : <চন্দন+আ, ইয়া। 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে' চন্দ্রা। চননা (পূর্ববঙ্গ, শালিক বিশেষ) <চন্নলা <চন্দনা। সমনা (মৈমনসিংহ) <চমনা।

চা' (রাজশাহী), চাহা, ছাহা : <হিন্দী চাহা।

চাকদয়াল, চোখদয়াল : <চক্র+দয়াল।

চিরকা (সিলেট), ছ্যার্‌কা (রঙপুর) : <সারিকা।

চিল্‌হা (উত্তরবঙ্গ), চিলা (উত্তরবঙ্গ, ঢাকা), চিলু (সিলেট) : <চিল্ল+আ, উ।

চোজভরা (রঙপুর) : <সূঁচভরা, বাবুই।

চোরপাখি : <চতুর (?)

ছাতার, ছাত্তার : <সপ্তাকার, যেহেতু সাধারণতঃ সাতটি পাখি একত্রে থাকে। বীরভূমে বিশ্বাস, পা দিয়ে এরা ঘাস-পাতা-জঞ্জাল 'ছত্রে' বা 'ছত্রখান' করে অর্থাৎ এলোমেলো করে দেয় বলে এই নাম। ছাতারিয়া, ছাত্তারে : <সপ্তাকার+ইয়া।

ঝুঁট্‌শালিক : <ঝুঁটি+শালিক। ঝুঁশ্‌শালিক, সমীভবনে।

টিটাহি, টিটিহি : <টিট্টিভ।

টৌন (বাখেরগঞ্জ) : <টণ্টুক।

ডাক (পশ্চিমবঙ্গ), ডাইক (মৈমনসিংহ, পাবনা), ডাইগ (পাবনা), ডাউক

(কুমিল্লা), ডাহু (পাবনা), ডোক (চট্টগ্রাম) :<ডাহুক <দাত্যূহ। ডাউকী পাখী, ডাউকী চড়াই (উত্তরবঙ্গ) : <ডাহুক+ই+চড়ুই, অর্ধপ্রসারে।

তিত্‌রি, তিতিলি : <তিত্তিরি, তিত্তির। তিথির, টিঠির : (জলপাইগুড়ি), মূর্ধন্যীভবনে।

তিয়াস্ (উত্তরবঙ্গ) :<হিন্দী তিস্‌সা, Buzzard eagle.

তুর্‌বান্ (চট্টগ্রাম), তুর্‌মতী, তুর্‌মুতী, তুরুমতী (জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসা-মঙ্গলে') :<হিন্দী তুরুম্‌তী (Red headed Martin). 'ডানা' বইতে বনফুল লিখেছেন, অনেক জায়গায় কেবল লালমাথা বাজের স্ত্রীদেরই 'তুরুম্‌তি' বলে। স্ত্রী-লিঙ্গ বাচক 'মতি'র প্রভাবেই এটি ঘটেছে বলে মনে করি।

দাঁড়কাক :<দণ্ডকাক, দ্রোণকাক।

পইরিঘুঘু (জলপাইগুড়ি) : <পরীঘুঘু, অপিনিহিতি।

পাঁকঘুঘু : <পঙ্খীঘুঘু। এই রকম, পাখঋষি, সীমান্ত বাঙলায় মুরগী বোঝাতে।

পানিকাউর, পানিখাউর, পানিখাউরি (নেত্রকোণা) : <পানিকুক্কুট, পানকৌড়ি। পানিকোয়ারি (জলপাইগুড়ি)। খুলনার একটি ছড়াতে পেয়েছি, পানিকামড়ি। 'পানিকুমড়ি'ও পেয়েছি।

পায়রা : <পারাবত। নীল পেয়রা (পূর্ববঙ্গের একটি ছড়ায়)। উত্তরবঙ্গে, বিশেষতঃ জলপাইগুড়িতে : পাড়ো, পাঢ়ো, পার্‌হো, পাবো এবং কাবো 'পারোয়া'।

পিচা (খুলনা) : <পেঁচা।

ফিংগা, ফিঙে : <ফিঙ্গক।

বউকদুল, বকদুর, বকদুল, বউকধুর, বকধুর, বগদুড়, বগঝুল, বগঢুল, বোগ ডোল, বোগদুর (উত্তরবঙ্গ) :<বাদুড়, বাতুলি।

বকা, বকী, বগা, বোগা (চট্টগ্রাম : <বক+আ, ই। হিন্দী বকাল, সং বলাকা। বকুলা (সিলেট), বগিলা (রঙপুর), বগুলা (কুমিল্লা) : <বলাকা, কিংবা <বক +ইলা, উলা। বগিরা (উত্তরবঙ্গ), বগুরা (মৈমনসিংহ), বগলে (পাবনা), বোগলা (রাজশাহী), বৈল্‌গা (পাবনা) বৌগ্‌লা (সিলেট)।

বক্কা :<হিন্দী বাচ্‌কা, Night Jar বাক্‌চো :<বাচ্‌কা, বর্ণবিপর্যয়ে।

বটয়া, বতুই, বহটই, বোটোই (উত্তরবঙ্গ) :<বর্তক, বটের। ভাটুই, ভাড়ে ভাঁড়ে (চট্টগ্রাম) :<বর্তক।

বগেরি, বাইগুড়ি (বগুড়ো), বাগেড়া (উত্তরবঙ্গ), বাগেরী, বাগৌড়ি :<হিন্দী বাঘাইরা, বাঘাই<সং ব্যাঘ্রাট।

বাওই, বাঐ (ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, রাজশাহী) :<বাবুই। বঙ্গবাসী সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে, বাউই। বায়ই, বায়া :<হিন্দী বয়া, 'বয়নকারী' অর্থে। প্যা-আইরগা (চট্টগ্রাম) :<বাবুই+চড়ুই+গা (দ্রঃ পূর্বে 'চঁঐরগা' এবং 'চৈড়্‌গা')।

বাবুই : সংস্কৃত 'বয়ন'>হিন্দী 'বয়া' (?)। বাবুই বোঝাতে পাই :<বাইলো

(ফরিদপুর, চট্টগ্রাম), বাইল্যা (কুমিল্লা), বাউল্যা (ফরিদপুর), বালিয়া (বাকেরগঞ্জ), বালুই (২৪-পরগণা, খুলনা), বালৈয়া (ফরিদপুর)। সালিম আলি তাঁর বইতে 'ধাবিলা'-র উল্লেখ করেছেন। তা থেকেই কি বাঙলায় এই নামগুলি পাওয়া গেল ?

ভশ্ শালিক (পূর্ববঙ্গ) :<ভাতশালিক, সমীভবনে।

ভরুত, ভারই, ভারুই (বগুড়া), ভারেয়া (জলপাইগুলি) :<ভরত। কবিকংকণ চণ্ডীতে, মাণিক গাঙ্গুলি এবং ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও পাওয়া গেছে।

ভিমরাজ, ভিংরাজ (বনফুল) :<ভৃঙ্গরাজ। ভুঁড়ো চিল : <ভারণ্ড।

মইঅব, মইউর, মইয়র, মউর, মৈয়র :<ময়ূর। মেজুর : (ধলভূম, সিংহভূম ও মধ্যভারতে)। মজুর।

মদনাচিল :< ময়না+চিল, চিলবিশেষ।

মনা (চট্টগ্রাম) :< ময়না<মদনিকা। হিন্দী ও মারাঠীতে 'মৈনা'।

মাইছবাঙা (ত্রিপুরা), মাছেঙ্গা, মাদ্‌রেঙ্গা মাদেরেঙ্গা (জলপাইগুড়ি) : <মৎস্যরঙ্ক।

লখাপায়রা :<আরবি লক্কা=চওড়া।

লাওয়া, নাওয়া (ত্রিপুরা) :<লাব, লাবক।

শরইরি (পূর্ববঙ্গ), শরলি (বগুড়া), শরাহল্, (পূর্ববঙ্গ), শরাল, শারালি (জলপাইগুড়ি), শাল্‌লি (বগুড়া, পাবনা), হারাইল, হারালি (সিলেট) :< শারারি<শারাড়ি<শরাটি।

শাইর, সাইর (চট্টগ্রাম) :< সারি, শারি<শারিকা, সারিকা। শারক (পাবনা), শারোক (ঐ, বাকেরগঞ্জ), শারু (রঙপুর), সারো (জলপাইগুড়ি)<শারিকা, সারিকা। শারগি (রাজশাহী) :<সারিকা, হার, হাইর, হারি (সিলেট) :<সার সারি, সারিকা।

শালিক, শালিথ :<শারিকা, সারিকা। শলাক<শালিকা। শাইল্‌খ্যা (ত্রিপুরা), শাল্‌কি (হাওড়া) :<শালিক+ই, ইয়া। হালিক :<শালিক। হাইল্যা (নোয়াখালি), হাইল্‌লা (ঐ), হাইল্‌কা (কুমিল্লা), হাইল্‌খ্যা (ত্রিপুরা) :<শালিক+আ, কা, লা।

শিগ্‌নী (উত্তরবঙ্গ), শিংনী (ঐ) :<শকুনি। শগুন (ফরিদপুর, যশোহর), শেগুন, শোন (চট্টগ্রাম) :<শকুন। শুকুন, শুকুনি, সুকুনী ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'), জুগুনি (জলপাইগুড়ি) :<শকুনি। ফকিন (মৈমনসিংহ) :<শকুন। হকুন (ঢাকা), হক্‌কুন (ফরিদপুর), হক্‌কুম (চট্টগ্রাম), হগুন (ফরিদপুর), হহুন (ঢাকা), <শকুন। হাকিন (সিলেট), হৈন (কুমিল্লা), হোউন (ঐ) :<শকুন।

শুক (ঋগ্বেদে [১. ৫০. ১২] শব্দটি মেলে) :< শুভ+ক-ক, নিপাতিত। শুআ ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'), শুয়া, সুয়া :< শুক+আ। শিয়া<শুয়া। সোয়াপঙ্খী (কিশোরগঞ্জ) :<শুয়া, সুয়া, স্বরসঙ্গীতিতে।

শৈচান :<সঞ্চান। শয়চান, শাচান, হাচান (পূর্ববঙ্গ) :<সঞ্চান।

সুঁইচোনা (জলপাইগুড়ি) :<সুঁইয়া (পশ্চিম রাঢ়ে)+সঞ্চান।

হ্কুশ, হোকশ, হোকোশ (জলপাইগ্ড়ি) : <উৎক্রোশ, মহাপ্রাণতা।
হৈট্টোল (জলপাইগ্ড়ি) : <হরিতাল। হরিয়াল <হরিঅল।
হৈরকালী (কুমিল্লা) : <হরিকালী ॥

·১৯·

তেমনি, কতকগ্লি পাখির নাম আবার নিতান্তই 'আঞ্চলিক', তাদের ম্ল অজ্ঞাত, অন্ততঃ আমার কাছে জানা নয়। বিশেষ একটি অঞ্চল বা স্থানের মধ্যেই সেই নামটির প্রসার ও প্রচার। স্বল্প কয়েকটি উদাহরণ এই রকম—

উত্তরবঙ্গ থেকে: আউনী বোটোই। আহেরা। ইটালী। কথার (কহের)। চেরকা। চোরস। ডমনা: ব্লব্লি অর্থে। নোদাভাটি, নোনাভাটি। বন চরকচাম্পা। ভাপ। সব ক'টি উদাহরণ জলপাইগ্ড়ি, রঙপ্র থেকে। রঙপ্র থেকেই সংগ্হীত 'গোপীচন্দ্রের গানে' (তৃতীয় সং, ১৯৬৫। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পাই, বানোয়ার (মৎস্যজীবী পাখি বিশেষ)। গোধম। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০) পাই, কয়র। জলপাইগ্ড়িতে 'ধের্পী' বা 'ঢর্পী' (ম্র্ধন্যীভবনে) নামে ঝোপ-জঙ্গল নিবাসী এক ধরনের পাখির-নাম মেলে। এ কি হিন্দী 'ধাপরী'? (দ্রঃ সালিম আলি, সং ৪৭)। 'ভেওয়া' নামে পাবনায় একটি পাখি মেলে, যা আকারে মাণিকজোড়ের মতো বড়ো, প্চ্ছটা পাটকেলে। 'প্র্ববঙ্গ গীতিকা'-র (তৃতীয় খণ্ড. দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০) "শ্যাম রায়ের পালা" রচনাটিতে 'ভৈউর' নামে 'কালো ক্ৎসিত' পাখির নাম মেলে। 'ভেওয়া' ও 'ভৈউর' কি এক? উত্তরবঙ্গের একটি বারমাসী গানে 'হেওয়া' পাখির নাম পাচ্ছি। পাখিটা কী?

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গের পাখির নাম এই আলোচনায় গ্হীত হয়েছে ম্কুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, র্পরাম, ঘনরাম ও মাণিক গাঙ্গ্লি এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচলিত সংস্করণ থেকে। যেসব পক্ষিনাম তদ্ভব, অব্যবহিত প্র্ববর্তী পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কয়েকটির ম্ল নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি। র্পরামের 'ধর্মরাজের গীতে' পাই: ক্হরি। টুলক্চি। র্পরামের 'ধর্মমঙ্গলে' (বর্ধমান সাহিত্য সভা' ১৩৫১) পাই, কহর। কোহ্রি। লোচন। মাণিক গাঙ্গ্লির 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' (সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১২): দলালিপি, দলপাখি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) মেলে, পাউই <বউই (?)। এ কি হিন্দী 'পাওয়াই'? ঝাড়খণ্ডের আঞ্চলিক পাখি: কারিক্রি। কেরকেটা। গ্ভুর। ধাগর। পশ্চিম রাঢ়ে চড়্ইয়ের মতো ছোটো এক ধরনের পাখির নাম মেলে. 'ফ্চি'। তেমনি ফিঙে অর্থে মেলে 'চব্চু'।

প্র্ববঙ্গ: আলৈয়া (ফরিদপ্রে) গ্য্যাক্ললটা (রাজশাহী), বিলের পাখি। টকা (সিলেট, ঢাকা, মৈমনসিংহ): ব্লব্লি, ছোটো ব্লব্লি। ভাইর (ত্রিপ্রা): শালিক, ভাটশালিক। কিন্তু, তাইরপা (ক্মিল্লা), তার্রা (ফরিদপ্রে বরিশাল):

সাতভাই বা ছাতারে। তাইরো (খুলনা), তারো (সুন্দরবন)। এ ছাড়া, 'তাইরগা,' 'তাউরগা' প্রভৃতি পাই। মনে হয়, তিপরো-শব্দ। তুলনীয় পূর্বের 'চ'ঐরগা' এবং 'প্যাঁআইরগা'। দানাচাচা (রাজশাহী)। দিয়েড় (যশোহর) : জলচারী পাখি। নাগরবাটা (কুমিল্লা), নাগোর ভাটোয় (যশোহর) : ছোটো পাখি। নরালি (ফরিদপুর), নারুলি (বগুড়া) : এ পাখির মাংস সুস্বাদু। নিড়েন (যশোহর) : পাখি বিশেষ। পটে (সিলেট) : টুনটুনি। পাড়োল (ঢাকা) : মাংস সুস্বাদু। পিরিলা (সিলেট) : বাবুই। পুটুলি (যশোহর) : পাখি বিশেষ। ফেচা : ছাতারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফিঙে। বড়্র (বগুড়া)। বালুলাশ্ (চট্টগ্রাম) : শকুনজাতীয় মৎস্যভোজী পাখি। বাইল্যা (কুমিল্লা), বাইলুলা (ফরিদপুর, চট্টগ্রাম), বাউল্যা (ফরিদপুর), বালিয়া (বাখেরগঞ্জ), বালুই (খুলনা), বালৈয়া : বাবুই। খুলনার সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগণাতে 'বালুই' শব্দ মেলে। বাটুল (সিলেট)। বুরুবুইর‍্যা (ঢাকা) : ছোটো পাখি বিশেষ। বৈদর (সিলেট) : রঙ কালো, ঠোঁট লাল। ভাউই (চট্টগ্রাম) : ছোটোপাখি। মাংগুলা (চট্টগ্রাম) : টিয়ে। ম্যাতারা (চট্টগ্রাম) : মাছরাঙা। মৈল্যা (ফরিদপুর) : চড়ুই-সদৃশ পাখি। রিশাল (চট্টগ্রাম) : নবীন সেনের 'রঙ্গমতী' কাব্যে, পাহাড়ী বুলবুল অর্থে ॥

•২০••

আবার কখনো কখনো দেখা যায়, কিছু-কিছু পাখির নামের সংগে কোনো-কোনো স্থান বা অঞ্চল বিশেষের স্মৃতি, নাম ইত্যাদি জড়িয়ে আছে।

'কলিংগ' শব্দে ধুম্যাট, ফিঙে প্রভৃতি পাখিকে বোঝায়। 'কলিংগ' কি দেশবিশেষ? ফিঙেকে 'কুলিংগ'ও বলা হয়। 'উত্তর কুরু' দেশের শকুন বিশেষকে বলে 'ভারুণ্ড' (শব্দকল্পদ্রুম)। 'সিপাহী বুলবুলে'র নামান্তর 'চীনে বুলবুল'। মুনিয়া জাতীয় এক-প্রকার পাখিকে বলে 'জাভা চড়ুই' (Java Sparrow), যেহেতু জাভাতেই তা প্রথম দৃষ্ট হয়, বাঙলায় একে বলে 'রামগোরা'। তেমনি ক্যানারি (canary) দ্বীপপুঞ্জে প্রথম দেখা গেছে বলে পাখিটির নাম 'ক্যানারি' পাখি, অনেককে 'ক্যানা পাখি' বলতেও শুনেছি। কুক্কুট জাতীয় এক ধরনের পাখিকে বলে 'পেরু' (Peru), তা আমেরিকার পেরু দেশ থেকে আনীত বলে কথিত হয়।

রাজশকুনকে বলে Pondicherv Vulture; সাদা শকুন: Pharoh's Vulture বা Bengal Vulture. জাপানী মুনিয়া, জাপানী ম্যানিকিন (Manikin)-কে ভুল করে ইংরেজরা বলে 'Bengali'.

পাখির নাম থেকে স্থানেরও নাম হয়ে গেছে। অন্যত্র তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হল: 'Kiwi'; দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণপ্রান্তে; ১২০০ মাইল পূব দিকে, দক্ষিণ আটলান্টিকের শীতপ্রধান অঞ্চলে, দক্ষিণ জর্জিয়ার দ্বীপপুঞ্জের

একটির নাম 'অ্যালবাট্রস্'; বৃহদাকার অ্যালবাট্রস্ পাখির বাসভূমি বলেই দ্বীপটির এই নাম হয়েছে ॥

২১

একই নামে একাধিক পাখি মেলে। একই দৈহিক বিশেষত্ব, অভিন্ন অভ্যাস-সংস্কারের ফলে এবং সাধারণ মানুষের স্মৃতি ও বোধের অভাবে এমন ব্যাপার ঘটে থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই :

অলি : কাক, কোকিল।

কপিঞ্জল : চাতক, তিত্তির। কলকণ্ঠ : কোকিল, পারাবত, হংস। কলরব ('মধুর ধ্বনিযুক্ত' : বহুব্রীহি) : কোকিল, পারাবত। কলাপী ('কল'=মিষ্টস্বর; তার 'আপী'=প্রাপক) : কোকিল, ময়ূর। কাদম্বর : কোকিল, শারিকা। কালকণ্ঠ : ('কাল' অর্থাৎ বর্ষাকালে যাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় : বহুব্রীহি) : খঞ্জন, চটক, ডাহুক ময়ূর। কালিকা : বায়সী, শ্যামাপক্ষী। কুমার : শুক, শ্যামা। কুরুয়া (কুরর) : পূর্ববঙ্গে কাক, কুরর ও চিল। কুলিঙ্গ : চড়ুই, ফিঙে। কৃষ্ণ : কাক, কোকিল। ক্রূর : কঙ্ক, শ্যেন।

খর : কঙ্ক, কাক, কুরর। গৃহবলিভুক্ : কাক, চটক, পারাবত, বক ইত্যাদি। চটক : চড়ুই, শ্যামাপক্ষী। নাগাশন : গরুড়, ময়ূর। নাড়ীজঙ্ঘ : কাক, বক। ভাস : কুক্কুট এবং 'ভাস' নামীয় পাখি। মদনা : ময়না, শালিক। মহাবীর : কোকিল, ময়ূর। কিন্তু 'মহাবারিক' নামে জলপাইগুড়িতে অন্য এক নিশাচর পাখিকে বোঝানো হয়। মেধাবী : শুক, সারিকা। ষষ্টিক, ষষ্টিকা : টিট্টিভ, পানকৌড়ি। রবণ : কোকিল, খঞ্জন।

শকুনী : কপিঞ্জল, গৃধ্র, চিল; সাধারণভাবে সকল পাখি। শ্যাম : কোকিল, কোকিলা, কৃষ্ণশারিকা। শ্যামকণ্ঠ : (বহুব্রীহি) : নীলকণ্ঠ, ময়ূর। শ্বেতকাক : বক, সাদা কাক (Heron). সর্পারাতি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ): গরুড়, ময়ূর। সারঙ্গ : কোকিল, চাতক, ময়ূর, (এমন কি হাতী)। সারস : এই নামীয় পাখি, হাঁস। সুপর্ণ (বহুব্রীহি) : কুক্কুট, গরুড়, স্বর্ণচূড়, সাধারণভাবে পাখি। স্বর্ণচূড় (বহুব্রীহি) : কুক্কুট, চাষপাখি। হরি : কোকিল, ময়ূর, শুক, হংস।

পক্ষি-নামের যে অর্থগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তার এক কারণ হল, এক নামে একাধিক পাখিকে নির্দেশ করা ॥

·২২·

পক্ষি-নামের অর্থগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থের সংকোচন ও প্রসারণ দুই-ই ঘটেছে এ ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এক আঞ্চলিক ব্যাপার মাত্র। অঞ্চল বিশেষে বিশেষ ধরনের পাখির প্রাপ্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা, পক্ষি নামের অর্থের বোধ্যতা ও দুর্বোধ্যতা প্রভৃতি এই অর্থের পরিবর্তনে ক্রিয়াশীল হয় বলে মনে হয়। ঔপভাষিক বিশেষত্বও এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

পক্ষী>পেইক বলতে ঢাকাতে কেবল ঘুঘুকেই বোঝায়। রাঢ়বঙ্গের অঞ্চল বিশেষে বিশেষ এক ধরনের ঘুঘু বলতে 'পাঁকঘুঘু' কিংবা সীমান্ত বাঙলায় মুরগী বলতে যখন 'পাংখ্ খিষি' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন 'পংখী' শব্দের অর্থগত পরিবর্তন দেখা যায়। 'ময়না' বিশেষ এক ধরনের পাখি বটে, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কোনো কথা-বলা পাখিকেই 'ময়না' বলা হয়, ময়নার বাক্-ক্ষমতাই এই পরিবর্তনের কারণ। পূর্ববঙ্গের অঞ্চল বিশেষে হলদে পাখিকে বলে কুড়ুময়না<কুটুম+ময়না। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র (৩য় খণ্ড। প্রথম সং ১৯৭১) সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পূর্ববঙ্গে কবুতর - কবিতর - কৈতর শব্দটির অর্থগত পরিবর্তন নির্দেশ করেছেন। 'কৈতর' শব্দের অর্থ 'পারাবত' না করে বলেছেন 'টিয়া' বা 'ময়না' (পৃ. ১১৪)। কিছু পরেই, 'কৈতরা' শব্দের অর্থ নির্দেশ করেছেন, 'পাখির সাধারণ নাম 'কৈতর' (পৃ. ১৪৩)। সংস্কৃতে 'কপোত' বলতে বিহগান্তর অর্থাৎ ঘুঘু প্রভৃতি অন্যান্য পাখিকে নির্দেশ করা হলেও বাঙলায় কপোত বলতে কেবল পারাবতকেই বোঝায়।

ইংরেজিতে মোরগ-মুরগীবাচক 'Cock' ও 'Hen' শব্দের অর্থগত পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ ভাবে যে কোনো পুরুষ পাখি বোঝাতে 'Cock bird' এবং নারী পাখি বোঝাতে 'Hen bird' ব্যবহৃত হয়। তেমনি, ময়ূর Peafowl, Pea-cock : ময়ূরী : Pea-hen.

ফারসি চুযহ্ - চৈয্যা এবং চোযা-র অর্থ পূর্ববঙ্গে সাধারণ ক্ষেত্রে 'বাচ্চা পাখি'। মৈমনসিংহে ফারসি অর্থটি অবিকৃতরূপে মেলে। কিন্তু চট্টগ্রামে অর্থটি সংকুচিত হয়ে কেবলমাত্র 'চড়ুই' পাখিকেই নির্দেশ করে। অবশ্য, এ ক্ষেত্রে চটক>চড়অ>চটঅ>চড় শব্দের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। শাবক ছাও, ছ্যাও+না ছ্যাওনা শব্দটি যে কোনো পক্ষি-শাবককে না বুঝিয়ে রাজশাহীতে কেবল মুরগীর বাচ্চাকেই বোঝায়।

কুমিল্লার 'ফেইস্সা' বলতে ফিঙে, কিন্তু মৈমনসিংহে পেঁচা। 'ফেচা' বলতে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলেই ফিঙে, কিন্তু অঞ্চল বিশেষে 'ফেচা' বলতে 'সাতভাই' বা ছাতারে পাখি। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে 'ফেঁচো' বলতে 'সাচান' (পৃ. ৩৮৩) পাখিকে নির্দেশ করেছেন। শরচান, সঞ্চান, সাচান প্রভৃতি শব্দ মধ্যযুগে

প্রচুর ব্যবহৃত হত। এর প্রচলিত অর্থ 'বাজ' পাখি। কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র এই গ্রন্থেই (পৃ. ৫৬) 'সাচান' শব্দের অর্থ দিয়েছেন: "নিশাচর পাখি বিশেষ, ইহাকে 'কোক পাখি'ও বলে।"

বুলবুল বা বুলবুলি শব্দটি ধ্বন্যাত্মক, মূল শব্দটি ফারসি। কিন্তু ফারসিতে 'বুলবুল' গোটা পাখি জাতেরই সাধারণ নাম একদিকে; অপরদিকে সুকণ্ঠ ছোটো পাখি বিশেষ। 'বুলি' শব্দের প্রভাবে এবং সুকণ্ঠ বলে পাখিটিকে বাঙলায় আমরা 'বুলবুলি' করে নিয়েছি। তারপর তার আঞ্চলিক বিকৃতি ঘটেছে। যেমন, রঙপুরে (‘গোপীচন্দ্রের গানে’) 'বুলবুল', পূর্ববঙ্গের অঞ্চল বিশেষে 'বুলবুল্যা'। কিন্তু আমাদের বুলবুলি আর পারস্যের 'বুলবুল' এক নয়। যাকে আমরা বুলবুলি বলি তা সুকণ্ঠ নয়। পারস্যের বুলবুলির সগোত্র হল ইংরেজি Nightingle বা ল্যাটিন Philomela; বাঙলায় তা দোয়েল-শ্যামা হতে পারে। এইভাবে 'বুলবুল' শব্দটির অর্থগত পরিবর্তন ঘটেছে।

পক্ষি-নামের অর্থগত পরিবর্তনের একটি কারণ—একই নামে একাধিক পাখিকে নির্দেশ করবার প্রথা। এ-বিষয়ে এই অধ্যায়ের ২১-সংখ্যক পরিচ্ছেদে যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তা স্মরণ করা যেতে পারে। কাক-কোকিল, ঘুঘু-চড়ুই, বাজ-মুরগী প্রভৃতি অতি-পরিচিত পাখিরও অর্থগত পরিবর্তন ঘটেছে। দৃষ্টান্ত এই:

কাক: বনকাক, বনকাউয়া, crow pheasant, কুক্কুভ। কাইয়াকুলি (পাবনা): <কাক+ইয়া+কোকিল।

কোকিল>ক'অল, ক'ল (চট্টগ্রাম), কল (কুমিল্লা): ঘুঘু। কোকিল>কোয়াল (সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি): ঘুঘু। কোকিল>কোয়াল (ফরিদপুর): ডাহুক। দধিকুল (ঢাকা) >দধি+কোকিল, দোয়েল। শ্মশানকুলি (সিলেট)। যমকুলি (কুমিল্লা): <শ্মশান, যম+কোকিল, কুক্কুভ। হাইড্যাকুলি: <হাঁড়ি+ইয়া +কোকিল। খুঁটকুলি (খুলনা): <খুঁটি+কোকিল, বুলবুলি অর্থে।

গরুড়, চিল, বাজ: গোরাচিলা (ঢাকা): <গরুড়+চিল+আ, চিল জাতীয় পাখি বিশেষ। গোসিলা (কুমিল্লা)। বাজকুরাল (ফরিদপুর, বরিশাল): <বাজ+ কুরর, কুরল। হাড়গোরল (জলপাইগুড়ি): <হাড়গিলা+গরুড়।

গুড়গুড়ি, গুড়গুড়ে: হলুদগুড়গুড়ে, হলদেগুড়ো (মেদিনীপুর): <হলুদ+ গুড়গুড়ে।

ঘুঘু, বক, হরিয়াল: বগলাঘুঘু: <বগলা+ঘুঘু, ঘুঘু বিশেষ। কাকবক: <কঙ্ক+বক। হল্তেলঘুঘু, হরিয়ালঘুঘু: হরিয়াল।

চড়ুই: চড়াই (রাজশাহী), চরাই (রঙপুর): <চটক, 'মোরগ-মুরগী' অর্থে। চ'রা, চ'রে (মৈমনসিংহ), 'মোরগ-মুরগী' অর্থে। চাইনচরা (চট্টগ্রাম): চর্ম-চটিকা অথবা স্বর্ণচটক, 'চড়ুই' অর্থে ডাউক-চড়াই (জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রঙপুর): <দাত্যূহ+চড়াই, ডাহুক। হলৈদা চরৈ (চট্টগ্রাম): <হলুদ+ইয়া+চড়ুই, 'হলুদপাখি' অর্থে। সোনাচড়া: <স্বর্ণচটক, চাষ বা চাস পাখি। 'চড়ুই' শব্দের অর্থগত পরিবর্তন এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

টিয়াতোতা, টুইয়াতোতা :<টিয়া, টুইয়া+তোতা, শুক, সারি ইত্যাদি অর্থে।

পারো (রাজগঞ্জথানা, জলপাইগুড়ি) <পারবত, 'ঘুঘু' অর্থে ব্যবহৃত। যেমন আমপারো : <রাম পারাবত, বড়ো ঘুঘু বিশেষ। রায়বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল তাঁর বইতে Moorhen-এর বাঙলা প্রতিশব্দ দিয়েছেন, 'ডাহুক পায়রা'। ব্লানফোর্ড লিখেছেন, 'ডাক-পায়রা'। এই প্রসঙ্গে 'জল-পায়রা' শব্দও মনে করবার মতো।

বাউইটিয়া, বাওইটিয়া (পূর্ববঙ্গ গীতিকা : ৩য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০। 'আনয়াবিবি' পালাতে) :<বাবুই+টিয়া।

কুটুমময়না : <কুটুম+ময়না, 'ইষ্টিকুটুম' পাখি।

জল-ময়ূর (pheasant-tailed Jacana) : জল+ময়ূর।

মুরগী : গাছমোরগ (পাবনা) : <গাছ+মোরগ, 'শকুন' অর্থে। জলমুরগী, জলমোরগ (water hen).

আরবি 'হুদহদ' মানেই 'বাজ পাখি। কিন্তু কুমিল্লা-চট্টগ্রামে পুনরুক্তি করা হয় 'হুদ্‌দুতবাজ' বলে।

চখাচখীকে হিন্দীতে বলে 'সুরখাব' অর্থাৎ 'লালাচোখ'। এর থেকে চক্রবাক বলতে কেবল 'লাল' শব্দই চালিত হয়ে গেছে। হিন্দীতে শালিককেই ময়না বলে, অথচ বাঙলায় শালিক ও ময়না ভিন্ন দুই পাখি। হিন্দী গবুড়, বাঙলায় অপ্রচলিত হলেও, 'হাড়্‌গিলে'। চকোর বলতে 'চন্দ্রকরপানে তৃপ্ত পাখি বিশেষ', কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে চক্রবাক্। সাধারণভাবে, 'মুরগী বলতে বাঙলায় 'মোরগ-মুরগী' উভয় লিঙের পাখিকেই বোঝায় ॥

২৩

পুংলিঙ ও স্ত্রীলিঙ-বাচক পক্ষি-নামও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে আলোচনার যোগ্য।

বাঙলা ভাষায় প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেই পাখির স্ত্রীলিঙ-বাচক শব্দ তৈরী হয়েছে। ঈ-প্রত্যয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। যেমন : নর-কৈতর (চট্টগ্রাম) : পুরুষ পারাবত। 'নর-পায়রা' শব্দও অন্যত্র মেলে। কোক-কামিনী : কোকের রমণী। পরভৃত বধূ : পরভৃতের বধূ। পিক সীমন্তিনী। পুংস্কোকিল। সাধারণভাবে পাখির স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে, কাব্যে ও লোকসাহিত্যে 'পক্ষিনী'।

বাঙলা কথ্যভাষায় সচরাচর পাখির স্ত্রী-লিঙ্গবাচক রূপটি উচ্চারিত হয় না। তা মূলতঃ কাব্যে ও লোকসাহিত্যেই দেখা যায়। কথ্য ভাষাতে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ দিয়েই স্ত্রী-পাখিকেও নির্দেশ করা হয়। তেমনি, কাচিৎ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'মুরগী' বললে 'মোরগ-মুরগী' দুই-ই বোঝায়।

কোনো-কোনো পাখির একাধিক স্ত্রী-লিঙ্গ রূপ চালিত আছে, নীচের উদাহরণেই তা দেখা যাবে। কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ-বাচক শব্দকে স্ত্রী-লিঙ্গে আনয়ন করে অতঃপর নতুন করে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে পরিণত করা হয়। যেমন : কৈতরা : কৈতরী। কোকিলা : কোকিলী। খঞ্জনা : খঞ্জনী। চটা : চটী। চটকা : চটকী, চটকিনী। টোনা : টুনী। টেওরা : টেউরী। বগা : বগী। মোরগা : মুরগী। সারসা ('অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র) : সারসী। হংসা (উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে) : হংসী।

এসব ক্ষেত্রে আসলে পুংলিঙ্গ-বাচক শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় 'আ' যুক্ত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রত্যয়গুলো সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, বিহারে উলুয়া<উলূক। পিঙ্গলা পেঁচা বিশেষ। খঞ্জনীয়া : <খঞ্জন, মধ্যযুগের বাঙলাতে। শালুকি হাওড়া : শালিক।

পাখির স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দরূপে বাঙলায় মেলে :

-আ- : কোকিল—কোকিলা, কুকিলা। খঞ্জরীট—খঞ্জরীটা। চটক—চটকা। পরভৃত—পরভৃতা। বলাক—বলাকা। মত্ত (কোকিল)—মত্তা। ময়ূর—ময়ূরা (উপভাষায়)। হংস—হংসা।

-আনী- : চিল—চিলানী। পেঁচা—পেঁচানী।

-ইকা- : বিনায়ক—বিনায়িকা। হরিতাল—হরিতালিকা।

-ইনী- : কপোত—কপোতিনী। কাক—কাকিনী। চকোর—চকোরিণী। চটক—চটকিনী। ময়ূর—ময়ূরিণী। হংস—হংসিনী।

-ই (ঈ)- : উল্লুকি (জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে)। উৎক্রোশ—উৎক্রোশী। কইতর—কইতরী। কপোত—কপোতী। কহ্লক-(Ring-dove)-কহ্লকী। কাগ—কাগী। কুইলা—কুইলী। কুখা—কুখী। কুরর—কুররী। কুরল—কুরলী। কেকা—কেকী। কোক—কোকী। কৈরব—কৈরবী। খঞ্জন—খঞ্জনী। গুয়েন্যাকড়া—গুয়েনেকড়ী। গৃধ্র—গৃধ্রী। চকোর—চকোরী। হিন্দী চকোয়া—চকোয়ী। চক্রবাক—চক্রবাকী। চখা—চখী। চটা—চটী। চাতক—চাতকী। চুটিয়া—চুটী। ধৃতরাষ্ট্র—ধৃতরাষ্ট্রী। ফিঙ্গা—ফিঙ্গী। বক—বকী। বায়স—বায়সী। মরাল—মরালী। শার্ঙ্গ—শার্ঙ্গী। সারস—সারসী। হারীত—হারীতী।

-উনী- : চিল—চিলুনী (ঢাকা)। কুঁড়া—কুঁড়ুনী (পূর্ববঙ্গ)। ডমনা—ডুমুনী (উত্তরবঙ্গ)।

-নী- : চিল—চিল্‌নী। চড়াই—চড়্‌নী (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'তে)। ডম্‌না—ডুম্‌নী। ডা'ক—ডা'কনী। পক্ষী—পক্ষিণী।

বোম্বাইয়ের পারশিদের মধ্যে স্ত্রীকাক বোঝাতে 'কাগরি' শব্দ মেলে। একই অর্থে 'কাগুই' শব্দও চলে।

বাঙলা ছড়ায় লোকসঙ্গীতে 'শুয়া' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীলিঙ্গের নয়। শুক+আদরার্থে আ, শুয়া। যেমন, 'গোপীচন্দ্রের গানে' (ক. বি. ১৯৬৫) পাই : 'সার বলে, শুন দাদা, শুয়া প্রাণের ভাই।'

এই প্রসঙ্গে, নারীর নামরূপে কয়েকটি পাখির নামও উল্লেখযোগ্য। যেমন, কোকিলা, চন্দনা, পাপিয়া, বুলবুলি, ময়না, মুনিয়া প্রভৃতি। পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার আদিবাসী রমণীর নাম রূপে পাই, 'ময়ূরা'। মার্জিত সমাজে 'সুপর্ণা' নাম অনেক মহিলারই থাকে। 'হাঁসুলি' বাঁকের উপকথা'র তারাশঙ্কর এক নারীচরিত্রের নাম দিয়েছেন, 'পাখী'॥

২৪···

পাখি সম্পর্কে সহচর ও সমষ্টিবাচক শব্দও মেলে। এইখানে তার উল্লেখ করি।

সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, খুব পরিচিত পাখিরাই সহচর শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমধর্মী ও সমজাতীয় পাখিরাই সহচর শব্দ সৃষ্টি করে। যেমন:

পূর্ববঙ্গে কাউয়া-কুলি খুব মেলে। কাক-কোকিল। কাল-চিল। কাকের ছা', বকের ছা'। কাক-পক্ষী টের না পাওয়া। কাক-ফিঙ্গে। কাগ-বর্গ। কাগা-বগা। কোকিল-পাপিয়া। ঘুঘু-তিতির। চড়ুই-বাবুই। চাতক-চকোর। চিল-শকুন। চিল্ল-সাচান। টিয়ে-ময়না। টুনি-বুলবুলি। ডাউক-সারস। তিতির-গুড়ুর। তোতা-ময়না। দোয়েল-কোয়েল। ফিঙ্গে-বুলবুলি। বক-সারস। বাজ-চিল। বাজ-শকুন। বাজ-শিকরে। ময়না-কাকাতুয়া। ময়ূর-খঞ্জন। শকুন-সাচান। সারী-শুয়া। শালিক-চড়ুই। শুক-সারী। শুয়া-শালিক। হাঁস-পায়রা। হাঁস-মুরগী।

পাখি সম্পর্কে ইংরেজিতে সমষ্টিবাচক শব্দের যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়, বাঙলা বা কোনো ভারতীয় ভাষায় তা নেই। ইংরেজিতে বিশেষ-বিশেষ পাখি সম্পর্কে বিশেষ-বিশেষ সমষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার কয়েকটি এই:

Bevy of quils Brood of grouse. Building of rooks. Cast hawks. Covery of partridges. Desert of lapwings, Fall of wood-cock Flights of doves. Flock or gaggle of geese. Herd of cranes. Muster of peacocks. Nide of pheasant. Sedge or siege of herons Watch of nightingles. Wisp or snipes.

এর তুলনায় বাঙলা ভাষায় পাখি সম্পর্কীয় সমষ্টি-বাচক শব্দ খুবই কম। সাধারণ ক্ষেত্রে 'ঝাঁক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক ঝাঁক পাখি, এক ঝাঁক পায়রা। উত্তর বাঙলার একটি বিয়ের গানে মেলে: 'ঝাঙ্কের পংখী ঝাঙ্কে রে উড়ায় মোর সাহুদের (সাধুর) বাজারে।' এ ছাড়া আছে: একদল কাক, শকুন, সারস। একপাল হাঁস, মুরগী। একদঙ্গল ময়ূর।

পাখির শাবক নির্দেশ করতেও বাঙলার চেয়ে ইংরেজি ভাষা সমৃদ্ধতর। উদাহরণ এই: Duck: ducklings. Eagles: eaglets. Game-birds: cheepers. Gees: goslings. Hawks: eyasses. Pigeons: squats. Wildfowls: flappers.

বাঙলায় পাই : ছা' 'ছাও' ছ্যাওনা', বাচ্চা, 'শাবক'। এ ছাড়া অন্য শব্দ-নেই ॥

·২৫

অনেক পাখিই বিদেশি। বিদেশি পাখির যখন স্বদেশী ভাষায় নামকরণ হয় তখন তার মধ্যেও বিহঙ্গচারণা লক্ষ করা যায়। ভাষাতত্ত্বের দিকে থেকেও তা গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক পাখির নানা নামকরণ হয়ে থাকে। বাঙলা ভাষায় যাঁরা বিদেশি পাখির নামের অনুবাদ করেছেন, কিংবা নতুন নামকরণ, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে পক্ষিপ্রেমিক পক্ষিতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক এবং এমন কি, অশিক্ষিত পাখিওলারা পর্যন্ত আছেন।

ময়ূর অর্থে আরবি শব্দ 'তা উস' থেকে ভারতে তাউস শব্দ চলিত হয়ে গেছে। আরবি 'হুদহুদ' (বাজ) থেকে পাওয়া যায় 'হুদুত' (কুমিল্লা চট্টগ্রাম) তারপর 'হাঁদাল' (নোয়াখালি)। বাজ পাখি অর্থেই আরবি শব্দ 'বহ্‌রী' থেকে হিন্দী ও মারাঠীতে 'বহরী' পাওয়া যায়। এর সঙ্গে ফারসি 'বাজ' শব্দ মিলে হয়েছে 'বাজবাড়ী' (চট্টগ্রাম)। ফারসি 'কবুতর' শব্দের কতো বিচিত্র পরিবর্তন বাঙলায় হয়েছে তার উদাহরণ আগেই দিয়েছি। ফারসি 'বুলবুল' থেকে বাঙলায় 'বুলবুল' 'বুলবুলি', 'বুলাবুল' (উত্তরবঙ্গ) পাই।

ইংরিজি 'Eagle' শব্দের বিপ্রকৃষ্ট বঙ্গীয় রূপ 'ঈগল' এবং স্বরসঙ্গতি-জাত উচ্চারণ 'ঈগোল' 'ইগোল'। যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'পশুপক্ষী' বইতে Golden eagle এর বাঙলা করেছিলেন 'স্বর্ণ-ঈগল'। বনফুল Serpent eagle-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন 'সর্প-ঈগল', White-tailed Fishing eagle-এর অনুবাদ করেছেন 'মৎস্যগরুড়'। প্রথম অনুবাদটি আক্ষরিক দ্বিতীয়টি পুরাণ-প্রভাবিত।

সাতসহেলী বা সয়ালীকে বনফুল বলেন 'আলতাপরী' (Scarlet Minivet) — এখানে 'Scarlet' শব্দটিই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দীতে, যাকে বলে 'গান্দাম' (একেই কি উত্তরবঙ্গে 'গোধম বলে?)' ইংরেজিতে Banting, বনফুল তার নাম দিয়েছেন, 'সোনাপাখি'। বাঙলা 'খরকচুরা' (Brow shriek) নাম বনফুলের পছন্দ হয় নি। এ পাখির কানের ওপরের দিকে, চোখের ওপর দিয়ে একটি কালো রেখা থাকে বলে তিনি এর নাম দিয়েছেন, 'কাজলপাখি'। এখানে পাখির দৈহিক বিশেষত্বই নতুন নামকরণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল হয়েছে।

প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত মশাইও এক সময়ে অনেক পাখির নব-নামকরণ বা বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। যেমন : শ্বেতভ্রূ বুলবুল (White-browed Bulbul); মেঠো ছাতারে (Common Babler), পুচ্ছনপাখি (White-browed flycatcher). হিন্দী 'ঘাসকি ফুটকি' বা 'ঘাসফা পিটপিট্টির প্রদ্যোতবাবু বাঙলা নাম দিয়েছেন 'ফুলো ফুটকি', যেহেতু এর ল্যাজ কুলোর মতো এবং গায়ে 'ফোঁটা' আছে। ইংরেজি Blue

throat বা Red-spotted Blue-throat হিন্দী (হোসেনী ফিন্দা)-এর বাঙলা করেছেন 'গন্পীকণ্ঠ' বা 'নীলগ্রীব'। তেমনি 'Tickle's flowerpecker, হিন্দী 'ফন্লন্ছন্কী'র বাঙলা 'পরাগপাখি'। ফন্লের সংস্পর্শে এখানে 'পরাগ' শব্দ এসেছে, এবং নামকরণে কবিত্বের ছোঁয়া লেগেছে। চোখের চারপাশে সাদা গোল একটি বন্ত থাকায় White-eye বা 'বাবন্না' (হিন্দী)-কে প্রদ্যোতবাবন্ বলেছেন 'চশমা পাখি'।

পাখির নামকরণে শ্রীঅজয় হোমের নামও উল্লেখ করবার মতো। Fairy Blue bird-কে অজয়বাবন্ বলেন 'নীলপরী' সম্ভবতঃ বনফন্লের 'আলতাপরী'র প্রভাবে। অশিক্ষিত পাখিবিক্রেতারা একেই বলে 'বন্লন্' < Blue. হিন্দী আবাবিল, ইংরেজি Swallow-কে তিনি বলেন 'হাওয়াশীল'। হিন্দী নওরঙ বা নভরঙ্, ইংরেজি Indian Pitta-কে 'শন্মচা' নাম দেওয়া তাঁর মনে ধরে নি। নতুন নাম দিয়েছেন, 'বর্ণালী'। 'হাওয়াশীল' ছাড়া সব ক'টি নামকরণই সন্দর ও কবিত্বময়। ফারসি হাওয়া শব্দের সঙ্গে তৎসম 'শীল' মানানসই হয় নি।

'Bird of Paradise' হল নিউগিনির জমকালো পালকওলা কাকজাতীয় এক ধরনের পাখি। 'Paradise' শব্দের মন্ল হল, প্রাচীন পারসিক শব্দ Pairidaeza ; এর থেকে গ্রীক শব্দ এসেছে Paradeisos = a Park. বাঙলায় অনন্বাদ করবার সময় ইংরেজি 'Paradise' শব্দটিই অনন্বাদকদের দন্ষ্টি সবখানি কেড়ে নেওয়ায় অনন্বাদেও তার ছাপ পড়েছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার করেছেন 'নন্দন পাখি' ; সতীশচন্দ্র মিত্র করেছেন 'বৈকুণ্ঠ পাখি' ; বনফন্ল করেছেন 'পরমপাখি'।

কিন্তু শ্রীঅজয় হোম মশাই সম্পন্র্ণ অন্য এক পাখিকে 'নন্দনপক্ষী' বলতে চান। ইংরেজি Paradise fly-catcher, যাকে হিন্দীতে বলে দন্ধরাজ, টাকলা, হোসেনী বন্লবন্ল, বাঙলায় অনেকে যাকে বলে 'শা-বন্লবন্ল', তার সম্পর্কে 'বাঙলার পাখি' বইতে তাঁর মন্তব্য : "ভারতে যদি কোনও পাখিকে নন্দনপক্ষী বলা যায় তবে এই পাখিকেই। কথিত আছে, স্বর্গের কোনও দেবতা চপল মতি ও চঞ্চল স্বভাবের জন্যে একটি অপকর্ম করে ফেলায় স্বর্গ থেকে চিরনির্বাসিত হন। মনের দন্ঃখে তিনি নিজেকে এই পাখিতে রন্পান্তরিত করে ধরাধামে নামেন।"—পন্ ৭৩

এই অনন্বাদে তিনি 'মিথ্' দ্বারা প্রভাবিত।

মন্রগির বাচ্চা অর্থে ইংরেজি Chicken থেকে মেলে 'চিক্নি' (যশোর, খন্লনা) এবং 'চিকুনি' (খন্লনা)। গোটা ইউরোপের প্রিয়তম পাখি, Robin উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় উচ্চারণে হয়েছে 'রন্বিন' (হরকরা পত্রিকা। ১৫ই মার্চ, ১৮২৩)। বিশেষ এক ধরনের পাখি Bud gerigar (এদের love birdও বলা হয়) বাঙলায় হয়েছে 'বদরিকা'। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার কৌতুক করে Phoenix-এর বাঙলা করেছিলেন 'ব্যঙ্গমা' (দ্রঃ ভারতী। ফাল্গন্ন, ১৩৩২। পন্. ৪৪৫)। আফ্রিকা ও আরবের দীর্ঘপদ, লম্বগ্রীব পাখি Ostrich—উটের সঙ্গে দৈহিক সাদন্শ্যের ফলে এবং 'উষ্ট্র' শব্দের প্রভাবে বাঙলায় 'উটপাখি'তে পরিণত হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার 'লায়ার বার্ড' প্রায় বিনা প্রতিবাদেই 'বীণা পাখি' নাম পেয়েছে। 'Secretary bird'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ জগদানন্দ রায়ের বইতে মেলে 'কেরাণী পাখি'। এ পাখির একটি পালক

কানে কলম গোঁজা 'সেক্রেটারী'র মতো, কিন্তু বাঙালির কাছে কেরাণীর নাম ও রূপ অতি পরিচিত বলে বাঙালি একে 'কেরাণী পাখি' রূপেই অনুবাদ করে নিয়েছে। 'Butcher bird'-এর বাঙলা 'কসাই পাখি'-কে প্রথম করেছিলেন জানি না, আমি এর প্রাচীনতম উল্লেখ পেয়েছি সুরেন্দ্রনাথ সেনের রচনায় (দ্রঃ 'প্রতিভা' পত্রিকা : ফাল্গুন, ১৩২২। পৃ. ৪২১)।

মালয় দ্বীপের দুটি পাখি বাঙলা দেশ ও সাহিত্যে খুব পরিচিত। মালয়ের lory (Psittacus lory—Carey থেকে বাঙলায় 'লুরী' বা 'নুরী' এবং তারপর (যেমন 'নকলনোর' পাখি) হয়েছে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর কবিতায় দু' একবার এ নামের উল্লেখ করেছেন। 'কাকাতুয়া' বা 'কাগাতোয়া' শব্দটি ধ্বন্যাত্মক। মালয় শব্দ 'Kakatua', পোর্তুগীজ শব্দ 'Catatua', এবং ইরেজি শব্দ 'Cocktoo' এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যে 'কাকাতুয়া' বারংবার উল্লিখিত হয়েছে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় দশ খণ্ডে প্রকাশিত 'শিশুভারতী'তে একদা অনেক বিদেশী পাখির নামের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয়েছিল। পালকের দীপ্তির জন্যে প্রসিদ্ধ, এশিয়ার একটি পাখি 'ক্রোগোন'-এর অনুবাদ পাই : 'দীপ্ত পাখি' (৫ম খণ্ড। পৃ. ১৯৩৬)। নবম খণ্ডে (পৃ. ৩৪৫৩-৩৫৫৪) কয়েকটি অস্ট্রেলীয় পাখির নামানুবাদ দেওয়া আছে : 'রিজেণ্ট বার্ড' : 'সোনালী রাজপক্ষী', এখানে 'Regent' শব্দের প্রভাব লক্ষণীয়। 'রাইফেল বার্ড' : পিঙ্গলবর্ণের 'মখমখ' পাখি। 'লায়ার বার্ড', 'বাজনা পক্ষী'। পোডারগি : 'বিশাল বদনা', নারীত্বের আরোপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ম্যাগ-পাই : 'হরবোলা'। লাফিং জ্যাকাস : 'হাস্যকারী পক্ষী', একেবারেই আক্ষরিক অনুবাদ।

বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে বনফুল-এর বিজ্ঞান চর্চার কথা সুবিদিত। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর 'ডানা' উপন্যাসে তিনি বেশ কয়েকটি পাখির নামানুবাদ করেছেন। তার কিছু দৃষ্টান্ত আগেই দিয়েছি, আর কয়েকটি এই : Diving Duck : 'ডুবুরি হাঁস'। Pedestrian Duck : 'ভূমিচর'। Perching Duck : 'তরুচর'। Surface feeding Duck : 'সম্মুখ ভোজী'। Flamingo : 'লম্বগ্রীব', 'লম্বচরণ', 'লম্বপাদ'।

কয়েকটি পাখির নামের অনুবাদ সংশয়বিতর্কের অতীত নয়। অর্থাৎ এগুলো ইংরেজি থেকে বাঙলা, কি বাঙলা থেকে ইংরেজি, তা সহসা বোঝা যায় না। চখা-চখীকে ইংরেজীতে বলে 'Brahminy Duck' ; তেমনি বামনি শকুন বা বামুন শকুনকে বলে 'Brahminy Kite' ; স্পষ্টতঃই এখানে তৎসম 'ব্রাহ্মণ' শব্দই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। কিন্তু ছোটো বসন্তবউরিকে ইংরেজিতে বলে 'Copper-smith bird', নদীয়া জেলায় বলে 'স্যাকরা পাখি'। এখানে কোনটা মূল, তা বিতর্কের বিষয়। এই রকম সন্দেহ 'গাইবক' বা 'গো-বক'-এর ইংরেজি 'Cattle Egret'কে নিয়েও। বককে হিন্দিতে বলে 'আন্ধা বগুলো', বাঙলার অঞ্চল বিশেষে 'কানীবগুলো'। W. T. Blanford এর অনুবাদ করেছেন, 'Blind Heron'—একেবারেই আক্ষরিক অনুবাদ যাকে বলে। এই রকম আর একটি আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টান্ত হল : 'Weather cock'কে 'বাতশকুন' বা 'বায়ু মোরগ' বলাতে।

নিরক্ষর পাখি-বিক্রেতারাও অনেক সময় পাখির নতুন নামকরণ করে। তার উদাহরণ একটু আগেই দিয়েছি। আর একটি এই : হিন্দী 'বুলাল চশম' এবং 'গুলচশম'কে গুলিয়ে তারা বলে 'গুলাব চশম' —'সংমিশ্রণে'র এক চমৎকার দৃষ্টান্ত এটি ॥

২৬··

সব পাখিই সত্যিকারের পাখি নয়। গল্পে-ছড়ায়-গানে এমন অনেক পাখির উল্লেখ দেখা যায়, যা আদপেই পাখি নয়, কাল্পনিক পাখি বা পাখি জাতীয় প্রাণি-বিশেষ। প্রত্যেক দেশেই এমন কাল্পনিক পাখির অস্তিত্ব থাকে দেশবাসীর বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো আবার সংমিশ্রিত প্রাণী, অর্থাৎ একাধিক প্রাণীর সমবায়ে গঠিত বলে কল্পিত।

ইউরোপীয় বিশ্বাসে এমন কাল্পনিক প্রাণীর উদাহরণ খুবই মেলে। যেমন : Cherub : শিশুর মতো আকার যুক্ত ডানাওলা স্বর্গীয় জীব বিশেষ। Griffin, Griffon Gryphon : ঈগলের মতো মাথা ও পাখাওলা এবং সিংহের মতো দেহযুক্ত কল্পিত জীব বিশেষ। Pagasus : পাখাওলা পৌরাণিক ঘোড়া বিশেষ (তুলনীয়, আমাদের পক্ষীরাজ' ঘোড়া এ ঘোড়া দানবী মেডুসা-র রক্তজাত। Sphinx : মানবীর মতো মাথা সিংহিনীর মতো দেহ, কিন্তু পাখির মতো পাখা যুক্ত।

আমাদের দেশেও এই ধরনের কিছু জীবের সন্ধান মেলে।

আফরাঙ্গা : এই কাল্পনিক পাখির নামটি পাওয়া গেছে পূর্ববঙ্গের একটি লোক-কথায় 'Story of the Bull' : Folk tales of Bangladesh : Vol. I Bangla Academy, Dacca : March 1972. PP. 99-100 : Kabir chowdhury). শব্দটির মূল অজ্ঞাত।

গুলগুলি : 'গুলগুলিতে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে'। অবশ্য, বুলবুলি > গুলগুলি আসতে পারে। (তুলনীয় : পুব > পুগ। যুবতী > যুগতী। সাগু > সাবু)। ইংরেজী White-browed Bulbul-এর সিংহলী রূপ 'গুলগুয়া'ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

জীবঞ্জীবক : এক প্রকার দ্বি-মস্তক কাল্পনিক পাখি। বৌদ্ধ জাতকে এর উল্লেখ পেয়েছি।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী : বিহঙ্গম, বিহঙ্গমী।

ভারুণ্ড : একোদর, পৃথকগ্রীব, কাল্পনিক পাখি।

সিয়ামুরগ (মৈমনসিংহ) : আরবি-ফারসি সীমুর্গ। রূপকথার বিরাটকায় পাখি।

হাট্টিমা-টিম, হুতুম-থুমো, হুটটুমা-টুম, হুমো : এ নামগুলো স্পষ্টই কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়ায় আছে : 'তালগাছেতে হুতুম থুমো আছে পাঁদারু'। 'হুতুম থুমো' নামের মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার' আভাস আছে। 'আয় রে পাখি হুমো', কিংবা 'চালতা তলায় আছে হুমো' প্রভৃতি পঙ্ক্তির 'হুমো' 'হুতুমথুমো' থেকে আসা বিচিত্র নয়। মুর্শিদাবাদে বলা হয়, 'প্যাঁচা হুম্-হুম্ করে ডাকছে'। হুম+ও> হুমো হতে পারে। হুতোম প্যাঁচার ডাক হিসেবে ধ্বন্যাত্মক রূপ পাওয়া যায় : 'হুত্‌তুম্, হুদ্-হুদ-তুম্'। এর থেকে স্বতোমূর্ধণ্যীভবনের ফলে সহজেই 'হুটটুমা-টুম' হতে পারে। যেমন, বর্ধমানের একটি ছড়ায় : তাল গাছেতে হুটমা-টুম্ হুলো পাঁদারু'। পরবর্তীকালে এই পাখির ওপর রাক্ষসের রূপ-গুণ আরোপিত হয়েছে। রাক্ষস মানুষ খায় বলে কল্পিত, তার শিং আছে, হুতোম প্যাঁচা ডাকলে বাড়িতে লোক মারা যায়, সে কারণে সে রাক্ষসতুল্য এবং ইংরেজিতে হুতোমপ্যাচাকে বলে Horned owl, অতএব ছড়া পাওয়া গেল : 'হাট্টিমা-টিম্-টিম্, তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিং'!

...২৭...

মানুষ কতো বিচিত্রভাবে পাখির নাম চয়ন করেছে, এবং সেই নাম-প্রদানের কালে কিভাবে তার ভাষা-বৈভব বৃদ্ধি করেছে, এর মধ্যে লোক-মনস্তত্ত্ব কিভাবে কাজ করেছে, —এ পর্যন্ত তাই দেখানো হলো। এবারে আর এক নতুন প্রসঙ্গে আসছি।

পাখি ও পক্ষিনামকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করে মানুষ অন্যান্য প্রাণী, ফুল-ফল-তরুলতা ভাব ও বস্তুর নামকরণ করেছে। এতে মানুষের শব্দসম্পদের সঙ্গে পাখি যুক্ত হয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে।

গাছ-ফুল-ফলের নামকরণের সঙ্গে পাখির নামকে যুক্ত করবার প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তা হলো পাখির সঙ্গে কৃষি ও বৃক্ষের সম্পৃক্ততা। এ. এ. ম্যাকডোনেল এবং এ. বি. কীথ সম্পাদিত, দুখণ্ডে সম্পূর্ণ 'Vedic index of names and subjects' বইতে (P. 24) কোকিলের প্রতিশব্দরূপে প্রাপ্ত 'অন্যবাপ' (মৈত্রায়ণীসংহিতা ৩. ১৪. ১৮. ; এবং বাজসনেয়িসংহিতা ২৪ ৩৭) শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে 'অন্যের জন্যে যে বপন করে' অর্থাৎ কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, —'ডিমপাড়া' এখানে 'বপন করা'তে পরিণত, কৃষিকর্মের প্রত্যক্ষ উল্লেখ। উক্ত গ্রন্থেই বৈদিক 'আণ্ডিক' (P. 56) শব্দের অর্থ নির্দেশে যুগপৎ 'গাছ' ও 'পাখির নাম উল্লিখিত হয়েছে। 'কুণাল' শব্দে সাধারণতঃ পদ্মকে বোঝালেও হিমালয় অঞ্চলে এই শব্দে 'হাঁসকে'ও বোঝায়' যেহেতু হাঁস পদ্মবনে কেলি করে। জলপাইগুড়ি-কোচ-বিহারের অনেক অঞ্চলে, লোকসাহিত্যে, ডিমকে বলা হয় 'হাঁসের ফল',—'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্রও সে কথা বলেছেন। এখানে হাঁস যেন একটি গাছ। তেমনি, ফুলের

'পাপড়ি' শব্দটিও লক্ষণীয় : হিন্দীতে শব্দটি হলো 'পখড়ী', ওড়িয়ায় 'পাখুড়ি'। শব্দটির মূল হলো 'পক্ষাকৃতি'। ফুলের দল (Petals)-কে এখানে পাখির পাখার সদৃশ বলে মনে করবার জন্যেই শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে।

এবার পাখিকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করে গাছ-ফুল-ফলের নামকরণের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

গাছ ও পরগাছার নামকরণে : কাইয়া টুঁটি (ঢাকা) : গাছ বিশেষ। কাউয়া ঠোকরি (রাজশাহী) : বড়ো সবুজ পাতা বিশিষ্ট একপ্রকার জলজ আগাছা। কাউয়া ডিমা (পাবনা, রাজশাহী) : গাছ বিশেষ। কাঠঠুকরি (বগুড়া) : একপ্রকার ভেষজ গাছ। কাকতুণ্ডী : কাকনাসা বৃক্ষ। কাঁটা কোকিলা, কোকিলাক্ষ : কুলেখাড়া গাছ। কেউয়া ঠুঁটী < কাকতুণ্ডী। কেউয়াঠেঙা : সংস্কৃতে 'কাকজঙ্ঘা'। ঘুঘুবাকত (রাজশাহী) : গাছ বিশেষ। পদ্মবক : গাছ বিশেষ। পিকবন্ধু, পিকবল্লভ, পিকরাগ : আমগাছ। ময়ূরপঙ্খী : Thuja chinensis. শুকবর্হ : গ্রন্থিপর্ণী বৃক্ষ। হংসরাজ : কালীঝাঁপ গাছ (Indian Maidenhair Fern).

পঙ্খীরাজ : একপ্রকার পরগাছা-ফুল, দেখতে পাখির মতো। গাভ্ডাপাখি (জলপাইগুড়ি) : উড়ন্ত পাখির মতো দেখতে এক ধরনের পরগাছা। চিলের গাছ : পরগাছা বিশেষ।

পাতার নামকরণে : পাখিলতা : ইষের মূল। পারাবতপদী : নয়াফটকীলতা অর্থাৎ কাকজঙ্ঘা। হংসপদী বৃক্ষ, হংসাঙিঘ্র : গোধাপদীলতা, সূতপাদিকা। হংসলতা : Giant Swan Creeper.

ফুলের নামকরণে : কোকনদ : কোক পাখিকে যে শব্দ করায়, রক্তোৎপল। কুক্কুটশিখ : কুসুম্ববৃক্ষ, কুসুম ফুলের Safflower) গাছ। গরুড় চাঁপা : কাঠচাঁপা। বকফুল : অগস্ত্যপুষ্প, কাকশীর্ষ, কাকনাস। মোরগ ঝুঁটি বা মোরগ ফুল : Cock's comb flower. শরালি (বগুড়া) : জলজ ফুল বিশেষ। শুকপুষ্প : শিরীষ ফুল।

ফলের নামকরণে : কাউফল<কাকফল। কাউয়ার পাস্তা (ঢাকা) : এক প্রকার বনজ ফল, মাকাল (?)। কাউয়ার লুলি (সিলেট) : মাকাল ফল। কাকোডুম্বর, কাকোদুম্বর : কাকপ্রিয় বা কাকবৎ হেয় উদুম্বর বিশেষ। কেয়োখাগী (খুলনা) : আম বিশেষ। টিয়াপুরী, টিয়াঠুট্যা (পূর্ববঙ্গ) : টিয়ের ঠোঁটের মতো বাঁকানো এক প্রকার লাল আম বিশেষ। পারাবত ফল : গাব ফল। ময়ূরগ্রীব : তুথ, তুঁতে। ময়ূর-তুথ : নীল তুথ বিশেষ। মাছরাঙা জাম : বিশেষ। শুকজিহ্বা, শুয়াঠোঁটী : শুকের জিহ্বার মতো দেখতে বলে ফলটির এই নাম। শুকবল্লভ : দাড়িম্ব ফল।

ধানের নামকরণে : কাওয়াভোগ (কোচবিহার) : হৈমন্তিক, সরুধান। কৈতরথুপি (ঢাকা) : ধান বিশেষ। কৈতরমণি (বগুড়া) : আউশ ধান বিশেষ। চিলা-কাউয়া (রঙপুর) : ধান বিশেষ। পক্ষিরাজ (পাবনা) : কালো ধান বিশেষ। পাখিরাজ (উত্তরবঙ্গ) : মোটা আমন ধান বিশেষ। পক্ষিরাজ : আমনধান বিশেষ। পায়রা রস ('অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র) : ধান বিশেষ। বগবুলে (উত্তরবঙ্গ) : মোটা আমন ধান বিশেষ। ময়ূরশাল : শালি ধান বিশেষ। শকুনজুরি (ঢাকা) : আমন ধান বিশেষ। হাঁসকোল (বগুড়া), হাঁসখোল (কোচবিহার) : আমন ধান বিশেষ।

পাটের নামকরণে : বোগীপাট (কোচবিহার) : পাট বিশেষ। বকের মতো সাদা বলে (?)।

কয়েকটি ইংরেজি উদাহরণও এই প্রসঙ্গে তুলনার জন্যে উল্লেখ করি : Colum-binc < Latin Colamba = a dove, ঝাঁক বাঁধা ঘুঘুর মতো ফুলের গাছ বিশেষ। Crowfoot : এক রকমের ফুল বিশেষ। Dove's foot : ফুল বিশেষ। Geranium : Latin < Greek geranos = a crane, সারসের ঠোঁটের মতো এক ধরনের ফুলের গাছ। Peacock flower : কৃষ্ণচূড়া।

পাখিকে ভিত্তি করে প্রাণীর নামকরণ : কাকোদর (উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি) : কাকের মতো উদর যার, সাপ। কৈতোরি হোক (নোয়াখালি) : < কবুতর + ই + পোকা, ধানের সাদা পোকা বিশেষ। চিলা গোরু (উত্তরবঙ্গ) : যে গোরুর রঙ চিলের মতো মেটে। টিয়ে বোড়া (সুন্দরবন : বোড়া সাপ বিশেষ। টিয়াঠুঁইট্টা (ঢাকা : সাপ বিশেষ। পঙ্কীরাজ (উত্তরবঙ্গ) : কালো কাঠবিড়ালী বিশেষ। পায়রাচাঁদা, পায়রাতেলী : মাছ বিশেষ। বকঠুঁটো, বগোমাছ (২৪ পরগণা) : যে মাছের মুখ বকের ঠোঁটের মতো : গাংদাঁড়া, ধুরাকিনা বা কাঁকাল মাছ। ময়ূরপংথ : মেদিনীপুরের শবরদের মতে এক ধরনের বোড়া সাপ। হাঁসা ঘোড়া (একাধিক 'মঙ্গলকাব্যে' পাওয়া গেছে) : হাঁসের মতো সাদা ঘোড়া।

তেমনি, পাখির নামকরণেও অন্য প্রাণীর নাম মেলে। 'গয়ার' পাখিকে ইংরেজিতে বলে 'Snake bird'. বিশেষ এক ধরনের পাখিকে বলে 'Crocodile bird'.

এবারে পাখিকে ভিত্তি করে অন্যান্য বস্তুর নামকরণের উদাহরণ দিই।

মণি, অলঙ্কার. গরুড়মণি : গরুড়তুল্য সর্পভয় নিবারক মণি, মরকত মণি। হংসহার : হার বিশেষ। হাঁসুলি : হাঁসের গলার মতো কণ্ঠহার বিশেষ।

বস্ত্র, পোষাক : বাউয়ারঙ্গী শাড়ী (রঙপুর) : কাকবর্ণ বিশিষ্ট নীলাম্বরী শাড়ী। কাকডিমে শাড়ী : কাকের ডিমের মতো রঙ-বিশিষ্ট শাড়ী। কোকিল পেড়ে ধুতি। মৈমনসিংহের তাঁতীরা 'বাওই ঝাঁক' (অর্থাৎ বাবুই পাখির ঝাঁক) শাড়ী নামে এক ধরনের শাড়ী বুনে থাকে। ময়ূর পেখম শাড়ী।

ইংরেজি থেকে দৃষ্টান্ত : Roost : পাখির দাঁড় বা ঘুমোবার স্থান, মুরগীর বাসা ; অর্থ পরিবর্তনে বিছানা, শয্যা এবং তারপর বর্তমানে অর্থ : রাত্রিকালে ঘুমোতে যাওয়া, রাত্রিযাপন করা। Swallow-tail : লম্বা ঝুলওলা কোট বিশেষ।

খোঁপা : 'শুয়াঠুঁটী খোঁপা'।

রঙ : কপোতবর্ণ। ধূসরবর্ণ। কাইমা রঙ (সিলেট) : কায়েম বা কাম পাখির রঙ-বিশিষ্ট, নীলবর্ণ। কাক ডিমে : কাকের ডিমের মতো হরিতাভ নীল, ফিরোজা রঙ। ময়ূরকণ্ঠ, ময়ূরকণ্ঠী : ময়ূরকণ্ঠের মতো রঙ। ধান যখন পেকে প্রায় লাল হয়ে যায়, তখন তাকে বলে 'মাছরাঙ্গী' (খুলনা) শুকশ্যামল, শুকহরি শুকহরিত : শুকবৎ হরিদবর্ণ। হাঁসা রঙ : কটা, তামাটে রঙ।

ইংরেজি থেকে দৃষ্টান্ত : Dove colour : ধূসর, ঈষৎ নীল ও ঈষৎ গোলাপী বর্ণ। Peacock blue : ময়ূরকণ্ঠী নীল।

নৌকো : সুন্দরবনের 'জঙলা ভাষা'য় 'ঘুঘু' শব্দের অর্থ : ছোটো ডিঙি নৌকো। একে 'ঘুঘুডিঙি' বা শুধুই 'ঘুঘু' বলে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে পাওয়া যায় : 'টিয়াঠুটী', 'ময়ূরপঙ্খী', 'শুকপঙ্খী', 'হংসমালা' প্রভৃতি নামের নৌকো। নৌকোর গলুইতে যে পাখির মুখের নক্শা থাকত, সেই অনুযায়ীই নৌকোর নাম হত।

ঘুড়ি, বেলুন : পাখির মতো ঘুড়ি ও বেলুন আকাশচারী বলে সহজেই এ সবের সঙ্গে পাখির নাম জড়িয়ে গেছে। চিলা (রাজশাহী) : চিলের আকৃতিতে তৈরি ঘুড়ি বিশেষ। চিলা (নোয়াখালি, কুমিল্লা), চিলে (যশোর) : সাধারণভাবে যে কোনো ঘুড়ি। তুলনীয়, ইংরেজি Kite. পয়রা (সিলেট) : পায়রা সদৃশ বেলুন। ফ্যাচ্কা ঘুড়ি : ফিঙের ল্যাজের আকারে তৈরি ঘুড়ি বিশেষ।

অস্ত্র, যন্ত্র : কংকবদন, কংকমুখ : কাঁক পাখির মুখের মতো যন্ত্র বিশেষ, বাণ। নাচন পাখি : পাখির মতো তাঁতের সংজ্ঞা বিশেষ। বকযন্ত্র : Still. বগাকাঁচি (ঢাকা, কুমিল্লা) : বকের গলার মতো 'কাঁচি' অর্থাৎ কাস্তে। হাঁসকল : কপাট খোলাবার কব্জা বিশেষ, অংকুশাকার (তবে, কেউ কেউ মনে করেন ফাঁসকল>হাঁসকল)। 'হাঁসুয়া দা', হে'সো (পশ্চিমবঙ্গে) : হাঁসের গলার মতো দা'। হাস্স্যা (ফরিদপুর) : <হাঁস+ইয়া, কাস্তে।

ইংরেজি থেকে দৃষ্টান্ত : Bat's wing : বাদুড়ের ডানার মতো শিখা বিস্তারকারী গ্যাসচুল্লী বিশেষ। Cock : বন্দুকের ঘোড়া। Crande : কপিকল। Crowbar : শাবল। Crow's nest : চারিদিক পর্যবেক্ষণের জন্যে পোতাদির মাস্তুলের ওপরের কক্ষ। Dove tail : ছুতোরদের তক্তা জুড়বার পদ্ধতি বিশেষ। Sparrow-bill : মুচিদের মাথাহীন ছোটো পেরেক।

নক্শা : কল্কা : <হিন্দী কলগা। মোরগফুল : কলগী পাখির মাথার চূড়া ; কল্‌গা বা কলগীর অনুসরণের রচিত ফুল বা নক্শা। কোতরখুপী সেলাই : পায়রার খোপের মতো চতুষ্কোণ সেলাই। ইংরেজিতে : Crow-line : সরলরেখা।

অন্যান্য বিভিন্ন বস্তু : কুইল্ : ইংরেজি quil, কলমের জন্যে হাঁস-ময়ূরের পাখা। Crowquil : কলম বিশেষ। ঘুঘু ঘড়ি : এ ঘড়ি বাজবার সময় ঘুঘুর মুখের 'ঘুঘু' ডাক শোনা যায়। বাঙ্কুয়া (কোচবিহার, রঙপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি) : বিহঙ্গমিকা, বিহঙ্গিকা : ভারবহনার্থ বিহঙ্গসদৃশ দণ্ড, বাঁক।

পাখির পদাকৃতি থেকে পাওয়া যায় : কাকপদ : 'কাকপদাকৃতিযুক্ত' রতিবন্ধ বিশেষ। কাকপদতুল্য পরিমাণ। কাকপদতুল্য তিলকভেদ। চর্মে কাকপদতুল্য চিহ্ন বা রেখা। পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিতে ব্যবহার্য পরিত্যক্ত বর্ণাদি সূচক-চিহ্ন (Caret). ময়ূরপদক : ময়ূরপদাকৃতি নখাঘাত।

ইংরেজি থেকে দৃষ্টান্ত : Hay cock : খড়ের মোচাকার গাদা। Pigeon hole ; কাগজ-পত্রাদি বেছে আলাদা করে রাখবার খোপ ; মন বা স্মৃতির কক্ষ। Popinjay : তীরাদি সন্ধানের লক্ষ্যরূপে স্থাপিত শুকমূর্তি।

নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ে পাখি : কাউয়ার ডিমা (রঙপুর) : খুব অন্ধকার। কাকজ্যোৎস্না। কাবজুনাইখ্যা (মৈমনসিংহ) : <কাক+জোনাক+ইয়া। কাক-

সকাল। কুকড়ো বাগ (যশোহর : <কুকড়ো+ফারসি বাঙ্গ, সকাল। কুঁকড়ি ডাক (মানভূম : সকাল। কুহুনিশি, কুহুযামিনী, কুহুরজনী; কুহুরাতি : অন্ধকার রাত্রি। বাঙলায় 'কুহু' মানে 'অন্ধকার'। পিকবান্ধব : বসন্তকাল। বগাডল (বগুড়া) : < বগা+ঢল, অত্যধিক প্লাবন : বন্যার জলে চারদিক ভেসে গেলে বকের পাখার মতো সাদা দেখায়।

ইংরেজি থেকে দৃষ্টান্ত : Cock crow : সকাল। Owl light : সন্ধ্যা গোধূলি। A weather cock : বায়ু-প্রবাহের দিগনির্ণায়ক যন্ত্র, 'বাতশকুন' বা 'বায়ুমোরগ' ॥

২৮·

পাখির রূপগুণ ও অভ্যাস-সংস্কারকে ভিত্তি করে মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণ-অবস্থা-বিশেষত্ব নির্দেশ করা হয়। এ ভাবেও মানুষের ভাষার সঙ্গে পাখি জড়িত হয়ে আছে।

মানুষের দৈহিক অবস্থা ও বিশেষত্বকে নির্দেশ করবার জন্যে পাখির রূপ-গুণকে গ্রহণ করবার উদাহরণ :

কপোতহস্তক : হাতের মূল, অগ্র ও পার্শ্বের পরস্পরের সংযোগে কপোতাকার পাণিযুগল। কাউয়া-কাউয়া (খুলনা) : জীর্ণ-শীর্ণ ব্যক্তি। কাউয়াগালী (বাকেরগঞ্জ) : কাকের ঠোঁটের মতো যার ঠোঁটে ঘা হয়েছে। কাউয়া ঘুম (ঢাকা, কুমিল্লা), কাউয়া নিন্দ্ (রঙপুর), কাকনিদ্রা : কাকের মতো ঘুম, স্বল্প ও সজাগ নিদ্রা। কাউয়ার বাসা : অবিন্যস্ত, এলোমেলো চুল, কাকের বাসা অবিন্যস্ত বলে। কাউর : <কাকরূপ (?), পায়ের দদ্রুজাতীয় চর্মরোগ বিশেষ। কাকটো (খুলনা) : রোগা। কাকপক্ষ : কানপাটা বা জুলপি, সামান্য চূড়া বা শিখা। কাকস্নান। কাগমরুনে (তারকেশ্বর, হুগলি) : রোগা, শীর্ণ ব্যক্তি। কুলির চৌখ (ঢাকা), কুহিলার চ'ক (খুলনা) : কোকিলাক্ষ ব্যক্তি, খুব লাল চোখ। কোকস্তনী : কোকতুল্য স্তনবতী। গরুড়শয়ন : গরুড়ের মতো যুক্ত করে অর্থাৎ জড়সড় হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে শয্যায় অবস্থান। গরুড়ের মতো থাকা : গরুড়-মূর্তির মতো সভয়ে হাত জোড় করে থাকা। গোগল ডিঙ্গা, ঘোকল ডিঙ্গা (দিনাজপুর, রঙপুর, জলপাই-গুড়ি) : 'ঘোকলডিং' অর্থাৎ 'চোখ গেল' পাখির মতো লম্বা, উঁচু ও পিঠ-বাঁকা মানুষ। চড়ে ঠ্যাংগা (রাজশাহী) : খুব লম্বা, হালকা-পাতলা ঠ্যাং। চিলসত্বর যাওয়া (পূর্ববঙ্গ) : চিলের মতো দ্রুত ও ক্ষিপ্রগতিতে যাওয়া। ঝইড়া কাক (পূর্ববঙ্গ), ঝড়োকাক (পশ্চিমবঙ্গ), ঝড়োচিল (রাজশাহী) : রোগা ও শীর্ণ ব্যক্তি। টেঁইয়া নাচন (চট্টগ্রাম) : টিয়ের মতো শিশুদের নাচ। টুনিরা, টুনিয়া নাগা, টুনিয়া পড়া (জলপাইগুড়ি) : টুনটুনির মতো যার নিতম্ব শীর্ণ ও ক্ষুদ্র। ডেনা, ড্যানা (পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ) : বাহু, পাখির 'ডানা'র সাদৃশ্যে। প্যাঁচামুখো : প্যাঁচার মতো মুখ যার। প্যাতম (রাজশাহী) : হুতোম, হুতোমের মতো নাক-মুখ চ্যাপ্টা। বগা ঠ্যাং : বকের মতো যার লম্বা ঠ্যাং। মদিরেক্ষণা :

মত্ত খঞ্জনের মতো চোখ যার। শকুনের দৃষ্টি : শকুনের মতো যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শকুনির হায়াত (পূর্ববঙ্গ) : আরবি 'হায়াত', শকুনের মতো যে দীর্ঘজীবী, মন্দার্থে। শেগুনের জিউ (জলপাইগুড়ি) : শকুনের মতো দীর্ঘজীবী, মন্দার্থে। শ্যেন দৃষ্টি : শ্যেনবৎ দৃষ্টি যার। হাড়গিলা গলা (জলপাইগুড়ি) : হাড়গিলের মতো দীর্ঘ গলা যার। হাড়গিলের মতো হওয়া : হাড়গিলের মতো শীর্ণ ও দীর্ঘকায় ব্যক্তি। হাঁসগাণ্ডী হাঁসগালাণ্ডী (জলপাইগুড়ি) : হাঁসের মতো 'গণ্ড' (গলা বোঝাতে) যার, হংসগ্রীব। হাঁসের গলা-সমান খাওয়া (পূর্ববঙ্গ)। অত্যন্ত বেশি পরিমাণে খাওয়া। হুলুকমুখা (রাজশাহী) : উলুক বা প্যাঁচার মতো মুখ যার। হুলুক সাজা, হুলুক হওয়া (ঐ) : হতাশায় চুপ করে বসে থাকা। হোকোশের জিউ (জলপাইগুড়ি) : উৎক্রোশের মতো দীর্ঘজীবী যে, মন্দার্থে। হোকোশের ডেলি (ঐ) : উৎক্রোশের বাসার মতো যার চুল অবিন্যস্ত।

কাব্যে ও সাহিত্যে মানবদেহকে উপমান ও উপমিত রূপে গ্রহণ করে পাখির দৈহিক বিশেষত্ব উল্লিখিত হয়ে থাকে। যেমন : আঁখি-পাখি। আত্মাপুরুষ বা আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হওয়া। খগেন্দ্র-নিন্দিত-নাসা। খঞ্জন লোচন। গৃধিনী-গঞ্জিত শ্রুতিমূল। দেহ-পিঞ্জর। 'পাঞ্জারের শুয়া' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে)। প্রাণ-পাখি। বক্ষপঞ্জর। 'বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা'। বুকের খাঁচা। মন-ময়না। মন উড়ু-উড়ু করা। উড়াং-বাইরাং করে, মন উড়াও-পাড়াও করে (উত্তরবঙ্গে লোকসঙ্গীতে)। মন-পাখি। মরাল গমন, মরাল গামিনী। মরাল গ্রীবা। শুকনাস, শুকনাসা। সারসাক্ষি। হংসগ্রীবা।

ইংরেজি থেকে উদাহরণ : Bird-eyed : তীক্ষ্ণ নজর বিশিষ্ট। Cockerel : কুক্কুট শাবক, কিশোর, যুবা পুরুষ। Cock-eyed : টেরা। (To) crane one's neck : সারসের মতো গলা লম্বা করা। Crow's foot : বার্ধক্যজনিত চোখের কোলের চামড়ার কুঞ্চন। Duck eyed : মিটি-মিটি চক্ষু বা চাহনিযুক্ত, নম্রনেত্র। Duck-legged : খর্বপদ। Eagle-eyed, Eagle-sighted : তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। Falcon-eyed : শ্যেনদৃষ্টি। Feather weight : অতিলঘু দৈহিক ওজন বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধা বা অন্যান্য মল্ল। Haggard : বন্য বাজপাখি, চোখ বসে গেছে এমন, ক্ষেপাটে চাহনিযুক্ত। Hawk-eyed : শ্যেনদৃষ্টি। Owl-eyed : পেঁচার মতো চাহনিযুক্ত। Pigeon-breasted : সরু বুকে বক্ষাস্থি ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে, এমন।

পাখির কণ্ঠস্বর দিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর, কথা বলা, কান্না, চীৎকার ইত্যাদি নির্দেশ করবার দৃষ্টান্ত :

কপ্চানো : অকারণ জ্ঞানগর্ভ কথা বলা। কা-কা করা (সিলেট) : কাকের মতো গণ্ডগোল করা। কাইকাবাড়ি, কাউকাবাড়ি (ঢাকা) : যে বাড়িতে লোকেরা কাকের মতো চীৎকার ও কলহ করে। কাউয়া ক্যাচ-ক্যাচি (সিলেট) : কাকের মতো সামান্য ব্যাপার নিয়ে কলহ-বিবাদ। কাউয়া ক্যাচাল (কুমিল্লা) : আবোল-তাবোল বকা। কাউও কুরি (যশোহর) : শোরগোল, কান্নাকাটি। কাউকাসাং (রঙপুর) : কোনো কিছু নিয়ে কাকবৎ হট্টগোল করা। কাউয়া (সিলেট) : যে কাকের মতো কা-কা করে অর্থাৎ বেশি কথা বলে। কাউয়ার কল (জলপাইগুড়ি) : কাকের মতো

কলরব করা। কাউরহাটি (রঙপুর) : কাকের হাট, কাকের মতো কলহ। কাউরালি (মৈমনসিংহ) : হৈ-হল্লা। কাগানো (খুলনা) : অশ্লীল কথা বলা। কাটাল পাখির বুলি (সিলেট) : যে পাখি শিকল কেটে পালায়, যার কোনো কথার স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নেই। কুইল (পূর্ববঙ্গ) : মূলত কোকিলের অনুরূপ ডাকা, আর্তনাদ করা। 'কুক পাইড়া কান্দা', 'কুক দিয়া কান্দা' (পূর্ববঙ্গ) : 'কোক' পাখির মতো ডাক দিয়ে কান্না। কুহরানো : চীৎকার বা আর্তনাদ করা। 'গোপীচন্দ্রের গানে' : 'আজি কেনে কুহুরাইস' (ডাকিস)। কিন্তু জলপাইগুড়িতে 'কুহুরানো' : কাশা। কোড়ার ছাও (খুলনা) : প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে যে উত্তর দিতে পারে। চিল্লানো : চিলের মতো চীৎকার করা। 'চিল্লা-চিল্লি', 'চেল্লা-চিল্লি'। টি-টি পৈকের মতো বোঝানো (মৈমনসিংহ)। তোতা-পাখি : অন্যের শেখানো বুলি যে আওড়ায়। কাউকে কোনো কথা বারংবার বলে বোঝানো। 'তর্কচঞ্চু', 'ন্যায়চঞ্চু' প্রভৃতির মধ্যে যে 'চঞ্চু' শব্দ আছে, তা পাখির কণ্ঠস্বরকেই নির্দেশ করে।

গুজরাটে ও কাথিওয়াড়ে 'কাবর' নামে এক বিশেষ ধরনের পাখি কর্কশ কণ্ঠধ্বনির জন্যে বিশেষ অপ্রিয়। এ পাখি সর্বদাই স্ত্রীলোক বলে কল্পিত। 'A woman who is very noisy and over-talkative is often cal'ed a Kabor (The Indian Antiquary : January, 190 : P. 11) পশ্চিম বাঙলার একটি প্রবাদ : 'বউয়ের গলার স্বর কেমন ? শালিক চেঁচায় যেমন।'

ইংরেজি থেকে উদাহরণ : Chatter-box < chatter : পাখিদের কিচির-মিচির, যে ব্যক্তি অনর্থক বকে, বাচাল। Chatterer : বাচাল। Chirp : পাখি-পতঙ্গের কিচির-মিচির শব্দ ; Chirpy : প্রাণবন্ত, হাসি-খুশি মানুষ। Crow : শিশুর অস্ফুট আনন্দধ্বনি। ক্রিয়া : কর্কশধ্বনি করা। Gazette, Gazetteer : ম্যাগপাই সর্বদাই কিচির-মিচির করে, ইটালীয় ভাষায় ম্যাগপাইকে বলে 'gazza' ; এইজন্যেই খবরের কাগজ, যা সংবাদ প্রকাশ করে, তাকে বলে 'gazzetta'. সংবাদপত্রের হৈ-চৈ এখানে ম্যাগপাই পাখির কিচির-মিচিরে পরিণত হয়েছে। Magpie : < Margeret > Mag + pie. মার্গারেট্ নাম্নী এক বাচাল স্ত্রীলোকের কথা স্মরণ করে ; ছাতারে জাতীয় পাখি, যে ব্যক্তি অনর্থক বকে, বাচাল। Parrot : যে ব্যক্তি না ভেবে-চিন্তে পরের কথা আবৃত্তি করে (?)। A hooded Pigeon : উগ্র রাজনৈতিক বক্তা।

পাখির শঠতা ও ধূর্ততা, কৃতঘ্নতা ও বোকামি, ক্রোধ ও প্রেম, দম্ভ ও ভণ্ডামি প্রভৃতিকে ভিত্তি করেও মানুষের নানা মানসিক বিশেষত্ব নির্দেশ করা হয় : কাউয়ামি (সিলেট) : অল্পের জন্যে অধীর হওয়া। কাউয়ারাগী (রঙপুর) : কাকের মতো যে সহজেই রেগে যায়। কাউয়া সিয়ান (সিলেট) : কাকের মতো যে সেয়ানা। 'সেয়ানা' শব্দের মূল হলো 'সজ্ঞানক'। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতার ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'শ্যেন' থেকে 'সেয়ানা' হয়েছে, শ্যেনের মতো যে চালাক। সিলেটেই 'কাউয়া' বলতে বোকা লোককে বোঝায়, রঙপুরে আবার তারই অর্থ 'খেলো', 'অলম-পাতলা লোক'।

ময়মনসিংহে 'বুজু শালিখ' বলতে মূর্খ লোককে বোঝানো হয়। বাঙলার সর্বত্রই 'ঘুঘু' বলতে ধূর্ত, চতুর, শঠ, ভণ্ড ও ফন্দীবাজ লোককে নির্দেশ করা হয়। Jail-bird বা Prison bird-এর বাঙলা হল 'জলঘুঘু'। জলপাইগুড়িতে 'ঝেঁচু' অর্থাৎ ফিঙে সম্পর্কে এমন ধারণা আছে। সেখানে 'খুঁজাল ঝেঁচু' বলতে চতুর, শঠ ও ভণ্ড ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। শকুন ও শ্যেনের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা যায়। লোকটা একটি শকুন বা শ্যেনের মতো তার দৃষ্টি,—হামেশাই আমরা বলে থাকি। মহাভারতের 'শকুনিমামা' এখন প্রবাদে পরিণত। 'শকুন' শব্দের প্রভাবেই এমনটা হয়েছে।

ভণ্ডামিকে নির্দেশ করতে বকের নাম সবচেয়ে বেশি বলা হয়। বকধর্মী, বকধার্মিক ; বগাধার্মিক ; বকব্রতিক, বকব্রতী, বকব্রতচর, বকবৃত্তি—ইত্যাদি শব্দই তার প্রমাণ। বৌগ্লামো (সিলেট) : বকের মতো কপট নিরীহতার ভাণ করা। ভকভাড় (ঝাড়খণ্ড) :- বকভণ্ড। ভণ্ড থেকে বককে মূর্খও বলা হয়। যেমন, বকমূর্খ।

সিলেটে বুলবুলি সম্পর্কে ধারণা বোধহয় ভালো নয়। 'টেঁকে পইখের ছা' অর্থাৎ 'বুলবুলির ছা' বলতে সেখানে সংকীর্ণমনা ব্যক্তিকে বোঝায়।

তোতা ও শুক পাখি নাকি পালনকারীর চোখে আঘাত করে এবং সুযোগ পেলেই পালিয়ে যায়। এইজন্য 'তোতা' বা 'শুক' বলতে অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়। প্রবাদেও আছে : পোষা সারী চোখে ঠোকরায়। শিকল কাটা টিয়া পোষ মানে না।

কৃপণতা ও বহুদর্শিতার ভাব ব্যক্ত হয়েছে কাকের মাধ্যমে। 'ভূশণ্ডী', 'ভুশণ্ডি', 'ভুষণ্ডি' বলতে রামায়ণে উল্লিখিত ত্রিকালদর্শী কাক, তার থেকে অর্থান্তরে 'অশীতিপর বহুদর্শী ব্যক্তি'। সিলেটে 'কাউকরা হাগা'র অর্থ : যে বেশী খাদ্য ব্যয়ের ভয়ে, কাকের মতো অধিক মলত্যাগ করে না অর্থ-প্রসারে 'কৃপণ'। কাকের নীড়ে কোকিল শাবক লালিত হয়। এর থেকে অপর কর্তৃক পালিত ব্যক্তিকে বলা হয় 'পরভৃত'। তারও পর মেলে পরগাছা বলতে 'পরভৃতবৃক্ষ'।

গালাগালি দিতে অনেক সময় পেঁচো (<পঁ্যাচ+উয়া) শব্দ ব্যবহৃত হয়। পরিমাণে কারো আহারের অল্পতা বোঝাতে 'পাখির আহার' ব্যবহার করা হয়। 'আহার' শব্দের বদলে 'আধার' বা 'আদার' শব্দও মেলে। ঢাকা থেকে পাওয়া গেছে, 'বগার আদার'। তেমনি পরিমাণের অল্পতা বোঝাতে বলা হয়, 'চটকস্য মাংস', অর্থাৎ চড়ুই পাখির মাংসের মতো সামান্য পরিমাণ। স্বল্পাহারী বলে পাখিকে সহজে মরণশীল বলে কল্পনা করা হয়, আকৃতির ক্ষুদ্রতাও তার পেছনে আছে। যে মানুষ অল্পেই কাতর হয়, তার উদ্দেশে বাঙলা প্রবাদ : পাখির প্রাণ, অল্পেই যান।

গৃহজীবনহীন মানুষের বৃত্তিকে বলে 'কোকিলবৃত্তি', যেহেতু কোকিল অন্যের নীড়ে ডিম পেড়ে আসে। তেমনি অতিমাত্রায় গৃহজীবন বিলাসিতাকে বলে 'পারাবতবৃত্তি'। প্রাক্-উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যে পাই : 'ঘরখানা চিলাং বাটাং', অর্থাৎ ঘরখানার খড় উড়ে গিয়ে চিলের বাসার মতো এলো-মেলো মনে হচ্ছে। নিশাচর মানুষের বৃত্তিকে বলে 'পেচকবৃত্তি'। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য'

পত্রিকার 'সহযোগী সাহিত্য' (বৈশাখ ১৩০০) ফিচারে Pessimism শব্দের বাঙলা করা হয়েছিল 'পেচক বাদ' শব্দটি এর পূর্ব থেকেই চালিত ছিল।

প্রেমিক-প্রেমিকা বোঝাতে 'কপোত-কপোতী' খুবই পরিচিত সদর্থে ও মন্দার্থে—উভয়ার্থেই এটি প্রযুক্ত হয়। পূর্ববঙ্গে মেলে 'জোড়ের কৈতর' বা 'জোড়ের পাখি'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে স্বামী-স্ত্রীর 'রাজ-যোটক' হওয়াকে বলে 'লাগজুড়ি পারোর' মতো। সহচারী দুই বন্ধুকে বোঝাতে, মন্দার্থে, 'মাণিক জোড়' ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে জোড়ায়-জোড়ায় পাখির বিচরণ-বিহারকে মনে রাখা হয়েছে। তেমনি ঝাঁক বেঁধে পাখির বিচরণকেও স্মরণ করা হয়েছে : যে গৃহস্থের সন্তান-সংখ্যা পরিমাণে অধিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে তাকে বলে 'ঝাঁকুয়া মানুষি'।

আপন কলাপের বিস্তৃতি ও বৈভবের জন্যে ময়ূর নাকি মনে মনে গর্ব বোধ করে। 'কীর্তিকলাপ'-এর পেছনে ময়ূরের স্পষ্ট আভাস আছে। সুখের দিনের সঙ্গীকে বলে 'সুখের পায়রা'। বৃদ্ধলোক কিশোরবৎ আচরণ করলে তাকে বলে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ হওয়া', কেননা শৈশবে শালিক-শাবকের ঘাড়ে রোম থাকে না।

পাখির প্রসঙ্গে ডিমের কথাও ওঠে। 'ডিম' দিয়ে মানুষের দৈহিক বিশেষত্ব নির্দেশ করবার দৃষ্টান্ত : চোখের ডিম (eye-ball) : চোখের তারা। পায়ের ডিম (cough) : পায়ের 'গুলি' বা 'গুল্লি'। গুয়া-ডিম্বা, গো-ডিম : পক্ষি-শাবকের উদরস্থ মলপিণ্ড। পক্ষি-শাবকের সঙ্গে মানব-শিশুর সাদৃশ্যে। উভয়েই শিশু বলে বলা হয় : 'গো-ডিম ভাঙা'

তুলনার জন্যে ইংরেজি থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিই : Aquiline : <Latin aquila=an eagle, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা। Anserine : <Latin anser =a goose, হংসীতুল্য মূর্খ হাবাগোবা লোক। Aviate : <Latin Avis=bird, বিমান পোতে আকাশ ভ্রমণ করা। Batty : বাদুড়ের মতো, অস্থির বুদ্ধি, সুযোগ সন্ধানী। Bird of passage : যাযাবার পাখি, আলঙ্কারিক অর্থে 'ক্ষণিকের অতিথি'। Chicken hearted fellow : ভীরু। Cock's comb : পোষাক-পরিচ্ছদে ফুলবাবু। Cock-fight : ক্রীড়া বিশেষ। Cock : সাহসী। Cock-pit : মোরগ লড়াইয়ের স্থান, যেখানে প্রায়ই লড়াই হয়, রণতরী প্রভৃতির নিম্নভাগে প্রধানতঃ আহত ও রুগ্নদের আশ্রয়স্থান। Cock-sure : সম্পূর্ণ নিশ্চিত। Cocky : ধৃষ্ট। Coracoid : <Greek Korakos=a crow, edious=from, কাকের ঠোঁটের মতো আকার বিশিষ্ট। Corbie messenger<old French corbin<Latin Corvus=a crow, যে দূত অতি বিলম্বে ফেরে বা মোটেই ফেরে না, বাইবেলের কাহিনী স্মরণ করে। cuckoo : বোকা লোক। Cuckold : <old French Cucuault<cucu=cuckoo, অসতী পত্নীর স্বামীতে পরিণত করা (যেহেতু, কোকিল অপর পাখির নীড়ে ডিম পাড়ে, যেন অপরের ঔরসের সন্তান ধারণ করে, সেই হেতু কোকিল অসতী)। Dottere : এক ধরনের টিট্টিভ, কেউ ধরতে এলে বোকার মতো

স্থির হয়ে সহজেই ধরা পড়ে, তার থেকে 'বোকা লোক'। Dove : (প্রধানতঃ) প্রণয়িনীকে আদরসূচক সম্বোধন। Dove-like : ঘুঘুবৎ নির্দোষ ও পবিত্র। Duck, Ducky : প্রিয়তমা, লক্ষ্মী, সোনা প্রভৃতি আদরের ডাক বিশেষ। Turtle-dove : যে প্রেমিক চিরকাল অনুগত থাকে বা অত্যধিক প্রেম প্রদর্শন করে। Ugly duckling : বংশ বা দলের যে উপেক্ষিত লোক শেষ পর্যন্ত সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করে। Full-fledged : পূর্ণবর্ধিত, পূর্ণসদস্য প্রাপ্ত, পুরোদস্তুর, (পাখির পাখা ওঠাকে স্মরণ করে)। Un-fledged : অপূর্ণবর্ধিত, অপরিণত, অনভিজ্ঞ যুবজনোচিত। Gallow's-bird : ফাঁসির যোগ্য বা ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি। Gander : রাজহংস, মূর্খ, বোকা লোক। Goose : হংসী, বোকা। Goosery : বোকামি Halcyon days : সুখের দিন (Halcyon : মাছরাঙা Hen-hearted : ভীরু। Hen-pecked : স্ত্রৈণ। Jackdaw : দাঁড়কাক, বোকা লোক। Night-bird : সন্দেহ-জনক চরিত্রের যে লোক রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায়। Owl : (ব্যঙ্গে) গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বিজ্ঞবৎ হাবভাবপূর্ণ মূর্খ। Owlish : মিটমিটে, মূর্খ, বোকা। ক্রিয়ারূপেও owl এই বিশেষ্য শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় ইংরেজিতে। Peacock : মিথ্যা আত্মশ্লাঘাকারী ব্যক্তি। Pigeon-hearted : ভীরু। Plume : (আলংকারিক অর্থে) অহংকার করা, (কোনো বিষয়ে) কৃতিত্ব দাবী করা। Pride : ময়ূরের পেখম ধরা অবস্থা, গর্ব-অহংকার। Prison-bird : ঘাগীচোর', জেল ঘুঘু। Rara avis : <Latin=rare bird, দুর্লভ ব্যক্তি বা বস্তু। Rookery : Rook অর্থাৎ এক জাতীয় কাকের ডিম পাড়বার স্থান বা বাসা : পেঙ্গুইন, সীলমাছ প্রভৃতির প্রজননের স্থান ; তার থেকে ঘেঁষা-ঘেঁষি করা নোংরা বাড়ি বা কুটীরের সারি, বস্তি প্রভৃতি। Screech owl : অশুভ সংবাদ বহনকারী। Tomnoddy : দীর্ঘচঞ্চু সামুদ্রিক পাখি বিশেষ, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি। Vulturine : শকুনিতুল্য, শকুনের মতো লোভী। Wood-cock : স্নাইপজাতীয় অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার পাখি বিশেষ, মূর্খ, বোকা ॥

·২৯·

ইডিয়ম বা বাগধারা সৃষ্টির মূলেও পাখি বর্তমান। এর কিছু-কিছু উদাহরণ অব্যবহিত পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দিয়ে এসেছি। অপর কিছু উদাহরণ এই।

পাখির উড্ডয়ন ক্ষমতা তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। এইজন্যে 'ওড়া' দিয়ে অনেক ইডিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। যথা : উড়ু-পড়া ভিটে (ভিটে যেন পাখির খাঁচা, পাখির মতো ভিটে ছেড়ে গৃহবাসী চলে গেলে বলা হয়)। উড়ন চড়ে, উড়ন চণ্ডে, উড়ুন চড়ে (যে বোহিসেবী, অর্থ সঞ্চয় করতে পারে না)। একই অর্থে মেলে 'উড়ন চুটকী' (তারকেশ্বর, হুগলি)। উড়া করা, উড়া দেওয়া, উড়া মারা, উড়াও

করা, উড়াও দেওয়া, উড়াও মারা : 'ওড়া' অর্থে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায়। উড়া-তাবা বা উড়া-ভাসা শোনা (লোকমুখে অসম্পূর্ণ ও অসমর্থিত সংবাদ শোনা)। উড়ো খবর (হিন্দি : উড়তী খবর)। উড়ো চিঠি। উড়তে শেখা (সেয়ানা হওয়া। পাখি সমর্থ হলে যেমন নীড় ছেড়ে উড়ে যায়। যেমন, ছেলেটা উড়তে শিখেছে)। উড়ে এসে জুড়ে বসা।

এ ছাড়া পাই : কারো কথা উড়িয়ে দেওয়া (তার কথায় গুরুত্ব আরোপ না করা)। টাকা ওড়ানো (অকাতরে অর্থ ব্যয়)। পাখি উড়েছে (কেউ পলায়ন করলে বলা হয়)। এই প্রসঙ্গে 'fly' দিয়ে ইংরেজি ফ্রেজ-ইডিয়ম মনে পড়ে।

পাখির ওড়বার উপায় হল তার পাখা। 'পাখা' বা 'ডানা' দিয়ে বঙ্গীয় বাগধারার দৃষ্টান্ত : পাখে পানি না বাদা (মৈমনসিংহ : পাখায় জল না লাগা, অর্থাৎ কোনো অসুবিধেয় না পড়া। হাঁস প্রভৃতি পাখির পাখায় যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তার জন্যে পাখায় তাদের জল লাগে না, এখানে সেটাই স্মরণ করা হয়েছে। পায়না (কুমিল্লা) : <পাখনা। যেমন, তোমার এখন 'পায়না' হয়েছে।

অনেক পাখিই ঝাঁক বেঁধে থাকে বা অনেকগুলি বাচ্চা নিয়ে মা-পাখি বিচরণ করে। এর থেকে বহু সন্তানবতী মা-কে বা তার বহু সন্তানকে উল্লেখ করবার জন্যে পাওয়া যায় : 'আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে মেয়েটি বাপের বাড়ি এসেছে।' শকুনির জাক (নোয়াখালি) : <ঝাঁক, ছেলেমেয়ের বহুত্ব বোঝাতে মন্দার্থে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে মা-পাখি তার শাবকদের পাখার তলায় গোপন করে রাখে। এর থেকেই পাওয়া যায়, কারো 'পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া।'

হাঁস-মুরগীর ডিম দেবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অবস্থাকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে বলে 'ডেখুয়া'। কোনো বিধবাকে অসতী বলে গাল দিতে হলে এজন্যে বলা হয় 'ডেকুয়া আড়ী' অর্থাৎ বিধবা হয়েও যে সন্তানবতী। যেসব পাখির crest বা ঝুঁটি আছে, উত্তরবঙ্গে তাদের বলা হয় 'খোঁপাচুলী', 'খোঁপালাসী', 'খোঁপানাসী'। পাখির ঝুঁটি এখানে নারীর খোঁপাতে পরিণত। এই তিনটিই শৌখিন, কর্মবিমুখ ও অলস নারীকে তিরস্কার করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

পাখির চোখ খুব তীক্ষ্ন। উপরন্তু সে বৃক্ষবাসী ও আকাশচারী বলে অনেক কিছু ওপর থেকে দেখতে পায়। অনেক পাখি নিশাচর, কেউ বা খুব ভোরে জাগে, এইসব কথা মনে রেখে সৃষ্টি হয়েছে : 'কাক পক্ষী টের না পাওয়া'। 'কাউয়া-কুলি না জানা' (নোয়াখালি)। 'কাঞ্চনমালা' নামে একটি পূর্ববঙ্গীয় ব্যালাডে পাই : টুনী পক্ষী নাহি জানে, না কইও বন্ধুরে।'

কয়েকটি পাখি সম্পর্কে মানুষের মনোভাব মোটেই ভালো নয়। কাকের নাম এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে। তারপরেই বক। যতো অসুন্দর ও মন্দ বস্তু আছে, সবের প্রসঙ্গেই এ দুটি পাখির নাম পাই। যেমন : কাগের ছা বগের ছা : অসুন্দর হস্তলিপি বা অন্য বিকৃত পদার্থ বোঝাতে। কাগাবগী ভস্ম করা (মূলে : মহাভারতের বনপর্বে কোনো ব্রাহ্মণ কর্তৃক বলাকা বধ), গৌণার্থে : প্রবলের কোপে দুর্বলের বিনাশ। বক দেখানো ব্যঙ্গ করবার জন্যে হাত বাঁকা করে বকাকৃতি করা। হংস মধ্যে বক যথা।

ঘরবাড়ি-সংক্রান্ত কয়েকটি বাগধারার মধ্যেও পাখি সম্পর্কে মন্দ মনোভাব ধরা পড়ে : কৈতোরের খোপ (ঢাকা) : খুব ছোটো ও অপ্রশস্ত ঘর অর্থে। চড়ুর বড়াই (মৈমনসিংহ) : অন্যের অর্থ ও শক্তিতে বড়াই করা, চড়ুই পাখি মানুষের ঘরে বাসা বাঁধে বলে। বাস্তুঘুঘু : মূলে ছিল গৃহদেবতারূপী ঘুঘু। অর্থের অবনতিতে ধড়িবাজ ও ফন্দিবাজ লোক। ভিটেয় ঘুঘু নাচানো বা ভিটে ঘুঘু-নাচা করা (রঙপুর) : শত্রুতা করে কাউকে ভিটে-ছাড়া করা। পরভৃত : অপর কর্তৃক লালিত।

ডিম দিয়ে : 'তুই বড়ো আকাশত ডিমা-পাড়া কাথা কইস' (রঙপুর), অর্থাৎ আকাশ-কুসুম কল্পনা করিস।

তুলনার জন্যে ইংরেজি থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিলাম : Bird's-eye-view : দ্রুতভাবে, এক নজরে সব কিছু দেখে নেওয়া। Birds of a feather : (মন্দার্থে) সমধর্মী লোকগণ, একই দলভুক্ত দুর্বৃত্তগণ। (To) break one's duck : ক্রিকেট খেলায় (ব্যাটস্‌ম্যান কর্তৃক) প্রথম রান তোলা। (To) clip the wings : পাখি যাতে উড়ে পালাতে না পারে তার জন্যে ডানার কিছু অংশ ছেঁটে দেওয়া ; আলঙ্কারিক অর্থ : কারো উচ্চাভিলাষ নষ্ট করে দেওয়া বা উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। Cock-a-hoop : জয়োল্লাসপূর্ণ। Cock and bull story : গাঁজাখুরি গল্প। (To) cook one's gooes : খতম করা, মেরে ফেলা, সর্বনাশ করা, পরিকল্পনাদি বানচাল করে দেওয়া। A feather in one's cap : পরম গৌরব বা বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। Feather bed : সুখশয্যা। (To be) in the high feather : উৎসাহ ও উল্লাস পূর্ণ হওয়া। (To) feather one's own nest : টাকা উপার্জন করা, বিশেষতঃ অসদুপায়ে। (To) show the white feather : ভয়ে পলায়ন করা। Feather touch : পালকবৎ কোমল স্পর্শ। (To) flutter the dove,cots : সংস্কার-মুগ্ধ জনসাধারণকে চঞ্চল করে তোলা। (To) fly in the face of : কোনো আদেশ,নীতি,নিয়ম লঙ্ঘন করে বিপদ বরণ করা। With fly colours : বিজয় গৌরবে। (To) Kill two birds with one stone : এক ঢিলে দুই পাখি মারা, দু কাজ এক সঙ্গে করা। (To) make or play ducks and drakes : ছিনিমিনি খেলা, যথেচ্ছভাবে ব্যয় করা, অপব্যয় করা। Riches have wings : টাকা থাকে না। Swan song : লেখকের শেষ রচনা, গায়কের শেষ গান, শিল্পীর শেষ সৃষ্টি। Under one's wing : কারো পক্ষপুটে বা আশ্রয়ে। Wild goose chase : (বুনো হাঁসকে তাড়া করে ধরা অসম্ভব বলে) মূর্খের দুর্লভকে পাবার চেষ্টায় হয়রানি।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ইংরেজি উপমার কথা স্মরণ করা যেতে পারে : **As blind as a bat. As cheerful as a lark. As gay as a lary. As gentle as a dove. As light as a feather. As proud as a peacock. As soft as a down.**

·৩০·

পরিশেষে সাংকেতিক ও দুর্বোধ্য ভাষার উল্লেখ করি।

ঐতরেয় আরণ্যকে বাঙালীর ভাষাকে বহিরাগতদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হওয়ায় তাকে পাখির ভাষা বলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যে গীত-বাদ্য বিলাসীরা 'পক্ষীর দল' স্থাপন করেছিলেন, তারা নিজেদের মধ্যে অর্থহীন পাখির ভাষায় কথা কইতেন। এ ভাষা এক ধরনের 'code language', সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য বা অর্থহীন। একে বলে যায় 'cryptogram'.

ঠিক এই ধরনেই এক রকম ভাষায় নানা 'crow language',—একে বলা হয়েছে, 'Secrct language'. A.M. Ferguson (JR) এ বিষয়টি নিয়ে তাঁর একটি নিবন্ধে আলোচনা করেছেন (The Indian Antiquary : Vols X and XI ; June 1881, P. 183 ; March 1882, P. 87)। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, বোর্ণিও-র স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের ফাঁকি বা ধোঁকা দেবার জন্যে এই ভাষা ব্যবহার করে থাকে। কেউ তাদের এই ভাষা বুঝে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে তারা 'code' পাল্টে ফেলে।

এই 'code language'-এরই অপর দিক হলো সাংকেতিক ভাষা। বাঙলার কোনো কোনো অঞ্চলে এক একটি পাখি এক একটি প্রতীক বা সংকেতে পরিণত হয়েছে। যেমন : 'লাল মোরগ' (কুমিল্লা) : পুলিশ। পুলিশের লাল পাগড়ি এবং মোরগের লাল ঝুঁটি উভয়ে সদৃশ বলে। 'শারি-শুয়া' (রাজশাহী) : অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। লোক-সাহিত্যে শুক-সারীর আলাপন এক পরিচিত বিষয়। তারা অনেক গোপন ষড়যন্ত্রের সাক্ষী। সেই কথা মনে রেখেই 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তির সঙ্গে এই যোগ-সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে ॥

॥ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পঞ্জী ॥

বাঙালীর পাখি (খ্রি. সং ১৯৩২) : জগদানন্দ রায়
পাখির কথা (আষাঢ়, ১৩২৮) : সত্যচরণ লাহা
জলচারী (১৯৩৫) : সত্যচরণ লাহা
পশুপক্ষী (পঞ্চম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৫৬। অজয় হোম কর্তৃক পরিশোধিত ও পরিবর্তিত) : যোগেন্দ্রনাথ সরকার
বাঙলার পাখি (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৮০) অজয় হোম
পাখির পরিচয় (প্রথম সং, নভেম্বর, ১৯৭২) নারায়ণ চন্দ
পাখির পৃথিবী (প্রথম সং, ১৪৭৮) বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

চিল-ময়না-দোয়েল-কোয়েল (প্রথম সং, বৈশাখ, ১৩৭০। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা) : এ. কে. এম. আমীনুল হক

ডানা প্রথম পরিচ্ছেদ) দ্বি. সং আষাঢ়, ১৩৬৬। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বি. সং ১৩৪৬। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বি. সং আষাঢ়, ১৩৭০) : বনফুল।

অসমীয়া হেমকোষ (১৯০০) : হেমচন্দ্র বড়ুয়া

বঙ্গীয় শব্দকোষ (সাহিত্য আকাদমী, ১৯৬৬) : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (তিন খণ্ড। বাঙলা একাডেমি, ঢাকা) : ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত

লৌকিক শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড : প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৬৮। দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম প্রকাশ ঃ ফাল্গুন, ১৩৭৭) : কামিনীকুমার রায়

রাজবংশী অভিধান (পঞ্চানন আশ্রম, শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭১) : কলীন্দ্রনাথ বর্মন

জীব অভিধাম (প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৩) : অমলেন্দু সেন

চট্টগ্রামী বাঙলার রহস্যভেদ (কলিকাতা : ১৯৩৫) ডঃ এনামুল হক

যশোহর-খুলনার ইতিহাস (তৃ. সং ১৯৬৩) : সতীশচন্দ্র মিত্র

কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৬০) : সুরেন্দ্র-চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত

আমার বোম্বাই প্রবাস (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) : সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতী : আষাঢ়, ১৩২০। পৃ. ২৩৭-২৪৮)

[মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখা পত্রাবলী : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতী : ফাল্গুন, ১৩৩২। পৃ. ৪৪৫)

সংস্কৃত সাহিত্যের পাখি ও তাহার নাম তালিকা : সত্যচরণ লাহা (প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৪৩। পৃ. ১৮-২১)

সত্যচরণ লাহা : (প্রবাসী : কার্তিক ১৩৪৬। পৃ. ৬৬-৬৯)

সত্যচরণ লাহা : (মাসিক বসুমতী : আশ্বিন, ১৩২৯। পৃ. ৮৫৩-৮৫৬)

দ্বাদশ শতকের বাঙ্গলা শব্দ : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩২৬, দ্বিতীয় সংখ্যা)

সুরেন্দ্রনাথ সেন : (প্রতিভা : ফাল্গুন, ১৩২২। পৃ. ৪২১)

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : (প্রতিভা : পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ৪৭৮-৪৭৯। চৈত্র, ১৩১৮। পৃ. ৬২৯-৬৩০। ফাল্গুন, ১৩২৪। পৃ. ৪৫৩-৪৫৪)

পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায় : (প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩৩১)

বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা : একেন্দ্রনাথ ঘোষ (হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা : প্রথম খণ্ড : সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী, ৮০ ; ১৩৩৮। নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃ. ১৪-৭০)

চিড়িয়াখানার অতিথি হাঁস : সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (অমৃত : প্রথম বর্ষ : ৩৩শ সংখ্যা । পৃ ৫৮০-৫৮৪)

The fauna of British India (Vol. III, IV) : W. T. Blanford F. R. S.

Handbook of the mangement of animals in captivity in lower Bengal (Calcutta : Bengal Secretariate Press, 1892) : Rama Bramha Sanyal.

Bird of India (Serventh revised edition, 1964) : Salim Ali.

Vedic index of Names and Subjects (Motilal Banarasidas, Varanasi : 1958. In two Volumes) : Arthur Anthony Macdonell and Arthur Berriedale Keith.

The oxford dictionary of Nursery Rhymes (Reprinted : 1952) : Edited by Iona and Peter Opie.

Samsad Anglo-Bengoli Dictionary (August, 1959).

Aspects of Bengali Society from old Bengali literature (University of Calcutta) : T. C. Das Gupta.

Crow language : A. M. Ferguson (JR) : (The Indian Antiquary ; Vol X, June 1881, P. 183. Vol. XI, March 1882, P. 87)

The Indian Antiquary : January, 1920.

Birds around Santiniketan : P.K. Sengupta (Visvabharati News : May, 1955 ; Oct. Nov. 1956).

তৃতীয় অধ্যায়

পাখি ও সাহিত্য

…১…

লোকসাহিত্য ও অভিজাত সাহিত্যে পাখির ভূমিকা অসামান্য। কবি ও শিল্পীরা জীবনের মধ্যে খোঁজেন ছন্দ, সুর, সুষমা,—একটা অব্যক্ত বিরাটের ইঙ্গিত। পাখির মধ্যে যেন সেই ছন্দ ও সুরের এবং দূরের আভাস তাঁরা পান। পাখি তাই সব ধরণের সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপাদানরূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে চিরকাল!

সাহিত্যে পাখির ভূমিকা দু'রকমের। এক, পাখির দৈহিক এবং যথার্থ ও বাস্তব দিক, যতটুকু চোখে দেখা যায়। দুই একটির মধ্যেই আসলে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা : পাখি এখানে কবি-সাহিত্যিকের কোনো বিশেষ তত্ত্ব, সত্য বা আইডিয়ার প্রতীক। পাখি দূর নভোলোকচারী, অনেক সময়েই বহুদূর দেশ থেকে আসা, যাযাবর, গায়ে রঙের সমারোহ, পাখায় ছন্দ, পায়ে নাচন,—সহজেই অনেক তত্ত্ব-মতবাদ-সত্যের সংকেত হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক দৃষ্টিতে সহজেই আমাদের মনে হয়, পাখিকে কোনো তত্ত্ব বা আইডিয়ার-'সিম্বল' রূপে গ্রহণ করবার প্রবণতা বুঝি কেবল অভিজাত সাহিত্যেই দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, পাখিকে 'সিম্বল' রূপে দেখবার প্রবণতা লোকসাহিত্যেও সমপরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে কে যে কার কাছে ঋণী, তা বোঝা কঠিন। কিন্তু এটুকু লক্ষ্য করেছি, সব দেশের লোকসাহিত্যেই পাখি প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে ব্যাপকভাবে, এমন কি, প্রকারে ও পরিমাণে অভিজাত সাহিত্যের চেয়ে বেশি রকমে। লোকমানস তার নিজস্ব মনস্তত্ত্ব দিয়ে পাখির গতিবিধি-আচার-আচরণ লক্ষ করেছে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে লোকমানসের যোগ নিবিড় বলেই, জীবনের সঙ্গে পাখি অনেক বেশি করে জড়িয়ে গেছে।

অভিজাত ও মার্জিত সাহিত্যেও পাখি প্রতীক বটে, কিন্তু কিছু তফাত আছে। মার্জিত সাহিত্যে পাখিকে যখন প্রতীক হয়ে উঠতে দেখা যায়, তখন সেই প্রতীক-পাখিটি একান্তভাবেই কবি-সাহিত্যিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত ধারণা দিয়ে গড়া, তাঁর নিজের ভালো-মন্দ লাগাটাই এখানে বড়ো ও সত্য। তিনি যে পাখিটিকে তাঁর খেয়াল ও খুশি দিয়ে কোনো তত্ত্ব বা সত্যের সংকেত হিসেবে নির্বাচন করে নেবেন, সেটাই হবে তাঁর কাছে বড়ো; অন্যের কাছে তা গ্রহণীয় নাও হতে পারে। 'ব্লু বার্ড' বা নীলপাখি নাট্যকার মেটারলিঙ্কের কাছে যে সত্য বয়ে আনে, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা নাও গৃহীত হতে পারে। একই 'স্কাইলার্ক' পাখি শেলী ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে ভিন্ন রূপে তাঁর

করে। 'বউ কথা কও' নামে মাইকেল যে অনবদ্য সনেটটি লিখেছেন, তাতে দেখা যায়, এ পাখি একটি রোমান্টিক পুরুষ, তার প্রিয়া "পাখা-রূপ ঘোমটায়" মুখ ঢেকে বসে আছে, এই "মানিনী ভামিনী"কে সবাক করবার জন্যে পাখিটির বারংবার এই উক্তি। এ নিতান্তই মাইকেলের নিজস্ব কল্পনা। 'আকাশে উড়িছে বকপাঁতি/বেদনা আমার তারি সাথী'—এখানে বকপাঁতি রবীন্দ্রনাথের বেদনার প্রতীক, কিন্তু অন্যত্র রবীন্দ্রনাথই বকের পঙ্‌ক্তির মধ্যে ভিন্নতর সত্য ও সত্তা খুঁজে পেয়েছেন। কাজেই মার্জিত সাহিত্যে পাখির মধ্যে শিল্পী একদিকে পান নিজের খুশিমতো সত্যের প্রতিচ্ছায়া (যেমন, কেউ মনে করেন পাখি দূরের প্রতীক, কেউ মনে করেন সুরের, কেউ বা গতির, কেউ বা গান বা ছন্দের বা কোনো অচেনা-অজানা জগতের, তেমনি, এক শিল্পীর ধারণার সঙ্গে অন্য শিল্পীর ধারণা নাও মিলতে পারে ; এমন কি, একই শিল্পীর মধ্যে পাখির প্রতীকতা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন-বিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে।

কিন্তু লোকসাহিত্যে পক্ষি-প্রতীকতার মধ্যে এমন ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে না। দেখা যায়, এক-একটি অঞ্চলে এক-একটি পাখি নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক কারণে যেমন প্রাধান্য অর্জন করে তেমনি, সেই পাখি বা পাখিগুলো সেখানকার বিশেষ একটি জনগোষ্ঠী বা লোকমানসে এক-একটি বিশেষ সত্যের বা ভাবের প্রতীক হয়ে ওঠে। কয়েকটি পাখি আবার ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে যায়। যেমন, টিয়ে-ময়না-কোকিল-কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখি যে ঘুমপাড়ানী গানে কিংবা প্রেমের গানে শিশুকন্যার এবং প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতীক, তা কেবল বাঙলা দেশেরই কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বত্রই দেখা যায়। এ প্রতীকতাকে তাই বাঙলা দেশের অঞ্চল বিশেষের প্রতীকতা বলব না, বলব ভারতীয় বা পূর্বভারতীয় একটি প্রতীকতা। আবার যখন, বাঙলা দেশের কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো বিশেষ পাখি, কোনো বিশেষ ভাবনার প্রতীক হয়, তখন তা আঞ্চলিক।

এই 'আঞ্চলিক প্রতীকতা' এবং শিথিল অর্থে, সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের প্রতীকতা কখনোই বিশেষ এক ব্যক্তির বোধের ফল নয়, তা সেই অঞ্চলের একটি জনগোষ্ঠীর নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক ধারণার ফল। কাজেই তাতে ব্যক্তি-মনের আভাসটুকু লাগে না, একজনের কাছে একটি বিশেষ পাখি যে ভাব ও ভাবনার প্রতীক, সেই গোষ্ঠীর সকলের কাছেও তাই। এখানেই অভিজাত সাহিত্যের পক্ষি-প্রতীকতার সঙ্গে লোকসাহিত্যের পক্ষি-প্রতীকতার তফাত। একটি বিশেষ পাখি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর কাছে যে বিশেষ ভাবের প্রতীক, আবহমানকাল এবং যুগ-যুগ ধরে তা এক এবং অভিন্নই থেকে যায়, এর কোনো পরিবর্তন সহসা ও সচরাচর ঘটে না।

পাখির দৈহিক, বাস্তব, প্রকৃত ও যথার্থ দিকটি অভিজাত সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য—উভয় ক্ষেত্রেই উপমান-উপমেয়রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানেও আছে পার্থক্য। মার্জিত-অভিজাত সাহিত্যে উপমার জন্যে যখন পাখিকে গ্রহণ করা হয়, তখন সব পাখিকেই গ্রহণ করা হয় না ; কেবল প্রথাসিদ্ধ, সাহিত্য-সংস্কারাচ্ছন্ন, সাহিত্যে যুগজীর্ণ ও ছাড়পত্র পাওয়া কয়েকটি পাখিকেই মাত্র নেওয়া হয়। যেমন চীনীয় সাহিত্যে ফিনিক্স বা ইউরোপীয় সাহিত্যে রবিন-নাইটিঙ্গেল-ফিলোমেলা। শুধু

তাই নয়, এক-একটি এমন ছাড়পত্র-পাওয়া পাখির সঙ্গে এক-একটি ভাবনার আসঙ্গ অন্বয়-বন্ধনে এমনভাবে জড়িত যে তার ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটলে প্রাচীনদের কাছে সাহিত্যের 'সিদ্ধরস'ই বুঝি বা বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেসব পাখি অপরিচিত বা একান্তই আঞ্চলিক, পূর্বসূরীরা যাদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করে একটি স্থায়ী অনুভূতিতে স্থির হতে পারেন নি, সেসব পাখি অভিজাত সাহিত্যে সাধারণভাবে প্রবেশপত্র পায় না। তাই নয়নের চাপল্য বোঝাতে সদাই খঞ্জনের নৃত্য, কর্ণের শোভমানতায় অসকৃৎ গৃধিণীর শ্রুতিমূল, নাসিকার অস্থূলতা নির্ণয়ে অবধারিতভাবে শুকের ওষ্ঠ—গুদাম-জাত এইসব উপমানই ব্যবহৃত হবে। কবিখ্যাতিহীন, সাহিত্য সংস্কার বর্জিত দু' একটি পাখির নাম ও প্রসঙ্গ মার্জিত সাহিত্যে কখনো সখনো পাওয়া গেলেও (যেমন, জীবনানন্দের রচনায়) তা নিতান্ত একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরবার জন্যে এবং বহুশঃ তা ব্যতিক্রমরূপেই বিবেচ্য। এজন্যে, পক্ষিপ্রতীকতার মধ্যে মার্জিত সাহিত্যে যেমন ব্যক্তিত্বের রঙ ও সার-সৌরভটুকু প্রায় অপরিহার্যরূপে লেগে থাকে, উপমা-উপমানেব ক্ষেত্রে ঠিক তাব বিপরীত ব্যাপার ঘটে,—সেখানে প্রথাসিদ্ধতার ডোবার মতো বদ্ধজলে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

এর বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে লোকসাহিত্যে। পাখিকে প্রতীকরূপে দেখবার মধ্যে এখানে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পথ নিশ্চিদ্ররূপে অবরুদ্ধ, কিন্তু উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু বা স্বাধীনতা; অতএব, সেই সূত্র ধরে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সংকুচিত সুযোগ রয়েছে। পাখিকে উপমান বা উপমেয় করে তোলবার সময় লোক সাহিত্যিক নিজ-নিজ অঞ্চলকে, সেই অঞ্চলের এক-একটি জনগোষ্ঠীর রস-রুচি ও মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দেন। ফলে, অখ্যাত, অবজ্ঞাত ও অপরিচিত পাখিও সাহিত্যের উপাদানরূপে স্বীকৃতি পায়। আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা-বিভাষাও এইখানে ক্রিয়াশীল হয়। কোনো-কোনো পাখির যে অঞ্চল বিশেষে নামের ও উচ্চারণগত প্রভেদ ঘটে থাকে, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। এই ভাষাগত দিক থেকেও আমরা স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করি, যা মার্জিত সাহিত্যে দেখা যায় না।

কয়েকটি পাখি সম্পর্কে যে সাহিত্যিক বিশ্বাস ও সংস্কার রয়েছে, যার ফলে সেই-সেই পাখি সাহিত্যের উপকরণে পরিণত হয়েছে,—তা, লোকসাহিত্য থেকে অভিজাত সাহিত্যে কিংবা অভিজাত সাহিত্য থেকে লোকসাহিত্যে গতায়াত করেছে। 'An out-line of Indian folk-lore' বইতে শ্রীমতী দুর্গা ভগত এ-বিষয়ে, অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করতে করতে, সামান্য আলোচনা করেছেন। তিনি ক্লাসিক সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের মাঝখানে 'জনপ্রিয়সাহিত্য' (Popular literature) নামে একটি স্তর কল্পনা করেছেন। ক্লাসিক সাহিত্যের সরল-তরল জনরুচিসম্মত রূপই হল 'জনপ্রিয় সাহিত্য'। এই 'জনপ্রিয় সাহিত্যে'র মাধ্যমেই আমরা নানারকম সাহিত্যিক সংস্কার ও বিশ্বাসের কথা জানতে পারি এবং কালক্রমে সে সংবাদের শাখা ও মূল প্রসারিত হয়ে লোকসাহিত্যের তলানিতে গিয়ে ঠেকে। তিনি আলঙ্কারিক রাজশেখরের 'কাব্য মীমাংসা'র উল্লেখ করে বলেছেন, তাতে পদ্ম, রাজহাঁস, পাহাড়ের ফাটলে সোনা-মণি পাবার বিশ্বাস, মলয় পর্বতে চন্দনের কথা অথবা রাতের বেলায় চখা-চখীর বিচ্ছেদের

কথা বলা হয়েছে সাহিত্যিক বিশ্বাস রূপে। "All the allusions to the cakravaka birds have descended from sanskrit epic and classical poetry. Popular poetry copies it and ultimately it passes on to folk poetry···In classical literature as well as in the supposed folk-literature their tone and diction are of the same quality. These seems to me, popular songs." p. 62.

কিন্তু লোকমানস-জাত অনেক সংস্কারও যে অভিজাত সাহিত্যে উন্নীত ও গৃহীত হয়েছে, শ্রীমতী ভগত তার উল্লেখ করেন নি। শ্রীমতী ভগতের ইঙ্গিতের সূত্র ধরে বলা যায়, কোকিল, ক্রৌঞ্চ, হাঁস, সারস প্রভৃতি পাখি সম্পর্কে সাহিত্যিক বিশ্বাস ক্লাসিক ও অভিজাত সাহিত্য থেকেই সঞ্চারিত বটে; কিন্তু লোকসাহিত্যে প্রথমতঃ, এইসব সংস্কার অবিকৃতরূপে গৃহীত হয় নি; দ্বিতীয়তঃ, এইসব প্রথাসিদ্ধ পাখি ছাড়াও লোক-সাহিত্যে অন্যান্য পাখি উপকরণরূপে গৃহীত হয়। কোকিলকে অবলম্বন করে যখন লোকসাহিত্যে 'বারোমাসী' গান বা প্রেম-বিরহের গান পাই, তখন সে প্রথা ও রীতি উচ্চতর সাহিত্য থেকে আগত বলে হয়তো শ্রীমতী ভগত সন্দেহ করবেন, যদিও 'বারমেসে' গানের উদ্ভব লোক-সাহিত্যেও হয়েছিল কিন্তু কোকিল প্রেম ও বিরহ বা বসন্তের দূতী না হয়ে যদি স্বয়ং প্রেমিক বা প্রেমিকা হয়ে ওঠে, যা উচ্চতর মার্জিত সাহিত্যে-দেখা যায় না, তখন তাও কি মার্জিত সাহিত্যের প্রভাবজাত বলে মনে করব? বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় 'কোকিল' শব্দের উচ্চারণের এতো রকমফের দেখা যায় যে, তা যে লোকসাহিত্যের ও জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের সুযোগটুকুও থাকে না, এবং সেক্ষেত্রে এ পাখি সম্পর্কে সংস্কারটি কতদূর মার্জিত সাহিত্য থেকে আগত, তাই-ই সন্দেহের বিষয় হয়ে ওঠে। চাতক, চকোর, ময়ূর সম্পর্কে সাহিত্যিক বিশ্বাসও তেমনি ক্লাসিক ও অভিজাত সাহিত্যে পরিমাণে বেশি বলে, তা অভিজাত সাহিত্যেরই পদার্থ, এমন মনে করা ঠিক নয়। মার্জিত সাহিত্যের হাঁস বা রাজহাঁস যদি লোকসাহিত্যে 'কোড়া' বা 'ডাহুক' হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে লোকমানসেই এই সংস্কারের উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু অভিজাত সাহিত্যে সে বিশ্বাস মার্জিত ও মসৃণ হয়ে নিছক সাহিত্যিক বিলাসে পরিণত হয়েছে, আর লোকসাহিত্যে তা অমসৃণ ও স্থূল জীবনের ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়ে আবৃত এক গোষ্ঠীগত বিশ্বাসে প্রসারিত হয়েছে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটিকে স্ফুটতর করা যায়। প্রথমতঃ, কয়েকটি সাহিত্যিক বিশ্বাসের মধ্যে জ্ঞান ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতার এমন একটি দিক আছে, লোকমানস, স্বভাবতঃই তার ধারণা করতে অসমর্থ বা অক্ষম। যেমন 'ক্রৌঞ্চরন্ধ্র' বা 'হংসদ্বার' সম্পর্কে কালিদাসের রচনায় যে সাহিত্যিক বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে, লোকসাহিত্যে কখনোই তা দেখা যাবে না। কিংবা রবীন্দ্রনাথের গানে পাই,

হংস যেমন মানসযাত্রী, তেমনি সারা দিবস রাত্রি··

সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক্ মহামরণপারে।— —গীতাঞ্জলি, সং ১৪৮

অথবা প্রাচীন ভারতীয় বিলাসিনী বা নায়িকারা যেমন গৃহাঙ্গনে ময়ূর রাখতেন কিংবা ভবনশিখীকে ক্রীড়াচ্ছলে নাচাতেন, সে সাহিত্য বিশ্বাস রবীন্দ্রসাহিত্যে মিলবে,

কিন্তু লোকসাহিত্যে মিলবে না। যেমন, রবীন্দ্রনাথের গানে দেখি তাঁর প্রেমিক প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : 'ধরিয়া রাখিয়া সোহাগে আদরে/আমার মুখর পাখি —তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে'; কিংবা : 'তালে তালে দুটি কংকণ কনকনিয়া/ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া'। এসব সাহিত্যিক সংস্কার পুরোপুরিই অভিজাত সাহিত্যের, লোকসাহিত্যে অদৃষ্ট।

'সাহিত্য দর্পণে' আছে (৭।২৩) হাঁসেরা বর্ষাকালে বিহার করবার জন্যে মানস-সরোবরে যায়, এ হল কবি-প্রসিদ্ধি। মানসসরোবর হাঁসদের জন্মস্থান, তাই, বর্ষাকালে কেলি করবার জন্যে সব হাঁস সেখানে সমবেত হয় বলে বিশ্বাস। 'মানস, হল, কৈলাসে ব্রহ্মার মানসনির্মিত সরোবর। 'মানস' শব্দের অপর অর্থ : 'রাজহংস'। এইসব কবি-বিশ্বাসের ফলে কালিদাস লিখেছেন : 'মানসরাজহংসী'। 'গীত গোবিন্দে' পাই, 'মুনিজন মানসহংস'। হাঁসের থেকে ভারতচন্দ্র লিখেছেন 'মানসসারস'। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে অবশেষে 'মানস শুকপাখি'। 'মানস-এর সংস্পর্শে 'মন' এসে গেছে যেমন, দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'তে : 'এই ত আমার মন-পিঞ্জরের হীরেমন এল।' মন-কে পাখি এবং বক্ষ-পঞ্জরকে সে পাখির পিঞ্জররূপে কল্পনা অভিজাত সাহিত্যের এক অতি প্রিয় ও পরিচিত সংস্কার থেকে জাত।

অথচ, বাউল-কবি যখন বলেন, 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কমনে আসে-যায়'— তখন ঠিক এই অভিজাত সাহিত্য-সংস্কারের প্রভাবেই তা বলেন, এমন মনে করবার কারণ নেই। এখানে আছে একটি আদিম লোকবিশ্বাস, একটি নৃতাত্ত্বিক দিক, একটি আচার সংস্কারজাত রহস্য-বিস্ময়বোধ, যাতে গোষ্ঠীগতভাবে বিশ্বাস করা হয়; মানুষের আত্মা 'পাখি'।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, একই পাখিকে উপমান উপমেয়রূপে গ্রহণ করবার পেছনে দু'ধরনের সাহিত্যে দু'রকমের মনোভাব কার্যকরী হয়েছে। অভিজাত সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে পাখি সম্পর্কে এই দুধরণের সংস্কার-বিশ্বাসকে দুটি নাম দেওয়া যায় : একটিকে বলা যায় 'সাহিত্যিক বিশ্বাস', আর একটি হলো 'সামাজিক বিশ্বাস'। 'সামাজিক বিশ্বাসে'র মূল্য ও ব্যাপকতা বেশী, তার মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি পরিস্ফুট হয়। 'সাহিত্যিক বিশ্বাস' কেবল সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের মধ্যেই আবদ্ধ এবং বিশ্বাস করলে বা না করলে কিছুই এসে যায় না। কিন্তু সামাজিক বিশ্বাস' জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং জীবনধারণ করতে এ বিশ্বাস সেই জনগোষ্ঠীর পক্ষে অপরিহার্য।

সাহিত্যিক বিশ্বাসের পেছনে যেন নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক জগতের এক সমর্থন থাকে, তাকে যুক্তি দিয়ে যেন বিচার করা যায় বা বোঝানো-দেখানো যায় : সামাজিক বিশ্বাস কিন্তু এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় জগৎকে ঘিরে গড়ে ওঠে, তা দেখানো-বোঝানো যায় না। চকোর চন্দ্রসুধা পান করে বলে মার্জিত সাহিত্যে যে বিশ্বাস চলিত আছে, তার পেছনে একটি যুক্তি এই যে, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতেই এদের আকাশে ঘুরপাক খেতে দেখা যায়; কোকপাখি পদ্মবিশেষ ফুটে উঠলেই ডেকে ওঠে, দুয়ের মধ্যে একটি সরল যুক্তি দিয়ে যোগসাধন করে পদ্মবিশেষের নাম হল 'কোকনদ'। চখা-চখী সারাদিন একত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এ প্রায় পরীক্ষিত সত্য। এগুলোর কোন-কোনটি কিছু-কিছু যুক্তি দিয়ে যেন ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু সামাজিক বিশ্বাসের পেছনে কোনো যুক্তি নেই বা একদা থাকলে আজ তা অদৃশ্য, অনির্দেশ্য বা অবলুপ্ত। অথচ, মজা এই সাহিত্যিক অনেক বিশ্বাসই আজ আধুনিক মানুষের কাছে অসার কবিকল্পনা বা নীরস প্রথানুসৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু যুক্তহীন সামাজিক বিশ্বাস আজও লোকমানসে জীবন্ত। কেন কোনো পাখি ডাকলে বাড়িতে শুভ বা অশুভ হবে, কেন পাখি বিশেষের ডাকের সঙ্গে বাড়িতে নবজাতকের আগমন সূচিত হবে অথবা বিবাহ কিংবা মৃত্যু, তার কোনো যুক্তি নেই, জবাব নেই। বলা যেতে পারে, একদা এক বিশেষ ভঙ্গিতে এক বিশেষ পাখিব ডাকের ফলে এক বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছিল কোনো বিশেষ ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতায়, এখন একটি জনগোষ্ঠীর সকলের কাছে বিশ্বাস্য ও গ্রহণীয় একটি সংস্কার। একদা যা ছিল কাকতালীয় বা Post-hoc crogo-bropter-hocএখন তাই নির্বিশেষে ও নির্বিচারে গৃহীত। এতে যুক্তি নেই। বরং পাখির ডাক বিশেষ যেন এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তা যেন এক দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় লোকের রহস্যদ্বার উন্মোচন করে মানুষকে হঠাৎ-হঠাৎ সেই রহস্যলোকের বিশেষ-বিশেষ সংবাদ যাচিত বা অযাচিতভাবে সববরাহ করে যায়; মানুষ সেই রহস্যলোকের বার্তা পেয়ে খুশি বা অখুশিতে কম্পিত-রোমাঞ্চিত হয়, যেন এক না-দেখা জগতের রহস্যমোড়া অচেনা আলোকের প্রক্ষেপ এসে পড়ে তাকে সেই লোকের সঙ্গে নিবিড়তর মানসিক বন্ধনে বেঁধে ফেলে। কী যেন আছে — কী যেন হবে—এই বোধ তাকে স্বস্তি-অস্বস্তির অপ্রতিরোধ্য ও অমোঘ দোলায় দুলিয়ে দিয়ে যায়। এটাই হলো 'সামাজিক বিশ্বাস'।

আভিজাত সাহিত্যে এই 'সামাজিক বিশ্বাসে'র স্থান অবশ্যই আছে কিন্তু সেখানে এ বিশ্বাসের প্রয়োগের মধ্যে বিশেষত্বও আছে। এর ভালো দৃষ্টান্ত স্বয়ং শেক্সপীয়ার। কাক ও পেঁচা সম্পর্কে শেক্সপীয়ার তাঁর নাটকে এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজদের লোকবিশ্বাসের বহু পরীচয় দিয়েছেন। যেমন, 'ম্যাকবেথ' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে: It was the owl that shirekep The fatal bell-man Whieh gives the stern'st good-nisht 'হেনরী দি ফোর্থ" নাটকের এক জায়গায় আছে: The owl shriked at thy brsth, an evil sign ; The night-crow cried, abiding lucklcss time.

এই নাটকেই পেঁচা সম্পর্কে বলেছেন: Thou ominus and feargul owl of death' (IV.2); 'Boding screach owl' (III,2) :রিচার্ড দি থার্ড" নাটক: Nothing but songs death' (IV,4। তেমনি কাক (Raven)-এর সঙ্গেও দেখেছেন মৃত্যুর আভাস। 'ম্যাকবেথ নাটকে কাকের প্রসঙ্গে মন্তব্য: 'craks the fatal entrance of Duncan.' 'কিংজন' নাটকে (IV,iii, 153), বা 'জুলিয়াস-সীজার' নাটকেও (V'i,85) কাকের সংঙ্গে মৃত্যুর যোগ উল্লেখ করেছেন। কিংবা, ওথেলো' নাটকেও (IV,i, 21। 'উইন্টার'স্ টেল্' নাটকে (II,iii, 186) আছে, come on, poor babe : Some powerfut spirit instruct the kite and ravens to be they nurses.

'হ্যামলেট, নাটকে ওফেলিয়া মন্তব্য করেছে: 'They say the owl was a baker's dughter' (IV., V).।

এইসব ক্ষেত্রে পাখি সম্পর্কে সে সংস্কার প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের পূর্বোল্লিখিত

'সামাজিক বিশ্বাসে'র অন্তর্গত। নাটকের অনেক ঘটনার ইঙ্গিত এই পক্ষি-সংস্কারের মাধ্যমে শেক্সপীয়ার ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পাখির আবির্ভাব বা তার কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত মাত্র, কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনার বা পরিণামের একটি suppoting বা Subscribing reason রূপে গৃহীত, কখনোই Sole reason রূপে নয়। নাটকের ঘটনাবলী এখানে নাটকের নিজস্ব নিয়ম ও গতিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, পাখীর আগমন বা কণ্ঠস্বর সম্পর্কে কোনো সংস্কার দিয়ে নয়, পাখি এখানে ঘটনার আবহমাত্র রচনা করেছে। লোকসাহিত্য হলে পাখি সম্পর্কে সংস্কারটাই Sole reason হয়ে নাটককে নিয়ন্ত্রিত করত।

অভিজাত সাহিত্যে পাখির আবির্ভাব বা কণ্ঠস্বরকে যেন এক সাহিত্যকর্ম বা শিল্প-কর্মরূপে নেওয়া হয়। কোনো ভৌতিক বা মায়াময় বা রহস্যময় পরিবেশকে পরিস্ফুট করবার জন্যে, কি কোনো সুখ বা শোকের লগ্নকে উজ্জ্বল ও অম্লান করবার জন্যে, এখানে পাখিকে এক শিল্পরূপে ব্যবহার করা হয়, শেক্সপীয়ার, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথেও তাই। এ হলো এক ধরণের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উপায়। কিন্তু সেই পাখিকে যখন লোকসাহিত্যে দেখা যায়, তখন তা কোনো শিল্পরূপে বা কোনো সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উপায়রূপে প্রকাশিত হয় না; তা আসে নিয়তি-নির্ধারিত এক অমোঘ-অলঙ্ঘ্য সত্য বা ভবিষ্যৎকে প্রকাশ করবার দুর্জ্ঞেয় কিন্তু আবশ্যিকভাবে একমাত্র কারণ-রূপে।

মার্জিত সাহিত্যে পাখিকে সংকেত ও প্রতীকরূপে দেখা ছাড়াও 'রূপক' রূপেও দেখা হয়। 'রূপকে'র সঙ্গে সংকেত-প্রতীকের পার্থক্য আছে। 'রূপক' হলো একটি প্রার্থিত সত্য বা তত্ত্বকে গল্পের মোড়ক বা আবারণ দিয়ে প্রকাশ করা; এতে যিনি গল্প চাইবেন তিনি গল্পরস পাবেন, যিনি গভীরে গিয়ে তত্ত্ব চাইবেন, তিনি তাও পাবেন। ভিন্ন রুচির ভিন্ন ব্যবস্থা এখানে। কিন্তু সংকেত-প্রতীকে তা নয়। এখানে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য একটাই : বা কোন সত্য তত্ত্বের ইঙ্গিতবাহী কোনো ভাববস্তুকে গ্রহণ করা। মার্জিত সাহিত্যে পাখি 'রূপক' এবং সংকেত-প্রতীক দুই-ই হতে পারে : লোকসাহিত্যে পাখি 'রূপক' পরিণত হয় না। গল্পরস ও তত্ত্বরসকে রেললাইনের মতো সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত করিয়ে আনার মধ্যেপ্রতিভার যে সামর্থও সচেতনার দরাকর অথবা যে বিশিষ্ট মনোভঙ্গির, লোকসাহিত্যকের তা না থাকাই স্বাভাবিক।

'রূপক'কে Allegory হিসেবে না দেখে যদি Metaphor রূপে দেখা যায়, তবেও দু'সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পাখিকে অবলম্বন করে অভিজাত সাহিত্যে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা করে যথার্থ 'রূপক' অলংকার যেখানে হামেশাই দেখা যায়, লোকসাহিত্যে সেখানে আপেক্ষিকভাবে উৎপ্রেক্ষার প্রাধান্য লক্ষিত হয়॥

ছড়া, ধাঁধা, গান, প্রবাদ ও কথা · লোকসাহিত্যের এইসব দিকেই পাখিকে অবাধ স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যা লক্ষণীয় তা হলো—পাখির বিশিষ্টতা বা তার উল্লেখের মধ্যে মনোভঙ্গির বিশিষ্টতা। নিছক পাখির উল্লেখকেই আমি লোক-

সাহিত্যিকের পক্ষে 'পক্ষি-মনস্কতা' বা আলোচকের পক্ষে 'বিহঙ্গচারণা' বলব না। এই-জন্যে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেখানে পাখির উল্লেখমাত্র ঘটেছে, নিছক বস্তুপিণ্ড-রূপে এখানে তার নিতান্ত সহজসংলক্ষ্য দৃষ্টান্তগুলো পুঞ্জীভূত করে তুলতে চাই না। লোকসাহিত্যে তাকেই বলব 'পক্ষি-মনস্কতা' কিংবা 'বিহঙ্গ-চারণা' যখন পাখিকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হবে, যখন তার মধ্যে ধরা দেবে একটি বিশেষ জন-গোষ্ঠীর মনোভঙ্গি ও মনস্তত্ত্ব, তার সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক জীবন,—এমন কি, অভিজাত সাহিত্যের মতো এতেও যদি থাকে, অবশ্য একান্ত লোকসাহিত্যেব ভঙ্গিতেই, পাখিকে অবলম্বন করে কোনো শিল্পকর্মের প্রকাশ।

ছড়ার কথাই সকলের আগে ধরা যাক। ছড়ায় পাখি-চেতনা ধরা পড়ে এই বিষয়-গুলিতে

১. ছেলেভুলানো ছড়ায় (এবং ঘুমপাড়ানী গানে শিশু পাখির প্রতীকে পরিণত হয় ;
২. পাখির সঙ্গে শিশুর আত্মীয়তা স্থাপিত হয় ;
৩. পাখির সঙ্গে রাজ্য, রাজা ও রাজতন্ত্রের যোগ লক্ষ্য করা যায় ;
৪. পাখির সঙ্গে বিবাহের কথা উল্লিখিত হতে দেখা যায় ; কদাচিৎ মৃত্যুব প্রসঙ্গ ;
৫ পাখির সঙ্গে ধন-সম্পদের যোগ দেখা যায় ;
৬. পাখিকে অবলম্বন করে 'বারোমাসী' ছড়া রচনা ;
৭. ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ের উল্লেখ।

'বিহঙ্গচারণা'র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উল্লিখিত এই প্রসঙ্গগুলোকে বাঙলাছড়ার উপাদান-উপকরণ বা Motif বলতে পারি। এই প্রসঙ্গ-উপাদান-উপকরণগুলো ছড়ায় যেখানেই পাখির উল্লেখ আছে, সেখানেই দেখা যাবে। এ-বিষয়ে দুটি ছড়াকে আমি আদর্শরূপ বলে ধরেছি। ছড়া দুটি এই .

১ ঘুঘু-ঘু/পেটে ফু/কি ছেলে হলো/বেটাছেলে/ছেলে কই/মাছ ধরতে গেছে/মাছ কই/চিলে নিলে। চিল কই/ডালে বসেছে।/ডাল কই/পুড়ে ঝুড়ে গেল।/ছাই মাটি কই/ধোপায় নিলে/কি করিলে/কাপড় ধুলে/সোনা কুড়ে পড়বি না ছাই কুড়ে পড়বি।

২. বুড়ী লো বুড়ী দাখানা কৈ ? /সুতোরে নিয়েছে।/সুতোর কৈ ? পিঁড়ি চাঁছে।/পিঁড়ি কৈ ? বৌ ব'সেছে।/বৌ কৈ ? জলে গেছে।/জল কৈ ? ডাউক খেয়েছে।/ডাউক কই ? বনে গেছে।/বন কৈ ? পুড়ে গেছে। /ছাই-পাঁশ কই ? ধোপা নিয়েছে।/ধোপা কৈ ? কাপড় কাচে। /কাপড় কৈ ? রাজা পরেছে। /রাজা কৈ ? সভায় গেছে।/সভা কৈ ? ভেঙ্গে গেছে।

দুটো ছড়াই লক্ষ্য করলে এই প্রসংগ-উপাদান-উপকরণগুলো পাওয়া যায় :

প্রথমটিতে : পাখি-ছেলে-মাছ-পাখি-গাছ-আগুন-ধোপা-সোনা। দ্বিতীয়টিতে : বুড়ী-দা-সুত্যার -পিঁড়ি-বৌ-জল পাখি -বন-আগুন, ধোপা-কাপড়-রাজ-াসভা। কয়েকটি প্রসংগ দুটো ছড়াতে অবিকল এক। যেগুলো মেলে-না, সেগুলো এভাবে মেলানো যায় : প্রথমটির 'গাছ' দ্বিতীয়টিতে 'বনে' পরিণত, গাছ দিয়েই বন তৈরি হয়। রাজার সঙ্গে ধনদৌলত এবং সোনার যোগ আছে. এইভাবে প্রথমটির 'সোনা'র সঙ্গে দ্বিতীয়টির 'রাজা'কে মেলানো যায়। 'ধোপা' ও 'সুতোর' সম্পর্কে আমি এখন পর্যন্ত কোনো

সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি। যাই হোক, পাখির উল্লেখ যেসব ছড়ায় দেখা যায়, সে-সব ছড়ায় মোটামুটি ওপরে উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলো লক্ষ্য করেছি আমি।

এবারে প্রসঙ্গগুলোর স-দৃষ্টান্ত আলোচনা করি।

পাখির সঙ্গে শিশুর এক দুর্নিরীক্ষ্য বা দুর্বোধ্য যোগ লক্ষ্য করা যায়। অনেক ছড়াই মেলে যাতে পাখি ও শিশু অভিন্ন হয়ে গেছে এবং অতঃপর পাখিই শিশুর প্রতীকে পরিণত হয়।

অনেক সময়েই বিশ্বাস করা হয়, মানুষ বৃদ্ধ হয়ে অথবা অকালেই পূর্বজন্মের কালসীমা উত্তীর্ণ হয়ে পরজন্মে নতুন করে জন্ম নেয়। মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গলোকে যায় এবং স্বর্গ আকাশে অবস্থিত বলে কল্পিত, পাখিও সেই আকাশচারী প্রাণী। মানুষ যখন স্বর্গ থেকে এসে পুনরায় শিশুরূপে কোনো গৃহে জন্ম নেয়, তখনো তার সঙ্গে স্বর্গের সুরভি ও পরিবেশ জড়িয়ে থাকে, এবং অতঃপর আকাশচারী পাখির সংগে তাকে অভিন্ন করে দেখা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

আদিম মানব মনে করে—আত্মার মরণ নেই, তা বিনষ্ট হয় না। মানুষ জীবিত থাকতেই তার আত্মার একাধিক রূপে, রূপান্তর ধারণক্ষমতায় এবং দেহ থেকে আত্মার ঘুমন্ত অবস্থায় বিচ্ছিন্নতায়, আদিম মানুষ বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে, নৃ-বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে Metempsychosis. এই মানসিকতার ফলে পূর্বপুরুষের আত্মা স্বর্গ থেকে শিশুরূপে ফিরে এসেছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

জার্মানীতে বিশ্বাস করা হয়, মুমূর্ষুর আত্মা তার ভাইয়ের দেহে চলে যায় এবং এতে তার শক্তি-সাহস দ্বিগুণিত হয়। গারো-রা বিশ্বাস করে, আত্মা মৃতদেহের সঙ্গে যমালয় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং উজ্জীবিত হয়। এইজন্যে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মৃত পূর্বপুরুষের নামানুসারে নবজাতকের নামকরণ করতে দেখা যায়, যেন সেই, ই ফিরে এসেছে। অনেক সময়ে মৃত পূর্বপুরুষের দেহ-চিহ্নও নবজাতকের দেহে অন্বেষণ করা হয় এবং সাদৃশ্যজনক কিছু পেলে এই বিশ্বাস বলবতী হয়।

আত্মা সম্পর্কে আদিম মানুষের ধারণা কি, এইসব তথ্য থেকে স্পষ্টই তা বোঝা যায়। আত্মা যেমন অবিনাশী, এবং আত্মা যেমন পাখিতে পরিণত হতে পারে, তেমনি 'টোটেম' বা 'কুলকেতু' রূপেও পাখিকে দেখা হয়। পাখি যখন গোত্রপ্রতীক, তখন সেই গোত্রভুক্ত পরিবারের নবজাতকের পাখির সংগে একাত্ম হয়ে যাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

আধুনিক যুগের মানুষ পাখির সঙ্গে শিশুর অভেদকে অন্য দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাঁদের কাছে শিশু হলো পাখির মতো সুন্দর, সুকণ্ঠ, পবিত্র ও সুদূর থেকে আসা (পাখি যেমন ঋতুতে ঋতুতে বহু দূরদেশে যায় এবং সেখানে থেকে ফিরে আসে) এক অপার্থিব অতিথি। এতে নৃতাত্ত্বিক দিক অপেক্ষা একটি কবিত্বময় দার্শনিক দিকই বড়ো হয়ে ওঠে। যে করেই দেখা যাক না কেন, পাখির সঙ্গে শিশুকে একাত্মারূপে দেখি ছড়াতে।

এবার এ-বিষয়ে ক'টি উদাহরণ দিই:

আয় রে পাখি আয়/কালো জামা গায়।/আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে/ সোনার নূপুর পায়। ও আমার যাদু বাছা কন বনেতে যায় /পিঁজরাতে বসি ময়না চিকন দানা খায়। খকন খকন পায়রাটি কোন্ বিলেতে চর/খকন ব'লে ডাকলে পরে মায়ের কোলে

পড়ে।…খোকা বলে পাখিটি কোন বিলেতে চরে/খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে। সাইর শুয়া দুয়া পক্ষী গভীন বিলে চরে/সাইরটা বুলি ডাক দিলে বুক জুড়িয়া পড়ে। আবু গেছে মাছ ধরতে ধনু গাঙের পারে/…আবু করুইয়া ডাক দিলে উড়ুইয়া আইসা পড়ে ॥ /আবু যাইব তামসা দেখতে ময়না যাইব সাথে।

…আমার ভাই হাঁটে রে টাপুর-টুপুর পায়। /এই উড়ে এই পড়ে দুঃখ নাহি পায়। ময়না কান্দে কিসের ল্যায়? টুইর (মাগুর) মাছের ঝোলের ল্যায়। …কৈতরী লো কৈতরী, উছাধান (সেদ্ধ করা ধান)। ঢুপী লো ঢুপী, ধান লাড়ছস্ কই…এমন কি, ২৪-পরগণা থেকে পাওয়া একটি ছড়াতে শিশু-কন্যার নামই মেলে 'কোকিলমণি': কোকিলমণি ঘর যাবে গো, রাখতে যাবে কাকা।

ছেলে ভুলানো ছড়ায় এবং ঘুমপাড়ানী গানে শিশুর মাতা-পিতা ও পূর্বপুরুষকে পর্যন্ত পাখি বলা হয়েছে ঃ

কইতরীর মা ঘরো গো / মুগীর ঠেঙ্গো ধর গো …। আমার আবু ঘুমায় রে কাল বাদুড়ের ছাও।/বাদুড় গেছে মধু খাইত (খেতে) শুইয়া নিদ্রা যাও। হলি ললি গো কাল বাদুড়ের ছাও। আমার খোকন গোসল করবে পানকৌড়ির ছা। কা-কা কা কাকের ছানা /দুধ খায় না খোকন ধনা। ঘুম যা রে বাদুড়ের ছাও ঘুম যা রে তুই। কাউয়া লো কা/তর নাতির ঘরে পুতি আইছে দেখ্‌খ্যা আইতে যা। হাড় গোড়ল গে হাড় গোড়ল/তোর মাও কোঠে গেইছে ; / ছয় কুড়ি ছোয়া নিয়া /গান শুনিবা গেইছে। ও বগী তুই বাড়ীত আয়। / তোর দুইটি ছাও কান্দে আধারি চায়।

যে ঘুমপাড়ানী 'মাসীপিসী' শিশুর এত প্রিয় স্বয়ং সেও একটি পাখি : ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী আমাদের বাড়ী যেও।…খিড়কী দুয়ার কেটে দেব ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ যেও। কথান্তর : খিড়কী দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেয়ো। ঘুমঘুমানী মা গো তুমি আমার বাড়ী যাইও./পাকা কাঁঠাল ভেঙ্গে দিব ডালে বসি খাইও। নিন্দাওয়ালী মাই গো মোদের বাড়ী যাইও।/…আবু দিব দুধভাত ডালে বসি খাইও। নিনুরাওয়ালী মাইয়া গো/কাল্ বাদুড়ের ছাও।

চাঁদ-ও পাখি হয়ে গেছে : আয় চাঁদ আয় রে/ বাঁশ বাগের উপর দিয়া ; /…আয় চাঁদ উড়ুইয়া। চান-ঘুঘু চান-ঘুঘু/তোরহে দোহাই ; / এক বেটী বিহানু/ষোল জামাই।

পাখির সঙ্গে শিশুর আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে এক দিকে, অপরদিকে পাখি শিশুর খেলার সাথী হয়ে উঠেছে।

আমার ছেলে আমার কোলে/গাছের পাখি গাছের ডালে। /খোকা ডাকে আয় রে পাখি/তোরে দেখে হব সুখী। আয় রাখি লেজঝোলা/তোকে দেব দুধকলা। /দেখে যা আমার নলিনবালা/শুয়ে কেমন করছে খেলা। আয় রে আয় সোনার পাখি / তোরে হেরে জুড়াই আঁখি/…তুই গোপালের সাথী। আয় পাখি ঘুমো/আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো। …কাগা-বগা আয় আয়/দেখ'সে খোকা ভাত খায়।… বক মামা বক মামা টিক্ দিয়ে যাও/গোলাভরা ধান আছে দুটি নিয়ে যাও। বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যা/নারকেল গাছে কড়ি আছে গুণে নিয়ে যা। কাউয়া নানা/এক আম লে না/দুই আম লে না। কাগা আমার ঠাকু ভাই/আম ফালা বাড়ীত্ যাই।… পাতি কাউয়া নাতি ভাই/আম ফালা বাড়ীত্ যাই। কাউয়া ভাই কা-কা / ছাইয়ার মা

রে লইয়া যা/কোনদিন আইব কইয়া যা। বাদুড় বাদুড় মিতা/হা থাবি তা তিতা। বাদুড় বাদুড় চৈতা/মামু কইছে খাইতা / তিলের-নাড়ু খাইতা। তিল লাগে তিতা/তুমি আমার মিতা। বুলবুলি লো সই মনের কথা কই। বুলবুলি লো খালা/উগ্‌গা (একটি) বরই ফ্যালা।

বুলবুল আমার কাকা/কুল ফেল পাকা ('প্রতিভা' :<পৌষ ১৩১৮, পৃ ৪'৭৮৪৮০॥ টকা আমার মিঞা ভাই, বরৈ ফেলা বাড়িত্‌ যাই।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে শিশুর সঙ্গে যে আত্মীয়-সম্বন্ধ কল্পিত হয়েছে, তার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত ছড়াগুলো, যাতে শিশুর মাতা-পিতা ও পূর্বপুরুষকে পাখি বলা হয়েছে, —বেশ মিল আছে। একই মনোভাব থেকেই দুটি উদ্ভূত।

মাদ্রাজের উত্তরপূর্ব দিকে, পূর্বঘাট অঞ্চলের শবরদের একটি ঘুমপাড়ানী গানেও শিশু ও পাখিকে অভিন্ন হতে দেখা যায় (S'ora (savara) Folk-lore : Miss Annie Catherine Munro : Man in India, vol. X, January-March, 1930, No. 1, pg. 1-9) :

Make nonoise, make no noise, make no noise, my pretty eyes./ You are your daddy's 'twin-twin' (unidentified) birdie. / You are your mummy's 'ni-da' (snipe) birdie. / You are your elder brother's 'Pong Pong' (paddybird) birde. / You are your younger brother's 'bulbul' birdie···

পাখির সঙ্গে রাজা, রাজত্ব এবং রাজতন্ত্রের যোগ দেখা যায়। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করেছি। এখন এ-বিষয়ে কেবল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ভশ্‌শালিকের দুই ডিম / ফিঙে রাজা টিমটিম্‌। বলে গেছে চড়ুই রাজা/চোরের পেটে চাল-কড়াই ভাজা। রামশালিক, রামশালিক পায়ে দিয়ে মোজা/তেলের ভাঁড়ে চান করে ফিঙে হল রাজা। পূর্ববঙ্গের (নেত্রকোণা) ছেলেরা শকুন তাড়াতে তাড়াতে বলে : শকুন রাজা গিরধনী। একটু দারু দিবেনি মরা খাইয়া খচ্চর/তুইন বড় নচ্চর (নচ্ছার ?)

এই রাজ-রাজড়ার সূত্র ধরে যেসব ছড়ায় পাখির নামোল্লখ আছে, সেখানে ধন-সম্পদ ও সোনা-দানার কথা এসে গেছে। এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য, উপস্থিত ক্ষেত্রে উদাহরণ সংকলন করছি মাত্র :

ধন ধন ধন পায়রা / ধন পায় গো কারা/ঘোষ পাড়ায় কামনা করে ধন পেয়েছি আমরা ॥ খুকীকে বিয়া দিব/দিব রাজার দ্যাশে। তারা বাইশ বলদে চষে ॥ /তারা ঘুর্ণী কবুতর পোষে।

বয়স্ক মানুষের আনুষ্ঠানিক ছড়ার মধ্যেও পাখির সঙ্গে ধন-সম্পদের যোগ দেখি। যেমন, পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী 'মাগন' বা চাঁদা চাইবার সময় বগুড়া জিলায় কথিত ছড়াতে : আইল রে আমশালুকা দাঁতে কর্যা কুট। /হামরা মাগিয়া খাই এই মাস পুষ ॥ /এই মাস পুষো রে বনে প'লো টাটি। /এক্কি ঝাঁকে উড়ান দিলাম নও জোড়া পাখি ॥ /নও জোড়া পাখি রে ইকর-বিকর। /···বান্যার বাড়ী ঘুঘুর ভাঁসা এক্কে ভাঁসা নও নও টাকা। কিংবা বরিশাল জিলার একটি মাগনের গানে : ·· রাজার বাড়ী হাজার বাসা/তা দেখ্যা ওড়ে হাঁসা/হাঁসা ওড়ে দিয়া মোড়া/পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া।

খুলনা-যশোরের মাগনের গানে : এ বাড়ী কার রে/চাঁদ মুখ যার রে > চাঁদমুখ কোতরির ঠোঁট/পায়রা আসে দিল ঠোক···

মজার ব্যাপার এই, মুসলমানগণও যখন 'মাগনে' গিয়ে লক্ষ্মীর ছড়া বলেন, তখনও পাখি ও ধন-সম্পদ একত্র উল্লিখিত হয় :···সোনার হালুকা বাঁশ, আগ দুয়ারে থুইলাম হাঁস/হাঁস ফালাইয়া দিলাম লড়, পায়রা পাইলাম বত্রিশ জোড়/পায়রার দাম ডাকসুয়া, বাঘমারারা খায় গুয়া/···বাইন্যা বাড়ী ঘুঘুর বাসা, লবণ বিকায় পয়সা পয়সা।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যারা 'মাগনে' এসেছেন, তাঁরা গৃহস্থের সচ্ছলতার কথা বলছেন, যাতে বেশি করে 'মাগন' মেলে ; সে জন্যে সব ছড়াতেই গৃহস্থের সম্পদের কথা এই বলে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, গৃহস্থ বাড়ীতে বহু রকমের পাখি আছে।

ছড়ায় পাখির সংস্পর্শে যে Motifটি সবচেয়ে বেশি পাই, তা হলো—'বিয়ে'। উদাহরণ এই : আজ ঘুঘুর অধিবাস, কাল ঘুঘুর বিয়ে। আজই চুপীর অধিবাস, কাইল চুপীর বিয়া···। আজ ময়নার খেলাধুলা কাল ময়নার বিয়া···। পুষ্ পুষ্ ময়না ভাত খাবি তো আয় না/কাল দিইছি গয়না/আজো বিয়ে হয় না। মনীর মায় কান্দে গো মনীরে বিয়া দিয়া /···মনীর মা মনীরে লইয়া চাউল ভাজা খায়।/ ঘর-শোভা পক্ষীডা মনীরে লইয়া যায়। টিয়ার বিটির বিয়া / লালশাড়ীখান দিয়া,···। আয়রে আয় টিয়ে আমার খুকুরাণীর বিয়ে।··আজ দুগ্গার অধিবাস কাল দুগ্গার বে। একটি নিলেন গুরু ঠাকুর একটি নিলেন টে/টিয়ের বাপের বে লাল গামছা দে। টিয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে। আমগাছে বুলবুল জামগাছে টিয়া/বড় দাদা বিয়া করে লালশাড়ী দিয়া। আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়/কলা বাদুড়ের বে। আদুড়ের কলা ছড়া বাদুড়ে খায়/তালতলা দে খোকনমনি বিয়ে করতে যায়। কাউয়া কা কা বৈল বিচি খা খা / সুন্দরীরে বিয়া করি ঢাকা চলি যা। খেছুয়া খেছুরুত লাতুরির বিয়া। আপনি যাব গৌড় আনব সোনার ময়ূর দেব ভায়ের বিয়ে ফুলচন্দন দিয়ে। ঝুটকুলি লো নাইয়র সুখী কাপড় কেচে দে / তোর বিয়াতে নাচতে যাব ঢোলক কিনা দে।

এই বিয়ের সঙ্গে কখনো-কখনো 'মৃত্যু'র প্রসঙ্গ আসতে দেখি : ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো চাল পিটুলি খেয়ে/আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে। ঘুঘু ডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চাল ভাজা খেয়ে/ঘুঘুর মরণ দেখতে যাব এয়ো পরে।/শাঁখাটি ভাঙ্গল/ ঘুঘুটি ম'ল। তালতলা তালতলা ফেউ ডাকেছে/দুটো কাত্লা মাছ ভাসি বেড়াছে। [একটা নিলে বাবুন ঠাকুর একটা নিলে টিয়া/টিয়ার বৌটক বেহা দিলে লাল সাড়ী দিয়া। /লাল শাড়ীংনা চিরি' গেল্ /টিয়ার বেটি মরি গেল্। চলচুপী মর্র‍্যা / রইছে খালের পারে বইয়া /আইজ চুপীর উলামেলা কাইল চুপীর বিয়া।

পাখি বিবাহের দূতী হয়ে গেছে : উড় উড়ু পংখী গো, /বড় বড় পংখী গো, /কও গো পংখী দামাদের খবর।

দাক্ষিণ ভারতীয় একটা ছেলে ভুলানো ছড়াতে দেখি, পাখির সংস্পর্শে বিয়ের কথা বলা হয়েছে (Indian Nursery Rhymes : C. H. Rao : Qtly Journal of the Mythic Society of Bangalore, Vol. XVI, No. 1 July 1925, Pg 32-35)।

Call the crow's sister ! /when is the wedding ? /To-morrow, or Sunday morn./All the kite's young ones perished in the stream.

'The oxford dictianary of Nurshery Rhymes' বইতে যে ৫৫০টি ছেলেভুলানো ছড়া (এবং গান) সংকলিত হয়েছে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে, বাঙলা বা ভারতীয় ছড়ার পাখির সংস্পর্শ থাকলে যে Motifগুলো ওপরে আমি লক্ষ্য করেছি, তার সবটাই মেলে না বা বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় না। ইংরেজী ছড়ার প্রধান Motifগুলো, বলা যায়, অন্য রকমের ; সে আলোচনার স্থান এ নয়। তবে, পাখির উপস্থিত কোনো ছড়ায় থাকলে ওপরে উল্লিখিত Motifগুলো একেবারেই যে মেলে না, তাও নয়। যেমন, পাখির সঙ্গে শিশুর অভেদ এবং পাখির সঙ্গে স্বর্ণ বা সম্পদের যোগ :

Go to bed first, /A Golden Purse; /Go to bed second. :/A Golden pheasant ; /Go to bed third, /A Golden bird —P. 69.

বাঙলা ছড়ায় যেমন দেখা যায়,গাছের পাখিকে ডাকা হয় শিশুর সাহচর্যের জন্যে, যেন শিশু ও পাখি দুই নিকট বন্ধু, ইংরেজ মা ও তেমনি বলেন : Catch him, crow ! carry him kite ! /Take him away till the apples are ripe ; ·· P. 138.

পাখির যখন মানসসুলভ নামকরণ ঘটে, তখন পাখি ও শিশুর অভেদ স্পষ্টতর হয় : Two little dicky birds,/Sitting on a wall ;/One named Peter,/ The other named paul=P.147.

বাঙলা ছড়ার মধ্যে পাখি সম্পর্কে আবো একটি প্রসঙ্গ মেলে, যা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের কছু-কিছু আভাস দেখা যায়। . যেমন, 'কুটুম পাখি' ডাকলে বাড়ীতে অতিথি আসে, এই বিশ্বাসের ফলে পাই কুটুম পক্ষী ডাকে লো/মামী কয় ভাগে লো/তরে নিতে আইছ লো। কিংবা : আমগাছে বোলা গো / শুয়া পক্ষী ডাকে গো। / মা-এ বলে ঝিগো / তরে নিতে আইছে গো।···

আবহাওয়া সম্পর্কে ক্রিয়াচারের পরিচয় : আয় বৃষ্টি ঝুড়িয়ে/কাক দেব পুড়িয়ে/ কাকটা মরে ধড়ফড়িয়ে/বৃষ্টি এল চড়চড়িয়ে। অনাবৃষ্টি হলে কি কাক পুড়িয়ে কোনো ক্রিয়াচার দ্বারা বৃষ্টি নামানো হতো ? কাকের সঙ্গে আবহাওয়ার যোগ এবং আগুনের যোগ বহুশঃ লক্ষ্য করা যায়। আর একটিতে : উত্তরেতে মেঘ করেছে/গরু (গরুড়) বেড়ায় উড়ে। এর মধ্যেও কোনো আচার-বিশ্বাসের অভাস আছে বলে মনে হয়।

পাখির মৃত্যু যেন মানুষের মতো, সে মৃত্যুর পর করণীয় পালনীয় আচারের ইঙ্গিত : মামাদের পাখি মল/আমাকে যেতে হল/চিঁড়ে দই খেতে হল। /তুমি নাও ঘি-কলসী/আমি নিই ঝাঝরী হাতে। চলো ভাই রাজপথে/রাজার এক কন্যে আছে/ বিয়ে হবে তার সাথে। স্পষ্টই বুঝি, পাখির শ্রাদ্ধ-সংস্কারের কথা এখনে বলা হচ্ছে। যেন পাখি এখানে কোনো বংশের পূর্বপুরুষ অথবা 'কুলকেতু' (Totem).

এই প্রসঙ্গে এই ছড়াটি লক্ষ্য করবার মতো : খোকন খোকন করে মায়/খোকন গেলো কাদের নায় ? /সাতটা কাকে দাঁড় বায়/ খোকন রে তুই ঘরে আয়। শরৎচন্দ্র মিত্র মশাই তাঁর

একটি প্রবন্ধে (on an aetiological myth about the Indian House-crow : Qtly Journal of the mythic Society of Bangalore : Vol. XVII, No. 2, October 1926, PP. 143.) এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, '...most likely the Indian house-crow was the totem of some forgotten clan of boatmen, ...' সেইজন্যে কাককে দাঁড়ী-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও একটি পঙ্‌ক্তি পেয়েছি : 'কাগা কান্ডারী নৌকার'।

'লোকসাহিত্যে ছড়া' বইটিতে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী নোয়াখালি জেলা থেকে একটি 'বকবন্দীর ছড়া' সংকলিত করেছেন (পৃ. ১২০)। "বকের সারি যখন আকাশে উড়িয়া যায়, তখন নীচের মন্ত্র-ছড়াটি বলিয়া বকের সারিকে গোলাকার মালার মত করিয়া সাতপাক ঘুরান যায় বলিয়া আগেকার মানুষের বিশ্বাস।"

দাড়িয়ে রাঁড়ীর পুত। / কচু পাতায় থইলাম দুত ॥ দুত পড়ে নালে। /দাড়ি বানলাম মালে ॥ /মালা গেল ছিঁড়ুইয়া। /দাড়ি বানলাম ভিঁড়ুইয়া ॥ /সাতপাক ঘুরাইয়া যা/গুরুর দোয়াই মান্যা যা।

ছড়াটির ঐন্দ্রজালিক দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটির উপকরণ-প্রসঙ্গ বলতে এই : বিধবার সন্তান। অর্থাৎ অবৈধ বা জারজ সন্তান, দাড়ি, কচুর পাতা এবং 'সাত' এই সংখ্যাটি। কচুর পাতায় জল লাগে না, এইজন্যে এটিকে এক আশ্চর্য ক্ষমতা-সম্পন্ন পদার্থ বলে মনে করা হয়। অনেক যাদুকরের যাদুদণ্ডটি আসলে গণিকার সন্তান বা কোন জারজ সন্তানের বাঁ পায়ের জানুর দীর্ঘ হাড়। এদিক থেকে 'বিধবার সন্তান' উল্লিখিত তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলক।

প্রায় এই একই ধরণের, মন্ত্রধর্মী একটি ছড়া মোহাম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫); 'ডিয়াল্যা' (<দীর্ঘলিয়া) নামক সারসজাতীয় পাখিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় : ডিয়াল্যারে ভাই। /আগা। কাডম চাগা চাগা,/ ঝরত পরের দাগা দাগা,/হাতকুরি হাউত্যা/পাক ন-খাইলে/তোর গুরুর দোহাই।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব-বিষয়ক ছড়া অনেক দেশেই আছে ॥

··৩···

প্রবাদ আসলে নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক একটি 'মনোভঙ্গি' এবং তার ভিত্তিভূমি হলো সামাজিক ও নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা। একদিনে হঠাৎ করে তাই একটি প্রবাদ রচিত হতে পারে না। স্মৃতি-অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণ দীর্ঘদিন ধরে বা পুরুষানুক্রমে স্তরে-স্তরে সঞ্চিত হতে-হতে, বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বেড়ে-বেড়ে নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক বস্তু-সত্যে পরিণত হলে, তবেই প্রবাদ তৈরি হয়। একজনের ধৃত্য সমাজশরীরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। প্রবাদের আসল ভাণ্ডারী তাই কেউ একজন মাত্র নয়, একটি জনগোষ্ঠী বা বিশেষ একটি ভূখণ্ডের ঐতিহ্যের ছত্রছায়ায় বর্ধিত অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মানুষ!

যে জনগোষ্ঠী একটি বিশিষ্ট প্রবাদের জন্মদাতা বা ধারক, তার প্রাত্যহিক ও সাংস্কৃতিক আচার-বিশ্বাসও সেই বিশেষ প্রবাদটির জন্মমূলে থাকে। পাখি-ঘটিত প্রবাদগুলো এই দৃষ্টিতেই বিচার্য। পাখি সম্পর্কে স্মৃতি-বিশ্বাস-সংস্কার-অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণ-অন্বেষণ কি করে প্রবাদ হয়ে ধরা দিল, সেটাই এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য।

এজন্যে সব প্রবাদের মধ্যেই বিহঙ্গ-চারণার উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাখি যখন নিছকই পাখি থেকে যায় প্রবাদে, নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক জগতে যা সত্য, তা যদি অবিকৃত ও যথার্থরূপেই প্রবাদে প্রতিফলিত হয়, তখন তার মধ্যে খাঁটি পক্ষি-চারণার কিছু নেই। পাখির উল্লেখ আছে এমন প্রবাদে তখনই পক্ষি-চারণার উপকরণ খুঁজব, যখন তার মধ্যে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব-পুরাতত্ত্বের কোনো আভাস থাকবে: তাতে কোনো রহস্যের ছাপ যদি থাকে কিংবা সমধর্মী প্রবাদগুচ্ছের মধ্যে যখন থাকে বিষয়গত সাদৃশ্য, তখন বিহঙ্গ-চারণার বিষয় হবে তা। যেমন, 'শকুনের নজর ভাগাড়ের দিকে' - একথার মধ্যে আলোচ্য কিছুই নেই, : কেননা, সত্যিই প্রাকৃত ও বাস্তব জগতে শকুনকে ভাগাড়েই পড়তে দেখা যায়, অতএব তা বাচ্যের অতিরিক্ত কোনো সংবাদ বহন করে না। কিন্তু 'মাথায় শকুন উড়ছে' বললে, লোকটির মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে হবে, যেহেতু এক দুর্বোধ্য-অস্পষ্ট-রহস্যময় কারণ এর পেছনে কার্যকরী হয়েছে।

প্রবাদের মধ্যে বিহঙ্গ-চারণা এই কদফায় লক্ষ করা যেতে পারে:

১ যেসব প্রবাদে পাখি সম্পর্কে সংস্কার-বিশ্বাস-আচার-মন্ত্র-রহস্য প্রতিফলিত হয়েছে,

২. যেসব প্রবাদে কোনো কাহিনীর সার-নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে,

৩ একই পাখি-বিষয়ক প্রবাদগুচ্ছ বা প্রবাদ-ধারার প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য;

৪. পক্ষি-বিষয়ক প্রবাদে জনগোষ্ঠীর 'মনোভঙ্গি' (Attitude);

৫. প্রবাদের মধ্যে পাখির সঙ্গে সোনা, সম্পদ এবং রাজা রাজত্বের যোগ।

একে-একে বিষয়গুলোর আলোচনা করা যাচ্ছে।

সংস্কার-বিশ্বাস-আচার-মন্ত্র-রহস্য অনেক পাখি-প্রবাদেই দেখা যায়। যেমন, অভিশাপ। বিশ্বাস এই, কোনো মন্ত্র ও আচার দ্বারা শক্তি অর্জন করে কেউ কাউকে 'অভিশাপ' দিয়ে হত্যা করতে পারেন। পাখি সম্পর্কে এই মন্ত্রাচার এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে: কাক মরল ঝড়ে/প্যাঁচা বলে—আমার শাপ লাগল হাড়ে-হাড়ে। ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। শকুনের শাপে কি গোরু মরে। কাগী-বগীভস্ম-করা। কতই বা কবুতর, কতই বা মন্তর। ফিকিরে ধরেছি বগ, পীরকে দেব লাউয়ের ডগ।

রহস্য-মন্ত্র-সংস্কার-বিশ্বাসঘটিত অন্যান্য প্রবাদ: উড়ে যায় পাখি, তার ডানা গুণে রাখি। দুয়ারে বসে পালক গুণি উড়ে যায় পাখি / সাত কায়েতের কান কেটে দিই এমন অকুব রাখি। মানুষ গা বড়ো সহজ নয়/উইড়া যাইতে পৈকের ফের গৈমা কয়। তেমনি রহস্য ধরা পড়ে এই ধরনের প্রবাদে: কাক ওড়ে চিল পড়ে: শঙ্খচিলে বাসা ধরে। পাখি, পাখি, পাখি/সতীনকে নে যায় গঙ্গায় আমি বসে দেখি। ময়না ময়না ময়না/সতীন যেন হয় না।

কোনো কোনো প্রবাদে পৌরাণিক প্রসঙ্গ মেলে: গরুড় মূর্তি/গরুড় শয়ন/ঘণ্টা

গরুড়। টুনটুনির হয় না গরুড়ের পাখা। জটায়ু পক্ষীর রথ গেলা। তেমনি কখনও পাওয়া যায় কোনো কাহিনীর আভাস বা তার সার-নির্যাস: কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে (পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী)। যার নাই খায় টিপটিপানির ঘাও, তার আগত যায়া টিপটিপাও (উত্তর এবং পূর্ববঙ্গে চালিত কাহিনী অবলম্বনে)। কালো হলেন কোকিল পাখি, শেয়াল হলেন চন্দ্রমুখীস্বর্গের বলি রাজা হলেন ব্যাঙ/বামুনের হাতে পুচু করলেন চ্যাঙ। কাকের ডাকে মূর্ছা যায়, রাত্রে নদী পার হয়। কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাঘা/বাঘার শত্রু সিঙ্গি, সিঙ্গির শত্রু শেয়াল/শেয়ালের শত্রু মহাকাল।

একটি গোটা কাহিনীকে এর্প প্রবাদ বা শ্লোকে রূপ দেবার প্রসঙ্গে বাঙলার লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখার কথা স্মরণ করা যেতে পাবে। এগুলোকে বলে 'শেলাকী কিস্সা' অর্থাৎ শ্লোকময় গল্প। ঢাকার বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত "লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ষষ্ঠখণ্ডে পূর্ববঙ্গ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি 'শোলকী কিস্সা' সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পাখিকে নিয়েও দু-একটি 'কেচ্ছা' আছে। যেমন, রঙপুর থেকে সংগৃহীত কোকিল ও কুকুয়া পাখি নিয়ে একটি (পৃ. ৩৬-৩৮), কোড়া পাখিকে নিয়ে একটি (পৃ. ৪৬-৪৭); ফরিদপুর জিলা থেকে কোকিল ও ফিঙেকে নিয়ে একটি (পৃ ৬৬-৬৭)—উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঈশপের গল্পের কথাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। ঈশপের অনেক গল্পই এক-একটি নীতিমূলক প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কাহিনীর শেষে নীতিবাক্যটি এমনভাবে গ্রথিত, যে, গোটা নীতিবাক্যটি কথিত গল্পের সার-নির্যাস। যদিও এই নীতিমূলক প্রবাদ-বাক্যগুলি একান্তভাবেই ঈশপের নিজস্ব নয়, অর্বাচীন, এবং পরবর্তীকালীন যোজন, তথাপি এই ভঙ্গিটি লক্ষ করবার মতো।

প্রবাদের মধ্যে বিহঙ্গচারণার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, একই পাখিকে নিয়ে রচিত একটি প্রবাদ-গুচ্ছ বা প্রবাদ-ধারায় বিষয় বা প্রসঙ্গগত বা উপকরণগত সাদৃশ্য। ওই প্রবাদ-গুচ্ছের সাদৃশ্যমূলক উপকরণগুলোকেই এর Motif বলা যেতে পারে। যেমন, কাক সম্পর্কে এক গুচ্ছ প্রবাদ এই:

কাউয়া কি চিনে? না, ধাউয়া কাঁঠাল। কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত। কাক মনে করে আমি বড়ো সেয়ানা। কাকের মুখে সিঁদুরে আম। ধার কাউয়ার মুখ স্যাঁন্দরা আম। বাঘ রাজার কাক মন্ত্রী। কাক খেলে কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা। আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল। আম পড়বে বাতাসে, কাউয়া রইস প্রত্যাশে। আশা করেছেন কাও পাকলে খাবেন ডাও। একি কাগী বগী ভস্ম করা। একি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসী মালা। কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা। কথা বলব কি জিব নেড়ে, জিব নিল কাকে কেড়ে। কাক নিয়ে গেল কান, কাকের পেছনে ধাবমান। কপালে থাকলে গু, কাকেও এনে দেয়। কাকে নতুন গু খাওয়া শিখেছে। কাক হয়ে কোকিলের মতো ডাকতে করে আশা। কাকে করে বাসা, কোকিল করে বাস। কাকের বাসায় কোকিলের ছা। কাকের মুখে কি কোকিলের রা। কাকের ছা, বকের ছা। কাকের শত্রু ফিঙে। কাগা বগা করে খাওয়া। কাক কাকুড় জ্ঞান। কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার। কায়েত মরে জলে ভাসে/কাক বলে

ফিকিরে আসে। কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না। গাছে বসে কাক হাগে, বলে—দেখে নি। ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ঝড়ো কাক। ঠোঁটকাটা কাক। তীর্থের কাক। দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ। ধান খায় কাকে ব্যাঙের পায়ে দাঁড়ি। নবান্নের কাক। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি। পাকা আম দেখলেই কাক ঠোকরায়। বামুন, গণক, কাউয়া, তিন পরের খাউয়া। বেল পাকলে কাকের কি? মরা কাকের আবার চড়কের ভয়? মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখির মধ্যে কাওয়া। রাজার মা, বিইয়েছেন যে কাকের ছা। শাওন মাসের ঝড়ে, বাসার কাকও নড়ে। কাত্‌তানী ঝড়ে কাগা-বাগা মরে। শহুরে কাক, বড়ো চালাক। সাতবার করে সিনান, কাক নয় বকের সমান। কাকস্নান। সোনার দাঁড়ে কাক বসানো।

কাককে অবলম্বন করে উল্লিখিত এই প্রবাদগুলো লক্ষ করলে কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে: ১. কাকের সঙ্গে নানান ফলের যোগ ২. কাকের ধূর্ততা, সে জন্যে সে মন্ত্রী ৩. কাক ও কায়স্থ ৪. কাক ও অন্যান্য পাখি ৫. কাক ও বৈষ্ণবতা ৬. কাক ও জিভ, কান, ঠোঁট ইত্যাদি অঙ্গ ৭. কাক ও বিষ্ঠা ৮. কাক ও মৃত্যু এবং মৃতদেহ ৯. ভাত, কাসুন্দী ও কাক ১০. কাক ও আগুন, জল (ঝড়, স্নান)। এইগুলোকেই কাকসম্পর্কীয় প্রবাদের সাধারণ Motif বলি।

এবারে 'ঘুঘু': ভিটেয় ঘুঘু চরানো/নাচানো। অযোধ্যার রঘু, বাঁশবনের ঘুঘু। আগুনের ফুলকি/যার চালে পড়বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। আমার নাম রণরঘু, ভিটেয় চরে ঘুঘু। কিবা বাবুর আশা, শিয়রে ঘুঘুর বাসা। বাস্তুঘুঘু। জেলঘুঘু (Jail bird). দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরে। বাবেবারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। যার পরে যার খায়, তারি ভিটেয় ঘুঘু চরায়। সেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ: ১. ভিটে, বাস্তু ২. 'রঘু' এই নাম (?) ৩. বাঁশবন ৪. আগুন ৫. ফাঁদ।

পেঁচা: এক গাঁজার তিন ধর্ম, তোতা পেঁচা কুম্ভকর্ণ। কাক মরল ঝড়ে,/পেঁচা বলে আমার শাপ লাগল হাড়ে হাড়ে। পেচক নিন্দে কাকের বোল। কোকিলের রব শুনে পেঁচার হল হাসি। চুলের শত্রু কাক, পেঁচার শত্রু কাক। কালো পেঁচা রাজা হবে লোকে মরে হেসে। কোকিলের ধ্বনি শুনে পেঁচা ডেকে মরে। লক্ষ্মীর বাহন কালো পেঁচা। সাজ করতে পেঁচা রাজা। সেজেগুজে পেঁচা রাজা।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ: ১. পেঁচা ও অন্যান্য পাখি: তোতা, কাক, কোকিল, ২. কাকের সঙ্গে শত্রুতা ৩. রাজা, লক্ষ্মী (ধনসম্পদ)।

শকুন: গো-ভাগাড়েই শকুন পড়ে। ঘরের ভাত দিকে শকুনি পোষে/গোয়ালের গরু ঢেঁকে বসে। বাড়ীর দক্ষিণে শকুনের বাসা ছাড় ভাই সে গাঁয়ের আশা। ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে। মড়ুকের শকুনি। মাথার ওপর শকুনি ওড়া। যেখানে মড়া, সেখানে শকুনি। শকুনের শাপে কি গোরু মরে। শকুনের দৃষ্টি ভাগ্য দিকে।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ : ১. ভাগাড় ২. গোরু ৩. মড়া, মড়ক, যমের দ্বার (দক্ষিণ দিক)।

বক : কাক খেল কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা। কাকের ছা, বকের ছা। কানা বক শুকনো গেড়ে/খায় না খায় আছে পড়ে। ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ফিকিরে ধরেছি বগ, পীরকে দেব লাউয়ের ডগ। বক কি কখনো ময়না হয়, জলের দিকে চেয়ে রয়। বকব্রতী। বকবৃত্তি। বকধার্মিক। বকধ্যান। বকবিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী। বড়বিলের বক। বিল শুকুলে বকের আমোদ। বুড়ো হলে বক চেনে না। কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং। রাজহাঁসের পা দেখে বকের নেঙা-পেঙা/তোব পা যেমন তেমন আমার পা ঢেঙা। সব শেষালে কাঁঠাল খেলে বকেব মুখে আঠা। হাতী পড়েছে দ'কে, ঠোকর মাবে বকে। কাগীবগী ভস্ম। কাগা বগা কবে কাজ করা। ঠকের মুখে বকেব গু। রাজসভা দেখলে পরে কোঁচা বাগলো চরে···। কৃষ্ণকথা কয় না বকে। হংসমধ্যে বক যথা। সাতবার ক'রে সিনান, কাক নয় বকের সমান।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ : ১. কাক ও বক সহচর শব্দ, অপরিহার্য রূপে একত্র ব্যবহৃত ২. ধর্মের প্রসঙ্গ ৩. পীর, ফকির ও মন্ত্রাচাব ৪. বিল, ডোবা ৫. বকের পা, মুখ ৬. রাজা ও রাজত্ব ৭. আগুন

শালিক : বউয়েব গলার স্বব কেমন—শালিক কেঁকায় যেমন। বুড়োর মাথায় শালিক নাচে। বুড়ো শালিককে রামনাম শেখানো। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। বুড়ো শালিক পোষ মানে না। শুক মলো মুখের দোষে, শালিক মলো সেই তরাসে। শালিখের মধ্যস্থ।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ : ১. বুড়ো ২. ঘাড়, কণ্ঠস্বর ৩. শালিকের মৃত্যু, যেহেতু সে বুড়ো।

চড়ুই এক পয়সার চড়ুই পাখি, চণ্ডীমণ্ডপে বাসা। চড়ুইয়ের পেটে জন্মাবে নর, দেবতা হবে বনের বানর। চার কড়ার চড়ুই চণ্ডীমণ্ডপে বাস। পাখমারের ঘরে চড়ুয়ের বাসা। হাড়গিলেও হাঁ করেছে চড়ুয়ের দেখ চোট। খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুয়ের নাচ। চটক পাখিতে কিবা পর্বত নেয় তুলি। চটকস্য মাংসং ভাগশতম্।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ : ১. চড়ুয়ের বাসা ২. চড়ুইয়ের নাচ।

ফিঙে : কাকের পিছে ফিঙে লাগা। কোথায় কপচায় রাম রাজা, কোথায় কপচায় ফিঙে। /সোনা বাঁধা নৌকা ফেলে কেবল তালের ডিঙে, সাজতে গুঁজতে ফিঙে রাজা। ঘর পোড়ে ফিঙে ধোঁয়া খায়।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ : ১. রাজা, সোনা ২. আগুন ৩. কাক।

ছাতারে : চন্দ্রসূর্য অস্ত গেল জোনাকি জ্বালে বাতি/ময়ূর গেল ছাতার এল—ফুলিয়ে বুকের ছাতি। ছাতার বলে গাঁ আমার। ছাতারের কেত্তন/নৃত্য। ছাতার পাখি নৃত্য করে, ডুমুর গাছে বসে/কালো পেঁচা রাজা হবে, লোকে মরে হেসে। ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ূর পাখি হাসে। ময়ূরের নৃত্য দেখি, ল্যাজ নাড়া দেয় ছাতারে পাখি।

সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গ : ১. নৃত্য-গীত ২. ময়ূরের প্রসঙ্গ ৩. হাঁতাবের বুক, ল্যাজ।

প্রবাদ-গুচ্ছ বা প্রবাদ ধারা অবলম্বন করে কিভাবে সাদৃশ্যমূলক প্রসঙ্গগুলো ধরা যায়, ওপরে তাই দেখানো হলো। এই একই পদ্ধতিতে এক-এক পাখি সম্পর্কে এক-একটি জনগোষ্ঠীর 'মনোভঙ্গি, (Attitude) কী তাও বোঝা যায়। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

কোকিল স্বার্থপর, ফাঁকিবাজ পাখি; তথাপি এ পাখি কেবল সুকণ্ঠ বলেই মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে। কোকিলের সঙ্গে বসন্ত এবং আমগাছের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সহচব শব্দরূপে কাকের উল্লেখ সর্বাধিক। কোকিলেব সঙ্গে যেসব পাখির উপমা দেওয়া হয়েছে যেমন, কাক, পেঁচা, বক, শকুন) তাদের সবাইকে কোকিলের চেয়ে হীন প্রতিপন্ন কবা হযেছে।

ঘুঘু সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রকাশিত হয় নি। এর সংগে নির্জনতা ও নিঃসংগতার কথা জড়ানো হয়েছে। অথচ, পাশ্চাত্যে ঘুঘু শান্ত, নম্রভঙ্গির প্রতিক বলে গণিত। পায়রা-'কবুতর' সুখ-শান্তির প্রতীক হলেও বাঙলা প্রবাদে শ্রদ্ধা পায় নি। স্বার্থপরতা বাবুয়ানা ও অহংকাবেব আভাস এতে লেগেছে। শংখচিলকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে বিয়ের আসংগ এ পাখিব সংগে জড়ানো। কাবকে নিয়ে সম্ভবতঃ পাখিদেব মধ্যে সব-চেয়ে বেশি পরিমাণে প্রবাদ রচিত হয়েছে। কোথাও কাকের প্রতি প্রীতি প্রকাশিত হয় নি। তেমনি অবহেলিত বক। ময়ূব ছাড়া অধিকাংশ পাখি সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক ও বিরূপ মনোভাব মেলে।

অনেক পাখিব সংগেই সোনা, সম্পদ ও রাজত্বেব যোগ লক্ষ্য কবা যায়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলোতে তার প্রমাণ আছে ॥

৪

ধাঁধার মধ্যে বিহংগচারণা সংক্ষিপ্তবরূপে সংলক্ষ্য। ধাঁধা রচনার মূল প্রেরণা আদিম লোকসমাজে 'প্রতীকতা' বোধ এবং Animism ও Animatism-এর প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকে সঞ্জাত। জড়বস্তুব মধ্যে প্রাণচেতনা আরোপ এবং সেই প্রাণময়তাকে জড়বস্তুর সংগে বিচ্ছেদ্য কখনো বা অবিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষ করা; সে প্রাণসত্তাকে কখনো রহস্যময়, কখনো শুভংকর কখনো ভয়ংকর রূপে দেখা; জড়বস্তুর মধ্যে যে প্রাণ আরোপিত হলো, তাকে বিচ্ছেদ্য রূপে দেখে, সেই প্রাণের 'বস্তুপ্রতীকতা' যখন লোকমানস স্বীকার করে নিল, মনে হয়, তারই পববর্তী স্তরে ধাঁধার জন্ম হলো।

ধাঁধা কখনোই ভাববাচক নয়, সর্বদাই বস্তুবাচক। বস্তুবাচক বলেই ইন্দ্রিয়-গোচর। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আছে চোখ আর কান, চোখই বেশি। কোনো একটি দৃশ্য ঘটনা বা বস্তুর 'প্রতীক' বা ইঙ্গিত বা সংকেত রূপে অন্য একটি বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে চোখই। ধাঁধা মানেই হলো একটি দৃশ্য-ঘটনা-বস্তুকে সরাসরি উল্লেখ না করে

ঘুরিয়ে, পরোক্ষভাবে বলা। এই পরোক্ষরূপে বিবৃতির সময়েই তাতে উল্লিখিতব্য দৃশ্য-ঘটনা-বস্তুর প্রতিনিধি বা প্রতীকরূপ বা ইঙ্গিত-সংকেতরূপে অন্য একটি বস্তু গৃহীত হয়। একের বিকল্পে অন্য এসে পড়ে। 'প্রতীকতাবোধ' সব লোকসমাজেই অল্পবিস্তর লক্ষ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে 'Fetishism'-এর কথা বলা যেতে পারে। অচেতন পদার্থের প্রতি পূজা ও ভক্তি নিবেদন লোকমানসের আর একটি বিশিষ্ট প্রবণতা। আমার মনে হয়, ধাঁধার উদ্ভবমূলে এই Fetishism-ও প্রভাব ফেলেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক জগতের বিভিন্ন দিক এবং ঘর-গৃহস্থালীর জড় বস্তুই ধাঁধাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। এইসব অচেতন পদার্থের প্রতি ভক্তি আরোপ, তার মধ্যে চেতনা আরোপ, এবং সংকেত-প্রতীকতা আরোপের ফলেই ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

ধাঁধার অন্যান্য দিক বর্তমানে আমার আলোচ্য নয়, কেবল পাখির ভূমিকা ছাড়া। ধাঁধায় পাখিকে পাওয়া যায় দু'ভাবে . ধাঁধার প্রশ্নের ভাষায় এবং উত্তরের ভঙ্গিতে। দুটি দিকই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তবে মনে হয়, প্রশ্নের মধ্যেই গুরুত্ব ধরা পড়েছে বেশি। যে কোনো অচেতন (এবং সচেতন বস্তু (এবং প্রাণী)-কেই পাখিরূপে নির্দেশ করবার প্রবণতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। ছড়ায় এবং গানে ও কথায় পাখিকে Symbol বা 'প্রতীক' রূপে গ্রহণ করতে আমরা দেখেছি। সেই একই প্রতীক-প্রবণতা ধাঁধাতেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল বটে, উপরন্তু ধাঁধাতে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পাখির প্রাধান্য কেবল প্রতীকতা বোধ থেকেই সঞ্জাত নয়, যেন বাড়তি আরো কিছু। পাখি সম্পর্কে লোকমানসের যতো সংস্কার-বিশ্বাস চলিত আছে, তা এখানে পূর্ণরূপে প্রভাব ফেলেছে। যেমন, পাখিকে গাছ বা মাছ বলা, দিন-রাত-চন্দ্র-সূর্য ঋতু-আবহাওয়ার সঙ্গে পাখিকে জড়ানো, অথবা, পাখিকে জল, আগুন, ধনসম্পদ ও রাজরাজড়ার সঙ্গে অভিন্ন করে তোলা—পাখি সম্পর্কে যাবতীয় সংস্কার ও প্রতীকতা-বোধই ধাঁধায় পাওয়া যাবে।

আজকের ধাঁধা প্রতিযোগিতাও পরীক্ষামূলক হয়ে গেছে। তাতে আছে একটি challenging mood এবং ধাঁধা জিজ্ঞাসাকারীর একটি Superiority complex. কিন্তু আদিম ধাঁধা তা ছিল বলে মনে হয় না, কিংবা পরীক্ষামূলকতার প্রয়োগ ও প্রয়োজনের উৎস ও উদ্দেশ্য ছিল অন্যত্র। একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-প্রতীকতাগুলো উত্তরকালে সেই সমাজের শিশু-বালক-তরুণ ও অনভিজ্ঞরা, এমনকি স্বয়ং অভিজ্ঞ বৃদ্ধরাও, যাতে হারিয়ে ফেলতে বা ভুলে যেতে না পারে, সেই জন্যেই যেন এক বিশেষ পদ্ধতিতে,—ধাঁধার আকারে, তা স্মরণে রাখবার আয়োজন করা। এইজন্য এখনও বয়স্ক মানুষের ধাঁধা চর্চার স্থান হলো কোনো প্রকাশ্য সভাস্থলে (যেমন বিবাহের আসর বা চণ্ডীমণ্ডপের সান্ধ্য আসর, কিংবা কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র। একদা যে সভা করেই, সমবেতভাবে, একটি গোষ্ঠী ধাঁধার মাধ্যমে তাদের সংস্কার-বিশ্বাসগুলো বিস্মরণের গর্ভ থেকে সংরক্ষণ ও সংশোধন করে নিত, প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যে বয়োকনিষ্ঠদের এইভাবে গোষ্ঠীর সংস্কৃতি জানিয়ে যেত, সভাস্থল তারই ইঙ্গিত। সেই বিস্মৃতির গর্ভ থেকে নিজস্ব আচার-বিশ্বাসকে চিরকাল সংরক্ষণ করবার মানস থেকেই আনুষ্ঠানিকতার আবশ্যিকতা কালে-কালে

তাতে আরোপিত হয়ে যায়। বলা যায়, এই প্রবণতা প্রবলতর হয়েছিল দুটি কারণে : এক, বৃহত্তর ও শক্তিশালী কোনো জনগোষ্ঠীর গ্রাস থেকে ক্ষুদ্রতর ও দুর্বল এক জন-গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে স্বল্প ও সাংকেতিক ভাষায় ধাঁধা রচনা ; দুই, আদিম মানুষ সভ্যতার স্পর্শ পেয়ে আপন সংস্কার-সংস্কৃতিকে যখন ভোলবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সংকেত-প্রতীকের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ।

এইভাবে ধাঁধার উদ্ভবকে দেখলে ধাঁধার challenging mood-কেও নতুনভাবে বিচার করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি তার নিজের গোষ্ঠীর চিরাচরিত, প্রথাগত সংস্কার-বিশ্বাস-ঘটিত হেঁয়ালির সমাধান করতে পারত না, স্বভাবতঃই তাকে সমাজের চোখে হীন হয়ে থাকতে হতো। এইরূপেই ধাঁধাতে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তার উত্তর বলতে না পারলে, তাকে বা তার পিতৃপুরুষকে পর্যন্ত অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সমাজস্থ সকলেই আপন গোষ্ঠীর ইতিহাস-বিশ্বাস জানবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত নিয়ম, তার ব্যতিক্রম ঘটলেই তাকে নির্মম তিরস্কার সহ্য করতে হতো।

এইজন্যেই ধাঁধার জিজ্ঞাসার মধ্যে উত্তরের পর্যাপ্ত উপাদান থাকে না। আসলে ধাঁধাতে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর তৈরি করা নয়, উত্তরটি প্রত্যাশিত ও পরিচিত জেনেই যথাসম্ভব স্বল্প ও সংকেতময় ভাষায় প্রশ্ন করা হয়। একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরের কেউ সহসা একটি ধাঁধার সম্মুখীন হয়ে আপন সামর্থ্যে সে সমস্যার গ্রন্থিমোচনে সক্ষম হবেন না। অর্থাৎ আগেই বলেছি, লোকসমাজে প্রশ্নটাই বড়ো ছিল না, উত্তরটাই ছিল প্রধান ও মুখ্য। স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত আকারে, তুচ্ছ ইঙ্গিতে যে প্রশ্নটি করা হলো, সমাজস্থ ব্যক্তিকে পূর্বেই শিখিয়ে দেওয়া উত্তরটি সে স্মরণ করতে পারছে কি না সেটাই বিবেচ্য ছিল বলে মনে হয়। এবং তা না পারলেই তাকে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হতো।

একই কারণেই আবার ধাঁধার উত্তরগুলোও হয় প্রথাগত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। যা ধাঁধার যে উত্তর একটি গোষ্ঠীর মধ্যে চলিত, খুব Rigid ভাবে তা অনুসৃত হয়ে থাকে, অনমনীয়রূপে তা গৃহীত হয়ে আসে। নির্দিষ্ট উত্তরের বাইরে অপর উত্তর তাই স্বীকৃত হয় না ; তেমনি গোষ্ঠীর ভেদেও সঙ্গে উত্তরেরও ভেদ এসে যায়।

ধাঁধার প্রশ্নের ভাষায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি, নির্বিশেষভাবে পাখির উল্লেখ করা হয় ; সবিশেষ পাখির নাম খুব বেশি নেই।

ধাঁধার প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে পাখিকে এই ক'ভাগে দেখা যায় :

১. পাখি ও গাছ (এবং/অথবা ফুল, ফল)-এর অভেদ ;
২. পাখি ও মাছ (এবং সেই আসঙ্গে জল, নৌকা)-এর অভেদ ;
৩. পাখি ও গ্রহ-নক্ষত্র-ঋতু-আবহাওয়ার অভেদ ;
৪. পাখি ও আগুনের (জলের বিপরীতে) অভেদ ;
৫. পাখি ও ধন-সম্পদ, সোনাদানা, রাজরাজড়ার অভেদ ;
৬. পাখি ও মানবদেহের অভেদ।

এই তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে, পাখির সঙ্গে সব বিষয়গুলির ঐক্য ও অভিন্নত্ব লক্ষ করবার জন্যেই পাখি ওই সব বিষয়ের 'প্রতীক' হয়ে উঠেছে।

গাছ এবং তারই ফলে ফুল ও ফলের সঙ্গে পাখির অভেদ কল্পনা [illegible] সর্বা-

ধিক এবং প্রকারে সবচেয়ে বেশি বিচিত্র। গাছের সঙ্গে পাখির সহজ ও স্বাভাবিক যোগের ফলেই এটি ঘটেছে,—সহজ বুদ্ধিতেই তা বুঝি। কিন্তু জিনিসটির মধ্যে আর একটু ব্যাপার আছে। গাছের উচ্চশাখা, ভূমি থেকে যেমন দূরবর্তী, তেমনি সেই উচ্চতার সঙ্গে আকাশের সম্পর্কও নিকটতর। পাখি ছাড়া আর কোনো প্রাণীই আকাশে উড়তে পারে না, সেই অর্থে আকাশ একমাত্র পাখিরই দখলে। আকাশের সঙ্গে গাছের উচ্চশাখা, উচ্চতার সূত্রেই, একাত্ম। পাখির সঙ্গে গাছের অভেদের অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে প্রদত্ত ধাঁধাগুলোর মধ্যেই মিলবে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' শুক পাখির ধাঁধা জিজ্ঞাসার কথা সকলেই আমরা জানি। শুক নিজে পাখি হয়ে পাখি-বিষয়ক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছে :

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। /গাছ পল্লব নয় কিন্তু রঙ্গে পত্র হয়।। / পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে। /মূর্খেতে বুঝিতে পারে বৎসর চল্লিশে :—
উত্তর : পাখি।

শুকের আর একটি ধাঁধা : বৃক্ষ অগ্রে বৈসে সেই নহে পক্ষ জানি। / ত্রিলোচন জটার ভার নহে পশুপতি।। নদনদী ধায় তার অঙ্গময় কায়। / রক্তমাংসে জড়িত নয় নারি বলয়।।—উত্তর : নারিকেল।

লক্ষ্য করবার বিষয়- ধাঁধা দুটির একটির উত্তর পাখি,—অপরটির প্রশ্নে পাখি। কিন্তু দুয়োর মধ্যে সাদৃশ্যের দিক হলো পাখি ও গাছ-ফলকে এক করে দেখা।

আর একটি ধাঁধা লক্ষ করা যাক : বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। দ্বিতীয় অংশটির কথান্তর মেলে . লালটুপী মাথায় দিয়ে ; লাল গামছা মাথায় দিয়ে। প্রথম অংশের কথান্তর : আড়ত হিনি বারাল টিয়া। বাংলা দেশের হেন অঞ্চল নেই, যেখানে এটি প্রচলিত নেই। শেষে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় গিয়ে এটি ঠাঁই পেয়েছে। ধাঁধাটির একাধিক উত্তর বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত আছে : আনারস, থোড়, মোচা, পেঁয়াজ ইত্যাদি। সব ক'টিই ফল, এবং পাখির সঙ্গে একাত্ম। কোনো প্রবীণ গবেষক টিয়ের সঙ্গে আনারসের বাস্তব ও হুবহু সাদৃশ্য না পেয়ে এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করেছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন, যেখানে একটি বস্তু অপর একটির প্রতীক, সেখানে বাস্তব জগতের সাদৃশ্যবোধ পুরোপুরি কাজ করে না। দ্বিতীয়তঃ, ধাঁধাটির উত্তরের মধ্যে 'আনারস' এই পোর্তুগীজ শব্দের আগমন নিতান্তই অর্বাচীনকালের ব্যাপার ; তথাপি 'আনারস' ফল, এটি লক্ষ করবার। টিয়ের টোপর, বা লাল গামছা আসলে একটি বিবাহের ইঙ্গিত দিচ্ছে ; তা ছাড়া, বাঙলা ছড়ার এক অপরিহার্য নিয়মে টিয়ে বা টিয়ার সঙ্গে বিয়ে বা 'বিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। আসলে এটি একটি বিয়ে, বিয়ের ফল গর্ভধারণ ও পরে ফল প্রসব। সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, আনারস, কলার থোড় ও মোচা এবং পেঁয়াজ—সব ক'টি ফলই আক্ষরিক অর্থে উদ্ভিদটিকে ভেদ করে তবে বেরিয়ে আসে, যেন সত্যই 'প্রসূত' হয়। ধাঁধাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটিও ইঙ্গিতবাহী : বন বা আড়া বা জঙ্গল অর্থাৎ একটি গুহ্য-গোপন প্রদেশ থেকে আকস্মিকভাবে একটি টিয়ের আবির্ভাব, সঙ্গত কারণেই মনে হয়—পুংজননেন্দ্রিয়ের আবির্ভাব, যা এই গর্ভসঞ্চারের কারণ। মানবদেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে পাখির অভেদ কল্পনা করে রচিত ধাঁধার কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে।

পাখির সঙ্গে প্রজনন ও বৃক্ষের এই যৌন-সম্বন্ধ অন্য একভাবেও প্রতিষ্ঠিত করা

যায়। কচ্ছপের ডিম অর্থে 'গঙ্গাফল' শব্দের ব্যবহার করেছেন ভারতচন্দ্র। উত্তরবঙ্গে এখন পর্যন্ত হাঁসের ডিম বলতে 'হাঁসের ফল' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডিম সম্পর্কে একটি ধাঁধা : গাছের ফলটি গাছে রইল, বোঁটাটি খসে গেল। দেখা যায়, পাখি যেন গাছ, ডিম যেন তার ফল, এবং সে ডিম প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত। 'গঙ্গাফল' শব্দের মধ্যেও নদীকে গাছ বলা হয়েছে ; নদী ও পাখির অভিন্নত্ব কল্পনা করে রচিত ধাঁধার কথা একটু পরেই বলছি।

ওপরে উল্লিখিত ধাঁধাটির প্রশ্নের মধ্যে পাখি এবং উত্তরের মধ্যে গাছ-ফল ছিল। এই ভঙ্গিতে রচিত অন্য ক'টি ধাঁধা এই : রাজার বেটা মদন হাঁস, খায় খোলা ফেলায় শাঁস (উত্তর : চালতে) অড়লের মধ্যে খড়লের বাসা। ডিম পাড়লো খাসা খাসা,/আ ধর্ম, তুমি সাক্ষী/ডিম পাড়লো কোন্ পক্ষী (উত্তর : আইরি ফল)। উপরে মাটি তলে মাটি/তার তলায় বাবুই বাটি (উত্তর : মেটে আলু)। কাঁচায় কাঁচ পাখিতে খায়, পাকায় গড়াগড়ি যায় (উত্তর : ডুমুর)। এক লই টানতে আর এক লই আসে,/হাঁসের বজরা পানিত ভাসে (উত্তর : তালের রস)। ঠাকমা দিদির কোলে, হলদে পাখি দোলে (উত্তর : লেবু)। চার পায়রার চার রঙ, খোপে গেলে একই রঙ (উত্তর : পান)। লাল মোরগ হাটে যায়, চক্কে ঠোকরায় (উত্তর : পেঁয়াজ)। বনের থেকে বেরোলো হাঁস, হাঁস বলে আমার শুধু মাস (উত্তর : বনছাতু, কোঁড়ক)। বনূলে বাইরাল হাঁস, হাঁস বলে আমার শুধায় মাস (উত্তর : ব্যাঙের ছাতা)। এতটুকু গাছটি ফল বিস্তর ধরে/তোতা পাখি খেয়ে গেল / প্রাণ ধুক ধুক করে (উত্তর : লংকা)। আকাশে থুনু সাক্ষী, পাতালে থুনু সাক্ষী / এক্ষে ডুবে তুলনু টিঙ্গালি-কাটা পাখি (উত্তর : শালুক)। রিং রিং রিং পাটকিলে ভাঙে না শরালের ডিম (উত্তর : সরিষা)। মামাগো পুকুরে মোর পাখিটা ঘোরে / কাঁচা কাঁচা ডিম পাড়লে সর্ব পূজায় লাগে (উত্তর : সুপারি)।

বস্তার জিলার মুরিয়াদের মধ্যে চলিত ধাঁধায় : on the bush are many yellow birds (solution : chili). প্রশ্নে গাছ, উত্তরে পাখি : From the tree-top falls a green leaf (solution : A parrot comes down to feed). পালামৌ জিলা থেকে : I live on a tree/But am not a bird/Three eyes have I/But I am Shankar (solution / Cocoanut). মধ্যপ্রদেশের গোঁড় মধ্যে চলিত ধাঁধায় : on the side of a hill is a hen which goes round and round/She has one leg and two wings (solution: A creeper climbing up a tree). ছোটোনাগপুরের খাড়িয়াদের ধাঁধা : The tree with the birds' nests (solution : *Mahua* flowers). সাঁওতালদের ধাঁধায় : A boys says in the morning : come, father, and gather up the crane's eggs (solution : Gathering *mahua* flowers)···মুসলমানের মধ্যে চলিত ধাঁধায় on a green branch/Sat a green pigeon./And itsn eck was black/ Scholars and gardeners/Alone can solve it (solution : Jamun).

তেমনি প্রশ্নের মধ্যে পাখি ও গাছ আছে, কিন্তু উত্তরের মধ্যে অন্য বস্তু বা প্রাণী

—এক্ষেত্রে উত্তরের বস্তুটির প্রতীক হলো পাখি : ছোটো ছোটো পাখি জলি ধান খায় / ল্যাজ তুলে পাড়া দিলে আশমানে ধায় (উত্তর : ঢেঁকি)। একটুখানি পক্ষীটে বালির মতন চক্ষু/বড়ো বড়ো বৃক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে যায় (উত্তর : উইপোকা)। কালো কচুবনে, কালো হাঁস চরে (উত্তর : উকুন)। বন থেকে বেরুল হাঁস, হাঁসের পিঠে থলথলে মাস (উত্তর : জোঁক)। অর্জুন গাছে বসল পেঁচা, হাড় নাইকো মাসের লেচা (উত্তর : জোঁক)। অতটুকু পাখি, সরষে পারা আঁখি (উত্তর : মশা)। এক টিয়রগ্যা মাধব ভাই, গাছত্ উঠি দমা বাই (উত্তব : কুড়ুল । একটি পাখি ঘাস মলমল খায়, ঘাটারি মুড়ি দিনে ঘরকে যায় (উত্তর : কোটা)। উপব থেকে আসছে টিয়ে টিটি করে/ মরা পাখিতে ধান খায় গরগর করে (উত্তর : ঢেঁকি) ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরী ভাষায় পাওয়া একটি ধাঁধায় : ধান ক্ষেতের তক্‌বুলু মসায় হাজাব বুলাম্ সাবানি তং (উত্তর : ঝাঁঝরি)। (অর্থাৎ : ধান ক্ষেতে বুলবুলি নাচে, হাজাব ছিদ্র কার আছে ?)।

একটি ওরাওঁ ধাঁধায় : In a tree on an ant hill is the nest of a *bulbul* (Solution : Hukka)। বস্তার জিলার মুরিয়াদেব ধাঁধা : on burnt tree the vultures sit (Solution : People round liquor)। ছোটোনাগপুরের 'অসুর'দের ধাঁধা : - A crow pecks at a ripe plantain (Solution : A bar smiting a piece of red hot iron. মুণ্ডাদেব ধাঁধা : A heron sits on a dry tree Sulution : An axe) : ওরাওঁদের ধাঁধা : A Parrot plays on the dry stump of tree (Solution : An axe). রাজপুত কায়স্থদের ধাঁধা : A bird has come/And eaten all the paddy/It has cleaned itself on a ridge / It has hidden itself in a nest (Solution : A razor). সাঁওতালদের ধাঁধায় : A little bird flies about in the thicket of slim bamboos (Solution : A lice).

এই উদাহরণগুলোতে দেখা যাবে, প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে গাছ-ফল ও পাখি কিন্তু তার উত্তর অন্য কোনো বস্তু বা প্রাণী। এবার যে উদাহরণগুলো দেব, তাতে দেখব, প্রশ্নের মধ্যে গাছ কিংবা ফল, কিন্তু তার উত্তরে আছে পাখি : হায় তরমুজ করবো কি, বোঁটা নাই তো ধরব কি (উত্তর : ডিম। ডিমকে পাখির অন্তর্গত করে নিলাম, যেহেতু পাখি অণ্ডজ প্রাণী)। ফল আছে তার বোঁটা নাই (উত্তর : ডিম)। ঝুপি মাপি গাছ, এটে ওঠে আঁচ/কোন পক্ষীর রাঙা গাল হয়ে যায় মাছ (উত্তর : মাছরাঙা পাখি ।

পাখি ও গাছের অভেদ সম্পর্কে ওপরে আমরা মোট তিন ধরনের ধাঁধা উপস্থিত করলাম : ক. প্রশ্নের মধ্যে পাখি, উত্তরের মধ্যে গাছ ; খ. প্রশ্নের মধ্যে গাছ ও পাখি, উত্তরের মধ্যে কোনো বস্তু বা প্রাণী ; গ. প্রশ্নের মধ্যে গাছ, উত্তরের মধ্যে পাখি।

পাখির সঙ্গে মাছের অভেদ ও একাত্মতা কিছু-কিছু ধাঁধায় দেখা যায়। মাছ জলজ প্রাণী, অতএব সেই সূত্রে পাখির সঙ্গে জলের আসঙ্গ লক্ষ করা যায়, কিংবা জলের সংস্পর্শেই মাছের কথা এসে যেতে পারে ; এবং সেই জলের আসঙ্গেই নৌকার প্রসঙ্গ এসে গেছে।

মাছের মধ্যে মাছ ধরবার জাল : উড়ি যাইতে পক্ষী পাড়ি পাক খায়/আপনে আপার আনি পরেরে যোগাএ (উত্তর : 'ঝাঞ্চ' নামক জাল) এক খণ্ড দুই দন্ত/ডিমা প ড়ে অনন্ত/বিলত্ চরে পক্ষী/ও ধর্ম তুই সাক্ষী (উত্তর : চিংড়িমাছ)। আঁখির মধ্যে পাখির বাসা/জল উঠিছে খালে/চার পাইয়ের উপর নেপাইয়া নাচে/দো াইয়া নিল ডালে (উত্তর : একটি দৃশ্যের আভাস : চিল, পুঁটিমাছ ও গোরু / অাঁখির ভিতর পাখির বাসা/জল ডুবে ডুবে খায়/চার পার ওপর শিকার পড়ল/দু পায় নিল তায় (উত্তর : চিল মাছ)। আঁকা বাঁকা নৌকাখানা/দিক পারাবার যায়।/ সোনার পাখির কৌতূহল/ কাঁকর খুঁটে খায় (উত্তর : হাঁস) বল ঘুঘু বল ঘুঘু জলের মধ্যে বাসা।/ হাড় কয়খান যেমন তেমন/মাংসটুকু খাসা (উত্তর : কই মাছ)। মাছের নাই মাথা, পাখির নাই ডিম (উত্তর : চিংড়ি, বাদুড়)। মামায় দিল পুখুরী, ভাগিনায় দিলা পাড়,/টিয়াপাখিরে পানি খাইতে দেখায় সংসার (উত্তর : আয়না)। এখানে প্রশ্নের মধ্যে পাখি ও জলের সহাবস্থান প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য। উঠিতে পাখি ঝুমুর ঝুমুর বসতে পাখি ধান্দা, /আহার করতে গেল পাখি ন্যাজ থাকল বান্ধা (উত্তর : মাছ ধরবার জাল)। আইল ঘুঘু ঝম-ঝমাইয়া/পড়ল ঘুঘু পাখা ছড়াইয়া/ধরল গিলল না (উত্তর : মাছ ধরবার জাল) আধার আয় ঘুঘু যায় ঘুঘু, জল দেখে দাঁড়ায় ঘুঘু (উত্তর : জুতো)। নদী নদী বক চরে, পা দিলে ক্যাঁক করে (উত্তর : ঢেঁকি)। খালায় পাখি নালায় চরে, ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে (উত্তর : দড়ি পাকানো)। এক শালিকের দুই মাথা, শালিক গেল কলিকাতা (উত্তর : নৌকা)। পানকৌড়ি ডুব দিয়ে যায়, কাদা খোঁচা আল দিয়ে যায় (উত্তর : সূঁচ)। পড়ে ঘুঘু মরে আছে, জাল মাছ য্যান চায়ে আছে (উত্তর : খই ভাজা)।

ছোটোনাগপুরের 'অসুর' উপজাতিদের ধাঁধা : A bent old man poaches and a peacock calls to him (Solution : A i shing hook and a float, made from a peacock's quil). মুণ্ডাদের ধাঁধায় : By the side of a river, a kite stretches its wings (Solution : A fishing net). ওরাওঁদের ধাঁধায় : The dove with its head on one side (Solution : A rafter).

মাছ, জল, নৌকো—এই তিনটি দিকের সঙ্গে পাখির অভিন্নতা ওপরের ধাঁধাগুলোর হয় প্রশ্নের মধ্যে, নয় উত্তরের মধ্যে ধরা পড়েছে। এর মধ্যে পাখির সঙ্গে নৌকার অভিন্নতা খুবই পরিচিত। সুন্দরবনের জঙলা ভাষায় ছোটো ডিঙ্গি নৌকাকে 'ঘুঘুডিঙ্গি' বা শুধুই 'ঘুঘু' বলে। একদা নানা পাখির ঠোঁটের আকারে নৌকো নির্মিত হত। 'ময়ূরপঙ্খী নাও', 'শুয়া ঠুঁটি নাও' প্রভৃতি নৌকো তার প্রমাণ। ময়ূরপঙ্খী নাও অর্বাচীন কালে রোমাণ্টিক আবহাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগীয় কাহিনীর নায়কেরা যখন সমুদ্রযাত্রা করতেন, তখন 'ময়ূরপঙ্খী' নাওয়ের মধ্যে এক বিশেষ প্রাণ-শক্তি (Mana) আরোপ করে, তাকে বিশেষত্ব দিয়েছেন। নৌকোর মধ্যে এই প্রাণ-চেতনা আরোপ চীন দেশেও লক্ষ করা যায়। কালে-কালে এই বিশেষত্বের ফলে 'ময়ূরপক্ষী নাও' রোমাণ্টিক নায়কের এবং বিবাহের বরের বাহন হয়ে ওঠে। বিয়ের সময় বরের বিয়ে করতে যাবার প্রাক্কালে কাঠ ইত্যাদি দিয়ে উনানের শত্রুকে নানা পাখির-

আকারে নৌকো তৈরি করা হতো। 'হুতোম প'্যাচার নক্সা'য় তৎকালীন একটি বিবাহের শোভাযাত্রার বর্ণনায় : পাই "পেছনে ··উটপ'ংখী ও ময়ূরপাংখীগুলির ওপরে বারোজন করে দ'াড়ি।"

নৌকাকে পাখিরূপে কাব্যে-সাহিত্যেও দেখা হয়েছে। 'মেঘনাদবধকাব্যে' মাইকেল লিখেছেন : 'চলিলা যথা গরুৎমতী তরী।' 'গরুৎ' শব্দের অর্থ হলো—'শব্দকারক', পাখা। বাঙলায় 'গরুৎমতী' অর্থ : পক্ষযুক্তা অর্থাৎ পালখাটানো নৌকো। এইভাবে দেখলে পাখির সংগে নৌকোর অভিন্নতার সহজ ও সংগত কারণ পাওয়া যায়।

পাখিব সংগে জলের পরিবেশের ঠিক বিপরীতে পাই– পাখির সংগে আগুনের একত্ব। আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না। আগুনের আবিষ্কারের কৃতিত্ব মানুষ দিয়েছে পশু বা পাখিকে। উত্তর আমেরিকার মেউক উপজাতীয়দের মধ্যে বিশ্বাস আছে, রবিন পাখিই পৃথিবীতে আগুন এনেছে, আগুন আনতে গিয়েই তার বুক পুড়ে লাল হয়ে গেছে। ফরিদপুর জিলায় বিশ্বাস করা হয় 'আলেয়া' নামে এক ধরনের পাখি যদি ওয়াক' করে, শব্দ করে, তবে তার মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে পড়বে। এই পটভূমিকায় পাখি সহজেই আগুনের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। যেসব ধ'াধায় এটি লক্ষ করা যায়, এবারে তার উদাহরণ দিই :

জানর বগা জানতা খায়/জানু পুয়াইলে বগা ধায় উত্তর : প্রদীপ)। এক শালিকের তিন মাথা/সে খায় বনের লতা-পাতা (উত্তর : উনুন)। কালো কালো পাখিটি/কালো বনে চরে ; /লক্ষ্মণপো রে দেখা দিয়ে/নথ পুরে মরে (উত্তর : উনুন)। একটা ঘুঘুর তিনটা মাথা/ঘুঘুটা কয় কোপাইয়া কথা (উত্তর : উনুন)। রাজার সরোবরে রাজহাঁস ভাসে/পোঁদে কাঠি দিলে ফিক করে হাসে। (উত্তর : প্রদীপ)। এক ঘটি জলে, বক চলে / জল শুকালে বক মরে (উত্তর : প্রদীপ)। অতটুকু টিটি চড়াই / ঘাড়মুড়ি পানি খাই (উত্তর : প্রদীপের পলতে)।

মুরিয়াদের ধাঁধা : A little sparrow scattered its feathers about the whole house (Solution : A lamp). বৈগাদের ধাঁধা : A red crane stands in the valley. Suddenly it climbs the hill with a great cracking noise Solution : Fire). উড়িষ্যার জুয়াঙ্গদের ধাঁধা : All the hill is burnt / But the pea-hen's eggs are safe (Solution : stones). মুসলমানদের মধ্যে চলিত একটি ধাঁধা : There is a bird / It sits along river / Drinks water with it claws/Holds communion with God (Solution : A Kerosene lamp):

আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, ঋতু-আবহাওয়ার সঙ্গে পাখির যোগ আদিম কাল থেকেই মানুষ অনুভব করে এসেছে। কতকগুলো পাখিকে 'weather bird', 'Rain-bird', 'Thunder bird' রূপে চিহ্নিতই করা হয়েছে। বৎসরের নির্দিষ্ট ঋতুতে সূর্যের অয়নের সঙ্গে সঙ্গে, অনেক পাখি দৃশ্য বা অদৃশ্য হয়, ফলে ঋতু-আবহাওয়ার সঙ্গে তাদের একটা যোগ এসেই গেছে। ধাঁধার মধ্যেও তার ছাপ পড়েছে :

লোহার জাল সোনার ছিটি / একশও বগ্‌লার দুইখান পুঁঠি (উত্তর : আকাশ, ইন্দ্রধনু, চন্দ্রসূর্য ও তারা)। মাসীর হাঁসে আণ্ডা পাড়ে / কেউনি আণ্ডা গণতে পারে (উত্তর : তারা)। এউড়ি বাঁশ তেউড়ি বাঁশ / তারি মধ্যে বালি হাঁস / বালি হাঁসে আণ্ডা পাড়ে / কোন্‌ কোন্‌ রাজার ব্যাটা গণতে পারে (উত্তর : তারা)। উড়ে যায় পাখি, নাড়ী ধরে রাখি (উত্তর : ঘুণী)। নিচ্যানী পক্‌কী খায় হলদীর গুঁড়া / হাগতে হাগতে যায় পক্‌কী / মাস্তানের মুড়া (উত্তর : চাঁদ)। অতি অলি পাখিগুলি গলি গলি যায় / সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখগুলো খায় (উত্তর : ধোঁয়া)। আকাশে জুড়লাম লাঙ্গল পাতালে জুড়লাম মই / সাততাল কাউয়ায় চিবড়িয়া খায় খই (উত্তর : বৃষ্টি)। এতগাছটা টান দিলে বেতগাছটা লড়ে / কোকিলে ডাক দিলে সমুদ্র লড়ে (উত্তর : ভূমিকম্প)। উড়ে যায় রে পক্ষী জুড়ে যায় রে বিল / সোনার ঢাকনি আর রূপার খিল (উত্তর : মেঘ)। বিনি হাল হাঁস লদর-বদর করে / আগলা ডুবে বজা পাড়ে কে গুণতে পারে (উত্তর : শিলা)। মধুবন তোতাটি, ফুল ফুটিছে একটি (উত্তর : সূর্য)। একখানা কণ্ঠি হ্যাঁকাব্যাঁকা / তার উপরে মাছরাঙা/মাছরাঙাতে মারলো ডুব, কোন্‌ পক্ষীর কোন্‌ ডুব (উত্তর : সূর্য)। হে সূর্য, তুমি সাক্ষী, ডিম পেড়েছে কোন্‌ পক্ষী (উত্তর : সুপুরি)। এখানে প্রশ্নের মধ্যে সূর্য ও পাখির সহাবস্থান লক্ষণীয়)।

বস্তার জিলার মুরিয়াদের ধাঁধা : The black cock gathers it, the white cock spreads it out to dry (Solution : Night and day). This peacock has only one leg (Solution : An umbrella). শবরদের ধাঁধা : The white crane with only one leg (Solution : A country umbrella). শেষোক্ত তিনটি পাখিই বর্ষাকালীন।

পাখির সঙ্গে স্বর্ণ ও ধন-সম্পদ এবং রাজ-রাজড়ার এক ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। 'সোনার পাখি', 'সোনার খাঁচা' ; 'স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হাঁস' প্রভৃতি কল্পনা এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে আসে। 'জাতকে'-র গল্পে দেখা যায়, পাখি-বিশেষে হাড়-মাংস খেয়ে রাজ্যপাট এবং রাজসভার উচ্চ পদপ্রাপ্তি ঘটেছে। রূপকথাতেও পাখির সঙ্গে রাজ্যপাটের নিবিড় ও নিগূঢ় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। এ-বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা পরে করেছি। বর্তমান ক্ষেত্রে ধাঁধা মধ্যে এটি আমরা লক্ষ্য করছি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

পড়িতে ঝুম্‌ঝুম্‌ করিতে রাও/সোনার কটরা রূপার পাও (উত্তর : ময়ূর)। রাজ রাজ পাখি, সর্প যত আঁখি/গোড় দুটো মুছে ঘষে (উত্তর : মাছি)। হিরণবরণ পক্ষী রে ভাই কৃষ্ণগান গায়।/ঠোঁটে করে আনে আধার উদরে না যায় (উত্তর : কলম)। গাঙ্‌পার দিয়া যায় টিয়া/সোনার টোপর মাথায় দিয়া।/যদি ইচ্ছা করে/সাত হাত মাটি খোচ্‌ করে (উত্তর : লাঙল, টিয়ে। 'টিয়ে' যতগুলো ধাঁধাতে উল্লিখিত, প্রায় সব ক'টিতেই, তার মাথায় সোনার মুকুট)। রাজার বাড়ী পাতি হাঁস/খায় খোলা তার ফেলায় শাঁস, (উত্তর : চালতে)। এউরি বাঁশ, তেউরি বাঁশ/তারি তলে বালি হাঁস, /বালি হাঁসে আণ্ডা পাড়ে/কোন্‌ কোন্‌ রাজা গুণতে পারে (উত্তর : তারা)। উড়ে যায় রে পক্ষী জুড়ে যায় রে বিল/সোনার ঢাকনি আর রূপার খিল (উত্তর : মেঘ)।

ওরাওঁদের ধাঁধা : The little bird that does not fear a raja (Solution An eye fly). বিহারের শবরিয়া পাহাড়ীয়াদের ধাঁধা : He has a crown but is not a king (Solution : A cock).

মানবদেহ এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পাখির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছে ধাঁধায়। আসলে, বিশ্বের বহু অঞ্চলেই পাখিকে মানুষের পূর্বপুরুষরূপে কিংবা তার আত্মা রূপে দেখবার যে প্রথা বা প্রবণতা চলিত আছে, তার থেকেই এটি সঞ্চারিত। উদাহরণ এই :

একাধিক ধাঁধা মেলে যার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'আঁখির মধ্যে পাখির বাসা'। কাব্যে ও সাহিত্যে চোখের সঙ্গে পাখিকে উপমিত করবার সাহিত্যিক প্রথাটিও এখানে স্মরণ করা যায়। হায় টিয়ে হয়ে চলে গেল, হায় টিয়ে হয়ে চলে এল (উত্তর : চোখ)। আতা গাছে তোতা নাচে, কথাকলি আরও নাচে (উত্তর : জিভ)। হালায় পাখি নালায় চরে, ধরে ধরে তার পেটটি ভরে (উত্তর : জিভ)। বগলা বসে ধারি ধারিতা/ঘুনী বসে একা,/এই ঢকটি যে ভাঙ্গাই দিবে/তাকে দিমু সোনার শাঁখা (উত্তর : দাঁতের সারি ও জিভ। দাঁতের সারিকে একাধিক ধাঁধায় বকের সারি বলা হয়েছে)। খাঁচার ভিতর পেঁচার ছাও/তিন মাথা তার ছয় পাও (উত্তর : পাল্কির ভেতরে বসা একটি লোক, এবং আগে-পিছে দুজন বেহারা)। সোনার পঙ্খী পানি খায়, দুনিয়াই দেখা যায় (উত্তর : আয়না)।

পাখির সঙ্গে অন্যান্য অনেক বস্তু ও প্রাণীর অভেদ কল্পনা করে ধাঁধা রচিত হয়েছে অনাবশ্যক বোধে তা এখানে উল্লিখিত হল না।

এই আলোচনায় আমি ধাঁধার প্রশ্ন অর্থাৎ ধাঁধা রচনার ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছি বেশী, উত্তরের দিকটার ওপরে ততটা নয় ; যদিও উত্তরের মধ্যেও অনেক আলোচ্য বিষয় আছে।'

...৫...

প্রকারের দিক থেকে ধাঁধার মধ্যে যেমন বিহঙ্গচারণার উপাদান সূক্ষ্মরূপে সংলক্ষ্য, পরিমাণের দিক থেকে তেমনি সবচেয়ে বেশী পাই গান ও গীতিকার মধ্যে। সঙ্গ অবশ্য সেই একই / বস্তুতঃ, ছড়া প্রবাদ, ধাঁধা, গান-গীতিকা ও কথায় বিহঙ্গচারণার প্রসঙ্গ এক। সব ক'টি প্রসঙ্গের আলোচনা করবার পর সবার শেষে এদের পেছনে একটি বিশিষ্ট মানস ও সংস্কৃতিকে আমরা দেখতে পাবো।

জীবনের প্রতিটি স্তর—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, সব ক'টি অবলম্বন করে যেসব গান মেলে; কিংবা, বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে চৈত্র মাস পর্যন্ত যেসব আচার-অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক গান পাওয়া যায়—সর্বপ্রকার গানেই পাখি প্রধানতম উপাদান-উপকরণ -প্রসঙ্গে হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিক দিক থেকে দেখলে রূপক-উপমা সৃষ্টিতে যেমন পাখির প্রাধান্য ; নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকেও তেমনি লোকমানসে পাখি একটি বিরাট ভূমিকা নিয়েছে।

জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু—জীবনের এই তিনটি প্রধান স্তর। এই তিনটি স্তর-বিষয়ক গানেই পাখির সঙ্গে মানুষকে এক ও অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। কিন্তু এই একাত্মতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিক আছে · কখনো কখনো দেখা যায়, পাখি ও মানুষকে ভিন্নরূপে উচ্চারণ বা উল্লেখ করে, তারপর উভয়ের মধ্যে অভিন্নতা প্রদর্শন করা হয়; আবার, কখনো কখনো মানুষের নাম ও প্রসঙ্গ সম্পূর্ণই অনুচ্চারিত ও অনুল্লিখিত রেখে, কেবল পাখির উল্লেখ দ্বারাই মানুষকে বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় প্রকারের অভিন্নতা প্রদর্শনের মধ্যেই সূক্ষ্মতা, প্রতীকতা ও সাংস্কৃতিকতা-বোধ এবং একটি নৃতাত্ত্বিক দিক ধরা পড়ে। প্রথোমোক্ত দিকটির মধ্যে একটি সাহিত্যিক দিকই বড়ো, এবং মার্জিত সাহিত্যে পাখির সঙ্গে মানুষের অভেদ এই পদ্ধতিতেই প্রদর্শিত হয়, লোকসাহিত্যে যখন এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তখন তাতে যেন একটি ভেদবোধকে আগে স্বীকার করে নিয়ে পরে অভেদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এতে যেন অন্ধ-আদিম দিকটি যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয় না। যেন পাখি মানুষের উপমান বা উপমেয় রূপে, রূপক-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালংকার সৃষ্টির সাহিত্যিক উপায় মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর গানগুলি থেকে এ কথাটি স্পষ্ট করছি।

ছেলেভুলানো ছড়া ও ঘুমপাড়ানী গানে পাখি ও শিশু কি করে একাত্ম হয়ে উঠেছে, আগেই তা প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি জাপানী ঘুমপাড়ানীয়া গানের উল্লেখ করা যায়, যাতে শিশুকে পারাবত এবং সেই সংস্পর্শে চাঁদকেও পাখি বলা হয়েছে; মাকেও বলা হয়েছে পাখি; Sleep, little pigeon, and fold your wings–/Little blue pigeon with velvet eyes/Sleep to the singing mother-bird swinging the nest where her little one lies/ In through the window a moon-beam comes—/ Little gold moon-beam with misty wings; ·

বিয়ের গানে পাখির উল্লেখ প্রচুর। বাঙলার বিয়ের গানে প্রায় সবক্ষেত্রেই কনে বা পাত্রীই পাখি, কচিৎ পাত্র বা বরকে পাখি বলা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর বাঙলা থেকে পাওয়া বিয়ের গানগুলোই এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। কনে বিদায়কালে ঝাড়খণ্ডের একটি বিবাহগীতি এই: যাহার পায়রা সেত লিয়ে যাছে : / বাপুত ভাবিছে মাও ত কাঁদিছে যাহার পায়রা সে উড়াইলয়ে যাছে।

রংপুর জিলায় কনেকে বিবাহ-সভায় আনবার সময়, এয়োরা কনেকে উদ্দেশ্য করে গায় : আজা ঘোরে ডালে ডালে/বুলবুল ফেরে তলে। / আইসো ওরে বুলবুল/ছ্যায়া মাড়োয়ার তলে। বরের উদ্দেশ্যে গায় : হামার ঘরের দইয়োল পঙ্খি/তোমাকে সঁপিনু রে/সর্বো অঙ্গের ময়না রে। জলপাইগুড়ি জিলায় কনেকে উদ্দেশ্য করে এয়োরা গায় : কতো খেলি খেলাও ময়না/বোনফুলের তলে রে ফুল ময়না।···আজি ধরিয়া যাবে রে ময়না/মন্দির করিয়া খালি রে। কনে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল, যেন একটি দীর্ঘাঙ্গী পাখি উড়ে গেল : কাসা কালা বাইগন রে গোছা/ দীঘল দীঘল পংখী ; । সেই না পংখী উড়িয়া গেইল/দামান (বর) শালার বাড়ি।

বগুড়া জিলায়, কনে বিদায়ের পব, এয়োরা মায়ের ব্যথা এইভাবে প্রকাশ করে : মায়ে ডাকে ময়না ময়না রে/ময়না নাই মোর ঘরে। কুখ্যা ঠিক্‌ক্যার বাবরি আলারে/ময়নাক করছে চুরি। এই জেলার বিয়ের গানে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের যে ভবিষ্যৎ ছবি আঁকা হয়েছে, তাতেও কনে পাখি হয়ে উঠেছে : দুপুর্যা বোদের মন্দে বুলবুল চড়ে দিছে আন্দোন লয় মোর কে/মুখখানি ঘামিয়া বুলবুল হইলো সরোবর/···ডানে আছে ডানের রুমালখানি বুলবুল/তাই দিয়্যা বুলবুল মোছ মুখের ঘাম।···

ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলেব আদিবাসী ও 'ভূমিপুত্র'দের বিয়ের গানে পক্ষি-প্রতীকতা ব্যাপকতব রূপে পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো আদিবাসীদের মধ্যে বিয়ে স্থির করবার আলোচনাব সূত্রপাতই হয় পক্ষি প্রতীকতা দিয়ে। রাচী জেলার খাড়িয়া রা কেমন কবে ও কি ভাষায় বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করে W G. Archer তার মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন (Betrothal dialogue · Man in India : Vol. XXIII, June 1943, No 2, pp 147-156), প্রস্তাব এইভাবে পাত্রপক্ষ উত্থাপন করে : তারা একটি পোষা বাজপাখিকে একটি 'কোয়েল'কে ধরবার জন্যে লেলিয়ে দিয়েছিল, কোয়েলটি এসে কনের বাড়ীতে লুকিয়েছে। এখন সেই কোয়েলটি তাদের চাই। সমস্ত কথাবার্তা পাখিব সংকেত দিয়ে চালানো হয়. আর্চার তাই একে বলেছেন 'The Quail Dialogue' একই ভঙ্গি চাকমাদেব মধ্যেও দেখা যায।

এইসব বিয়ের গানে পাত্রী বা কনেকে পাখি বলা হয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলের বিয়ের গানে আবার পাত্রকেই বলা হয়েছে পাখি। T. B. Naik তাঁর একটি প্রবন্ধে (Territorial Exogamy : Man in India, Vol. XXIX, January-March 1949, No. 1, pp. 6-17) এ-বিষয়ে একটি কারণ নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে যদি অসবর্ণ বিবাহ হয়, তবে পাত্রীর কাছে পাত্র থাকে অচেনা পরদেশীর মতো, যেন ভিন্ন বা দূর এক দেশ থেকে আসা এক পাখি বিশেষ। যেমন গুজরাটের একটি বিয়ের গানে : He has come/The pardeshi parrot has come ; /and he will take away our sister.

কিংবা পাঁচমহলের ভীলদের মধ্যে চলিত বিয়ের গানে, পাত্র যেখানে পরদেশী পাখি : The yellow parrot was staying in the yonder hills./It flew from there : / It sat on the tamarind tree. / It flew from there, / And sat on the woman's water pot

কিন্তু উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল জেলার বিয়ের গানে কনেকেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মতো, পাখিরূপে দেখা হয় : In the lonely forest/When tears come in eyes/Who will wash them away/Lachma, my parrot dear,/Who will wash away ?

গুজরাটের 'Anavil'-দের একটি বিয়ের গানে (Songs of the Anavil's of Gujrat : Man in India, Vol. XXX; April-Sept. 1950, No. 2-3

pp. 29-55) দেখা যায়: O sister, a bird which was smiling and playing on the bank of the lake,/Is going away...

রাঁচি জেলার ওরাওঁদের বিবাহ-গীতির মধ্যে (W. G. Archer: Folk-poems: Man in India, Vol. XXII, December 1942, No 4, pp. 197-206) আমি দুটো ধারা লক্ষ করেছি: একদিকে পাত্র বা বরকে পাখিরূপে দেখা; অপর দিকে বর-কনে দু জনকেই এক সঙ্গে এক জোড়া পাখিরূপে দেখা। যেমন, পাত্রকে পাখিরূপে দেখা: Where are you coming from/Beautiful parrot ?/ The parrot speaks the name of Ram. / Your feathers are green / Your crest is red, parrot / The parrot says the name of Ram.

তেমনি কনেকে পাখিরূপে দেখা: How shall I buy a *rivo* bird ? / How shall I buy a lovely wife ? / With words a *rivo* bird is bought / With words like flowers a lovely wife is got.

এবং, শেষে দু জনকেই একসংগে পাখিরূপে দেখা: The well is of stone and brick / And there the *rani* is drinking the shining water / The pigeons are drinking the water / The doves are drinking the water / Drinking it in pairs.

সাঁওতালী বিয়ের গানে নতুন কোনো প্রসঙ্গ নেই, এখানেও কনে পাখি। নেপালি বিয়ের গানে নতুন একটি প্রসঙ্গ পাচ্ছি (S. C. Mitra: The pigeon and the sparrow in Nepalese folk-song: Qtly. Journal of the mythic society of Bangalore. Vol. XXX, January 1940, No. 3, pp. 358-361). একটি গানে দেখি, বিয়ের পর কনে শ্বশুর বাড়ীতে যাবার সময় বাপের কাছে এক জোড়া পায়রা চাইছে। আর একটিতে দেখা যায়, শাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জরিত, বধূ তার দুর্দশার কাহিনী জানাতে চড়ুইকে দূতরূপে বাপের বাড়ীতে প্রেরণ করেছে। পাখিকে দূত বা সংবাদদাতা রূপে দেখবার প্রবণতা প্রেমের গানেই বেশি, একটু পরেই তা আমরা লক্ষ্য করব।

মৃত্যু-বিষয়ক গানেও পাখির প্রসঙ্গ দেখা যায়। মানবাত্মা যে পক্ষিরূপী, এ গান তারই প্রমাণ।

প্রেমের গানে পাখি এসেছে প্রধানতঃ তিনভাবে: প্রথমতঃ, নায়িকা-প্রেমিকার মনে বিরহের (কচিৎ মিলনের) বোধকে পরিস্ফুট করবার জন্যে পাখিকে পরিগ্রহণ; এজন্যে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ গৃহীত হয়েছে, তা হলো মুখ্যতঃ বর্ষা ও বসন্ত ঋতু। দ্বিতীয়তঃ, পাখিকে দূতরূপে প্রেরণ কিংবা সংবাদ বহনকারীরূপে লক্ষ করা। বাস্তবিক অর্থেই পাখিকে যদি দূত বা সংবাদ বহনকারীরূপে দেখা হতো (যা মার্জিত সাহিত্যে দেখা যায়), তা হলে এ শুধু এক সাহিত্যিক প্রথানুস্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত হতো। কিন্তু লোকসঙ্গীতে যখন পাখিকে দূত বা সংবাদবহনকারীরূপে দেখা হয়,

তখন মনে করা হয়, পাখি তার অসীম প্রজ্ঞা এবং আলোকসামান্য বোধের ফলে নিজের থেকেই নায়িকার মনোবেদনার কথা নায়ককে জানাতে যাবে; কিংবা নায়কের সংবাদ আপনা থেকেই নায়িকার কাছে বহন করে আনবে। পাখির ওপর এই রহস্যময় ক্ষমতার আরোপ নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার। তৃতীয়তঃ, প্রেমিকার (ক্বচিৎ প্রেমিকের) নিজের পাখি হয়ে ওঠা। এই তিনটি দিকই মার্জিত সাহিত্যে অল্প-বিস্তর দেখা গেলেও পার্থক্যও আছে। অভিজাত সাহিত্যে মানুষকে অনুল্লিখিত রেখে, কেবল পাখির উল্লেখ দ্বারাই, পাখিকে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করে তোলা হয় না।

প্রেমের গানের প্রসঙ্গে বারমাসী গানের কথাও ওঠে। আধুনিক গবেষক প্রমাণ করেছেন, ভারতীয় সাহিত্যে যে বারমাস্যা গান দেখা যায়, তা আসলে কৃষি ও আরণ্য সভ্যতার প্রয়োজনে ও প্রতিবেশে উদ্ভূত। তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' বইটিতে ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মশাই অনুমান করেছেন, কৃষিভিত্তিক মানুষের কাছে বন্য পশুপাখি যেমন আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তা কালক্রমে নারীর আনন্দ-বেদনা প্রকাশেরও মাধ্যম রূপে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই জন্যে নারীর প্রেম-বিরহ প্রকাশের ক্ষেত্রে তোতা, শারী, পাপিয়া, ডাহুক প্রভৃতি পাখির প্রয়োজন হয়েছে। আদিবাসীদের লোকসঙ্গীতে শুক বা তোতা পাখিই বিরহিণী নারীর বিকল্প হয়ে গেছে এবং ওই পাখিরা বিশেষ উৎকণ্ঠিত ও বিরহী রূপে বর্ষার পটভূমিকায় বারমাসী গানে চিত্রিত হয়েছে।

একদিকে কপোতী, চাতকী, রাজহংসী প্রভৃতি পাখির ওপর মানবীসুলভ বিরহবোধ আরোপ করা হয়েছে; অপরদিকে বাস্তব জগতের নারীর বিরহ (ক্বচিৎ মিলনকে) স্ফুটতর করবার জন্যে সেইসব পাখিরই আসঙ্গ গৃহীত হয়েছে। Verrier Elwin তাঁর 'Folksongs of the Maikal Hills' বইতে লিখেছেন "Of the relation between the male and the female birds it is said that the male only comes to the wife in Asodh and can only drink rain water. For the rest of the year the female bird is lonely and sings her songs in tears. In Chait and Baisakh she cries "More Pihu" and in Jeth she says 'Mai Piasi hu', I am thirsty. Then with the coming of the rains comes the male bird and their happyness is fulfilled."

চাতক-চাতকিনীর এ কথা কেবল লোকসাহিত্যে নয়, মার্জিত সাহিত্যেও বিশ্বাস করা হয়। শ্রীমতী দুর্গা ভগতের মতে এ-সব সাহিত্য সংস্কার জনপ্রিয় সাহিত্যের মাধ্যমেই লোকসাহিত্যে গিয়ে ঠেকেছে। এসব বিশ্বাসের মধ্যে সাহিত্যিক প্রথানুসৃতি যতোখানি আছে, নৃতাত্ত্বিক দিক ততোখানি নেই। কাজেই পাখির ওপর বিরহিণী নায়িকা বা নারীর ভাব আরোপ আমাদের কাছে ততো গুরুত্ব পায় না, কিংবা তার বিপরীত চিত্র রূপে বাস্তব বিরহিণীর প্রতিভূরূপে পাখিকে প্রদর্শন করাও। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'কঙ্ক ও লীলা' গীতিকায় যখন বিরহিণী নায়িকার উক্তি শুনি: রৈয়া

রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর। / না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর। কিংবা, রঙপুরের বারোমাসী গানে যখন শুনি : আষাঢ় মাসেতে হে কন্যা কিষ্‌ষাণে কাটে ধান। / কোড়া পাখির কান্দনেতে শরীর কম্পমান॥ হে'ওয়া পাখির কান্দনেতে পাঞ্জর কৈল শেষ / ডাউকির কান্দনেতে মুঞি ছাড়িনু বাপোর দেশ। অথবা, আসামের 'মধুমতীর গীতে' ('অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি', প্রথম খণ্ড) : বৈহাগর মাহত ডাউকী কান্দয়। / ডাউকীর কান্দন শুনি হৃদয় ন সহয॥ / বৈহাগর মাহত কুলিয়ে করে রাব। / কুলির কান্দন শুনি নুজুরাই গাব। —তখন স্পষ্টই বুঝি বিরহী বা বিরহিণীর বিরহকে জাগাবার বা তাকে তীব্রতর করবার এক সাহিত্যিক প্রথা বা সংস্কার রূপে পাখিকে গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। তথাপি, এও অস্বীকার করবার উপায় নেই, এই সাহিত্যিক-রীতি লোকসাহিত্যে বেশ ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে। দেখা যাবে, অন্য সব ঋতু অপেক্ষা, বিরহ-চেতনাকে পরিস্ফুট করবার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে দুটি মাত্র ঋতুকে : বর্ষা ও বসন্ত। এই ঋতু-চেতনা এবং বাছ-বিচারের সচেতনতা লোকমানসের নিজস্ব বস্তু নয়। সেখানকার বিরহ-বোধ ও যৌনচেতনা স্থূলতর এবং তা প্রতিদিনের ও প্রতিমুহূর্তের।

তেমনি, পাখিকে দূতরূপে নিয়োগ করা বা সংবাদ সরবরাহকারীরূপে লক্ষ করার মধ্যে বিরৎপরিমাণে সাহিত্যিক প্রথানুসৃতি দেখা যেতে পারে। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে সংস্কৃত 'হংসদূত' কাব্য (দক্ষিণ ভারতীয় কবি শ্রীভেংকটনাথ বা শ্রীবেদান্ত দেশিকের 'হংসসন্দেশ' কাব্যগুলো) সাহিত্যিক প্রথানুসৃতির ফল। কিন্তু এ বিষয়ে সংশয় পোষণ করা যেতে পারে। লোকসাহিত্যে পাখিকে দূতরূপে নিয়োগ করবার প্রবণতা এতো বেশি যে, তাকে সাহিত্য-সংস্কারের প্রভাব বলে সর্বত্র মানা যায় না। তেমনি, পাখির সংগে দূরলোকের বার্তার যোগ দৈনিক জীবনেও এখনও এক স্বীকৃত সংস্কার। তবে, আগেই বলেছি, যেখানে পাখির মধ্যে এক রহস্যময়তা ও অজ্ঞাতশক্তির প্রভাব আরোপিত হয়, সেখানেই খাঁটি লোকমানসের পরিচয়। আমার আরো মনে হয়, নায়িকা যেখানে স্পষ্টরূপে, সচেতন মনে পাখিকে তার বিরহ-বেদনা নায়কের কাছে পেঁৗছে দিতে বলছে, তার চেয়ে, নায়কের কাছ-থেকে-আসা বলে কল্পিত পাখিকে নায়কের সংবাদ জিজ্ঞাসার মধ্যে রহস্য ও অজ্ঞাতভাব আরো পরিস্ফুট হয়। উদাহরণ দিই।

উত্তরবঙ্গের একটি গানে, বিবাহিতা কন্যা পতিগৃহে তার লাঞ্ছনার কথা কাকের মুখে মায়ের কাছে জানাচ্ছে : কাগা রে, যখন মা মোর সিনান করে / তখন না ক'ন কাগা মায়ের আগে / মরিবে মা মোর দরিয়ায় ঝাম্পো দিয়া / যখন মা মোর বিছিনাত শোতে / তখন ক'ন কাগা মায়ের আগে / বালিশ ভিজিবে দুই নয়নের জলে। এখানে স্বচ্ছ, সুন্দর ও সুস্থ একটি মানবিক-বোধ, যা সাহিত্যের চিরকালীন উপাদান, তাই ধরা পড়েছে। এতে সুন্দর সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু নৃতাত্ত্বিক কোনো দিক এতে ধরা পড়ে নি। কাজেই আমাদের কাছে এর গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেল।

কিংবা, পূর্ববঙ্গ থেকে একটি উদাহরণ : ওরে পংখী কইও নিরলে। / মনের দুঃখ কইও আমার বন্ধুর লাগ পাইলে। / উনচা ডালে বইছে রে পংখী নজর বহুদূরে। /

এই না পন্থে যাইতে দেখছ নিদয়া-নিষ্ঠুর ।। /উইড়া যাও রে বনের পংখী জুইড়া পড়ছে ছায়া। / ছায়ার মইধ্যে দেখি আমি বন্ধের কায়া-মায়া ।। / উইড়া যাওরে বনের পংখী আমার খবর লইও। / পরাণ-বন্ধের আগে যাইয়া উইনুচ স্বরে কইও।

এবং, পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি উদাহরণ : পাখি বলে যাও রে / নীল আকাশে মন উল্লাসে / কোন্ বা দেশে যাও রে। / বন্ধুর দেশে যাইও রে পাখি ব'লো আমার কথা। / জানাও ওরে পাখি আমার মনের ব্যথা।

তিন বঙ্গের তিনটি উদাহরণে দেখা যাবে, নারী তার বিরহ বা বেদনার কথা অপরের কাছে জানাবার জন্যে পাখিকে বলেছে,—এতে কোনো জায়গায় কোনো অস্পষ্টতা নেই।

কিন্তু যেক্ষেত্রে অদৃশ্য নায়কের কাছ থেকে সংবাদ বহন করে পাখি এসেছে বলে কল্পিত, সেখানে এতো স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা নেই। এখানে যথার্থই নায়ক পাখিকে প্রেরণ করেছে, সেই ইঙ্গিত নেই ; পাখি যেন সু বা কু যে কোনো বার্তাই আপন খুশিতে, আপন আলোকসামান্য ক্ষমতা বলে, অথবা, পাখির নিজস্ব একটি ধর্মরূপেই, নায়িকাকে সংবাদ জানাতে এসেছে। অথচ, নায়িকার কাছ থেকে পাখিকে সুস্পষ্টভাবে, ভাষায় ও দূতরূপে নিয়োগ করা হয়েছে। এই পার্থক্যটুকুর মধ্যে দুটি দিক আছে : নায়িকার কাছ থেকে যাওয়া অংশে পাখির ভূমিকা মার্জিত সাহিত্যেও দেখা যাবে, কিন্তু, নায়কের কাছ থেকে আসা পাখির অজ্ঞাত রহস্য একান্তভাবেই একটি নৃতাত্ত্বিক দিককে স্পষ্ট করে তোলে তা মার্জিত সাহিত্যে নেই। উদাহরণ এই :

উত্তর-রাঢ়ের একটি কৃষকের গানে : বন্ধুর দেশে পাখি এসে উড়ছে আকাশে / বল রে পাখি সত্য করে কে কেমন আছে? 'মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যার পালা'য় (প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড) : ঐনা পারের থাইকা পংখী আইলা তুমি উড়ি। যে জনা বাজাইছে বাঁশি / কও কেমনে তারে ধরি। 'মাধব রাজার কেচ্ছা' নামে একটি দীর্ঘ পালাগানে : ঝড়ীর সামনে কাউয়া কুলি / কতো রঙের রইছে বুলি, রে মাধব, / প্রাণের মাধব আইলা না দেশেতে। 'সত্য করে' বলা, 'কও কেমনে তারে ধরি,' 'কতো রঙের রইছে বুলি' প্রভৃতি এখানে লক্ষণীয়।

কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার নাম অনুল্লিখিত বা অনুচ্চারিত রেখে, কেবল পাখির উল্লেখ করেই যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকাকে বোঝানো হয়, সেখানেই পক্ষি-প্রতীকতা পূর্ণ ও সূক্ষ্ম হয়ে ধরা দেয়। মানুষে এখানে যথার্থই পাখির সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন। পাখিকে এমনভাবে দেখার মধ্যে একটি নৃতাত্ত্বিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

পশ্চিমবঙ্গ থেকে : একটি দাঁড়-ঝুমুর গানে : ইতিটুকু পাইখটি/হলদবরণ লেজটি / চিনাই দে ন দিদি/কে বটে লকটি (এতটুকু পাখিটি, হলদে লেজ, দিদি চিনিয়ে দাও, কে লোকটি)। ইতুটুকু পাইখটি/সীমলাটায় চরে / ডাকছে গলার মালা / মন কেমন করে (শিমঝোপের ভেতর ছোটো পাখিটি চরে বেড়ায়, ভাবের বন্ধু ডাকছে, মন কেমন করে। উপর ডালে কারিকুরি/নামুহ ডালে বাসা / খনেক উড়ে খনেক বসে / কার পায়েছ আশা (ওপর ডালের কারিকুরি পাখি নীচের ডালে এসে বাসা বাঁধল, একবার ওড়ে, একবার বসে। তোমাকে কে কি আশ্বাস দিল?)।

উত্তরবঙ্গ থেকে : তিস্তা নদীর পারে পারে গে দিদি,/জড়া হংস পড়ে ;/ হংসের কান্দনে দিদি মনটা না অয় ঘবে। আজি জলত কান্দে জলসুয়া/ডালত্ কান্দে টিয়া ; । ঘব-যুবতী নারী কান্দে খাট-পালংকে শুইয়া। ওকি ও দইয়ল বে/কার বাদে আখিমো সোনার যৈবন রে। দূর হাতে আসিলু বোগদুলু/কলা খাবার আশে/গাছের কলাগাছ গাছে রইল্ মোর/বোগদুল যায় দূরো দ্যাশে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের মধ্যেও এটি লক্ষ করা যায়। দু'একটি দৃষ্টান্ত এই : J.P. Mills আও নাগাদের একটি প্রেমের গানে লক্ষ করেছেন (A short anthology of Indian Folk-poetry : Man in India, Vol. XXIII, March, 1943, No 1, pp. 4-40). প্রেমিক পুরুষ যেন একটি কাঠবিড়ালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রেম নিবেদন করছে, প্রেমিকা একটি পাখির জবানীতে তার উত্তর দিচ্ছে। উক্ত প্রবন্ধেই বস্তার জিলার Bhattra-দের গানে (ভেরিয়র এল্উইন অনূদিত) : The parrot has eaten/The green Karmata fruit/ O the wings of a golden bird ! / Those days are gone. বিহারের ছোটোনাগপুরের একটি 'আষাঢ়ী' গানে ডব্লু. জি. আর্চার অনূদিত) : A girl is going/With parrot feathers/ Look at her this way/Look at her that way/With her parrot feathers. এখানে নায়িকাই পাখি।

প্রেমের ও অন্যান্য ধরনের গানে পাখির আর একটি ভূমিকার মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। বহু গানেই দেখা যাবে কাক, কোকিল, মোরগ প্রভৃতি রাত্রির শেষ ও দিনের শুরু ঘোষণা করছে। সাধারণতঃ ভোরের পাখিরাই এই কাজে নিযুক্ত হলেও, অন্যান্য ধরনের পাখিকেও নিশি অবসানের কথা ঘোষণা করতে দেখা যায়। পাখির সময়জ্ঞান প্রখর, প্রহরে প্রহরে নির্দিষ্ট সময়ে এমন কি জোয়ার ভাঁটা নির্দেশ করতেও, পাখি ডেকে থাকে। কিন্তু এইসব ডাক তার থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। যেন নায়ক বা নায়িকার সু বা কুভাগ্য নির্দেশ করতে এই ঘোষণা। পাখির এইসব ডাকের মধ্যে 'the idea of Mana বা 'Mana theory -কে মেলে। দু-একটি নিদর্শন এই :

'গোপীচন্দ্রের গান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫ থেকে : আত্রি করে ঝিকি-মিকি কোকিলা করে রাও/শ্বেত কাউয়া বলে রাত্রি প্রোহাও প্রোহাও। ঝেনু করে ঝিলমিল কোকিলাও ছাড়ে রাও/শ্বেত কাকা বলে নিশি পোহাও পোহাও। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (৩য় খণ্ড) থেকে : তুলা গাছে কুড়্গাস ডাকিয়া শুনিয়া আমির/রাত্তির পোষাইল বলি হইল ঘরের বাহির। কাউয়া করে কলরব কোকিলা কুশবে/উপায় না দেখি ভেলুয়া চলি গেল ঘরে। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড থেকে : কাল নিশি পোষায়্যা গেল/কাহা কাক ডাকিল/বাসুর মাও নিদ্রায় অচেতন।

প্রেমের গানে ও বারোমাসী গানে নানা ধরনের পাখিই নায়ক-নায়িকার বিকল্প রূপে উল্লিখিত হয়েছে বটে, তবে 'কোকিলে'র নামই সম্ভবতঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেলে। কোকিল সম্পর্কে লোকসংস্কার যে পরিমাণে আছে সাহিত্যসংস্কার তার চেয়ে বেশি। কোকিল সুকণ্ঠ, কালো হলেও সুশ্রী, ঋতুরাজ বসন্ত এবং ফল-রাজ আমের সঙ্গে এর যোগ থাকায়, এর সম্পর্কে সাহিত্য-সংস্কার গড়ে উঠেছে। জীবনের মধ্যে প্রেম একটি

বড়ো দিক, বসন্তকালে সেই প্রেমবোধ তীব্রতাযুক্ত বলে বিশ্বাস, সুতরাং এই পথ ধরেই কোকিল সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কোকিলকে অবলম্বন করে একটি সাহিত্য-ধারারই সৃষ্টি হয়েছে। এবার তারি কথা বলি।

যশোর ও খুলনা জেলায় 'কোকিলের বারমাসী' বা 'কোকিলকন্যার বারমাসী' নামে এক ধরনের বারোমাসী গান চলিত আছে। কোকিল এখানে দূত, নায়িকার বিরহবেদনা নায়কের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে কোকিলকে অনুরোধ জানানো হয়। কোকিলকে অবলম্বন করে এই বারোমাসী গানগুলিতে (দ্রঃ বারাসীগান : অমলেন্দু ঘোষ। অমৃত. ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯) অবশ্য নতুন কোনো প্রসঙ্গ নেই। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য একদা 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-য় (১৩১১, ৩য় সংখ্যা) এই ধরনের একটি গান প্রকাশ করেছিলেন : যা রে কোকিলা তুই/আমার পতি গেছে যে দেশে ; অমন করে জ্বালাস নি আর নিত্যি এসে।

এই ধরনের বারমাসী গান বিহার এবং উড়িষ্যাতেও চলিত আছে (দ্রঃ উড়িষ্যার লোকসাহিত্য : বৃন্দাবননাথ শর্মা। প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩৫২। পৃ. ৪৩৯-৪৪০)। প্রকৃতপক্ষে 'কোইলি সাহিত্য'ই উড়িষ্যার সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'Typical selection from Oriya literature' গ্রন্থের প্রথমভাগের ভূমিকায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, মার্কণ্ডেয় দাস রচিত 'কেশব কোইলি' বা 'যশোদা কোইলি' ওড়িয়া সাহিত্যের আদি নিদর্শন। 'কোইলি' সাহিত্যকে বলে 'বারোমাসী কোইলি'। প্রত্যেক মাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পালনীয় আচার অনুষ্ঠানের কথা রামচন্দ্র বা কৃষ্ণকে লক্ষ করে এক-একটি পদ বা কলি রচনা করে 'বারোমাসী কোইলি' রচিত হয়। একটির প্রারম্ভিক অংশ এই :

আরে বাপু চাপধারী ! কি দণ্ড হেলা তোহর।
কান্দি কউশল্যা বোলন্তি কৈকেয়ী অরজিব কেঁউশিরী লো।
কোইলী শুন লো ॥

এহি মাগুশির মাস ! কাকর পরে বিশেষ।
শীতল পবন বহে ঘন ঘন মো পুত্র করিব কিস লো ॥…

'উৎকলের পুরী অঞ্চলে এক শ্রেণীর জাতি বাস করে তাহার নাম ফেলা। এ জাতির মেয়েরা গান করিয়া বিবাহিতা রমণীদের শরীরে উল্কি রচনা করিয়া থাকে। বংশদণ্ডের উপর দড়ির সাহায্যে বালিকা ও রমণীরা নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শনপূর্বক দর্শককে আনন্দিত করিয়া থাকে। বংশদণ্ডের উপর বসিয়া গায়িকা মধুর কণ্ঠে বারমাসী কোইলা সঙ্গীত করিয়া দর্শকচিত্তে আনন্দ বিধান করে।'

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার আকবর শাহ্ মাঝি নামীয় জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছে রামগরীব চৌবে এই ধরনের কোকিলগীতি শুনে তা প্রকাশ করেছেন (North Indian Notes and Queries, March 1894, P. 215).

তুক্কা, মনঃশিক্ষা, হেঁয়ালি, দেহতত্ত্ব, বাউল, মুর্শিদা এবং অন্যান্য ভক্তিগীতিতে পাখিকে 'পরমতত্ত্ব' রূপে বারংবার প্রদর্শন করা হয়েছে। রীতিটি এতই প্রচলিত

যে, সহসা এটিকে একটি আলোচ্য বিষয় বলেই মনেই হয় না। এইসব গানে দেহ ও মনকে দু ভাগে ভাগ করে নিয়ে, দেহকে পিঞ্জর এবং মনকে সেই পিঞ্জরে আবদ্ধ 'পাখি' বলা হয়েছে। যেমন, 'মন-পাখি', 'মন-মইনা' (ময়না), 'মনসুয়া'। শ্রীহট্টের একটি বাউলগানে মন-কে 'মুনিয়া' পাখি বলা হয়েছে : মন-চোরা মনিয়ার পাখি রে./পাখি কে নিল ধরিয়া। মনের বদলে 'প্রাণ' মেলে : 'প্রাণপাখি'। পূর্ববঙ্গের একটি গীতিকাতে পেয়েছি, 'মন-কোকিলা'। মনকে আবার দু ভাবে দেখা হয়েছে : এক 'মন' সাধারণ স্তরের, সে কায়া ও মায়াতে আবদ্ধ। আর এক 'মন' পরমতত্ত্ব রূপী। দুই মনে সব সাধকের মনে দ্বন্দ্ব চলছে : যেন 'শুক-সারি' দাঁড়ে বসে কলহে রত। 'হৃদয় পিঞ্জর', 'দেহ পিঞ্জর' ইত্যাদি তো অতি পরিচিত। পাখির প্রসঙ্গে এইসব গানে বার বার গাছের কথা এসে গেছে।

এইসব বর্ণনার মধ্যেও, আমি মনে করি. সাহিত্যিক সংস্কার ও রীতিই বলবতী হয়েছে, কোনো নৃতাত্ত্বিক দিক নয়। দেহ ও আত্মাকে পুরোপুরি পাখি বলার যে আদিম মনোবৃত্তি, তা এখানে কার্যকরী হয় নি বলেই মনে হয়। এখানে মনরূপ ময়না এই কর্মধারয় সমাস ; অথবা, মন ও ময়না—উপমান ও উপমিতের অভেদের মধ্যে রূপক অলংকার সৃষ্টি করে সাহিত্যিক কৌশল প্রদর্শনই মুখ্য। এ বিষয়ে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুটি উদাহরণ দিলাম :

ময়নার ময়হা বড়ো ভারী রে,/পায়া ময়না সনার খাঁচারি রে/মনে কি হয়না ময়না যাইতে হোবে উড়ি রে। পশ্চিমবঙ্গের বাউরীদের ঝুমুর গানে : এ দুনিয়ায় মায়ার বাঁধন/কেবলমাত্র ছয়া বে ছুয়া/মুদলে পাখি সকল আঁখি/পড়ে র'বে কয়া (কায়া)। কিংবা ধাঙড়দের গানে : ছোট পারা পাখিটা চালে করে বাসা/খাজনা পাতি না দেয় তো মার খায় গো চাষা।

কিন্তু এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গের একটি প্রখ্যাত ও প্রচলিত গানকে ব্যতিক্রম বলে মনে করি। গানটির প্রথম পঙক্তি : 'ফান্দে পড়িয়া রে বগা কান্দে রে !' আত্মারূপী বক পার্থিব জগতের মায়া-ফাঁদে পড়ে আজ কাঁদছে। এই কল্পনাকে নিছক সাহিত্যিক বিশ্বাস বা সংস্কার বলে মনে হয় না।

ছড়া এবং ধাঁধার আলোচনা কালে পাখির ধন-সম্পদের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছি। গানের মধ্যেও তাই। এখানেও যেখানে গৃহস্থের আর্থিক সাচ্ছল্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেখানে পাখির প্রসঙ্গ অপরিহার্যভাবে এসে গেছে।

পূর্ববঙ্গ থেকে উদাহরণ : ঢাকা জেলায় 'ওম্নিগান' নামে এক ধরনের মাগনের গান চলিত আছে। রাখাল বালকেরা বেশি পরিমাণে চাঁদা পাবার জন্যে গৃহস্থকে সম্পন্ন মানুষ রূপে উল্লেখ করবার বাসনায় গায় : সুনারী গুলাইল বাঁশ/দুই দুইয়্যাবে দুইটি হাঁস। / হাঁস দেইখে দিলাম নুড় / কৈত্তর পাইলাম বত্রিশ জোড়া। ··

ফরিদপুর জেলার মাগনের গানকে বলে 'হুলোই' গান। একটি গানে : ছিয়া নড়ে ছিয়া নড়ে / ঝুপুঝুপাইয়া টাকা পড়ে। / একটি টাকা পাইবে। / বাইনা বাড়ী বাইরে / বাইনা বাড়ী ঘুঘুর বাসা,···

পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ডের আভীরদের গো-বন্দনার গীতকে বলে 'কপিলাগীত'। অমাবস্যার রাতে, মাদল বাজিয়ে যখন গৃহস্থের দুয়ারে আভীররা 'মাগনে' আসে, তখন গায় : খুঁজা খুঁজিতে আইল'/পূজা পূজিতে আইল'/গলাবাবু ঘর কতিধুর/বসিতে দেইত ভালা/ঝাঙ্গাঝরি মাচিলা/খাইতে দেয়ত গুয়া-পান। /অইরা কা ঘরে ভালা/ তুলসী কা পিঁড়া হো/উপরে ত উড়ে রাজার হাঁস।

তেমনি গানে পাখিকে রাজা বলা হয়েছে : তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো,/ পায়রা রাজা ঘুরি ফিরি খায় মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১২ : হরিনাথ ঘোষ)।

বিভিন্ন প্রকার ব্রতগানে ও ব্রত আলপনায় পাখির রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ও ভূমিকাতে এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য।

নবান্নের গানের মধ্যেও পাখির প্রসঙ্গ মেলে। ত্রিপুরা জেলা থেকে পাওয়া, ত্রিপুরী ভাষায় রচিত একটি নবান্নের গানে আছে[১], হাতাল হা কাথাম মতম ফরুছে / তকছা তগলা পুংগ, / জালাইহা কাথাম মতম ফরুছে / জালাইক তক-পোপো পুংগ। / মা লক্ষ্মী-ন রুঅ খানায়ছে / রোআই চুং নানায় ফাইঅ। / হাবা মাইচলাম কালাইমা বাগয় / তকথুছা কাংখুবুঅ।

অনুবাদ : দগ্ধ জুমের পোড়ামাটির গন্ধ যখন ছড়ায়, তখনই 'তকছা-তগলা' পাখি ডাকে। 'জালাই' টিলার নীচের সামান্য জলময় ভূমি -র পোড়ামাটির গন্ধ ছড়ালেই তকপোপো (হাঁড়িচাঁচা) পাখিরাও ডেকে উঠে। মা লক্ষ্মীর পুজো দেওয়া হচ্ছে শুনেই আমরাও আশীর্বাদ নিতে এসেছি। জুমে বীজধান বপন করা হলেই না ঘুঘু পাখিও (খুশিতে) ডানা ঝাপটায়।...

অবশ্য, এই গানে বিহঙ্গচারণার কোনো সূক্ষ্ম উপাদান নেই ।।

৬

লোককথার মধ্যেই পাখির নৃতাত্ত্বিক দিক সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে করি। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখায় পাখির ভূমিকাকে সাহিত্যিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করবার বিশেষ অবকাশ ও সুযোগ আছে ; কিন্তু লোককথায় পাখির ভূমিকাকে নৃতাত্ত্বিক দিক ছাড়া ব্যাখ্যা করবার সুযোগ তেমন নেই। এই অপরিহার্যতার জন্যেই লোককথায় পাখির ভূমিকা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে আলোচ্য।

---

১ গানটি শ্রীবিভূতি চৌধুরির সৌজন্যে পাওয়া গেছে।

রূপকথাই হলো লোককথার সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান শাখা ; রূপকথার কাহিনী নিয়ন্ত্রণে, মানুষের নিয়তি-নির্ধারণে, পাখিই বোধ হয় বড়ো স্থান গ্রহণ করেছে। নীতিগল্পে ও পশুপাখি নিয়ে রচিত গল্পে (Fables, Apologues), সাধারণ পশুকথায় Animal tales), মজার গল্পে (Amusing tales), ক্রমপুঞ্জিত লোককথায় (Cumulaive folk-tales পাখির ভূমিকা সামান্য নয়। পাখির সম্পর্কে Aetiological myth গুলোও নানা দিক থেকে আলোচ্য। Aetiological mythগুলো আমরা তাই স্বতন্ত্র-ভাবে সংকলিত করেছি। Didactive mythগুলোও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

গল্প কথার মধ্যে একদিকে আছে বক্তার বলে যাওয়া, অপরদিকে শ্রোতার শুনে যাওয়া। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে একমাত্র পাখিই অল্প-সল্প মানবিক ভাষা নকল করতে পারে, আর কোনো প্রাণীর এই ক্ষমতা নেই। স্বভাবতঃই, লোককথায় পাখিকে শুধুমাত্র বাক্‌শক্তি সম্পন্ন করাই হয় নি, তাকে গল্প-কথকের ভূমিকা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। মানবেতর অনেক প্রাণী এবং গাছপালাকে লোককথায় বাক্‌শক্তিসম্পন্ন দেখা যায় বটে, কিন্তু পাখির বাক্‌শক্তির কাছে তা বৈচিত্র্য, গভীরতা ও জটিলতাবিহীন বলে মনে হয়। বাক্‌শক্তির সঙ্গে পাখিকে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞতা বিচক্ষণতা এবং অজ্ঞাত অদৃশ্য নিয়তিকে দেখাবার ক্ষমতা। এতগুলো গুণ অন্য কোনো মানবেতর প্রাণীতে লোককথায় অর্পণ করা হয় নি।

সব পাখিকেই কিন্তু এইসব ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। 'খেমা-খেমী', 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী' এবং শুক' যেন এ বিষয়ে একটু গৌরবজনক পদ পেয়েছে। যদিও 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী' শব্দ দুটি 'বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী' শব্দজাত, যা নির্বিশেষভাবে যে কোনো বিহঙ্গই হতে পারে, তথাপি, মনে হয় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী এক নির্দিষ্ট ও সবিশেষ (এবং অবাস্তব) এক জোড়া পাখি। শুকের ভূমিকা সেই তুলনায় স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। শুকপাখি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত গৃহপালিত পাখিরূপে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়ে আসছে। উপরন্তু রাজসভার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যে এ পাখির এক নিবিড় যোগ দৃষ্ট হয়ে থাকে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের গল্পে তো শুককে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে। 'জাতকে'র কাহিনীতে যেমন প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য কথায় তেমনি গুরুত্ব লাভ করেছে 'শুক' পাখি। 'শুকসপ্ততি' প্রমুখ গ্রন্থের কথা এ বিষয়ে সকলেই স্মরণ করবেন। মুসলমান-প্রভাবিত উত্তর ভারতীয় লোককথায়, মধ্যযুগে, প্রাধান্য পেয়েছে 'তোতা' পাখি। 'তুতীনামা'র পারস্য কাহিনী এখন পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় কথা-সাহিত্যে যথেষ্টই মেলে।

কিন্তু 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী'র ভূমিকা একান্তভাবেই যেন বাঙলা রূপকথার। তাঁর 'Folk-literature of Bengal' বইতে দীনেশচন্দ্র সেন ঠিকই বলেছেন যে, 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী' বাঙলা রূপকথার নিজস্ব বিশেষত্ব। কিন্তু তার মানে অবশ্যই এ নয় যে, বাঙলা রূপকথায় অন্য কোনো পাখি নেই। অন্যান্য পাখির সঙ্গে 'শুক' পাখিও এখানে আছে।

প্রাচীন ভারতীয় কথা সাহিত্যে 'শুক' জুটিবিহীন, নিঃসঙ্গ পাখি। কিন্তু 'খেমা-

খেমী', ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী জোড়-বাঁধা বা জোড়-গাঁথা, সঙ্গী পাখি, যেমন স্বামী-স্ত্রী, পুরুষ-স্ত্রী তো বটেই। এক জোড়-গাঁথা পাখিরই প্রভাবে বাঙলা লোককথার 'শুক' পাখির সহচরী 'সারী' জুটেছে, 'শুক শব্দেরও তৎসম রূপের বদলে তদ্ভবরূপ 'সুয়া' এবং স্বরসঙ্গতিজাত রূপ 'সোয়া' মেলে। শুক-সারী-র ভূমিকা বঙ্গীয় লোককথায় খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। বৈষ্ণবের 'লীলাশুকবাদ এবং 'সুক-সারী'-প্রিয়তা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এক ব্যাপার।

বাঙলার লোককথায় যে 'তোতা পাখিকে মেলে তা একদিকে প্রাচীন ভারতীয় 'শুক' পাখির, অন্যদিকে উত্তর ভারতের মাধ্যমে পারস্য থেকে আগত 'তোতা পাখির সমান প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

আগেই বলেছি, 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' অবাস্তব, অনৈসর্গিক পাখি। এমন পাখি বাঙলার লোককথায় আর মেলে 'আফরাঙ্গা' পাখি,—পূর্ববঙ্গের একটি লোককথায় পেয়েছি। পাখিটির শব্দগত ব্যুৎপত্তি জানা যাচ্ছে না। 'রাঙ্গা' যদি বাঙলা শব্দ হয়, এবং 'জল' অর্থে ফারসী 'আব' জাত 'আফ' যদি হয়, তবেও এর কোনো সুস্পষ্ট অর্থ করে ওঠা যায় না। ব্রতকথার 'খেমা-খেমী সম্পূর্ণই অবাস্তব। এদের দেহটা পাখির মতো; কিন্তু মুখটা মানুষের মতো। মিশরের দেব-দেবীর মতো, অর্ধেক পাখি, অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ যাকে বলে Theriomorphic.

জোড়া-পাখি হিসেবে 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' গ্রন্থের 'আতাব-মাতাব' গল্পে 'সুখপাখি ও 'দুখপাখির' নাম পাই। লোককথায় পাখির এই প্রসঙ্গগুলো আমার চোখে পড়েছে:

১. মানুষের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ও রোগহরণের কারণ রূপে পাখি; মানব-ধাত্রী রূপে পাখি;

২. রাজা, রাজত্ব, রাজপাট; মণি-মুক্তো-হীরে-জহরৎ ও সোনা: সৌভাগ্য ও ধন-সম্পদের কারণ রূপে পাখি;

৩. আগুন, জল ও গাছের আসঙ্গে পাখি;

৪. প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, ত্রিকালদর্শী, ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, নিরপেক্ষ ও ন্যায়াবলম্বী পাখি; পাখি কেবল অজ্ঞেয়-দুর্জ্ঞেয় নিয়তি ও ভবিষ্যৎকে মানুষের কাছে স্পষ্ট করে নি, মানুষকে সেই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশও করেছে; অলৌকিকতা ও ঐন্দ্রজালিকতার অনুষঙ্গ;

৫. জোড়া-বাঁধা পাখি; এই জোড় স্ত্রী-পুরুষ বা দুই ভাইয়ের বা দুই সখার হতে পারে;

৬. রূপসী নারীর সংবাদ প্রদান এবং তাকে প্রাপ্তির পথ নির্দেশ; 'নারী-রূপা' পাখি;

৭. অভিশাপগ্রস্ত হয়ে অথবা অন্য কোনো ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার ফলে মানুষের পাখির রূপ ধারণ (Transformation); 'ঐন্দ্রজালিক যুদ্ধে' (Magic conflict) মানুষের পাখির রূপ ধারণ;

৮. পাখিকে দিয়ে গোটা গল্প বা গল্পাংশ বলানো ;
৯. অন্যান্য কয়েকটি বিশেষত্ব।[১]
একে একে প্রসঙ্গগুলোর স-দৃষ্টান্ত আলোচনা করছি।

লোককথায় মানুষের জন্ম-বিবাহ মৃত্যু ও রোগহরণের সঙ্গে পাখির নিবিড়-নিগূঢ় যোগ-সম্পর্ক দৃষ্ট হয়ে থাকে। প্রাচীন মানুষ মনে করত, এক-একটি গোষ্ঠীর সকলেই একই মাতা-পিতা থেকে উদ্ভূত এবং তাদের পূর্বপুরুষ বা পিতৃ-পুরুষ রূপে তারা পশু পাখি ও গাছ-পালাকে নির্দেশ করত। এমন করেই এরা তাদের 'টোটেমে' পরিণত হয়। পশু বা পাখিকে আদি পিতা বা মাতা রূপে বিশ্বাস থেকে সহজেই লোককথার নায়ক-নায়িকার জন্মের ও লালনের সঙ্গে পাখির প্রসঙ্গ এসে গেছে। পাখির ডিম থেকে মানুষের জন্ম অথবা পাখি কর্তৃক মানবশিশুকে লালন, তাই অনেক গল্পেই দেখা যাবে। পাখিলালিত শিশুকে একটি সাঁওতালি গল্পে 'জাতীয় বীর' হয়ে উঠতে দেখা যায়, আসলে পশু-পাখি কর্তৃক লালিত চরিত্রগুলোর এ একটি বিশেষত্বও বটে। চিল, ঈগল, হাঁস প্রভৃতি পাখিকে ধাত্রীর ভূমিকায় দেখা যায়। একটি কাশ্মিরী লোককথায় দেখি, একটি কাক এক কুম্ভকারের শিশুকন্যাকে হরণ করে তাকে লালন করতে থাকে এবং পরিশেষে এক রাজার সঙ্গে কন্যাটির বিয়ে হয় (Knowcls : Folk-tales of Kashmir 'pp, 29-31 'চিলুনী মা' (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত : 'শিশুভারতী', ২য় খণ্ড, পৃ ৫২৫-৫৩২ নামে একটি পূর্ববঙ্গীয় লোককথায় চিলকে স্নেহময়ী জননীর ভূমিকা নিতে দেখেছি। এখানেও কন্যার বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং চিল-জননী বিবাহিতা কন্যার গৃহকাজ গোপনে করে দিয়েছে।

রাজশকুন-কর্তৃক লালিত এক যমজসন্তানের কথা সাঁওতালি লোককথায় মেলে (Folk-lore of the Santal Parganas : London, David Nutt, 1909, By C, H, Bompus, pp, 289-292),

তেমনি, পাখির ডিম থেকে নায়িকার জন্ম হতেও দেখি। শ্বেত-বসন্তের কাহিনীতে (Folk-tales of Bengal : The Rev, Lal Behari Dey, pp, 93-107)নায়িকার জন্ম হয়েছে একটি টুনটুনি পাখির ডিম থেকে। এই প্রসঙ্গে ব্রতকথা-র উল্লেখ করা যায়। জিতাষ্টমীর ব্রতকথায় আছে, রাণী স্বপ্ন দেখলেন, হাঁসের পিঠে চড়ে কে একজন তাঁকে বললেন, জিতাষ্টমীর ব্রত করলে তিনি সন্তানবতী হবেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুতিবাহন (দ্যুতিবাহন) দেবতাকে প্রসন্ন করবার জন্যে ওড়িশাতে যে 'দুতিয়া ওসা'র গল্প-কথা চলিত আছে তাতে দুই বোন রূপে চিল শকুনকে মেলে। এখানেও সন্তান কামনার প্রসঙ্গ আছে। সন্তান কামনার সঙ্গে পাখির এই যোগাযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র অন্তর্গত 'মধুমালা' গল্পে দেখা যায় রাজা সপ্তব্যঞ্জন সহযোগে

---

১ An outline of Indian folklore (Popular Book Depot, Bombay-7, March 1958. P. 37) গ্রন্থে শ্রীমতী দুর্গা ভগত ভারতীয় রূপকথার যে ক'টি 'মোটিফ' পেয়েছেন, তার মধ্যে দুটি এই : ক, The parrot brings the fruit of immortality : খ. The bird emitting gold .

'সোনার পাখি'র মাংস খেয়ে পুত্রের পিতা হলেন। তেমনি বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রথম গল্পেই : এখানে ন' রাণীর গর্ভে এক পেঁচা হয়েছে। এই পেচক সন্তানের নাম ভূতুম। অর্থাৎ পাখি থেকে মানুষ এবং মানুষের গর্ভে পাখি, দুই-ই ঘটেছে।

নায়কের বিয়ের দিনে পাখির ভবিষ্যদ্দর্শনের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বিয়ের দিন যে বিপদ এগিয়ে আসে, পাখিই তা দেখতে পায়। যেমন, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কুঁচবরণকন্যা।' পৃ. ৫৭-৬৬) গল্পটিতে। এই গ্রন্থেই 'এড়ী ও সোহাগী' (পৃ. ১১-১৯) গল্পে দেখি, সোহাগী তার সতীন-কন্যা (এড়ী মেয়ে-র বিয়ে উপলক্ষে গায়ে-হলুদের দিন গলায় একটা "মাদুর তাবিজ" বেঁধে দিতেই সে টিয়ে হয়ে উড়ে গেল। আদিম সমাজে বিবাহাচারের মধ্যেও তাই পাখিকে লক্ষ করা যায়। হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পক্ষীই সেখানে পণ ও যৌতুক রূপে গৃহীত হয়। বাঙালীর বিবাহের পিঁড়িতে এখনো কোনো-কোনো অঞ্চলে পাখির প্রতিকৃতি আঁকা হয়।

বহু লোককথায় পাখির মধ্যে রোগহরণের দুর্লভ গুণকে লক্ষ করা হয়েছে। পাখিকে এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী রূপে বিশ্বাস থেকে এটি এসেছে। বাঙলা-দেশের পশ্চিম অংশে প্রচলিত একটি লোককথায় দেখি, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর বিষ্ঠা প্রয়োগ করে রাজপুত্রকে নীরোগ করা হলো। গল্পটি লালবিহারী দে তাঁর গ্রন্থে Folk-tales of Bengal : The story of prince sabir, pp. 124-137) সংকলিত করেছেন। এই গ্রন্থেরই আর একটি গল্পে (The story of a Hiraman, pp. 209-225) ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর শাবকের দেহ-নিঃসৃত গুপ্ত পদার্থ দ্বারা রাজার অন্ধত্ব মোচন করা হয়েছে। নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে পাখির মাংসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

রাজা, রাজসভা ও রাজত্বের সঙ্গে পাখি জড়িয়ে আছে। নীতিমূলক গল্প-গুলোতে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চড়ুই, টুনটুনি ইত্যাদি ক্ষুদ্র পাখিকে পাই, যারা সবাই রাজাকে জব্দ করে গেছে (দ্রঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : টুনটুনির বই)। কখনো বা রাজা পাখির ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছেন ; কখনো কোনো গায়ক পাখির ডাক শুনে মুগ্ধ হয়ে ভুলক্রমে অগায়ক পাখিকে খাঁচাবন্দী করে নাকাল হয়েছেন ('লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা, পৃ.৩৬-৩৮। এবং : The Indian Antiquary, February, 1903, P. 99 ; The Indian Antiquary, January, 1920, p.p. 11-12 ; The Indian Antiquary, July, 1924. P. 1 ; North Indian Notes and queries : August 1893. P. 83-84 ; October, 1893, P. 119).

উত্তরভারতে বিশ্বাস করা হয় বিভিন্ন ধরণের পাখি রাজার প্রাসাদ প্রহরা দেয় : In the Popular follk-lore of Northern India, various kinds of birds are supposed to guard the Palaces of Rajas. In one version of lhe legend of Rasalu. five peacocks, eight ospres and nine water fowls

keep watch and ward over Queen Koklan's palace Some suppose that these birds are, in reality, men of different tribes. (Swynnerton · 'Raja Rasalu', Calcutta edition, 1884, pp. 219-220).

শীত বসন্তের কাহিনীটি লালবিহারী দে ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত করেছেন। উত্তর ভারতেও গল্পটি চলিত আছে; এর চারটি মুসলমানী পাঠও মেলে বাঙলায়। প্রত্যেকটিতেই রাজা হবার জন্যে পাখির ভূমিকা আছে। গোলাম কাদের সংকলিত সংস্করণে (আফাতুদ্দিন আহমেদ প্রকাশিত, ১৫৫-১ মস্‌জিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলকাতা) দেখা যায়, এতে পাখির কলজে খেয়ে রাজা হবার কথা আছে। উত্তর-ভারতীয় সংস্করণেও (North Indian Notes and Queries, August 1892, pp 81-82) পাখিরাই রাজা হবার সংবাদ দিয়েছে। এখানে পাখি দুটি হলো—টিয়ে ও ময়না।

'ন্যগ্রোধজাতকে' (ঈশানচন্দ্র ঘোষ: জাতক, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৩৪, সং ৪৪৫) এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবৃতি আছে। লোকচরিত্র জানবার জন্যে ন্যগ্রোধকুমার, শাখকুমার এবং পোত্তিক যখন নানা জনপদে বিচরণ করছিলেন, তখন একদিন তাঁরা একটি গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রত্যূষকালে পোত্তিক শুনতে পেল: সেই গাছের কুক্কুটেরা কলহ করছে। একটি কুক্কুট বলল, যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করে তার মাংস খাবে, সে ব্যক্তি প্রাতঃকালেই সহস্রমুদ্রা পাবে। অপর কুক্কুট তখন বলল যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করে তার স্থূল মাংস (=চর্বি?) খাবে, সে প্রাতঃকালেই রাজা হবে। যে ব্যক্তি মধ্যম মাংস খাবে, সে সেনাপতি হবে; যে অস্থিসংলগ্ন মাংস খাবে সে ভাণ্ডাগারিক হবে। এই উক্তি পালন করতেই পরদিন ন্যগ্রোধকুমার রাজা এবং শাখাকুমার সেনাপতি হলেন; এবং পোত্তিক হলো ভাণ্ডাগারিক।

রাজ-প্রতিবেশের ফলেই সোনা-রুপো, হীরে-জহরতের কথা ওঠে। এ বিষয়ে সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলো, রাজহংসকে (Swan) সোনা বা রুপোর শেকল দিয়ে জড়াবার বা বন্দী করবার প্রসঙ্গ: (Motifটি স্টিথ টম্‌সনের অভিধান অনুসারে D 536. 1.) গ্রীম-ভ্রাতৃদ্বয়ের গল্প-সংগ্রহের 'The six swans' গল্প এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। হুগলি জেলার তারকেশ্বর অঞ্চলের জনাব মুস্তাফা নাশাদ-এর কাছ থেকে সংগৃহীত 'কুকুমাতা' নামে একটি গল্পে (A comperative study of a Bengal Folk tale: Ralph Troger, pp. 90-96) দেখি, বিমাতার মন্ত্রগুণে কুকুমাতা একটি টিয়ে পাখি হয়ে তার স্বামীর বাড়ীর কাছে, রাতের বেলায় গাছে বসে হাসছে এবং কাঁদছে: তারই ফলে মণি-মুক্তো ঝরে পড়ছে। 'জাতকে'র গল্পের 'সুবর্ণহংসজাতক'-টিতেও সোনার প্রসঙ্গ আছে।

জল, আগুন ও গাছ—নৈসর্গিক জগতের এই তিনটি দিক পাখির সঙ্গে সম্পৃক্ত। জল ও আগুনের সঙ্গে পাখির সম্পর্কের কথা ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ ও গানেও দেখেছি। সৃষ্টিতত্ত্বমূলক কাহিনীগুলোতে পাখির সঙ্গে জলের সম্পর্ক স্পষ্টীকৃত হয়েছে। পাখির

সঙ্গে গাছের সম্পর্ক লোককথায় দু-ভাগে দেখা যায় : পাখির আশ্রয়স্থল গাছ, এইজন্যে স্বাভাবিক কারণেই গাছের কথা এসে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক লোককথায় 'গাছচালনা' বা গাছকে পাখির মতো উড়তে দেখা যায় ; সেখানে গাছ ও পাখি একাকার হয়ে গেছে। কেবল পাখির আশ্রয়স্থল রূপেই গাছের প্রসঙ্গ আসে নি ; 'ট্রি-কাল্ট' এবং টোটেম রূপে গাছকে স্বীকৃতি জানানো ছাড়াও এর মধ্যে আছে গাছের পাতার সঙ্গে পাখির পালকের সাদৃশ্য : কোনো কোনো লিপ্তপাদ পক্ষীর সুপ্তিকালে একপায়ে দাঁড়ানো, গাছ যেমন একপায়ে দণ্ডায়মান থাকে : পত্র শোভিত বিশেষ সুষমামণ্ডিত গাছকে পেখম-মেলা ময়ূর বলে মনে হওয়া : গাছের পাখির পাখাবৎ মনে হওয়া, ইত্যাদি। জাতকের গল্পে বৃক্ষদেবতার কথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। বাঙলা লোককথায় পাই 'সত্যের গাছ,' নায়ক বা নায়িকার সংকটকালে আপন গহ্বরে এ গাছ তাদের ঠাঁই দিয়েছে, কখনো বা সংকটের মোচনে সাহায্য করেছে। 'সত্যে'র প্রতীক গাছ এবং 'সত্যদ্রষ্টা পাখি' এই দুইয়ে মিলে এক নতুন তত্ত্বের আভাস আনে। সত্যপীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক লোকবথাগুলোতে কিংবা ইসলামী গল্পগুলোতে দেখি, মন্ত্রপড়া গাছ পাখির মতো উড়ে চলে। অপর উদাহরণ, 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' গ্রন্থের "দুঃখিয়ার কিসসা" (পৃ: ৯-১০)।

নায়ক-নায়িকার আসন্ন বিপদের কথা পাখিরাই জানিয়েছে। পাখির বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা এতে পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু বিপদের উল্লেখই নয়, বিপদের থেকে উদ্ধারের পথও নির্দেশ করেছে, এতে পাখির দৃষ্টিশক্তির গভীরতার পরিচয় মেলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অযাচিত রূপে এই উপদেশ-নির্দেশ মেলে, ক্বচিৎ নায়ক-নায়িকাকে সমস্যা সমাধানের পথ ও পদ্ধতি যাচ্ঞা করতে দেখা যায় ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বাঙলা লোককথায়, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীকে কথোপকথন রত দেখা যায় নিশীথ রাতে, গাছের ওপরে, —নীচে তখন নির্ঘাৎ সমস্যাকাতর নায়ক-নায়িকা জাগ্রত বা অর্ধজাগ্রত ; কখনো বা অন্য নামের কোনো পাখিকে। যেখানে একটি পাখি থাকে, সেখানে পাখিটি পুরুষ হয় এবং গাছকে উদ্দেশ করে পাখি তার বক্তব্য বলে। যেখানে দুইটি পাখি থাকে, সেখানে পাখি দুটি হয় স্বামী স্ত্রী, নয় ভাই-বোন, নয় ভাই-ভাই, নয় দুই সখা। আমার চোখে এখন পর্যন্ত স্ত্রী পাখিকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ধরা পড়ে নি। সহচর,—তা সে স্বামীই হোক বা সহোদরই হোক,—ছাড়া স্ত্রী পাখিকে দেখা যায় না। স্ত্রী পাখি কেবলই প্রশ্ন করে যায়, পুরুষ পাখিই উত্তর দিয়ে যায়। এইজন্যে স্ত্রী পাখি নিষ্ক্রিয়, পুরুষ পাখি সক্রিয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রীমের গল্প সংগ্রহের (Grimms' populor stories, Oxford University Press, 1909 P. 194 'Faithful John' গল্পটি এবং লালবিহারী দে সংকলিত 'Phakir chand' গল্পটি নাম করা যায়। জন-এর কাছে এসে তিনটি দাঁড়কাক (Ravens রাজার ভবিষ্যৎ বিপদসম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেমন 'ফকির চাঁদ' গল্পে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর আলাপনে। ভারতীয় গল্পে পাখির সংখ্যা এ ক্ষেত্রে হয় এক বা

দুই হয়, ইউরোপীয় গল্পে এখানে 'তিন'কে মেলে। অবশ্য, যে কাকচরিত্র নিয়ে ভারতে একটি শাস্ত্র পর্যন্ত গড়ে উঠেছে, সেখানে দাঁড়কাককে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা রূপে দেখায় ইউরোপ নতুনত্বের কোনো পরিচয় দেয় নি।

'ঠাকুরদাদার ঝুলি-'র 'পুষ্পমালা'তে পুষ্পমালা তার বিপদ ও সমস্যার কথা শুক-সারীকেই বলেছে।

লোককথায় পাখিই পুরুষকে রূপসী নারীর সংবাদ দিয়েছে। ক্বচিৎ নারীকে পুরুষের পরিচয় ও সংবাদ দিয়েছে। এই ধারার প্রচীনতম নিদর্শন সম্ভবতঃ মহাভারতের নলদময়ন্তীর উপাখ্যান। রাজা নল এবং দময়ন্তীর মধ্যে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে পরিচয় স্থাপন করিয়েছে একটি হাঁস। উত্তরভারতীয় এবং বঙ্গীয় গানে ও শ্লোকেও এ ব্যাপার দেখা যায়। উত্তরভারতীয় লোক-কাহিনীটি এই : বিয়ের পর জনৈক স্ত্রীলোক শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছে ; যাবার বেলায় তার প্রাক্তন প্রণয়ীকে দেখা করবার স্থান-কাল জানিয়ে গেল ইঙ্গিতে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রণয়ী এসে প্রেমিকাকে না দেখতে পেয়ে নিকটস্থ শুকপাখিকে কন্যের উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করতে শুকপাখি ইঙ্গিতে কন্যের প্রস্থানের কথা জানায় (The Parrot's Reproof: The Indian Antiquary, March 1926, P 56). পূর্ববঙ্গ থেকে এই কাহিনীর যে সংস্করণ পাওয়া গেছে (লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ,' পৃ ৫৮-৫৯) তাতে শুকের বদলে বকের নাম পাই।

মুসলমান প্রভাবিত মালতীকুসুমমালার কাহিনীতে নায়িকার সংবাদ বহন করেছে রাজহংস। পুরুষকে রূপসী নারীর সংবাদ ও উদ্দেশ জানানোর উদাহরণ হিসেবে 'Folk tales of Bangladesh' গ্রন্থের 'The story of the Pine-apple girl' এবং 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' গ্রন্থের 'একতোলা কন্যা' গল্প দুটি উল্লেখ্য।

এই প্রসঙ্গে 'পক্ষি-নারী'র কথা ওঠে। পাখিই পুরুষের কাছে নারীর সংবাদ দিয়ে যেন নিজেই নারী হয়ে গেছে। এইভাবে লোককথায় 'Swan maiden type' বা 'হংসকুমারী গল্পধারা' নামে বিশ্ববিস্তৃত এক গল্প-প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমতী M. R. Cox An Iutroduction to folk-lore, New edition London, David Nutt, pp. 120-121), শ্রীমতী C. S. Burnes (The Handbook of folk-lore, 1914, P. 344), E. A. Armstrong (The Folk-lore of birds, collins: St. Jame's place, London, 1958) প্রভৃতি সুন্দর আলোচনা করেছেন। ইউরোপ ও এশিয়ার 'Swan culture' থেকে Bird-maiden, বা 'পক্ষি-কুমারী'র ধারণা গড়ে উঠেছে। ভারতের পুরূরবা-উর্বশীর গল্পই হংসকুমারী গল্পধারার প্রচীনতম নিদর্শন এবং কারো কারো মতে, ভারত থেকে এই ধারা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ই, এ. আর্মষ্ট্রং অবশ্য মনে করেন, উত্তর ইউরোপের সাইবেরিয়ার এক এক জাতি, The Buriats, তারাই 'হংসকুমারীতত্ত্ব'র প্রবর্তক।

'Bird-maiden' বা পক্ষিকুমারীরা পৃথিবীর নানাদেশে নানা পাখির রূপ ধরে। ফিনল্যাণ্ডে হয় 'হংসী দল' বা 'হংসী' ; বোহেমিয়া, পারশ্য এবং সেলেবিস দ্বীপে হয়

'ঘুঘু' ; দক্ষিণ স্মল্যাণ্ডে হয় 'পারাবত' ; গিনি দ্বীপে এবং আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে হয় 'শকুন'।

ইন্দ্রজাল প্রভাবিত বা অভিশাপগ্রস্ত কিংবা শোকে সন্তপ্ত হয়ে মানুষের পাখিতে রূপ নেওয়া লোককথায় বহুশঃ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রজাল-প্রভাবিত হয়ে নারীই পাখিতে পরিণত হয় বেশি, এবং কোনো আকস্মিক শুভলগ্নে সে মন্ত্রের শক্তি বিনষ্ট হলে পাখি পুনরায় নারীতে পরিবর্তিত হয়। বাঙলা লোককথায় দেখি, মন্ত্রপড়া শেকড়-বাকড় উদ্দিষ্টা নারীর মাথায় বা দেহে গুঁজে বা বেঁধে দেবার ফলেই সে পাখি হয়ে যায়, কোনো একদিন সে মন্ত্রপূত শেকড় সারয়ে নিতেই আবার তার পূর্বমূর্তি ফিরে আসে অর্থাৎ মানবরূপে রূপান্তর ঘটে। আসলে একই মানুষের একাধিক আত্মায় এবং সে আত্মার বিচ্ছেদ্যতায় ও বস্তুরূপতায় যেমন আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল, তেমনি একই দেহের বিভিন্ন রূপকেও তারা স্বীকার করত। আত্মা যেমন বাহিরের (external) একটি পদার্থরূপে এবং তার রূপান্তর গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে স্বীকৃত ছিল, দেহও তেমনি। দেহ ও আত্মার এই বোধের ফলে লোককথা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে।

উদাহরণ দিই। কাহিনীর প্রয়োজনে নায়ককে স্বেচ্ছায় পক্ষিমূর্তি ধারণ করতে দেখি 'Folk-tales of Bangladesh' গ্রন্থের 'The story of the Pine-apple girls' গল্পটিতে। একটি সত্যপীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনীতে দেখি খল চরিত্রের ভ্রাতৃবধূর (মদন এবং কামদেবীর স্ত্রীগণ) তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেবর সুন্দরকে মন্ত্রদ্বারা শুক পাখিতে পরিণত করে উড়িয়ে দিচ্ছে। কাহিনীর পরিণতিতে এই শুকপাখি একটি ভূমিকা নিয়েছে এবং তার মানবরূপ ফিরে পেয়েছে। শ্বেতবসন্তের কাহিনীর যে পাঠ 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে মেলে, তাতে দেখি সুয়োরাণী চুল বাঁধবার অছিলায় দুয়োরাণীর মাথায় এক মন্ত্রপড়া শেকড় বেঁধে দিল, যার ফলে সে একটি টুনটুনি পাখি হয়ে গেল। তারকেশ্বর থেকে পাওয়া 'কুকুমাতা' নামে যে গল্পটির কথা আগে উল্লেখ করেছি, তাতেও আছে, বিমাতা ঈর্ষাবশতঃ সপত্নীকন্যার চুলে শেকড় বেঁধে তাকে পাখিতে পরিণত করে দিল। সর্বক্ষেত্রেই এক পরিণতি ও এক পরিস্থিতি : সৎ নায়িকাকে অসৎ নায়িকায় পাখি করে দেওয়া এবং পরিশেষে তার মনুষ্যরূপ ফিরে পাওয়া।

দেহের এই রূপান্তর ধারণ, আগেই বলেছি, আত্মার রূপান্তর ধারণের ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের আত্মা দেহ থেকে বহির্গত হয়ে অন্য কোনো প্রাণী বা বস্তুর আকার ধারণ করতে পারে, প্রাচীন মানুষের এ বিশ্বাস খুবই বলবতী ছিল। ওই প্রাণী বা বস্তুকে বিনষ্ট করলেই দেহেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। লোককথায় এই ধারণাটির কিঞ্চিত অধঃপতন লক্ষিত হয়ে থাকে। অধঃপতন এই অর্থে যে, এখানে কেবল ডাইনী বা রাক্ষসীর প্রাণ বা আত্মাকেই এমনভাবে দেখানো হয়েছে,—সকল মানুষের বা সৎ আত্মার গমন পরিবর্তন প্রদর্শিত হয় নি, অন্ততঃ এখন পর্যন্ত তা আমার চোখে পড়ে নি।

এ বিষয়ের উদাহরণ খুব দুর্লভ নয়। একটি ভালো উদাহরণ হলো—'সাত সেকরার কথা' (হিন্দুস্থানী উপকথা : সীতাদেবী ও শান্তাদেবী অনূদিত, পৃ. ৮২-৯৫)। এই গল্পের নায়ক রাজকুমার রাক্ষসদের রাজ্যে উপনীত হয়েছেন, বুড়ী রাক্ষসীর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক পাতানোয় রাক্ষসী তার কাছে তাদের প্রাণের রহস্য খুলে বলেছে : "এই পাখিগুলো আমাদের প্রাণ। এরা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন আমরা কিছুতেই মরব না।···এই দাঁড়কাকটা আমার প্রাণ, ঐ টিয়েটা তোমার মামার, আর ঐ ময়ূরটা তোমার মায়ের প্রাণ।" রাজপুত্র এই পাখিগুলো হত্যা করতেই সংশ্লিষ্ট রাক্ষস রাক্ষসীদের মৃত্যু হলো। এই পাখিগুলোই ছিল রাক্ষসদের 'Life-spring' বা 'Life-token' বা 'Life-index' অর্থাৎ 'প্রাণপ্রতীক'।

গুলে-বাকাওলী গল্পে (কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী গ্রন্থে) আছে, নায়ক তাজুল মুলুক্-কে বাকাওলী পরী দিনের বেলায় তোতা পাখি বানিয়ে সোনার খাঁচায় রেখে দিত, রাতে মানুষ করে আমোদ-স্ফূর্তি করত। ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটেছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'সোনারকাঠি ও রূপার কাঠি'তে। এখানে রাক্ষসীর প্রাণ শুক পাখিতে আবদ্ধ ছিল।

'The story of the Koonch Baran Kanya'তে (Folk-tales of Bangladesh' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ডাইনীর প্রাণ যে পাখিটিতে আবদ্ধ থাকত, তার নাম বলা হয় নি। এটি মুক্ত পাখি নয়, খাঁচার পাখি। এটিকে হত্যা করতেই ডাইনীও নিহত হলো।

দেহ ও আত্মার এই রূপান্তর ধারণের বিশ্বাসের সঙ্গে লোককথায় পক্ষি-ঘটিত একটি Motif পাওয়া যায়, 'Magic conflict' নামে কথিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, দুই যযুধান ব্যক্তি পর পর, প্রতিযোগিতা করে, রূপ থেকে রূপান্তর ধারণ করছে: এই রূপান্তর ধারণের মধ্যে আছে, কোনো কোনো সময়ে, নানারকম পাখি। 'ময়নামতীর গানে' বা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' বা 'গোপীচন্দ্রের গানে' গোদাযম এবং ময়নামতীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে এই মোটিফ্-টি অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। শরৎচন্দ্র মিত্র এ বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা করেছেন (The 'Magic conflict' in Santali, Bengali, and Ao Naga folk-lore : Man in india, Vol. IX, June-Sept. 1929, No.s 2 + 3, pp. 173-180).

C. H. Bompus সংকলিত 'Folk-lore of the Santal Parganas' (London : David Nutt,1909) বইয়ের The boy who learnt magic' (pp. 134-138) গল্পে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এই যাদুময় দ্বন্দ্ব চলেছে। গুরু—সীতারি যোগী—প্রথমে চিতাবাঘ হয়ে শিষ্যকে বধ করতে চাইলে শিষ্য তখন পারাবতের রূপ ধরে উড়ে পালালো। গুরু তখন হলো বাজ। শিষ্য এবার হলো মাছি, গুরু বক হয়ে তাকে তাড়া করলে। শিষ্য মাছির রূপ ধরে রাণীর ভাতের থালায় গিয়ে বসল। রাণী সব ভাত মাটিতে ছড়িয়ে দিলে, শিষ্য তখন একটি প্রবাল হয়ে রাণীর কণ্ঠহারে লুকিয়ে রইল। এদিকে পারবতের রূপ ধরে সব কটি ভাত খুঁটে খেয়েও গুরু শিষ্যকে মারতে

পারলো না। রাণী কণ্ঠহার ছিঁড়ে ফেললে গুরুরূপী পারাবত তা ঠুকরে খেতে লাগলো। শিষ্য তখন প্রবাল রূপ পরিত্যাগ করে একটি বিড়াল হল এবং পারবতরূপী গুরুকে হত্যা করলো। আও নাগাদের মধ্যে চলিত একটি গল্পেও এই 'মটিফ' দেখা যায় (The Ao Nagas : London, Macmillan and Co, Ltd, 1926 By J. P Mills. P. 318).

এই 'Magic conflic' সম্পর্কে W. A. Clowston তাঁর বইতে (Popular tales and fictions : Edinburgh and London, William Black Wood and sons, 1887; Vol. I, pp. 413-460) দীর্ঘ আলোচনা করে পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন রূপ ধারণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন (p. 439) : Norse Danish, Welsh, Kalmuk এবং তামিল গল্পে পাখি এবং বাজ পাখির রূপ নিতে, Italian, Norse, Albanian এবং তামিল গল্পে মুরগীর রূপ নিতে লক্ষ্য করা যায়।

আসলে, এর পেছনে যাদু-বিশ্বাসই কর্যকরী হয়েছে। পাখির পালক নিয়েও কোনো কোনো গল্পে যাদুবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরী পাখা নাড়লেই বিদেশস্থ রাজকুমারের এসে পড়া।

বিভিন্ন নীতিগল্পের ও নিছক আমোদ-কৌতুকের গল্পে পাখি বেশ বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত লোককথাগুলোতে (Cumulative folk-tales, Accumulation drolls) প্রায় সর্বত্রই পাখিকে দেখা যায় বলে, একদা এই প্রশ্ন উঠেছিল : পাখি কি 'ক্রমপুঞ্জিত লোককথা'র পক্ষে অপরিহার্য? বলা বাহুল্য, বেশির ভাগ 'ক্রমপুঞ্জিত লোককথা'য় পাখিকে দেখা যায় বটে, কিন্তু পাখি ছাড়াও 'ক্রমপুঞ্জিত লোককথা' মেলে॥

৭...

জাতকের গল্প, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্প, ঈশপের গল্প, ও আরব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে পাখির ভূমিকা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করছি। এই কথাসাহিত্য খাঁটি লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হয় না, অথচ, লোক-সাহিত্যের কোনো কোনো অংশের সংগে এদের যোগাযোগও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এই সব 'কথা'য় পাখি সম্পর্কে ওপরে লক্ষিত ও আলোচিত Motif-গুলোই ধরা দিয়েছে, নতুন Motif প্রায় নেই বললেই চলে।

জাতকের গল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন জন্মে নানা পক্ষিরূপে জন্ম নেয়া। কয়েকটি উদাহরণ এই : ময়ূর রূপে ময়ূরজাতক (সং ১৫৯), বাবেরু জাতক (সং ৩৩৯)। গৃধ্ররূপে : গৃধ্রজাতক (সং ১৬৪, ৩৯৯, ৪২৭)। বর্তক পাখিরূপে : শকুনীজাতক (সং ১৬৮), বর্তকজাতক (সং ৩৯৪)। শুকপাখি

রূপে ঃ রাধাজাতক (সং ২৯৮)। উদককাক বা পানকৌড়ি রূপেঃ বীরকজাতক (সং ২০৪)। কাষ্ঠকুট্ট বা কাঠঠোকরা, কন্দগলকজাতক (সং ২১০), জবশকুনজাতক (সং ৩০৮)। পারাবতরূপেঃ কাকজাতক (সং ৩৯৫, কপোতজাতক (সং ৩৭৫)। কুক্কুটরূপে ঃ কুক্কুটজাতক সং ৩৮৩)। সুবর্ণ হংসরূপে ঃ পলাশজাতক (সং ৩৭০), মেরুজাতক (সং ৩৭৯)। 'ধর্মধ্বজজাতকে' (সং ৩৮৪) বোধিসত্ত্ব পক্ষি-যোনিতে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু কি পাখি তা বলা নেই। তেমনি, 'কুটীদূষক জাতকে' (সং ৩২১), তিনি "শৃঙ্গিল বিহঙ্গ যোনি"তে জন্ম নিয়েছেন বলে কথিত হয়েছে, কিন্তু এ পাখির পরিচয় জানা যায় নি।

বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন পক্ষিরূপ ধারণে একটি সত্য পরিস্ফুট হয়েছে ঃ দেহ রূপান্তরিত হতে পারে। সব জাতকের মধ্যে যে প্রসংগগুলো ধরা পড়েছে আমার চোখে তা এই :

১. সুবর্ণহংস ও ময়ূরের প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা পোষণ করা হয়েছে ; কাকের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে একাধিক বার ;

২. পাখির সংগে রাজ প্রতিবেশ এখানেও মেলে ;

৩ পাণ্ডিত্য ও মনীষার সংগে পাখি যোগ এখানেও লক্ষ্য করা যাবে ;

৪. পাখীর অনুসংগে এখানেও সাপ, গাছ, ধন ও ধান্য মেলে।

সুবর্ণহংসরূপে বোধিসত্ত্ব যতোবার জন্ম নিয়েছেন, সব বারই তিনি ধীর, স্থির, ব্যক্তিত্বশালী এক রাজা হয়ে জন্মেছেন। 'খুল্ল হংসজাতকে' (সং ৫৩৩) তিনি ধৃতরাষ্ট্র হংসকুলের রাজা রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। ব্যাধের পাশে আবদ্ধ হয়েও সংযত ব্যবহার করেছেন। হংসরাজ ও হংসসেনাপতি দু জনেই ব্যাধের সংগে রাজার কাছে এলেন, ব্যাধকে ধন-সম্পত্তি পাইয়ে দিলেন। 'মহাহংসজাতকে' (সং ৫৩৪) এই একই কথাই আছে। তবে, এখানে বারাণসী রাজের অগ্রমহিষী ক্ষেমাদেবী স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি এক সুবর্ণহংসের কাছে ধর্মকথা শুনছেন। এতে পাখির পাণ্ডিত্যই প্রমাণিত হয়েছে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণেরা বলেছেন ঃ কোনো কোনো বিশেষ জাতীয় মাছ, কর্কট, কচ্ছপ, মৃগ, ময়ূর ও হংস (পরবর্তী একটি জাতকে, 'মহাময়ূরজাতকে (সং ৪৯১) তিতির পাখির নামও এই সংগে উল্লিখিত হয়েছে)—এইসব তির্যগ্‌গণ সুবর্ণ বর্ণ। এর মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রকুলজাত হংসগণ সুপণ্ডিত ও জ্ঞানবান। সুত্রনিপাতের অর্থকথায় বুদ্ধ ঘোষ ছয় রকম হাঁসের উল্লেখ করেছেন ঃ হরিৎ, তাম্র, ক্ষীর, কাল, পাক, ও সুবর্ণ। আলোচ্য জাতকের কাহিনীতে দেখা যায়, পাক-হংসরাজের কন্যা 'হেমবর্ণা'। দেখা যাচ্ছে, হংসরাজের মধ্যে রাজাসুলভ সব বিশেষত্ব এবং স্বর্ণ-প্রতিবেশ আরোপিত হয়েছে। 'জবনহংস জাতকে', (সং ৪৭৬) দেখা যায় মহাসত্ত্বরূপী হংসরাজ সূর্যের গতির সংগে প্রতিস্পর্ধিতা করেছেন। 'হংসজাতকে'ও (সং ৫০২) ক্ষেমাদেবী এই একই স্বপ্ন দেখেছেন।

'মহাময়ূর জাতকে' (সং ৪৯১)-ও বোধিসত্ত্ব সুবর্ণদেহী ময়ূর হয়েছেন। এখানেও বারাণসী রাজের অগ্রমহিষী ক্ষেমাদেবী স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি যেন এক সুবর্ণবর্ণ ময়ূরের

কাছে ধর্মোপদেশ শুনছেন। পূর্বোল্লিখিত 'মহাহংসজাতকে'র মতো এখানেও রাজা ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করলে, ব্রাহ্মণেরা হংস, ময়ূর ও তিতিরকে সুবর্ণবর্ণ বলে উল্লেখ করেন। এই জাতকের উল্লেখযোগ্য অপর দুটি বিষয় এই : হিমবন্তের মহাময়ূরকে পুরুষানুক্রমেও কেউ ধরতে পারল না, কারণ প্রতিদিন মহাময়ূর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে সূর্যের বন্দনা করে সূর্যের আশীর্বাদে এক বিশেষ শক্তি অর্জন করেছিল। সূর্যের সঙ্গে ময়ূরের যোগ অন্য বহু লোককথায় উল্লিখিত হয়েছে। সূর্যের সাত রং ময়ূর-পাখায় প্রতিবিম্বিত। যে হাঁস ও ময়ূর জাতকে সবচেয়ে শ্রদ্ধান্বিত, সেই দুটির সঙ্গেই সূর্যের আসঙ্গ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অপর বিষয় হলো : হিমবন্তের চতুর্থ পর্বতরাজিতে বিচরণশীল এই ময়ূর সম্পর্কে একটি রাজ-ঘোষণা : এই ময়ূরের মাংস খেলে মানুষ অজর ও অমর হবে। যদিও একটি উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে একথা বলা হয়েছে, তথাপি, এটি উপেক্ষা করবার মতো নয়।

'ত্রিশকুনজাতকে' (সং ৫২১) রাজপ্রতিবেশ স্পষ্ট হয়েছে। এখানে পেচকের পুত্র 'বিশ্বন্তর' হয়েছে 'মহাসেনাগোপ্তা' ; শারিকার কন্যা 'কুন্তলিনী' হয়েছে ভাণ্ডাগারিক' ; এবং শুকীর পুত্র 'জম্বুক' হল 'সেনাপতি' ; পরে তাকেই রাজারূপে মনোনীত করা হয়েছে, কারণ, শুকীর পুত্র 'জম্বুক'ই স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। লক্ষ্য করবার বিষয় এই, পেচকের প্রতি বিরূপ মনোভাব নেই ; তিনটি পাখির সন্তানই রাজকর্মচারী হয়েছে। এবং শুকীর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবের দরুণ, তার পুত্রকেই বোধিসত্ত্ব এবং রাজারূপে নির্দেশ করা হয়েছে। শুকপক্ষী শস্য নাশক, তথাপি ভারতীয় কথাসাহিত্যে এ পাখির মান সর্বোচ্চ স্থানে। আরো লক্ষ্য করি, 'শালিকেদার জাতকে' (সং ৪৮৪) বোধিসত্ত্ব এক শুকরাজের পুত্র হয়ে জন্মেছেন।

পণ্ডিত ও বিজ্ঞজন রূপে একাধিক পাখিকেই দেখা যায়। 'চক্রবাক জাতকে' (সং ৪৫১) চক্রবাক কাককে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। 'তিতির জাতকে' (সং ৪৩৮) দেখা যায়, একটি তিতির পাখি তিন বেদে পারঙ্গম হয়ে বেদ-অধ্যাপনা করছে। কেবল মানুষই নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীরাও তার কাছে বেদ অধ্যয়ন করছে। 'তৈত্তিরীয় উপনিষদে'র কথা এখানে সকলেরই মনে পড়বে।

জাতকের মতো 'কথাসরিৎসাগরে'ও প্রাধান্য পেয়েছে হাঁস। সুবর্ণহংস এবং হাঁসের সঙ্গে স্বর্ণসম্পদ ও পাণ্ডিত্যের সংযোগ এখানেও লক্ষ্য করি। হাঁসের পর শুকপাখি। শুকের মধ্যের বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা, রাজপ্রতিবেশ আরোপিত হয়েছে। তৃতীয় যে পাখিটি উল্লেখযোগ্য তা হলো—গরুড় এবং গৃধ্র।

'কথাসরিৎসাগরে'র তৃতীয় তরঙ্গে, 'পাটলিপুত্র নগরের উৎপত্তি বিবরণ'-এ বলা হয়েছে, বারণসী ধামে রাজা ব্রহ্মদত্ত একদিন রাতে স্বপ্নে "আকাশ পথবিহারী বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় শত শত রাজহংসমধ্যবর্তী দুইটি সোনার হাঁস" দেখতে পেলেন। কৌশলে হাঁস দুটি ধরে পরিচয় পেলেন : পূর্বজন্মে এরা কাক ছিল, এক পবিত্র দেবালয়ে নৈবেদ্যের ভাগ নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে এরা প্রাণ হারায় এবং জাতিস্মর হাঁস হয়। অপরাধ করে

কাক-জন্ম থেকে হাঁস-জন্ম এবং জাতিস্মরতা লাভ কি কাকের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচায়ক নয়? চতুর্দশাধিক শততম তরঙ্গে, রাজা ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যানে, এই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেখানে সোনার হাঁস দুইটির বর্ণনা এই: "হাঁস দুটির পাখা গরুড়মণির, চরণ প্রবালের, চক্ষু দুটি মণিমুক্তাময়"। অর্থাৎ হাঁসের সঙ্গে মণি-মুক্তার যোগ অন্যত্র যেমন দেখে এসেছি, এখানেও তাই। হাঁস দুটি দিব্যহাঁস, ত্রিসন্ধ্যা পূজা-আহ্নিক করে থাকে। এরা আসলে ছিল শিব-সহচর প্রমথ, দেবী পার্বতীর অভিশাপে ব্রহ্মরাক্ষস, পিশাচ, চণ্ডাল, তস্কর, কুকুর এবং পাখির রূপ ধারণ করে পর-পর। পাখির মধ্যে প্রথমে হয় কাক তারপর ময়ূর এবং শেষে সুবর্ণরত্নময় হংস। অভিশাপ দ্বারা রূপান্তর ধারণ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। হাঁসের সঙ্গে কাক ও ময়ূরের যোগটাও উপেক্ষা করবার নয়। জাতকে ও ঈশপের গল্পে দেখা যায়, দাঁড়কাক ময়ূরের পাখা পরে ময়ূর হতে চেয়েছে, অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে একটি অভেদ সূচিত হয়েছে। হাঁস ও ময়ূর—ভারতীয় কথাসাহিত্যের প্রধান দুটি পাখি। এই হাঁসদের কাছেই রাজা ব্রহ্মদত্ত জ্ঞানলাভ করে দিব্যগতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

'কথাসরিৎসাগরে হাঁসের উল্লেখগুলো থেকে এই প্রসঙ্গগুলো লক্ষ্য করেছি: হাঁসেরা জোড়াবদ্ধ থাকে, তারা স্বামী-স্ত্রী অবশ্য ষটপঞ্চাশত্তম তরঙ্গে, নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে' রাজা নলকে যে দুটি হাঁস ছলনা করে, তারা কলি ও দ্বাপর); তারা পবিত্র, পণ্ডিত; তারা জাতিস্মর। অভিশাপ প্রদান ও রূপান্তর গ্রহণ এসব ক্ষেত্রে দুটি সাধারণ Motif, হাঁসদের সঙ্গে ধন-রত্নের যোগাযোগও দু-একটি জায়গায় দেখা যায়।

একসপ্ততি তরঙ্গে, মঞ্জুমতীর উপাখ্যানে, মন্ত্রীকে মন্ত্রবলে ময়ূর হতে দেখা যায়। গলায় মন্ত্রপূত সূত্র বেঁধে মন্ত্রীকে ময়ূর করে রাখা হয়েছিল। রাজা নিজেও এই সূত্রে বেঁধে ময়ূরের রূপ ধরে পলায়ন করেছেন। রাজপ্রতিবেশ বহু পাখিরই আছে, এখানে তা ময়ূরের মধ্যে দেখা গেল। সপ্তম তরঙ্গে, 'মাল্যবানের শেষ উপাখ্যানে,' 'কলাপ ব্যাকরণে'র উদ্ভব কথা ব্যক্ত হয়েছে। শর্ব বর্মাচার্যের মুখনিঃসৃত এই ব্যাকরণের, কার্তিকের বাহন ময়ূরের অঙ্গশোভার কথা স্মরণ করে, নাম হলো—কলাপ ব্যাকরণ। ভারতের অনেক প্রদেশেই সরস্বতীর বাহন হাঁস নয়, ময়ূর। ময়ূরের বিদ্যাবত্তা এই প্রসংগে সূচিত হয়েছে।

শুকপাখির সঙ্গেও রাজপ্রতিবেশ, ব্রাহ্মণত্ব, জাতিস্মরত্ব ও পাণ্ডিত্য জড়িত, 'কথাসরিৎসাগরে' একাধিকবার তা প্রমাণিত হয়েছে। ঊনষষ্ঠিতম তরঙ্গে, 'শক্তিযশার উপাখ্যানে' দেখা যায়, মুক্তালতা নামে এক নিষাদপতির কন্যা একটি শুকপাখি নিয়ে রাজা সুমনার দর্শনপ্রার্থী হয়েছে। শুকের নাম 'শাস্ত্রগঙ্গা', সে চতুর্বেদ অধিকারী, অসাধারণ কবি, সব ধরণের কলা ও বিদ্যায় পারদর্শী। পূর্বজন্মের কোনো কর্মের জন্যে এই শুক মানবরূপ ত্যাগ করে শুকরূপ ধরে নিষাদগৃহে পালিত হচ্ছিল। দ্বিসপ্ততিতম তরঙ্গে 'বিনীতমতি উপাখ্যানে' আছে: "পূর্বকালে বিন্ধ্যাচলে শুকপাখিদিগের হেমপ্রভ নামক বুদ্ধদেবের অংশে উৎপন্ন জিতেন্দ্রিয় এক রাজা ছিলেন। পূর্বজন্মাভ্যস্ত সৎস্বভাব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল।" এই শুক-রাজ ধর্মোপদেষ্টা ও জাতিস্মর ছিলেন।

'হেমপ্রভ' নামের মধ্যে স্বর্ণ-সংযোগ পরিস্ফুট হচ্ছে। শুকের সংগে 'সারি' বা 'শারিকা'-ও উল্লিখিত হয়েছে, যার ফলে জোড়া গাঁথা চরিত্র হিসেবে একটি পরিচয় মিলছে। সপ্তসপ্ততিতম তরংগে (তৃতীয় বেতাল) শারিকাও বিদুষী।

পাখির সংগে রাজত্ব ও রাজ্যপাটের যোগের অপর ভালো উদাহরণ ষিব-ষষ্ঠিতমতরঙ্গে 'মেঘবর্ণ উপাখ্যানে' পাই। রাজ্যপাট নিয়ে কাক-পেচকের কলহ। কাকরাজের নাম— মেঘবর্ণ; পেচকরাজের নাম—অপমর্দ। মেঘবর্ণের চতুর মন্ত্রী চিরজীবী কৌশলে পেচকরাজকে সবংশে পুড়িয়ে মারল। কাকের সংগে আগুনের যোগ প্রায় সবত্রই লক্ষ্য করেছি। এখানে দুবার।

পাখির সংগে ধন-সম্পদের যোগের কথা, 'কথাসরিৎসাগরে', পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। আর দুটি উদাহরণ এই: চতুঃপঞ্চাশত্তম তরংগে, 'সমুদ্রশূরের উপাখ্যানে', রাজকন্যা চক্রসেনার স্বর্ণহার রাজসভায় যখন প্রদর্শিত হচ্ছিল, তখন হঠাৎ একটি গৃধ্র এসে সেই হার ছড়াটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পঞ্চষষ্ঠিতম তরংগে 'বণিকপুত্রাদির উপাখ্যানে' দেখা যায়; এক বৌদ্ধ সাত্ত্বিক মহাপুরুষ স্বর্ণচূড় পাখিকে উদ্ধার করেছেন বলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে স্বর্ণচূড় পাখি রত্নালংকারপূর্ণ একটি ঝাঁপি তাঁকে এনে দিয়েছে। স্বর্ণচূড় নামটিও প্রসংগতঃ লক্ষণীয়।

জাতক, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ-এ যে সব পাখির নাম মেলে, সকলেই মানবায়িত, অর্থাৎ মানবসুলভ তাদের নামকরণ করা হয়েছে, ঈশপের গল্পে যা দৃষ্ট হয় না। এই জন্যে ঈশপের গল্পে পাখির নির্বিশেষ গুণ কেবল ফুটেছে, সবিশেষ রূপ নেই। ভারতীয় কথাসাহিত্যে পাখির একাধারে রূপ ও গুণ দুই-ই সমুজ্জ্বল। এইসব নামকরণের মধ্যে দুটি দিক দেখা যায়: গুণের ধর্ম ও রূপের বিশিষ্টতা। দৃষ্টান্ত হিসেবে কেবল 'হিতোপদেশ' থেকে সামান্য দু-একটি নাম উল্লেখ করছি। 'মিত্রলাভ' থেকে: কাকের নাম—'লঘুপতনক' (রূপ), সুবুদ্ধি (গুণ)। কপোতের নাম—'চিত্রগ্রীব'। গৃধ্রের নাম—'জরদ্গব'। 'বিগ্রহ' থেকে: রাজহংসের নাম—'হিরণ্যগর্ভ'। রাজহংসের কন্যার নাম—'কর্পূরমঞ্জরী', পুত্রের নাম 'চূড়ামণি'। বকের নাম—দীর্ঘমুখ'; ময়ূরের নাম—'চিত্রবর্ণ'; চক্রবাকের নাম— 'সর্বজ্ঞ'; কাকের নাম—'মেঘবর্ণ'; গৃধ্রের নাম—'দূরদর্শী'। এইসব রূপ-গুণবাচক মানবিক নামকরণ থেকে মানুষের পক্ষিরূপ ধারণের বিশ্বাসটি প্রকটিত হয়েছে।

হিতোপদেশ-এর গল্পে এক-একটি সম্পর্কে এক-একটি মনোভাব (Attitude) প্রকাশিত হয়েছে। কাক সম্পর্কে মিশ্রধারণার প্রকাশ দেখা যায়। 'মিত্রলাভ' কথায় কাকের বন্ধুতা ও বুদ্ধিবত্তা প্রশংসা পেলেও 'বিগ্রহ' কথায় কাকচরিত্র নিন্দিত হয়েছে। এখানে কাকের অবিমৃষ্যকারিতা, লৌল্য ও বিশ্বাসঘাতকতা ব্যক্ত হয়েছে। মেঘবর্ণ নামীয় কাক বিশ্বাসঘাতকতা করে, রাজহংস-ময়ূরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে রাজহংসের পতন ঘটিয়েছে। রাজহংসের দুর্গে কাকই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, কাকের সঙ্গে আগুনের সংশ্রব এতে পুনরায় সমর্থিত হলো। কাক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী জ্ঞানেই রাজহংস তাকে সভায় স্থান দিয়েছিল। 'সন্ধি'তে কাকের চরিত্রে অতি হীন। সুহৃদ্ভেদ' কথায়

বৃক্ষতলস্থ সর্পকে হত্যা করবার জন্যে কাকী কাকের পরামর্শে রাজপুত্রের স্বর্ণহার নিয়ে এসে সর্প-বিবরে নিক্ষেপ করেছে, রাজার লোকেরা স্বর্ণহারের সন্ধানে এসে সর্পকে হত্যা করেছে। পাখির সঙ্গে সোনা ও বহু-কথিত যোগ এখানেও এভাবে লক্ষিত হয়। পাখির সঙ্গে সর্পের সংযোগও তেমনি লক্ষণীয়।

বরং শকুন সম্পর্কে প্রীতিপূর্ণ মনোভাব দেখা যায়। ভাগীরথীর তীরবর্তী গৃধ্রকূট পর্বতের পর্কটী বৃক্ষের অধীবাসী জারদ্গব নামক বৃদ্ধ গৃধ্র কর্তব্যপরায়ণ, বৃদ্ধের মতোই বিশ্বাসপ্রবণ, সহজেই বেড়াল কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়ে অকারণে নিহত হয়েছে। 'বিগ্রহ' কথাতেও গৃধ্র সম্মানসূচক মন্ত্রিপদ পেয়েছে ময়ূর-রাজ্যের সভায়, এবং পরিশেষে তারই বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় ময়ূররাজ জিতেছে। তেমনি রাজহংসের প্রধান মন্ত্রী সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী চক্রবাক্। এসবের মধ্যে পাখির রাজপ্রতিবেশ ও পাণ্ডিত্য প্রমাণিত হচ্ছে। ময়ূরের রাজসভায় একজন বিজ্ঞ সভাসদ—শুক। প্রধানমন্ত্রী গৃধ্র যখন বলেছে রাজহংসের দরবারে দূতরূপে একজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করা দরকার, তখন ময়ূর ব্রাহ্মণজ্ঞানে শুককেই দূতরূপে প্রেরণের প্রস্তাব করেছে। 'সন্ধি'তে বক মূর্খ ও মূঢ়-রূপে চিহ্নিত, বস্তুতঃ হিতোপদেশের কুত্রাপি বক সকৃৎ প্রশংসা অর্জনেও সমর্থ হয় নি। রাজহংস ও ময়ূররাজের সেনাপতি সারস ও কুক্কুট এবং মন্ত্রী চক্রবাক ও গৃধ্রের বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এই যুদ্ধে ময়ূররাজকে বিজয়ী করা বিশেষ ইঙ্গিত-বহনকারী। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বহু রাজপরিবারে—রাজবংশের প্রতীকরূপে এখনো ময়ূরমূর্তিকে গ্রহণ করতে দেখা যায়।

'হিতোপদেশে' পাখির রাজপ্রতিবেশ সম্পর্কে আর একটি উদাহরণ দিই। এখানে সব ধরণের পাখির মিলিত একজন রাজা এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেক ধরণের পাখিদের রাজা কল্পিত হয়েছে। সব পাখির মিলিত রাজা গরুড়। গরুড় রাজোচিত কাজ করেছে। টিট্টিভ দম্পতির প্রতিবার প্রসূত ডিম সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সকল পাখি সমবেত হয়ে গরুড়কে এর প্রতিকার করতে বললে, গরুড় নারায়ণকে দিয়ে সমুদ্রকে শাসন করায়। পাখির রাজা গরুড়ের দেবতা বিষ্ণু, বিষ্ণুর নামান্তর নারায়ণ; 'নার' অর্থাৎ 'জল' 'অয়ন' বা আশ্রয় যাঁর, তিনিই নারায়ণ, এইজন্যে বিষ্ণুর সমুদ্র-শাসন যুক্তিসিদ্ধই হয়েছে। গরুড়ের সঙ্গে জলের আসঙ্গও এতে পুনর্বার প্রমাণিত হল। 'বিগ্রহ কথাতেও গরুড় রাজসম্মান পেয়েছে। সমস্ত পাখি সমুদ্রতীরে সমবেত হয়ে গরুড়ের 'যাত্রামহোৎস'ব করছে, দেখা যায়। যেমন, দোলযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদিতে বহু মানুষ মিলিত হয়ে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খ্যাপন করে, 'যাত্রামহোৎসবে' তেমনি গরুড়ের মাহাত্ম্য খ্যাপিত হয়। গরুড়ের দেবত্ব ও সম্রাটত্ব এতে সুস্পষ্টরূপে সূচিত।

ঈশপের গল্পে পাখির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে ঈগল ও চিল এবং কাক। ঈগল পাশ্চাত্ত্য দেশে পাখির রাজা বলে কল্পিত, এই কারণে ঈগলের সঙ্গে রাজপ্রতিবেশ সহজেই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। ঈগলের সংস্পর্শে চিলের মধ্যেও এই রাজপ্রতিবেশ সঞ্চারিত হয়েছে। ঈশপের কাক কর্মঠ ও সক্রিয়, এবং কাকের চাতুর্য সম্পর্কে প্রাচ্যে যে বিশ্বাস আছে, তার পূর্ণ সমর্থন এখানে মেলে। রাজা হিসেবে ঈশপের গল্পে ময়ূর ও সারসের নামও মেলে। ময়ূর ভারত থেকে ইউরোপে গেছে, ময়ূরের মধ্যে

রাজপ্রতিবেশের ইঙ্গিত পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্পেও আমরা দেখেছি। তেমনি সারসের মধ্যেও। ঈশপের একাধিক গল্পে প্রাচ্য-প্রভাব লক্ষিত হয়েছে, ময়ূর-সারসকে রাজা বলায় সেই প্রভাব প্রগাঢ়তর হয়েছে বলে মনে করি। পাখির সঙ্গে স্বর্ণ ও রত্নের আসঙ্গও ঈশপের গল্পে ধরা পড়েছে। উদাহরণ দিচ্ছি।

ঈগলের শক্তি ও বীর্যের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবের জন্যেই ঈগল ছোঁ মেরে একটি মেষকেও নিয়ে যেতে পারে (James : No. 132 : The Eagle and the Jack চিল রাজা হয়েছে (James : No, 3 : The Kite and the Pigeons), চিল রাজা হয়েছে (James : No 115 : The Frogs asking for a king), —দু জনেই প্রজার ওপর অত্যাচার করেছে। ময়ূর যখন রাজা হয়েছে, তখন তার শক্তিবত্তায় সংশয় পোষণ করা হয়েছে, 'জাতকে'র গল্পে কাক যেমন করেছিল পেচকের রূপদর্শনে। ময়ূর সম্পর্কে উচ্চ ধারণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কুদর্শন কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে সুদর্শন হবার চেষ্টায় (James : No. 6 : The vain Jackdaw)। চাতক-কে রাজা নয়, রাজকন্যা হতে দেখেছি : "এক চাতক তেরেউস-এর পুরোনো কাহিনী শুনিয়ে এক দাঁড়কাককে বললো—আমি হচ্ছি এথেন্সের মেয়ে,—শুধু মেয়েই বা বলি কেন,—এক রাজকন্যা—এথেন্সের রাজার মেয়ে।" (অনুবাদ : সুধীর করণ : সং ২১১) ইউরোপের বহু অঞ্চলে পেচক রাজকন্যা রূপে কল্পিত।

হাঁস-মুরগী দুই-ই ডিম দেয়, দুই-ই গৃহপালিত, প্রতিদিন এদের ডিম পাওয়া যায়, ডিম সম্পর্কে নানা কৌতূহল থেকেই Egg-lore'ও Egg-myth'-এর জন্ম হয়েছে। পাখির সংস্পর্শে এই ডিম অবশেষে সোনায় পরিণত হওয়াতেই স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসীর কল্পনা James : No, 110 : The Goose with the golden eggs) করা হয়েছে ; কিংবা খাদ্যান্বেষণরত কুক্কুট মণি-মুক্তার সন্ধান পেয়েছে বলে কথিত হয়েছে (James : No 11 : The Cock and the Jewel).

বাদুড় সম্পর্কে একটি Aetiological myth মেলে ঈশপে (James -No. 125 : The birds, the beosts and the bat).

আরব্য উপন্যাসের কাহিনীগুলো মন্ত্র, ইন্দ্রজাল ও অভিশাপে-র কথায় ভরপুর। এখানে মন্ত্রদ্বারা বা অভিশাপের ফলে মানুষ সহজেই পশু-পাখিতে পরিণত হয়। আরব্য উপন্যাসে কয়েকটি বৃহৎ পাখিকে দেখা যায়, এদের মধ্যে সিন্ধবাদের কথায় Roc-পাখির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত পাখি, যা গৃহপালিত এবং গুপ্তকথা ফাঁস করে দিতে সক্ষম, এমন পাখি একাধিক সহস্র রজনীর প্রথম গল্প বণিক ও দৈত্যের কথার অন্তর্গত একটি কথায় মেলে। গৃহস্থ তার শিক্ষিত পাখিটিকে রেখে দূরদেশে গেল,—তার অনুপস্থিতে তার স্ত্রী কি করে বা না করে, তা জানবার জন্যে। আরব্য উপন্যাসের শেষ গল্পে পাখির ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচ্য। গল্পটি পুরোপুরি ভারতীয় রূপকথা দ্বারা প্রভাবিত। রাজপুত্র বাহমান এবং পরভেজ দুজনে গেলেন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ এক বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পাখির অন্বেষণে, Taboo ভঙ্গ করে দুজনেই প্রস্তরীভূত হলেন। অবশেষে তাঁদের একমাত্র ভগ্নী পরিজাদী সেই পাখি আনতে সমর্থ হলেন। সোনার খাঁচায় রাখা সেই পাখির এমনই যাদুশক্তি, তার দিকে দৃষ্টিপাতমাত্রই

সব কোলাহল নিমেষে থেমে গেল। এই পাখির প্রসাদেই রাজকন্যা প্রচুর ধনরত্ন এবং হারানো পিতা-মাতা-ভাইকে ফিরে পেলেন।

আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনীতে দেখি, রানী বেদৌরার হীরক সংলগ্ন কবচটি একটি পাখি এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। সাদ সাদীর গল্পে আছে : জনৈক ব্যক্তি তার পাগড়ীর ভেতর টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছিল, একটি চিল তা নিয়ে যায় ; পরে দেখা গেছে, সেই পাগড়ীটিই চিলের বাসা হয়েছে। সিন্দবাদের দ্বিতীয় বারের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনীতে 'রক'-পাখির সাহায্যে হীরক-মাণিক সংগ্রহের উল্লেখ পাই।

এই বিশাল উপন্যাসের এক স্থানে Magic conflict ও দেখা যায়। কুহক বিদ্যায় পারদর্শিনী রাজকন্যার সঙ্গে সিংহরূপী এক দৈত্যের এই দ্বন্দ্ব। সিংহ শ্যেন পক্ষীর রূপ ধরেছে ; রাজকন্যা সর্প, গৃধ্র, ব্যাঘ্র, কুক্কুট, পানকৌড়ি প্রভৃতি প্রাণীর রূপ ধরেছেন। পাখির সঙ্গে এখানে যাদু, সাপ ও জলের (পানকৌড়ির মাধ্যমে) সংসর্গ দেখা যায়॥

ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ও পৌরাণিক সাহিত্যে দেব দেবী বা নায়ক নায়িকাদের মানবেতর নানা প্রানীর রূপ ধারণ করতে দেখা যায়। এ গুলোর মধ্যে পক্ষিরূপ ধারণটাই আমাদের আলোচ্য। অধিকতর শক্তিধর দেবদেবীর অভিশাপে কিংবা নিজস্ব কর্মফলে, কিংবা দেবদেবীদের কোনো বিশেষ ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁদের এই পক্ষিরূপ ধরনের ব্যাপারটা ঘটে।

ইটালীর ফ্লোরেন্স-এর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক Angelo de Gubernatis দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেছেন : Zoological Mythology or the legends of Animals (London: 1872)। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি পৌরাণিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ ভারতীয় বৈদিক ও ক্লাসিকাল সাহিত্যে, পাখির ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেছেন। গুবেরনাটিস্ ছিলেন ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলারের শিষ্য। কাজেই, ম্যাক্সমূলার প্রবর্তিত 'comperative Mythology' তাঁর একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে সর্বাংশেই তিনি ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। এই প্রসংগেই তিনি আলোচনা করেছেন (pp.421-429), কেন পৌরাণিক সাহিত্যে দেবদেবী ও নায়ক নায়িকাদের পক্ষিরূপ ধারণ করানো হয়েছে।

পুরাণ ও পৌরাণিক সাহিত্যকে গুবেরনাটিস নিছক 'রূপক' রূপে দেখেন নি, কিংবা এর মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন নৈতিক বা শিক্ষাগত তত্ত্বের অন্বেষণ করেন নি। তাঁর

মতে, পৌরাণিক ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত। তা হলে একই পৌরাণিক ঘটনা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হবে না, মোটামুটি তাঁদের মধ্যে একটি মতৈক্য থাকবে।

পুরাণ সৃষ্টিতে আদিম মানুষ দুই বিপরীত বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে একদিকে আছে পাশবিক প্রবৃত্তি, তার জড়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার দিক; অপরদিকে আছে উচ্চ ও মহৎ বৃত্তি, তার প্রগতির দিক। এই বিরোধ-বোধের ফলেই মানুষের মধ্যে কল্পনার জাগরন হয়েছে। প্রতি মানুষের মধ্যেই আছে এই বিরোধ। নিষ্ক্রিয়তার জড়তা থেকে মানুষ সক্রিয়তার প্রগতি প্রর্থনা করে। একেই বলা যায় তার 'elevated instinct'।

দেব-দেবী বা নায়ক নায়িকারা যখন মানবেতর প্রাণীর রূপ ধারণ করেন, তখন তাঁরা দেবত্ব বা নরত্ব সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়ে যথার্থ পশু পাখির মতোই আচরণ করেন। তারপর আবার যথাকালে নিজ নিজ রূপ ও গুণ ফিরে পান। পৌরাণিক সাহিত্যে তাই দৈহিক রূপের সঙ্গে মানসিক গুণ অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা থাকে।

মানুষ একবারেই দেবতার মধ্যে পূর্ণতাকে লক্ষ্য না করে, ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে তা দেখতে চেয়েছে। সে জন্যেই দেবতাকে পশুরূপ ধারণ করানো। কিংবা, বিশেষ একটি দেবতার মধ্যেই দেবত্বের উৎকর্ষকে লক্ষ্য না করে বিভিন্ন রূপে তা লক্ষ্য করতে চেয়েছে; অথবা, নৈসর্গিক জগতের বিভিন্ন গুণ, ভাব ও বিশেষত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্যে এক একটি বিশেষ দেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে তুলনা করবার উপযুক্ত ভাষা জ্ঞান আদিম মানুষের ছিল না। রূপক অলংকার সৃষ্টির দক্ষতাও ছিল না তাদের। সংযোজক শব্দের প্রয়োগ করে দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনাত্মক সমাস সৃষ্টিও ছিল তার অজানা। তাই আদিম মানুষ 'সিংহরূপ রাজা' বা 'রাজসিংহ' শব্দ ব্যবহার না করে, রাজাকেই সরাসরি 'সিংহে' রূপান্তরিত করে নিত। এক একটি ভাববাচক গুণের প্রতীক রূপে আদিম মানুষ নৈসর্গিক জগৎ থেকে এক একটি দিককে গ্রহণ করেছে। যেমন: শক্তি ও শৌর্য বোঝাতে ষাঁড়, সিংহ ও বাঘ; ভালোত্ব বোঝাতে মেষ, কুকুর, কপোত ও ঘুঘু; সৌন্দর্য বোঝাতে হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি। যেহেতু তখন মানুষের ভাষাগত দৈন্য ছিল, সেই হেতু শক্তিশালী একজন রাজা হয়ে গেলেন একটি সিংহ; বিশ্বস্ত বন্ধু হলো কুকুর; সতর্ক ও চট্‌পটে একজন স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন ছোটো আকারের হরিণ। কখনো কখনো স্ত্রীলোকদের বলতে শোনা যায়, 'আমি পাখি হলে সেখানে উড়ে যেতুম'। আসলে বিশেষ বাসনার তীব্রতায় সেই মুহূর্তে তারা পাখি হতে চায়। একই ইচ্ছে দেবতাদের মধ্যেও কাজ করে। কোনো ইচ্ছের ফলে বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে তাঁরাও সময় সময় পাখি হতে চান। যেমন, শিবির আতিথেয়তার পরীক্ষার জন্যে ইন্দ্র শ্যেনরূপ এবং অগ্নি কপোত রূপ ধারণ করেছিলেন।

দেবতারা যে তাঁদের আপন স্বর্গীয় ক্ষমতা বলেই আকাশে উড়তে সক্ষম, আদিম মানুষ তা ভাবতেই পারত না; কেননা, নিজেদের জীবনের মাপকাঠিতেই তারা

দেবতাদেরও বিচার করত। অতএব, দেবতাদেরও মনে যখন পাখির মতো ওড়বার সাধ জেগেছে বা প্রয়োজন হয়েছে, তখন সরাসরিই তাঁদের পাখি করে দেওয়া হয়েছে আদিম কল্পনায়। দেবতার রথ টানে যে ঘোড়া, সে ঘোড়ারও পক্ষ কল্পিত হলো (এই 'পক্ষিরাজ' ঘোড়াই হলো Hippogriff)। দেবতারা যখন সমুদ্রবিহার করেন, অতএব, তখন তাঁদের হতে হয় মাছ বা অন্য কোনো জলচারী জীব!

·৯···

আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পাখিকে জ্ঞানী ও বিদ্বানরূপে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। 'জারিতা' নামে পক্ষিবিশেষ অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেছে বলে কথিত হয়। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' এ বিষয়ে এক দীর্ঘ উপাখ্যান আছে: জ্ঞানী জৈমিনি মহাভারতের কিছু, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্যে মার্কণ্ডেয়ের উপদেশ চাইলেন। মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে দ্রোণপুত্রদের (পিঙ্গাক্ষ, বিরোধ, সুপত্র ও সুমুখ) কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বললেন। সাধারণ পাখিদের এই গভীর জ্ঞানের কথা শুনে জৈমিনি খুব অবাক হলেন। মার্কণ্ডেয় তখন সেই পাখিদের পূর্ব-পরিচয় জানালেন: জনৈকা অপ্সরা গরুড়ের বংশে জন্ম নিয়ে, তারক্ষী নামে এক পক্ষিরূপে অবতীর্ণা হলো, বেদ-বেদাঙ্গে পারঙ্গম পক্ষিরূপ দ্রোণের সঙ্গে তার বিয়ে হলো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তারক্ষী উপস্থিত ছিল, সে উদরদেশে বাণবিদ্ধ হলে তার জঠর থেকে চাঁদের মতো চারটি উজ্জ্বল ডিম প্রসূত হলো। যুদ্ধ শেষ হলে, শমীক ঋষি যুদ্ধক্ষেত্রে পাখির শাবকের রব শুনতে পেলেন। তিনি সযত্নে তাদের শাসন করতে থাকলেন, শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে কালক্রমে তারা জ্ঞানী হয়ে উঠল। পূর্বজন্মের কথাও তারা স্মরণ করতে পারত। এই পক্ষি শাবকেরা আসলে তুম্বুরুর পুত্র। যখন তারা পিতার সঙ্গে বনে বাস করত, তখন একদিন দেবরাজ ইন্দ্র এক ভীষণকায় বৃদ্ধ পক্ষীর রূপ ধরে অতিথি-বৎসল তুম্বুরুর কাছে নরমাংস খেতে চাইলেন। তুম্বুরুর পুত্রগণ বলি হতে অস্বীকার করায়, তুম্বুরু এই বলে পুত্রগণকে অভিশাপ দিলেন: তির্যগ্‌যোনিতে তাদের পরবর্তী জন্ম হবে। তারপর অবশ্য পক্ষিরূপী ইন্দ্রকে পুত্রদের দেহ নিবেদন করলেন। ইন্দ্র তখন স্বমূর্তি ধারণ করে অন্তর্ধান করলেন। তুম্বুরু পুত্রদের কথায় নিজের দেওয়া অভিশাপের মাত্রা হ্রাস করলেন: তারা তির্যগ্‌যোনিতেই জন্ম নেবে বটে, কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে। মহাভারতের অন্যত্রও (যেমন, ষষ্ঠপর্বে) দেখা যায়, ব্রাহ্মণ মুনীরা পক্ষীরূপ ধারণ করে ঋষি মাণ্ডব্যের কাছে গিয়েছিলেন সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে পাখিকে মানুষের ধাত্রীরূপে খুব দেখা যায়। এ বিষয়ে সেমিরামিস্ (Semiramis)-এর কথা অনেকেরই মনে হবে।

আবেস্তায় Veretharaghna পাখী রূপে অবতীর্ণ, পাখির ভাষাও তার জানা! Khorda Avesta র একটি গল্পে দেখা যায়, বৃদ্ধ yima পাখির রূপ ধরে পালিয়ে যাচ্ছেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পৌরাণিক গ্রন্থ-দ্বয় Edda-তে দেখা যায় Atli র সঙ্গে পাখিদের দীর্ঘ সংলাপ। Aristophanes এর কমেডি The Birds' ('Orni thes') এর সমগ্রটাই পাখির প্রজ্ঞা ও ঐশী শক্তির কথায় পূর্ণ।

গ্রীস্ দেশে কবিদের বলা হত 'the birds of the Muses,' কবিরা হলেন কলালক্ষ্মীর পক্ষিস্বরূপ। ভারতীয় কবিদের কাছে কোকিল হল সুর-শিক্ষার উৎস। সুকণ্ঠ গায়িকাকে 'কোকিলকণ্ঠী' নাম দেবার প্রথা এ দেশে আছে। ঊনবিংশ শতকের কবিওয়ালারা আসরে নামতেন পাখির পালকের তিন কোনা টুপি পরে। 'ব্রজসুন্দব সান্যাল তাঁর 'কবিওয়ালা' (নব্য ভারত। ফাল্গুন, ১৩১৩। পৃ ৫৭৫-৫৭৯) নামে এক ধারাবাহিক রচনায় লিখেছেন: "কোকিলকে ডাকিতে সাধা লইয়া কবি-ওয়ালারা বড়ই মাথা ঘামাইয়া গিয়াছেন। অনেকেই কবি-লড়ায়ের সময় 'কোকিলকে ডাকিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেন, আবার প্রতিপক্ষ হইতে তাহাকে নীরব থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইত। মধুসূদন কানের রচিত এই ভাব ব্যঞ্জক ঝিঁঝিট তালে একটি গানে আছে" ;—এই বলে তিনি গানটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন।

এ বিষয়ে তুতীনামা'র সেই পাখিটির কথা বলা যায়, যার ঠোঁটে ছিল অসংখ্য ছিদ্র, প্রত্যেক ছিদ্র থেকেই বেব হত সঙ্গীত। Angelo de Gubernatis তাঁর পূর্বোক্ত বইতে (P.177) বলেছেন, যে সব পাখি গান গায়, তাবা কেবল কবিবৎ নয়, কবিদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিও পায়।

বাজ-ঈগল-শকুন প্রভৃতি পাখিরা তাদের শৌর্য ও ক্ষিপ্রতার জন্যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষেব দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। পৌরাণিক সাহিত্যে এই তিন ধরনের পাখি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ভূমিকাও এদের অভিন্ন,—এরাই দেবতা ও নায়কদের বন্ধু ও মিত্র হয়ে থাকে। অবশ্য স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও জার্মানীর পৌরাণিক সাহিত্যে শ্যেন ও ঈগল কিছু ভিন্ন ভূমিকা নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে শ্যেনের সঙ্গে দিন ও সূর্যের এবং ঈগলের সঙ্গে রাত্রি ও মেঘের আসঙ্গ দেখা যায়।

হেলেনীয় অর্থাৎ গ্রীক সংস্কৃতিতে শ্যেন এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। 'ইলিয়াডে' দেখা যায়, শ্যেন হয়েছে অ্যাপোলোর সংবাদ বহনকারী। সেখানে, 'ইডা' পাহাড় থেকে অ্যাপোলোর অবতরণ দৃশ্য শ্যেনের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। অ্যাপোলোর সঙ্গে সূর্যের সংযোগটি এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য।

কখনো বা দেখা যায়, শ্যেন ও ঈগল একাকার হয়ে গেছে। গ্রীক দেবরাজ জিউসের বাহন ঈগল কিন্তু ভারতীয় দেবরাজ ইন্দ্রের অনুষঙ্গে পাই শ্যেনকে। জিউসের ঈগল মাংসাশী নয়, তৃণভোজী। হেলেনীয় পুরাণে ঈগল আলোক আনায়নকারী, পূজ্য ও মান্য,—সুখ শান্তি ও উর্বরতার প্রতীক। উর্বরতার প্রতীক বলেই ঈগলের সঙ্গে নারীর আসঙ্গ দেখা যায়। স্নানরতা আফ্রোদিতি (Aphrodite)-কে দেখে প্রেমোন্মত্ত হয়ে

হার্মিস্ (Hermes) ঈগলকে দিয়ে তার বসন চুরি করিয়েছেন। এটি ভারতীয় সাহিত্যেও দেখা গেছে।

ঈগল-বাজ-শ্যেন-শকুন সব একাকার হয়ে যাবার দরুণ একদিকে শকুনও ক্লাসিকাল সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে পবিত্র পাখিতে পরিণত হয়েছে ; অপরদিকে শ্যেনের কিছু, কিছু, সদ্‌গুণ চিলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। চিল সম্পর্কে হেলেনীয় সংস্কারে ভালো ধারণা ছিল না। প্লেটো-র Phoedon-এ কথিত হয়েছে, লোভী আর ছিনতাই-কারী লোকেরাই মরে নেকড়ে এবং চিল হয়।

এইবার ভারতীয় বৈদিক ও ক্লাসিকাল সাহিত্যের কথা বলি। ইউরোপের ঈগল বাজ চিল ভারতীয় সাহিত্যে শ্যেন গৃধ্র গরুড়ে পরিণত। ভূমিকাও মোটামুটি এক। ঋগ্বেদে শ্যেনরূপী ইন্দ্র অন্যান্য সাধারণ শ্যেনের চেয়ে দ্রুতগামী, তিনি 'সুপর্ণ', দেবতাদের 'হবিঃ' তিনি মানুষের জন্যে নিয়ে আসেন (৪. ২৬. ৪)। তিনি লৌহদুর্গে আবদ্ধ হয়েও সেখান থেকে বহির্গত হতে সমর্থ (৪ ২৭ ১)। তিনি তাঁর নখে জীবন-প্রদায়িনী অমৃত বহন করেন, লৌহবৎ নখর-দ্বারা দস্যুদের হত্যা করেন। তিনি সর্পদানব অহীকে পরাভূত করে দ্রুত উড়ে যেতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পাখি ও সাপে যে যুদ্ধের কথা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে দেখা যায়, তার প্রাচীনতম নিদর্শন এটিই।

ঋগ্বেদে শ্যেনের সঙ্গে গৃধ্র অশ্ব ও অগ্নির সংযোগ দেখা যায়। মাতরিশ্বা, অগ্নি এবং অশ্বের সংঘর্ষ লক্ষণীয় (৯. ৯৩. ৬)। অশ্বিদ্বয়ের রথ শ্যেনের দ্বারা চালিত হয়েছে, গৃধ্রের মতো দ্রুতগতিতে (১. ১১৮. ৪)। অশ্বিদ্বয় গৃধ্রের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। যে বৃক্ষে ধনরত্নাদি আছে, গৃধ্র তার চার দিকে উড়ে বেড়ায় (২.৩৯.১) মরুৎগণকেও গৃধ্র বলা হয়েছে (১ ৮৮. ৪)। অন্তরীক্ষে ধাবমান মরুৎগণকে স্পষ্টরূপে শ্যেন বলা হয়েছে (১. ১৬৫. ২)। ঋগ্বেদেই আছে, দিন-শেষে সূর্য যখন সমুদ্রে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যান, তখন তিনি গৃধ্রের চোখে দেখেন (১০. ১২৩. ৮)। সৌর দেবতাকে এই শিকারী পাখি রূপ ধারণ করতে দেখা যায় বলেই 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' যজ্ঞস্থলকে পক্ষিসদৃশ বলা হয়েছে, দেবত্বের অনুষঙ্গে। রামায়ণেও অশ্বমেধ-যজ্ঞস্থলটি গরুড়সদৃশ বলে উল্লিখিত হয়েছে।

মহাভারতের কাহিনীতে আছে, বিনতার দুই পুত্র অরুণ ও গরুড়। অরুণ সূর্যের সারথি, গরুড় বিষ্ণুর বাহন। অরুণ ও গরুড় দুই পাখি জন্ম নেবা মাত্রই উচ্চৈঃশ্রবার আবির্ভাব লক্ষণীয়। এতে সৌর-পাখি এবং সৌর অশ্ব অভিন্ন হয়ে গেছে। শ্যেন রূপী ইন্দ্রের মতো অথবা ইন্দ্রের শ্যেনের মতো বিষ্ণুর বাহন গরুড়ও অথবা স্বয়ং বিষ্ণুই, তৃষ্ণার্ত। তিনিও ইন্দ্রের মতো বহু নদীর জলপানে সমর্থ, সর্প সংরক্ষিত অমৃত আহরণে তিনিও সমর্থ। শ্যেন ও গরুড় এখানে যেমন একাত্ম হলো, তেমনি জল ও সাপের সাধারণ (Common) প্রসঙ্গটিও দেখা গেল। মহাভারতের শ্যেন-কপোতের উপাখ্যানে শ্যেন হলো ইন্দ্র, আর কপোত অগ্নি। শ্যেন-কপোত মিলিত ভাবে যেন অশ্বিদ্বয়। অগ্নি ও সূর্য উভয়ের মধ্যেই উত্তাপ আছে বলে উভয়ে অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়ে গেছে।

এই মিশ্রণ রামায়ণেও লক্ষ্য করা যায়। শ্যেনীর জননীর নাম তাম্রা (তাম্রার অপর সন্তানের নাম ক্রৌঞ্চী, ক্রৌঞ্চীর সন্তানের নাম সারস)। শ্যেনীর সন্তানের নাম বিনতা।

'বিনতার ডিম থেকে জন্ম হলো অরুণ ও গরুড়ের। গরুড় আবার দুই ভয়ংকর পাখির জনক—জটায়ু এবং সম্পাতি। এই বংশলতিকা বিশ্লেষণ করলে, দিনের অগ্রগতির সঙ্গে আকাশে সূর্যের ক্রমারোহণের দৃশ্যটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূর্যের মতোই, হ্রস্বদেহী বিষ্ণু (গরুড়), ক্রমেই ভয়ঙ্কর ও বিরাট রূপ ধারণ করেন। গরুড়ের পুত্র জটায়ু—অতীতের সব কিছু তিনি জানেন, ভবিষ্যৎও তাঁর কাছে দৃশ্যমান,—যেহেতু বৈদিক সূর্যের মতো তিনি 'বিশ্ববেদ', সর্বদ্রষ্টা, সর্বত্র উপস্থিত, চরাচরে চলাচল করেন।

ইন্দ্র কেবল শ্যেনই নয়, অন্যান্য পাখির রূপও ধারণ করেছেন নানা সময়ে। এবার সে সব পাখির কথা বলি। 'বৃহদ্দেবতা'য় উল্লিখিত হয়েছে, তিনি কপিঞ্জলের রূপ ধরেছিলেন। রামায়ণে তাঁকে দেখা যায় কোকিলের রূপ ধরতে: বিশ্বামিত্র ঋষির ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে অপ্সরা রম্ভাকে প্রেরণ করে নিজে কোকিলের রূপ ধরে সেখানে গিয়ে গান গাইতে থাকলেন। ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়, কোকিল একদিকে বিদ্যাবত্তা ও সঙ্গীত (দ্রঃ পূর্বে উল্লিখিত কবিগানের প্রসঙ্গে কোকিলের ভূমিকা), অপরদিকে প্রেম, অবৈধ প্রেম ও ব্যভিচারের সঙ্গে জড়িত। Slavonic পুরাণে আছে, Zywiee নামে দেবতা প্রতি বৎসর কোকিলের রূপ ধরে আবির্ভূত হয়ে, তার ডাকের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন—কোন্ মানুষ আর কতোদিন বাঁচবে। এতে কোকিলের প্রাজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

কোকিলের প্রসঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যে প্রেম, অবৈধ প্রেম ও ব্যভিচারের আসঙ্গ দেখা যায়, ইউরোপীয় পুরাণে নাইটিঙ্গেল পাখি সম্পর্কেও খাটে। এ পাখির নামের মধ্যেই আছে রাতের কথা। সেই হেতু বহুশঃ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শৈশ্নিকতার (phallicism) দিক। গ্রীক পুরাণে দেখা যায়, গোপন কথা ফাঁস হবার ভয়ে দেবরাজ জিউস ফিলোমেলা (philomela)-র জিভ কেটে দেন। ফিলোমেলাই পরে হয় নাইটিঙ্গেল। ভারতীয় সাহিত্যে শুক যেমন সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করতে পারে, ভবিষ্যৎ ঘটনাও বুঝতে পারে, বিপদে মানুষকে সাহায্য করতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে। লক্ষণীয় যে, ভারতীয় সাহিত্যেও শুকের সঙ্গে প্রেমের প্রতিবেশ জড়িত আছে। নাইটিঙ্গেলকে কেউ বলেছেন—জিউসের দূত। তা সত্ত্বেও তার দুর্নাম ঘোচে নি। ইউরিপিডাস নাইটিঙ্গেলের মধ্যে এক অকল্যাণকারী শক্তিকে দেখেছিলেন।

পাখির বিজ্ঞতা ও বিদ্যাবত্তার প্রসঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতির নিরীহ পাখি তিতির ও আবাবিলের কথা উল্লেখযোগ্য। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে'র সৃষ্টির মূলে এই কাহিনী আছে: বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য 'কুপিত গুরুর আদেশে অধীত যজুর্গণ বমন করিয়া প্রস্থান করিলে, মুনিগণ তিত্তিররূপে সেই উদ্বান্ত যজুর্গণ গ্রহণ করেন। তিত্তিরসমূহ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায়, এই যজুর্গণ 'তৈত্তিরীয়' নামে প্রসিদ্ধ।" ('হংসোপনিষদ্,' গরুড়োপনিষদ্,' প্রভৃতি উপনিষদে পক্ষিনাম লক্ষণীয়)। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পৌরাণিক গ্রন্থ Edda-দ্বয়ে আবাবিল (Swallow) পাখির দীর্ঘদর্শিতার উল্লেখ আছে। সিগার্ড (Sigard) ধনরত্নের প্রহরা রত দৈত্যকে হত্যা করবে কি না, এ বিষয়ে যখন সংশয়ে আচ্ছন্ন ছিল, তখন সাতটি আবাবিল, একের পর এক, তাকে নির্দেশ

দেয় সেই দৈত্যকে হত্যা করে ফেলতে। সে নির্দেশ অনুসরণ করেই সিগার্ড লুকোনো স্বর্ণ উদ্ধার করে, স্ত্রীকে ফিরে পায়।

তিতিরের বিজ্ঞতার প্রসঙ্গে গ্রীক পুরাণের একটি গল্পকে স্মরণ করা যায়ঃ প্রাচীন গ্রীসে Daedalus (বা Daidales) নামে এক দক্ষ শিল্পি বাস করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো, ক্রীট দ্বীপের রাজা মিনস (Minos)-এর এক ভয়ংকর প্রাণী Monotaur কে রাখবার জন্যে একটি গোলকধাঁধাময় স্থান নির্মাণ, যার নাম—'the Labyrinth'। ডায়েডালাস্ তাঁর ভাই-পো পারডিক্স (Perdex)কে সব কিছু শেখাতেন, শেষে তারই দক্ষতায় ঈর্ষাকাতর হয়ে একদিন পাহাড়ের চূড়ো থেকে পারডিক্সকে ঠেলে ফেলে দেন। জ্ঞানদেবী মিনার্ভা শূন্যপথে পারডিক্সকে রক্ষা করে তাকে একটি তিতির-পাখি করে দিলেন। জ্ঞানদেবীর প্রিয়তা অর্জন করেছে বলেই কি তিতির বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়?

অবশ্য ভারতীয় সাহিত্যের অন্যত্র তিতিরের যে জন্ম পরিচয় মেলে, তা নিন্দাত্মক। বিশ্বকর্মার পুত্র বিশ্বরূপের ছিল তিনটি মুখঃ এক মুখে সোমপান, একমুখে মদ্য পান করতেন এবং তৃতীয় মুখে তিনি খাদ্য খেতেন। বিশ্বরূপ বাহ্যতঃ দেবতাদের পক্ষে থাকলেও কার্যতঃ তিনি অসুরদের সাহায্য করতেন। তাঁর এই বিরুদ্ধ আচরণের জন্যে ইন্দ্র তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। যে মুখে তিনি সোমপান করতেন, তা হল কপিঞ্জল; তাঁর মদ্যপায়ী মুখ হলো কলবিংক (চড়ুই)। আর যে মুখে খাদ্য খেতেন তা হলো তিতির। এই কাহিনীর রূপান্তর মেলে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে, ত্রিশিরার কাহিনীতে। ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ত্রিশিরা নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। ইন্দ্রের বজ্রে ত্রিশিরার মৃত্যু হলেও তাঁর তিন মস্তক জীবিতই থেকে যায়। ইন্দ্রের নির্দেশে এক সূত্রধর তাঁর সেই মস্তক ছেদন করলে প্রথম মুণ্ড থেকে চাতক পক্ষিদল, দ্বিতীয় মুণ্ড থেকে শ্যেন পক্ষিদল এবং তৃতীয় মুণ্ড থেকে তিতির পক্ষিদল নির্গত হয়।

এইবার পৌরাণিক সাহিত্যে কাক-পেচকের ভূমিকার কথা বলছি। এখানেও দেখা যায়, কাক ও পেচক মিশ্রিত হয়ে গেছে। ঋগ্বেদে নিশাচর রাক্ষসকে বলা হয়েছে 'খরগশা' (৭.১০৪.১৭), শব্দটি সম্ভবতঃ পেচককেই নির্দেশ করে। এখানে পেচক ও রাক্ষস অভিন্ন। যে দুষ্ট ব্যক্তি ভবিষ্যতের ঘটনাবলী আপন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায়, কুকর্মে যে দক্ষ, মহাভারতে তাকেও, আলংকারিক অর্থে, পেচক বলা হয়েছে।

পেচক এথেন্স-এর রাজকন্যা রূপে কল্পিত। গ্রীকেরা পেচককে Niiktens-এর কন্যা বলে মনে করত। কন্যা পিতার প্রতি কামোন্মত্ত হয়ে পিতার অজ্ঞাতসারেই একদা তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হয়। Niiktens তা জানতে পেরে কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, কিন্তু দেবী Athene করুণা করে তাকে পেচকে পরিণত করে দেন। আপন অপকর্মের কথা স্মরণ করেই, লজ্জায় পেচক আজও তাই দিনের আলোতে বের হয় না। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী Athene-র প্রিয় পাখি পেচক, কারণ, অবিদ্যার অন্ধকারেও এ পাখি চোখে দেখে। এ জন্যেই এথেন্সবাসীর কাছে এ পাখি ওই দেবীর

প্রতীক হয়ে গেছে। বিদ্যা ও যুদ্ধের দেবী মিনার্ভার প্রিয় পাখি পেচক। অবশ্য, পূর্বে পেচকের এই সমাদর ছিল না। ল্যাটিন লেখক Pliny লক্ষ্য করেছেন, প্রাচীন গ্রীকসংস্কার অনুযায়ী পেচক ছিল Dionysos-এর শত্রু।

প্যাঁচার থেকেই পৌরাণিক সাহিত্যে কাক-শকুন প্রভৃতি পাখির কথা এসেছে। 'পঞ্চতন্ত্রে' কাক-পেচকের প্রতিস্পর্ধিতার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে আছে, কাক যখন রাতের বেলায় সুপ্তিমগ্ন, প্যাঁচা তখন তাকে হত্যা করেছে। এইজন্যে প্রচীন ভারতে প্যাঁচাকে বলা হয় 'কাকারি'। পাণিনিতে 'কাকোলুকিকা' শব্দ মেলে, যার অর্থ হলো, প্যাঁচার মতো কাক।

রামায়ণের একটি গল্পে আছে, একদা একটি প্যাঁচা একটি শকুন বিবাদ করতে করতে রামচন্দ্রের কাছে এলো। বিবাদের বিষয়ঃ শকুন প্যাঁচার বাসা দখল করে নিয়েছে। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, কে কতদিন বাসাটি দখল করে আছে। শকুন উত্তর দিলঃ যতদিন থেকে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়েছে। প্যাঁচার উত্তরঃ যতদিন পৃথিবীতে বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছে, ততদিন থেকে। রামচন্দ্র প্যাঁচাকেই নীড়টি দিলেন, যেহেতু মানুষের চেয়ে বৃক্ষ প্রাচীনতর। এখানে পেচক শকুনির দ্বন্দ্ব-কথা ব্যক্ত হয়েছে।

আরিস্টটলের History of Animals-এর নবম খণ্ডে কাক পেচকের যুদ্ধের কথা আছে। কাক দিনের বেলায় প্যাঁচার ডিম নষ্ট করেছে, প্যাঁচা রাতের বেলায় কাকের ডিম নষ্ট করেছে।

Festus বলেন, দেবরাণী জুনোর প্রিয়পাখি ময়ূর বটে, কিন্তু পূর্বে ছিল কাক। Aristophanes-এর 'Orniths'-এ আছে, এথেন্সবাসীরা কাক ও জিউসের নাম নিয়ে শপথ করত। কাক ও জিউস এখানে সমার্থক।

Aristophanes-এরই Clouds বইতে একটি গ্রীক প্রবাদ আছে: 'তুমি কাকের কাছে যাও', অর্থাৎ 'তুমি মরো'। ভারত, পারস্য, রাশিয়া, জার্মানী, গ্রীস ও ইটালিতে কাকের সঙ্গে প্রধানত: মৃত্যু ও যমের প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। ভারতীয় সংস্কার অনুযায়ী কাক হলো মৃতের ছায়া স্বরূপ। এই জন্যেই পরিবারের কারো মৃত্যু হলে কাককেই খাদ্য নিবেদন করা হয়। অনেকে পাতের ভাত কাকের জন্যে রেখে দেয়। রামায়ণে আছে, ভুক্তাবশেষ ভাত কাককে দেবার জন্যে রামচন্দ্র সীতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

রামায়ণেই আছে, দৈত্যের আবির্ভাবে সকল দেবতা যখন পলায়ন পর, তখন মৃত্যুর দেবতা যম কাকের রূপ ধারণ করলেন। হেলেনীয় পুরাণে দেব দৈত্যের যুদ্ধে অ্যাপোলো কাকের রূপ ধরেছিলেন। অনেকের অনুমান, অ্যাপোলো তখন শ্বেত কাকের মূর্তি ধরেছিলেন। তা হওয়াই সম্ভব। কেননা, গ্রীক সংস্কার অনুযায়ী সূর্যের উদ্দেশ্যে শ্বেতকাককেই নিবেদন করা হতো। কাকেরা প্রথমে সাদাই ছিল, কিন্তু একবার একটি ভুল সংবাদ দেবার জন্যে অ্যাপোলো রেগে গিয়ে তাদের কালো করে দেন। অপর একটি হেলেনীয় কাহিনী অনুসারে কাক দেবতা Pallas-এর প্রিয়ত্ব হারায়। বিভিন্ন দেশের পুরাণে কাককে দেবতাদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে।

ভারতীয় পুরাণে ত্রিকালদর্শী বিজ্ঞ কাক 'ভুশুণ্ডী'র নাম শোনা যায়। এই কাক অমর, পৃথিবীর তাবৎ ঘটনা দেখে আসছেন বলে পরম অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তুলসীদাসের 'রাম চরিত মানসে'র উত্তরকাণ্ডে দেখা যায়, পক্ষিবাজ গরুড় রামকথা শোনবার জন্যে 'ভুশুণ্ডী' কাকের কাছে যান। প্রসঙ্গক্রমে গরুড় 'ভুশুণ্ডী'কে সাতটি প্রশ্ন করেন, 'ভুশুণ্ডী' তাব সদুত্তর দেন। সেই আলোচনাব কয়েকটি স্থানে আছে,

··দ্বিজ নিন্দক বহু নরক ভোগ করি।
জগ জনমই বায়স শরীর ধরি॥

[যে দ্বিজ-নিন্দক, সে বহু নরক ভোগ কবে কাকের রূপ ধবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে]

···হোহি উলুক সন্ত নিন্দারত।
মোহানিসা প্রিয়জ্ঞান ভানুগত॥
[যে সন্ত-নিন্দক, সে পেচক হয়ে জন্মগ্রহণ করে]
'ভুশুণ্ডী' এবং অন্যান্য কাক এখানে পৃথক।

কাক একচক্ষু বলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রামায়ণে কথিত হয়েছে, কৃত্তিবাসী বামায়ণেও তা আছে। মালাবাবে প্রচলিত কাহিনীটি এই : দণ্ডকারণ্যে বসবাস কালে রাম সীতা মাংস শুকিয়ে বাখতেন। একদিন সীতার পা (মতান্তরে স্তন)-কে একখণ্ড মাংস মনে করে একটি কাক চঞ্চু দ্বারা তাঁকে আঘাত করে, সেই অপরাধে বামচন্দ্র তাদের একটি চোখ নষ্ট করে দেন। পরে রামচন্দ্র কাকদের এই বর দেন যে, প্রয়োজন হলে কাক তার চোখের মণিকে একদিক থেকে অপরদিকে চালনা করতে পারবে।

ভারতীয় পুরাণে দেখা যায়, ইন্দ্র বহু পাখির রূপ ধরেছেন (যেমন, শ্যেন, ময়ূর কোকিল)। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' তাঁকে কাঠঠোকরা রূপেও দেখা যায়।

অতঃপর ভরত ও বটের পাখি সম্পর্কে বলছি। Aristophanes তাঁর Ornithes'-এ লিখেছেন, ভরত পাখি কেবল পৃথিবীতে প্রথম প্রাণীই নয়, এ পাখি জিউস, ক্রোনস (Kronos) প্রভৃতি দেবতা এবং Titan (টাইটান'রা হল দানব, এরা Uranus ও Gaea-র পুত্র বা বংশধর)-দেরও পূর্ববর্তী। সৃষ্টির পূর্বেই যে এ পাখির অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে বলা হয়, এ পাখি ঈশ্বরের বন্দনা করবার জন্যে দিনে সাতবার আকাশের উচ্চদেশে উঠে গান গেয়ে থাকে। সেণ্ট ক্রিস্টোফারকে এ পাখি ভয় পায় না, কারণ, তাঁরই স্কন্ধদেশে ভরত পাখি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই দেখতে পায়। কথিত হয়ে থাকে, যীশুখ্রীষ্টই ভরত পাখির পিতা ; যিশুর মৃত্যুর পর আপন ঝুঁটির মধ্যে ভরত পাখি যিশুকে সমাধিস্থ করে। গলরা তাদের শিরস্ত্রাণে ঝুঁটিওয়ালা ভরত পাখির মূর্তি ব্যবহার করত। ঈশপের গল্পে যে ভরত পাখিকে পাওয়া যায়, সে খুব প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ।

ভারতীয় পুরাণে ভরদ্বাজ বা ভরত বলতে তিনটি পরিচয় পাওয়া যায়ঃ কবি ; সপ্তর্ষিদের একজন ; এবং বৃহস্পতির পুত্র। সপ্তর্ষির অন্যতম যিনি, পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, তিনি এক ভরদ্বাজ বা ভারুই পাখিদ্বারা পালিত হন। বৃহস্পতির পুত্র রূপে ইনি দিবোদাসের সঙ্গে অভিন্ন। দিবোদাস ছিলেন ইন্দ্রের প্রিয়। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'ও দেখা যায় ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক আছে। তিনি স্বর্গারোহন করে আদিত্য অর্থাৎ সূর্যের সাযুজ্য লাভ করেন। ইন্দ্রের সঙ্গেও আমরা পাখি ও সূর্যের যোগ লক্ষ করেছি।

চাঁদের সঙ্গে তেমনি বটের পাখির যোগ দেখা যায়। চাঁদ উঠলে বটের পাখি উত্তেজিত হয়ে অতন্দ্র ভাবে ডাকতে থাকে। চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে বটের পাখির মাথারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অনেক দেশে বিশ্বাস আছে, এ পাখি চাঁদ ও শীত অপেক্ষা সূর্য ও উত্তাপকে পছন্দ করে। মহাভারতে আছে : ভীম যখন সর্পদ্বারা আক্রান্ত হন, তখন একটি বর্তক পাখির আবির্ভাব ঘটে সূর্যের কাছে। পাখিটি ভীষণ দর্শন ও রক্তবমনকারী।

এবার হাঁস ও মুরগীর প্রসঙ্গে আসছি। গ্রীক ভাষায় মুরগীর প্রতিশব্দ হল— 'Alektruon'। আলেকট্রুওন ছিল Mars বা মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ অর্থাৎ তার সহচর। একদা ভাল্কান (Vulcan -এর অনুপস্থিতিতে মার্স্ ভেনাসের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে চাইলেন। আলেকট্রুওনকে দ্বার দেশে প্রহরায় নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ায় এবং তার ফলে এই অবৈধপ্রণয়কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায়, মার্স্ আলেকট্রুওনকে একটি মুরগীতে পরিণত করে দিলেন,—যাতে সে পাহারা দিতে দক্ষ হয়ে ওঠে।

একই ব্যাপার ইন্দ্র অহল্যার অবৈধ প্রেমের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবার জন্যে ইন্দ্র চন্দ্রকে সঙ্গে করে, নিজে কুক্কবাক (অর্থাৎ মোরগ বা ময়ূর)-এর রূপ ধরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হলেন, চন্দ্র রইলেন প্রহরায়।

ইতিমধ্যে গৌতম ফিরে এসেছেন চন্দ্র তা টের পান নি। গৌতম অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন, আর ইন্দ্রের সর্ব শরীরে হলো যোনিবৎ সহস্র চোখ (মনে রাখা প্রয়োজন, ময়ূরের নামান্তর 'সহস্রাক্ষ')। মোরগ ও ময়ূর এখনে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো গ্রীক লেখক মোরগের সঙ্গে চাঁদের আসঙ্গ লক্ষ করেছিলেন। চাঁদ রাত্রি জাগে, অতএব সে যেন প্রহরায় পটু, মোরগও তেমনি। মোরগ অনেক দেবতারই প্রিয়তা অর্জনা করেছিল। সংবাদ প্রদানকারীরূপে Mercury-র, বহু রোগের উপশমকারীরূপে æsculapius-এর যোদ্ধা রূপে Mars, Hercules এবং Pallas-এর এবং উর্বরতার প্রতীক রূপে Lares-এর প্রিয় পাখিরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

গৃহে অগ্নি-সংঘটনকে ঋগ্বেদে জলমধ্যে হংসের সন্তরণ বলা হয়েছে (১.৬৫.৯)। সেখানে মরুদ্গণের স্বর্গীয় দেহকে নীলাপৃষ্ঠ হংস বলা হয়েছে (৭.৫৯.৭), অশ্বিদ্বয়কে

বলা হয়েছে স্বর্ণপক্ষ হংস। রামায়ণে আকাশকে এক হ্রদ বলা হয়েছে। সূর্য সেই হ্রদের এক উজ্জ্বলা হংস। রামের বাক্য যেন প্রেমোন্মত্ত হংসের ধ্বনির মতো। রামের তীর সপ্ত তালবৃক্ষ, পাহাড় ও পৃথিবী ভেদ করে তাঁরই কাছে ফিরে আসে হংসের রূপ ধরে। মহাভারতে, নল-দময়ন্তীর প্রেমের ক্ষেত্রে দৌত্য করেছে হাঁস। মাঝে মাঝে হাঁস বা রাজহাঁস মন্ত্র-বলে অকল্যাণজনক কর্মে লিপ্ত হলেও মূলতঃ এরা শুভংকর এবং শুভফলদায়ক। স্কান্ডিনেভিয়ার Edda-দ্বয়ে দেখা যায়, যখন নায়ক সিগার্ডের মৃত্যু হলো, হাঁসেরা যেন শোকে অভিভূত হয়েছে।

ঘুঘু ও কপোত পুরাণে খুব বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। শ্বেত কপোত নানা কাব্যময় অনুভূতির প্রতীক। লাল এবং গাঢ় বর্ণের ঘুঘু কপোত নানা ভালো-মন্দয় মিশ্রিত অনুভূতির প্রতীক। ঋগেবদে যে ধূসর এবং গাঢ় বর্ণের কপোতের কথা বলা হয়েছে, সে কপোত মৃত্যু-বোধের সঙ্গে জড়িত। পঁ্যাচা, যা মৃত্যুর সঙ্গে নিশ্চিত ভাবে জড়িত, সেই তার সঙ্গে যখন কপোতের উল্লেখ করা হয়, তখন কপোতের মধ্যেও মৃত্যুর উৎসঙ্গ এসে পড়ে। ঋগেবদের দশম মণ্ডলের ১৬৫-সংখ্যক সূক্তে কপোতকে নিঋ'তি ও যমের দূত বলা হয়েছে। কপোত অগ্নিস্পর্শ করলে তা মহা অমঙ্গলের সূচনা করে বলেও উক্ত হয়েছে। মহাভারতের শ্যেন-কপোতের বহু পরিচিত উপাখ্যানে শ্যেন হলো ইন্দ্র, কপোত—অগ্নি। উপাখ্যানটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে 'তুতীনামা'য় মেলে। সেখানে শ্যেনেব জায়গায় শকুন এবং বাজা শিবির জায়গায় মুসা (Moses)-এব নাম পাই।

খ্রীষ্টপুরাণে ঘুঘু (কপোত)র ভূমিকাও বহু শ্রুত। জল প্লাবনের পর, নোয়া ত'ার 'আর্ক' থেকে পর-পব যে সব পাখি ছেড়ে দিয়েছিলেন, ঘুঘু (কপোত) ছিল তার মধ্যে শেষতম। খ্রীষ্টানরা বলে থাকেন, বিশেষ এক ধরণের ঘুঘু (the turtle dove) যিশুর পুনরুত্থানেব কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের প্রতীক। খ্রীষ্টানদের সমাধিস্তম্ভে এই জন্যেই অনেক সময় ঘুঘুর প্রতিকৃতি এ'কে দেওয়া বা খোদাই করে দেওয়া হয়। গ্রীস দেশে ঘুঘু প্রেম, মৃত্যু ও শস্যেরও প্রতীক। 'ওডেসী'তে আছে, জিউস ঘুঘুর রূপ ধরেই কুমারী Phthia-র কাছে গিয়েছিলেন। ঘুঘু এখানে প্রেম ও শৈল্পিকতার সূচক।

হেলেনীয় পুরাণে ঘুঘু-সম্পর্কে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে: Aphrodite এবং Love দুজনে ফুল তোলার প্রতিযোগিতা করছিলেন। Loveই জিতছিলেন। এমন সময়ে অপ্সরা Peristera এসে Aphroditeকে সাহায্য করতে লাগলেন। Love তখন রেগে গিয়ে Persiteraকে একটি ঘুঘুতে পরিণত করে দিলেন। আজও তাই 'ঘুঘু' শব্দের প্রতিশব্দ হলো 'Peristera'। 'ওডেসী'তে আছে, ঘুঘু জিউসের কাছে 'অমৃত' এনে দেয়, শ্যেন যেমন বেদে 'সোম' এনে দিয়েছিল। ঘুঘুকে ভেনাসের সহচারীরূপে কখনো বা ত'ার রথের আকর্ষক রূপে দেখা যায়।

সর্বশেষে শুক ও ময়ূরের কথা। শুক সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনী প্রাচ্য দেশেই প্রথম রচিত হয় এবং এখানেই তা ব্যাপকতা লাভ করে। শুকের দেহবর্ণ হলো সবুজ। 'সবুজ' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো 'হরি' বা 'হরিৎ'। একটি বৈদিক

সূক্তে আছে, সৌর অশ্বগণ বলছে, তারাই শুকপাখি (মতান্তরে ময়ূর বা অন্য পাখি) এবং গাছ-গাছালিতে হরিদ্বর্ণ সঞ্চারিত করেছে। এর ফলে শুককে সৌরজগৎ ও বৃক্ষজগতের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা সম্ভব হয়।

শুকের ঠোঁট ও পা লাল ও হলুদ রঙের। এই রঙের সঙ্গে চাঁদের আলোর সাদৃশ্য আছে। এদিক থেকে শুককে চাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়। চাঁদ রাত জাগে যেন রাতে দেখতে পায়, যেন সকল অজ্ঞতার 'অন্ধকার' দূর করতে সমর্থ সে,—এবং সে জন্যেই বিজ্ঞ বলে কল্পিত। আর সেই চাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত শুক পাখিও তাই। বস্তুতঃ ভারতীয় সব পুরাণেই শুককে বিজ্ঞ ও বিদ্বান পুরুষ বলা হয়েছে। মহাভারতের গোড়াতেই কৃষ্ণ-পুত্র শুকের উল্লেখ আছে। এর আসল অর্থ হলো, চাঁদের মতোই সে মহাভারত রহস্যের অন্ধকার দূর করতে সমর্থ। তাই দৈত্যদের কাছে সে মহাভারত পাঠ করে। রামায়ণে দেখা যায়, দৈত্যদের মুখ শুক-সদৃশ,—প্রসঙ্গত তাও উল্লেখযোগ্য।

চাঁদ লিঙ্গের প্রতীক বলে কথিত হয়। চাঁদের সঙ্গে একাত্ম বলে শুকও তাই। কাম-দেবতা মদন তাই শুক বাহন। সংস্কৃত ভাষায় 'চাঁদ' একটি পুংলিঙ্গ শব্দ। বিদ্যুৎ যেমন মেঘ ভেদ করে প্রকাশিত হয়, চাঁদও তেমনি অন্ধকার ভেদ করে প্রকাশিত হয়। এই ভাবে চাঁদ লিঙ্গের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই ভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে 'শুক-সপ্ততি'[১] প্রভৃতি আখ্যায়িকাতে, শুকের সঙ্গে রাতের আসঙ্গ প্রদর্শিত হয়েছে। রাতের বেলাতেই তাই শুক পাখি সক্রিয়। বিভিন্ন প্রেমের উপাখ্যানে এই কারনেই শুক গোপন ও অবৈধ প্রণয়কথা ফাঁস করে দেয়। সুবন্ধু-র 'বাসবদত্তা'য় প্রেমিকের সন্ধানে টিয়ে পাখিকে নিযুক্ত করা হয়েছে শুকের এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে পশ্চিমা সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে। গ্রীস দেশের অতি প্রাচীন কালেই এ বিশ্বাস ভারত থেকে চলে যায়।

ভারতীয় পুরাণে ইন্দ্রকে যেমন আকাশ, সূর্য, ময়ূর, কোকিল বলা হয়েছে, গ্রীক পুরাণে তেমনি জিউসকে। এর থেকে আর দুটি কথা এসে পড়ে ; কোকিলের সঙ্গে ময়ূরের অভিন্নতা এবং ইন্দ্রের উৎসঙ্গে ময়ূরের সঙ্গে আকাশ ও সূর্যের একাত্মতা। রামায়ণের এক জায়গায় দেখা যায়, কোকিলের কণ্ঠস্বরের প্রতিস্পর্ধিতা করেছে ময়ূর (তুলনীয় ঃ 'এপারে মুখর হল কেকা ওই' গানে রবীন্দ্রনাথ কুহু ও কেকার বিরুদ্ধতার সহাবস্থান প্রদর্শন করেছেন) এর মধ্যেও এক ধরনের সাদৃশ্য আছে।

ইন্দ্র, আকাশ ও সূর্য। ইন্দ্র-অহল্যার অবৈধ সঙ্গমের জন্যে গৌতম ঋষির অভিশাপে, ইন্দ্রের সর্বদেহে যোনিবৎ 'চোখ' দেখা যায়। ময়ূরের পালকেও আছে 'চোখ'। শান্ত নীল আকাশ যেন ময়ূরের গাত্রবর্ণ, আর নক্ষত্রখচিত আকাশ 'চোখ'-সহ ময়ূরের পালক। ইন্দ্রের গাত্রে আছে 'সহস্রযোনী', তাই সূর্যকে বলে 'সহস্রাংশু'। ইন্দ্রের অনেক নাম : 'সহস্রদৃশ্', 'সহস্রনয়ন', সহস্রাক্ষ'। ময়ূরেরও আছে সহস্রচোখ।

১। কাহিনীর কাঠামোটি এই ঃ শুক ও যুবতী স্ত্রীকে ঘরে রেখে স্বামী বাণিজ্যে গেলে, অসতী স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করতে উদ্যত হলো। চতুর শুক তখন সত্তর দিনে সত্তরটি চমকপ্রদ কাহিনী বলে স্ত্রীলোকটিকে নিবৃত্ত করে। ধূর্ত স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের কিভাবে বঞ্চনা করে, কথাগুলি তাই দেখানো হয়েছে।

রামধনুর সপ্তবর্ষ, যা মূলতঃ সূর্যের, তা ময়ূরের কণ্ঠে ও পালকেও আছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ইন্দ্রের ঘোড়াও ময়ূর পালকে সজ্জিত (৩. ৪৫. ১), তার ল্যাজও ময়ূরের মতো (৮. ১. ২৫)।

কোকিল ছাড়াও ময়ূরের সঙ্গে একাধিক পাখির যোগ দেখা যায়। সংস্কৃতে 'শিখী' বলতে মোরগ এবং ময়ূর দুইকেই বোঝায়। সংস্কৃতেই 'ময়ূরচাতক' বলতে বোঝায় —গৃহপালিত কুক্কুট। ঈশপের গল্পে দেখি, কাক ময়ূর সাজার চেষ্টা করেছে।

ময়ূরের দীর্ঘ ও দীপ্ত লেজ লিঙ্গের প্রতিরূপ যেন। এই জন্যেই লিঙ্গ দেবতা শিবের নামান্তর—'ময়ূরেশ্বর। রণদেবতা কার্ত্তিক হলেন—ময়ূররথ, ময়ূরকেতু শিখিবাহন, শিখিধ্বজ। ময়ূরবাহন কার্ত্তিককে তাই একটি লিঙ্গ দেবতা (Phallic god) বলা যায়।

ইউরোপীয় লোকসংস্কারে ময়ূর সম্পর্কে একটি মিশ্র অনুভূতি দেখা যায়। জার্মানীর প্রাচীন কবি বলেন: 'ময়ূরের পাখায় আছে দেবদূতের সৌন্দর্য' কণ্ঠে শয়তানের কণ্ঠস্বর, আর তার চলন-ছন্দ চোরের মতো! জুপিটার-প্রিয়া, দেবরানী জুনো-র প্রিয় পাখি হলো ময়ূর। এই জন্যেই গ্রীষ্মে ময়ূরকে বলে 'Avis Junonia' বা Alcs Junonia'। দেবী জুনো হিংস্রতায়, কুটিলতায়, স্বার্থপরতায় হেলেনীয় পুরাণে যথেষ্ট কুখ্যাত।

এ বিষয়ে হেলেনীয় পুরাণের কাহিনী এই: দেবরাজ জুপিটার নদী দেবতার কন্যা আইও (Io)-র প্রেমে পড়লে রানী জুনো খুব রেগে গেলেন। একদিন সরাসরি ধরা পড়ে গেলে জুপিটার পরিত্রাণ পাবার জন্যে আইও-কে একটি সাদা বকনা বাছুরে পরিণত করে দিলেন। জুনো সে বকনা বাছুরটিকে নিয়ে অর্গাস্ (Argus) নামে এক ভৃত্যের পাহারায় রেখে দিলেন। আর্গাস-এর ছিল 'শত চোখ'। জুপিটারের নির্দেশে, তাঁর পুত্র মার্কারি ছলা-কলার আশ্রয় নিয়ে আর্গাসের মাথা কেটে নেয়। জুনো তখন আর্গাসের 'শতচোখ' ময়ূরের পালকে খচিত করে দিলেন। ময়ূর জুনোর সহচর প্রাণী ছিল।

ভারতীয় পুরাণে মাছরাঙা (The King fisher) এবং Halcyone সম্পর্কে কোনো উপাখ্যান মেলে না। গ্রীক পুরাণে এ বিষয়ে করুণ ও সুন্দর আখ্যান চলিত আছে: Ceyx নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর রানীর নাম Halcyone। Ceyx একবার সমুদ্র-যাত্রায় গেলেন এবং যাত্রার পঞ্চম দিনে নৌকোডুবি হয়ে মারা গেলেন। দেবী জুনো তাঁর দূত আইরিস (Iris) কে পাঠালেন স্বর্ণদেবীর কাছে, যাতে স্বপ্নে Halcyone তাঁর স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পান। সংবাদ শুনে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। দেবতারা করুণা করে তাকে মাছরাঙা বা Halcyone পাখিতে পরিণত করে দিলেন। আজও সমুদ্রের নাবিকেরা বিশ্বাস করে, সমুদ্র শত অশান্ত হলেও, Halcyone পাখির ডিম পাড়বার সময় সাতদিন (মতান্তরে চোদ্দ দিন) তা স্থির বা প্রশান্ত থাকবেই। এই ক'দিনকে বলে 'Halcyone days'। এর থেকে অর্থের পরিবর্ত্তন হয়ে, মানুষের জীবনের নির্ঝঞ্ঝাট, সুখশান্তির সময়কে বোঝানো হয়।

রামায়ণের পটভূমিকার প্রসঙ্গে পাখির ভূমিকা কী, রামায়ণের পরিকল্পনায় তিনটি পক্ষী' (মানসী ও মর্মবাণী। জৈষ্ঠ, ১৩৩৩।পৃঃ ৩১৩-৩১৭) নামে একটি প্রবন্ধে দীননাথ সান্যাল একদা আলোচনা করেছিলেন। পাখি তিনটি পারিবারিক সম্পর্কে বাঁধা —জটায়ু, সম্পাতি, সুপার্শ্ব। জটায়ু পঞ্চবটী, সম্পাতি বিন্ধ্যপর্বত এবং সুপার্শ্ব ভারত উপকূলে বিচরণ করে। এই তিন পাখির ইঙ্গিত ও নির্দেশেই রামায়ণের পটভূমিকা ক্রমেই দক্ষিণে সরতে থাকে। জটায়ুই প্রথম রামকে জানায়, সীতাকে হরণ করে রাবণ দক্ষিণ দিকে গেছেন ; তারপর সম্পাতি এবং তাঁর পুত্র সুপার্শ্বের কাছ থেকেই বানর সৈন্যগণ জানতে পারে, অশোক বনে সীতা তখনও বন্দিনী।

সম্পাতি ও জটায়ু একবার সূর্যকে স্পর্শ করবার স্পর্ধা নিয়ে আকাশের অতি উচ্চদেশে চলে যান। জটায়ু সূর্য তেজে কাতর হয়ে পড়লে সম্পাতি নিজ পক্ষ বিস্তার করে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁর দুটি পাখা সূর্যতেজে পুড়ে যায়। সেই থেকে জরাগ্রস্ত হয়ে তিনি বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থান করেছিলেন। পাখি ও সূর্যের সংযোগ এখানে দেখা যায়।

আরো কয়েকটি পৌরাণিক পাখির নাম মেলে বাস্তবে আজ আর যা দেখা যায় না। যেমন : the phoenix, the herpy, the griffon, the strix the sirens, the, seleucide birds, the stymphalian birds.

এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—'ফিনিক্স'। 'ফিনিক্স' আসলে উদয় ও অস্তকালের সূর্য। বলা হয়, ফিনিক্সের জন্ম পূর্বদিকে, সূর্যের অরণ্যে। জন্ম নেবার পর, পূর্ণায়ত হবার পূর্বে সে শিশির পান করে বাঁচে (অর্থাৎ সূর্য প্রখর হলেই শিশির শুকিয়ে যায়, যেন ফিনিক্সই তা নিঃশেষে পান করে নেয়), অতঃপর সবই খায়। প্রতিদিন তার জন্ম হয়, প্রতিদিন তার মৃত্যু হয়। দিনের শেষে, মরণের পূর্বে, সে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে ফিনিক্স প্রতিদিন সূর্যের বন্দনা করে, এবং সূর্য থেকেই প্রতিদিন তার পুনর্জন্ম ঘটে ঊষাকালে। একমাত্র ফিনিক্সই তাই সূর্যের রহস্য জানে। স্পষ্টই বোঝা যায়, ফিনিক্স এবং সূর্য এক ও অভিন্ন। দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে ফিনিক্সেরও আয়ু বাড়ে কমে। মধ্য যুগের মানুষদের বিশ্বাস ছিল সূর্য প্রতিদিন সকালে জন্ম নিয়ে বিকেলে মারা যায়, রাত্রির অন্ধকার গর্ভে তার পুনর্জন্ম ঘটে। শুধু প্রতিদিনই নয়, প্রতি বৎসরও সূর্যের জন্ম ও মৃত্যু হয়, আপন ভস্ম থেকেই তার পুনর্জন্ম ঘটে। ফিনিক্সের মধ্যে এই বিশ্বাসই সঞ্চারিত।

সূর্য সম্পর্কে ভারতীয় পুরাণেও এই কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (৮. ৮৫. ১৩) এবং অথর্ব বেদে (৬ ৫২ ১) কথিত আছে, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দশ সহস্র রাক্ষস সূর্যকে আক্রমণ করে এবং সূর্য তাদের নিধন করেন। ঋগ্বেদ : ১. ৩৫. ১০ । 'বিষ্ণু-পুরাণে' বলা হয়েছে :

সন্ধ্যাকালেতু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরম দারুণে
মন্দে হাঃ রাজসাঃ সর্বে সূর্যং ইচ্ছান্তি খাদিতুম্।
— বি. পু. ২।৮। ৪৫-৪৭

সূর্য যে প্রতিদিন উষাকালে নবজন্ম লাভ করে, ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে (১০. ৫৫. ৫)। প্রতিবৎসর, দক্ষিণায়নের শেষে. উত্তরায়ণের প্রারম্ভে সূর্য নবজীবন লাভ করেন। অথর্ববেদে এজন্যেই সূর্যকে 'বর্ষজীবী' বলা হয়েছে (৯.৯.৫)।

সূর্যের সঙ্গে অরুণ ও গরুড়ের সংযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। সূর্যকে পাখি বলে মেনে নিলে, সূর্য ও ফিনিক্সের অভিন্নতার মাধ্যমে, ফিনিক্সের সঙ্গে পাখির প্রসঙ্গটি ভালো করে বোঝা যাবে।

Strix-এর সঙ্গেও সূর্যের নিগূঢ় যোগ আছে। বিকেল ও সন্ধ্যেবেলায়, শিকারী এবং সৌর পাখিরাই (The solar birds) তাদের তীক্ষ্ণ ও ভয়ংকর নখ দিয়ে অন্ধকার রূপী দৈত্যকে যেন হত্যা করে,—সূর্যের পুনর্জন্মের পথ প্রশস্ত করে। Strix দের মুখশ্রী মনোরম, কিন্তু দেহের অবশিষ্টাংশ ভয়ংকর।

গ্রীক লেখকদের মতে, সাইরেনদের মুখের দিকটা চড়ুই পাখির মতো, দেহের নীচের দিকটা স্ত্রীলোকের মতো। হার্পিদের বর্ণনা দিয়েছেন ভার্জিল এবং দান্তে। হার্পিদের মুখ স্ত্রীলোকের মতো। অপর লেখকদের মতে হার্পিদের দেহ শকুনের মতো॥

১০

ভারতীয় পুরাণ গুলিতে পাখির অন্যান্য ভূমিকা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে প্রসঙ্গগুলো হলো, মানুষের জন্ম, প্রেম ও যুদ্ধের সঙ্গে পাখির যোগ। অন্যান্য দেশের পুরাণ গুলিতে এ সব প্রসঙ্গ থাকলেও ভারতীয় পুরাণের মতো বিশিষ্টতা অর্জন করে নি। এ বিষয়ে ভারতীয় পুরাণ থেকে কয়েকটি উপাখ্যান স্মরণ করছি।

ঋষি কশ্যপ এবং দক্ষকন্যা বিনতার পুত্র গরুড়। গরুড় ডিম্বজাত। সে অর্ধেক পাখি, অর্ধেক মানুষ। মহাভারতের আদিপর্বে আছে মাতা বিনতাকে বিমাতা কদ্রুর দাসীত্ব থেকে মুক্ত করবার জন্যে গরুড় যখন অমৃত আহরণে ব্যাপৃত, ইন্দ্র তখন তাকে বজ্রাঘাত করেন। তাতে গরুড়ের কিছু হল না, কেবল ইন্দ্র ও দধীচিমুনির সম্মানে সে নিজের একখানি পালক ফেলে দেয়। দেবতারা সেই সুন্দর পালক দেখে গরুড়ের নাম দেন 'সুপর্ণ'। জন্মকালে গরুড়ের দেহ-বর্ণের ঔজ্জ্বল্য থেকে তাকে অগ্নি বলে ভুল করা হয়। ইন্দ্রের বজ্রও তাকে কিছু করতে পারেনি, গরুড় তাই অগ্নিজয়ী। ইন্দ্রের নামান্তর 'উলূক'। কাজেই ইন্দ্র গরুড়ের দ্বন্দ্ব আসলে দুই পাখির যুদ্ধ।

এই দ্বন্দ্ব অন্যত্র দেখা যায়। ঋগ্বেদে আছে, একবার কশ্যপ ঋষি পুত্র কামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করেন। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্যদের তিনি যজ্ঞের কাঠ আনতে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্র সেই বালখিল্যদের উপহাস করায় তারা অধিকতর বলশালী অপর এক ইন্দ্রের আবির্ভাবের জন্যে যজ্ঞ করতে থাকে। তখন কশ্যপ বলেন, অপর এক ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ না করে এক পক্ষিশ্রেষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করবে। সেই-ই হল গরুড়।

এই দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে পাখি ও সাপের দ্বন্দ্ব-কথাও উল্লেখযোগ্য। পাখি ও সাপের যুদ্ধের প্রাচীনতম নিদর্শন, আগেই বলেছি, ঋগ্বেদে মেলে (১. ৩২. ১৪),—সর্পদানব অহীকে শ্যেন যেখানে পরাভূত করেছে। বিষধর সাপ কালীয় গরুড়ের কাছে পরাভূত হয়ে হ্রদে আশ্রয় নিয়েছে। কৃষ্ণ কালীয়কে সমুদ্রে চলে যেতে বলেন। অভয় দিয়ে বলেন, কালীয়ের মাথায় কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখলে গরুড় আর তাকে আক্রমণ করবে না। আসামের বিভিন্ন নাগা উপজাতিদের সৃষ্টি-পুরাণে পাখি ও সাপের যুদ্ধ এক প্রধান ঘটনা।

জটায়ু-সম্পাতির কথাও এখানে বলা যায়। জটায়ু হলো গরুড়ের ভাই-পো। সেও সকল পাখির ওপর আধিপত্য করত, তাই তারও এক নাম 'পক্ষিরাজ'। জটায়ু দশরথের বন্ধু। জটায়ুই রামচন্দ্রকে প্রথম সীতাহরণের সংবাদ দেয়ঃ রাবণ সীতাকে হরণ করে দক্ষিণ দিকে গেছেন। রাবণ জটায়ুর ভীষণ যুদ্ধে জটায়ুর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর রাম লক্ষ্মণ তার সৎকার করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধের কথা আছে। বশিষ্ঠ ছিলেন রাজা হরিশচন্দ্রের কুল-পুরোহিত। হরিশচন্দ্রের জীবনে দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী বিশ্বামিত্রকে অভিশাপ দিয়ে বশিষ্ঠ এক বক পক্ষীতে পরিণত করে দেন। নিজেও এক পাখিতে পরিণত হন। শেষে পক্ষিরূপেই এই দুই মুনি এমন ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হন যে, পৃথিবী তাতে কেঁপে উঠতে থাকে। শেষে ব্রহ্মা এসে কলহ থামান।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এর দৃষ্টান্ত মেলে। কংসের অনুচর বকাসুর, বক রূপ ধরে, কৃষ্ণকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করে। কৃষ্ণ বকাসুরের চোখ দুটি বিদীর্ণ করে তাকে নিহত করেন। মহাভারতের বনপর্বে পাওয়া যায় বক রাক্ষসের কথা। ঋষ্যশৃঙ্গ রাক্ষসের দুই পুত্রের মধ্যে একজন হলো এই বকরাক্ষস। ভীম তাকে নিহত করেন।

ব্রহ্মদত্তের দুই স্ত্রীর গর্ভে দুটি সন্তান জন্মায়। জ্যেষ্ঠের নাম হংস, কনিষ্ঠের নাম ডিম্বক। ঔদ্ধত্যের জন্যে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে হংস প্রাণ হারায়। সাত্যকির ভয়ে ডিম্বক যমুনায় প্রাণ বিসর্জন করে। অপর মতে, হংসের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে কাতর হয়ে ডিম্বক আত্মহত্যা করে এবং তারপর হংস নিজে যমুনায় ডুবে মারা যায়।

এইবার পাখির সঙ্গে জন্মের যোগের কথা বলি। সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মার কথা ওঠে। স্বর্ণডিম্ব বা স্বর্ণগর্ভ রূপে সৃষ্টির আদিতে জন্ম নিয়ে ইনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবীকে এইজন্যেই বলা হয় 'ব্রহ্মাণ্ড'। আদি পুরুষ প্রথমে জল সৃষ্টি করে সেই জলে বীর্য নিক্ষেপ করলেন। সেই বীর্য হিরণ্য বর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হলো, তাই থেকে ব্রহ্মার জন্ম (বিষ্ণু পুরাণ, কূর্মপুরাণ)। ব্রহ্মাকে কখনো কখনো 'কলহংস' বলা হয়।

মহাভারতে আছে, সুক্তিমতী নামে নদী ও 'কোলাহল' নামে পর্বতের কন্যা গিরিকা-কে চেদি-রাজ বসু বিবাহ করেন। একদিন মৃগয়া কালে গিরিকার স্মরণে বসুর শুক্র স্খলিত হলো। এক শ্যেন পাখির সাহায্যে সেই রেতঃ তিনি গিরিকার কাছে পাঠালেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণে সেই বীর্য নদীতে পড়ে যায়।

অদ্রিকা নাম্নী এক মৎসী সেই বীর্য পান করে গর্ভবতী হয় এবং দুটি সন্তান প্রসব করে। পুত্রটি মৎস্য নামে এক ধার্মিক রাজা হন, কন্যাটির নাম হয় সত্যবতী। ইনিই মৎস্যগন্ধা নামে পরিচিতা এবং ব্যাসদেবের জননী।

একবার ঘৃতাচী নাম্নী এক অপ্সরাকে দেখে ব্যাসদেবের বীর্যস্খলন ঘটে। ঘৃতাচী শুক পক্ষীর আকার ধরে পলায়ন করে। এই রেতঃপাত থেকেই শুক দেবের জন্ম হয়। রেতঃপাতের পর ব্যাসদেব শুক পাখিকে দেখেছিলেন, তাই পুত্রের নাম রাখেন শুকদেব।

অপুত্রক ঋষি মন্দপাল পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় সারঙ্গিকা পাখির রূপ ধরেন এবং জারিতার গর্ভে চারটি পুত্র লাভ করেন। এই চার পুত্রই বেদব্যাখ্যাকাররূপে খ্যাত হন। এঁদের দুজনের রচিত স্তোত্র ঋগ্বেদে আছে। এই প্রসঙ্গে অপর বৈদিক ঋষি বামদেবের কথা বলা যায়। একটি বৈদিক মন্ত্রে তিনি বলেছেন : শ্যেনের মতো দ্রুত-গতিতে তিনি এসেছেন। এর ভাষ্যে বলা হয়েছে, তিনি যোগবলে শ্যেনের রূপ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হন।

প্রজাপতি কশ্যপ তাঁর দ্বাদশ স্ত্রীর মাধ্যমে বিচিত্র ধরণের প্রাণী সৃষ্টি করেন : দস্যু, নাগ, পাখি, ইত্যাদি। 'যাতু' বা 'যাতুধান' নামে তাঁর যে দৈত্য-পুত্রগণ, তাদের একটি রূপ হলো শকুনের।

দুর্যোধনাদির মাতুলের নাম শকুনি। শকুনির পুত্রের নাম 'উলূক'। পিতা-পুত্রের নামকরণ লক্ষণীয়। 'শকুন্ত' শব্দের অর্থ 'পাখি'। পাখি কর্তৃক রক্ষিত বলেই, মালিনী নদীর তীরে পরিত্যক্ত, বিশ্বামিত্র-মেনকার সন্তানের নাম হয় 'শকুন্তলা'।

জন্মের প্রসঙ্গে জন্মান্তরের কথাও বলা যায়। 'বিষ্ণু পুরাণে'র কাহিনী অনুসারে, শতধনু ছিলেন একজন রাজা ; তাঁর স্ত্রীর নাম শৈব্যা। শতধনুকে বিভিন্ন জন্মে নানা পশু-পাখি হয়ে জন্মাতে হয়। যেমন, কুকুর, শৃগাল, বৃক ; গৃধ্র, কাক, ময়ূর। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ-পুরাণের কথা মনে পড়ে যায়। বুদ্ধদেব মোট ৫০৬ বার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রাণীর আকারে জন্ম নিয়েছিলেন। তার মধ্যে হংস ৮ বার, কাদাখোঁচা ও কুক্কুট ৬ বার করে, শিকারী পাখি ৫ বার, ময়ূর ৪ বার, কাক ও কাঠঠোকরা ২ বার, জলপক্ষী অন্য বিশেষ এক ধরনের কুক্কুট, বন্য কুক্কুট ও চিল একবার করে হয়েছিলেন।

ভারতীয় পুরাণাদিতে দেখা যায়, মানুষের সম্পদে-বিপদে পাখি একদিকে যেমন সহায়তা করেছে, অপর দিকে তেমনি ছদ্মবেশ ধারণ, ছলনা ও আত্মগোপন প্রভৃতি কর্মেও সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে। এই দুই বিপরীত কর্মের বিশিষ্ট উদাহরণ মহাভারতের নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান। নল-দময়ন্তীর প্রেমের ক্ষেত্রে হংসের দৌত্য খুবই হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার ; কিন্তু কলির অভিশাপে রাজ্যচ্যুত, ক্ষুধাক্ষিন্ন নলকে স্বর্ণবর্ণ পাখিরা যেভাবে ছলনা করেছে, তা সমপরিমাণেই হৃদয়-বিদারক। পাখির রূপ ধারণ অবশ্য মানুষকে অনেক বিপদ থেকেই উদ্ধার করেছে। রামায়ণে আছে, উশীরবীজ দেশে মরুত্ত যখন যজ্ঞ করছিলেন, রাবণ তখন হঠাৎ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ ময়ূর, কাক, হংস প্রভৃতির রূপ ধারণ করে আত্মগোপন করেন॥

ইচ্ছে করেই এ পর্যন্ত আরব্য ও ইজিপ্‌শীয় পুরাণ সম্পর্কে কোনো কথা বলি নি। এইবার সে প্রসঙ্গে আসি।

আমার মতে ইজিপ্‌শীয় পুরাণের মধ্যে তিনটি দিক থেকে বিহঙ্গচারণাকে লক্ষ করা যায়: প্রথমতঃ, পাখিকেই দেবতা রূপে লক্ষ্য করা, অর্থাৎ পাখির zoomorphic দিক; এটাই হল সেখানকার দেব রূপের প্রাচীন ও প্রাথমিক স্তর। দ্বিতীয়ত: দেবতাদের অর্ধ-মনুষ্য ও অর্ধ পক্ষিরূপ, অর্থাৎ তাঁদের Theriomorphic রূপকল্পনা; এবং তৃতীয়তঃ, মানুষের আত্মা ও পাখির মধ্যে অভিন্নতা দর্শন। এই একাত্মীকরণের মাধ্যমেই পাখির Anthropomorphic দিকটি পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে পরিকল্পিত ও প্রচলিত হয়েছে।

পাখিকে অবিকৃত রেখেই তাকে পূজা উপাসনা করা প্রাচীন ইজিপ্টে দেখা গেছে। যে পাখি সর্বাধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে, সে হলো এক ধরনের বক্রচঞ্চু জলচারী, সারস জাতীয় পাখি—'Ibis'। শব্দটি একটি গ্রীকল্যাটিন শব্দ। পাখিটি ইজিপ্টের প্রধান দেবতা 'থথ্‌' Thoth) এর বাহন। প্রাচীনকালে হারমোপোলিস্‌ (Hermopolis) শহর ছিল আইবিস পাখি উপাসনার কেন্দ্রভূমি। হেরোডেটাস্‌ (Herodetus) এই আইবিস পাখি সম্পর্কে চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আরব দেশের 'বুটো' (Buto শহরের নিকটবর্তী একটি স্থানে এ বিষয়ে একটি বিশ্বাস আছে: প্রতিবৎসর পশ্চিমী ঝড়ের সঙ্গে পক্ষবান্‌ সাপেরা চলে আসে। আইবিস পাখিরা সেই সাপদের বিনাশ করে মানুষকে রক্ষা করে। হেরোডেটাস নিহত সাপদের স্তূপীকৃত অস্থিও নাকি দেখেছেন। একটি সংকীর্ণ গিরিসংকটের মুখে পাখি ও সাপদের এই বার্ষিক যুদ্ধ ঘটে। প্রতিবৎসর বসন্তকালে আরব দেশ থেকে ইজিপ্টের দিকে পশ্চিমী ঝড়ের বাতাসে এই পক্ষবান্‌ সাপেরা উড়ে আসতে থাকে; কিন্তু ওই গিরিসংকটের মুখে এসে পৌঁছতেই আইবিস পাখিরা তাদের নিহত করে। এ পাখির রঙ কালো, পা সারসের মতো। ত্রাণকারী বলে ইজিপশীয়েরা পাখিটিকে বিশেষ ভক্তি করে থাকে। পাখি ও সাপের যুদ্ধ পৃথিবীর সব দেশের পুরাণেই আছে।

অপর একটি সারস জাতীয় পাখিও ইজিপ্টে বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে,—'the Bennu,' পৌরাণিক phoenix পাখির পরিকল্পনার পেছনে এ পাখিই আছে অনুমান করা হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সঙ্গে পাখিটির আছে নিবিড় ও গভীর যোগ। বহু কথা কাহিনী গড়ে উঠেছে পাখিটিকে কেন্দ্র করে। Herodetus এবং cliny তার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন:

মিশরের হিলিওপোলিস্‌ নগরীর সূর্যমন্দিরে সংঘটিত এক উপাখ্যান এখানে স্মরণ করা যায়। ফিনিক্সের জন্মস্থান আরব। সাধারণতঃ এক একটি ফিনিক্স ৫।৬ শ' বছর

জীবিত থাকে এবং গোটা দেশে একসঙ্গে একটির বেশি থাকে না। কখনো আরবে, কখনো আফ্রিকার মরুভূমিতে কখনো সাগর বক্ষে খাদ্যান্বেষণে সে উড়ে বেড়াত। কাল পূর্ণ হলে বৃদ্ধ পাখি নিজের মৃত্যু সন্নিকট জেনে কোনো উঁচু গাছে বা পাহাড়ের চূড়োতে নীড় নির্মাণ করত। কাঠ এবং নানা সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে তৈরি হত তা। চারিদিক সুগন্ধে ভরে যেত। বৃদ্ধ পাখি নীড়ে শয়ন করত, এবং সে ভাবেই তার মৃত্যু হত। তার অস্থি মজ্জা থেকে বের হত একটি ক্ষুদ্র কীট। এই ক্ষুদ্র কীটই ক্রমে বড়ো হয়ে নবজাত ফিনিক্সে পরিণত হত। নবজাত ফিনিক্সের প্রথম কর্ত্তব্য পিতার অন্ত্যেষ্টি সাধন। একটি ডিম্বাকৃতি গোলক নির্মাণ করে, নানা সুগন্ধ দিয়ে তা পূর্ণ করা হত। একদিকে রাখা হত একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, সেই ছিদ্র পথে পিতার মৃতদেহ প্রবেশ করিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হত। তারপর নবীন ফিনিক্স তা বহন করে নিয়ে যেত হিলিওপোলিসের সূর্য মন্দিরে। সেখানার পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে পিতার মৃতদেহ নিক্ষেপ করে তা ভস্মে পরিণত করত। পরবর্তী পাঁচশত বছরের জন্যে আহার অন্বেষণ বিশ্রাম ব্যতীত তার আর কোনো কাজ থাকত না। ফিনিক্স দেখতে উৎক্রোশের মতো। মাথায় নানা বর্ণের উজ্জ্বল ঝুঁটি, গলার পালক সোনালী, দেহের অবশিষ্টাংশ বেগুনী। পুচ্ছদেশে শ্বেত ও রক্তবর্ণ পালক, চোখ দুটি প্রভাত সূর্যের মতো উজ্জ্বল।

Horus, Ra এবং osiris প্রভৃতি দেবতার প্রিয় পাখিরূপে শ্যেনের নাম পাওয়া যায়। শ্যেন সৌর-পাখি। ভারতেও তা দেবতার সংগে জড়িত। শ্যেনকে মনুষ্য-মুণ্ড ধারণকারী রূপেও দেখা যায়। তখন শ্যেন মানবাত্মার প্রতীক। Osiris-এর প্রসঙ্গে আবাবিলের (Swallow কথা শোনা যায়। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেছেন, Isis একটি আবাবিলের রূপ ধরে osiris-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিলেন।

কোরানশরীফে (৩০ পারা, ১০৫ সংখ্যক সূরা) আবাবিলের সক্রিয় ও প্রশংসাত্মক ভূমিকা আছে। ৫৭০ খৃীষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদের (সঃ=তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জন্ম গ্রহণের কয়েকদিন পূর্বে এক ঘটনা ঘটে। এয়েমেনের শাসনকর্তা আবরাহা পবিত্র কাবা-গৃহ ধ্বংস করবার জন্যে মক্কা আক্রমণ করেন। আবরাহা হস্তীযূথ নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার অলৌকিক কৌশলে প্রেরিত ঝাঁকে-ঝাঁকে আবাবিল পাখিরা এসে সসৈন্যে আবরাহাকে নিহত করল [কোরান শরীফে বলা হয়েছে : অ আর্‌সালা আলাইহিম্‌ তয়রান্‌ আবাবিল." অর্থাৎ "এবং তিনি (ঈশ্বর) তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল নামে পক্ষিকুল প্রেরণ করেছিলেন।" 'তায়ের' হলো আরবী ভাষায় পাখির প্রতিশব্দ]।

যাই হোক, আরব্য ও ইজিপশীয় পুরাণে আবাবিলের সম্মানের সাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্যেই এখানে তথ্যটির উল্লেখ করা গেল। দ্বিতীয়ত; পাখীর যুদ্ধ-প্রবণতা। এখানে অবশ্য সাপের বদলে হাতির কথা পাই।

দেব Isis-এর প্রিয় পাখি রূপে হাঁসের নাম বলা হয়েছে। দেবী Nekhebet-এর প্রতীক হলো-শকুন।

এইবার মিশরীয় দেবদেবীর রূপ কল্পনায় পাখিও মনুষ্যমূর্তির মিশ্রণের কথা বলি। মিশরের প্রধান দেবতা হলেন 'Thoth' বা 'Tehuti'। তিনিই হলেন সকল জ্ঞান ও বিদ্যার উৎস। বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'The book of the dead' তাঁরই রচনা বলে কল্পিত। তাঁর মুখটি আইবিস পাখির দেহটি মানুষের। অনেক সময় কেবল আইবিস পাখির দ্বারাই তাঁকে কল্পনা করা হয়।

'Thoth'-এর স্ত্রীর নাম 'M-aat'। তাঁর বাহন বা প্রতীক হলো উটপাখি। তিনি হয় উটপাখি ধারণ করে থাকেন, নয়তো তাঁর শিরোভূষণরূপে থাকে এ পাখির পালক।

অতীত প্রাচীনকাল থেকেই সূর্যদেবতা 'রা' (Ra) ইজিপ্টে সম্মানিত হয়ে আসছেন। পরবর্তী কালে তিনি সৃষ্টির দেবতা হয়ে যান। এরই ফলে শ্যেন দেবতা 'Horus' বা 'Heru' 'রা'র সঙ্গে মিলিত হয়ে যান। Ra এবং 'Horus' দুজনেরই শ্যেন-মুণ্ড এবং মানব-দেহ। কখনো বা কেবল শ্যেন রূপেই এঁদের কল্পনা করা হয়। দূর অতীতকাল থেকেই ইজিপ্টে শ্যেন সূর্যের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটি ভারতেও দেখা গেছে।

শ্যেন-মুণ্ড অপর একটি দেবতা হলেন 'Soker'। আর একজন দেবতা Amen, এঁর নানা রূপ কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর পরিচিত মূর্তি এই: মুখে দাড়ি, এবং মাথায় ভূষণরূপে আছে দীর্ঘ ও ঋজু পক্ষি-পালক। পরবর্তী কালে তিনি শ্যেন-মুণ্ড ধারণ করে Ra-র সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছেন। তখন তাঁর নাম হয় 'Amen-Ra'। 'আমেন-রা'র স্ত্রীর নাম 'Mut' ('the world—mother') কোনো কোনো ছবিতে তাঁকে পক্ষ-সহ দেখা যায়; কখনো বা দেখা যায়, তাঁর ঘাড়ের ওপরে রয়েছে শকুনের মুণ্ড।

'Animal transformation' ইজিপ্টের লোকবিশ্বাসে নিশ্চিতই প্রচলিত ছিল, ফলে মানবাত্মার সঙ্গে পাখির একাত্মতা সম্ভব হয়েছে। দেবতা ও মানুষ নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী জন্মান্তরে যে কোনো পশু-পাখি বা গাছের রূপ নিতে পারে,—এ বিশ্বাস সেখানে ব্যাপক ভাবে ছিল। সাধ অনুযায়ী জন্মগ্রহণের জন্যে মৃত্যুর পর কি কি করণীয়, সে বিষয়ে 'The book of the dead'-এর দীর্ঘ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ জুড়ে বিস্তৃত নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে।

ইজিপ্টে আত্মার প্রতীক হলো 'বা' (The 'Ba')। এর মুণ্ডটি মানুষের, কিন্তু দেহটি পাখির। 'Ba' অর্থাৎ আত্মা মৃত্যুর পর দেহে বন্দী থাকে না, মুক্ত-স্বাধীন রূপে আকাশে বিচরণ করতে চায়। মৃত্যুকালে মানুষ কেন পাখি রূপে জন্ম নিতে চায়? পাখীর সঙ্গে দেবতা, দেবদূত, অনৈসর্গিক প্রাণীর অভেদ কল্পনা করবার ফলে এটি ঘটে। পৃথিবীর বহু দেশেই এই বিশ্বাস চলিত আছে বটে, কিন্তু নীল নদীর উপত্যকাবাসীদের মতো কোথাও এই বিশ্বাস দৃঢ়তা ও দীর্ঘস্থায়িতা লাভ করে নি।

এবার আরব্য পুরাণের কথা। কোরাণশরীফে আবাবিলের ভূমিকার কথা প্রাসঙ্গিক

ভাবে আগেই বলা হয়েছে। কাঠঠোকরার মতো এক ধরণের পাখিকে আরবি ভাষায় বলে 'হুদহুদ'। পাখিটিকে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত করা হত। কোরাণশরীফে (১৯ পারায়, ২৬ সংখ্যক সুরা নমলের ২০ সংখ্যক আয়াত বা শ্লোকে) এর উল্লেখ আছে। 'হাদিশ শরীফেও (পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদের বাণীকে 'হাদিশ শরীফ' বলা হয়) পাখি সম্পর্কে সংস্কার-বিশ্বাসের উল্লেখ মেলে। উল্লেখটি 'বুমা' বা 'হামা' (আরবি ভাষায় প্যাঁচাকে 'হামা বলে) সম্পর্কে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্যাঁচাকে আরবদেশে কুলক্ষণের প্রতীক বলে মনে করা হত। এ বিষয়ে আবার দুটি মত প্রচলিত ছিল। একমতে বলা হত, কবরে সমাহিত মৃত ব্যক্তির হাড় অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে এলে সেই অস্থি থেকেই 'হামা' বা প্যাঁচার জন্ম হয়। প্যাঁচার রূপ ধরেই সেই মৃত ব্যক্তি রাতের বেলায় পরিবারের খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। অপর মত এই : কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে তার স্বজনেরা যদি সেই হত্যার প্রতিশোধ না নেয়, তবে সেই ব্যক্তির আত্মা 'বুমা' বা হামা' পাখিতে পরিণত হয়। সে তখন পাখির রূপ ধরে বলতে থাকে : 'আমাকে জলপান করাও, আমাকে জল পান করাও।' প্রতিশোধ গৃহীত হলে সে তখন অন্যত্র কোথাও উড়ে চলে যায়। এইসব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হজরত মোহাম্মদ 'হাদিশ শরীফে' বলেছেনঃ "লা তায়রা অ লা হামা," অর্থাৎ, "প্যাঁচা বা অন্য কোনো পাখিতে শুভ বা অশুভ কোনো লক্ষণই নেই।" আরবি ভাষায় চড়ুই পাখিকে বলে 'উসফুর' পাখি। শহীদদের অমর আত্মাই চড়ুই পাখি হয়ে 'জান্নাত' অর্থাৎ স্বর্গে বিচরণ করে বলে সেখানে বিশ্বাস আছে।

প্রাক্-ইসলাম যুগের আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকগণ যেমন . 'ইমরোল কাইস' [মৃত্যু ৫৪০ খৃীঃ], 'নাবেগা জুবইয়ানী' [মৃত্যু ৬০৪ খৃীঃ]' 'শানফারা' [মৃত্যু ৫১০ খৃীঃ] প্রভৃতি) তাঁদের রচনায় পাখি সম্পর্কে সচেতনতা ও সংস্কার-বিশ্বাসের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। নিতান্ত আধুনিক যুগে মিশরের ডঃ তাহা হোসেন (১৮৮৯-১৯৭২ খৃীষ্টাব্দে) 'দোয়াউল কারাওয়ান' অর্থাৎ 'কারাওয়ান পাখির প্রার্থনা' নামে একটি নাটক রচনা করেছেন। 'কারাওয়ান' সারস জাতীয় জলচর পাখি, স্বর অত্যন্ত করুণ। নাটকটি মিশরের রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত, পরিশেষে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে ॥

…১২…

পাখি সম্পর্কে সকল সাহিত্যিকের মনোভাব সংকলন প্রায় অসাধ্য এক ব্যাপার। তা আমাদের উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূতও নয়। কেবল প্রসঙ্গের অনুরোধে বিশ্বের দুই সেরা সাহিত্যিক—শেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথ—এঁদের সম্পর্কে দু' কথা বলে এই দীর্ঘ অধ্যায় সমাপ্ত করছি।

শেক্সপীয়ারের পক্ষি-চেতনা সম্পর্কে এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ লোকসংস্কৃতিকে শেক্সপীয়ার বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ উভয় দিক থেকেই তিনি এ ব্যাপারে প্রভাবিত। কখনো বা তিনি দুই ভিন্ন লোকবিশ্বাসকে অভিন্ন করে এনেছেন আপন কল্পনায়। তখন সেই লোকবিশ্বাসগুলি হয়ে উঠেছে একান্ত ভাবেই শেক্সপীয়রীয়। যেমন, 'Cymbeline' নাটকে প্রখ্যাত ব্যালাড 'Babes in the wood'-এর প্রভাব মেলে :

The ruddock would
With charitable bill, O bill sore-shaming
Those rich left-heirs that let their father lie
Without a monument ! (IV, 2, 224—227)

অল্প বেশি সব নাটকেই লোকচারণা থাকলেও, 'Macbeth', 'A Mid-summer Night's Dream' এবং 'Tempest' নাটকেই পরিমাণে সব চেয়ে বেশি। 'হ্যামলেট' নাটকের ওফেলিয়া প্যাঁচাকে বলেছে 'বেকার' অর্থাৎ রুটি-বিস্কুটওয়ালার মেয়ে। এর পেছনে আছে যীশুখৃীষ্ট সম্পর্কে গোটা ইউরোপে চলিত একটি গল্প : এক রুটিওয়ালা ক্ষুধার্ত যীশুকে আশা দিয়েও শেষে রুটি দেয় নি। যীশুর অভিশাপেই সে প্যাঁচা হয়ে গেছে। ইংরেজি লোকসংগীতে অবশ্য প্যাঁচাকে রাজকন্যা বলা হয়েছে : 'Once I was a monarch's daughter…'। Othello নাটকের শেষ দিকে পাই : 'I will play the swan ; / And die in music'-এর পেছনে আছে সেই বিশ্বাস : রাজহাঁস নাকি মরবার আগে শেষ বারের মতো গান গায়। [এই কারণেই শিল্পীর শেষ সৃষ্টিকে 'Swan song' বলা হয়]। 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের জুলিয়েট বলেছে :

It is the lark that sings so out of tune,
Straining harsh discords and unpleasing sharps
Some say the lark makes sweet division ;
This doeth not so, for she divideth us
Some say the lark and the loathed toad change eyes.

ভরত পাখি সম্পর্কে শেক্সপীয়ারের এই বিশ্বাসের কারণ এখন পর্যন্ত অন্বেষণ

করা হয় নি। নাইটিঙ্গেল পাখি নাকি কীট বিশেষের কাছ থেকে চোখ ধার করে,—এ বিশ্বাস ইউরোপে আছে বটে, কিন্তু ভরত পাখি (the lark) ব্যাঙের কাছে চোখ পায়,—এ বিশ্বাস শেক্সপীয়ারের। তবু লক্ষ করতে হবে, এই সব বিশ্বাস উল্লেখ করবার সময় শেক্সপীয়ার প্রায়ই 'Some say', 'They say' ইত্যাদি বলে নিয়েছেন। আসলে এই সব বিশ্বাসকে সাহিত্যে স্থান দেবার মূলে ছিল একদিকে কাল্পনিক চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলা, অপরদিকে সমকালীন দর্শকদের অনুভূতির কাছে চরিত্রগুলিকে সত্য ও বাস্তব করে তোলা। ভরতপাখির গান সম্পর্কে দুই বিপরীত মতবাদ এই জন্যেই উল্লিখিত হয়েছে যে (তা জুলিয়েটের তৎকালীন মানসেরই প্রতিবিম্ব যদিও) তাতে বিপরীত মত-বিশ্বাসী দর্শকের সমর্থন মিলবে। কিন্তু আগেই বলেছি, শেষ পর্যন্ত শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের ঘটনা ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আপন যুক্তি ও আবেগ দ্বারাই, বহিরাগত কোনো লোকবিশ্বাস দ্বারা নয়। লোকবিশ্বাস কেবল সাহিত্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

এই একই ব্যাপার রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কেও অনেকাংশে সত্য। তবে শেক্সপীয়ার মূলতঃ নাট্যকার, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ গীতিকবি। শেক্সপীয়ারের বিশ্বাস বহুলাংশেই, চরিত্রদের বিশ্বাস, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস একান্তভাবে তাঁরই। এইজন্যে, জীবনের বিভিন্ন পর্বের গানে কবিতায় যে পাখির উল্লেখ দেখতে পাই, তা গীতি-কবিসুলভ সহৃদয়তা ও মানবিক করুণা-সঞ্জাত। সেখানে বিহঙ্গচারণার কিছু নেই। কিন্তু যেখানে পাখির নানা গুণ ও বিশেষত্বকে একটি সাহিত্যিক উপকরণে পরিণত করে, নানা ধরণের চিত্রকল্প রচনা করেছেন কবি, সেখানে এক ধরণের বিহঙ্গচারণা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সে বিহঙ্গচারণাও এতো সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের যে তা আভিজাত সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এইখানেই শেক্সপীয়ারের সঙ্গে বিহঙ্গচারণায় রবীন্দ্রনাথের তফাত। শেক্সপীয়ারে বিহঙ্গচারণার উপাদান-উপকরণগুলিকে সহজেই পৃথক করে দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়, এবং সেগুলি খসিয়ে নিলেও নাট্যবস্তু একই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ আপন উচ্চ কল্পনাশক্তি ও মমতা দিয়ে সেই সব উপকরণগুলিকে এমনই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ভরে দেন যে তার লৌকিক দিকটি খসে গিয়ে একান্তভাবে রাবীন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং তা গান-কবিতার সঙ্গে এতোই সংলগ্ন যে তা ছিঁড়ে নেওয়া যায় না।

প্রাচীন কাব্য-সংস্কারের অনুসরণে বিরহিণীর বিরহভাব প্রকাশ করতে 'চাতকিনী আছে চাহিয়া' লিখলেও 'গতিরাগের' কবি বলে স্বাভাবিক কারণেই কবি পাখির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। পাখিকে অবলম্বন করেই নিজের রোমান্টিকতা ('মানসী'র 'কুহুধ্বনি' বা 'খেয়া'র 'কোকিল' কবিতা), জীবনদর্শন ('বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধ, 'সোনার তরী'র 'দুইপাখি' কবিতা), প্রেমতত্ত্ব ('এপারে মুখর হল কেকা ওই ..', 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি,' প্রভৃতি গান) পরিস্ফুট করেছেন। প্রথম ও মধ্যবয়সে কবি সাহিত্যখ্যাতি সম্পন্ন পাখিদের (যেমন: কোকিল, ময়ূর) সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করেছেন, শেষ বয়সে, গদ্য কবিতার নিজস্ব দাবীতেই তেমনি কবি

খ্যাতিহীন পাখিদের (যেমন : কাক, শালিক, চড়ুই) উল্লেখ করেছেন। সবই ঘটেছে একান্ত ভাবে তাঁর সাহিত্যিক মেজাজের জন্য।

এবং সেই কারণেই পাখি চিত্রকল্পের শরীর নির্মাণ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কেবল দুটি গানের উল্লেখ করি। একটি, 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'; আর একটি, 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না'। প্রথম গানে বর্তমান হলো ঘর বা খাঁচা; অতীত হলো পাখি; অতীতের পাখি বর্তমানের খাঁচায় বন্দী থেকেও বন্দী নয়, সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কাল সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা এখানে ধরা পড়েছে। পাখি এখানে বিশেষ কোনো পাখি নয়, নির্বিশেষ পাখি। দ্বিতীয় গানটিতে বন্ধনহীন মুক্ত মনের আকাশ-বিচরণ ব্যক্ত হয়েছে পাখিরই মুক্ত জীবনের স্মরণে॥ [১]

১, তিব্বত চীন জাপানের পৌরাণিক সাহিত্য প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছি, এই অধ্যায়ে তার আলোচনা এই জন্যে করলাম না। যে সব পুরাণের উল্লেখ এ অধ্যায়ে করা হল, সেই সব পুরাণের অনান্য প্রাসঙ্গিক দিকও পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি এ ছাড়া, অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থ থেকেও প্রয়োজন বোধে বিহঙ্গচারণার উপকরণ লক্ষ করা হয়েছে।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

পাখি : শিল্প-শাস্ত্র-কলা-বিদ্যা

পাখিকে লক্ষ্য বা উপলক্ষ করে বহুবিধ শিল্প-শাস্ত্র ও কলা-বিদ্যা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গড়ে উঠেছে। আজ যে শিল্প ও কলা নিছক 'আর্ট' ছাড়া কিছু নয়, অতীতে তাই ছিল লোকজীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের পরিপোষক, 'আর্ট' তখন ছিল 'functional'. এই অধ্যায়ে দেখা যাবে, পাখি কতোরকম শাস্ত্র ও বিদ্যা এবং শিল্প ও কলার উৎসমুখে রয়েছে।

প্রাচীন ভারতের চৌষট্টি কলার মধ্যে দুটি হলো: মেষ-কুক্কুট-শাবক যুদ্ধবিধি এবং শুক-সারিকা প্রলাপন। চৌষট্টি কলার মধ্যে চতুর্বিংশতি স্থান দেওয়া হয়েছে 'শকুনবিদ্যা' বা 'নিমিত্তজ্ঞান'কে। আর একটি কলা হলো 'বাস্তুবিদ্যা'। 'বাস্তুবিদ্যা'র অন্তর্গত একটি বিষয়—পশু-পক্ষীর নীড়-রচনা।

প্রাচীন ভারতে আহারান্তে পাখি 'পড়ানো'র অর্থাৎ পাখিকে কথা বলতে শেখানোর প্রথা ছিল। এ জন্যে গৃহে গৃহে খাঁচায় পাখি থাকত, বিশেষ করে শুক, সারিকা, পারাবত। এদের মঙ্গলকারী শক্তির জন্যেই এদের পোষা হত, ক্রমে তা গৃহের শোভা ও বিলাসিতায় পরিণত হয়ে যায়। পাখির মধ্যে এক 'ক্ষমতা বা 'শক্তি'কে আদি কালের মানুষ লক্ষ করে গৃহে বন্দী করে রাখত: যেন পক্ষিসঞ্জাত মঙ্গল বা কল্যাণে গৃহস্থ ঋদ্ধ হয়ে ওঠেন। পাখির রব নির্ঘাতি দূর করবে বলেই তাদের পাখি পোষবার বাসনা হত। মনে হয়, কালক্রমে পাখির রবের মধ্যে অমঙ্গল ও অকল্যাণকারী শক্তির অস্তিত্বও লক্ষ করা হয়েছিল; এবং পাখি যাতে অন্য প্রকার অমঙ্গলকারী রব করে না ফেলে, কে জানে, তারই জন্যে তার কণ্ঠকে গৃহস্থের প্রিয় ও বাঞ্ছিত শব্দাবলী উচ্চারণে নিয়োজিত রাখা হত কি না; এ ভাবেই শেষে পক্ষি-প্রলাপন একটি কলাতে উন্নীত এবং বিলাসিতায় অধঃপতিত হয়ে থাকতে পারে।

বৃহৎ খাঁচাতেও বহুবিধ পাখি পালন করা হত। এই ভাবেই পরবর্তীকালে 'পক্ষিপালন' প্রথা-পদ্ধতি একটি বিদ্যার মর্যাদা পেয়েছে, ইংরেজিতে একেই বলে 'Aviculture'। এক একটি পাখির দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করেই তার নীড় রচিত হয়ে থাকে। পাখির সেই বিশেষ প্রয়োজনকে স্মরণ রেখে যে

Aviculturist পাখির জন্যে নীড় রচনা করে দেন, তাও একটি বিদ্যা, তাকে বলে 'Caliology'। প্রাচীন ভারতে চৌষট্টি কলার অন্তর্গত একটি কলা ছিল পাখির 'বাস্তুনির্মাণ'। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে: অশ্বের পরিমাণ অনুযায়ী অশ্বশালা নির্মাণ করতে হবে। অশ্বের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে গৃহটি। চারদিকে চারটি দ্বার থাকবে। দ্বারদেশে কাষ্ঠাসন এবং বানর, ময়ূর, মৃগ, শকুন, চকোর, শুক-সারিকা প্রভৃতি রাখতে হবে। পাখি সম্পর্কে কৃষকদের অনেক অভিজ্ঞতা থাকে, সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিকদেরও প্রভূত সহায়তা করে। একেই অবলম্বন করে 'Economic ornithology' নামে একটি বিদ্যা গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন জাতের পাখিদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়ে বিচিত্র বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতির পক্ষি-প্রজননও একটি বিদ্যা ॥

শিকার করবার জন্যে পক্ষি-প্রশিক্ষণ এবং পাখি দিয়েই পাখি শিকার করবার প্রথাও একটি বিদ্যারূপে গৃহীত হতে পারে। মধ্যযুগে ইউরোপে অভিজাত সমাজের যুবকগণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার করবার জন্যে বাঁ হাতের প্রকোষ্ঠে শ্যেন পাখি নিয়ে বের হতেন। মূলতঃ শ্যেন ও বাজকেই এই কর্মে নিযুক্ত করা হত বলে একে বলে 'Falconry' বা 'Hawking'। ঈগলও ব্যবহৃত হত। শিকারী পাখিদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই এক দুঃসাধ্য কর্ম ছিল। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ যখন লাহোরে এসেছিলেন, তখন বহু আফগান প্রকোষ্ঠে বৃহদাকার ঈগল বসিয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সব ঈগল, শ্যেন সঙ্গে রাখা পূর্ব তুর্কীস্থানে নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। সেখানকার প্রত্যেক জেলার গভর্ণরের অমন একাধিক শিক্ষিত ও পোষা ঈগল থাকে। ইয়ারখন্দের দক্ষিণে, এবং খোটানে পাহাড়ের মাথায় এসব ঈগল বাচ্চা দেয়, সেই বাচ্চাদের প্রভূত কষ্ট স্বীকার করে সংগ্রহ করে শিক্ষিত করে তোলা হয়। চীন ও তুর্কীস্থানের কাজাকদের হাতে প্রায়ই থাকে ঈগল বা বাজ। 'স্বর্ণ ঈগল' (The golden eagle) সবার চেয়ে প্রিয়। শরৎকালে এসব পাখিদের শিকার করতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

মোগল বংশীয় সম্রাটেরা শ্যেন-বাজ-ঈগল দিয়ে শিকার করতে খুব ভালোবাসতেন। কুবলাই খাঁন নাকি সত্তর হাজার অনুচরসহ বাজ নিয়ে শিকার করতেন। মধ্য ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার নানাস্থানে "স্বর্ণ ঈগল" পোষার প্রথা আছে। ইতালীর নায়ক বেনিতো মুসোলিনী বাজ পুষতে ভালোবাসতেন এবং নিজের হাতে বাজ নিয়ে শিকার করতেন।

শ্রীমতী Nancy price তাঁর 'Wonder of Wings' (London : 1947) বইতে শ্যেন পালন ও প্রশিক্ষণ এবং ইংলণ্ডের রাজন্যবর্গের শ্যেন-প্রিয়তা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন। পারস্যে খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ সনে, চীনে তারও পূর্ব থেকে, ইউরোপে খ্রীষ্টের জন্মের তিন শ' বছর আগে Falconry প্রচলিত ছিল। বহু শত বছর ধরে শ্যেন মানুষের শিকারের প্রিয় সঙ্গী ও বিশেষ সাহায্যকারী পাখি ছিল। শ্যেনের পরই উল্লেখযোগ্য (দাঁড়) কাক।

শ্যেনের সঙ্গে (দাঁড়) কাককেও শিকারে নেবার প্রথা ভারতেও চলিত ছিল। (দাঁড়) কাককে গ্রীসেও শিকারী সহযোগী করে নেওয়া হত। এরা শিকারীর হাতে বা কাঁধে উপবিষ্ট থাকত।

শ্যেন পালন ও প্রশিক্ষণ প্রথা ইংলণ্ডে স্যাক্সনদ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, রোমানদের দ্বারা নয়। এটি এক সময়ে সেখানকার অভিজাত মানুষদের শিক্ষার একটি অঙ্গরূপে বিবেচিত হত। রাজা-মহারাজাদের উপহারের জন্যে শ্যেন ছিল প্রশস্ত। শোনা যায়, আলফ্রেড দি গ্রেট Hawking সম্বন্ধে একখানা বই পর্যন্ত লিখেছিলেন। ইংলণ্ডের বহু রাজা শ্যেন সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ ও মমতা প্রদর্শন করেছেন। জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইটালীতেও মধ্যযুগে Falconry খুবই জনপ্রিয় ছিল।

শ্যেন শিক্ষণ ও পালন প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিল। কূর্মাচল (কুমায়ুন) এর রাজা রুদ্রদেব (নামান্তর : চন্দ্রদেব, রুদ্রচন্দ্রদেব) খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে এক সময়ে "শ্যৈনিক শাস্ত্র" নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক এটি সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয়, অনূ্যন পাঁচ শত বৎসর পূর্বেও ভারতে শ্যেন পালিত হত। মুঘল সম্রাট আকবরের পক্ষিপ্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পক্ষিশালায় নানা ধরনের পাখির মধ্যে শ্যেনও ছিল এবং তাদের আহার ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন।

ইটালীর ব্যাধেরা পেচকের সাহায্যে শিকারের সুবিধের জন্য পেচক পালন করে।

'তিত্তির জাতকে' (সং ৩১৯) দেখা যায়, এক শাকুনিক একটি শিক্ষিত তিত্তিরকে দিয়ে অন্য তিত্তির পাখিদের শিকার করত। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র একাধিক পালাতে 'পালা ঢুপী' দিয়ে শিকারের কথা আছে। 'কুড়া' শিকারের কথাও মেলে। 'কুড়া' শিকার এখন পর্যন্ত মৈমনসিংহ অঞ্চলে দেখা যায়, সৌখিন লোকেরা তা পালনও করে থাকেন। খালেক দাদ একটি প্রবন্ধে 'কুড়া পাখি : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩২, পৃ. ৫১৭ এ সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যাদি দিয়েছেন ॥

...৩

পাখিকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও একটি বিদ্যা। মুরগীর নাম এ বিষয়ে সারা বিশ্বেই পরিচিত। বটের-তিত্তির-বুলবুলি-কোড়া প্রভৃতি পাখির লড়াইও প্রসিদ্ধ।

আহারান্তে পাখির লড়াই দেখা প্রাচীন ভারতের এক প্রথা ছিল। অনেকে মনে

করেন, ভারতেই মুরগীকে বন্য অবস্থা থেকে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করা হয়েছে প্রথম। এখানে তাই মুরগী লড়াইয়ের প্রথাও অতি প্রাচীন। এমন কি, মোহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পায় পাওয়া 'সীল' ইত্যাদিতে মোরগ লড়াইয়ের প্রতিচিত্র মেলে। দণ্ড্যাচার্যের 'দশকুমার চরিতে' (পঞ্চমোচ্ছ্বাস, প্রমতি-চরিত) একটি প্রাচ্য দেশীয় নারিকেল জাতীয় কুক্কুটের সংগে পশ্চিম দেশীয় ক্ষুদ্রকায় বলাকজাতীয় কুক্কুটের ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা আছে। এখন পর্যন্ত সাঁওতাল, হো প্রভৃতি ভারতের নানা আদিবাসীদের মধ্যে মুরগীর যুদ্ধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ, তবে অনেক ক্ষেত্রে তা আমোদ ও পেশার স্তরেও নেমে এসেছে।

মানভূম জেলার বাগদা গ্রামের গ্রামদেবী "দারিদ্র্য নাশিনী"-র বার্ষিক পূজা হয় ১৩ই মাঘ সেদিন যে মেলা হয়, তার একটি প্রধান অঙ্গ হলো মোরগ লড়াই। বিশেষ লক্ষ করবার বিষয় হলো, এই পুজোতে হাঁস-পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়া হলেও মুরগী বলি দেওয়া হয় না। মুরগী এই অঞ্চলে নানা শুভশক্তির প্রতীক ছিল বলেই হয়তো এ সম্পর্কে অতীতে taboo সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিঘ্ন-বিনাশী শুভশক্তিই মুরগীর যোদ্ধৃ রূপটির প্রতীক।

এই জন্যেই মুরগীর যুদ্ধ নিয়ে শাস্ত্র রচনা ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও হয়েছে বলে জানি নে। এ বিষয়ে B. A. Saltore লিখিত একটি প্রবন্ধ (Cock-fighting in Tuluva : The qtly. Journal of the mythic socicty of Bangalore : April 1927, pp 316—327) বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের কোন্ তিথিতে কোন্ বর্ণের মুরগী কোন্ বর্ণের মুরগীকে পরাভূত করবে, তার ঐতিহ্যানুসারী তালিকা এতে সংকলন করা হয়েছে। মুরগীর লড়াই নিয়ে নানা সংস্কার সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন লেখক। এতেই মনে হয়, একদা এ সম্পর্কে লিখিত বা অলিখিত একটি শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। তারই ফলে কোনো কোনো তিথি বা উৎসবে মুরগীর লড়াই অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণিত হত। যেমন, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বালিবেলা গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির দিন সাঁওতালদের মুরগীর লড়াই।

লড়াইয়ের মুরগীকে বলে 'game cock'। মোরগ লড়াইয়ের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন এ. কে. এম. আমিনুল হক তাঁর "চিল ময়না দোয়েল কোয়েল' (বাঙলা একাডেমী ঢাকা : প্রথম সং বৈশাখ ১৩৭০, পৃ. ৩-৪) বইটিতে। মালয় ইত্যাদি দেশে মোরগ লড়াই জাতীয় ক্রীড়ার মর্যাদা পেয়েছে। গোটা ইউরোপে "cock Fighting' বিশেষ জনপ্রিয়। মোরগ যুদ্ধের অনুকরণে, এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে, ওই নামেই এক ধরণের খেলার প্রচলন বহুদেশেই আছে।

প্রাচীন কালে মুরগীকে বলা হত 'son of mars'। mars হলেন রোমানদের রণদেবতা। মুরগীর ঝুঁটিকে কেশরওলা সিংহও নাকি ভয় পায়। যুদ্ধ বিগ্রহে জয়ের উদ্দেশ্যে গ্রীস-রোমের অনেক যোদ্ধাই তাঁদের শিরস্ত্রাণে মুরগীর প্রতিকৃতি রাখতেন, মুরগীর পুজো করতেন। মোরগের ডাক যুদ্ধে জয়লাভের সূচক বলে ইউরোপে বিশ্বাস ছিল।

যে-সব দেশে সঘন যুদ্ধাদি ঘটে, তাদেব সঙ্গে 'মোরগ লড়াই' কথাটিও জড়িয়ে গেছে। যেমন, ঠাট্টা করে লোকে বেলজিয়মকে 'cockpit of Europe' বলে থাকে (প্রবাসী : আষাঢ় ১৩২৩, পৃ ২৮২ ।

লাবক- বটের) ও তিতিরেব লড়াই এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত আছে। বর্ত্তক বা বটেব পাখির লড়াই কাশ্মীরে খুব জনপ্রিয়। চীনে বটের পাখির যুদ্ধ খুবই পরিচিত। সেখানে বটের পাখির যুদ্ধ প্রদর্শন অনেকের পেশা। দুজন পেশাদার দুটি বটের পাখির মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়, যে জেতে সে পুরস্কার পায়। Encyclopedia of chinese Symbolism and art motives' (New york, 1960) বইতে C A S. williams সেখানকার বটের পাখির যুদ্ধেব একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন P. 332)। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের চতুর্থ অংকে যে পক্ষিশালার বিবরণ আছে, তাতে লাবক পাখিকে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। বুলবুলির লড়াই এই সেদিন পর্যন্ত বিলাসী মানুষদের আমোদের এক বিষয় ছিল। প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্মা তাঁর 'বগুড়ার ইতিহাস' (প্রথম প্রকাশ ১৯১২, পৃ ৫৮) বইতে লিখেছেন, বগুড়ার সেরপুরেব বুলবুলেব লড়াই একটি প্রসিদ্ধ বাৎসরিক উৎসব। পূর্ববঙ্গের 'কোড়া'র লড়াইও বিখ্যাত। মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের অনেকে এতদুদ্দেশ্যে কোড়া পালন করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে পায়রা ওড়াবার কথা বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার 'বাবু' -রা সকালে উঠে পায়রা ওড়াতেন। এক-এক ধরণের শিস দিলে পায়রা-রা এক এক ভংগিতে ওড়ে। এর মধ্যেও পায়রাকে শিক্ষা দেবার প্রসঙ্গ আছে। 'গেরোবাজ' অর্থাৎ ডিগবাজী-খাওয়া পায়রা নিয়ে তাঁরা লড়াই করতেন এবং বাজী ধরতেন।

প্রাচীন রোমে যে ব্যক্তি রণনিপুণ পাখির প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন না করতেন, তিনি সাধারণের অবজ্ঞাভাজন হতেন, কখনো বা তাঁর প্রাণদণ্ড হতো এজন্যে। মিশরেও রণনিপুণ পাখির বিশেষ মর্যাদা ছিল। একটি রণনিপুণ তিতির পাখিকে খাবার জন্যে কেনবার অপরাধে মিশরের কোনো এক নগরপালকে সম্রাট অগস্টাস প্রাণদণ্ড দেন।

কোনো কোনো পক্ষিযুদ্ধে পাখিদের শারীরিক ভাবে যুদ্ধ করতে হয় না। তাদের কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও মাধুর্য দিয়েই জয় পরাজয় নির্ণীত হয়। এটিকে স্থূলতা থেকে সূক্ষ্মতার দিকে একটি বিবর্তন বলা যায়।।

পাখির এই যুদ্ধ-পরায়ণতার ফলে রণশাস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গেও পাখিকে জড়িত হতে দেখা যায়।

প্রথমে ধনুর্বিদ্যার কথা বলি। কঙ্ক বা কাঁকের পালক বাণের গোড়াতে লাগানো

হয়। এই জন্যেই শরকে বলে 'কঙ্কপত্র'। ঈশপের গল্পে অবশ্য ঈগলের পালক বাণের গোড়াতে লাগাবার কথা আছে। বস্তুত গোটা ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে ঈগলের পালকই ব্যবহৃত হত। তীরাদি সন্ধানের লক্ষ্য রূপে একটি শুকমূর্তি স্থাপিত হয়। ইংরেজীতে তাকে বলে 'Po pinjay'

প্রাচীন ভারতে এ নিয়ে বিশেষ চর্চা ছিল। 'বৃহৎ শাস্ত্র' গ্রন্থ অবলম্বনে রামদাস সেন 'ধনুর্বেদ' (ভারতী: অগ্রহায়ণ, ১২৯০ পৃ. ৩৫০-৩৫৮ নামে একটি বন্ধে বিস্তৃতভাবে তা আলোচনা করেছেন। বাণে পাখির পালক সংযুক্ত করবার নিয়ম ছিল এই: কাকহংসনাশাদীনং মৎস্যাদক্রৌঞ্চ কেকিনাম্। / গৃধ্রানাং কুররাণঞ্চ পক্ষা এতে সুশোভনাঃ॥ / একৈকস্য শরস্যৈব চতুঃ পক্ষানি যোজয়েৎ। / ষড়ঙ্গুলি প্রমাণেব পক্ষচ্ছেদঞ্চ কারয়েৎ / দশাঙ্গুলিমিতং পক্ষং শার্ঙ্গচাপস্য মার্গনে। যোজ্যা দৃঢ়াশ্চতুঃ সংখ্যাঃ সন্নদ্ধাঃ স্নায়ুতন্তুভিঃ॥

অর্থাৎ, বাণের জন্যে কাক, হাঁস, মাছরাঙা, বক, ময়ূর, গৃধ্র, কুরর, প্রভৃতির পাখাই উত্তম। প্রত্যেক শরে সমান্তর করে, চারটি করে পাখা সংযোজিত করতে হবে। পাখাগুলি হবে দৈর্ঘ্যে ছ' আঙুল করে। কিন্তু যে সব বাণ হবে শার্ঙ্গ ধনুকের জন্যে, তা হবে দশ আঙুল পরিমিত, বৈনব ধনুর জন্যে হবে ছ' আঙুল পরিমিত। প্রত্যেকে শর স্নায়ু-তন্তুর দ্বারা দৃঢ় করে আবদ্ধ করে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে Bird arrow'র কথাও ওঠে। এস্কিমো এবং অন্যান্য জাতিদের মধ্যে তা দেখা যায়। এতে তীরের ডগায় কোনো পদার্থ লাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে আহত প্রাণীটির আঘাত না লাগে।

মনুসংহিতার ১৮৭ম এবং ১৮৮ম শ্লোকে যুদ্ধকালীন সাত প্রকার ব্যূহের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে 'গরুড়ব্যূহ' একটি। এই রকম, শ্যেনাকৃতির ব্যূহকে শ্যেনব্যূহ' বলা হয়েছে। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে (৫৫।১৫-২৬, পঞ্চানন তর্করত্ন সং) এবং দ্রোণপর্বে (১৯।৪) গরুড় (সুপর্ণ) ব্যূহ' এবং ভীষ্ম পর্বে (৬৯।৭-১২ 'শ্যেনব্যূহে'র কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ভীষ্ম (৫০।৪০-৫৮ এবং দ্রোণপর্বে (৬।১৫) ক্রৌঞ্চ (ক্রৌঞ্চারুন)-র আকারে সৈন্যসমাবেশের কথা বলা হয়েছে। গরুড় ব্যূহ বা ক্রৌঞ্চব্যূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো 'অর্ধচন্দ্রব্যূহ' এবং সুপর্ণ ব্যূহের প্রতিদ্বন্দ্বী 'মণ্ডলার্ধব্যূহ', 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' অনুসারে অষ্টাধ্যায়ীতে প্যাঁচার পেছনদিকের মতো সেনার পশ্চাদ্ভাগ (সূত্র সং ৫১১) বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডঃ রামদাস সেন এ'দা সুন্দর আলোচনা করেছিলেন (অসি: নব্যভারত: ভাদ্র ১২৯০, পৃ. ১৫৭-১৬৬; কার্তিক ১২৯০, ২৭২-২৭৬)। এটিতে তিনি প্রাচীন ভারতের অস্ত্র-শস্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন।

খড়্গাদি অস্ত্র-শস্ত্রের উপাদানরূপে প্রধান প্রধান সাঙ্গ লৌহের নাম মেলে দশটি, তার মধ্যে তিনটি হলো: 'ময়ূর গ্রৈবক', 'ময়ূরবজ্র' এবং তিত্তিরাঙ্গ'। এদের পরিচয় এই:

'ময়ূর গ্রৈবক': ময়ূরকণ্ঠ সংস্থান মঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূর গ্রৈবক লৌহং তং বিদুমুনি পুঙ্গবাঃ॥

যার অবয়ব ময়ূর-কণ্ঠতুল্য, মুনিরা তাকে 'ময়ূর গ্রৈবক' বলেন।

'ময়ূর বজ্রক' লৌহ :

নাগকেশর পুষ্পাভ মঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূর বজ্রকং প্রাহুর্লৌহশাস্ত্র বিদোঃ জনাঃ।

যার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভা দেখা যায় লৌহশাস্ত্রবিদেরা তাকে 'ময়ূর বজ্র' লৌহ বলেন।

'তিত্তিরাঙ্গ' লৌহ :

যস্মিংস্তিত্তিরি পক্ষাভমঙ্গং লৌহে প্রতীয়তে।
দুর্লভং তন্মহামূল্যং তিত্তিরাঙ্গ সুপাকজনম্ ॥

যে লৌহের অঙ্গ তিতির পাখির পাখার মতো দেখায়, তাকে বলে 'তিত্তিরাঙ্গ' লৌহ। এই লৌহ অতি দুর্লভ ও মহামূল্য। এই সুধাতু লৌহ দিয়ে যে কোনো অস্ত্রই নির্মিত হোক না, তা উত্তম ও গুণবান্ হয়।

এই শ্লোকগুলো 'বীর চিন্তামণি' ও 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। যে চিহ্ন থাকলে অসি 'অমঙ্গলপ্রদ' হয় তাকে অরিষ্ট বলে। 'অরিষ্ট' ত্রিশ রকমের হতে পারে। তার মধ্যে কয়েকটি এই :

কাকপদ : কাকপদাকার চিহ্ন। কপোত : কপোতের পক্ষাকার চিহ্ন। কাক : কাকাকৃতি চিহ্ন।

ধ্বনি বা শব্দের দ্বারাও খড়্গের ভালোমন্দর বিচার করা হত। এই ধ্বনি আট রকমের। দু-একটি এই : খড়্গে নখাঘাত করলে যদি হংসধ্বনির মতো শব্দ হয়, তাকে 'হংসধ্বনি' খড়্গ বলে। এ খড়্গ উত্তম বলে পরিগণিত। কিন্তু অসিতে নখাঘাত করলে যদি কাকস্বরের মতো বিস্বর শোনা যায়, তা অত্যন্ত অধম। একে 'কাকধ্বনি' অসি বলা হয় ॥

…৫…

পাখিকে দৌত্য শেখানো ও সে কর্মে নিয়োগ করাও এক কঠিন কর্ম। সে জন্যেও উপযুক্ত বিদ্যে থাকা চাই।

ইউরোপে প্রাচীন কাল থেকেই সংবাদাদি প্রেরণের জন্যে পাখিকে ব্যবহার করা হতো। এই শতকের বিশ্বযুদ্ধগুলিতে পাখির গুপ্তচরবৃত্তি এবং সংবাদ-বহন ক্ষমতা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা গেছে। ভারতেও যে প্রাচীন কালে পাখিকে দৌত্যে নিযুক্ত করা হতো তারও প্রমাণ মেলে। এছাড়া প্রেম-প্রণয়াদির ক্ষেত্রে পাখির মাধ্যমেই সাংবাদাদি আদান-প্রদান করা হত, 'হংসদূত' প্রভৃতির সাহিত্যিক প্রমাণের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

আধুনিক কালে পারাবতকেই প্রধানত একর্মে নিযুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু তথ্যাদি

পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, যে কোনো পাখিই এ-কর্মে নিযুক্ত হত। বিশেষ করে কাক। পাখির এই দৌত্যের পেছনে আছে, পাখিকে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ও দীর্ঘদর্শী রূপে গ্রহণ করার মনোভাব। কাকের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সর্বত্র স্বীকৃত বলে কাককে দূত রূপে প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহার করে আসা হয়েছে। মহাপ্লাবনের পর নোয়া এই জন্যেই বিভিন্ন পাখিকে একের পর এক দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন, কাক ছিল সর্বাগ্রে। শ্রীমতী বীণা মিশ্র সংকলিত 'পূর্বাচলের রূপকথা' (প্রথমপ্রকাশ, ১৩৮০) বইতে দেখা যায়, আসামের 'আক' ও মণিপুরীদের রূপকথায় কাক দূতের ভূমিকা গ্রহণ করছে। শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবীর 'পৌরাণিক ব্রতকথা' (ভারতী, আশ্বিন ১৩১৫। পৃ: ২৪৯-২৫৭) প্রবন্ধে দেখা যায়, রাখদুর্গার ব্রতকথায় 'সতি্য কালের কাক' পত্র নিয়ে গেছে।

কাক যে দূত হিসাবে ব্যবহৃত হতো "corbie messenger" ("যে দূত বিলম্বে ফেরে, বা আদৌ ফেরে না," নোয়া-প্রেরিত কাক ফেরে নি) পদটিই তার প্রমাণ। 'corbie' অর্থাৎ 'দাঁড়কাক'। ল্যাটিন 'corvus' =কাক থেকে প্রাচীন ফরাসী শব্দ 'corbin', তারপর 'corbie',। বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলোতে কাককেই দূতরূপে দেখা যায়।

চীনের Postal flag-এ থাকে উড়ন্ত হাঁসের ছবি। এই সেদিন পর্যন্ত প্রেম পত্রাদিতে একটি ছবি আঁকা থাকত: ঠোঁটে করে পাখি একটি পত্র নিয়ে উড়ে চলেছে। নীচে থাকত সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'যাও পাখি বোলো তারে। সে যেন না ভোলে মোরে।' মহাভারতে নল-দময়ন্তীর মধ্যে দৌত্য করেছে হাঁস।

পারাবত প্রাচীন কাল থেকেই দূতের কর্ম করে আসছে। ইতিহাসে পত্রবাহক রূপে পারাবতকে প্রথম দেখা যায় রাজা সলোমনের রাজত্ব কালে Encyclopedia Britanicca Tenth edition: Vol. XXXI, p. 770)। ভারতবর্ষে মৌর্যরাজের শিকারীগণও পারাবতকে এই কাজে নিযুক্ত করতেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পারাবত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল (Birds that helped to win wars: Modern Review, May, p. 578 । প্রায় পাঁচ হাজার পারাবত সংবাদ বহনের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল তখন। ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সৈন্যরা দক্ষিণ হল্যাণ্ডের Leyden শহর অবরোধ করলে, একটি পারাবতের মাধ্যমে তারা সংবাদ পায়, Prince of orange তাদের সাহায্যার্থে সৈন্যসহ আসছেন। আজও সেই পারাবতটি কাঁচের আধারে Leyden শহরের সিটি হলে রক্ষিত আছে। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে (১৮৯৯—১৯০২) ব্রিটিশ সৈন্য পারাবতের দৌত্যে উপকৃত হয়। জাপান ও রাশিয়ার যুদ্ধে উভয় পক্ষই পারাবতের সাহায্য নিয়েছিল।

'অভয়ামঙ্গলকাব্যে' বণিক ধনপতি ও রাঘবদত্তের বাজি রেখে পায়রা ওড়ানোর কথা আছে। যুদ্ধে জয়লাভ করলে শ্বেত পারাবত এবং পরাজিত হলে কৃষ্ণ পারাবত ওড়ানো হত। শ্রীহট্ট জেলায়, শাহ জালাল পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে, সেখানকার রাজা গৌরগোবিন্দকে পারাবতের সাহায্যে পরাভূত করেন।

শুক-সারীকেও দৌত্যে দেখা যায় ('গোপীচন্দ্রের গানে', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫)। সত্যচরণ লাহা তাঁর 'পাখীর কথা' (১৩২৮ সাল) বইতে জানিয়েছেন পৃ ১১) কোনো কোনো জাতি বা সম্প্রদায় পাখিদের দিয়ে নানা ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করে জীবিকার্জন করে। কোনো কোনো শিক্ষিত বুলবুলি নাকি প্রেমিকের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যত্র গিয়ে প্রেমিকার কপালের টিপ ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে আসে ॥

৬০

লেখাপড়া ও সমজাতীয় বিদ্যার সঙ্গে পাখিকে যুক্ত হতে দেখা যায়।

যেমন, পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য শিশুদের বর্ণমালা শেখাবার সময় একটি ছড়া বলা হয়, তাতে 'খ' কে বকের গলার মতো ('বগা খ') বলা হয়। ব্যাকরণের নামকরণে 'কলাপ ব্যাকরণ', Caret বা তোলা চিহ্নকে 'কাকপদ' বলা ইত্যাদি লক্ষণীয়। একদা Pessimism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছিল 'পেচকবাদ' (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার 'সহযোগী সাহিত্য' বিভাগে) অবশ্য, এর আগেই 'বান্ধব' পত্রিকায় ১২৯১, ২য় সংখ্যা, পৃ ৬৯ পাওয়া গেছে 'পেচকধর্ম'।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটি গল্পে আছে, সোম পিপাসু হয়ে দেবতারা তা স্বর্গ থেকে নিয়ে আসবার জন্যে সাহায্য নিলেন ছন্দের। প্রথমে জগতী, পরে ত্রিষ্টুভ—দুই ছন্দই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। পরিশেষে গায়ত্রী ছন্দ রাজপাখির রূপ ধরে সোম অপহরণ করে আনে। 'কুক্কুট প্রসঙ্গ' তত্ত্ববোধিনী বৈশাখ, ১৩২৮। সংকলন : ভারতী শ্রাবণ, ১৩২৮। পৃঃ ৩০১-৩২৩ নামে একটি প্রবন্ধে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন যে, প্রাচীন ভারতে "ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতের উচ্চারণ ভেদ কুক্কুটের ধ্বনি হইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কুক্কুট ক্রমে যে তিনটি শব্দ করিয়া থাকে, সেই শব্দের প্রতি লক্ষ করিয়াই পাণিনি মুনি 'ঊকালোহজ-হ্রস্ব-দীর্ঘ প্লুতঃ' এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, ['উ বর্ণে কুক্কুটরুতো প্রসিদ্ধাত্বাদুবর্ণ ভাক্']।"

ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটি বিষয় বোঝাতে, সাদৃশ্যার্থে পক্ষিজগতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি এই :

'অর্ধ কুক্কুটী ন্যায়', 'কাকতালী বা কাকতালীয়', 'কাক দন্ত গবেষণা, কাকদন্ত পরীক্ষা (বিচার) ন্যায়', 'কাকাক্ষিগোলক ন্যায়', 'খলকপোত (কপোতিকা) ন্যায়'; 'শ্যেন কপোত ন্যায়', টিট্টিভ ন্যায়', 'কাকোলূক ন্যায়', 'বকাণ্ড প্রত্যাশা ন্যায়', 'পঞ্জরমুক্ত পক্ষী ন্যায়' ইত্যাদি।

চিকিৎসা বিদ্যা ও শাস্ত্রের সঙ্গেও পাখির যোগ দেখি। প্রাচীন ভারতের প্রাজ্ঞ চিকিৎসকেরা মানুষের দেহের অবস্থা বিশেষে নাড়ীর গতি কেমন হয়, তা বোঝাতে পাখির নৃত্যের উপমা অবলম্বন করেছেন। প্রখ্যাত সন্ন্যাসী কণাদ-এর 'নাড়ী বিজ্ঞানে' আছে : কোনো লোক মিষ্টদ্রব্যের ঘ্রাণ নিলে তার নাড়ী ময়ূরের মতো

নাচে ; এবং ঝাল দ্রব্যের ঘ্রাণ নিলে নাড়ী ভৃঙ্গরাজ পাখির মতো লাফায়। (কবিরাজ ধর্মদাস সেনগুপ্ত কর্তৃক গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। দ্রঃ The Indian Antiquary: June 1895, p. 18)।

"সংস্কৃত সাহিত্যের পাখি ও তাহার নাম তালিকা" (প্রবাসী: কার্তিক, ১৩৪৬: পৃ. ৬৬-৬৯) নামে একটি প্রবন্ধে সত্যচরণ লাহা দেখিয়েছেন, বৈদ্যক শাস্ত্রের দু-একটি যন্ত্রপাতির নামকরণ পাখির নামে হয়েছে। যেমন, অঞ্জলিকর্ণ', 'অবভঞ্জন' 'আটি' ইত্যাদি। সুশ্রুত সংহিতায় 'অঞ্জলিকর্ণ' পাখির মুখের অনুকরণে গঠিত একটি যন্ত্রের নাম মেলে, কিন্তু এ পাখির কোনো পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি। 'অবভঞ্জন' সম্পর্কেও এই কথা। 'আটি' পাখির মতো দেখতে একপ্রকার শস্ত্রকে বলে 'আটীমুখ' পাখিটির চঞ্চু বৃদ্ধাঙ্গুলি সদৃশ বলে মনে হয়॥

...৭...

'বাস্তুবিদ্যা' ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সঙ্গেও পাখি জড়িত।

প্রাচীন ভারতের অনেক প্রাসাদ হংসাকার করে নির্মিত হতো, এদের বলাই হতো 'হংস'। দক্ষিণ বিহারের গয়া জেলার উত্তর প্রান্তে গিরিয়াক নামক স্থানে জেনারেল কানিংহাম একটি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কার করেছিলেন। এটি একটি হংসের ওপর নির্মিত, "হংস সঙ্ঘারাম" নামে পরিচিত। হাঁস বৌদ্ধ ধর্মে এবং পৃথিবীর সব লোকবিশ্বাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

সাঁচীস্তূপে (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) প্রস্তর নির্মিত তোরণ ফলকে ময়ূর-মূর্তি খোদিত আছে। দ্বিতীয় আর একটিতে কলাপ বিস্তারী ময়ূর-মূর্তি দেখা যায়। গোয়ালিয়রে পাওয়া একটি স্তম্ভগাত্রে ময়ূর-মূর্তি আছে। ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে হাঁস ও ময়ূরেই প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতের রথ, তোরণ ইত্যাদির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে তাতে নানা পাখির আকৃতির আভাস আনা হত। 'বিদুর পণ্ডিত জাতকে' (সং ৫৪৫) র একটি গাথাতে আছে,

তোরণের পথে, হের, রয়েছে নির্মিত
বিহঙ্গম নানা জাতি—ময়ূর, উৎক্রোশ,
পিক, চক্রবাক, চিত্রা, জীবঞ্জীব আদি।

'সুধা ভোজন জাতকে' (সং ৫৩৫) ইন্দ্রের রথের বর্ণনায় আছে, রথের সর্বাঙ্গে নৃত্যশীল শিখী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি পাখির মূর্তি খচিত। পাখির মধ্যে কল্যাণকারী শক্তিকে লক্ষ করবার দরুণই এটি করা হত।

একই উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ির অলঙ্করণেও পাখির পালক ব্যবহৃত হত। 'মৈমনসিংহ

গীতিকা'র 'মলুয়া' পালাতে দেখা যায়, বিনোদ বাড়ির ছাদে : 'মাছুয়া পক্ষীর পাখ দিয়া সাজুয়া বানায়।' 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র 'দেওয়ান ঈশাখাঁ মসনদালির পালাতে ঈশা খাঁর বাড়িতে : 'মাছুয়া রাঙ্গার পাখ দিয়া ছানি তাতে দিল'। এবং : 'দুধ বগার পাখে ছাইল বাইর আঙ্গিনা।' 'বারবাংগলার ঘর ছাইল মউরের পাখে।'

ইউরোপেও অঞ্চল বিশেষে মুরগীর আকৃতিতে ঘরের ছাদের অলংকরণ করা হতো, মুরগীকে 'life bringer' বলে বিশ্বাস করবার ফলে। চীনেও অলংকরণের জন্যে সারস, মাছরাঙা প্রভৃতি পাখি গৃহীত হয়।

পাথরের তৈরি মূর্তিশিল্পেও পাখিকে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি গরুড়-মূর্তির কথা বলি। পারস্য, আরব, ব্যাবিলোনিয়া, ঈজিপ্ট, চীন এবং অন্যান্য বহু দেশে গরুড়-উপাসনার রীতি থাকলেও এর প্রাচীনতম নিদর্শন ভারতেই মেলে বলে অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু, M. M. Nagar তাঁর একটি প্রবন্ধে (Two Garuda images in Mathura Museum : The journal of the Bihar and Orissa Research Society : Vol XXVIII, pt iv, pp 468-472) বলেছেন, ভারতই যদি গরুড়োপাসনার প্রাচীনতম দেশ হয়, তবে ভারতে প্রাপ্ত গরুড়ের মূর্তিগুলোও ভারতীয় পৌরাণিক আদর্শ ও কল্পনা অনুযায়ীই হওয়া উচিত। কিন্তু 'মথুরা' জেলাতে (প্রাচীন ব্রজ বা শৌরসেন অঞ্চল প্রাপ্ত এবং মথুরার মিউজিয়ামে (২৮৮৯ ও ২৯১৫ সংখ্যক মূর্তি) রক্ষিত গরুড় মূর্তিতে গ্রীক ভাস্কর্য রীতির অনুসরণ দেখা যায়। এই মূর্তিটি ভারতের পক্ষি উপাসনার ক্ষেত্রে একটি মিশ্রণের সাক্ষী হয়ে আছে। প্রসঙ্গতঃ, বিমলাচরণ মৈত্রেয় লিখিত 'বিষ্ণুবাহন গরুড়' ভারতী শ্রাবণ, ১৩২৭। প্রবন্ধটি এবং তার অন্তর্গত চিত্র দুটি দ্রষ্টব্য।

ভারতের মূর্তিশিল্পে ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পশু-পাখির স্থান যে কতো ব্যাপক অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারত শিল্পে মূর্তি' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪) বইতে তা সুন্দর করে দেখিয়েছেন॥

··৮

ধাতুশিল্প, দারুশিল্প ও মৃৎশিল্পের উপাদান উপকরণ রূপেও পাখি গৃহীত হয়েছে। কারণ কিন্তু সর্বত্রই এক : পাখির মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও রহস্যময় শক্তি ও ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করা।

বরদা মিউজিয়ামে একটি বিচিত্র তাম্রমূর্তি আছে (সং এ. ৮. ২০৪)। মূর্তিটির পাতা দিয়ে তৈরী দুটি পাখা আছে। S. Srikanta Sastri তাঁর "Iconography of Sri Vidy-arnava Tantra" (The qtly. Journal of the mythic Society of Bangalore : Voll. XXXV : July 1944, No. 1, Pp. 4-12)

প্রবন্ধে কুক্কুটেশ্বর মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন : "golden colour, bird form in the hand of Gouri, 2 wings, red sikha and red beak."—p. 7.

মূর্তির প্রসঙ্গে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সরস্বতী মূর্তির কথা এখানে তোলা যায়। হেমচন্দ্র রচিত 'অভিধান চিন্তামণি' (২য় পর্যায়) গ্রন্থে জৈনদের ষোড়শ মহাবিদ্যার নাম মেলে। এই ষোড়শ মহাবিদ্যার এক-একজন দেবী কল্পিত হয়েছেন, তাঁরাই হলেন সরস্বতী। এঁদের রূপ ও মূর্তি এই রকম : 'প্রজ্ঞপ্তী' মহাবিদ্যার বাহন হংস, তাঁর হস্তসংখ্যা ছয়। 'বজ্রশৃঙ্খলা' ও 'অচ্ছুপ্তা' মহাবিদ্যার বাহন হংস, হস্তসংখ্যাও চার করে। 'চক্রেশ্বরী' মহাবিদ্যার বাহন গরুড়, হস্তসংখ্যা ষোলো। 'মহামানসী' মহাবিদ্যার বাহন ময়ূর, হস্তসংখ্যা চার।

কানিংহাম তাঁর Archaelogical Survey Reports (Vol. 4., p. 70) এ জানিয়েছেন, রাজপুতনা, বোম্বাই তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে সরস্বতী ময়ূর-বাহনারূপে পূজিতা হন।

ধাতুশিল্পের প্রসঙ্গে মুদ্রার কথা ওঠে। সোনা, রূপো, তামা, সীসে ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রাতে নানা পাখিকে মেলে। এর কারণ প্রধানত দুটি : প্রথমত, পাখির সঙ্গে ধন-বৈভবের একটি আসঙ্গ; দ্বিতীয়ত, রাজরাজড়ার আসঙ্গ। তৃতীয় কারণ, আগেই বলেছি, পাখির শুভংকর শক্তি ও বৃত্তি।

প্রাচীন ভারতের এবং ব্রহ্মদেশের বহু রাজার রাজমুদ্রায় ময়ূরের প্রতিকৃতি ও ছাপ (Punch-marked) দেখা যায়। যৌধেয় গণরাজ্যের মুদ্রাতে স্কন্দের ছবির পাশেই ময়ূরকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের (খ্রীঃ ৪১৩-৪৫৫) সুবর্ণমুদ্রার একপিঠে দেখা যায়—তিনি ময়ূরকে আঙুর খাওয়াচ্ছেন, অপর পিঠে ময়ূরবাহন কার্তিকের প্রতিকৃতি। প্রথম কুমারগুপ্তেরই একটি রৌপ্যমুদ্রার একদিকে একটি বিস্তৃতপক্ষ ময়ূরের ছাপ দেখা যায়। স্কন্দগুপ্ত এবং বুধগুপ্তের মুদ্রাতেও ময়ূর ছিল। মৌখরীরাজ ঈশানবর্মা এবং থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধন সপ্তম শতাব্দীতে তাঁদের মুদ্রায় ময়ূরের প্রতিকৃতি গ্রহণ করেছিলেন। হূণরাজ তোরমানের মুদ্রাতেও কলাপ সমন্বিত ময়ূর গৃহীত হয়। ব্রহ্মদেশের রাজা মিনডন যে তাম্রমুদ্রার চলন করেন, তার একদিকে একটি কলাপবিস্তারী ময়ূর দেখা যায়। সেখানে সীসার মুদ্রাতেও ময়ূর গৃহীত হয়েছিল। ব্রহ্মদেশের মুদ্রা নিয়ে ভালো আলোচনা করেছেন R. C. Temple তাঁর দুটি প্রবন্ধে (The Indian Antiquary : March 1928 ; July 1928)।

মুদ্রায় ময়ূরকে গ্রহণের কয়েকটি কারণ আছে বলে মনে করি। আকাশের মেঘোদয় হলে ময়ূর কলাপ বিস্তার করে থাকে। মেঘ বৃষ্টির উৎস, বৃষ্টি কৃষি কাজের প্রধান সহায়, যে কৃষি প্রাচীন রাজন্যবর্গের প্রধান সম্পদ ছিল। এইজন্য ময়ূর উর্বরতারও প্রতীক। দ্বিতীয় কারণ : ময়ূরের পশ্চাতে পটভূমিকা রূপে যেমন কলাপ তার শোভা সৌন্দর্য বাড়ায়, রাজন্যবর্গেরও তেমনি 'কীর্তিকলাপ' পদটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

অন্য পাখিকেও মুদ্রাতে মেলে। প্রাচীন ভারতীয় কোনো মুদ্রাতে গরুড়ের মূর্তি মুদ্রিত দেখে L. D Barnett মন্তব্য করেছেন The Indian Antiquary : January, 1929, p. 20) : "The bird I take to be Garuda alighting on the Mount of Heaven to carry away India's soma...on the other Punch-marked coins we find a huge bird on a tree, which reminds us of Graruda on the tree Rauhina, a wellknown mythic trait,... The Rauhina may be the "Eagle's Tree" of the Iranian yasht,.. "

'প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রার ঐতিহাসিক বিবরণ' (সাহিত্য সংহিতা · পৌষ, ১৩১৪। পৃ. ৪১৯-৪২৭) নামে একটি প্রবন্ধে ধর্মানন্দ মহাভারতী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন : দক্ষিণ গ্রীস : সর্প গ্রাসিত পক্ষি-পুচ্ছ। রোমের শেষ মুদ্রা : পুচ্ছসহ শকুনি। জার্মানী মুকুটপরা পাখি। পোলাণ্ড অর্ধমনুষ্য, অর্ধপক্ষী।

পুজোর বাসনপত্রে নানা পশু-পাখির মূর্তি নানা ভাবে দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য ভূত-প্রেত ইত্যাদির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা, এগুলো আসলে Apotropaism-এর উদাহরণ। তাম্রপাত্রের মাঝখানে, পঞ্চপ্রদীপ ধারণকারী পিত্তল মানবটির মুণ্ডটিতে, ঘণ্টার হাতলের শীর্ষে ময়ূরের মুখ ও মূর্তি দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের পুজোর বাসনে ময়ূর খুবই দেখা যায়। নেপালেও এটি দেখা যায়। গরুড়ের মূর্তিও মেলে, যেহেতু গরুড় বিষ্ণুর বাহন।

কলসী, ঘটী, পানের ডাবর ও বাটা, পাখির খাঁচা ইত্যাদি পেতল-কাঁসার পাত্রাদির ওপর যে সব কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়, তাতে পাখির রূপাকৃতি একটি প্রধান উপকরণ রূপে গৃহীত হয়। বাঁকুড়ার 'ঢোকরা' বা 'ডোকরা শিল্পের কথাও এখানে বলা যেতে পারে। এই শিল্পে পাখির মূর্তি একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গে গ্রীসদেশের আইওনিয়া প্রদেশের কারুকার্য ও অলংকরণে সমৃদ্ধ পাত্র Melian amphora-র কথা বলা যায়, যাতে অলংকরণের উপকরণ রূপে পাখি গৃহীত হয়। অবশ্য সে পাখি বাস্তব ও কাল্পনিক দু ধরণেরই হতে পারে।

কিন্তু পেতলের পাত্রাদির ওপর পাখির রূপমূর্তি ফুটিয়ে তোলা একটি 'সংস্কৃতি' হয়ে উঠেছে সম্ভবত একমাত্র চীনেই। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় ও যাদুধর্মী অনুষ্ঠানে যে সব পাত্রাদি ব্যবহৃত হত তাতে নানা প্রাণীর আভাস খোদাই করা হত, চড়ুই, মুরগী প্রভৃতি পাখিও থাকত। চীনের প্রাচীন যে সব নিদর্শন মিলেছে, তাতে পাখির সঙ্গে বাঘকেও সংমিশ্রিত হতে দেখা যায়। এতে অনেকে মনে করেন, চীনে ব্যাঘ্র সংস্কৃতি পক্ষি-সংস্কৃতির পূর্ববর্তী। যে পাখিদের এই বাঘের সঙ্গে সংমিশ্রিত হতে দেখা গেছে, তারমধ্যে চার রকমের পাখিকে দেখা যায়, পরবর্তী কালে পঁ্যাচা একটি Motif হিসেবে গৃহীত হয়। এইসব Ritual vessel-এর মধ্যে পাখির গুরুত্বের একটি ক্রমবিকাশও দেখা যায় : শাং-সংস্কৃতির পূর্বে পাখি এতে যতখানি গুরুত্ব পেত, পরবর্তী কালে তা হ্রাস পায়।

এই প্রসঙ্গে চীনের মৃৎশিল্পের কথা বলি। চীনের 'Black pottery people' যারা, তারা পোর্সিলিনের ওপর পাখির মূর্তি ফুটিয়ে তোলে। বিবিধবর্ণসহ শুক পাখির মূর্তি খুব আঁকা হয়, বিশেষত 'famile rose' ধরনের পোর্সিলিনে। প্রসঙ্গতঃ 'Effigy bowl'-এর কথা ওঠে ; গাছ, বিবিধ প্রাণী বা অন্য কোনো বাস্তব আকৃতিতে নির্মিত। আলোচ্য ক্ষেত্রে পাখির আকৃতিতে মৃৎপাত্রকে এই আখ্যা দেওয়া হয়)। পেতল বা মাটি উভয় ক্ষেত্রেই পাখিগুলো কিন্তু ঝুঁটিহীন। সাধারণত হাতল প্রভৃতিতে পাখির মাথা অংকিত থাকে।

ভারতের নানা স্থান থেকে পাওয়া অনেক মাটির পুতুলের মুখ পাখির মতো। এখনও বাঙলা দেশের কুমোরেরা সেই ধরনের পুতুল তৈরী করে থাকে। পাখিকে মানুষ এবং মা বলে মনে করবার দরুণ একদিকে তার দেহটি মানববৎ. অপরদিকে তার কোনো সন্তানাদি দিয়ে তার মাতৃমূর্তি পরিস্ফুট করা হয় এসব পুতুলে। চব্বিশ পরগণার (ডায়মণ্ড হারবার থানার) হরিনারায়ণপুর থেকে আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন পুতুলকে মোহেঞ্জোদাড়োর সমকালীন বলা হয়েছে। এ ছাড়া হাঁড়ী কলসীর গায়ে চতুর্দিকে, 'ফুটকি' দিয়ে তোলা পাখির আভাস বিশেষ লক্ষণীয়। এসব ক্ষেত্রে ময়ূরকেই বেশি দেখি। কিন্তু ইউরোপ থেকে যে সব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে মৃত্তিকা পাত্রাদিতে হাঁসের ছবি ও মূর্তিই মিলেছে প্রথম। তার কারণ হয়তো এই, হাঁসই এই জাতীয় পাখীদের মধ্যে প্রথম গৃহপালিত পাখিতে পরিণত হয় ; হাঁস মা বসুন্ধরা, শস্য সৃষ্টিকারিণী জল ও জলদেবীর এবং সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সব কারণে হাঁস একটি শ্রদ্ধার আসনে পূর্ব থেকেই আসীন ছিল, তারই ফলে পাত্রাদিতেও হাঁস অংকিত বা গৃহীত হতে থাকে। ময়ূরও সূর্য ও উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত বলে এসব ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

বিভিন্ন কাঠের আসবাব পত্রাদিতে অলংকরণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি পক্ষি মূর্তি গৃহীত হয়। কাটা-দরজার (Swing door), খাট-পালংকের শিয়রে, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দুপাশে ইত্যাদিতে। ময়ূর এবং ঈগলই এ সব ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

হাড়-শিল্পের কথাও উল্লেখযোগ্য। চীনের 'Bone culture-তো এ বিষয়ে বিশ্ববিশ্রুত উদাহরণ। হাড়ের ওপর যাদু ও ধর্মীয় কারণে পাখিকে ফুটিয়ে তোলা হয়। গোরু-মোষের শিং দিয়ে ভারতে পাখির মূর্তি (বককে বেশি দেখি) তৈরি করতে অনেকেই দেখে থাকবেন॥

দারুশিল্পের প্রসঙ্গে নৌ-শিল্পের কথা এল। নানা পাখির মুখ-মাথা অনুযায়ী নৌকোর গলুই নির্মাণের প্রথা ছিল, এবং রূপাকৃতি অনুসারেই নৌকোর নামকরণ হত, যেমন ঃ 'টিয়ঠুটী', শুকপঙ্খী', 'ময়ূরপঙ্খী', 'হংসমালা', ইত্যাদি। এক ধরণের ছোটো নৌকোকে বলে 'সাম্পান'। শব্দটি চীনীয়, সেখানে হংসাকৃতিতে তৈরি নৌকোকে 'সাম্পান' বলে।

ভোজরাজের "যুক্তিকল্পতরু"তে প্রাচীন ভারতে নৌকো নির্মাণের নানা বিধি-নিষেধের কথা আছে। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর "প্রাচীন শিল্প পরিচয়' (১৩২৯) বইতে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নৌকোর গলুইতে মোট আট রকমের পশু-পাখির আকৃতি নির্মাণ করা যেতে পারে বলে ভোজরাজ লিখেছেন। "সূর্যাদিগ্রহের দশাজাত রাজাদিগের নৌকার উপরে ক্রমে হংস, ময়ূর, শুক, সিংহ হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র ও ভ্রমর ইত্যাদির আকৃতি বিন্যাসের ব্যবস্থা দেখা যায়।" —পৃঃ ১৯৯। স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, গ্রহ দোষ এড়াবার জন্যেই এক একটি প্রাণীর মূর্তি গৃহীত হত।

বাঙলা মঙ্গলকাব্য ও রূপকথাদিতে নৌকা গঠন ও নৌযাত্রার কথা আছে। বংশী-দাসের মনসামঙ্গলে দেখা যায়, নৌকা নির্মাণের শেষ কাজ হলো : যে পশু বা পাখির রূপাকৃতি অনুসারে নৌকোর গলুই তৈরি হয়েছে, মণিমাণিক্য দিয়ে সেই প্রাণীর 'চোখ' তৈরি করা। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেও আছে! 'মকর আকার মাথা। গজদন্তের বাতা। মাণিকে করিল চক্ষুদান'। জড়বস্তুর 'চোখ কল্পনা করবার অর্থ হলো, তাকে সচেতন, সপ্রাণ প্রাণিরূপে স্বীকৃতি দান। এই 'প্রাণশক্তি' এবং সজাগ 'চোখ' দুর্জনের কুনজর এবং জলপথের নানা দুর্যোগ থেকে নৌকোকে রক্ষা করবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

মধ্যযুগের বণিকেরা যখন বাণিজ্যে যেতেন তখন তাঁদের 'বহর' সাধারণতঃ 'সাত' বা 'চোদ্দ' ডিঙার হতো। বহরের মধ্যে প্রধান বণিক কোন্ নৌকোতে থাকতেন? কিংবা কোন্ নামের কোন্ নৌকোকে কিভাবে পরপর বিন্যাস করা হতো? বিজয়গুপ্ত এবং মুকুন্দরামের কাব্যে 'মধুকর' নামে ডিঙিই বহরের প্রথমে চলেছে, তাতেই আছে 'রাইঘর' (—রাজগৃহ)। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে বহরের অষ্টম নৌকো 'টিয়াঠুটী। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে অষ্টম নৌকো 'হংসখল' : 'অষ্টমে মিলিল হংসখল।' নাম ও আকৃতি অনুযায়ী এক-একটি নৌকোর এক-একটি যাদুশক্তি ছিল, তারই তারতম্য অনুসারে বহরে নৌকোর স্থান নির্দেশ করা হত।

'The Folk Literature of Bengal' (University of Calcutta, 1920) বইতে দীনেশচন্দ্র সেন মশাই পাখির নামানুযায়ী নৌকোর নামকরণের একটি কারণ

প্রদর্শন করেছেন (P. 65) : যেহেতু বঙ্গীয় ও ভারতীয় নৌকো সাগর পেরিয়ে বাণিজ্য করবার কালে ময়ূরকে একটি প্রধান পণ্য হিসেবে নিয়ে যেত, সেইহেতুই কালে কালে নৌকোর নাম হয় 'ময়ূরপংখী' ! আমাদের ওপরে প্রদর্শিত যুক্তি দুটি লক্ষ করলেই সেন মশাইয়ের এ যুক্তির অসারতা উপলব্ধি করা যাবে। তা ছাড়া, শুক, টিয়ে, হাঁস ইত্যাদি পাখি এবং মকর, মধুকর, সর্প, হস্তী ইত্যাদি প্রাণীর নামে যে নৌকোর নামকরণ করা হয়েছে, তাদের পেছনেও সেন-প্রদর্শিত একই যুক্তি অন্বেষণ করতে হয় ! আসলে পাখির মধ্যে যে 'Mana' আছে, তাই নৌকোকে রক্ষা করে বলে এটি করা হয়।

চীনের 'Bird-boat', 'Dragon-boat', 'Junk' জগদ্বিখ্যাত। নৌকোর গলুই-গুলো হতো ড্রাগনের মুখ-মাথার মতো, আর হালের ওপর আঁকা থাকত খাঁটি চীনীয় ভঙ্গিতে উৎক্রোশের ছবি। সামান্য কিছুদিন পূর্বেও চীনে এ ধরণের নৌকো দেখা যেত ! এইসব নৌকো নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত। চীনের সম্রাটেরা, ঈজিপ্টের 'ফারাও'-দের মতো, এই ধরণের নৌকো রাখতেন ; নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, 'বৃষ্টি আনায়ন' ইত্যাদি কর্মে সেসব নৌকো ব্যবহৃত হত।[১] 'Bird-boat'-কে চীনীয় ভাষায় বলা হত 'Yih', যার অর্থ : "এক ধরণের সামুদ্রিক পাখি, যা অতি উচ্চস্থানে উড়ে যেতে সক্ষম, নৌকোর গতির দ্রুততা বাড়াবার জন্যে হালের ওপর এর ছবি সেই-জন্যেই আঁকা হয়।" Donald A. Mackenzie তাঁর Myths of China and Japan" (The Gresham Publishing Company : London : প্রকাশের তারিখ দেওয়া নেই, বইতে P. 41) নৌকোর হালের ওপর পাখির ছবি এঁকে রাখবার যে কারণ প্রদর্শন করেছেন, দীনেশচন্দ্র সেনের মতের মতোই তা সর্বাংশে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। পাখির দ্রুতগতি অর্জনের জন্যেই নৌকাতে পাখির ছবি আঁকা, স্পষ্টতই "হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিক" এর উদাহরণ বটে ; কিন্তু ম্যাকেঞ্জি এখানে পাখির অন্তর্নিহিত Mana-কে, লক্ষ করলে ভালো করতেন। এই যদি না হবে তাহলে 'সাম্পান' নামে চীনদেশেরই অপর এক ধরণের ছোটো নৌকো হংসাকৃতির করে তৈরি করা হত না ; কারণ, হাঁস জলজ পাখি হলেও গতিতে সে দ্রুত নয়।

---

১. এ সম্পর্কে Florance Waterbury তাঁর Bird-Deities in China (Menlli : Ascona : Switzerland, 1952) বইতে আরো তথ্য দিয়েছেন : "...the raft-like canoes of the Maories of the Chatham Islands have to conventionalized birds on the stern-board, and two protecting sticks at the prow which end in carved bird's head. White sea-birds' feathers extend from the foremost seat to these heads...The natives of Dorey, New Guinea, adorn the high prows of their boats with a human figure whose head is a bunch of Cassowary feathers...In Tahiti canoes sacred to the Gods were decorated with feathers, and the prow and the stern, sometimes twelve to fifteen feet high, bore the curved head of a sea-bird, or a spirit-image. The God's image, covered with the sacred red and yellow feathers, was placed in the canoes, which was accompanied by followers in long double-canoes, each of which had two great drums on board, which were called "Sounding-at-sea".—PP. 100-101.

নৌকাকে পাখি বলবার প্রথা অনেক দেশেই আছে, বাঙলাতেও আছে। সংস্কৃতে নৌকাকে 'গরুত্মতী' বলা হয়॥

·১০·

অতঃপর যন্ত্রপাতির কথা বলি। এখানেও পাখির প্রভাব দেখি।

'কঙ্কমুখ' বা 'কঙ্কবদন' : কাঁক পাখির মুখাকৃতিতে তৈরি যন্ত্র, বাণ, সাঁড়াশি। সুশ্রুত সিংহ ও কাকাদির মুখের মতো দেখতে চব্বিশ রকমের যন্ত্রের (Forceps কথা উল্লেখ (১৭.৬) করেছেন।

'বকযন্ত্র' : বৈদ্যকশাস্ত্রে তেল ও আরক চোলাই করবার জন্যে বকগ্রীবাবৎ যন্ত্রবিশেষ (Retort)। কপিকল বা 'Crane'-এর কথাও এখানে বলা যেতে পারে। সারস বকের গ্রীবার মতো বলে এই যন্ত্রের এই নাম হয়েছে।

'বগাকাসি' (ঢাকা, কুমিল্লা) : বকের গলার মতো কাস্তে।

'বগি' (রাজশাহী) : বক+ই, বকের গলার মতো বাঁকা দা বিশেষ।

'নাচনপাখি' : তাঁতযন্ত্রের অঙ্গবিশেষ।

'ময়ূর' : ঘটীযন্ত্র বিশেষ।

···১১

প্রাচীন ভারতের দেবতা ও নৃপতিদের ব্যবহার্য নানা আসবাব পত্রে পাখির মূর্তি একটি আবশ্যিক উপকরণ বলে পরিগণিত ছিল। রাজাদের ছত্র, চতুর্দোল, সিংহাসন ও 'ভদ্রাসনে'র কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।

দেববিগ্রহ ও রাজসিংহাসনের ওপর, বিবাহ ও অভিষেক ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভারতে ছাতা ব্যবহার হত। 'বৃহৎ সংহিতা'য় বরাহমিহির রাজাদের ছাতার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, তাঁদের ছাতার শোভাসম্পাদন করতে হবে হংস, কুক্কুট, ময়ূর, সারস প্রভৃতির মধ্যে যে কোনো একটি পাখির পালক দিয়ে। অভিষেক বা বিবাহকালে যে সব ছাতা ব্যবহৃত হত, তাদের ওপরে অন্যান্য মঙ্গলচিহ্নের সঙ্গে হংসও যুক্ত হত। এই হংসচিহ্নিত ছত্র (নয়টি রত্নে ও বত্রিশটি মুক্তার গ্রথিত) বত্রিশটি মালায় খচিত হত।

নানা উদ্দেশ্যে মাথায় উষ্ণীষ ধারণ করা হত। স্নানের পর মাথার জল শুষ্ক করবার জন্যে যে উষ্ণীষ ব্যবহৃত হত, প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তা 'রাজহংসনিভ' বলে কথিত

হয়েছে। বঙ্গীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁর বিধানে বলেছেন, একমাত্র স্নানের পরই এই 'রাজহংসনিভ' উষ্ণীষ ধারণ করা উচিত, অন্য সময়ে নয়। উষ্ণীষে পালক ধারণ করবার প্রথা পৃথিবীর সব দেশেই আছে। যেমন, উট পাখির পালকে তৈরি মুকুট, যা ইজিপ্টের দেবতাদের মাথায় দেখা যায়, যাকে বলে 'Atef crown'।

ব্যজন বা পাখার ওপরও থাকত নানা পাখির ছবি, কিংবা তা কাপড়ে তৈরি হলে সুতো দিয়েই পাখির আভাস ফুটিয়ে তোলা হত বিশিষ্ট সূচীশিল্পের মাধ্যমে, কিংবা পাখির পালক দিয়েই তৈরি হত ব্যজন। দেবতা, রাজা এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই সব ব্যজন ব্যবহৃত হত এবং হয়। রাজা ও দেবতার ব্যজন আকারে বৃহৎ হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতে দেবপূজার উপচার রূপে যে ব্যজন ব্যবহৃত হত, তার আকৃতি ও প্রস্তুত করবার উপকরণের কয়েকটি বিশিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি ছিল, তা পালন করতেই হত। ব্যজনের দণ্ডাগ্রভাগকে দু-ভাগ করে তাতে ময়ূর পুচ্ছের গোড়ার দিকটি দিয়ে গোলাকার ব্যজন তৈরি হত, ঝালরে দেওয়া হত ময়ূরের পালক। একেই বলা হত 'ময়ূর ব্যজন'।

সূর্যাদি অষ্টগ্রহের দশাতে জাত রাজাদের চতুর্দোল-যানে দর্পণ, অর্ধচন্দ্র ইত্যাদির সঙ্গে হংস, ময়ূর, শুক প্রভৃতির প্রতিকৃতি নিহিত হত। 'যাত্রাসিদ্ধি' নামে চতুর্দোল যানের একেবারে ওপরে নিহিত হত চাস পাখির পুচ্ছ আর একধরণের চতুর্দোলের নাম 'নিষ্পতাক'; এই নিষ্পতাক চতুর্দোলে বিশেষ নিয়মে পাখির পালক যুক্ত হত, ঠিক সেই নিয়মেই 'সিংহ' নামক 'অষ্টদোলেও'।

ভোজরাজের 'যুক্তিকল্পতরু'তে সূর্য প্রভৃতি অষ্টগ্রহের দশায় জাত নৃপতিদের সিংহাসনের চিহ্ন হিসেবে অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে হংসের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। 'হংস' সিংহাসন শালকাঠ দিয়ে নির্মিত এবং 'হংসের প্রতিকৃতি শ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত' হত। সিংহাসনের পদাগ্রেও হংসের প্রতিকৃতি থাকত। এই প্রসঙ্গে শা-জাহান-এর জগদ্বিখ্যাত 'তখত তাউস' অর্থাৎ 'ময়ূর সিংহাসনের' কথা মনে পড়বেই।

প্রাচীন ভারতের রাজাদের অভিষেক দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হল 'ভদ্রাসন'। 'ভদ্রাসনে'র গঠনে আটটি হংসের প্রতিকৃতি বিন্যস্ত করতে হত।
এই প্রসঙ্গে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের "প্রাচীনশিল্প পরিচয়" (১৩২৯) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য॥

···১২·
বস্ত্র, অলংকার, প্রসাধন সামগ্রী ও কবরী রচনার সঙ্গেও পাখিকে যুক্ত হতে দেখা যায়।

কালিদাস 'হংস চিহ্ন দুকূল' (রঘুবংশ : ১৭. ২৫) অর্থাৎ হংসাঙ্কিত পট্টবস্ত্রের

কথা বলেছিলেন। এখনও বালুচর শাড়ী, কটকী, মুর্শিদাবাদের ছাপা রেশমী শাড়ী প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধরণের পাখির প্রতিভাস হয় সুতো নয় রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। 'লোকশিল্পে' পক্ষিমূর্তি কিভাবে গৃহীত হয়েছে, তার চমৎকার প্রমাণ এখান থেকে মেলে। মৈমনসিংহের তাঁতীরা 'বাওই ঝাঁক' শাড়ী বোনে, এতে মনে হয় এক ঝাঁক বাবুই পাখি যেন তাতে উপস্থিত। শাড়ীর রঙের মধ্যেও আছে পাখি: 'ময়ূরপেখম' শাড়ী বা 'ময়ূরকণ্ঠী' শাড়ী ময়ূরের দেহ বর্ণকে আদর্শ রেখে প্রস্তুত হয়। 'কাউয়া রঙ্গী' শাড়ী: কাক-বর্ণবিশিষ্ট নীলাম্বরী শাড়ী। 'কাগডিমে' শাড়ী: কাকের ডিমের মতো রঙ যার।

শাড়ীর ওপর বিভিন্ন পাখির রূপাভাস বর্ণে বা বয়নের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে যে উদ্দেশ্যটি ক্রিয়াশীল তা হল: পাখির মধ্যে বিশিষ্ট মঙ্গলকারী ও যাদুধর্মী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে তারই ফল আদায় করে নেওয়া। নীচে উদ্ধৃত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে এ কথা সপ্রমাণ হবে।

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (ক, বি, ১৯২৬: দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা: দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত)-র "মইষাল বন্ধু" পালাতে সাজুতী সুন্দরীর সজ্জাতে দেখি: 'কোমরে বান্ধিয়া পরে ময়ূরপঙ্খা শাড়ী', পৃ. ৫৬। এখানে এই শাড়ীর মধ্যে কোন কোন যাদুগুণ আরোপিত হয়েছে স্পষ্ট সংবাদ নেই; কিন্তু এরই পরে সাজুতী সুন্দরী যখন "কপালে সিন্দুর দিল পক্ষী সমতুল", তখন তার মধ্যে একটি ঐন্দ্রজালিকতার দিক ভেসে উঠল। "কমলা কন্যার পালা', (প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা: তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭১: ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত)-তে আছে: "শূন্যেতে থইলে শাড়ী শূন্যে যায় উড়ে"। এই ওড়ার মধ্যে পাখি ও যাদু একত্র সমাবিষ্ট হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের নেত্রকোণা থেকে সংগৃহীত (লোক সাহিত্যে ছড়া: বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৬৯: মোহা. সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী) একটি ছড়াতে পাই:

> কত পক্ষীর নাম লেখ্‌খ্যাছে শাড়ির কিনারে॥
> দইগল খঞ্জন লেখ্‌খ্যা থইছে যার বুক কালা।
> কুসুম পক্ষী লেখ্‌খ্যা থইছে, রাও শুনিতে ভালা॥
> কুঁডা পক্ষী লেখ্‌খ্যা থইছে টুল্লুর টুল্লুর কবে।
> কানী বগা লেখ্‌খ্যা থইছে গাল ফুলাইমা ঘরে॥ পৃ ৫১

কবি জসীমউদ্দীন কর্তৃক সংগৃহীত "ওতলা সুন্দরীর পালা" (বাঙালীর পল্লী-জীবনে রূপের সাধনা: প্রবাসী: মাঘ ১৩৪২, পৃ. ৪৭২-৪৭৬)-তে পাই:

> শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে হাঁসা-হাঁসীর জোড়া,...
> ...হাঁস লেখছে কবুতর লেখছে হরিণ পালের পাল...
> ...বগাবগী লেখ্যা থুইছে মারিয়া আধার করে...
> ...মুরগী আণ্ডা লেখ্যা থুইছে অসক্যা অসক্যা চলে।

অডা লেখছে হাঁসাহাঁসী সোনাসার টিয়া,
নলগ্দণ্ডী কাম কুড়া ডাক সাতই করিয়া।
ওডই পোডই লেখ্যা থ্ইছে গরগর চড়া,
উকা বাবই লাউয়া বাবই বাবই পিয়ারা।
কুণ্ডনে দৈগল লেখছে যার ব্ক কালা,
কয়ার কুকুয়া লেখছে রাও শ্নিতে ভাল।
আরও কত পক্ষী লেখছে শোন্যে উড়িয়া যায়,
চড়াচড়ি লেখ্যা থ্ইছে বেড়ী যার পায়।
বাঘার ভেল্য়া লেখছে যার বড় রাও,
আড়গিলা লেখ্যা থ্ইছে যার লম্বা পাও।

রঙপ্রের জেলা থেকে সংগ্হীত 'গোপীচন্দ্রেব গানে' (ক, বি, ১৯৬৫ : পরিবর্ধিত তৃতীয় সং) রানীর শাড়ীর বর্ণনায় আছে :

প্রথমেতে পিঞ্জল কাপড় কাউয়ারঙ্গি সাড়ি।...
হাঁস ন্যাখছে বাহনা ন্যাখছে গহ্র হরি।
কাগের সরস্বতী ন্যাখছে কুবিরের ভাণ্ডারি ॥ ··
প্থিবীর যত পক্খি দ্যাছে কাপড়াএ নেখিয়া ॥··
চিলায় মারে ছই বগিলায় ধরিয়া খায়।...
রাজহংস বালিহংস সারাল্গি চকোআ।
লাউজালি কদমা পখি নেঁখিছে সারা কাপড় দিয়া ॥
চোজভরা পখি ন্যাখছে কলার খায় মৌ।
চটর মটর কেউচা ন্যাখছে আর বানিয়ার বউ ॥
দাস্যাস্তরি পখি ন্যাখছে দ্যাসে দ্যাসে ধায়।
শকুন গ্ধিনী ন্যাখছে যা মরা গর্ খায় ॥
আ'চ্চরা পখি ন্যাখছে আজ্যের ঠাকুর।
সকল পাখির রাজ্ ন্যাখছে গোধম তার ঠকুব ॥
দলের উপর কোরা পখি করছে ডুবাডু ॥···
ঝাডের তোতা একটা ন্যাখছে হাজার টাকা ম্ল ॥
দ্ই পাকে দ্ইটা নেবিছে ভুলকিমারা প'্যাচা ॥
ঢাল কাউয়া ন্যাখছে কাক্খান কাক্খান করে।
চন্দন মএনা ন্যাখছে রাধা কিষ্ট বলে।

প্. ৮৪-৮৭ : পাঠান্তর এবং অতিরিক্ত পাঠান্তর।

এইসব দ্ষ্টান্তগ্লিতে সাদ্শ্যম্লক কয়েকটি ব্যাপার দ্ষ্টি আকর্ষণ করে : প্রত্যেকটিতেই পাখির অস্তিত্বের দর্ণ শাড়ীকে বিশেষ শক্তি ও যাদ্ধর্মান্বিত বলে মনে করা হয়েছে। পাখিগ্লোর নামচয়ন যদ্চ্ছা করা হয় নি ; একটি সচেতনতা এর পেছনে কাজ করেছে : হয় এরা শ্ভ ; নয় অশ্ভ শক্তির প্রতীক। এই জন্যে শকুনি-

গৃধিনী-হাড়গিলে-প্যাঁচাও বাদ যায় নি। পাখিগুলির এক একটি বিশিষ্ট দেহ ভঙ্গিমা, কণ্ঠস্বর, এবং তাদের সঙ্গে জড়িত এক একটি দৃশ্য বা ঘটনা এখানে নকশার বিষয় হয়েছে। ওই বিশেষ ভঙ্গিমা বা দৃশ্য-ঘটনাগুলোই এখানে মূল উদ্দিষ্ট বিষয়। জোড়া-সহ পাখির মধ্যেও এক যাদুশক্তি খোঁজা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাখির এই রূপ 'লেখা' অর্থাৎ আঁকা হয়েছে, বয়নের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার কথা উল্লিখিত হয় নি।

একই উদ্দেশ্য ও উপকরণ নিয়ে কাঁচুলিতেও পাখির আভাস আনা হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর কাঁচুলি নির্মাণের কথা সকলেরই জানা। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের (প্রথম খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৫৯ ডঃ সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত) স্থাপনা পালাতে ইন্দ্রের সভায় জম্বুবতী নাচবেন বলে যে কাঁচুলিটি পরলেন, তাতে দেখা যায় নানা কারুকাজ। এই কাঁচুলিটির একটি বর্ণনা উক্তগ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় একটি অর্বাচীন পুঁথিতে যে ভাবে পেয়েছেন, পাঠান্তর হিসেবে পাদটীকায় তা উদ্ধৃত করেছেন।

শঙ্খচিল গিধিনী লিখিল শারীশুক।
কোহুরি কহব ফিঙ্গা লোচন নাছচোরা॥
চাতক চড়ুই সার উড়ে যেতে চায়।
পাতকুয়া ঝাকে ঝাকে বৈসে পাঁচ সাত॥
সাপ ধব্যা খায় শিখী উভ করে বুক॥
সম্বিধ ফেলে বসে থাকে নাম তার শারা।
পেচাকে দিখিয়ে কাক পেছু পানে চায়॥—পৃ ৩২.

শ্রীকমলকুমার মজুমদার "বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ" নামে একটি প্রবন্ধে এক্ষণ: কার্তিক—মাঘ ১৩৭৯, পৃ. ৭৫—৯৬ রূপরামের ধর্মরাজের গীতের অন্তর্ভুক্ত নয়ানী কুলটার কাঁচুলির বর্ণনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

কাঁচলি উত্তর চালে শিখি পক্ষী সব।
খত্রর খুরঙ্গ লেখা সারস সরব॥
টুলকুচি টেসকলা টিয়া রাঙ্গামুখী।
কোকিল খঞ্জন ঘুঘু চিল কাক পাখী॥
কুহরি কচল বক লিখ্যা বুড়ি পাঁচ।
মাছরাঙ্গা সদাই উড়ে মুখে যার মাছ॥
ফিঙ্গ চোটুই বাদুড় লিখিল গঙ্গাচিল।
রামশাল্কী উড়ে যায় সাক্ষাৎ অনিল॥
পাঁচযুড় লিখিল সমুখে কাদাখোঁচা।
কদম্ব কোটরে বস্যা মাথা নাড়ে পেঁচা॥...

ওপরের দৃষ্টান্তগুলিতে শাড়ীর বর্ণনাগুলি পূর্ব ও উত্তর বাঙলা থেকে এবং

কাঁচুলির বর্ণনাগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে গৃহীত। কিন্তু সর্বত্রই উদ্দেশ্য, উপকরণ, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এক ও অভিন্ন।

বস্ত্র ও পোশাকে পাখির প্রতিকৃতি পৃথিবীর বহুদেশেই গৃহীত হয়েছে। চীনের কথা এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীনের চতুর্থ শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের আনুষ্ঠানিক পোশাকে সূচীশিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হত সাদা সারসের প্রতিরূপ। তেমনি তৃতীয় শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পোশাকে থাকত বন হংসীর প্রতিরূপ এ ছাড়া পর্দা প্রভৃতিতে মাছরাঙার সত্যিকারের পালক এবং শ্যেনের প্রতিরূপ গৃহীত হয়। সত্যিকারের পালক খচিত পর্দা স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যে ও যাদুগুণে অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হয়। বীরত্ব ও সূক্ষ্মদৃষ্টির জন্যে গৃহীত হয় শ্যেনের মূর্তি। কুকো বা মাহোকা (Pheasant)-এর দীর্ঘপালক চীনে নানাভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পোশাকে স্বর্ণ কক্কুভ (The golden pheasant) এর এবং পঞ্চম শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পোশাকে শ্বেত কক্কুভ (The silver pheasant)-এর প্রকৃতি সূঁচ-সুতোয় নিহিত থাকে। কুকোর যে মূর্তিটি এই সব ক্ষেত্রে নেওয়া হয়, তা এই : সমুদ্রের ওপর একটি পাহাড়ের চূড়োতে কুকো সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এটাই চীনের রাজকীয় প্রতীক। চীনের উত্তর দিকের পর্বতমালার বিশেষ এক ধরনের কুকো, যা 'Reeve's pheasant' নামে পরিচিত, তা দীর্ঘ পালকের জন্যে প্রখ্যাত। এই পালক নাকি ছ'ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। চীনের অভিনেতারা প্রাচীন যোদ্ধার পোশাকে এই দীর্ঘ পালক ব্যবহার করে থাকেন। এই পালক কালো রঙের হয়ে থাকে।

কাঁথা এবং বিভিন্ন আসবাব পত্রের শৌখিন ঢাকনা (Tapestry)-তেও পাখি উল্লেখযোগ্য 'Art motive' এবং 'symbol দুই হয়েছে। বাঙলার নক্শী কাঁথা'র নকশার কথা অবশ্যই এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাথিওয়াড় বা সৌরাষ্ট্র এবং বাঙলার কাঁথা শিল্পে ময়ূরের রূপাকৃতি প্রায়শ গৃহীত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে ময়ূরকে দুভাবে ফোটানো হয় : কাঁথার ঠিক মাঝখানে কলাপবিস্তারী একটি বড়ো আকারের ময়ূর ; অথবা, দুপাশে সমাকৃতির দুটি, বা সারি বেঁধে ছোটো আকৃতির একাধিক ময়ূর, পাশাপাশি। শাড়ীর আঁচলে বা কাঁথার পাড়ে যখন সারি সারি ময়ূর সুতোয় গেঁথে তোলা হয়, তখন সেই ময়ূরের আকৃতিগুলো এই রকমের হয় : দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে সামনের দিকে স্থিরভঙ্গিতে তাকানো, স্বল্প ফোঁড়ে পুচ্ছের আভাস দানের চেষ্টা। কাঁথা প্রভৃতির সেলাই করবার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিকে বলে "কৌতর খুপী" সেলাই। এতে সেলাইয়ের ভঙ্গিটা হয়, পায়রার খোপের মতো সম চতুষ্কোণ।

শামিয়ানার ওপর যে পাখির আভাস ফোটানো হয়, তা মূলত Applique-এর কাজ অর্থাৎ শামিয়ানার জমিনের ওপর অন্য রঙের কাপড় পাখির আকারে কেটে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া। এখানেও পাখির নিখুঁত ও স্বাভাবিক মূর্তি ফোটে না। ভিন্ন রঙের সুতোর কারুকাজের মাধ্যমে সেই কাটা কাপড়ে পাখির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আভাস দেবা। চেষ্টা করা হয়। এখানেও পাখির উড়ন্ত মূর্তি অপেক্ষা স্থির নিশ্চল মূর্তিটাই বিশিষ্ট লোকশিল্পের মাধ্যমে গৃহীত হয়। চীনের Applique-এ একটি

অভিনবত্ব আছে; সেখানে কাটা-কাপড়ের সঙ্গে মাছবাঙার প্রকৃত পালকই ব্যবহৃত হয়। পর্দাতেও এটি করা হয়।

নারীর নানা আকারের কবরী রচনাতেও পাখির রূপাভাস মেলে। চণ্ডী-মঙ্গলে মুকুন্দরাম লিখেছেন: "কবরী বান্ধিল রামা নাম শুয়াঠুটী।" অমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "বাইশ কবি মনসামঙ্গলে" (১৩২২) পাওয়া গেছে: "ময়ূর পেখন খোঁপা", অর্থাৎ ময়ূরের পেখমের মতো বিস্তৃত ও বৃহৎ খোঁপা। জসীমউদ্দীন সংগৃহীত পূর্বোক্ত "ওতলা সুন্দরীর পালা"-তে খোঁপার বর্ণনা এই: "প্রথমে বান্দিল খোঁপা আড়িয়া চামর। / দেখিতে যেন খোঁপা ময়ূরের পেখম॥" পূর্বোল্লিখিত সম্পাদকদ্বয়ের রূপরামের ধর্মমঙ্গলে, জম্বুবতীর কেনা রচনায়: "মল্লিকার মালা দিএ বান্ধিল লোটন। / বাদলে ময়ূর যেন ধরিল পেখম।"

শাড়ী ও কাঁচুলির মধ্যে পাখি যেমন কেবল নিছক অলংকরণ নয়, পরন্তু যাদু-ইন্দ্রজাল-ঘটিত এক বিশেষ দিক কবরীর ক্ষেত্রেও তাই। জম্বুবতীর বিশেষ ধরণের খোঁপা রচনার মধ্যেও এক উদ্দেশ্য-প্রবণতা ক্রিয়াশীল। কয়েকটি উদাহরণে দেখা যাবে, স্পষ্টতই কবরীগুলি অস্বাভাবিক। যেমন, উত্তরবঙ্গে বৈশাখ মাসে কৃত্য "কাত্যায়নীব্রতে"র গানের এক স্থানে আছে: "তারপরে বান্ধে খোঁপা হাড়িয়া তাড়িয়া / খোঁপার উপরা বাসা করে ঝেচু চিলা কাউয়া॥" রঙপুর থেকে সংগৃহীত পূর্বোক্ত 'গোপীচন্দ্রের গানে'র সন্ন্যাসখণ্ডে নারীর রূপসজ্জায় আছে: "খোঁপার ভিতর বাসা করে বাঙ্গাল গাইয়ার টুনি।" আবার, অভিশাপ দেবার সময়ও বলা হয়েছে: "ঝেঁচু পংখী বাসা করবে মস্তকের উপর।"

বহু তন্ত্র-মন্ত্রে 'চুল' একটি বিশিষ্ট উপকরণরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। আরব্য উপন্যাসে' দেখা যায় বহুবার 'একগাছি চুল' নিয়ে নানা মন্ত্রপাঠ করতে। প্রধানত 'Black magic' অর্থাৎ অপরের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে 'চুলে'র প্রয়োজন হয়। যেহেতু তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেহজাত, অতএব এটি জেমস্ জর্জ্ ফ্রেজার কথিত 'Contagious magic'-এর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরবঙ্গের সকল ক্রিয়াচার ও তন্ত্রাচারের মধ্যে ফিঙ্গে পাখি (ঝেচু, ফেচু) খুব বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। সম্ভবত তন্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান কামাখ্যার সন্নিহিত অঞ্চল বলে এটি ঘটেছে। 'চুল' ও পাখি এইভাবে এক অভাবিত পরিণতির মধ্যে এসে একত্র দাঁড়িয়েছে। শিল্প ও যাদু মিলেমিশে গেছে।

অতঃপর বিভিন্ন অলঙ্কার ও মূল্যবান পাথরের সঙ্গে পাখির যোগের কথা বলি। 'A study of human ornamentation' (Man in India: Vol. X, No. 4, December 1930, PP. 216-243) নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধে রাজরাজ মুখোপাধ্যায় মশাই লিখেছেন যে, ময়ূর, মুরগী, টিট্টিভ প্রভৃতি ঝুঁটিওলা পাখিরাই মানুষকে ফুল-পাতা-পালকের গুচ্ছ দিয়ে শির সাজাতে প্রাণিত করেছিল; কাঠঠোকরা প্রভৃতি বিচিত্রিত পাখিরা তাকে উল্কিচিত্র দিয়ে দেহ-সজ্জা করতে শিখিয়েছিল। শুধু পাখিই নয়, অন্যান্য সবপ্রকার মানবেতর প্রাণীই এ বিষয়ে মানুষকে প্রাণিত

করেছিল। এখনও সোনা-রূপোর নানা গহনাদিতে অলঙ্করণের জন্যে পাখির রূপাকৃতি খুবই গৃহীত হয়। হাঁসের গলার মতো দেখতে যে কণ্ঠহার, তাকে তাই বলা হয় 'হাঁসুলি' বা 'হাঁসুলি হার'। বাহুর অলঙ্কার 'আর্মলেটে' সেদিন পর্যন্ত মূল Motive রূপে থাকত —পেখম মেলা ময়ূর, সারি বাঁধা হাঁস, (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা 'মিনে' করা), কিংবা পাখা মেলা প্রজাপতি। এ ছাড়া সাপ তো ছিলই।

নূপুরকে কখনো কখনো বলা হয়েছে—'হংসক'। 'হংসক' শব্দের অর্থ নিয়ে মতবাদ আছে : হয় এর অর্থ হংসের আকার বিশিষ্ট নূপুর ; নয় তো, হংসের রুত সদৃশ নূপুরের নিক্কণ। বাণভট্ট 'কাদম্বরী'-তে এবং শ্রীহট্ট তাঁর 'নৈষধচরিতে' এই প্রকার নূপুরের কথা বলেছেন।

বিভিন্ন মণিখণ্ড ও প্রস্তর খণ্ডের বর্ণ নির্দেশের মধ্যে পাখির দেহবর্ণকে আশ্রয় করা হয়েছে। বরাহমিহির 'বৃহৎ সংহিতা' (৮২. ১) য় বলেছেন, যে মরকত মণির বর্ণ শুক পক্ষীর পক্ষ সদৃশ, তা নানা শুভফল প্রদান করে। ভোজরাজের 'যুক্তি কল্পতরু'-তে মরকত মণির আট প্রকার ছায়ার কথা বলা হয়েছে, কয়েকটি এই : ময়ূরপিচ্ছ তুল্য ছায়া, চাসপাখীর (স্বর্ণ চাতক, বা স্বর্ণচূড়) পক্ষতুল্য ছায়া, শুকশিশুর তুল্য ছায়া। বৈদূর্য মণির বর্ণভেদ নির্দেশ করতেও পাখির দেহবর্ণ আশ্রিত হয়েছে : ময়ূর কণ্ঠের মতো নীলবর্ণ বৈদূর্য মণিকেই প্রধান বলা হয়েছে ; চাসপক্ষীর পক্ষের বর্ণসদৃশ বৈদূর্যমণিকে প্রশস্ত বলা হয় নি। ময়ূর কণ্ঠের বর্ণের মতো কিছু কিছু ইন্দ্রনীল মণি দেখা যায়।

মরকত উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের মণি, আধুনিক নাম 'পান্না'। 'শব্দরত্নাবলী' প্রভৃতি কোষ-গ্রন্থে এর প্রতিশব্দ মেলে এই : 'গরুড়াঙ্কিত,' 'গরুড়োস্মীণ', 'গারুড়' প্রভৃতি। 'বৃহৎ-সংহিতা' ছাড়া অগ্নিপুরাণ, গরুড় পুরাণ, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, রাজনির্ঘণ্ট, যুক্তিকল্পতরু, প্রভৃতি গ্রন্থে মরকত মণি সম্পর্কে যে আলোচনা মেলে, বিভিন্ন পাখির সঙ্গে এর যোগ আছে। 'গরুড় পুরাণে'র ৭১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বাসুকি দৈত্যপতির পিণ্ড নিয়ে চলতে থাকলে পক্ষীন্দ্র গরুড় তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। সর্পরাজ তা ফেলে দিলে গরুড় পতনকালে তার কিয়দংশ গ্রহণ করেন এবং পরে নাসারন্ধ্র দিয়ে তা নিক্ষেপ করেন। 'মানসোল্লাস'-এ বলা হয়েছে, ইন্দ্রধনুর অন্তর্গত সবুজ বর্ণের, চাষ কিংবা ময়ূরের পাখার ছায়ার মতো মরকত গরুড়ের বক্ষ থেকে উদ্ভূত হয়। 'গরুড়পুরাণে' ইন্দ্রনীলা বা নীলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোনো কোনো নীলা ময়ূর-কণ্ঠের মতো, কোনোটা বা মত্ত কোকিলের কণ্ঠের মতো বর্ণবিশিষ্ট। এ বিষয়ে 'মরকত মণি' (আর্যদর্শন : অগ্রহায়ণ, ১২৮৯। পৃ ৮৬-৯০) নামে রামদাস সেনের একটি প্রবন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মণিখণ্ড, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি সম্পর্কে পাখির পরম আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা যায়। পাখির নীড়ে অনেক সময় প্রস্তরাদি মেলে। নানা সংস্কার বিশ্বাস কাহিনীরও উদ্ভব হয়েছে এ জন্যে। আবাবিল (the swallow) পাখির মাথাতে এক রকম পাথর হয়, তাকে বলে 'Swallow stone' ; এই পাথর নানা যাদু মন্ত্রে লাগে। বিশেষ

করে প্রেমের ক্ষেত্রে বশীকরণের জন্যে 'শামির', 'কর্নিয়া' ইত্যাদি পাথরের সংগেও পাখির সম্পর্ক নিয়ে নানা কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। পাখির প্রস্তর-মনস্কতা সম্পর্কে এস্. এস্. মেহ্তা 'Curious lore or superstition about precious stones' (Journal of the Anthropological society of Bombay : Vol. XII, No 4 pp 32-39) নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন ॥

·১৩··

সামান্য কয়েকটি লৌকিক ক্রীড়া সামগ্রীর (Folk games, Folk toys) মধ্যেও পাখিকে প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। তাঁর "Games, sports, and pastimes in Pre-historic India" (Man in India : Vol XXI, No. 2+3, April-Sept 1941, pp. 127-146) প্রবন্ধে টি, আর, পদ্মনাভচারী দেখিয়েছেন, হরপ্পার মাটি খুঁড়ে মাটির তৈরি পশু-পাখি পাওয়া গেছে। এগুলো যে খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মোহেঞ্জোদাড়োর মৃত্তিকা গর্ভে এক ধরনের মাটির তৈরি বাঁশি পাওয়া গেছে, যা ঠিক পাখির আকারের। কাঠি দিয়ে পাখির পা তৈরি করা হত, ভেতরটা ফাঁপা, ঠোঁট দুটি ফাঁক করা,—পুচ্ছ দেশ সছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে ফুৎকার দিলে তীক্ষ্ণরবে বাঁশি বেজে উঠত। আশ্চর্যের কথা এই, মাটির তৈরি (পোড়া মাটির, কালো রঙের) এই পাখি বাঁশি এখনও তৈরি করে কুমোররা, মেলা ইত্যাদিতে সামান্য দু-চার পয়সায় বিকোয়। মোহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া এই ধরনের পাখি-বাঁশির অস্তিত্ব থেকে স্বতই মনে হয়, তখনকার দিনেও নিশ্চয়ই গায়ক পাখিদের খাঁচায় করে পোষা হত, পাখিদের গানই পাখিকে খেলার বাঁশি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। মোহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া আর একটি খেলনা হল : একটি দণ্ডে আরোহণরত একটি প্রাণী ; প্রাণীটিকে সঠিক সনাক্ত করা যায় নি বটে, তবে অনুমান হয়, ওটি একটি বুলবুলি। মাটির তৈরি আ-পোড়া, নানা রঙ করা, স্বাভাবিক মূর্তির খেলনা পাখি এখনও যে কোনো মেলাতেই দেখা যায়, টিয়ে, কাকাতুয়া এর মধ্যে প্রধান। Cock-fighting বা মোরগ যুদ্ধ দর্শন ক্রীড়া-কৌতুক রূপে চলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে চলিত ছিল 'Game of goose'। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে তা পুনরুজ্জীবিত হয়। এই খেলার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থলটি বোর্ডের উপর একটি হাঁসের আকৃতি দ্বারা চিহ্নিত থাকত।

গত শতকে রথ ইত্যাদির মেলাতে শোলার পাখি বিক্রী করা হত। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"-য় কলকাতার চিৎপুরের রথের মেলার বর্ণনায় লেখা হয়েছে ; "তাল পাতের ভেঁপু পাখা ও সোলার পাখি বেধড়ক বিক্রী হচ্ছে ; · " এখনও, একটি কাঠের গাছে অনেকগুলো কাঠের তৈরি পাখি বসে আছে, এমন বস্তু চিৎপুরের দোকানে দেখা যায়, এই সেদিনও স্বচক্ষে তা দেখেছি। বেলুন দিয়ে টিয়ে বা চড়ুই পাখি তৈরি করে, লাঠির মাথায় বেঁধে ফিরি করতে কলকাতার রাজপথে হামেশাই দেখা যায়।

শ্রী নারায়ণ চন্দ তাঁর "পাখির পরিচয়" (নভেম্বর ১৯৭২) বইতে লিখেছেন : পূর্ববঙ্গে চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় শোলার তৈরি পাখি বিক্রি হত। বাঁশের সরু চটা দিয়ে একটি টিপ্কলের কৌশল লাগানো থাকত পাখির সঙ্গে। দুটি টিপলেই একই সঙ্গে পাখির লেজ ও মাথা একবার নীচে নামত, একবার ওপরে উঠত। মাছরাঙার লেজ ও মাথা দোলানোর ভঙ্গি দেখেই হয়ত শিল্পী তার শোলার পাখিকে তা অনুকরণ করিয়েছিল—পৃ. ১৮।

চিনির তৈরি পাখিও দেখেছি, খাদ্য হিসেসে কিন্তু মূল প্রেরণাটি খেলনার। নানা রঙের, তার মধ্যে গোলপী রঙই বেশি, চিনির পাখি ছাঁচে ফেলে তৈরি করে একখন্ড গাছের ডালে সুতোয় করে তা ঝুলিয়ে (যেন পাখিরা গাছে বসে আছে) ফিরি করতে দেখেছি। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে দোল পুজোর মেলাতে এটি দেখা যায়, বিশেষ ভাবে। অন্যত্রও দেখেছি। সর্বত্রই ফিরিওলারা বিহারের লোক।

পুতুল বা খেলনা নয়, অথচ শোভা-সৌন্দর্যের খাতিরে (কিংবা 'টোটেম' বলে গৃহীত হবার ফলে) অনেক সময় নিহত বা মৃত পাখিকে Stuff করে রাখতে দেখা যায়। কলকাতার অনেক স্টেশনারী দোকানে Stuff করা পাখি কিনতে পাওয়া যায়, মূলত ঘরের শোভা বৃদ্ধির জন্যেই, টিয়েই এর মধ্যে প্রধান, অন্যান্য পাখিও আছে। এই Stuff-করাও একটি বিশিষ্ট শিল্পীমন ব্যতীত সম্ভব নয়, এও এক ধরণের কলা।

প্রাচীন রোম ও ফ্রান্সের রাজরাজড়াদের ডিনার টেবিলে রাখা হত ময়ূর, মূলত শোভার জন্যেই, Stuff করা পাখির প্রসঙ্গে তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তখন ময়ূরের মাংস খাওয়া হত। পাচক পালক ছাড়িয়ে যথারীতি ময়ূরটিকে আস্ত রেখে রান্না করত (এখন যেমন chicken Royal বা 'কবাক' রান্না করা হয়), তারপর সেটিকে পালক পরিয়ে টেবিলের মাঝখানে রেখে দিত। এতে গৃহস্থের মান ও টেবিলের শোভা দুই-ই যেত বেড়ে)।

লোক-ক্রীড়ার উদাহরণ হিসেবে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের একটি খেলার পরিচয় দিই মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর থেকে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী "কুকুর ও শকুনী খেলা" (লোকসাহিত্যে ছড়া : বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৬৯ ; পৃ. ৮৯-৮১) নামে একটি খেলার বিবরণ দিয়েছেন। এতে একজন মড়ার ভাণ করে শুয়ে থাকে, আর সবাই শকুনি সেজে, দু হাত ডানার মতো নাড়তে নাড়তে সেই মড়া খেতে আসে, এবং ছড়া বলে : আমরা যত হকুনী, / মড়া দেখি যখনি, / উড়ইয়া পড়ি তখনি,—শোঁ-শোঁ শোঁ। দলের অপর একজন তখন কুকুর সেজে সেই শকুনিদের তাড়াতে আসে। শকুনির দল তখন এই ছড়া বলে পালিয়ে যায় : আমরা যত হকুনি, / কুত্তা দেখি যখনি, / উড়ুইয়া পালাই তখনি,—শোঁ-শোঁ-শোঁ।

প্রায় এই একই খেলার একটি বিবরণ আমি শ্রীললিত কুমার বর্মন (সাকোয়াডাঙ্গা-পাড়া, বোদা থানা, দিনাজপুর)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। এখানেও একজন মড়া সেজে শুয়ে পড়ে। অন্যান্য বালকেরা শকুন সেজে, সেই মড়াকে জিজ্ঞেস করে :

'মসী গে মসী, তুই কি হুয়া মইস্‌সিদ্‌ গে মইস্‌সিদ্‌' (মাসী গো মাসী, তুই কি হয়ে মরেছিস)? একজন তখন কাক সেজে, ঠিক কাকেরই মতো সুর করে বলে : 'বাওঘাও গে, বাওঘাও' (আমার পচা ঘা' হয়েছিল)। অপর একজন, তখন 'কালাকুত্তা' হয়ে কুকুরের ভঙ্গি অনুকরণ করে বলে : 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই জানিস ! ভুক্‌, ভুক্‌, ভুক্‌ !'

এই খেলার মধ্যে কাক-শকুনের স্বভাব-চরিত্র সুন্দরভাবে উদাহৃত হয়েছে।

পরিশেষে সাঁতারের কথা উল্লেখ করা যায়। সাঁতার মানুষ পশু-পাখির কাছ থেকেই শিখেছে। পাখির আকাশে ওড়াকে অনেকেই কাব্য করে বলে থাকেন— "বায়ু সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া।" পাখির ওড়া আর মানুষের পক্ষ-সদৃশ দুই হাত নাড়িয়ে জলে ভাসা একই ব্যাপার। ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সাঁওতালী ভাষায় ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় 'সাঁতার' শব্দের প্রতিশব্দটি বিচার করলে। এই দুই ভাষায় 'সাঁতারের' প্রতিশব্দ হলো : 'পর' বা 'পহর', শব্দটির মূল ফারসী। মহাপ্রাণতার ফলে প্রান্ত উত্তরবঙ্গে এটি 'পহর' রূপে উচ্চারিত হয়। এই শব্দের মধ্যে পাখির ডানা এবং মানুষের সাঁতার দেওয়া এক হয়ে গেছে।

সাঁতারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হলো 'ডাইভ' দেওয়া। জলের ভেতর ভাসমান মাছকে মাছরাঙা প্রভৃতি মৎস্যাশী পাখিরা যে ভাবে 'ডাইভ দিয়ে তুলে নিয়ে আসে, অথবা চিল যেভাবে ছোঁ মারে,—মানুষের দৃষ্টি সে দিকে আদিকাল থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল। এইজন্যে 'ডাইভ' দেবার মধ্যে পক্ষি ভঙ্গিমা এসে গেছে ; এমন কি, এই নামটির পাখির জগৎ থেকেই গৃহীত হয়েছে। যেমন, উড়ন্ত পাখির মতো 'ডাইভ' দেওয়া ; ময়ূরের মতো দেহকে বাঁকিয়ে 'ডাইভ' দেওয়া।

সাঁতার শিক্ষার্থী যখন প্রথম সাঁতার দিতে চায় তখন তাকে বায়ুপূর্ণ এক রকমের পাখা ব্যবহার করতে হয়, তাকে বলে 'water wings'। এই 'wings'-এর মধ্যেই কি পাখির আভাস নেই ?

·১৪·

চারুকলার মধ্যে চিত্রকলার সঙ্গেই পাখির যোগ সর্বপ্রাচীন এবং পরিমাণেও তা সর্বাধিক ; প্রকৃতিতেও বৈচিত্র্য ও জটিলতাময়। আদিম কাল থেকেই চিত্রকলার প্রথম ও প্রধান উপকরণ রূপে পাখি স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। এর পেছনে কারণ হিসেবে আছে, মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনবোধ এবং তন্ত্র-মন্ত্র-যাদু-ইন্দ্রজালে নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস।

অর্থাৎ আদিম চিত্রকলা এবং বর্তমানের লোকচিত্র কলা যতখানি উদ্দেশ্যপ্রধান ও প্রয়োজনভিত্তিক ততখানি বা আদৌ নিছক, কলানুশাসন নয়। আদিম চিত্র ও

লোকচিত্র হয় 'functional'। এখানেই আধুনিক ও মার্জিত চিত্রকলার সঙ্গে ওই পদ্ধতির মূল বিচ্ছেদ। আদিম মানুষের ধর্ম-সংস্কার ইত্যাদির প্রয়োজনে চিত্ররচনার মূল প্রেরণা আসতেই যে সব গুহাচিত্র (Cave art) এযাবৎ কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতেও এই Magico Religious প্রবণতাটিই প্রখর হয়ে উঠেছে। যে সব পাখির ডিম-মাংস-হাড়-পালক তাদের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, স্বাভাবিক কারণেই সে সব পাখিই ছিল তাদের শিকারের মূল লক্ষ্য; এবং সেই কারণেই তাদের অঙ্কিত চিত্রাবলীতে ওই সব পশু-পাখিই প্রধানতম উপকরণরূপে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটি ম্যাজিকবোধ কাজ করেছে। পাখি শিকারের সাফল্য এবং পাখি প্রাপ্তির মানসিক রূপ দিতে গিয়েই বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পরিযায়ী পাখির আসা-যাওয়া, ওড়া-বসা, প্রেম-সঙ্গমের চিত্র বারংবার আঁকা হয়েছে। যেন চিত্রে যা প্রদর্শিত যা অঙ্কিত হল, বাস্তবেও তা ঘটবে।

এই বোধের ফলেই পৃথিবীর বহু আদিম গুহাচিত্রে পাখির প্রেম ও সঙ্গমের দৃশ্য আঁকা হয়েছে। এই সঙ্গমের ফলেই পাখির বংশবৃদ্ধি ঘটুক এবং ফলে তার জীবনের প্রয়োজন মেটাক, এই বাসনাই এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরই ফলে এই সব দৃশ্য ও ঘটনা অঙ্কিত হয়েছে: নদীতীরে এক ঝাঁক পাখি এসে বসেছে। কিংবা কোনো পাখি তীরবিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হয়েছে। অথবা, এক ঝাঁক পাখি ব্যাধের পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে।

যে সব পাখি মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে সহায়ক হয়েছে, কালে-কালে তারাই মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিশ্বাস আকর্ষণ করেছে। এইভাবে পাখি 'টোটেম', দেবতা, আত্মার প্রতীক প্রভৃতিতে উন্নীত হয়েছে, শিল্পে ও চিত্রকলাতেও তার ছাপ ও ছায়া পড়েছে!

শিল্পে ও চিত্রে পাখির রূপকল্পনা সভ্যতার অগ্রগতি ও মানুষের মানস-বিবর্তনের ফলে বিবর্তিত হয়েছে। প্রথম স্তরে পাখির যথাযথ Zoo morphic রূপ, দ্বিতীয় স্তরে অর্ধমানব-অর্ধপক্ষী অর্থাৎ Therio morphic রূপ এবং তৃতীয় স্তরে পাখির নরাকৃতি অর্থাৎ Anthropo-morphic রূপ—এই তিন রূপ মূর্তির মধ্যে শিল্পে ও চিত্রে পাখির রূপ বিবর্তিত হয়েছে পর-পর। শিল্পে পাখির Therio-morphic রূপের কল্পনার পেছনে ছিল পাখি ও মানুষের অভেদ ও একাত্মতাবোধ। এরই ফলে মানুষের দেহ, আত্মা প্রভৃতির রূপ পাখির প্রতিকৃতি অনুযায়ীই কল্পিত হয়েছে। স্পেনের প্রস্তরযুগের চিত্রে দেখা যায়, মানুষের মূর্তিতে পাখি অথবা পাখির মূর্তিতে মানুষ। মানুষের মাথায় গোঁজা রয়েছে পাখির পালক, অর্থাৎ মানুষ পাখি হতে চায় কিংবা পাখিকে মানুষ করে নিতে চায়। উভয়ের এই অভেদের ফলেই কোনো অঞ্চলের মানুষরা (যেমন Vogul রা) কফিনের ওপর পাখির ছবি এঁকে দিত, অর্থাৎ মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তি পাখিতে পরিণত হত বলে বিশ্বাস ছিল।

নারীর সঙ্গে পাখির এক বিচিত্র সাদৃশ্য আদিমকাল থেকেই লক্ষ করে আসা হয়েছে। প্রত্ন প্রস্তরযুগীয় গুহাচিত্রে দেখা যায়, নারীর জীবনে প্রথম রজোদর্শনের

কালে, যখন তাদের গোষ্ঠীর বাইরে গিয়ে গুহায় কাটাতে হতো দিন কয়েক, তখন তাদের সেই সময় দৈহিক ও মানসিক অনুভূতিগুলো পাখির রূপ ধরে ভিত্তিগাত্রের ছবিতে ধরা পড়েছে। এই জন্যেই নারীকে 'পক্ষিরূপা' বলে কল্পনা করা হয়েছে। নারীর মধ্যে পাখির মতো দুই বিপরীতভাবকে দেখা যায়: পাখির নরম পালকের সঙ্গে আছে তার তীক্ষ্ণ ও ধারালো নখ ও চঞ্চু; আর কণ্ঠে সুর মাধুর্যের সংগে আছে তীব্র চীৎকার; সঙ্গীর প্রতি প্রেমের সংগে আছে নিষ্ঠুরতা ও মানসিক অদৃঢ়তা। —এ সব ধর্মই নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে নারীকে 'পক্ষিরূপা' করে চিত্রিত করা হয়েছে। অনেক দেবী, গ্রীক পুরাণের 'Harpy' ও 'Siren'-দের রূপ কল্পনায় এই পক্ষিরূপ লক্ষ করা যায়। পাখির ঠোঁট, পা, পাখা বা নখ মানুষের দেহে সংযুক্ত করে ছবি আঁকবার বা অন্য কোনো শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করবার প্রবণতা প্রত্নপ্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালেও দেখা যায়। আবার কখনো দেখা যায়, মানুষকে যথার্থ, প্রকৃত ও অবিকৃত রেখেই তার হাতে, কাঁধে বা মাথায় একটি পাখি এঁকে দেওয়া হয়েছে; এও পাখি ও মানুষকে অভিন্ন করবার চেষ্টা। নারীর মতো পুরুষকেও পক্ষিরূপ দিয়ে নানা শিল্পকর্মে প্রকাশ করবার চেষ্টা প্রাক্‌খ্রীষ্ট যুগেও দেখা গেছে বহু।

মানুষ ছাড়া চন্দ্র-সূর্য ও নানা গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গেও পাখিকে জড়িয়ে নেবার ফলে চিত্রেও তার ছাপ পড়েছিল। প্রাচীন ঈজিপ্ট ও মেসোপোটেমিয়ার ছবিতে প্রায়ই দেখা যেত একটি গাছের মগডালে অথবা কোনো দণ্ড বা স্তম্ভের শীর্ষে একটি পাখি বসে রয়েছে। যেন আকাশের চন্দ্র-সূর্যকে এই উচ্চতার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। কখনো বা বজ্রকেও নির্দেশ করেছে এই দণ্ডশীর্ষস্থ পাখি।

হাঁস এবং হাঁসজাতীয় পাখিরাই (The Anserine birds) প্রথমে মানুষের গৃহ-পালিত পাখিরূপে পরিগণিত হয়েছিল বলেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের মৃত্তিকা-পাত্রে হাঁসের মূর্তিই প্রথম মিলেছে। হাঁসের পরেই শিল্পকলায় স্থান পেয়েছে এই জাতীয় পাখিদেরই সগোত্র দীর্ঘ গ্রীব পাখিরা,—রাজহাঁস, সারস, Flamingo, ইত্যাদি। চিত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। উর্বরাশক্তি, মাতৃশক্তি ও সৌরশক্তির প্রতীক রূপে হাঁস গৃহপালিত পাখি হবার পূর্ব থেকেই মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছিল।

চিত্রে এবং শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগে কালক্রমে এইসব পাখিদের সঙ্গে-যুক্ত হতে লাগল অন্যান্য প্রাণী, যেমন—মাছ, সাপ বা চতুষ্পদ প্রাণী। একেই বলা হয় 'সংমিশ্রণ', পাখি তখন আর একটি প্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বিশিষ্টভাবের দ্যোতনা করে। পাখির সঙ্গে সাপের সংযোগ অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর সব দেশের শিল্পে-সাহিত্যে দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্যেও এর সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। সাপ থেকেই পাখির উদ্ভব—জীব বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্ত এখানে নতুনতর সমর্থন লাভ করেছে। পাখির সঙ্গে অন্যান্য প্রাণী ও পদার্থ সংমিশ্রিত হয়ে কিভাবে নানা ভাবনার দ্যোতনা করেছে, পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

যে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসপ্রবণতায় পাখিকে মানুষ প্রত্ন-প্রস্তরযুগে চিত্রকলার বিষয়-বস্তু করে নিয়েছিল, কালে কালে সভ্যতার অগ্রগতির ফলে, সেই যাদুময় দিকটি ক্রমেই অপ্রধান হয়ে গিয়ে তার মধ্যে শিল্পভাব ও অলংকরণের দিকটি পরিস্ফুট হতে থাকল। এখানেই প্রত্নপ্রস্তর যুগের চিত্রকলার সঙ্গে স্প্যানীশ আর্টের বড়ো তফাত। প্রত্নপ্রস্তর যুগের আর্টে দেখা যায়, নগ্ন শিকারী এক ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস নিয়ে পাখির ছবি আঁকছে; কিন্তু স্পেনীয় ছবিতে দেখা যাবে, নগ্ন মানুষের সভ্যতাবোধ এসে পড়ায় সে তখন পরেছে পাখির পালক; পাখির পালক তখন আর কেবল তার দেহের লজ্জা নিবারণও উষ্ণতাবিধানের জন্যে নয়, সজ্জা ও অলংকরণের জন্যেও বটে। এই মানুষেব নাচেব ছন্দেও তখন পাখিব নাচন সঞ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ যে পাখি একদিন ছিল নিছক বেঁচে থাকবার উপকরণ, যার ডিম মাংস-পালক-হাড় মানুষকে দিত খাদ্য ও তাপ, তাই পরিশেষে খাঁটি শিল্প, অলংকরণ এবং প্রতীকে পরিণত হয়ে তার জীবনকে এক সূক্ষ্ম ও উন্নত মহিমায় ভরিয়ে ফেলল।

·১৫

ভারতবর্ষের বেত্রবতী ও চম্বল উপত্যকায়, ছত্তিশগড়ের সিংহাশপুরে, মীর্জাপুরে প্রাচীন গুহা চিত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। কালের দিক থেকে এগুলো খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী। ভারতের অধিবাসী ও আদিবাসীরাই এইসব চিত্রের শিল্পী। এগুলোর অংকনের পেছনেও পূর্বোক্ত কারণ ও উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল।

হাঁস ও হাঁসজাতীয় পাখিরাই চিত্রে ও শিল্পে প্রথম উপকরণরূপে গৃহীত হয়, একথা আগেই বলেছি। ভারতীয় শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। পঞ্চম শতাব্দীতে অংকিত বলে অনুমিত অজন্তার 'ফ্রেস্কো' ছবিতেও হাঁসকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় চিত্রে ও অন্যান্য শিল্পে হাঁসের সঙ্গে সমপরিমাণে, কোথাও বা সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে ময়ূর, এবং ময়ূরের পরই বক-সারস। অজন্তার দ্বিতীয় গুহার দক্ষিণদিকের দেওয়ালে আঁকা আছে ময়ূরের দল, নীচে রাজা ও রাণী বসে আছেন। বক-সারস দীর্ঘগ্রীব পাখি, এইদিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিত্র ও শিল্পে এখানে তফাৎ নেই। তফাৎ কেবল ময়ূরের অস্তিত্বে ও পরিমাণের গুরুত্বে। পারাবত ও অন্যান্য পাখির ছবিও অবশ্য এখানে মিলেছে।

ভারতীয় চিত্রে ও শিল্পেও পাখির সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীকে সংমিশ্রিত হতে দেখা গেছে। মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার 'সীল' গুলিতে এক দিকে যেমন একক ভাবে হাঁস, মুরগী, ময়ূর দেখা গেছে, তেমনি অপর প্রাণীর সঙ্গেও পাখি সংমিশ্রিত হয়েছে। যেমন একটি রথকে টানতে দেখা যায় এক প্রাণীকে: তার দেহের নিম্ন অংশ ও লেজটি পাখির মতো, কিন্তু মাথা ও শিং ভেড়ার। অজন্তার কোনো চিত্রে দেখা যায়, আকাশে বিচরণ

শীল বড়ো দাঁতওয়ালা রাক্ষস-রাক্ষসী, গাধাদের, কিন্তু তাদের নিম্নাঙ্গ পাখির মতো। অজন্তার সপ্তদশ গুহায় দুটি গরুড় মূর্তি আছে। একটি হল পায়রা ও কুক্কুটের মিলিত রূপ, মাথায় ঝুঁটি, হাত দুটি মানুষের মতো। এই সংমিশ্রণ চিত্রেও পরবর্তী কালে সঞ্চারিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় চিত্রেও ক্রমে ক্রমে একটি পার্থক্য এসে পড়ল : পার্থক্য অভিজাত চিত্রের সঙ্গে লোক চিত্রের। অভিজাত চিত্রে একটি সচেতনতা, 'যথাযথতা', কয়েকটি ধরা-বাঁধা নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণের প্রবণতা দেখা যায়। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার আদি গ্রন্থ মহামুনি নারায়ণ কর্তৃক সংকলিত, তাঁর গ্রন্থ 'চিত্র-সূত্র' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের নির্দেশাবলী লক্ষ করলেই অভিজাত চিত্ররীতির বিশেষত্বটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেমন, পুরুষ লোকের মূর্তি অঙ্কনের ক্ষেত্রে তা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে,— হংস, ভদ্র, মালব্য, রুচক ও শশক। এই পাঁচ ধরণের পুরুষ মূর্তির মধ্যে 'হংস পুরুষ' আঁকতে গেলে সেই ব্যক্তির দৈর্ঘ্য চিত্রে হবে তারই একশ' আট আঙুল পরিমাণ। দেবতাদের চিত্রেও তাই।

এ বিষয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথও "ভারত শিল্পে মূর্তি" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪) বইতে সুন্দর আলোচনা করেছেন। ভারতীয় চিত্রশাস্ত্রকাররা চিত্রের মধ্যে বাস্তবতা, যথাযথতা ও স্বাভাবিকতাকেই মূল্য দিয়েছেন বলে প্রাকৃতিক জগৎ থেকে 'মডেল' বা আদর্শ নিয়ে তারই হুবহু অনুসরণে ছবি আঁকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ চোখ খঞ্জনের মতো বা নাসিকা শুকচঞ্চু তুল্য, রূপবর্ণনার এই আলঙ্কারিক দিককে আক্ষরিক ভাবে চিত্রে সত্য হয়ে উঠতে হয়। তাই এখানে ছবির-পাখি প্রাকৃতিক জগতের পাখির নিখুঁত অনুকরণ, : দেবতা ও মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদর্শ বা মূলের (অর্থাৎ পাখির) অনুরূপ।

কেন এটি ঘটেছে, অবনীন্দ্রনাথ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন : সকল মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক রকমের নয়, কিন্তু সব মানবেতর প্রাণী বা গাছপালার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একই রকমের। এ জন্যেই ভারতীয় শিল্পাচার্যরা কোনো মূর্তির ডৌল নির্দেশ করতে গিয়ে আদর্শ হিসেবে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা না বলে কোনো ফুল বা প্রাণীর অনুরূপ বলেছেন। যেমন 'মুখম্ বর্তুলাকারম্ কুক্কুটাণ্ডাকৃতিঃ', মুখের আকার হবে কুক্কুট ডিম্বের ন্যায় গোল। 'খঞ্জন নয়ন' বলতে অবনীন্দ্রনাথ তাই খঞ্জনের নৃত্যচাঞ্চল্যময় চোখকে বোঝান নি ; তিনি একটি খঞ্জনপাখি এবং মানুষের চোখকে পাশাপাশি এঁকে এ দুয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য ও যথাযথভাবে পরিস্ফুট করেছেন। 'শুকচঞ্চুনাসা' বলতে ঠিক শুকের ঠোঁটের আকারে গড়া নাসাকেই বুঝিয়েছেন।

এ যেমন পাখির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে 'মডেল' রেখে মানুষের মূর্তি অঙ্কনের বেলায়, ঠিক তেমনি পাখির নিজের মূর্তি অঙ্কনের বেলাতেও এই রীতির অনুসরণ দেখা গেছে। লাহোরের মেয়ো আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ সমরেন্দ্র নাথ গুপ্ত "পশুপাখীর চিত্র" (প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২৩, পৃ. ১৭-১৮) নামে একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন। প্রাচীনভারতীয় শিল্পীরা পশুপাখিকে তাদের নিজস্ব আরণ্য

প্রতিবেশে স্থাপিত করে, মুক্ত ও স্বাধীন ভঙ্গিতে, বাস্তব ও প্রকৃত মূর্তিতে এঁকেছেন। এতে পশু-পাখিদের প্রকৃতির পরিচয়ও সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে। এই অনুকরণের বাহাদুরী সর্বাধিক দেখা যায়, মুঘলযুগের শিল্পীদের মধ্যে। হিন্দু চিত্রশিল্পের মধ্যে কাংড়ার শিল্প উল্লেখযোগ্য ঃ"কাংড়ার এই সকল চিত্রের বিশেষত্ব এই যে, এগুলি অতি সহজভাবে আঁকা। মোগল শিল্পের সূক্ষ্মতা এর কোনোটায় নাই। কিন্তু সকল অংশই অতি স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে দেখানো হয়েছে।"

কিন্তু ভারতীয় লোকচিত্র সম্পর্কে এই সব উক্তি খাটে না। লোকচিত্র অংকন মূলত উদ্দেশ্য প্রধান ও প্রয়োজন ভিত্তিক, এই জন্য তা যাদুধর্মময় : দ্বিতীয়ত, তার অংকন-পদ্ধতি অনুকরণাত্মক নয়, সংকেত ও প্রতীক ধর্মী। লোকচিত্র মাত্রই স্বাভাবিক বা আদর্শ বস্তুর ফটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি নয়। তা মূল বা উদ্দিষ্ট বস্তুর একটি আভাস দেয় মাত্র, এবং তাও ট্র্যাডিশনাল ভঙ্গিতে, শিল্পীর স্ব-উদ্ভাবিত কোনো পদ্ধতিতে নয়। লোকচিত্র মূলত হয় টু-ডাইমেনসান্যাল,তাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকলেও গভীরতা থাকে না। বহুশ তা এক টানে আঁকা হয়, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে থাকে অনেক ফাঁক, চিত্রদর্শনকারী আপন ঐতিহ্যানুসারী রসবোধ দিয়ে তা পূরণ করে নেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লোকচিত্রের পাখির চিত্র বিচার্য।

হুবহু পাখি নয়, অথচ তা পাখির রূপাভাসযুক্ত, এমন পাখির ছবিই যেন অধিকতর যাদুশক্তিসম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়। অথবা, বিপরীত ভাবে বলা যায়' এমন ভাবে পাখি আঁকাটাই লোকচিত্রের বিশেষত্ব। এবারে উদাহরণ দিই।

প্রভূত পরিমাণে প্রজনন শক্তির জন্যে, উর্বরতার প্রতীক রূপে, জীবন প্রতীক ও গোত্রের প্রতীক রূপে, ময়ূর Door sign হিসেবে ঘরের দরজার পাশে, ভেতরে-বাইরের দেওয়ালে, দেহের বিভিন্ন অংশে উল্কিরূপে অংকিত হয়ে থাকে। উল্কি চিত্র ভারতের লোক শিল্পের একটি বড়ো দিক। Capt. C. E. Luard তাঁর "Tatooing in central India" (The Indian Antiquary : Sept-Oct-Nov-Dec-1904) প্রবন্ধে মধ্যভারতের আদিবাসীদের উল্কিচিত্র সম্বন্ধে সদৃষ্টান্ত আলোচনা করেছেন। প্রধানত ঐতিহ্যানুসারী ভঙ্গিতে একটানে এগুলি আঁকা, এবং ময়ূরের অবাস্তব এবং অযথার্থ রূপটিই গোষ্ঠীর কাছে স্বীকৃত, সেটাই তাদের কাছে একটি প্রতীকসত্যে পরিণত হয়েছে। জোড়া ময়ূর বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বত্রই এই জোড়া ময়ূর নর-নারী বা প্রেমিক-প্রেমিকা নয় ; বহু ক্ষেত্রেই তা দুই ভাই, দুই বোন, দুই বন্ধু ইত্যাদি,—এ সবের পেছনে আছে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সৃষ্টি পুরাণের কাহিনী, সেই কাহিনীর চরিত্রও ময়ূর রূপে অঙ্কিত হতে পারে বলে আমার অনুমান। প্রায়শই জোড়া ময়ূরকে মুখোমুখি স্থাপিত দেখি—যেমন বুকে, পেটে, পিঠে। কিন্তু দুই স্তনে, দুই বাহুতে, দুই উরুতে যখন তা অংকিত হয়েছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই দুই দিক মিলিয়ে একটি পূর্ণতাকে প্রতিফলিত করবার প্রয়াস দেখা যায়। দেহের এক একটি অংশে অংকিত ময়ূরের 'ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা'র তারতম্য আছে ; ঠিক যেমন একক ময়ূর ও জোড়া ময়ূরের ক্ষমতার পার্থক্য লক্ষ করা হয়েছে। ব্রহ্মদেশে

এ বিষয়ে একই বিশ্বাস দেখা যায়। মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডের আদিবাসীদের উল্কিরূপেও থাকে এক জোড়া ময়ূর বাঁ হাতের সম্মুখ দিকে একটি. পেছনের দিকে একটি)। ভূপালে দেখা যায় বক্ষোদেশে ময়ূরের চিত্র। মকশুদা নগর স্টেটের অধিবাসীরাও জোড়া ময়ূর এঁকে দেয় বক্ষে। মালব অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা বক্ষে বা স্তনে ; সেখানকারই আর একটি অঞ্চলে বক্ষে, কাঁধে ও কব্জিতে ময়ূরের ছবি আঁকে উল্কি হিসেবে। বি. এ. গুপ্তে তাঁর একটি প্রবন্ধে (The Indian Antiquary : July, 1902. p. 297) জানাচ্ছেন, পাঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা ময়ূরকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে বাম বাহুতে উল্কিরূপে ধারণ করে।

উল্কি ছাড়াও মুদ্রা-চিত্র রূপেও ময়ূরকে মেলে। ময়ূরের সঙ্গে রাজৈশ্বর্য ও রাজ-প্রতিবেশ যুক্ত থাকার ফলে এটি ঘটেছে। গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের (খ্রীঃ ৪১৩—৪৫৫) সুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে দেখা যায়ঃ একদিকে তিনি ময়ূরকে আঙুর খাওয়াচ্ছেন ; আর অন্যদিকে আছে—ময়ূরবাহন কার্তিকের একটি প্রতিকৃতি। প্রথম কুমারগুপ্তেরই একটি রৌপ্যমুদ্রার এক পিঠে দেখা যায়—একটি বিস্তৃতপক্ষ ময়ূরের ছাপ। স্কন্দগুপ্ত এবং বুধগুপ্তের মুদ্রাতেও ময়ূরের প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। মৌখরীরাজ ঈশান বর্মা এবং থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন সপ্তম শতাব্দীতে তাঁদের মুদ্রায় ময়ূরের প্রতিকৃতি গ্রহণ করেন। হূণরাজ তোরমানের মুদ্রাতেও কলাপসমন্বিত ময়ূর গৃহীত হয়। কলাপের এই পূর্ণতা রাজাদের সর্বপ্রকার পরিপূর্ণতার প্রতীকরূপে বিশ্বাস করা হত,—সুতরাং চিত্র-পদ্ধতিতেও তার ছাপ পড়েছে। বর্মার রাজা মিনডন (Mindon) যে তাম্রমুদ্রার চলন করেন, তারও একপিঠে এই কলাপবিস্তারী ময়ূরকে দেখা যায়। সেখানকার সীসার মুদ্রাতেও ময়ূর মেলে।

ভারতীয় চিত্রকলায় পাখি Motif রূপে এতোই প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, মুসলমান চিত্রকরগণও পাখিকে নিয়ে ছবি লিখেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মনসুর নামে এক চিত্রকরের নাম করা যায়। পাখিকে বিষয় করেই তিনি বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলেন ॥

...১৬...

চিত্রের প্রসঙ্গে আলপনা চিত্রের কথাও ওঠে। বাঙলার ব্রতের সঙ্গে আলপনা

চিত্রের সংযোগ অচ্ছেদ্য। বাঙলা-বিহার সীমান্তের আদিবাসীরা শুকনো চালের গুঁড়ো দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে আলপনা দেয় (এরা আলপনাকে বলে 'ইত্তালন')। দক্ষিণ ভারতে আবার বিচিত্র পদ্ধতিতে আলপনা দেওয়া হয়ঃ একটি বাঁশের ফাঁপা নলের গায়ে নানা আকৃতিতে ফুটো করে নেওয়া হয়। এরপর ওই বাঁশের কিংবা নল খাগড়ার) নলটির ভেতর শুকনো চালের গুঁড়ো পুরে দিয়ে, রোলারের মতো মেঝেতে গড়িয়ে দিলে স্বতই একটি ডিজাইন ফুটে ওঠে। এ ছাড়া সাবেক পদ্ধতির আলপনা সেখানেও আছে।

অন্যান্য বিচিত্র ধরণের আলপনা-চিত্রের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল বাঙলার আলপনা চিত্রের কথা বলি। পৃথিবীর বহু দেশেই আলপনার প্রচলন ছিল বা আছে। আদিম মানুষের কাছে আলপনা Sympathetic magic-এর অন্তর্গত Homoeopathic magic রূপে পরিগণিত ছিল। যাদু ও ইন্দ্রজালই তখন এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আলপনার মধ্যে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে থাকে কতকগুলি 'Media' বা মাধ্যম; সেই 'মাধ্যম'গুলিকে অভিষ্টসিদ্ধির 'উপায়' বা 'পদ্ধতি' বলতে পারি। বিভিন্ন 'উপায়ে'র মধ্যে পশু-পাখির চিত্র একটি বিশেষ 'উপায়'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাঙলার ব্রত' বইটিতে (পৃ. ৬৭) ব্রতের আলপনার বিষয়গুলিকে আটভাগে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে পঞ্চম বিষয় হল, পশু-পাখি, মাছ ও নানা জন্তুর চিত্র। শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আলিম্পন' (শ্রাবণ, ১৩৬৮) বইটিতে আলপনার অংকনরীতির বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন (পৃ. ২৩), আলপনার পশু-পাখি কোনোটাই বাস্তবের ফটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি নয়; তার অনেকটাই সাংকেতিক। "আলপনা যে আঁকে তাকে মনে রাখতে হয় যে তাঁর আঁকা ছবি দেখে আসল জিনিসটা মনে আসে কিনা। আলপনার ছবি টু-ডাইমেনশন্যাল। অর্থাৎ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, গভীরতা নেই।" লোক-চিত্র মাত্রই তাই। তার অংকনরীতির মধ্যে একটি সাংকেতিকতার ভাব থাকেই। অবশ্য সেই সাংকেতিকতাকে ট্র্যাডিশনাল হতে হবে। হুবহু পাখি নয়, অথচ, সংশ্লিষ্ট লোকসমাজ তাকেই পাখি বলে মেনে নেয়। এই ভাবে আঁকা পাখিই একদিকে যাদুগুণ-সম্পন্ন, অপর দিকে লোকচিত্রের রীতিসিদ্ধ।

অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ, অন্তত এই ক্ষেত্রে, বিষয়কেন্দ্রিক এবং সাহিত্যিক; শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ আবার চিত্রাংকন রীতি-ঘটিত; কিন্তু এই দু'টি দৃষ্টিকোণ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি দৃষ্টিতে আলপনার পাখি-চিত্রকে বিচার করা যায়ঃ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ। এই

দৃষ্টিতে যারা আলপনাচিত্রের বিচার করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য : অজিত মুখোপাধ্যায় (Folk Art of Bengal : University of Calcutta, 1946), এবং সুধাংশুকুমার রায় (The Ritual Art of the Bratas of Bengal : January, 1961)।

আমাদের মতে, ওপরের দু'টি ধারার মিশ্রিত দিককে আশ্রয় করেই আলপনার পাখিকে বিচার করতে হবে :

১. পাখির অলৌকিক ও ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় বিশ্বাস ; 'হোমিওপ্যাথিক' ম্যাজিকের 'উপায় ও পদ্ধতি' রূপে পাখি ;

২. পাখিকে Totem এবং Ancestor মনে করে, তার কাছে বর প্রার্থনা ;

৩. লোকচিত্রের বিশিষ্ট অংকনরীতির অনুসরণে পাখির চিত্রকে বিচার করা ;

৪. ব্রতকথা ও ছড়ার সঙ্গে পাখির সংযোগধারাটি লক্ষ করা।

বাঙলার কয়েকটি মাত্র ব্রতে পাখির মূর্তি আঁকা বা পিটুলি দিয়ে গড়া হয়। যেমন, 'ভদ্রাতি' বা 'ভাদুলি' ব্রতে (দ্রঃ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংকলিত 'ঠানদিদির থলে')। গোটা ভাদ্রমাস জুড়ে এই ব্রত করা হয়। পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, শ্বশুর— কেউ যদি বাণিজ্যে বা তীর্থভ্রমণে যায়, তবে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় নারী কর্তৃক এ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। ব্রতের আলপনায় থাকে : সাত সমুদ্র, তের নদী, নদীর দুই কূলে বন, বাঘ-মোষ-কাক-বক, পাহাড় এবং সেই পাহাড়ের মাথায় বাবুই পাখির বাসা-সহ তালগাছ। অংকিত প্রত্যেক পশু-পাখির কাছে প্রিয়জনের মঙ্গল সংবাদ যাচ্ঞা করা হয়। সকলের শেষে বলা হয়, 'নৌকা ধরতে ঘাটে চল'। হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিকের একটি সুন্দর নিদর্শন এটি। যেন এই ব্রতানুষ্ঠানের সুফল রূপেই, সত্যিসত্যিই, প্রিয়জনের নৌকো নিরাপদে ঘাটে এসে পেঁছল ; অথবা, এভাবে নৌকো 'ধরলেই' বুঝি সেই অভীষ্ট ব্যাপারটি অগোণে ঘটে যাবে। এর পেছনে পাখিকে তুষ্ট করবার ফলে দূর বিদেশের সংবাদ পাওয়া এবং পাখিকে সেই ক্ষমতার অধিকারীরূপে কল্পনা ও বিশ্বাসের দিকটি ছড়িয়ে আছে।

কার্তিকমাসের 'যমপুকুর ব্রতে' পুকুর কেটে সেই পুকুরের পশ্চিম পাড়ে কাক-বক-চিল-কুমীর-কচ্ছপ-হাঙর প্রভৃতির মূর্তি গড়ে বসাতে হয়, পুকুরে জল ঢালতে হয়। জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়া জেলার 'জিতাষ্টমী'র ব্রতেও পুকুর কেটে জল ঢালতে এবং চিল গড়ে দিতে হয়। 'গারুব্রতে'ও কাক-চিল গড়ে দিতে হয়। এই সব তথ্য থেকে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যায় :

১. এই 'পুকুর'গুলি পৃথিবীর জলভাগের প্রতীক; এর সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের (Cosmology) যোগ আছে; জলের সঙ্গে এসেছে জলজাত প্রাণী। পৃথিবীর সব দেশের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টিপুরাণে জলজ প্রাণীর ভূমিকা সর্বাধিক। মাছের সঙ্গে Composition রূপে এসেছে পাখি। পাখিও সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টিপুরাণের এক বিশিষ্ট চরিত্র। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা করেছি।

২. পাখির বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা আছে; যে জল সৃষ্টিকর্ম ও কৃষিকার্যের মূল উপকরণ, পাখি সেই জলের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত।

৩. দেখা যাচ্ছে, পুকুর বা জলাশয় থাকলেই কাক-বক-চিল তিনটি পাখির একত্র উল্লেখ থাকছে। এই তিনটির একক ভাবে প্রত্যেকটির এবং সম্মিলিত ভাবে সকলের একটি বিশেষ গুরুত্ব এখানে স্বীকৃত। এদের যেন এখানে গোত্রপ্রতীক (Totem) বা পূর্বপুরুষ (Ancestor) রূপে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

বাঙালীর 'টোটেম' হিসেবে নদী, পাহাড়, গাছ, বন—সবই মেলে। হাঁস, বেড়াল, সাপ যে 'টোটেম' ছিল, তা এখন পর্যন্ত ব্রতকথার মধ্যে সঞ্জীবিত আছে। যেমন, 'শুবচনী'র ব্রতের হাঁস। এই ব্রতে এক ঝাঁক হাঁস ও পাতিহাঁস এঁকে দিতে হয়। ব্রত-কথাতে অবশ্য ১০৮টি হাঁসের কথা আছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাঙলার ব্রত' বইটিতে এই এক ঝাঁক হাঁসের যে আলপনা চিত্র দিয়েছেন, তা থেকে এর অঙ্কনরীতির বিশেষত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই ব্রতের 'কথা' থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, হাঁস এখানে 'টোটেম' রূপে স্বীকৃত হয়েছে। 'টোটেম' রূপে চিহ্নিত পশু-পাখি হত্যা বা ভক্ষণ করা করা বিষয়ে 'Taboo' থাকে। শুবচনীর ব্রতকথায় সেই সত্যই পরিস্ফুট হয়েছে। মাংসের লোভে এক বিধবার সন্তান রাজার একটি হাঁস হত্যা করে কি বিপদে পড়েছিল, ব্রতকথায় তাই কথিত হয়েছে।

সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় ৫২ রকমের পুতুল বা মূর্তি আঁকতে হয়। এর মধ্যে আছে, নির্বিশেষ ও সবিশেষ পাখি। সবিশেষ পাখির মধ্যে আছে, ময়না ও সুয়া' পাখি। ময়নাকে উদ্দেশ করে বলা হয়: 'সতীন যেন হয় না'। 'সুয়া'কে উদ্দেশ করে বলা হয়: 'আমি যেন হই জন্ম সুখী'। এর থেকে অনুমান করি:

১. বহু রূপকথায় দেখা যায়, মন্ত্র দিয়ে সতীন অপর সতীনকে পাখিতে পরিণত করে রাখছে। সুতরাং পাখির সঙ্গে এখানে কুহকবিদ্যাও জড়িত হয়ে পড়েছে। আবার, দুঃখিনী সধবার সতীন-জ্বালা জুড়োতেও পাখিকে সহায়ক বলে মনে করা হয়েছে।

২. 'সো-পাখি' অর্থাৎ 'সুয়া' পাখি কি সুয়োরাণীর প্রতীক? মনে রাখতে হবে, 'সুয়ো' এসেছে 'সুভগা' এবং 'দুয়ো' এসেছে 'দুর্ভগা' শব্দ থেকে।

বাঙলার ব্রতকথায়, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাঙালীকে পাখি থেকে জাত এক জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারাব্রতে যে 'হাতে-পো-কাঁখে-পো' মূর্তি আঁকা হয়, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে। এটি একটি পক্ষি-মাতার রূপ। এমন পক্ষি-মাতা লোকচিত্রে আরো আছে: 'খেমা-খেমী', 'গোদা-গুদী', বা 'হেচী-করকচী'। এই পক্ষি-মূর্তিগুলির সবই মিশ্রমূর্তির—অর্ধেক পাখির, অর্ধেক মানুষের (তুলনীয়: প্রাচীন মিশর ও চীনের বিভিন্ন দেবতাদের মিশ্রমূর্তি।

পূর্বপুরুষরূপে 'খেমাখেমী'র মিশ্রমূর্তির একটি দুর্লভ চিত্র সুধাংশু কুমার রায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে (plate xvii, fig b) দিয়েছেন।

আলপনা চিত্রের প্রসঙ্গে পিঁড়িচিত্র, সরাচিত্র, দেওয়ালচিত্র (Fresco) প্রভৃতির কথাও ওঠে। ঢাকার পটুয়ারা যে লক্ষ্মীর সরা-চিত্র এঁকে থাকে, তাতে দেখা যায়,—লক্ষ্মী পদ্ম-সরোবরে 'ময়ূরপঙখী নাও'তে চড়ে বাণিজ্যে যাচ্ছেন। এই 'ময়ূরপঙখী নাও'য়ের গলুইয়ে যে ময়ূরমূর্তি সংযুক্ত থাকে, এখানে সেটাই আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয়।

পিঁড়িচিত্র সাধারণত করা হয়, বিয়ে উপলক্ষে। এর Motif হিসেবেও পাখিকে মেলে। ভারতবর্ষের বিয়ের সঙ্গে পাখির যোগ একটি পরিচিত তথ্য, যেহেতু এখানকার কামদেবতা মদনদেব শুকবাহন। বিয়ের জন্য তৈরী করা শোলার মুকুটে ময়ূরের আভাস প্রায়ই থাকে। মিথিলায় বিয়ের বাসর ঘরকে বলে 'কোহবর'। বিবাহ উপলক্ষে এই 'কোহবরে'র দেওয়ালে স্ত্রীলোকেরা যে ছবি আঁকে, তাকে বলে 'মধুবানী' ('মধুবনী') চিত্র। ছবির Motif-এর মধ্যে থাকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে টিয়ে শুক) পাখি। আমেরিকায় আবার বিপরীত ব্যাপার, বিয়েতে পাখি সেখানে 'Taboo' হয়ে গেছে। সেখানকার বিশ্বাস: বিয়ের উপহার-দ্রব্যে পাখি বা পাখির আভাসযুক্ত কোনো ছবি এঁকে দিতে নেই; তাহলে নব-দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-শান্তিও পাখির মতোই উড়ে পালাবে!

দেওয়াল-চিত্রের কথা যখন উঠলই, তখন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করি: লখিন্দর বিয়ের বাসরে মারা গেছে, বেহুলা সেই মৃতদেহ নিয়ে কলার 'মান্দাসে' নিরুদ্দেশ যাত্রা করল। যাত্রাকালে কাঠকয়লা দিয়ে সেই বাসরের ভিত্তিগাত্রে একটি ময়ূর-মূর্তি এঁকে রেখে গেল। এই অংকিত ময়ূরটি যেন লখিন্দরের প্রাণের প্রতীক, তার life index বা life token। ছ'মাসের মধ্যে যদি এই অংকিত ময়ূরটি জীবিত প্রাণিবৎ পেখম বিস্তার করে, তবে মনে করা যেতে পারে, মৃত লখিন্দর প্রাণ পেয়ে পুনরায় ফিরে আসবে:

অঙ্গারে ময়ূর বামা বাসরে লিখিয়া।
শাশুড়ীকে বলে বামা বিনয় করিয়া ॥
ছয় মাস বই যদি ময়ূরে পেখম ধরে।
তবে সে জানিবেন প্রভু আসিবেন ঘরে ॥

বেহুলা নিশ্চয়ই সেই ময়ূরমূর্তিতে সাধারণ অংকনপদ্ধতি অনুসরণ করে নি। অংকনপদ্ধতি 'অসাধারণ' ছিল বলেই সে ময়ূরও যাদুগুণময় 'অলৌকিক' ছিল ॥

১৭·

পাখির সঙ্গে সঙ্গীত-শাস্ত্রের সংযোগের কথা ক্ষণপরেই আলোচনা করছি। কিন্তু তার আগে পাখির সঙ্গে গান ও সেই গানের সঙ্গে ছবির কথা প্রথমে বলি। 'ভারতের জাতীয় পক্ষী : শিল্পে ও সাহিত্যে' (দেশ : ১১ মাঘ, ১৩৭০। পৃ. ১১৭১-১১৭৬) নামে একটি নিবন্ধে এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয় :

"চিত্রকলায় বহুবিধ রাগ-রাগিণীর, নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে নানা বিচিত্র পরিবেশে ময়ূর মানুষের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সুখ-দুঃখ আরাম-আনন্দের সহচর হিসাবে স্থান পেয়েছে।... মল্হার রাগচিত্রে প্রোষিতপতিকার প্রেম-তৃষ্ণার প্রতীক হিসেবে বর্ষার জলবিন্দুসেবী ময়ূর এক বিশিষ্ট পরিবেশের সৃষ্টি করে—

নৃত্যন্ময়ূরে জলবাহ কালে
বাসাঙ্গ সংশ্লিষ্ট নিতম্বিনীকঃ।
বর্ণেন নীল: সুখগীতরক্তো
মহ্লার-রাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥

"বসন্তরাগের চিত্রে নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণের ময়ূর-মুকুট সর্বজনবিদিত। বসন্ত ঋতুর আনন্দোৎসবে সমগ্র পরিবেশ মধুময়। বৃক্ষশাখায় ময়ূর এই উৎসরমুখর চিত্রের এক বিশিষ্ট অঙ্গ .

"গৃহের পোষা পাখি হিসেবে ময়ূর ও বিরহিণী নায়িকার বা সাধারণ পরিচারিকার কোমল করপল্লবে অতি যত্নসহকারে সমাদর ও আহার্য লাভ করে। ভারতীয় গৃহস্থের জীবনে এই অতি সাধারণ দৃশ্য খৃষ্টীয় ১৭দশ—১৮দশ শতকের রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। ভারতীয় কামশাস্ত্র অনুসারে ময়ূর প্রবাসস্থিত নায়কের প্রতীক। এরই সান্নিধ্যে প্রিয়তমা নায়িকা তাঁর শৃঙ্গার-সাধন করেন—এ চিত্র নানা বৈচিত্র্য সহকারে ভারতীয় শিল্পে রূপায়িত হয়েছে। 'মধু-মাধুরী' রাগিণীর চিত্র অনুরূপ একটি দৃশ্যের দ্বারা প্রিয়ের প্রতি নায়িকার অনুরাগ ব্যক্ত করে।... কুকুভ-রাগিণীর বিষয়বস্তু—মাল্যহস্তা নায়িকার উভয় পার্শ্বে দুই বা ততোধিক ময়ূর-ময়ূরী।"

সঙ্গীত-শাস্ত্রে দেখা যায়, ময়ূরের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে ষড়্জের, ক্রৌঞ্চের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে চতুর্থ স্বরের এবং কোকিলের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে পঞ্চমের স্বরসাম্য আছে। স্বরগ্রামের প্রথম স্বরের সঙ্গে ময়ূরের কণ্ঠধ্বনির সাদৃশ্যের ফলে দোতারা, তানপুরা, বেহালা, স্বরোদ ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের মাথায় ময়ূরের প্রতিকৃতি (পংখের কাজ করা) অথবা কাঠের মূর্তি সংযুক্ত করতে দেখা যায়।

কণ্ঠস্বর আদৌ সুখকর নয়, অথবা নেইই, এমন পাখির সঙ্গে সঙ্গীতকে সংযুক্ত করবার প্রবণতা পৃথিবীর নানা দেশে দেখা যায়। একটি ভারত থেকে, অপরটি চীন থেকে দৃষ্টান্ত দিই।

অদ্ভুত রামায়ণে একটি চমকপ্রদ কাহিনী মেলে : অহংকারী নারদের অহংকার শ্রীকৃষ্ণ একদা এমন করেই চূর্ণ করেন যার ফলে নারদকে এক পেচকের কাছে সঙ্গীত সম্পর্কে পাঠ নিতে হয়!

তেমনি চীন দেশে মেলে 'পায়রা বাঁশি' : "চীন দেশের লোকেরা বাঁশের এক প্রকার ছোটো ছোটো বাঁশী তৈয়ার করে। এই বাঁশী ছোটো ছোটো লাউয়ের খোলে লাগাইয়া, সেই লাউটি বাঁশীযুক্ত অবস্থায় পায়রার পিছনে বাঁধিয়া দেয়। এই রকম একদল পায়রাকে যখন আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন বাঁশীতে হাওয়া ঢুকিয়া নানা প্রকার মধুর শব্দ বাহির হয়। এই শব্দ নীচে মাটি হইতে শুনিতে বেশ লাগে।"—প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। পৃ ২৫৩।

প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে পাখিকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিশ্বের অন্য কোথাও তা হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। 'সঙ্গীত রত্নাকরে'র টীকাকার কল্লিনাথের মতানুযায়ী ভৈরবরাগেব একটি রাগিণীর নাম 'বিহাগ' বা 'বাদহংসী'। ভরত নামে এক সঙ্গীত বিশারদের মতে মালকোষ রাগের পুত্র 'বড়হংস' বলে কল্পিত হয়েছে। ভরতেরই মতে, হিন্দোল রাগের পুত্র 'রেখবহংস,' দীপকরাগের পুত্রবধূ—'বড়হংসী'। অবশ্য, ভরতের এসব মতের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

ব্রহ্মার মতে, পঞ্চম রাগের একটি রাগিণীর নাম—'বড়হংসিকা'। দুপুরে ১—৪টার মধ্যে গেয় একটি রাগের নাম, 'হংসকিঙ্কিণী'। রাগ-রাগিণীর গোত্র অনুযায়ী প্রকারভেদ কল্পনা করা হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে। যেমন : বিলাবল—কুকুভ, হংস। সারং—বড়হংস, রক্তহংস।

শ্রীহট্টের একজন লোককবি ও গীতিকার সৈয়দ শাহানূরের গানে 'মইউর' (ময়ূর) নামে একটি রাগের নাম মেলে (শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : মাঘ, ১৩৪৪। আব্দুল জব্বার কর্তৃক সংকলিত)।

'তান' নানা রকম স্বরে তোলা যায়। সেই অনুযায়ী এর নামকরণও হয়েছে। যেমন, কাকী : কাকের মতো কর্কশ ধ্বনিতে যা গীত হয়। 'কোয়েল' তানের পরিচয় এই : 'সগ—গপ—পন—নস'।

গানের 'অলংকারে'র নামচয়নেও পাখিকে পাওয়া যায়। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' যে ৬৩টি অলংকার প্রদত্ত হয়েছে, তার 'সঞ্চারী বর্ণগত অলংকার' রূপে একটির নাম হলো—'শ্যেন' ঃ—'সপ—রধ—গন - মর্স'। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাল বিশেষের নাম 'হংসহার'। অবশ্য এই নামে দ্বাবিংশত্যক্ষরপাদ একটি ছন্দ-ও আছে।

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নামকরণেও আছে পাখি : এক ধরনের বীণার নাম 'মত্তকোকিলা' (একবিংশতিতন্ত্রী যন্ত্র)। 'তাউস্' (অর্থাৎ ময়ূর) একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম। 'ভারতীয় সঙ্গীত কোষ' (বৈশাখ, ১৩৭২) গ্রন্থে বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী লিখেছেন : "এস্রাজের খোলা'টকে ময়ূরাকৃতি করিয়া 'তাউস্' নামে প্রচলিত করা হইয়াছে। তাউসে ময়ূরের পদদ্বয় এমন ভাবে গুপ্ত থাকে যাহাতে তাউসটি স্বাধীন ও লম্বা লম্বি ভাবে দাঁড়াইতে পারে এবং এই অবস্থায় উহা বাদিত হয়। রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের মতে উহা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সৃষ্ট।" —পৃ ৯১।

আর একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম 'টাইসোকোডো'। "ইহা জাপান হইতে ভারতে আসিয়াছে। ইহা কানন ও গীটার যন্ত্রের সমবায়ে টাইপরাইটারের ন্যায় চাবিযুক্ত করিয়া নির্মিত। . ভারতীয় বাদকগণ ইহাকে 'বুলবুল তরঙ্গ' আখ্যা দিয়াছেন।"—ঐ পৃ. ৮৮-৮৯।

ঢাক একটি অতি পরিচিত লোকবাদ্য। ঢাকের 'টয়া' বা 'টোয়ে' পাখির পালক দিয়ে চূড়োর মতো সজ্জিত করবার প্রথা এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় লিখিত হয়েছে ঃ "ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর পাখির পালক বেঁধে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে।"

সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রসঙ্গে অবশেষে নৃত্যের কথাও এসে পড়ে। নৃত্যের সঙ্গেও পাখির সংযোগ অত্যন্ত গভীর এবং তা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। লোকনৃত্য ও মার্জিত নৃত্য—উভয় প্রকার নৃত্যেই তা দেখি।

নিছক আমোদের জন্যে লোকনৃত্যের চেয়ে উদ্দেশ্যমূলক ও আনুষ্ঠানিক লোক-নৃত্যই পরিমাণে বেশি। নৃত্যের মূলকথা দেহভঙ্গিমা ও সুষমা। এই দেহ ভঙ্গিমা ও সুষমা মানুষ পাখির কাছেই শিখেছিল কিনা কে জানে। এখনও পাখির অনুকরণে 'Mimetic dance' বহু স্থানেই চলিত আছে, তা থেকে এই অনুমান দৃঢ়তর হয়। সাঁওতালদের সমবেত নৃত্যের মধ্যে যে পদক্ষেপ দেখা যায়, তা ঠিক ময়ূরের পদক্ষেপের মতো। কলহকালে শালিক পাখিরা যেমন একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা থেকে 'যুদ্ধনৃত্য' (War Dance) সম্পর্কে মানুষ অবহিত হয়ে থাকতে পারে। শালিক মানুষের মতোই পর্যায়ক্রমে ডান-বাঁ পায়ে হাঁটে। এই হণ্টনকালে শালিকের পদক্ষেপ বেশ দৃঢ় ভঙ্গির সৃষ্টি করে। এই দৃঢ় পদক্ষেপ অনেক নৃত্যে প্রভাব ফেলেছে। অনেক সময় দেখা যায়, শালিকেরা প্রণামের আভাসে মাথা নুইয়ে একপ্রকার ভঙ্গি করে,—নানা লোক নৃত্যে তা মেলে।

নৃত্যকালীন 'চলন' বা হাঁটার ভঙ্গি হাঁসের কাছ থেকে পাওয়া বলে মনে হয়। নৃত্যকালীন গ্রীবার দোলনও ময়ূর, সারস, কাঠঠোকরা প্রভৃতির অনুকরণে সৃষ্ট বলে অনুমান হয়।

সমবেত নৃত্যে নানা রকম figure সৃষ্টি করা হয়: বৃত্ত, সরল রেখা, সমান্তরাল রেখা। সবই এক-একটি ভাবনার প্রতীক। বিকেলের দিকে যে কাকের সভা বসে, তাতে দেখা যায়, কাকেরা অর্ধবৃত্ত রচনা করে বসেছে; কখনো বা অখণ্ড একটি বৃত্তই রচনা করে ফেলে। বৃত্ত রচনার ক্ষেত্রে কাকের চেয়ে পেঙ্গুইন পাখির অবদানই বেশি বলে মনে করি। মেরুদেশে যখন প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝা বইতে থাকে, তখন পেঙ্গুইন পাখিরা বৃত্তের অভ্যন্তরে বৃত্ত রচনা করে সেই তুষার-ঝঞ্ঝা থেকে আত্মরক্ষা করে। বৃত্তরচনা পাখি ও সাপের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য। চিলেরা আকাশে বৃত্তাকারে ওড়ে। 'গগনভেড়' (Pelican পাখি আকাশ বেষ্টন করে ওড়ে বলেই বাঙলায় এই নাম দেওয়া হয়েছে।

এইবার উদাহরণ দিই।

জমির উর্বরতাশক্তির বৃদ্ধির জন্যে শস্য রোপণের কালে আমেরিকার কোনো-কোনো উপজাতি Zuni, Teseque, Comamche, Fox, Cherokee)-দের মধ্যে ঈগলের অনুকরণে নাচা হয়। একে বলে fertility symbol। একই উদ্দেশ্যে সাঁওতালদের মধ্যে 'মুরগী নৃত্যে'র প্রচলন আছে। আমেরিকার বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের মধ্যে যাদু-অনুষ্ঠান সূচক নানা পক্ষি-নৃত্যের প্রথা প্রচলিত আছে। 'Standard dictionary of folklore, legend and mythology' নামীয় অভিধান গ্রন্থটি এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, পূর্বপুরুষকে তুষ্ট করা, অন্যান্য অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে এসব নৃত্য যেমন অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনের প্রেমের অভিনয়ও এতে করা হয়। নারী কোমলপ্রাণা ও ক্ষুদ্র পাখির ভূমিকায় অভিনয় করে; পুরুষ সাজে দীর্ঘকায় শিকারী পাখি।

ভারতবর্ষের ওড়িশার জুয়াংদের মধ্যে নানা পক্ষিনৃত্যের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। E T. Dalton তাঁর 'Descriptive Ethnology of Bengal' বইতে (P. 154) জুয়াংদের নৃত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। ডঃ ভেরিয়র এলুউইন-ও 'A short anthology of Indian Folkpoetry' Man in India: vol XXIII, No 1, March 1943-PP4-40) নামে প্রবন্ধে জুয়াংদের এই সব পক্ষিনৃত্যের সঙ্গে গেয় গানগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ডাল্টন জুয়াংদের মধ্যে প্রচলিত 'শকুন নৃত্যে'র যে বিবরণ দিয়েছেন, তার অনুরূপ নৃত্য না হোক,

বালক-বালিকাদেব এক রকমের খেলা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পাওয়া গেছে। "কুকুর ও শকুনী খেলা" নামে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী তাঁর 'লোক সাহিত্যে ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯। পৃ. ৮০-৮১) বইতে এই নৃত্যের সমধর্মী একটি খেলার বিবরণ দিয়েছেন। এটি তিনি সংগ্রহ করেছেন মৈমনসিংহ জিলার জামালপুর অঞ্চল থেকে। এই একই খেলার আর একটি বিবরণ আমি শ্রীললিত কুমার বর্মণ (সাকোয়াভাঙ্গা পাড়া, বোদা থানা, দিনাজপুর, বাঙলা দেশ)-এর কাছ থেকেও পেয়েছি।

খেলার কাছাকাছি একটি নৃত্যানুষ্ঠানের বিবরণ আসামের মণিপুর অঞ্চল থেকে মেলে। রাসপূর্ণিমার দিন অপরাহ্ন বেলায় মণিপুরের বালকেরা শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার অভিনয় করে থাকেন। একে বলে 'বকাসুর নৃত্য'। কৃষ্ণকর্তৃক বকাসুর নিধনের দৃশ্য ও ঘটনা এটি। কাপড় দিয়ে একটি বিরাট আকারের বক তৈরি করা হয়। তারপর সেটির নিধন-কর্মের অভিনয়। শ্রীপ্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Folk dance of India' (1959) বইতে (p. 54) এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। নলিনী-কুমার ভদ্র তাঁর "মণিপুরী নৃত্য-উৎসবেব চিত্র" (প্রবাসী: ভাদ্র, ১৩৩১) প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আর একটু তথ্য দিয়েছেন: বকাসুরের মৃত্যু লক্ষণটিকে এখানে দৈহিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

পক্ষিনৃত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রাদাযের উদ্ভবেতিহাস জড়িত আছে। "মত্ত ময়ূর শৈব সন্ন্যাসী" (প্রবাসী: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১) নামে একটি প্রবন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, হাজার বছর আগে মালব ও মহারাষ্ট্র দেশে এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল: কার্তিকের বাহন ময়ূর যে কেকাধ্বনি করে, তাতে আছে ষড়জ ও কোমল ঋষভ, এই দুটি স্বব। শিবের পার্ষদগণ সেই কেকাধ্বনিতে মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন। শিবের প্রসাদেই তাঁরা মর্তকায়া ধারণ করে এই নামের সন্ন্যাসী হন।

ভারতীয় ক্লাসিক্যাল নৃত্যেও পাখির অনুকরণ দেখা যায়। ক্লাসিক্যাল নৃত্যে যে গ্রীবার দোলনকে বলে 'প্রকম্পিতা', তা আসলে ময়ূরের সামনে-পিছনে দোলন থেকে গৃহীত। হাতের নানা মুদ্রার নাম এই: 'শুকতুণ্ড,' 'হংসবক্র', 'হংসপক্ষ'। 'অভিনয় দর্পণে' যে ২৮টি মুদ্রার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে আছে 'ময়ূর' ও 'হংস'। ভরতের 'নাট্য শাস্ত্রে' আছে দু'হাত মিলিয়ে মোট ১৩টি মুদ্রার সৃষ্টি করা যায়; 'কপোত' মুদ্রা তার মধ্যে এক'ট। এই গ্রন্থের 'নৃত্য হস্তের' জন্যে যে সব মুদ্রা প্রদত্ত হয়েছে, তার মধ্যে আছে: 'পক্ষ বঞ্চিত,' 'পক্ষ প্রদ্যোত,' 'গরুড় পক্ষ,' এবং 'হংস পক্ষ'।

'অভিনয় দর্পণে'র 'ময়ূরহস্ত' মুদ্রা বলতে কেবল ময়ূরকেই নয়, যে কোনো পাখিকেই বোঝানো হয়েছে। 'হংসহস্ত' মুদ্রা আশীর্বাদ, উৎসব, বন্ধন, উপদেশ গ্রহণ ইত্যাদির সূচক। 'হংসপক্ষহস্ত' মুদ্রা হলো 'ছয়' সংখ্যা, সেতুবন্ধন, ইত্যাদির সূচক। 'তাম্রচূড়হস্ত' মুদ্রা মুরগী-কাক-সারস প্রভৃতি পাখির নির্দেশক। 'অর্ধসূচীহস্ত' মুদ্রা যে কোনো পাখির শাবকের সূচক। ব্রহ্মাকে নির্দেশ করতে হলে বাঁ হাতে 'চতুর' মুদ্রা এবং ডান হাতে 'হংসাস্য' মুদ্রা প্রদর্শন করতে হয়, কারণ, ব্রহ্মা হংসবাহন।

পাখির নৃত্যভঙ্গিমা থেকে এখনও মানুষ নব-নব প্রেরণা ও আদর্শ গ্রহণ করছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, একজন করিওগ্রাফার – মাইকেল ফকনিল - তৎকালীন রুশী ব্যালে নাচকে নতুন করে ঢেলে সাজেন। তাঁকেই অনেকে রুশী ব্যালে নাচের 'জনক' আখ্যা দেন। তাঁর রচিত 'দি সোয়ান' নামে একটি ব্যালে নাচ নেচে নর্তকী অ্যানা পাভলোভা (১৮৮৫—১৯৩১) পৃথিবী বিখ্যাত হন॥

১৮..

মধ্যযুগের নানা ধরনের শিল্পের মধ্যে 'Heraldry' একটি বিশিষ্ট শিল্প। The Rev. Charles Boutell লিখেছেন 'Heraldry' (Frederick Warne and Co., ltd : Revised edition, 1963 Revised by : C. W. Scott Giles and J. P. Brooke-Little নামেই চমৎকার একটি বই। এই Heraldry শিল্পের সঙ্গে পাখি কতভাবে যুক্ত তার সচিত্র ও সবিস্তার বিবরণ এই গ্রন্থে মেলে।

'Herald' শব্দের অর্থ হল—সরকারী ঘোষক, উৎসবাদির ব্যবস্থাপক, বীরধর্মের আদবকায়দা এবং অভিজাত বংশাবলীর ও কুলচিহ্নের তালিকা সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, আগন্তুককে রাজা-নাইটদের সভাকক্ষে নিয়ে যাবার সময় তাঁদের পরিচয় জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি, রাজাদের ভ্রমণের সম্পর্কে তথ্যদানকারী, রাজপুত্র ও সৈন্যদের সংবাদ বহনকারী। একেই বলে 'Blazonry,'—সরল বাঙলায় আমরা যাকে বলি 'ভাট-গিরি'। ভাটেরাও প্রায় এই ধরণের কাজ করতেন। মোটামুটি ভাবে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে একসঙ্গে এ বিষয়টি একটি নিয়মবদ্ধ শিল্প-শাস্ত্র রূপে গড়ে ওঠে।

যে কোনো বিষয়ের বা পদার্থের (যেমন, সৈন্যদের ঢাল, তরবারি ; কুলমর্যাদা সূচক পোশাক ; বংশ ও মর্যাদা সূচক পতাকা ; রাজার 'সীল') জমিনটা ভরাট করাকে বলে 'Heraldic charge'। পাখি কত রকম 'চার্জ' হতে পারে, সেটাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য। পাখির বিভিন্ন দেহভঙ্গি অনুযায়ী 'চার্জে'র তার পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়।

যেমন : পাখা ভাঁজ করে মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থায়; কিংবা, কোনো কিছুর ওপর দাঁড়ানো। কখনো পাখি উড়তে উদ্যত। এর আবার আছে চারটি ভঙ্গি : পাখা দেহের দু'দিকে প্রসারিত, ডগা ওপর দিকে; কখনো বা এই একই ভঙ্গি, কিন্তু ডগা নীচের দিকে; কখনো বা পাখা পেছনে মোড়া, ডগা ওপর দিকে; আবার, কখনো এরই বিপরীত ভঙ্গি, ডগা নীচের দিকে। কখনো সরাসরি ওপরদিকে, কখনো বা সে ওড়া আড়া-আড়ি ভাবে। কখনো মাথা সম্মুখে, ডানদিকে বাঁকা; পাখা ও দু'টি পা দু দিকে তখন প্রসারিত, ডগা ঊর্ধ্বমুখী। কখনো, এই একই ভঙ্গি, কিন্তু পাখার প্রান্ত বা ডগা নিম্নমুখী। এই শেষের ভঙ্গিগুলিকে বলে 'display'।

পাখিদের মধ্যে এসব ক্ষেত্রে ঈগলই বেশি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে অস্ত্র-শস্ত্রে। রাজমুকুটে, শিরোভূষণে, গলা বন্ধনীতেও ঈগল মেলে। একাধিক ঈগলও মেলে। সে ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়স্ক ঈগল অপেক্ষা ঈগল-শাবকই প্রাধান্য পায়। ঈগলের ঠোঁটে শিকার শুন্ধ কিছু খাদ্য থাকতে পারে। কখনো বা কোনো পশু বা প্রাণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার দৃশ্যও নিতে পারা যায়।

ঈগলের 'display'র ভঙ্গিগুলো রোমান ঈগল থেকে নেওয়া রোমান সাম্রাজ্যের প্রতীকরূপে কখনো এর মাথা একটি বা দুটি ; দুটি মাথা পূর্ব-পশ্চিম এই দুই দিকের রোমান সাম্রাজ্যের প্রতীক দেখান হয়। দু' মাথা-ওয়ালা ঈগলই Holy Roman Empire-এর প্রতীক। কখনো বা ঈগলকে 'Alerian' (যে ঈগলের ঠোঁট-পা নেই) ভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়। আবার কখনো বা ঈগলের মাথা, পা বা পাখাটুকুই কেবল 'চার্জ' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পাখা কেবল একটি বা এক জোড়া দেখানো হতে পারে। মাথাও তেমনি আঘাত করে ছিন্ন করে নেওয়া কিংবা, দেহের অবশিষ্টাংশকে ঘষে মুছে পৃথক করে দেখানো যেতে পারে। পা সাধারণত উরু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়।

শ্যেন ও বাজ প্রায় ঈগলের মতোই প্রদর্শিত হয় বটে তবে ঈগলের মাথা যেখানে পালক-শুদ্ধ থাকে শ্যেনের মাথা সেখানে মসৃণ রাখা হয়। উড়ন্ত (volant) কালের পাখা পূর্ণরূপে প্রদর্শন করতে হয়। শিকাররত অবস্থাতেও দেখানো চলে। কখনো পায়ে চামড়ার ফিতে বাঁধা থাকে, প্রান্তে থাকে দাঁড়ে আটকাবার vervel (varvel) বা আংটা। তখন সেই ভঙ্গিকে বলে 'vervelled'। হাতের কব্জিতে প্রদর্শিত হলে মুখোশ পরানোর ভঙ্গিতে দেখানো হয়।

গগনভেড় (The Pelican) প্রধানতই বাস্তব রূপে প্রদর্শিত হয়। কখনো দেখা যায় : নীড়ে দাঁড়ানো এবং নিজের ঠোঁট দিয়ে নিজের বুক থেকে রক্ত বের করছে— আপন শিশুকে বাঁচাবার জন্যে। এই ভঙ্গিকে বলে : 'A Pelican in its piety.'

রাজহংসকে শিরোভূষণ এবং 'চার্জ'—উভয় রূপেই মেলে। পাখা নানা ভাবে দেখানো যায়। কেবল মাথা ও ঘাড়ও ব্যবহৃত হয়। উটপাখির মুখে সাধারণত দেওয়া হয় ঘোড়ার ক্ষুর বা অন্য কোনো ধাতব পদার্থ। কারণ, উটপাখি না কি যা খায়, তাই হজম করে। সারস থাকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে, অপর পায়ে সে একটি পাথর ধরে থাকে। এটি হল চরম সজাগ ও অতন্দ্র হয়ে থাকবার ভঙ্গি। কারণ, সে ঘুমোলেই নিজের পায়ের থেকে পাথরটি পড়ে যাবে এবং সেই শব্দে নিজেই জেগে উঠবে।

কাক এবং সমস্তরের ও সমধর্মের পাখিদের পা কৃষ্ণবর্ণ করে দেখানো হয়। ময়ূরকে দেখানো হয় পাশের থেকে পেখম বন্ধ অবস্থায়, কিংবা সামনাসামনি,—কলাপবিস্তারী অবস্থায়। এই ভঙ্গিকে বলে, 'A peacock in its Pride'

মুরগীকে Blazon করতে হবে—তার পায়ে অস্ত্র বা তীক্ষ্ন নখর প্রদর্শন করে; তার মাথার ঝুঁটি দেখাতে হবে; এবং ঠোঁট, তীক্ষ্ন নখর ও ঝুঁটি উপযুক্ত রঙ দিয়ে ফোটাতে হবে। আবাবিলকে (the swallow) পা-বিহীন করে দেখাতে হবে। প্রাচীন বিশ্বাসঃ আবাবিল গাছে বসতে পারে না, সে জন্যেই পা-বিহীন করে দেখানো। আবাবিলের এই ভঙ্গিকে বলে,—'Martlet'। ইংলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডে বংশের চতুর্থ সন্তানকে নির্দেশ করতে আবাবিলের মূর্তি গৃহীত হয়।

Military Heraldry, Naval Heraldry, Airforce Heraldy প্রভৃতিতেও পাখির ভূমিকা অনন্য। 'Motto' হিসেবে নানান বাণী লেখা হয়। যেমনঃ 'Atle fert aquila' অর্থাৎ 'The eagle soars aloft'। দুদিক থেকে দুটি ঈগল এই বাণী ধরে থাকে। বাণী বা কোনো প্রতীক চিহ্নের ধারণকারী (Supporters) হিসেবে নানা ধরনের পাখিকেই মেলে।

এই প্রসঙ্গেই পতাকা (Flag) এবং পতাকাচারণা Flaglore -এর কথা বলা যায়। এ বিষয়ে F. E Hulme লিখিত এবং H. Gresham-সম্পাদিত 'Flags of the World' (Frederick Warine and co., ltd : London, 1953) বইটি উল্লেখযোগ্য। আপন গোষ্ঠী, টোটেম, এবং ব্যক্তিগত মর্যাদাকে ব্যক্ত করবার জন্যে যে প্রথার প্রবর্তন হয়, তার থেকেই পতাকা-র উদ্ভব ঘটে কালে-কালে। পতাকা নানা ধরণের হয়ঃ Flag, Banner, Standard, Pennon, ইত্যাদি। 'Banner' মূলত সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অঙ্গ বা স্তর নির্দেশক। 'Standard' হল ব্যক্তিগত মর্যাদাসূচক। এই জন্যে সমাধিস্থলেও 'standard' স্থাপিত হত।

Standard-এর দৈর্ঘ্য নিরূপিত হত মর্যাদার স্তর অনুযায়ী (যেমন : রাজা, ডিউক, আর্ল, মার্কুইস, ভাইকাউন্ট, ব্যারন, নাইট)। 'Pennon' হল—ছোটো, সরু, প্রান্তটি 'Swollow-tailed', অর্থাৎ আবাবিলের লেজের মতো। এ হল 'নাইট'-দের পতাকা, বর্শার মাথায় করে বওয়া হত। 'নাইট'রা যুদ্ধ প্রভৃতিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে রাজা তাঁদের Pennon খানিকটা ছিঁড়ে 'Banner' করে দিতেন। 'Pennoncelle' বা 'Pencil' হল—ছোটো ধরনের Pennon। কোনো বিশেষ আনন্দ বা দুঃখের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত। আর 'Pennant' বা 'Pendant' হল—সরু, দীর্ঘ পতাকা ; জাহাজ প্রভৃতিতে তা ঝোলানো হত। টিউডর যুগে একে বল হত 'Streamer'। এর থেকেই পরবর্তী কালে উদ্ভব হয় 'Badge'-এর।

এই সবগুলির সঙ্গেই পাখি যুক্ত ও জড়িত আছে। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ হেনরির ব্যাজে থাকত রাজহংস বা মরাল ; চতুর্থ এডওয়ার্ডের ব্যাজে থাকত গোলাপের সঙ্গে শ্যেন। অষ্টম হেনরীর আমলে পৈতৃক ব্যাজে যুক্ত হয় শাদা মোরগ। এলিজাবেথ অন্যান্য চিহ্নের সঙ্গে নেন শ্যেন গ্রীকরা দণ্ড বা বর্শার মাথায় ব্যবহার করত অ্যাথেনার প্রতীক প্যাঁচার প্রতিমূর্তি। Marius দ্বিতীয়বার 'কন্‌সাল্‌' হবার পর রোমের সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দিয়েছিলেন, কেবল মাত্র ঈগলই হবে তাদের ব্যক্তিগত পতাকার (Standard) চিহ্ন।

ব্রিটেনের সামুদ্রিক আবহাওয়া নির্দেশক জাহাজগুলির পতাকায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে থাকে ঈগল। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাজে থাকে হলদে জমিনের ওপর শাদা পিঠ এক ধরনের পাখি। তেমনি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ব্যাজে মেলে : হলদে দাঁড়ের ওপর কালো মরাল।

উত্তর রোডেশিয়ার পতাকা : নীল রঙের জমিনে হলদে রঙের ঈগল, তার ঠোঁটে মাছ। উগাণ্ডা : স্বাভাবিক ভঙ্গি ও রঙে আঁকা আফ্রিকান সারস। মরিশাসের সৈন্যবাহিনীর কোটে থাকে একদিকে সম্বর হরিণ, অন্যদিকে 'ডোডো' পাখি ; উভয়ে যুদ্ধরত। গিলবার্ট এবং এলিস আইল্যাণ্ড কলোনীর ব্যাজে থাকে সামুদ্রিক চিল। আমেরিকার উত্তর ডাকোটার পাতাকায় থাকে স্বাভাবিক রঙে উপস্থাপিত ঈগল। সে তার ঠোঁটে সাপ ধরে আছে॥

.. ১৯

বিবিধ শিল্প-শাস্ত্র-কলা-বিজ্ঞানের সঙ্গে পাখির যোগাযোগের কথা এ পর্যন্ত বলা হল।

কিন্তু পাখিকেই অবলম্বন ও কেন্দ্র করে যে নানা প্রকার ইন্দ্রজাল, কুহক ও যাদুবিদ্যার প্রবর্তন হয়েছে যুগে যুগে দেশে-দেশে,—সে কথা এই অধ্যায়ে উহ্যই রইল। সে প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে পরে আলোচনা করেছি॥

পাখি : রূপক, প্রতীক ও সংমিশ্রণ

...১...

আদিম মানুষের কাছে প্রকৃত ও বাস্তব বস্তুটি অপেক্ষা তার পরোক্ষ ও প্রতীকতাময় দিকটিই ছিল বড়ো। এই জন্যেই জীবনের যে কোনো দিককেই তারা কেবল বর্তমানের প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় না; তাকে একদিকে অতীত এবং অন্য দিকে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে নিতে চায়। এই পরোক্ষতার প্রসঙ্গেই এসে পড়ে নানা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচার ও যাদুময় অনুষ্ঠান। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াচারের মধ্যে আছে, আগুন নিয়ে নানা ভঙ্গিতে, নানা দিকে নানা ক্রিয়াকাণ্ড; কোনো বিশেষ দিক বা বস্তুকে কোনো দুজ্ঞেয়, অদৃশ্য, রহস্যজনক শক্তির অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলে তার আরাধনা; জল সিঞ্চন; অথবা, অন্য কোনো পদার্থ ঘর্ষণ, লেপন; ছবি বা আলপনা আঁকা, ইত্যাদি।

ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো অপ্রাকৃত শক্তিকে আয়ত্ত করবার প্রয়াস থেকেই কালক্রমে প্রতীকতার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। এই-এই আচার-অনুষ্ঠান পালনের ফলে এই-এই ফলাফল অতীতে পাওয়া গেছে; অতএব, তা করলে ভবিষ্যতেও অনুরূপ ফল মিলবে, সুতরাং অভীষ্ট ফল অর্জনের জন্যে ওই সব আচার-অনুষ্ঠান অবশ্য পাল্য হয়ে উঠেছে প্রথমে। তারপর এলো বিবর্তন: এইসব আচার-অনুষ্ঠান-অভিচারগুলিই লোকমানসে রহস্যময় হয়ে উঠল। যেন সেগুলির বিশিষ্ট প্রাণশক্তি আছে। তাই আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে এলো নানা নিয়ম, নানা বিধি-নিষেধ-টাবুর বেড়াজাল, নানা গোপনীয়তা,—সকলেই সকল সময়ে তা পালনেও সক্ষম নয়। একদিকে আচার-অনুষ্ঠান যেমন গোপ্য ও গুহ্য হয়ে পড়ল, অন্যদিকে তেমনি আচার-অনুষ্ঠানগুলোও প্রকৃতই পালন না করে, মনে করা হতে লাগল,—পরোক্ষে তা পালিত হয়েছে। এই পরোক্ষ অনুষ্ঠানই ইঙ্গিত-সংকেত-প্রতীকতার প্রাথমিক রূপ। তখন মনে করা হত, প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের ফলেই বুঝি যাদুগুণ বিনষ্ট হয়ে পড়বে।

নানা ভাবে পাখিকেও নানা ভাব-ভাবনার প্রতীক-সংকেতে পরিণত করা হয়েছে। কারণও অবশ্য একাধিক। কোথাও বাস্তব পর্যবেক্ষণ ক্রিয়াশীল; আবার, কোথাও বা গভীর রহস্য ও যাদুবোধ। শকুনের সঙ্গে মৃত্যু বা কাকের সঙ্গে চাতুর্যের; ঈগলের সঙ্গে শক্তি-শৌর্যের বা কোকিলের সঙ্গে সুকণ্ঠের কিংবা বসন্তের অনুষঙ্গ যখন লক্ষিত ও স্বীকৃত হয়, তখন তার মধ্যে কোনো যাদু-রহস্য নেই। বাস্তব জগতে এসব ভাবনার সমর্থন কিছু-কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ঘুঘুকে যখন প্রেম, নির্জনতা ও কারুণ্যের প্রতীক বলা হয়, কিংবা হাঁসের শ্বেতাভ রঙের মধ্যে যেখানে বিদ্যা ও পবিত্রতার সংযোগ লক্ষ করা হয়, তখন তার মধ্যে এক ধরণের মানসিক ভাব ও বিশ্বাস আরোপিত হয়।

সপ্রাণ ও সজীব প্রতীক অপেক্ষা নিষ্প্রাণ ও বস্তুময় প্রতীক আরো বড়ো রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। যেমন, টোটেম হিসেবে, গোত্রের প্রতীক রূপে যখন কোনো জীবন্ত পাখি গৃহীত হয়, তার মধ্যে যতো না রহস্য থাকে, তার চেয়ে সেই প্রাণীর শক্তি ও রহস্য অধিকতর অনুভূত হয়—যখন তা ঘরের দেওয়ালে আঁকা একটি ছবি হয়ে ওঠে কিংবা দেহের কোনো অঙ্গে আঁকা একটি উল্কি রূপে দেখা দেয়। বাস্তব, প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা তার পরোক্ষ, অনুকরণাত্মক অভিনয়মূলক দিক যেমন প্রতীকের উদ্ভবের একটি কারণ, তেমনি সেই প্রতীকের শক্তি ও রহস্যও বেড়ে যায়—যখন তা সপ্রাণতা থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু ও চিত্রে সমর্পিত হয়। কেননা, তখন তাদের মধ্যে 'Mana', 'Orenda' প্রভৃতিকে আরোপ করা যায়॥

২…

'রূপক' (Metaphor) এবং প্রতীকের (Symbol) মধ্যে প্রকারগত না হোক অন্তত পরিমাণগত পার্থক্য আছেই। পরে সে আলোচনা করছি। প্রথমে রূপকের কথা বলি। পাখিকে রূপক রূপে নানা দৃষ্টি কোণ ও মতবাদের আলোকে দেখা যেতে পারে। কেউ দেখেছেন নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ বা Solar myth ও Nature myth-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ; কেউ দেখছেন, সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ; আবার, কারো বা দৃগ্‌ভঙ্গী যৌনতত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের।

Solar myth, Nature myth এবং Phallicism-এর দৃষ্টিকোণ থেকে পাখিকে যাঁরা রূপক রূপে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণে আসে ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমূলরের ভাবসন্ততি, ইটালীর ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক—Angelo de Gubernatis-এর নাম। গুবেরনেটিস-এর বিখ্যাত গ্রন্থ : 'Zoological Mythology or the Legends of Animals' (London : 1872 : Vol. II)। পাখির সব কিছুকেই তিনি ওপরে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, রূপক-ব্যাখ্যাও তদনুযায়ী। ম্যাক্সমূলার যে comperative Mythology-র নায়ক ছিলেন, গুবেরনেটিস সেই তুলনা মূলক পৌরাণিকতাকেই অনুসরণ করেছেন।

পাখি যেহেতু নভোচারী, সেই হেতু তিনি তাঁর আলোচনা আরম্ভই করেছেন আকাশ দিয়ে। অতঃপর সহজেই তিনি Solar myth-এর তত্ত্বে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। আকাশ কখনো পথের মতো, তাতে আমরা হাঁটি, পথ হারাই। কখনো তা বায়ুবৎ, তা আমাদের ওড়বার স্থান ; কিংবা, সেখান থেকে পড়বার স্থান। কখনো সে আকাশ আবার বৃক্ষস্বরূপ, যে গাছে আমরা নীড় রচনা করতে চাই, সে নীড় ভেঙে গেলে মর্মাহত হই। কখনো সে আকাশ সমুদ্র-সমান। এই আকাশ-প্রতিবেশ ও আকাশ-বৃক্ষই বহু পৌরাণিক পাখি ও পতঙ্গের জগৎ। দেবতা, দৈত্য, নায়ক ও রাক্ষসেরা যখন এই আকাশ ও অন্তরীক্ষের জগতে সঞ্চরমান, তখন এই

কারণেই তাঁরাও পক্ষবান্‌প্রাণিরূপে কল্পিত হন, অথবা পক্ষবান প্রাণীর সঙ্গ, সাহচর্য ও সাহায্যও তাঁদের কাম্য হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়। চন্দ্রসূর্য, সূর্যরশ্মি, বজ্ররব ও বিদ্যুল্লেখা, ঊষা, সন্ধ্যা-রাত্রি, মেঘ ও মেরুপ্রভা (Aurora) প্রভৃতি নৈসর্গিক দিকগুলোও পক্ষিরূপ ধারণ করে। যেমন ঋগ্বেদে সূর্যকে বলা হয়েছে পাখি (১.৭২.৯)। অশ্বিদ্বয় যেন পাখায় ভর করে আসে (১.১৮৩.১)। ইন্দ্রকে বলা হয়েছে সুপর্ণ (১০ ৫৫.৬)। সরুৎ সরের সঙ্গেও পাখির আসঙ্গ কল্পিত হয়েছে (১.৮৫.৭)। অগ্নি পাখির ইচ্ছা সম্পাদন করেছে (১.৯.৬৬)। সবিতৃ পাখিরা অরণ্যে বাস করে না (২.৩৮.৭)। পাখিরা যেন ঊষা বা মেরুপ্রভা থেকে আবিভূর্ত হয় (১.১২৪.১২)। একটি বৈদিক মন্ত্রে আছে : আকাশবৃক্ষের চারিদিকে সূর্য ও চন্দ্র (অর্থাৎ ইন্দ্র ও সোম) দুটি পাখি রূপে নিরন্তর উড়ে চলেছে, একজন সেই বৃক্ষের ফল খায় (পিপল), অপরজন দেখে। দুজনে সেই বৃক্ষস্থিত 'অমৃত' প্রহরা দিয়ে চলেছে (১.১৬৪.২০)। এবিষয়ে Khorda Avesta-য় কথিত দুই পৌরাণিক পাখি Amru এবং Camru-র কথা তুলনীয় ; এরাও এক পৌরাণিক বৃক্ষের বীজ নিয়ে দুই বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত ছিল। এই সব উদাহরণ থেকে প্রাকৃতিক জগতের এক-একটি দিক কী করে পাখির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়ে পক্ষি-প্রতীকতার জন্ম দিয়েছে তা বোঝা যায়। আমার মনে হয়, পাখি ও নৈসর্গিক দিকের অভিন্নতার ফলে রূপক-কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং ওই রূপক-কাহিনীর ফলে পরবর্তী কালে তা প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতা থেকেই পুরাণের উৎপত্তি—ম্যাক্সমূলরের এই তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে মনে আসে। একই শব্দের একাধিক অর্থ থাকবার দরুণ, ওই অর্থের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্যে পুরাণ-কাহিনী সৃষ্ট বা কল্পিত হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। যেমন, 'হরি' এই শব্দটি দ্বারা ইন্দ্র, চন্দ্র, ইন্দ্রাশ্ব, শুক, হংস, ময়ূর, কোকিল ; হরিচাপ অর্থে ইন্দ্রধনু ; হরিলোচন বলতে পেচক ; 'হরিহর' বলতে হরিদ্বর্ণ অশ্ব, পীতবর্ণাশ্ব বা সূর্য, ময়ূরাশ্ব বা কার্ত্তিকেয়—এতগুলো অর্থ বোঝানো হয়। অর্থের এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার ফলে, বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সার্থকতা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এমন-এমন কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে ঐ অর্থবৈচিত্র্য আর অবাস্তব বা অসম্ভব বলে না মনে হয়। এর পেছনে আর একটি কারণ আছে। একই শব্দের একাধিক অর্থ কল্পনার পেছনে থাকে ওই একাধিক অর্থের মধ্যে চিত্রগত বা রূপগত কোনো সাদৃশ্য। যেমন, একটি শিশু আকাশের এক খণ্ড মেঘ দেখে তাকে তুষারাবৃত পাহাড় বলে ফেলে ; সে হয়তো জানেও না যে, বৈদিক ভাষায় পর্বত বলতে মেঘ ও পাহাড়—দুইই বোঝাতো। মেঘ ও পাহাড়—এই দুই ভিন্ন বস্তুর চিত্রগত ও বাহ্যিক সাদৃশ্যই একই 'পর্বত' শব্দ দিয়ে দুটিকে বোঝাতে মানুষকে প্রণোদিত করেছিল। এই ভাবে সাদৃশ্য বোধ থেকেই প্রাচীন মানুষের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে পুরাণের জন্ম দিয়েছে।

তাহলে দুই ভিন্নবস্তুর বাহ্যিক ও রূপগত সাদৃশ্যই একটি শব্দের একাধিক অর্থের

মূল কারণ। তাই যদি হয়, পুরাণের উদ্ভবের মূল কারণও তাহলে এই। এভাবেই স্বভাবতই-মানুষের মনে এই কাহিনীগুলো উদ্ভূত হতে পারে। তারকাখচিত আকাশ যেন কলাপ-বিস্তারী একটি ময়ূর, ময়ূরের 'চোখ'গুলো যেন তারকা; আকাশের নীল রঙ বা রামধনুর সাত রঙ ময়ূরের পাখায় লেগে থাকে। পাখি নভোচারী—নিশ্চয়ই সে-ও আকাশ। প্রত্যূষে পাখি জাগে, সূর্যও ওঠে, অতএব সূর্যই পাখি। সূর্য পূর্ব আকাশ থেকে পশ্চিম আকাশে গিয়ে পৌঁছয় নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে নয়। পাখির দ্রুত গতি ছাড়া আকাশ ভ্রমণ কী করে সম্ভব। এইভাবে পাখি ও গ্রহ-উপগ্রহের নানান দিক এই দুই ভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক সাদৃশ্যের ফলে অভিন্নতা, সেই অভিন্নতার বোধকে স্পষ্টতর ও বাস্তবসম্মত করবার জন্য নানা কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়েছে; শেষে এই কাহিনীর সংস্কার এমন করেই মনে গেঁথে গেছে যে, একটি বস্তু অপর বস্তুর অর্থাৎ পাখি আকাশের বা এই উপগ্রহের (গ্রহ, উপগ্রহ) বা আকাশ পাখির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এখানেই আমার মতে রূপকের সঙ্গে প্রতীকের সম্পর্ক লক্ষিতব্য। রূপক তাই প্রতীকের প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক স্তর।

যাঁরা Mythologist তাঁরা এই কাহিনীগুলোর মধ্যে নানান রূপক আবিষ্কার করেন। প্রাচীন যুগের মানুষ যে সহজ সাদৃশ্যবোধের ফলে এবং সরল কল্পনা দিয়ে কাহিনীগুলো সৃষ্টি করেছিল, সেগুলো মূলত ধরার বুকে তাদের টিকে থাকবার সহায়ক কারণগুলো ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। তাই কৃষি-কর্ম, পশু-পাখি, জল-বৃষ্টি-রোদ, ঋতুর আবির্ভাব-তিরোভাব এই বিষয়গুলোই তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। Mythologist-রা মনে করেন, নিসর্গ জগতের এই সব ব্যাপারের কথা ও ঘটনা ব্যক্ত না করে প্রাচীন মানুষেরা পরোক্ষভাবে রূপকের আড়ালে তা ব্যক্ত করেছেন।

এরই ফলে গবেষকরা চন্দ্রকে মনে করেন শীতঋতু, সেই রকম সূর্য যেন গ্রীষ্মঋতু। প্রতিদিন চন্দ্র-সূর্যের আবির্ভাব-তিরোভাব তাঁদের কাছে প্রতি বৎসরের শীত-গ্রীষ্মের আবির্ভাব ও তিরোধান বলে মনে হয়। কখনো একই চন্দ্রের কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষকে দিন-রাত্রি বা শীত-গ্রীষ্ম বলে মনে করেন। চাঁদ অমাবস্যায় অদর্শন হয়, বা পক্ষ অনুযায়ী কলায়-কলায় তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ঠিক তেমনি সূর্য কখনো মেঘে অদৃশ্য হয় বা প্রতিদিন দিনের শেষে অন্তর্হিত হয়। চন্দ্র ও সূর্য কখনো স্বামী-স্ত্রী, আবার কখনো সহোদর-সহোদরা (যেমন, অ্যাপোলো ডায়না), কখনো দুই সখা। আকাশ তাদের গৃহ। বস্তুত চন্দ্র ও সূর্যের আবির্ভাব-তিরোধান, অয়ন চলন ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের কৃষিকর্ম গভীরভাবে জড়িত। এই সবই পাখির সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া যায়: পাখিও বছরের সব সময় দর্শন দেয় না, যাযাবর পাখি ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে অঞ্চলও পরিবর্তন করে, যেমন চাঁদ বা সূর্য। আকাশ যেন একটি গাছ, সেই গাছে চাঁদ ও সূর্য দুই পাখি ওড়ে, প্রতিদিনের অন্ধকার রাত্রি বা প্রতি ঋতুর প্রবল শীত যেন শ্যেন-ঈগল-বাজপাখির মতো: তারা যেমন তাদের ক্ষিপ্রগতি, তীক্ষ্ণ চোখ, প্রখর নখর দিয়ে শিকার ধরে, ঠিক তেমনি রাত্রি-শ্যেনের

প্রখর নখরে অন্ধকার-দৈত্যের মৃত্যু হয়, সূর্যের আবির্ভাব বা বসন্তের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে ; কেন না, অন্ধকার-দৈত্য বা শীত-দৈত্যের কবলে প্রতিদিন ও প্রতি বৎসর সূর্য ও বসন্ত পতিত হয়ে থাকে। চাঁদ নিশাচর—সারারাত জাগে সে। অনেক পাখিও রাত্রিচর, কাজেই চাঁদ ও পাখি একাত্ম হতে পেরেছে। অনেক পাখি জোড়ায় জোড়ায় জুটি বেঁধে থাকে, চাঁদ ও সূর্য যেন সেই জুটি।

কখনো বা পৌরাণিক পাখি সূর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, সূর্যের সঙ্গে মেঘও এ প্রসঙ্গে আসে। প্রখর সূর্য-রশ্মি কখনো কখনো শিকারী পাখির তীক্ষ্ম নখর, কখনো তার ধারালো ঠোঁট, কখনো পাখা, মেঘের অন্তরালস্থিত বিদ্যুৎও নখ বা ঠোঁট হয়ে ওঠে। সূর্য সকালে যখন প্রথম দেখা দেয়, তখন তার রশ্মি থাকে মৃদু ও কোমল। বেলা যতই বাড়ে ততই তা হয় প্রখর ও ধারালো। যদি গরুড়ের বংশ-লতিকা বিচার করা যায়, তবে প্রভাত-সূর্যের কোমলতা থেকে মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তির প্রখরতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : বিনতার ডিম থেকে জন্ম নেয় অরুণ ও গরুড় ; গরুড়ের দুই পুত্র—জটায়ু ও সম্পাতি। এরা সবাই পাখি ও বংশ-পরম্পরায় প্রত্যেকেই যেন পূর্বপুরুষের চেয়ে শক্তিধর। প্রভাত-সূর্য অরুণ, তারপর গরুড়। এমনি করে যখন বংশধারা এগিয়ে চলে, অর্থাৎ বেলা বেড়ে একই সূর্য যখন পরিবর্তিত হয়ে জটায়ু (যে বড়ো যোদ্ধা) ও সম্পাতি (যে খুব সক্রিয়)-র স্তরে এসে পেঁছায়। জটায়ুর প্রচণ্ডতা আসলে সূর্যের প্রাখর্য। গরুড় সূর্যের প্রথম স্তর, গরুড় বিষ্ণুর বাহন, বিষ্ণু হ্রস্বদেহী, ক্রমেই বড়ো হতে থাকেন, যেন প্রথম সূর্যের হ্রস্বতা ঘুচে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অরুণ ও গরুড়—এই দুই পাখির জন্ম নেবামাত্রই উচ্চৈঃশ্রবার আবির্ভাব লক্ষণীয়। এতে সৌর পাখি ও সৌর অশ্ব যে এক ও অভিন্ন তা প্রমাণিত হয়।

গরুড়কে অবলম্বন করে কয়েকটি রূপকের ব্যাখ্যা করেছিলেন কিশোরীলাল রায় তাঁর 'দেবতত্ত্ব' (নব্যভারত : মাঘ ১২৯১ : পৃঃ ৫৪৮ ৫৫৪) নামে একটি প্রবন্ধে : " রৌদ্রের নামই গরুড়। অরুণ প্রাতঃকালীন সূর্য-জ্যোতি, সুতরাং প্রবল রৌদ্র অর্থাৎ গরুড়কে যে তাহার কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, 'গরুড়কে সকলে অগ্নিবর্ণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। উহাতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গরুড়ের শরীর ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। রৌদ্র প্রকাশেরও এই নিয়ম। প্রথমত অল্প অল্প রৌদ্র হয়, তাহার পরে উহা ক্রমে ক্রমে অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠে। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে গরুড়ের পক্ষের কিছু হানি হয় নাই। ইহার তাৎপর্য এই যে, বজ্রাঘাত দ্বারাও সূর্য-জ্যোতির কিছুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে না। গরুড় চক্ষের নিমেষেই অনেক দূর গমন করিতে পারিত, ইহাতে এই সূচিত হইয়াছে যে, জ্যোতির গতি যৎপরোনাস্তি দ্রুতবেগবিশিষ্ট। এই গতির নিমিত্তই গরুড় ও অরুণকে পক্ষী বলা হইয়াছে। সুমেরু পর্বতের উপরে, গরুড় ও পবনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবনের ভয়ানক পরাক্রমেও সুমেরু পর্বতের কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু গরুড়ের পাক সাটেই উহার এক শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে অভিপ্রেত হইয়াছে যে,

এপ্রকার স্থলে বায়ু অপেক্ষা উত্তাপের শক্তিই অধিকতর ফল প্রসব করে। এ পর্যন্ত গরুড় সম্বন্ধে কেহই কিছু ব্যাখ্যা করেন নাই ; কিন্তু বোধ করি, গরুড়কে যে সূর্য-জ্যোতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলাম, ইহাতে কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কোনো পণ্ডিতই কিছু আপত্তি করিবেন না।"—কিশোরীলাল রায়ের এই শেষ মন্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত, তাঁর পূর্বে বিদেশে অনেকেই গরুড়ের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Angelo de Gubernatis-এর নাম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত, বৈদিক সাহিত্যকে 'রূপক' মনে করে তাকে যুক্তি ও গণিতের আলোকে যোগেশ চন্দ্র রায়-বিদ্যানিধি পরবর্তী কালে সুন্দর আলোচনা করেছেন। যোগেশচন্দ্রের মতবাদ সম্পর্কে একটু পরেই আমরা আলোচনা করব।

সূর্যরূপী শ্যেন ও ঈগলের ধারণার মধ্যে একটি বিবর্তন বা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পাখি দুটি যখন দিনের শেষে ডুবন্ত সূর্য বা মুমূর্ষু গ্রীষ্মের রূপক, তখন এরা অশুভ শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। যেন এদের পাখা দিয়ে দিনের শেষে সূর্যকে ঢেকে ফেলে, তাতেই আসে অন্ধকার ; এবং তারই ফলে গ্রীষ্মঋতুর অবসানে আসে শীতঋতু। আবেস্তায় Kamck নামে পাখি এমনই এক পাখি, সে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছিল পাখা দিয়ে, পৃথিবী যাতে জনশূন্য হয়ে মানুষের বিপদের সূচনা করেছিল সাত বৎসর সাত রাত্রি ধরে। অবশেষে নায়ক Kerecaepa তাকে হত্যা করে সূর্য ও মানুষকে মুক্ত করে।

এমন কি একই পাখির মধ্যে শুভ ও অশুভ এই দুই দিকের প্রকাশ দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে পারস্যের কাহিনীতে শিমুর্গের ভূমিকা বিচার্য। Alburs পাহাড়ের উচ্চচূড়ায় শিমুর্গ পাখির বাসা ; অসহায়, ক্ষুধার্ত, শীতার্ত, শিশু 'সাল' (Sal)-কে সে রক্ষা করে। রাজার কাছে এজন্য শিমুর্গ বিশেষ প্রশংসা পায়। কিন্তু Isfendiar-এর ৫ম অভিযানে এই শিমুর্গ পাখিকেই বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। শিমুর্গকে তখন শয়তান-তুল্য এজন্যেই বলা হয়েছে যে, সে তখন তার পাখা দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রেখেছিল। Isfendiar যুদ্ধে শিমুর্গকে পরাজিত করে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল।

ঠিক সেই ব্যাপার ঘটেছে শ্যেন-ঈগলের প্রসঙ্গে। দুটিই সূর্যের সঙ্গে একাত্ম বলে বিবেচিত হলেও কালক্রমে ঈগলের সম্পর্কে ধারণা খারাপ হতে থাকে। শ্যেনের সম্পর্কে অবশ্য ধারণা ভালোই থাকে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও জার্মানীর পুরাণে শ্যেন তাই উজ্জ্বল আকৃতিতে প্রকাশিত, বীর নায়কদের তাই প্রিয়। ঈগল সেখানে অন্ধকার মূর্তি নিয়ে দৈত্য-দানবদের প্রিয় হয়েছে। মধ্যযুগ থেকেই ঈগল সম্পর্কে ধারণা খারাপ হতে থাকে। Edda-দ্বয়ে বলা হয়েছে, ডাইনীদের রথের বল্গা হলো ঈগল। এমন কি ঈগল তখন অনেক দৈত্য-রাক্ষসের প্রতিরূপ বলেও বিবেচিত হত। হেলেনীয় পুরাণেও যতদিন জীউস শ্রদ্ধা পেয়েছেন, কেবল ততদিনই ঈগল শ্রদ্ধাভক্তি পেয়েছে, তারপর নয়। প্রমিথিউসের বুকে নখরাঘাত করতে ঈগলকেই দেখা গেছে।

শ্যেনের সম্পর্কে শুভ ধারণা শকুন ও চিলে পরবর্তীকালে সঞ্চারিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের অশ্বিদ্বয়ের মতো একজোড়া শকুন প্রতিদিন নরকের দৈত্য Tityo-র যকৃৎ খেয়ে ফেলত। প্রতিদিনই ওই দৈত্য আবার বেঁচে উঠত। জুপিটারের স্নেহাস্পদা ল্যাটোনা Latona)-কে ওই দৈত্য নিপীড়ন করেছিল। ল্যাটোনা আসলে চাঁদ। (চাঁদরূপী ডায়না তাঁরই কন্যা, সূর্যরূপী অ্যাপোলো তাঁরই পুত্র)। এই ব্যাপারের আসল কথা এই : রাত্রি বা অন্ধকার রূপী দৈত্য (গল্পে Tityo) প্রতিদিনই নিহত হয় এবং প্রতিদিনই রাতে প্রাণ পেয়ে আবার জেগে ওঠে। অর্থাৎ প্রতিদিনই দিন-রাত এমন করে হয়ে থাকে।

Phoenix-এর কল্পনার মধ্যেও এই প্রতিদিনের দিন-রাত হবার কথা আছে। ফিনিক্স উদয়াস্তের প্রতীক, সে-ই সূর্যের রহস্য জানে বলে কথিত আছে। তার জন্ম পূর্ব দিকে (অর্থাৎ সূর্যের উদয়ে তারই জন্ম), সে পূর্ণায়ত হবার পূর্বে শিশির পান করে (অর্থাৎ সকালে শিশির থাকে, রোদ চড়ে উঠলে তা শুকিয়ে যায়, যেন কেউ নিঃশেষে পান করে ফেলে) ; অতঃপর সবই খায় (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্য সব কিছুকেই সমভাবে কিরণ দেয়, তপ্ত করে)। দিনের শেষে সেদিনই অস্তাচলে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয় (তু° রবীন্দ্রনাথের পঙক্তি : দিবা পুড়ে মরে স্বামীর চিতায়)। মরণের পূর্বে ফিনিক্স তার পুনর্জন্মের কথা স্মরণ করে মরে। অর্থাৎ পরদিন প্রভাতে পুনরায় তার জন্ম হয়। আপন ভস্ম থেকেই তার পুনর্জন্ম সূচিত ও সম্ভাবিত হয়। অস্ত ও উদয়কালে সূর্যের অগ্নিবৎ রঙ এবং মধ্যাহ্ন কালে তার প্রচণ্ড উত্তাপ সহজেই আগুনে পুড়ে মরার কল্পনার জন্ম দিয়েছে।

অস্তকালে সূর্যের এই অগ্নিবৎ রঙকে অন্য ভাবনার রূপক বলে মনে করা যেতে পারে। শিকারী পাখি বা সায়ংকালীন সৌর পাখিরা রাতের বেলা ডাইনী হয়ে যায়। আগেই লক্ষ করেছি, ঈগল কিভাবে দৈত্য-রাক্ষস হয়ে উঠেছিল। ডাইনীরা রাতের বেলায় শিশুদের রক্ত পান করে বলে বিশ্বাস। শিকারী পাখি বা সায়ংকালীন সৌর পাখিরাও রাতে strix হয়ে যায়। strix এবং ডাইনী যদি সমার্থক বস্তু হয় তবে অস্তকালীন সূর্যের রক্তিম আভা শিশুদের সেই রক্ত। অন্ধকাররূপী দৈত্য বা ডাইনী যেন দিনের শেষে সূর্যের রক্ত নিঃশেষে শোষণ করে নেয়, তারই ফলে সূর্যের মৃত্যু ঘটে প্রতিদিন। এখানে পাখির প্রতি বিরূপ মনোভাব, আবার পাখির প্রতিই শুভ মনোভাবের ফলে বিপরীত বিশ্বাস এই : সন্ধ্যার শিকারী বা সৌরপাখিরা তাদের ভয়ংকর ও তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে অন্ধকার রাতের দানবকে হত্যা করে কবলগ্রস্ত সূর্যকে প্রতিদিন সকালে উদ্ধার করে। এই ভাবে পাখির প্রতি দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সঙ্গে সূর্যের উদয়াস্ত মিলে-মিশে গেছে।

সূর্যের সঙ্গে যুদ্ধ অর্থাৎ অশুভ শক্তিময় পাখি (যেমন, ঈগল)-কে তাই কোনো পৌরাণিক কল্পনায় হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, এমন কি সামান্য বা স্বল্প শক্তি-সম্পন্ন ক্ষুদ্রায়তন পাখির কাছে ঈগলের পরাভব প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন, ক্ষুদ্র গায়ক

পাখি Wren। একে ঈগলের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখানো হয়েছে। Pliny বলেন, ঈগল Wren-এর শত্রু। Aristotle-ও ঈগল ও wren-এর যুদ্ধের কথা বলেছেন। Monferrato-র একটি গল্পে দেখা যায়, Wren ও ঈগল কে কত উঁচুতে উঠতে পারে তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে। Wren-কে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করে গর্বিত ঈগল নিমেষে এতো উঁচুতে উঠে গেল, যে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। Wren ঈগলের পাখার তলাতেই লুকিয়েছিল, এইবার সে বাইরে বেরিয়ে আর একটু উঁচুতে উঠে বিজয়ীর সম্মান লাভ করল।

এই wren জাতীয় একটি ক্ষুদ্র পাখির নাম পরিচয় ('ইয়ত্তিকা শকুন্তিকা') মেলে ঋগ্বেদে, সূর্যের বিষ সে পান করে নেয় ('গয়াস তে বিষম্', ১. ১৯১. ১১)। এই সূর্যের বিষপান একটি রূপক। আসলে এই ক্ষুদ্র পাখি 'সৌর বাষ্প' (the solar vapours) শোষণ করে নেয়, অর্থাৎ তাতে গ্রীষ্ম ঋতুর অবসান হয়ে শীত ঋতুর সূচনা ঘটে। প্রমাণ হিসেবে জার্মানীর একটি সঙ্গীতের কথা বলা যায়। Wren তাতে শীতের প্রতীক, এবং শীত শেষ হয়ে যাওয়ায় এ পাখি শোকে বিহ্বল হয়েছে।

Mythologistরা শীত ঋতুকে 'চন্দ্র' এবং গ্রীষ্মঋতুকে 'সূর্য' বলে থাকেন। wren জাতীয় পাখিরা যখন শীতের বিদায়ে কাতর, তখন নিশ্চয়ই তারা চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, এবং এই হিসেবে তারা 'lunar bird' বা 'চান্দ্র পক্ষী'। বিপরীত ভাবে গ্রীষ্মকালীন পাখিরা 'solar bird' বা 'সৌর পক্ষী'। চাঁদের সঙ্গে যৌনতার একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়: রাতের বেলাতেই যৌনবোধ প্রখর হয়; চাঁদ নিশাচর; এবং অন্ধকারকে সে ভেদ করে জননেন্দ্রিয়ের মতো। সুতরাং চান্দ্র পক্ষীরা Phallic bird-ও বটে।

শীতরূপ অন্ধকার ভেদ করে, বসন্তের আবির্ভাব হয়; শীতকাল অর্থ চন্দ্র। ঈগলের গাঢ় বর্ণ ওই অন্ধকারের রূপক। প্রতিযোগিতার সময় ঈগলের পক্ষপুট ভেদ করে wren আবির্ভূত হয়েছিল, wren চান্দ্র পাখি। অর্থাৎ অন্ধকার ভেদ করে চাঁদ উঠল; অর্থাৎ শীত অতিক্রান্ত হয়ে বসন্ত এলো; অথবা, রাত্রি শেষ হয়ে দিন হলো। এই জন্যেই ঈগল ও wren কে একত্র সমাবিষ্ট করা হয়েছে।

অতঃপর এই বসন্ত কি করে গ্রীষ্মে বিবর্তিত হয়, সে রূপকের কথা বলি। প্লেটোর মতে, Muse-রাই 'cicadae'-তে পরিণত হত। তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে গান গাইত কেবল। অপর কারো কারো মতে, 'cicadae' কোকিলের লালা থেকে জন্ম নিত। কোকিল বসন্তের পাখি। সুতরাং তার লালা থেকে যার জন্ম, সে বসন্তের পরবর্তী গ্রীষ্ম ঋতুর সঙ্গে জড়িত। গ্রীষ্মঋতু অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে কৃষিকর্মের সময়, প্রাচুর্যের সময়। 'ciceda' (বহুবচনে 'cicadae') রা পূর্বদিকের (অর্থাৎ প্রাতঃ কালীন) শিশির পান করে জীবন ধারণ করে বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন।

এ বিষয়ে হেলেনীয় পুরাণের একটি ঘটনা স্মর্তব্য। হেলেনীয় পুরাণে বৃদ্ধ Tithon একটি 'cicada'তে পরিণত হয় বলে বিশ্বাস। সূর্য Tithon হলেন ঊষাদেবী

(the aurora)-র প্রেমিক। সূর্য অমৃত পান করেন, অতএব তিনি অমর কিন্তু অনন্ত-যৌবন নন, এই জন্যেই জরা তাঁকে আক্রান্ত করে! সারাদিন কর্মের পর কিংবা সারা গ্রীষ্ম করদানের পর সূর্য ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এই ক্লান্তিই তাঁর বার্ধক্য, যে বার্ধক্য তাঁর মৃত্যুর কারণ হয় প্রতিদিন এবং প্রতি গ্রীষ্মের পর। শীত আসা অর্থাৎ গ্রীষ্মের মৃত্যু হওয়া। মৃত্যুর পর, শীতের শেষে বসন্তকালে সূর্য Tith n তাই একটি 'cicada'-তে রূপ নেন হেলেনীয় পুরাণে। আবার, 'cicada' যখন কোকিলের লালা-জাত বলে কল্পিত, তখনও এই রূপকের সমর্থন মেলে।

এই জন্যেই দেখা যায়, কোকিলের লালা থেকে জাত cicada-র জন্মের পর, গ্রীষ্মকালে আর কোকিলকে সাধারণভাবে দেখা যায় না। বিশ্বাস করা হয়, cicada নাকি কোকিলের পাখার নীচের দিকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। এই ভাবে আপন জাতকের হাতে কোকিলের মরণ হয় প্রতি বৎসর। অর্থাৎ বসন্ত গিলে গ্রীষ্ম আসে। ঠিক যেমন Tithon-প্রেমিকা উষা প্রতিদিন অন্ধকারকে গিলে খেয়ে সূর্যের আবির্ভাবকে সম্ভাবিত করেন। দিন এখানে গ্রীষ্মকাল। রাত এখানে বসন্তকাল।

কোকিলের আবির্ভাবেই বৎসরের প্রথম বজ্ররব শোনা যায় বলে বিশ্বাস আছে। এই জন্যে কোকিলের সঙ্গে বজ্রের যোগাযোগ কল্পিত হয়েছে। কোকিলের প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতে 'দাত্যূহ' শব্দটি মেলে। দাত্যূহ বা ডাহুক বর্ষার পাখি, মেঘের সঙ্গে কাজেই এর একটি সহজ যোগ আছে। দাত্যূহ শব্দের অপর অর্থ মেঘ, তাও স্মরণীয়। বজ্রসৃষ্টিকারী ও নিপাতকারী জিউসকে বলে 'Kokkiik', যার অর্থ কোকিল। কখনো সূর্য বা সূর্যরশ্মিরূপেও কোকিল কল্পিত হয়েছে।

যেমন, অহল্যার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার কালে ইন্দ্র কোকিলের রূপ ধরেছিলেন। অকস্মাৎ সেখানে গৌতম এসে পড়ায় ইন্দ্র ধরা পড়ে যান। ইন্দ্র যখন ব্যভিচারে লিপ্ত তখন একটি মুরগী ডেকে ওঠে। ইন্দ্র বা কোকিল হল লুক্কায়িত সূর্য, মুরগী এখানে প্রভাত। অর্থাৎ প্রভাত সূর্যকে প্রকাশিত করল। কোকিলের সঙ্গে তাই সূর্য, মেঘ ও বজ্রের আসঙ্গ লক্ষ করা যায়।

এই মেঘ ও সূর্য মিলে কোকিলের আর একটি দিক তুলে ধরে। কোকিলকে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক যেন মেঘে ঢাকা সূর্য সে। মেঘে ঢাকা সূর্যের মধ্যে কয়েকটি বিরুদ্ধ ধর্ম আবিষ্কার করা হয়। বিভিন্ন পুরাকাহিনী থেকে দেখানো যায়, তার মধ্যে বীরত্বের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, শুভ বোধের সঙ্গে দৈত্য-রাক্ষসের মনোভাব যুক্ত হয়েছে। কোকিলের মধ্যেও এই বিরুদ্ধ গুণ : সে বসন্তের সূচনা কারী বলে সকলের প্রিয়, কিন্তু অকৃতজ্ঞ রূপে নিন্দার্হ।

কোকিলের সম্পর্কে সংস্কার বিশ্বাসগুলো আবাবিল (swallow) সম্পর্কেও প্রচলিত হয়েছে। আবাবিলও বসন্তের সূচক। এই জন্যে বসন্তকালে সে প্রিয়, কিন্তু শীতকালে অশুভ-শক্তিময় বলে নিন্দিত। কোথাও বিশ্বাস আছে, আবাবিল

ভগবানকে আকাশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। অপরদিকে, গ্রীক ভাষায় প্রবাদ আছে, ঘরে যেন আবাবিলকে বাসা করতে না দেওয়া হয়।

মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে একাধিক বার কাক-পেচকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। অ্যারিস্টটলের 'History of Animals'-এর নবম খণ্ডে কাক-প্যাঁচার যুদ্ধকথা আছে। এও এক রূপক। এ যুদ্ধ অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে চাঁদের যুদ্ধ। কাকের গাত্রবর্ণ অন্ধকার রাত্রিকে নির্দেশ করে। পেচক নিশাচর, রাত জাগে চাঁদের মতো, চাঁদের মতোই অন্ধকারেও দৃষ্টিবান। গ্রীকরা বিশ্বাস করত, পেচক হলো Niiketeus-এর কন্যা। Niiketeus হলেন ইথিওপিয়ার রাজা। ইথিওপিয়ানরা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তি, সুতরাং তাদের রাজা Niiketeus অবশ্যই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং সে কারণেই তিনি "রাত্রি"। Niiketeus-এর কন্যা পিতার অজ্ঞাতে পিতার শয্যা-সঙ্গিনী হয়, এতে পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করতে গেলে দেবী Athene তাকে করুণা বশে একটি পেচকে পরিণত করে দেন। এই অপরাধবোধে লজ্জিত হয়ে পেচককে আজও দিনের বেলায় দেখা যায় না, রাতে বের হয়। চাঁদ যেমন দিন বা সূর্য থেকে দূরে থাকে, তেমনি 'রাত্রি'-রূপী Niiketeus-এর কন্যাও দিনে দর্শন দেয় না। ল্যাটিন লেখক Pliny গ্রীকদের আর একটি সংস্কারের কথা বলেছেন: গ্রীক মতে প্যাঁচা Dionysos-এর শত্রু। তার কারণ, Dionysos রহস্য ভালোবাসতেন। চাঁদ এবং ঊষা সব রহস্যের অন্ধকার দূরীভূত করে দেন। প্যাঁচার নিশাচর রূপটি এখানে ধরা পড়েছে।

প্যাঁচার সঙ্গে চাঁদের যোগ জার্মানরাও বিশ্বাস করেন। বাঙলা দেশে বিশ্বাস আছে, চাঁদের ভেতর এক বুড়ি তুলো পেঁজে নিয়ে চরকা কাটে। জার্মানীতেও বিশ্বাস করা হয়, প্যাঁচা "Nocturnal weaver". সংস্কৃতে প্যাঁচাকে বলা হয় 'পিঙ্গলাক্ষ'। চাঁদের পিঙ্গল রঙ অর্থাৎ জ্যোৎস্না এই পিঙ্গলাক্ষ শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যজনক। যখন গল্পে পড়ি: প্যাঁচা কাকের বাসা নষ্ট করল অথবা অন্যপাখীর পালকে আবৃত কাককে প্যাঁচা সঠিকভাবে সনাক্ত করল, তখন তার অর্থ হল: চাঁদের উদয়ে অন্ধকার অপসৃত হলো।

যে প্যাঁচা চাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই প্যাঁচা একদা পাখীদের রাজারূপে মনোনীত হয়েছিল। ইন্দ্রকে বলা হয় চন্দ্র। প্যাঁচা যেমন পাখীদের রাজা, চন্দ্ররূপী ইন্দ্রকে তেমনি বলা হয় 'মৃগরাজ' অর্থাৎ পশুরাজ। এদিক থেকে ইন্দ্রের সঙ্গে প্যাঁচার যোগ অনুভূত হয়।

কাকের রঙ কালো, কালোর কাছাকাছি রঙ হলো নীল। শিথিল ভাবে দেখলে নীল ও কালো অভিন্ন, ময়ূরের রঙ নীল। অতএব, কাক ও ময়ূর সমার্থক। ঈশপের গল্পে একারণেই কাক ময়ূরের পালক ধারণ করে ময়ূর হতে চেয়েছিল। ইন্দ্র হলেন ময়ূর দেবতা। নীল তারকাখচিত আকাশ যেন ময়ূর, তারাগুলো ময়ূর-পালকের চোখ।

নীল ও কালোর অভিন্নতার জন্য ইন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হন। কাক যেমন

ময়ূরে পরিণত হয়, বিপরীত দিকে। ইন্দ্র যেমন যুবরাজ, জীউসও তেমনি। প্রাচীন এথেন্সবাসীরা কাক ও জীউসের নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করত। কাজেই ইন্দ্র-জীউস, কাক-ময়ূর এখানে একাকার হয়ে গেছে।

হেলেনীয় পুরাণে দৈবদৈত্যের যুদ্ধে অ্যাপোলো কাকের রূপ ধরেছিলেন। তবে অনেকের অনুমান, শ্বেতকাকের মূর্তিই তিনি ধরেছিলেন, কেননা গ্রীক সংস্কার অনুযায়ী শ্বেতকাকই সূর্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে হয়। অ্যাপোলো সূর্যদেবতা। এই কাক গ্রীষ্মের সূচনা করে বলে বিশ্বাস করা হয়। সূর্যই বৃষ্টির কারণ, এইজন্যে কাক অনেক সময় বৃষ্টি দেবতা (Plurial god)-র প্রতীক।

সাধারণভাবে কাক কালো বলে অন্ধকারের প্রতীকও বটে। কিন্তু সেই অন্ধকারই আলোকের উৎস। এইজন্যই কাক আলোক বা সূর্য হয়ে গেছে। যেমন, অন্ধকার রাত্রির থেকেই উজ্জ্বল দিন সম্ভাবিত হয়। Estonian গল্পধারার প্রথমেই এজন্যে দেখা যায়, কাক আলোকের সূচক হয়ে উঠেছে।

কাকের কয়েকটি পৌরাণিক বিশেষত্ব ম্যাগপাই পাখির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। শীত ও সূর্যের সঙ্গে ম্যাগপাই-এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিশ্বের সব দেশের পৌরাণিক সাহিত্যে ও লোককথায় সোনার সঙ্গে কাকের যোগ দেখা যায়। ম্যাগপাইয়ের সঙ্গেও তেমনি, ম্যাগপাই সোনা-রূপো চোর বলে কুখ্যাত। এ পাখি সোনা-রূপো নিজের বাসায় লুকিয়ে রাখে—তা ভালো বাসে বলে নয়। উজ্জ্বলতা সইতেপারে না বলে, আলোকে ঘৃণা করে বলে। অর্থাৎ এ পাখি কাকের মতোই অন্ধকারের প্রতীক, অর্থাৎ শীতের প্রতীক। অন্ধকার ও শীত কৃষিকর্মের সহায়ক সূর্যের বিপরীত। ম্যাগপাই-এর সোনা লুকিয়ে রাখা হল, পাকা শস্যের স্বর্ণশীর্ষ লুকিয়ে রাখা। অর্থাৎ শীতের দিনে কৃষিকর্ম হয় না। জার্মানীর পৌরাণিক সাহিত্যে ম্যাগপাইকে নরকের পাখি বা ডাইনীদের বাহন বলে মনে করা হয়। এইজন্যে খ্রীষ্টমাস ও Epiphany-র মাঝখানের বারোদিন ম্যাগপাই পাখি হত্যার নির্দেশ আছে। Epiphany ও খ্রীষ্টমাস বছরের সেই সময়ে আসে যখন অয়নের ফলে দিন আবার বড়ো হতে থাকে। ম্যাগপাই হত্যার মধ্যে দিয়ে শীতকে বিদায় করা হয় তাই।

সারস এবং ক্রৌঞ্চের মধ্যে জল, বর্ষা, শীত ও সূর্যকে দেখা যেতে পারে। একটি রাশিয়ান লোককথায় আছে, সারস ও ক্রৌঞ্চ পরস্পরকে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। এবং দুজনেই পরপর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। আজও সারস স্বামী ও ক্রৌঞ্চ স্ত্রী হবার জন্যে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। সারস ও ক্রৌঞ্চ জলের পাখি ; এইজন্য বর্ষার সূচক ; বৃষ্টি আসে মেঘ থেকে, অতএব মেঘেরও সূচক ; মেঘ করলে সূর্য ঢাকা পড়ে, দিনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়, অতএব তা শীতের সূচক কিংবা রাত্রির। মেঘের মাঝে সূর্য ঢাকা পড়লে, সূর্য যেমন সেই মেঘের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে ; কিংবা রাত্রির অন্ধকার আবরণ থেকে তরুণ নায়ক রূপে সূর্য সম্ভাবিত হয়, বর্ষার সঞ্চিত জলরাশিতে তার প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই কারণে বর্ষার পাখি সারস ও ক্রৌঞ্চ সূর্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। অপরাহ্ণ বেলায় বিরাট পাখা মেলে

এদের উড়ে যাওয়া, যা বৃষ্টির সূচক বলে বিশ্বাস করা হয়, তা সূর্যের মৃত্যুরও পূর্বাভাস বলে মনে করা যেতে পারে ; অপরাহ্ণেই সূর্য অস্তমিত হয়ে অদৃশ্য হয় বলে : কিংবা মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে বলে। এই জন্য সারস-ক্রৌঞ্চ 'আকাশ-শ্মশানে'-র প্রতীক।

কাঠঠোকরা তার ঠোঁট দিয়ে ক্রমাগত কাঠ ঠুকরে চলে। তখন যে শব্দ উত্থিত হয়, স্পষ্টতই তা মেঘের মধ্যে বজ্ররব। তার ঠোঁটের আঘাতে কাঠও চিরে যায়। যেন ঠোঁটের আঘাতে রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরে সূর্যকে বা শীতের বুক ভেদ করে বসন্তকে আনায়ন করে। অথবা সে চাঁদ,—যার আলোকরশ্মি কাঠঠোকরার ঠোঁটের মতন অন্ধকারকে ভেদ করতে পারে। তাহলে কাঠঠোকরা সূর্য-চন্দ্র ও মেঘ-বজ্রের সঙ্গে যুক্ত। বৈদিক দেবতা ইন্দ্রও বজ্রবৃষ্টি ও চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'সোম' বা চন্দ্র ইন্দ্রেরই সঙ্গে জড়ানো। ল্যাটিন লেখক Pliny একটি গ্রীক বিশ্বাসের কথা বলেছেন : কাঠঠোকরার ঠোঁট দিয়ে কেউ যদি মৌচাক থেকে মধু আহরণ করে, তবে মৌমাছিরা তাকে দংশন করে না। মৌচাক যেন একখণ্ড মেঘ, মধু এখানে বৃষ্টি। অথবা যেন 'চন্দ্রজাত' সোমরস। অথবা, ঊষাকালের শিশির। Pliny আরও একটি বিশ্বাসের কথা বলেছেন : কাঠঠোকরা নাকি বিশেষ এক ধরণের তৃণলতা ছুঁইয়ে যে কোনো বন্ধ বস্তু খুলতে পারে, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠঠোকরার এই ক্ষমতারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই বিশ্বাসের মধ্যেও কাঠঠোকরার সঙ্গে চাঁদের যোগ অনুভূত হবে। চাঁদ শীতের প্রতীক ; কাঠঠোকরার ডাকে শীত আসে। যে সব দেশে শীতকাল কঠোরবেশে দেখা দেয়, সেসব দেশের লোকেরা কাঠঠোরাকে অলক্ষুণে পাখি বলে মনে করে

Lark বা ভরত পাখি পৃথিবীর আদিতম প্রাণী বলে কথিত হয়। এই জন্যে পৃথিবীর আদি আলোর উৎস সূর্যের প্রতিরূপ বলে গৃহীত হতে পারে এ পাখি। ভরতপাখির ঝুঁটি (Crest) যেন সূর্যের রশ্মি। ভরতপাখি আকাশের অতি উচ্চলোকে উঠে দিনে সাতবার তার পিতা ঈশ্বরের বন্দন-গান গেয়ে থাকে—বিশ্বাস করা হয়। এ পাখি প্রত্যূষ ঘোষণা করে, গ্রীষ্মের আগমনবার্তা জানায়. আকাশের উচ্চলোক. প্রত্যূষ ঘোষণা ও গ্রীষ্মের আগমন রটনা—তিনটির মধ্য দিয়েই এর সূর্য সম্পৃক্ততা সপ্রমাণিত। ভরত - এই তদ্ভব শব্দের তৎসম রূপ হলো 'ভরদ্বাজ'। ভরদ্বাজ সপ্তঋষিদের একজন ছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে : তিনি তিন জন্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পরিশেষে, চতুর্থ জন্মে স্বর্গারোহণ করে আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করলেন, অর্থাৎ তিনি সূর্য হয়ে গেলেন। সূর্যের সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ গভীর। বৃহস্পতির পুত্ররূপে ভরদ্বাজ দিবোদাসের সঙ্গে অভিন্ন ; দিবোদাস ইন্দ্রের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন. এই ভাবে ভরত ও সূর্য একাত্ম হয়ে গেছে।

বর্তক বা বটের পাখিও সূর্য ও গ্রীষ্মের সঙ্গে জড়িত বটে, কিন্তু চাঁদের সঙ্গেই এর যোগ বেশি। গ্রীক ও ল্যাটিনদের বিশ্বাস, বটের পাখি চাঁদ উঠলে জেগে থাকে বা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আবার, চাঁদের কলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে এর মাথার পালকের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বলে মনে করা হয়। সূর্যের প্রতিরূপ রূপে, এ পাখি উত্তাপকে ভালোবাসে, এবং চাঁদকে ভয় পায়। সে জন্যেই চাঁদের সঙ্গে তার পালকের হ্রাসবৃদ্ধি

ঘটে থাকে। বটের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বুঝতে পারে: দুর্যোগময় আবহাওয়া আসন্ন কিনা। শীত আসছে কিনা, তাই বুঝে নিজেই উষ্ণতর অঞ্চলে প্রস্থান করে। উষ্ণ অঞ্চল সূর্যকেই নির্দেশ করে।

লাল মুরগী উদয়কালীন সূর্যের রক্তিম আভার নির্দেশক। সূর্য আপন তাপে বৃষ্টি সম্ভাবিত করে কৃষিকর্মের সাহায্য করে; সেই সূর্যের প্রতিরূপ যখন মুরগী, তখন সূর্যের মতো সেও উর্বরতার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। জার্মানীতে ২০শে জুলাই প্রাচীন বজ্রদেবতা 'ডোনার' (Donar)-এর সম্মুখে মুরগী নাচানো এবং পরে সেগুলো বলি দেওয়া হতো। আবহাওয়ার সঙ্গে মুরগীর যোগ আছে। হাঙ্গেরীতে টিনের তৈরী রঙ করা মুরগীর মূর্তি উঁচু ও বড়ো অট্টালিকার ওপরে স্থাপিত হয় বাতাসের গতি ও দিক বোঝাবার জন্যে। ইংরেজীতে একেই বলে 'weather cock'।

কখনো কখনো, গল্পে পড়া যায়, গোবর-গাদায় মুরগী মুক্তা পেয়েছে অন্বেষণ করে। এই মুক্তা আসলে ডিম; এবং এই ডিম আসলে গোলাকার নবীন সূর্য। মুরগী তাহলে কালো রাত, যে সূর্যকে প্রসব করে সে। সকালবেলায় এই কালো মুরগী হয়ে পড়ে সাদা। মুরগীর ঝুঁটি সূর্যের রশ্মি। সাদা রঙকে তুষারের রূপক বলে মনে করলে মুরগীকে শীতের সূচক বলা যায়। ঈস্টারের পূর্বে (গুড ফ্রাই ডে-র পরদিন, শনিবার রাতে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়) যে ডিম খাওয়া হয়, যার সম্পর্কে গোটা ইউরোপে অনেক গান ও প্রবাদ ছড়ানো আছে, তা আসলে প্রাচুর্য ও বসন্ত-কালীন সূর্যের প্রতীক।

চাঁদের সঙ্গেও মুরগীর যোগ কল্পিত হয়। Ælianos বলেছেন, মুরগী চাঁদের প্রিয়, কারণ ল্যাটোনা-র প্রসবকালে মুরগী সহায়তা করেছিল বলে বিশ্বাস আছে দ্বিতীয়ত, মুরগী ভোর রাতে ডাকে, যেন প্রহর সম্পর্কে সচেতন, যেন রাতে অতন্দ্রই থাকে, চাঁদ যেমন সারারাত জেগে আলোক দেয়।

হাঁস, রাজহাঁস, মরাল প্রভৃতির শ্বেতশুভ্র পালক প্রশস্ত দিবালোক ও প্রসন্ন সূর্যকে নির্দেশ করে। এই হাঁসের স্বর্ণ ডিম্ব যা বহুবার বহু গল্পে শোনা গেছে, সে স্বর্ণ ডিম্ব গোলাকার উদীয়মান সূর্য।

বিকেল বেলায় সূর্য বা মেরুপ্রভা, পৃথিবীর শ্যামল শোভা—সবই রাতের বেলায় বা শীতের দিনে অদৃশ্য হয়ে যায়। গল্প কাহিনীতে যাদু প্রভাবে যে সব নায়ক-নায়িকা গাঢ় রঙের কপোত বা ধূসর রঙের হাঁস রূপে পরিণত হয়, সে সব নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে বিকেল বা শীতের একটি যোগ দেখা যায়। কপোতের গাঢ় বর্ণ বা হাঁসের ধূসরতা রাত্রি ও শীতের সূচক।

ইটালীর ফ্লোরেন্সে একটি প্রথা আছে: গুড ফ্রাইডে-র পরদিন, ঈস্টারের পবিত্র

শনিবার দিন, একটি কৃত্রিম ঘুঘু পাখিকে গীর্জার বেদী থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়, যেন সেই পাখিই মৃত্যুর ৪০ দিন পর যীশুর শুভ পুনরুত্থানের বার্তা ঘোষণা করল। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী এই ঘুঘুটির ওড়বার গতি-প্রকৃতি থেকে কৃষকেরা সে বৎসর কেমন ফসল হবে তা নির্ধারণ করে। আসলে এর দ্বারা শীতের শেষ ঘোষণা এবং কৃষি কাজের জন্য বসন্তের সূচনা করা হলো। Ælianos যে বলেছেন, Turtle dove কৃষি দেবীর প্রিয়, তা এই ব্যাপার থেকে স্পষ্ট হয়।

ঋগ্বেদে মরুৎগণকে নীলপৃষ্ঠ হংস বলা হয়েছে (৭. ৫৯. ৭.)। অনেক slavonic গল্পে হংসের স্বর্ণডিম্ব ডাইনী-দৈত্যের মরণের কারণ হয়েছে। হংসডিম্ব সূর্য ; সূর্যের আবির্ভাবে অন্ধকার-দৈত্যের মরণ—এর পেছনে রূপক হিসাবে আছে। ইউরোপে St. Michale's day-তে হাঁস বা রাজহাঁস খাবার প্রথা আছে, খেলে তা শুভফল দেয়। এ আসলে শীতের সূচনা ঃ জলচর পাখিদের কাছে শীতকাল পরম সংকটের সময়, কেন না তখন জল জমে বরফ হয়ে যায়, জলচর পাখিদের পক্ষে তা বিরাট অসুবিধার কারণ হয়। শীতের প্রথমে, সেন্ট মাইকেল দিবসে হাঁস খাবার অর্থ ঃ তাদের মরণের কথা স্মরণ করা।

শুকের রঙ সবুজ বলে এর নামান্তর হরিৎ বা 'হরি'। অশ্বিদয়কেও বলা হয় 'হারয়', স্বয়ং ইন্দ্রের নামও 'হরি'। এই শব্দের অপর অর্থ—সুন্দর কেশ যার। মেঘ ভেদ করে যখন বজ্র পতিত হয় তখন বিদ্যুল্লেখা দীর্ঘকুঞ্চিত কেশের আভাস আনে ; কিংবা চন্দ্ররশ্মি সেই চুলের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। চন্দ্ররশ্মি পিঙ্গল বা হলুদাভ রঙের। সেই জন্যে সবুজের সঙ্গে হলুদ রঙ মিশে যায়। চাঁদ সেই জন্য কখনো সবুজ গাছ, কখনো সবুজ শুক পাখি। মহাভারতের প্রথমেই যে কৃষ্ণ-পুত্র শুকের উল্লেখ আছে, তার অর্থ হলো, চাঁদের মতোই ওই শুক মহাভারত-রহস্যের অন্ধকার দূর করতে সমর্থ।

ময়ূর শান্ত-স্তব্ধ, নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ এবং সপ্তবর্ণ বিশিষ্ট সূর্যের প্রতীক। সূর্যকে বলা হয় 'সহস্রাংশু'। ময়ূরের আছে তেমনি সহস্র 'চোখ'। এই 'চোখ' রাত্রির আকাশের নক্ষত্রও বটে। সূর্য যেমন কখনো মেঘে কখনো শীতকালে ঢাকা থাকে, ময়ূরও তেমনি শীতের দিনে পালক খসিয়ে ফেলে এবং অনলংকৃত হয়ে পড়ে। পালক খসানো ময়ূর কাকেরই তুল্য। (এই জন্যেই ঈশপের গল্পে কাক ময়ূর হতে চেয়েছিল), এবং কাক যেহেতু সূর্যের প্রতীক, সেই হেতু ময়ূরও। কাকের কণ্ঠস্বর ময়ূরের মতোই কর্কশ। গ্রীষ্মকালে আকাশের মেঘ গর্জন আদিম মানুষের কাছে সঙ্গীতের মতো মনে হয়, কেন না, ওই মেঘ

কৃষিকর্মের সহায়ক হয়। আষাঢ়ের নৈসর্গিক শোভা ময়ূরের ডাকের মধ্যে কেমন ধরা পড়ে, রবীন্দ্রনাথ 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে তা চমৎকার করে দেখিয়েছেন।

প্রতি শীতে পালক খসিয়ে বর্ষায় ময়ূরের পালক গজানো যেন Phoenix পাখির মতো। পালক খসানো যেন ময়ূরের মৃত্যু, পালক গজানো তার জন্ম. যেমন Phoenix প্রতিদিন জন্ম নিয়ে প্রতিদিনই মরে, আপন ভস্ম থেকে প্রতিদিনই পুনর্জন্ম হয়। Phoenix আসলে সূর্যই। দিন-রাত্রি সূর্যের জন্ম-মৃত্যু তুল্য। প্রতিদিন পুনর্জন্ম গ্রহণের মধ্যে Phoenix-এর অমরতা সূচিত হয়, বহু রোগের উপশমকারী ময়ূরও তেমনি। এইভাবে ময়ূর, Phoenix ও সূর্যকে এক সূত্রে গাঁথা যায় ॥

নৈসর্গিক জগতের কয়েকটি Cardinal ব্যাপার, যেমন, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রীষ্ম-শীত প্রসঙ্গে, পাখির পটভূমিকায় যে রূপকার্থ ওপরে ব্যক্ত হলো, সকলেই সমানভাবে তা গ্রহণ করবেন, এমন কথা অবশ্যই মনে করা যায় না। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ওপরের এই রূপকার্থ ব্যক্ত হয়েছে। পৌরাণিকতা-বাদীদের মধ্যে যাঁরা Nature myth-এ বিশ্বাসী, তাঁরাই এই ধরনের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করবেন, অপর কেউ নয়। পৌরাণিক জগতের সব ব্যাপারই প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক জগতের রূপক, তার মধ্যেই তাঁরা যুক্তি ও সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চান। তাঁরা পাখির আকৃতি-প্রকৃতির আলোকে সেই ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাখ্যাকারেরা যেহেতু শীতপ্রধান ইউরোপের অধিবাসী, সেইহেতু কয়েকটি ব্যাপার তাঁরা কেবল শীতপ্রধান অঞ্চলের আলোকেই ব্যাখ্যা করেছেন, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের পটভূমিকায় আলোচনা করলে সেই সব ব্যাখ্যা যুক্তিসহ হতো কি না, তাঁরা ভেবে দেখেন নি। এই জন্যে এই ব্যাখ্যা নিতান্ত একপেশে ও একঘেয়ে হয়ে গেছে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন এই পৌরাণিকতাবাদ ইউরোপে একটি বিশিষ্ট স্কুল রূপে গড়ে উঠল তখন তার চিন্তাধারা ভারতবর্ষের মানুষকেও প্রভাবিত করেছিল। অনেকেই পৌরাণিক জগতের অসম্ভব ব্যাপারকে যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে বুঝতে চাইলেন, এবং তার মধ্যে প্রাকৃত জগতের সত্যকেই রূপকের আড়ালে প্রতিফলিত বলে মনে করলেন। Max Muller এবং Gubernatis এই দুজন পৌরাণিকতাবাদীর নাম এ বিষয়ে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি ও দুর্বলতার দিক হলো—এঁদের

'মুক্তি' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরাণকে ও লোকচারণা (Folk-lore)-কে অবলম্বন করে তুলনাত্মক ভঙ্গীতে অগ্রসর হলেও তাতে নৃ-তত্ত্ব কোনো ভূমিকা নেয় নি, ফলে এই রূপক ব্যাখ্যা বহুলাংশে ভিত্তিবিহীন হয়ে পড়েছে এবং এতে সাহিত্যিক দিক প্রাধান্য লাভ করায় কল্পনার অবাধ প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। তাতে ব্যক্তিগত কল্পনার ছোপও লেগেছে।

Andrew Lang ম্যাক্সমূলারের এই মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনিই নৃ-তত্ত্বের আলোকে, একটি objective দৃষ্টি নিয়ে সে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। নৃতত্ত্বের আলোকে, সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে Lang যে বিজ্ঞান বোধের ধারার সৃষ্টি করলেন, পৌরাণিক সাহিত্য ও লোকসাহিত্যকে নূতনতর দৃষ্টিতে দেখবার তাই হলো এক দৃষ্টিকোণ। এরই ফলে, গণিতের আলোকেও পৌরাণিক ব্যাপারকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা গেল। যোগেশচন্দ্র রায়-বিদ্যানিধির নাম প্রসঙ্গত এ বিষয়ে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' (চৈত্র, ১৩৬১) নামে বিদ্যানিধি মশাইয়ের গ্রন্থটির মন্তব্য এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। তাঁর কয়েকটি মন্তব্য এই:

"ঋগ্‌বেদে সোম দুইটি। একটি চন্দ্র দ্যুলোকে থাকেন, অপরটি এক ওষধি, ভূলোকে থাকে। ঋগ্‌বেদে এই দুই সোমের বর্ণনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ... ঋগ্‌বেদের বহুস্থানে আছে, এক শ্যেন পক্ষী উন্নত দ্যুলোক হইতে ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সোম আনিয়াছিল। (১. ৮০. ২. ; ৩. ৪৩. ৭; ৪. ১৮. ২৩ ; ৪. ২৬. ৬ ; ৯ ৬৮. ২. ; ১০. ১৪৪ ৪)...।

"প্রতিদিনের সূর্যে লক্ষণীয় কিছুই নাই। আজ যেমন, পাঁচদিন পরেও তেমন দেখা যায়। কিন্তু চন্দ্র সেরূপ নয়। এই কারণে চন্দ্র এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল ·· ঋষিগণ দেখিলেন, চন্দ্রের পর্ব (অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) গণিয়াও বৎসরের পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারা যায়। বৎসরে বারো চান্দ্রমাস; প্রতি চান্দ্রমাসে দুই পক্ষ, বৎসরে ২৪ পক্ষ। শ্যেন পক্ষী এই চতুর্বিংশতী পক্ষ বিশিষ্ট বর্ষপক্ষী। শ্যেনপক্ষী ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম আনিয়াছিল; অর্থাৎ এক বর্ষাঋতুর আরম্ভের ২৪ পক্ষ পরে দ্বিতীয় বর্ষাঋতু আসে।

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই তথ্য উপাখ্যানের আকার পাইয়াছে (১. ৯. ৫)। রাজা সোম গন্ধর্বগণের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ সোম পাইতে ইচ্ছা করিলে বাগদেবী বলিলেন, "গন্ধর্বগণ স্ত্রী-কামুক; আমাকেই স্ত্রী করিয়া সোমের মূল্য স্বরূপ কর।

দেবগণ কহিলেন, "তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কিরূপে থাকিব?" বাগদেবী বলিলেন, "আমা দ্বারা সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদের প্রয়োজন হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট পুনরাগত হইব।" শতপথ ব্রাহ্মণে (১১.৭ ২,৮) গায়ত্রী পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া দ্যুলোক হইতে সোম আনিয়াছিলেন (গায়ত্রী ছন্দের ২৪ অক্ষর)।

"ঋগ্বেদের আর এক স্থানে ৪. ২৭. ৩, ৪) শ্যেন পক্ষীদ্বারা সোম আহরণে এক উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। শ্যেন পক্ষী দ্যুলোক হইতে সোম আহরণ করিয়া আনিতেছিল। সোম-রক্ষক কৃশানু তাহা দেখিতে পাইয়া ধনুকে জ্যা-রোপণ পূর্বক শ্যেনের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে প্রহৃত পক্ষীর একটি পক্ষ পতিত হইল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩.১ .২ এই উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্নাকারে আছে। দেবগণ গায়ত্রীকে বলিলেন, "তুমি আমাদের নিকট সোম আনয়ন কর।" তদনুসারে গায়ত্রী উঠিয়া সোম-রক্ষকগণকে ভয় দেখাইয়া পদদ্বয় ও মুখ দ্বারা রাজা সোমকে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিলেন। তখন কৃশানু নামক সোমরক্ষক গায়ত্রীর পশ্চাৎ বাণ মোচন করিয়া তাঁহার বামপদের নখ ছিঁড়িয়া দিলেন। সেই নখ শল্যক হইল। সেইজন্য শল্যক নখের মত তীক্ষ্ন রোমযুক্ত।

"একদা ইন্দ্র মূলা নক্ষত্রে নমুচি বধ করিয়াছিলেন। সেদিন অমাবস্যা। একদিন কি দুইদিন পরে এক কলা চন্দ্র শ্রবণা নক্ষত্রের দক্ষিণে, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের উত্তরে শ্রবণা নক্ষত্র পাইতেছি। বিষ্ণু শ্রবণার দেবতা। ঋগেদে শ্রবণা নাম নাই, ঋষিগণ শ্রবণা নক্ষত্রে শ্যেনপক্ষী দেখিতেন। শ্যেনপক্ষী পুরাণে গরুড়। ঋগ্বেদে ইহার নাম গরুত্মান্ ও সুপর্ণ। ফাল্গুন মাসে ভোররাত্রে শ্রবণা উঠিতে দেখা যায়। পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বে শীত ঋতুতে উঠিতে দেখা যাইত। বোধ হয় আরও পূর্বকালে শ্যেন পক্ষীর উত্তরস্থ সরস্বতী দেখিয়া শীতঋতুর আগমন অনুমিত হইত।"—পৃ: ১১.

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্যেনের রূপ কহিসেবে আমরা সূর্য ও চাঁদকে পেয়েছি। বর্তমান পরিচ্ছেদে শ্যেনকে বৎসররূপে পাওয়া গেল। বৎসর রূপে শ্যেনকে নির্দেশ করবার মধ্যেই এক বিশেষ মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। বৎসর গণনার মধ্যে এক গাণিতিক দিক আছে, কয়েক হাজার বছর আগে শীত-গ্রীষ্মের সূচনা কোন্ নক্ষত্র দ্বারা হতো, আজ গণিত ছাড়া তা নির্দেশ করবার কোন পন্থা নেই। ইন্দ্রের নমুচি বধের দিন অমাবস্যা ধরে নিয়ে, শ্যেনকে শ্রবণা রূপে নির্দেশ করা এবং শ্যেনের পক্ষ ছিন্ন করা অর্থে এককলা চন্দ্রের প্রকাশ রূপে গ্রহণ করার পশ্চাতে জ্যোতিষ বিদ্যার দিক ধরা পড়ে। "বিগঙ্গার নিকটস্থ কিরাত তারা ধরিয়া

কাল-গণনা করা গিয়াছে।" বেদে যেহেতু শ্রবণা নক্ষত্রের নাম নেই, অথচ শ্রবণা নক্ষত্রেই শ্যেনকে ঋষিগণ দেখেছিলেন, অতএব ব্যাপারটি বেদের পরবর্তীকালের। পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে শ্যেন পক্ষীর উত্তরবস্থ সরস্বতীর অবস্থান দেখে কি ভাবে শীতঋতুর আগমন অনুমিত হতো, যোগেশচন্দ্র তার গাণিতিক হিসেব করেছেন।

একই পাখি দুই ভিন্ন 'স্কুল'-এর চিন্তার ফলে, দুই ভিন্নরূপে প্রতিফলিত হতে পারে, তারই তুলনাত্মক দিকটি এখানে এভাবে প্রদর্শিত হলো ॥

অলংকার হিসেবে 'রূপক' (Metaphor) হলো উপমান ও উপমেয়ের অভেদ বা অভিন্নতার ফল। সাহিত্য হিসেবে 'রূপক' (Allegory)-কেও এই একই দৃষ্টিতে দেখা চলে : কাহিনী ও তত্ত্ব এখানে উপমেয়, এবং উভয়ের অভেদ প্রদর্শন এখানেও অভিপ্রেত। Metaphor হিসেবেই দেখা যাক, আর Allegory হিসেবেই দেখা যাক, দুই ভিন্ন বস্তুর অভিন্নতা ও একাত্মতা প্রদর্শন উভয় ক্ষেত্রেরই লক্ষ্য। Metap' or এবং Allegory-র মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর? Metaphor আমার মতে তত্ত্বময় থিওরি, তা নিশ্ছিদ্র ও ব্যাখ্যাবিহীন। Al'egory সেই তুলনায় ব্যাখ্যাময় ও বিস্তৃত এবং সেই কারণেই এটিকেই আমার প্রাচীনতর বলে মনে হয়। Allego'y-তে উপমান-উপমেয় অর্থাৎ কাহিনী ও তত্ত্ব পাশা-পাশি চলে, একটিকে অপরটি থেকে সহজেই যে কোনো স্তরে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়া যায়, এখানে নীর ও ক্ষীর যুগপৎ বর্তমান। কিন্তু Metaprho-এর মধ্যে কি করে উপমান-উপমেয় একাত্ম-অভিন্ন হয়ে গেল তা অপ্রদর্শিত। এ যেন কারণ না দর্শিয়ে তার ফলটুকু দেখানো মাত্র। এখানে তাই বিকাশ নেই, এক বারেই চরম স্তর বিকশিত। নীরাংশ পরিত্যক্ত হয়ে অপরিহার্য ক্ষীরাংশটুকু মাত্র উল্লেখ করা। একটি বিশেষ স্তর অতিক্রম না করলে এই স্তরে এসে পেঁছানো অসম্ভব। এজন্যেই Metaphor পরবর্তী স্তরের বস্তু।

Metaphor-এর সঙ্গেSymbol-এর একটি অন্বয় যোগবন্ধন আমি লক্ষ করেছি। Symobl বা সংকেত-প্রতীকের মূল কথা হলো : একটি বস্তু বা ভাবনার সঙ্গে অন্য একটি বস্তু বা ভাবনার অভেদ একাত্মতা লক্ষ করে যেন তৃতীয় আর একটি দিককে গ্রহণ করা। Mcataphor-এরও মূল কথা সেই সাদৃশ্য-বোধই। কিন্তু Metaphor-এর মধ্যে যেমন দু'টি দিকের যুক্তিগ্রাহ্য সাদৃশ্যের দিক আছে, Symbol-এর ক্ষেত্রে তেমন.

কোনো যুক্তিগ্রাহ্য, সহজ সংলক্ষ্য সাদৃশ্য নাই। এখানেই Metaphor থেকে symbol ভিন্ন ও গূঢ়তর পথে চলে গেল।

symbol একটি বস্তু বা ভাবনার বদলে আর একটি বস্তু বা ভাবনা হলেও দু'য়ের মধ্যে যখন সহজগ্রাহ্য বাহ্য সাদৃশ্য নেই, তখন তাকে একটি গূঢ়, গভীর, রহস্যময় পদার্থ বলে নির্দেশিত করাই বাঞ্ছনীয় বুঝি। পাখি উড়ে চলে, অতএব তা গতির প্রতীক, কিন্তু সব পাখিকেই কেন সেই গতিব প্রতীক বলে ভাবা হয় নি? 'বলাকা' কাব্যে 'হংস বলাকা' গতির প্রতীক; কিন্তু গানে কেন কবি বলেন, সেই বলাকা-ই তাঁর বেদনার সাথী? কেন কোন বিশেষ পাখি শুভসূচনাকারী বলে কল্যাণের প্রতীক, কেন কোনটি বা অকল্যাণের প্রতীক? গূঢ়-গভীর গোপন রহস্যময়তাকে প্রতীকের পশ্চাতে স্বীকাব করে নিতেই হয়। এবং এই গূঢ়-গভীর-গোপন-রহস্যময়তাকে লোকমানস একভাবে গ্রহণ করে, অভিজাত বা মার্জিত মানস অপরভাবে গ্রহণ করে। মার্জিত মানস ভুঁই ফোড় কিছু নয়, তা লোকমানসেরই বিবর্তিত একটি স্তর। এবং সেই বিবর্তন মানে লোকমানস অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরকে একেবারে বর্জন করাও নয়। লোকমানসেরই সূক্ষ্মতর উন্নততর, ক্রমবিবর্তিত স্তর হলো মার্জিত মানস; সুতরাং সেই বিবর্তনের মধ্যে কোন কোন স্থলে, আদি ও মূলস্তরের মনোভঙ্গি কিছু কিছু সঞ্জীবিত থেকেও যায়। এই ভাবে ভেবে দেখলে, প্রতীকতার ক্ষেত্রেও কখনো কখনো লোকমানস ও মার্জিত মানসে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পাখিকে অবলম্বন করে গঠিত প্রতীকতা সম্পর্কেও একথা খাটে।

এই জন্যেই মার্জিতমানস কোন প্রতীক গ্রহণ করবার বেলায় বহুশ শিক্ষা যুক্তি ও বাস্তবতার বোধের পরিচয় দিলেও, বহুশই আবার দেয়ও না; তখন অমার্জিত লোকমানসেব যুক্তিহীন গূঢ়-গভীর-গোপন-রহস্যময়তাকে অনুসরণ করেই প্রতীক রচনা করে থাকে। মোটকথা, শিক্ষিত সমাজ যৌক্তিক ও অযৌক্তিক, সচেতন ও অসচেতন দু' দিকের ফলেই প্রতীক রচনা ও নির্বাচন করে নেয়; আর লোকমানস-অসচেতন ও অযৌক্তিক ভাবে, কেবল এই একভাবেই প্রতীক নির্বাচন করে থাকে।

দুই মানসের প্রতীকের বিষয়গুলিতেও তফাত আছে। লোকমানসের প্রতীকগুলি জীবনের সহজ, স্থূল এবং চিরকালীন বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়; অভিজাত মানস উচ্চ, সূক্ষ্ম ও ভাবনাময় বিষয়কে অবলম্বন করে প্রতীক রচনা করে।

যাকে বলেছি "অসচেতন ও অযৌক্তিক" ভাবে প্রতীক রচনা করা, সেটাই হলো গূঢ়-গোপন রহস্যভরা কারণের দিক; এটার মধ্যেই আছে ম্যাজিক বা যাদু ধর্ম। এর মধ্যে একটা অংশে কিছু কার্য-কারণাত্মকতার যৌক্তিকতা মেলে: যেমন, কয়েকবার প্যাঁচা ডাকার কারণে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবারের লোক মারা গেল, অতএব প্যাঁচা মরণের প্রতীক হলো। বলা অনাবশ্যক, এই কার্য কারণাত্মক দিককে নেহাৎ কাকতালীয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তথাপি, এটাই একটা 'যুক্তি' হিসাবে গৃহীত হয়ে গেছে।

ওপরের এই আলোচনা থেকে প্রতীকের তিনটি রকম ফের দেখা যেতে পারে; ১. দুই বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ আইডিয়া এবং তার বহিঃপ্রকাশের রূপের মধ্যে যেখানে সহজ

সংলক্ষ্য সাদৃশ্য প্রকট ; ২. যেখানে তথাকথিত "কার্য কারণাত্মক" সম্পর্ক বিদ্যমান ; ৩. একটি গূঢ়-গোপন-গভীর-রহস্যানুভূতি ও যাদুবোধের ফল হিসাবে রচিত প্রতীক। এই তৃতীয় দিকটিই প্রতীকের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার্য।

'রূপক'কে আমি প্রতীকের প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক স্তর বলে 'রূপক' (Allegory) এবং প্রতীকের মাঝখানের স্তর বলতে আমি Metaphor কে বুঝিয়েছি।

"রূপক' থেকে পাখি কি করে প্রতীকে পরিণত হয়, তার দৃষ্টান্ত প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক জগৎ থেকেই আহরণ করা যায়। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাখির সম্পর্কিত নানা আখ্যান উপাখ্যান কি করে চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত্রি, মেঘ-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে, তা আমরা লক্ষ করেছি। এরই ফলে, পরবর্তী কালে, ওই সব কাহিনী মানুষের মনে সংস্কার রূপে গেঁথে যাওয়ায়, কাহিনীগুলো obscure হয়ে তার তত্ত্বটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তখন ওই তত্ত্বটি পাখির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, পাখিটি তত্ত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। এমনি করেই Solar bird, Lunar bird, Rain bird, Thunder bird প্রভৃতির নামোদ্ভব ঘটে। এক একটি পাখি প্রাকৃতিক জগতের এক একটি দিকের প্রতীক হয়েছে এমন করেই। 'বর্ষাদূত' বা 'বসন্তদূত' হয়ে বর্ষা বসন্তের প্রতীক হয়ে গেছে, যেমন ডাহুক বা কোকিল। গ্রীষ্মের প্রতীক আবাবিল (Swallow) গৃহীত হয়েছে বলেই প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে : 'one swallow doesn't make a summer'. চিলকে প্রাচীন গ্রীসে বসন্তের দূত বলা হত, কারণ চিল ওই সময়তেই দর্শন দেয়, বসন্তকাল কৃষিকর্মের সূচনা হয়। Aristophanes বলেছেন, চিলই ছিল প্রাচীন গ্রীসের রাজা, চিলই গ্রীকদের প্রণাম করতে শিখিয়েছে ; চিলই যদি বসন্তের প্রতীক হয় তবে তার থেকে এই কথাগুলো মনে হয় : আমাদের দেশেও বসন্ত ঋতুরাজ বলে কল্পিত। চিল রাজা থেকে দূতের স্তরে অধঃপতিত হয়েছে। কোকিলও বসন্তের দূত বলে কল্পিত। রাজা ও দূতের পরিসঙ্গ অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী-ঘটিত। আজ সেই পৌরাণিক কাহিনী হয় অপ্রচলিত, নয় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু সেই কাহিনীর জের ধরে অবশেষে পাখিরা প্রতীকে পরিণত হয়ে গেছে।

'রূপক'-রূপে পৌরাণিক কাহিনীর অধঃপতন বা অস্পষ্টতা বা অন্য কোন কারণে পরিবর্তন প্রতীকের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনে, যেমন, রোমানদের বিশ্বাসে জুনোর প্রিয় পাখি ময়ূর ; তাই ময়ূরের পালক তাদের কাছে পবিত্র ও কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়েছে, ময়ূর যে জুনোর প্রিয় পাখি সে সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীও রচিত হয়েছে, কিন্তু ইংলন্ডে ময়ূরের পালক অশুভজনক এবং ডাইনীর অঙ্গ বলে বিশ্বাস করা হয়।

এর কারণ নির্ণয় করেছেন J. M. campbell তাঁর একটি প্রবন্ধে (spirit basis of belief and custom : The Indian Antiquary, December 1900) :

"The explanation of the change seems to be that the Peacock feather is one of the pre-christian ornaments on symbols to which wit failed to attach a christian meaning like other properties of its patron Juno, which were not worked into the decoration of the new queen of Heaven, the guardian Peacock eye was degraded to be witch symbol and therfore unlucky" :

এই জন্যেই কোনো দেশে যে পাখি শুভ ঘটনার প্রতীক, অন্য দেশে সেই পাখিই ভিন্ন বস্তু বা অশুভ ঘটনার প্রতীক।

আবার বিভিন্ন দেশে প্রতীকতার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও ঈষৎ পার্থক্যও দেখা যায়। প্রাকৃতিক জগৎ থেকেই দৃষ্টান্ত আহরণ করছি। 'মৈমন সিংহ গীতিকা'র চন্দ্রাবতী পালাতে একটি সূর্যোদয় বর্ণনায় আছে,

আবে করে ঝিলিমিলি সোনার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা॥

অরুণ পাখি রূপে প্রাচীন ভারতে বহুবার কথিত হয়েছে। হলুদ রঙের পাখিও আছে। তাহলে এই বর্ণনা থেকে পরোক্ষে পাই: অরুণ অর্থাৎ পূর্বদিক পাখি রূপে কল্পিত হওয়ায়, হলুদ পাখিকে পূর্বদিকের প্রতীক বলা হয়েছে। যদিও ব্যাপারটি খুব একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এই অস্পষ্টতা কাটানো যায়, যখন দেখি চীনেও অনুরূপ প্রতীক প্রচলিত আছে। Richard Temple বলেছেন, (Colour symbolism : The Indian Antiquary : April 1923) এক একটি দেশ এক একটি দিককে এক একটি রঙ দ্বারা প্রতীকিত করে। চীন দেশে দক্ষিণ দিককে বলা হয় 'লাল পাখি' অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের প্রতীক 'লাল পাখি'।

শ্যেন বা ঈগলকে সূর্যের প্রতীক হতে বারেবারে দেখা গেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এই পাখিদের খুব উঁচুতে উঠবার ক্ষমতা, তীক্ষ্ন নখর ও গতির দ্রুততা সূর্যের প্রতীক হতে সাহায্য করেছে। ঈজিপ্টে শ্যেন সুপ্রাচীনকাল থেকেই সূর্যের প্রতীক বলে গণিত হয়। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান উপজাতিরা ঈগলকে সূর্যের প্রতীক বলে মনে করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে এই সব শক্তিশালী পাখিই সূর্যের প্রতীক হয়, তা নয়। অনেক সময় ক্ষুদ্র ও কোমল প্রকৃতির পাখিও সূর্যের প্রতীক হতে পারে। শক্তিশালী পাখী সূর্যের প্রতীক হবার মধ্যে কোন বিস্ময় বা রহস্য নেই, যা আছে ক্ষুদ্র ও কোমল প্রকৃতির পাখির বেলায়।

পাখি কেবল নিঃসঙ্গ রূপে, একা-একাই প্রতীকে পরিণত হয় না। অনেক সময় পাখির সঙ্গে অন্য বস্তু বা চিহ্ন বা প্রাণী সহচরী উপাদান রূপে বর্তমান থেকে এক ধরনের প্রতীকের সৃষ্টি করে। এই ধরনের প্রতীককে বলা যায়, 'সংমিশ্রিত প্রতীক' বা 'যৌগিক প্রতীক'; ইংরেজীতে যাকে বলে 'Composite symbol', এই ধরনের

প্রতীকে উপাদান হিসেবে একাধিক বস্তু থাকে বলেই এই নাম হয়েছে। পাখির সহচারী উপাদানরূপে নানা প্রাণী (যেমন—হরিণ, মাছ ও সাপ), ফুল (যেমন—পদ্ম), নানা চিহ্ন (যেমন—চক্র, স্বস্তিকা) ইত্যাদি মেলে। পদ্মের ওপরে বসা হাঁস ভারতীয় জীবনে এক পবিত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, কিন্তু তার মূল অন্যত্র। সকালবেলায় সূর্য থাকে যেন আধ ফোটা একটি কুঁড়ি, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শতদলের মতো তার রশ্মি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সূর্যই পদ্ম। হাঁস ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যেই কেবল সূর্যের প্রতীক নয়, গোটা পৃথিবীতেই তাই। ইংলণ্ডে Michael man দিবসে হাঁস খাবার প্রথা আছে। আসলে এসব প্রথা খৃষ্টধর্ম প্রচারের বহু পূর্বেকার প্রথা, বিবিধ পশু প্রাণীকে যখন এক একটি দেবতার কাছে বলি দেওয়া হতো। খাওয়া বলি দেবারই নামান্তর। হাঁস জলচারী প্রাণী, জল মাটিলগ্ন, এবং পৃথিবীর স্তন স্বরূপা; এই জন্যে হাঁস মাতা বসুন্ধরা (যেমন—Berchta)-এর প্রতীক। জলদেবীরা জলে বাস করে, হাঁসও তাই, সেই সূত্রে হাঁস দেবীত্ব অর্জন করেছিল। দেবীরাই শক্তির আধাররূপে কল্পিত। এই জন্য পুংশক্তির প্রতীক সৌর-শক্তির উপাসনার পূর্বেই দেবী শক্তির উপাসনা প্রবর্তিত হয়, হাঁসও সেই সূত্রে দেবীরূপে পূজিতা হতে থাকে। পরবর্তীকালে মাতৃশক্তি বা স্ত্রী-শক্তি উপাসনার পরিবর্তে পুংশক্তিরূপে সূর্যের উপাসনা প্রবর্তিত হলে হাঁস তখন সূর্যের প্রতীকে পরিণত হয়। হাঁসের সঙ্গে সৌরজগতের ও জ্যোতির্লোকের যোগাযোগ আছে বলেই বিভিন্ন অয়নের সময় হাঁস হত্যা করা হয়। প্রাচীন কোরিয়াবাসীরা এবং কাইটানরা (kitans), সূর্যের দক্ষিণায়ণের দিন (২১ বা ২২শে ডিসেম্বর) একটি বন্য হাঁস হত্যাপূর্বক মদের সঙ্গে তার রক্ত মিশিয়ে পান করত। চীনের শি-চিয়াং জেলার লোকেরা আবার সূর্যের উত্তরায়নের দিন (২১শে জুন) হাঁস হত্যাপূর্বক রোস্ট করে পরস্পরকে উপহার দিত।

সুতরাং পদ্মের উপরে বসা হাঁসের মূর্তি সূর্যেরই প্রতীক। 'composite symbol' রূপে পাখির সঙ্গে স্বস্তিকা ও চক্র চিহ্ন পৃথিবীর অনেক দেশেই মেলে। পাখি অর্থে এখানে হাঁস, স্বস্তিকা ও চক্রসহ হাঁস জাতীয় পাখিও সূর্যের প্রতীক। ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর রহুস্থানে স্বস্তিকা কোন্ কোন্ প্রতীকার্থে গৃহীত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে জে. জে. মোদী আলোচনা করেছেন (The swastika as a symbol in India and elsewhere : Journal of the anthropolgical society of Bombay, Vol XIV No 5, p.p. 682-695)। স্বস্তিকা চিহ্ন "a flying. bird' বলে কথিত হয়। তেমনি 'চক্র'-ও সূর্য। চলন্ত সূর্যকে "winged disk" সুপ্রাচীন কাল থেকে মিশরে কল্পনা করে আসা হয়েছে। 'স্বস্তিকা' ও 'চক্র' দুই-ই সূর্য উপাসনার চিহ্ন।

সর্বমিশ্রিত প্রতীক হিসেবে হাঁস এবং হাঁস জাতীয় পাখির সঙ্গে প্রাণীদের মধ্যে মেলে সাপ, মাছ ও হরিণ মাছ জলচারী প্রাণী, হাঁসও তাই। উভয়েই প্রচুর

পরিমাণে ডিম পাড়ে। প্রাচুর্য ও উর্বরতার প্রতীক দুটি প্রাণীই। জলচারী প্রাণী বলেই জলদেবীর দেবীত্ব ও শক্তি যেমন হাঁস প্রাপ্ত হয়েছে, মাছেও তা সঞ্চারিত। উপরন্তু মাছ জলতলে অদৃশ্য বলে তার শক্তি আরো রহস্যময়, বিবরে লুকোনো সাপের মতো। জলের গভীরে থাকে বলেই ভূগর্ভের নিকটবর্তী বলে মাছ কল্পিত। এই জন্যে বসুন্ধরার সঙ্গে তার যোগ নিবিড়তর। অপরদিকে, পাখি আকাশের উচ্চলোকের, মাছ মর্ত্যের গভীরতর প্রদেশের, পাখির সঙ্গে মাছের উল্লেখ তাই স্বর্গ-মর্তের একত্র রূপের প্রতীক। সাপের প্রসঙ্গেও এই একই কথা বলা যায়। পাখির সঙ্গে সাপের উল্লেখ বৈজ্ঞানিকভাবেও সমর্থিত, কেননা, জীববিজ্ঞানীরা বলেন, সাপের থেকেই পাখির উদ্ভব হয়েছে ; উভয়েই অণ্ডজ, উভয়েই উভয়ের খাদ্য-খাদক। সাপের সঙ্গে জল 'Composite symbol' হিসেবে পাওয়া যাবেই যাবে। সাপ, পাখি, মাছ, জল এইভাবে এক হয়ে যায়। বহু দেশেই বিশ্বাস আছে সাপের মাংস খেলে পাখির ভাষা বোঝা যায়। ঋগ্বেদের 'অহি' মেঘ বা জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাপের সঙ্গে সূর্যের অসংগতি লক্ষনীয়। পাখি ও সাপ মিলিতভাবে সূর্যের প্রতীক।

পাখির আকৃতি-প্রকৃতি তার কণ্ঠস্বর ও কর্কশতা, উড্ডয়ন ভংগি ও উপবেশন ভঙ্গি সবই এক একটি প্রতীকের জন্ম দিয়েছে।

খঞ্জনের গলায় কালোর সঙ্গে সাদা ফোঁটা থাকলে তা নৈরাশ্যের প্রতীক বলে বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'-য় কথিত হয়েছে। সেখানেই আরো বলা হয়েছে, হলুদ রঙের খঞ্জন ঝামেলা ও দুর্ভাগ্যের প্রতীকসূচক। এখানে কালো ও হলুদ রঙ দুর্ভাগ্যের প্রতীক। খঞ্জনের গায়ের সাদা এবং কালো—দুই বিপরীত রঙ এখানে ভালো মন্দ এই দুই বিপরীত দিককে নির্দেশ করেছে। ঠিক যেমন ম্যাগপাইয়ের গায়ের সাদা কালো দাগ, ময়ূরের নীল রঙ আকাশের নীল বর্ণের সঙ্গে একাত্ম বলে তা উচ্চ ও গভীর মানসের প্রতীক বলে P. Sama Rao তাঁর একটি প্রবন্ধে (symbolism in Indian Art. : qutly, Journal of the mythic society of Bangalore Vol. XXXIV) জানিয়েছেন, বাকের কালো রঙ অনেকের কাছেই অন্ধকার রাত্রির প্রতীক।

শ্বেতবর্ণ পৃথিবীর সর্বত্রই শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক বলে গৃহীত। বিদ্যা পবিত্র বস্তু, এইজন্যে বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বাহন শ্বেত হংস। শুভ্রবর্ণ আধ্যাত্মিক পবিত্রতারও নির্দেশক, এই জন্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় শুভ্র হংস সর্বত্র সম্মানীয়। খ্রীষ্টান শিল্প ও নীতিকথায় সাদা ঘুঘু (এবং কপোত) সর্বত্র পবিত্রতার প্রতীক রূপে-বর্ণিত হয়েছে। এই জন্যেই খৃষ্ট পুরাণে ঘুঘু (কপোত) সম্পর্কে নানা

বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। শয়তান নিজেকে যে কোন প্রাণীতে বা আকৃতিতে পরিণত করতে পারে, কিন্তু সে কখনোই ঘুঘুর রূপ ধারণ করতে পারে না। ভগবান যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করতে পারেন খ্রীষ্টানরা তা বিশ্বাস করেন (Mathew, III, 16) যীশুর মা কুমারী মেরিকে যেদিন (২৫শে মার্চ) সংবাদ দেওয়া হয়, তিনি মা হবেন, সেই Announciation-এর দিন ঈশ্বর মেরির কাছে একটি ঘুঘুর রূপ ধরেই এসেছিলেন, কপোত-ঘুঘুর, শ্বেতবর্ণই এই সব বিশ্বাসের মূল কারণ।

চিলের প্রসঙ্গে এই বর্ণ সচেতনতা প্রকটতর হয়ে ওঠে। 'শঙ্খ চিল'-এর গাত্র বর্ণ শঙ্খের মতোই শুভ্র; ধবল বলে একে 'ধোবিয়া চিল'-ও বলা হয়। অথচ, মেটে রঙের সাধারণ চিল যাকে 'গোদা চিল' বলে, তাকে অনাদরে 'ডোমচিল' আখ্যা দেওয়া হয়। শঙ্খ চিলের শুভ্রতা পবিত্রতার দ্যোতনা করে বলেই, এর নামান্তর 'চণ্ডী চিল' বা 'শঙ্কর চিল', বা 'ঠাকুর চিল'। এর উদ্দেশে প্রণামও নিবেদিত হয়। ছড়ায় গোদা চিলের প্রতি লাথিও মারা হয়েছে।

কিন্তু শ্বেতবর্ণের মুরগী ভিন্ন প্রতীককে নির্দেশ করে। মুরগীর সঙ্গে সূর্য-উপাসনা গভীরভাবে জড়িত বলে লাল বর্ণের মুরগী পাশ্চাত্যদেশে উদীয়মান সূর্যের প্রতীক। শীতপ্রধান দেশে তুষারের প্রতীক রূপেও সাদা মুরগীকে দেখা যায়। লাল মুরগী আগুনেরও প্রতীক। তেমনি কালো মুরগী দৈত্য দানবের প্রতীক। হাঙ্গেরীতে দৈত্য-দানবকে তুষ্ট করতে তাই কালো মুরগীই উৎসর্গ করা হয়।

শুক পাখির সবুজ বর্ণ চাঁদ ও গাছের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি 'Composite symbol' রূপে কিভাবে লিঙ্গের প্রতীক হয়ে উঠেছে একটু পরেই সে আলোচনা করেছি।

একটি ভিয়েতনামী Aetiological Myth-এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি (The stark and the shrimp, New Delhi, 1959 p. 5.7. Do Vang Ly) সারসের গায়ের সাদা রঙ কোন সৎ বা পবিত্র কাজের দ্যোতক নয়। আগে সব পাখিরাই ছিল সাদা। তারপর একদিন সব পাখি একে একে স্বর্গে গিয়ে নিজস্ব রঙ লাগিয়ে প্রত্যেকে পৃথক হয়ে গেল। রঙ দেওয়া যখন শেষ, তখন এলো সারস, সে স্বীকার করল, চিংড়ি জাতীয় মাছ আহরণে সে ব্যস্ত ছিল বলেই আসতে পারে নি। মাছ চুরির অপরাধে সারসকে কোনো রঙ দেওয়া হলো না, সে সাদাই রইলো, যাতে স্পষ্ট করে সহজেই চোরকে চেনা যায়। এখানে সাদা রঙ নিন্দার প্রতীক।

সাধারণতঃ দেখা যায় গায়ক পাখিরা সকলেই, কি ভারতবর্ষে কি ইউরোপে, আনন্দময়তার প্রতীক। অগায়ক পাখি (যেমন, কাক, পেঁচা ইত্যাদি) সর্বপ্রকার অকল্যাণের প্রতীক। ভারতবর্ষে সুকণ্ঠের প্রতীক হলো কোকিল, কোকিলের পঞ্চম স্বর প্রসিদ্ধ। এই জন্য সুকণ্ঠ ব্যক্তিকে 'কোকিল-কণ্ঠ' বলা হয়। কর্কশ কণ্ঠের ব্যক্তিকে সুকণ্ঠ হবার জন্যে ব্যঙ্গ করে বলা হয়—কোকিল পুড়িয়ে খেতে। সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী তাই কোথাও কোথাও 'কোকিল-বাহিনী' বা 'কোকিলারূঢ়া' ;

P. sama Roo তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধতে বলেছেন, বর্ষাকালে মেঘোদয়ে ময়ূরের কেকাধ্বনি যেন ব্যক্তিগত বন্ধন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ক্রন্দন।

কানাড়ী ও তেলেগু ভাষী দক্ষিণ ভারতে গরুড়কে অসীমের প্রতীক বলে মনে করা হয়। যেহেতু এ পাখি আকাশে চক্রাকারে ওড়ে এবং চক্র যেহেতু আদি অন্তহীন ও চলমানতার প্রতীক।

কোকিল সুকণ্ঠের প্রতীক হলেও, অপর একদিক থেকে অকৃতজ্ঞতার প্রতীক বলে মনে করা হয়। সে কাকের আলয়ে লালিত-পালিত হয়ে স্বাবলম্বী হবার পর নির্মম ভাবে নীড় বর্জন করে চলে যায়। 'বসন্তের কোকিল' এই ইডিয়ামটিও লক্ষণীয়। সুখেই যে পাশে থাকে, দুঃখে নয়, তার প্রতি এটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। সারিকা-ও অকৃতজ্ঞতার প্রতীক। পোষা সারো (সারিকা) চোখে ঠোকরায়। অর্থাৎ সুযোগ পেলেই সারিকা নাকি তার পালন কর্তার চোখ ঠুকরে দেয়।

ময়ূরকে অমরতার প্রতীক বলা হয়। এর পেছনে একটি প্রকৃত এবং একটি কাল্পনিক বিশ্বাস আছে, প্রতি শীতে ময়ূরেব পালক খসে পড়ে, যেন তার সাময়িক ভাবে মৃত্যু হয়। বর্ষায় আবাব তা গজিয়ে ওঠে, যেন তার পুনর্জন্ম ঘটে। এই নৈসর্গিক সত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে একটি কাল্পনিক বিশ্বাস, সঙ্গমের মাধ্যমে ময়ূরের বংশ বিস্তার নাকি ঘটে না ; কারও বিশ্বাস, পুরুষ ময়ূরের ভূপতিত রেতঃ পান করে ময়ূরী গর্ভধারণ করে ; কাবো বিশ্বাস, ময়ূরের অশ্রু পান করে ময়ূরী গর্ভবতী হয়। যেহেতু সাধারণ প্রক্রিয়ায় ময়ূরের বংশ বিস্তার ঘটে না বলে বিশ্বাস, সেই হেতু সহজেই ময়ূর অমরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। Angelo De gubernatis তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি তথ্য দিয়েছেন। ময়ূর অমর বলেই তার আত্মা বিভিন্ন প্রতিভাধব ব্যক্তির মধ্য দিয়ে যুগে যুগে সঞ্জীবিত আছে, "It is said of Pythagoras that he himself to have once been a peacock, that the peacock's soul passed into Euphordos, that of Euphordos into Homer, and that of Homer into him. It was also alleged that out of him the soul of the ancient peacock passed into the poet Ennius...' p. 372.

কোকিলকেও অনেকে অমরতার প্রতীক বলে মনে করেন বিশ্বাস করা হয়, একই কোকিল প্রতিবৎসর একই সময়ে এবং একই গাছে ডেকে থাকে, কোকিলের মরণ নেই। এরও পেছনে একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস কার্যকরী হয়েছে। কোকিলকে অনেকেই যাযাবর পাখি বলে মনে করে থাকেন ; যার জন্যে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কোকিলকে বিদেশ যাত্রাকারী বলে মনে করা হয়, শীতে পালক খসানো ময়ূরের মতো সাময়িকভাবে যেন তার মৃত্যু হয়। বসন্ত আসতেই সে ডেকে ওঠে এবং দেখা দেয়, যেন আর পুনর্জন্ম ঘটে।

কাক বা ভূশণ্ডীর কাক সম্পর্কেও এই বিশ্বাস থাকায় তাকে অমরতার প্রতীক করা হয়েছে। একই ভূশণ্ডীর কাক আজও নাকি জীবিত আছে।

পাখির পালকও প্রতীকের জন্ম দিয়েছে। পাখির পালক একটি মূল দণ্ডের দুপাশে, সমভাবে, সামঞ্জস্য রেখে গঠিত হয়; ন্যায়নীতির মূলকথা সমতা ও নিরপেক্ষতা। এই জন্যে ঈজিপ্টে ন্যায়-নীতির প্রতীক হলো পাখির পালক। ঈজিপ্টে সকল জ্ঞান বিদ্যার দেবতা হলেন 'থথ্' (Thoth বা Tehuti)। তাঁর স্ত্রীর নাম, Maat ; এঁর মাথায় থাকে অস্ট্রিচ পাখিক পালক। Lewis Spence তাঁর 'Myths of ancient Egypt' বইতে লিখেছেন ; "···it is likely that the equal sideness of the feather, its divison into halves, rendered it a fitting symbol of balance or equilibrium. Among the Maya of central America the feather denoted the plural number, The word, we are told, indicates "that which is straight." The name Maat with the ancient Egyptians came to imply anything which was true, genuine, or real. Thus the goddess was the personification of law, order, and truth.''—p. 108—109.

ময়ূরের পালক সম্পর্কে বিচিত্র ধারণা বিপরীত প্রতীকের জন্ম দান করেছে। আপন কলাপ বিস্তার করে ময়ূর তার সৌন্দর্য দেখে নিজেই মোহিত হয়ে গর্ব অনুভব করে ; এইজন্যে কলাপ বিস্তারী ময়ূর অহংকারের প্রতীক বলে গণিত হয়েছে। এই জন্যেই ইংরেজীতে বলা হয়, 'As proud as a peacock'. কিন্তু ভারতীয় ভাবনায় ময়ূর ভগবদ্ভক্তির প্রতীক। ভগবদ্দর্শনে ভক্তের মন উন্মুখ হয়ে কলাপের মতো নিজেকে নিবেদন করে দেয়। এই জন্যে 'মন-ময়ূর' পদটির উদ্ভব হয়েছে। মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তরা ময়ূরের নাচনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রত্যক্ষ করতেন।

অনেক পাখিই জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। এই জোড় বন্ধন পাখি সম্পর্কে প্রেমের ধারণাটিকে উচ্চে তুলেছে এবং আদর্শ প্রেমের প্রতীকরূপে পক্ষি-মিথুনকে স্থায়ী পদ দেওয়া হয়েছে। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটির মরণ তাই এতোই শোকাবহ হতে পারে যে, মহাকবি বাল্মীকির কাব্য নির্ঝরের উৎসরূপেও তা পরিগণিত হয়। হংসমিথুন ভারতবর্ষ ও চীনে দাম্পত্য নিষ্ঠার প্রতীকরূপে তাই গৃহীত হয়েছে। বিশেষ এক স্তরের ঘুঘু (the turtle dove) ইংরেজের কাছে প্রেম ও দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক হয়েছে। ঘুঘুনী ঘুঘু মারা যাবার পর কোনো জলাশয় থেকে জলও পান করে না ; কারণ, দুজনের প্রেম এতোই গভীর যে, ঘুঘুনী জল পান করতে গিয়ে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তার মধ্যেই যদি ঘুঘুকে দেখে ফেলে। এই জন্যে নাকি সে আমরণ জল না খেয়ে থাকে। কপোত মিথুনের মধ্যেও প্রেমের গভীরতা পরিলক্ষিত হয় বলে "কপোত-কপোতী সম" দম্পতির কথা বলা হয়। চক্রবাক-চক্রবাকী অর্থাৎ চখা-চখী সারাদিন একত্র বিহার করে, যেন আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা। রাতের বেলায়

এরা পৃথক থাকে ; সারারাত চখা চখীর কাছে আসতে চায়, সে জন্যেই সে ডাকে, যেন বিরহে কাতর হয়ে আর্তনাদ করে। বাস্তবে সত্যিই দেখা যায়, চখা-চখী রাতে পৃথক স্থানে অবস্থান করে।

পাখির তীক্ষ্ম নখর, চঞ্চু ও চীৎকার তার হিংস্রতার দিক ; অপরদিকে তার কোমল পালক ও নয়নাভিরাম দেহবর্ণ মৃদুতার নির্দেশক। এই জন্যে পাখিকে নারীর প্রতীক রূপে লক্ষ করা হয় ; নারীর মধ্যে যেমন হিংস্রতার সঙ্গে কোমলতার মিশ্রণ দেখা যায়। অনেক সময় আপন জুটিকেই পাখি হত্যা করে বলে এই প্রতীকতার জন্ম হয়েছে। দক্ষিণভারতে বিশ্বাস করা হয়, ময়ূরের চলনভঙ্গী 'পদ্মিনী' নারীর চলনভঙ্গীর প্রতীক।

কোনো কোনো পাখি কথা কইতে পারে। যেমন, শুক, তোতা ইত্যাদি। মানবেতর প্রাণী মানবের ভাষায় কথা কইছে, অতএব তা এক বিস্ময়ের বস্তু এবং সেজন্যেই তা প্রিয়। এই জন্যে শুক পাখি প্রিয়-ভাষিকতার প্রতীক। পাখি মাত্রই মানুষের শেখানো বুলি মুখস্ত করে বলে। এই জন্যে 'তোতা পাখি' বলতে নিজস্বতা বিহীন মুখস্ত প্রবণ ব্যক্তিকে বোঝায়।

পাখিকে অবলম্বন করে যে সব প্রতীক এই পর্যন্ত উল্লিখিত হলো, তার সবই পাখির দৈহিক আকৃতি ও মানসিক প্রকৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, এগুলোর পেছনে বাস্তব স্বীকৃতি আছে। সেজন্যেই কার্যকারণের একটি যুক্তিগ্রাহ্য যোগসূত্র এখানে অনুভব করা যায়। দেখে দেখে প্রতীকটির উদ্ভবের কারণ বোঝা যায়। এই জন্যে এর মধ্যে কোনো রহস্যের গভীরতা নেই।

কিন্তু এইবার যে-সব প্রতীকের নামোল্লেখ করব, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনো যুক্তি পাওয়া যাবে না ; পাখির আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে এইসব প্রতীকের সরাসরি কোনো যোগ নেই। যোগ নেই বলেই তার মধ্যে রহস্য ও বিস্ময় আছে, কল্পনা ও সংস্কারের স্থান আছে। বস্তুত এইসব ক্ষেত্রে অভ্যাস, সংস্কার, বিশ্বাস ও কল্পনাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

যেমন : মানুষের জন্ম, মৃত্যু, প্রেম-বিবাহ-যৌনজীবনের প্রতীক রূপে ; বিদ্যা ও বিজ্ঞতার প্রতীক রূপে পাখি ; সোনা-রুপো, ধন-দৌলতের প্রতীকরূপে পাখি। ঊর্বরতার প্রতীক রূপে পাখি। রাজশক্তির প্রতীকরূপে পাখি ইত্যাদি।

মানুষের জন্মের জন্যে দুটি বস্তুর প্রয়োজন : নারীর রজোদর্শন এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয়। রজোদর্শন ও জননেন্দ্রিয় কিভাবে প্রতীকের মধ্যে ধরা পড়ে, তা পশ্চিম মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলার 'কুনবি' সম্প্রদায়ের রজোদর্শনের একটি আনুষ্ঠানিক

গান থেকে বোঝা যায়। গানটির সংগ্রহকর্ত্রী হলেন শ্রীমতী দুর্গা ভগত (Premerilal Ruberty rites of girls in western Maharastra : Man in India : Vol XXIII, June 1943)।

গানটি এই :

It thunder, O sister in-law,
The clouds have sent showern. O sister-in-law
The river has flooded, O sister-in-law,
The snake has crawled, O sister-in-law,
Time has torn it, O sister-in-law,
The bird has seen it, O sister-in-law.
The bird is afflicated in the sky, O sister-in-law,
It is scorched horribly, O sister-in-law,
The bird has seen it, O sister-in law,
It is picked up in the beak, O sister-in-law,
And carried to the nest, O sister-in-law.

সহজেই বোঝা যায়, ইশারা-ইঙ্গিতেই এখানে সব কথা বলা হয়েছে। এটির ব্যাখ্যা এই : রজোদর্শনের সঙ্গে বজ্রের একটি নিবিড় যোগ আছে, বজ্র যেমন বৃষ্টির সূচক, রজঃ তেমনি রক্তপাতের। নদীতে বন্যার অর্থও তাই। সর্পের দৈর্ঘ্য পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক সাধারণ ক্ষেত্রে, কিন্তু বর্তমানে তা' রক্তস্রোতের প্রতীক। পাখি ঈগল পাখি, যে সাধারণভাবে সাপের শত্রু। ঈগল তাই পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। ঈগল ঠোঁটে করে সাপকে নিয়ে গেল—এর অর্থ : স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম হলো। ঈগল আকাশের উচ্চলোকে উঠতে পারে, যেন বজ্রপাতের উৎসভূমি মেঘলোকের সংগে সে এবাত্ম ; বজ্রের কঠোরতা এবং ঈগলের নিজস্ব দ্রুততা-ক্ষিপ্রতা মিলে তাকে পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক করে তুলেছে। ঈগল Thunder-bird রূপে পরিচিত।

পাখির সঙ্গে phallicism-এর একটি গভীর যোগ আছে। কয়েকটি পাখিকে 'phallic bird' রূপে চিহ্নিতই করা হয় এজন্যে। চড়ুই এমন একটি পাখি, এই পাখি বহু ক্ষেত্রে লিংগের প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে। শুধু পাখিটিই নয়, এর হাড় পর্যন্ত লিংগ রূপে গ্রহণ করা হয়। আদর্শ সঙ্গমের জন্য চাই : Emotion like a man, duration like a dog, repetition like a sparrow' এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয় P.O. Bodding এর একটি মন্তব্য (Studies in santal medicine, Calcutta, 1927 : Part II, p. 139) থেকে। বোডিং বলেছেন, সাঁওতালরা চড়ুইয়ের যৌনক্ষমতায় এতোই বিশ্বাসী যে, কোনো ব্যক্তিকে 'কামুক' বলে তিরস্কার করতে হলে তাকে "চড়ুই পাখির মতো" বলে তিরস্কার করে।

ভেরিয়র এলউইন তাঁর একটি প্রবন্ধে (The attitude of Indian ab-originals

towards sexual importance : Man in India, Vol XXIII, June 1943) এই বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করেছেন, 'ডারিয়া' নামে ভারতের এক আদিবাসীরা পুরুষত্বহীনতা দূর করবার জন্যে এই ব্যবস্থা নিয়ে থাকে : গাছের যে ডালে বসে চড়ুই-চড়ুইনী সঙ্গম করেছে, তা পুড়িয়ে ছাই করে, একটি কালো মুরগীর সঙ্গে তাই রান্না করে কোনো রবিবার বা বুধবার তা খেতে হবে। গাছের ডাল অবশ্যই পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক, আসলে তা চড়ুইয়েরই। রবিবার ও মুরগী এ দুটোই লক্ষণীয়। রবি অর্থাৎ সূর্য সকল প্রকার উৎপাদনের মূল কারণ, মুরগী এখানে Sun-bird, ইউরোপে Guineafowl যৌনতার প্রতীক।

"Another sparrow remedy is to kill the male bird in the act of copulation. It should be roasted and eaten—some say on the Sunday after Diwali, but these are Hinduised—and the bones should be carefully preserved, Eating the flesh will restore potency and if a bone is kept in the mouth during the sexual act it will prevent premature ejaculation and will indeed prolong the act as long as it is retained···The bone obviously symbolises the hard erect penis'.

ময়ূরের দীর্ঘ পালকগুচ্ছও লিঙ্গের প্রতীক। এই জন্যেই লিঙ্গ দেবতা শিবকে 'ময়ূরেশ্বর' বলা হয়।

সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকারকে ভেদ করে, বজ্রও তেমনি মেঘকে দ্বিধাখণ্ডিত করে। এদের এই 'ভেদ' করার ক্ষমতা জননেন্দ্রিয়ের 'ভেদ' করবার ক্ষমতার সদৃশ। উপরন্তু, বাঁকা চাঁদ, বিশেষত দ্বিতীয়া থেকে পঞ্চমী পর্যন্ত চাঁদের আকৃতি জননেন্দ্রিয়ের মতো। এই জন্যে সূর্যের সঙ্গে জড়িত Sun-bird ও Solar-bird, চন্দ্রের সঙ্গে জড়িত Lunar-bird এবং বজ্রের সঙ্গে জড়িত Thunder-bird সবই Phallic-bird, শুধু চাঁদের আকৃতিই নয়, চাঁদ নিশাচর বলেও চাঁদের সঙ্গে যৌনবোধের যোগ আছে। কাজেই যে সব পাখি চান্দ্র-পাখি, যৌনতার প্রতীক হিসেবে তারাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কখনো বা একই পাখির মধ্যে সৌর ও চান্দ্র পাখিকে পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে লিঙ্গ প্রতীকতা প্রকটতর হয়।

যেমন, কোকিলের ক্ষেত্রে। কোকিল Migratory পাখিরূপে কথিত, এবং যাযাবর পাখি রূপে নির্দিষ্ট ঋতুতে এ পাখিই সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয় এবং ঋতু শেষ হলে সর্বপ্রথমেই অন্তর্ধান করে বলে বিশ্বাস। পাশ্চাত্য দেশে বিশ্বাস আছে, কোকিলের আবির্ভাবেই বৎসরের প্রথম বজ্ররব শোনা যায়, গ্রীষ্মের দিন আসে। কারো কারো বিশ্বাস, কোকিল অলস পাখি, কর্মতৎপর চিলই তাকে ডেকে নিয়ে আসে, নির্দিষ্ট ঋতু এসে গেলে। গ্রীসে চিল বসন্তের দূত, এবং অন্যত্র ঈগলের গুণাবলী সঞ্চারিত হওয়ায় সেও Solar bird এবং Thunder bird যে করেই দেখা যাক,

কোকিলও তাহলে Solar এবং Thunder bird, অতএব লৈঙ্গিকতা এর মধ্যেও দেখা যায়।

সংস্কৃতে 'কোকিল' শব্দের একটি প্রতিশব্দ হলো 'দাত্যূহ', দাত্যূহ শব্দের একটি অর্থ মেঘ। অতএব, কোকিলের সঙ্গে মেঘের যোগ আছে। Solar bird রূপে কোকিল সূর্য-কোকিল-মেঘেই আবৃত হয়। Gubernatis তাঁর গ্রন্থে তাই মন্তব্য করেছেন: "As a hidden sun, the Cuckoo is now an absent husband, a travelling husband, a husband in the forests, and now an adulterer. in secret a morows inter-course with the wife of another. In any case, it is often a phallical symbol, and therefore delights in mysteries, Mean while it sits on the sceptre of Here, the protectress of marriages and child births, whilst Zeus himself the thunder-striker, the thunderer, her adulterous brother, is called kokkiik or cuckoo,...Hence the song of the cuckoo was considered a good omen to whoever intended to marry".—p. 232.

আসলে কোকিলের জন্ম পরিচয়ের মধ্যেই অবৈধ প্রেম, যৌনবোধ ও লৈঙ্গিকতা লুকিয়ে আছে। কোকিল 'অন্যপুষ্ট', 'পরভৃত' বলেই তার জন্ম সম্পর্কে নানা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে এবং তার মধ্যেও এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোকিল নাকি অবৈধভাবে অন্য এক বিচিত্র পাখির সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে। এই ভাবে লৈঙ্গিকতা, অবৈধপ্রণয় ও বিবাহ—প্রভৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছে কোকিল। আমাদের দেশে কোকিল বসন্তের পাখি, বসন্তকাল—'মধুমাস', নরনারীর প্রেমানুভূতি এই সময়েই তীব্রতর হয় বলে কথিত। সুতরাং, সেদিক থেকেও কোকিলের সঙ্গে লৈঙ্গিকতার আসঙ্গ স্পষ্টতর হয়। ফ্রান্সে কুমারী কন্যারা ঋতুর প্রথমে কোকিল দেখলেই কোকিলকে জিজ্ঞেস করে, তার বিয়ে হতে আর কতোদিন বাকী আছে। উত্তরে কোকিল যতোবার ডাকে, গুণে গুণে ততো বৎসর দেরী আছে বলে মনে করা হয়। অহল্যার সঙ্গে ব্যাভিচার কালে ইন্দ্র হয়তো এ জন্যেই কোকিলের রূপ ধারণ করেছিলেন, ঠিক যেমন জিউস। 'Standard dictionary of folklore, legend and mythology'তে মন্তব্য করা হয়েছে: From its well-known habits, e.g. haying its eggs in other birds' nexts for them to hatch, it is in ill repute as an adulterer (the English word 'cuckold' is derived from cuculus) and is connected with phallic symbolism".

ভারতীয়দের কাছে যে পাখি কোকিল, ইউরোপীয়দের কাছে তাই 'নাইটিঙ্গেল'। 'নাইটিঙ্গেল' নামের মধ্যেই রাত্রের প্রসঙ্গ আছে, সুতরাং দেখা যায়, এ পাখির নামোদ্ভব নিয়ে যে কাহিনী চলিত আছে, তার মধ্যে অবৈধপ্রণয়ই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নাইটিঙ্গেলও অতএব কোকিলের মতো 'phallos'-এর প্রতীক।

আগেই বলেছি, শীতকালে চাঁদের আধিপত্য, গ্রীষ্মকালে সূর্যের। চাঁদ লিংগের প্রতীক, অতএব যে সব পাখির আবির্ভাব বা তিরোধানের ফলে শীতকাল সূচিত হয়, সে সব পাখিকেই লিংগের প্রতীক বলে মনে করা যেতে পারে। যেমন, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা (the Halcyon) এবং St. Martin পাখি।

চাঁদের সঙ্গে শুক পাখির যোগ অনেকেই লক্ষ করেছেন। চাঁদ ও শুক পাখি এবং গাছ মিলে একটি 'composite symbol' রচনা করেছে। শুক সবুজ বর্ণের পাখি বলে একে 'হরি' বা 'হরিৎ' বলে; শব্দ দুটির অপরার্থ হলো, 'সুকেশিনী', রশ্মিময় চন্দ্র যেন তাই। হরিৎ শব্দের সংস্পর্শেই চাঁদ গাছের সংগে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই ভাবে চাঁদ, গাছ ও শুক একাত্ম হয়ে গেছে। চাঁদের আকৃতি এবং বক্রচারিতা একে লিংগের সংগে যুক্ত করে ফেলেছে। এই জন্যেই বিভিন্ন দেশের, বিশেষত ভারতীয় কথাসাহিত্যে শুক রাতের বেলাতেই সক্রিয় এবং সকল অবৈধপ্রণয়ের সঙ্গে যুক্ত। কামদেবতা মদনও তাই শুক বাহন। সংস্কৃতে চাঁদ পুংলিংগ শব্দ, এতে চাঁদকে লিংগের সংগে জড়ানো সহজতর হয়। এ বিষয়ে আগেও কিছু আলোচনা করেছি।

এই প্রসংগে yiinx নামে হেলেনীয় পুরাণের একটি পাখির নাম করা যেতে পারে। yiinx হলো pan-এর কন্যা। জিউসকে yiinx প্রেমাকৃষ্ট করবার চেষ্টা করলে Here তাকে ওই নামেরই একটি পাখিতে পরিণত করে দেন। পিণ্ডারের রচনায় দেখা যায়, Jason, Medea-র প্রিয়তা অর্জন করবার জন্যে এই yiinx পাখিকে ব্যবহার করেছে। Theocritos-এর লেখায় দেখা যায়, মেয়েরা প্রেমিককে আকর্ষণ করবার জন্যে yiinx-এর বন্দনা করছে। তাহলে yiinx-এর সঙ্গে প্রেম, অবৈধপ্রেম এবং লিঙ্গের যোগ লক্ষিত হয়। 'ওডিসী'তে জিউসকে ঘুঘু বা কপোতের রূপ ধারণ করে কুমারী phthia-র কাছে যখন যেতে দেখা যায়, তখন ঘুঘু বা কপোত লিংগের প্রতীক হয়ে ওঠে। 'মহাভারতে'র নল-দময়ন্তীর প্রেম পরিণয়ের ক্ষেত্রে দৌত্য করেছে হাঁস, হাঁসকেও এভাবে লিংগের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া যায়।

পাখি লিঙ্গের প্রতীক হয়ে উঠেছে বলেই রূপকথা ও লোককথায় বারে বারে দেখা যায়, নায়কের কাছে রূপসী নারীর পরিচয় পাখিরাই দেয়; অথবা রূপসী নারীকে আয়ত্ত করতে পাখিরাই সক্রিয় সাহায্য করে। এর বিস্তৃত আলোচনা ও উদাহরণ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে। প্রেমের গানে ও বিয়ের গানে পাখির সঙ্গে নারীর যোগ ও অভেদ, কি করে পাখিকে নারীর প্রতীক এবং তার প্রসারিত ফল রূপে লিঙ্গের প্রতীক করে তুলেছে, ওই অধ্যায়েই আমরা তার বিস্তৃত ও সদৃষ্টান্ত আলোচনা করে এসেছি।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতীয়দের প্রেমের গানে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, বিরহিনী, প্রোষিতভর্তৃকা ও কুমারী কন্যার কাছে পাখি পুংলিঙ্গের প্রতীক হয়ে উঠেছে, দু-একটি দৃষ্টান্ত এই ঃ

যেমন, W.G.Archer সংগৃহীত (Baiga poetry : Man in India, March 1943) একটি বইগা গানে :

I have killed a peacock, I have cut
shoots of green bamboo
Tell me, my young love, when will you
Sleep with me ?

অথবা, ভেরিয়র এলউইন সংগৃহীত ছত্তিশগড়ী গানে (Folk songs of chhattisgarh, Man in India, March 1944)

১. In the great garden
The shade is cool
Who will lie with me there
Adorable bird ?

২, Red as a rose
Come to your madman's bed
Come as a bird
Come to your madman's bed

৩ ...The koel cries on the mango branch
In the forest calls the peacock
On the river bank the crane
And I mistake their musik
For the voice of my love
How dark my bed is now.

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে আমার মনে হয়েছে, কোনো বিশেষ একটি পাখিকেই কেবল লিঙ্গের প্রতীক বলা যায় না। যে কোনো পাখিই যে কোনো অঞ্চলে লিঙ্গের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। কাজেই কয়েকটি পাখির যৌনক্ষমতা বা যৌনআসঙ্গ থেকে তাদের লিঙ্গ প্রতীক হবার কারণ দর্শানো গেলেও, সব পাখির বেলাতেই তা সম্ভব নয়। মনে হয়, পাখি এখানে বিশেষ এক ধরনের পাখি না হয়ে নির্বিশেষ ভাবে সাধারণ পাখিরূপে নির্দেশিত হয়েছে। এই জন্যেই একাধিক ও বিচিত্র পাখির নাম মেলে।

বিবাহের সঙ্গে পাখির যোগ বহু অঞ্চলেই বিশ্বাস কবা হয়। ডঃ নির্মলপ্রভা বরদলৈ তাঁর "অসমব লোকসংস্কৃতি" (১৯৭২) গ্রন্থে লিখেছেন, "পখিলা গাত পরিলে বিয়াৰ লগ্নকাষ চাপিছে বুলি সাধাৰণত ভাবে।"—পৃ: ৪৬. একটি মনসার ভাসান গানে দেখি কাজলা মালিনী লখিন্দরের বিয়ের জন্যে যে মুকুট তৈরি করলো তাতে নানা ছবি উৎকীর্ণ করা হলো। তার মধ্যে একটি 'হংস বাহনেতে লিখে চতুর্মুখ ধাতা।'

একটি মুকুটে ময়ূরও চিত্রিত হয়েছিল। রঙপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীরা তাদের বিয়েতে বরের মুকুটে জোড়াপাখি দেয় এখনও।

প্রেম, অবৈধ প্রেম, বিবাহ ও লিঙ্গ—সবগুলিই একসঙ্গে জড়িত। ওপরে সে কথা দেখানো হলো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রজোদর্শন। এই সব মিলিয়ে মানুষের জন্মের সূচনা করে। এইবার তাই পাখি কি করে জন্মের প্রতীক হয়, সে আলোচনায় আসছি।

জন্মের সঙ্গে অমরতার একটি যোগ আছে। কাক, ময়ূর, কোকিলের সঙ্গে 'অমরতার' যোগ সম্পর্কে একটু আগেই সামান্য আলোচনা করেছি, অমর বলেই জন্মেরও প্রতীক বলে কোনো কোনো পাখি গৃহীত হয়েছে।

·৮··

লিঙ্গ এবং জন্মের প্রতীক যেমন পাখি, তেমনি মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর দেহ-বিমুক্ত আত্মার প্রতীকও পাখি। আত্মার প্রতীকরূপে পাখি উন্নীত হয়ে আত্মার গোত্রের প্রতীক বা 'টোটেম' রূপে দেখা দিয়েছে, উল্কিরূপে তারই প্রকাশ, উল্কিও প্রতীক-চিহ্নমাত্র।

জন্মের প্রতীক ও সূচক রূপে পাখিকে যে প্রকার ও পরিমাণে দেখা যায়, মৃত্যু ও আত্মার প্রতীক রূপে সেই প্রকার ও পরিমাণ দুই-ই বৈচিত্র্য ও জটিলতর। বিষয়টি গভীরভাবে নানা দিক থেকে বিচার্য।

Bird soul রূপে পাখি মরণোত্তর কালে আত্মার প্রতীকেই কেবল পরিণত হয় না, তার মরণেরও সূচনা করে। পাখি তখন অশুভময়তার প্রতীক। আবার স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মৃত্যু হলেও তার দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেও পাখি সহায়তা করে থাকে, পাখি তখন মানুষের সাহায্যকারী শুভময়তার প্রতীক। এইভাবে 'Funeral bird'-এর ধারণার জন্ম হয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতি চড়ুই-ম্যাগপাই এর ব্যবহার ছিল বিরূপ ও নিষ্ঠুর,crombill এবং রবিন রেডব্রেষ্ট-এর ব্যবহার ছিল সমবেদনাময়। এই এই দুই বিরুদ্ধ ব্যবহারের মধ্যে পাখির প্রতি মানুষের দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, যা পাখিকে দুই বিরুদ্ধ ভাবের প্রতীক করে তুলেছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রসঙ্গে।

যদিও ভারতে ও এশিয়ায় পাখির ডাক মৃত্যুর সূচনা করে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মৃতের আত্মার প্রতি কাকের মাধ্যমে 'কাকবলি' প্রদান করা হয়, তিব্বতে এবং পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা মৃতদেহ পাখিকে খেতে দেয়, গোরখপুরে প্যাঁচাকে 'মড়াখোওয়া চীড়িয়া' বলে, তথাপি 'Funeral bird'-এর-ধারণা প্রাচ্যের নিজস্ব বস্তু বলে মনে হয় না, তা পাশ্চাত্যের। এবং আমার মনে হয়, পাশ্চাত্যে একটি বহু পুরাতন ধারণা, অন্তত

খ্রীষ্টের পূর্বকালীন তো বটেই। খৃষ্টের মৃত্যুকালে Funeral bird-এর ধারণা না থাকলে ক্রুশবিদ্ধ মরণোন্মুখ যিশুর প্রসঙ্গে পাখিকে নিয়ে আসা হত না। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই গ্রীসে ধারণা ছিল, শ্যেন মৃতদেহ দেখলে অশ্রুমোচন করে এবং যে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয় নি, অন্তত তার চোখ দুটিতে সামান্য কিছু মাটি নিক্ষেপ করে। অবশ্য শ্যেন থেকে এই ধারণা কোনো বিশেষ ধরনের শকুনে সঞ্চারিত হয়েছে। বাংলাদেশে তাই বিশ্বাস আছে, এরা মৃত জন্তুর চোখটুকু কেবল খায়; অন্য দিকে শ্যেন মৃত জন্তুর হৃৎপিণ্ড খায় না বলে গ্রীসে বিশ্বাস আছে। এই খাওয়া-না-খাওয়ার মধ্যে দিয়েই এ সব পাখি মানুষের প্রীতির আস্পদ হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, Funeral bird-এর ধারণাই Bird soul-এর ধারণার জন্ম দিয়েছে। Funeral birdকে প্রীতির চোখে না দেখলে আত্মার পক্ষিরূপ প্রাপ্তিকে সম্ভব বলে মানা যায় না।

যে সব পাখি মৃত্যুর সূচনাকারী এবং সেই অর্থে মৃত্যুর প্রতীক, সেই সব পাখিকে সদ্যজাত শিশুর বিশেষ শত্রু বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে লক্ষণীয় হল—মৃত্যুর সঙ্গে সদ্য জাত শিশুর যোগ। যেন শিশুর আত্মা সদ্য যমলোক বা মৃত্যুলোক থেকে পুনরায় পৃথিবীতে এলো, তখনো মৃত্যুর সঙ্গে শিশুটির যোগ-সূত্র ছিন্ন হয় নি। এই জন্যেই গোটা আরব ও মিশরীয় দেশগুলিতে, পূর্বভারতে (যেমন, বাঙলার মুর্শিদাবাদ জিলাতে) যেখানেই প্যাঁচা মৃত্যুর সূচক সেখানেই প্যাঁচা সদ্যজাত শিশুরও মৃত্যুর সূচক। বিহারে এই রকম পাখি হলো 'কাগী চিল'। প্রাচীন আরবদের বিশ্বাস ছিল, মড়ার মাথার খুলি ভেদ করে প্যাঁচার উদ্ভব হয়। আরবদের সমাধি স্থলের প্রবেশ পথে প্যাঁচার মূর্তি তাই খোদাই করা থাকে। সাঁওতালরা মৃতদেহ দাহ করবার সময় একটি মুরগী শাবককেও চিতার কাঠের সঙ্গে বেঁধে দেয়। মুরগী আত্মাকে স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে, এই বিশ্বাস। এটির মধ্যে একটু বিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। হয়তো কিঞ্চিৎ হিন্দুপ্রভাব পড়েছে। পাখি এখানে সরাসরি আত্মাতে পরিণত না হয়ে স্বর্গে যাবার সহায়ক হয়েছে। যাই হোক, প্রথাটি দিয়ে এখনও পাখি ও মানবাত্মার একাত্মতা চিনে নেওয়া যায়।

শকুনি-গৃধিনী যে মৃত্যুর প্রতীক, তা এতো ব্যাপক ও পরিচিত যে উল্লেখ করাও অনাবশ্যক। কেবল একটি উদাহরণ দিই। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র দস্যু 'কেনারামের পালা'তে দেখি, লখীন্দরের মৃত্যুর পর, যে ভেলায় তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো, সেই ভেলায় মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে শকুনি-গৃধিনী এবং 'রাঙ্গা কুকুড়া' (লাল মুরগী) দেয়া হলো:

> মরার লক্ষণ দিল উপরে গৃধিনী।
> চারিদিকে বসাইল চারটী শকুনী॥
> রাঙ্গা কুকুড়া দিল শ্বেত বিড়াল আর।
> ইহাদের জন্য দিল ছয় মাসের আহার॥

শকুনি গৃধিনীর অনুষঙ্গে চিল-ও মৃত্যুর সংগে জড়িত অথবা যমের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কবি ভবানী দাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় সং, ১৯৬৫) তে দেখা যায়ঃ "চিল রূপে আইসে যম, সাচন রূপে যায়" (পৃ. ২০১)। চিল থেকে সয়চানও যমের প্রতীক হয়েছে।

ময়ূরও এক বিচিত্র পথ ধরে মৃত্যুর প্রতীকে পরিণত হয়েছে। রোমানরা ময়ূরের ওপর দেবত্বারোপ করেছিল ; এরই ফলে প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টানরা ময়ূরকে অসীমতা ও অমরতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করে। অসীমতা ও অমরতার প্রতীক বলেই রোমে অবস্থিত খ্রীষ্টান শহীদদের ভূগর্ভস্থ সমাধিস্তম্ভে ময়ূরের মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ঘুঘু-কপোতকেও খ্রীষ্টান স্মরণস্তম্ভে 'funeral symbol' রূপে দেখা যায়। এই জন্যেই ইটালী, জার্মানী, হল্যাণ্ড এবং রাশিয়াতে ঘুঘু খাওয়া বিশেষ পাপ বলে গণিত হয়। আত্মার প্রতীক বলেই যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর কবর থেকে তাঁর পুনরুত্থানের প্রথম সংবাদ একটি ঘুঘুই দিয়েছিল বলে ইটালীর ফ্লোরেন্সে বিশ্বাস করা হয়।

'The folklore of birds' বইতে E. A. Armstrong পাখিব সঙ্গে মানবাত্মার যোগাযোগ বোঝাতে মন্তব্য করেছেন: Wooden birds on poles are placed around the coffin of a Tungus shaman or erected beside a sacrificial platform The Voguls sometimes depict a bird on the coffin. The yakuts erect a row of trees representing the stores of heaven, before a sacrificial platform and place model birds on them. Wooden effigies of mythological birds, including a double-headed bird and a raven, are set on posts where a shaman performs the "flight to heaven" ritual. For this purpose the Dolgans may set up nine bird-surmounted poles. Apparently the birds are believed to accompany him…The bird on pole is used by the Eskimo and some North American Indians to mark a grave."—PP. 14-16.

নিখিল বিশ্বেই পাখিকে বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতীক বলে প্রাচীনকাল থেকে মানা হয় ; তবে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যেই এই প্রতীকতাবোধ গভীরতর। সম্ভবত, ভারতবর্ষেই এই প্রতীকতার সূচনা হয়েছিল।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পাখির বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার প্রতি আস্থা-বিশ্বাস আপামর জনসাধারণের মধ্যে পরিশেষে এক দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হয়। প্রাচীন ভারতের তাবৎ সাহিত্যে, এমনকি বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের সব ধরণের উপজাতীয়দের লোককথায় এবং অভিজাত-অনভিজাত সর্বপ্রকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারায় পাখির এই বিশেষ গুণ ও ক্ষমতাটি স্বীকৃত পেয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতের ধর্ম-সংস্কার-সংস্কৃতির ডোরে বাঁধা ছিল অ-ভারতীয় যে সব দেশ, সেই সব দেশেও পাখির প্রতি সমপ্রকার মনোভাব প্রচলিত হয়েছিল।

অনেক পাখিই বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা অর্জন করলেও শুক-পাখিই ভারতীয় জীবনে ও সংস্কারে এ বিষয়ে প্রধান স্থান নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার এ দেশে দৃঢ়মূল হয়ে উঠলে সেই সংস্কারের বশে শুকপাখিকে 'দ্বিজ' বা ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, 'ব্রাহ্মণ' ভারতীয় সংস্কারানুযায়ী পণ্ডিত ও বিদ্বান। 'দ্বিজ'-শব্দের মধ্যে এখানে একটু 'pun' আছে বলে মনে হয়। পাখি মাত্রই 'দ্বিজ', তার প্রথম জন্ম অণ্ডরূপে, দ্বিতীয় জন্ম সেই অন্ড ভেঙে দিয়ে। পাখির প্রতি প্রয়োগ-নির্বিশেষ শব্দ 'দ্বিজ'কে বিশেষরূপে যখন শুকের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে, তখনই শুকের বিশেষ ক্ষমতাটি প্রকাশ পেয়েছে। উন্নতনাসিকা আর্যত্বের ও আভিজাত্যের একটি দিক বলে কথিত হয় বলেই 'উন্নতনাসিকা' বোঝাতে 'শুক-নাস' পদের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বপ্রকার অমঙ্গল গৃহ থেকে দূরে রাখতে পারবে তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, এই বিশ্বাসেই শুক গৃহপালিত পাখিতে পরিণত হয়েছে; 'কথাসরিৎসাগর', 'কাদম্বরী'তে দেখা যায় এই জন্যেই রাজসভাতেও শুকের আদর, উচ্চমূল্যে শুকপাখি ক্রয় করা হচ্ছে, তার বাসের জন্য আক্ষরিক অর্থেই স্বর্ণপিঞ্জর নির্দিষ্ট হয়েছে। শুকসারি-নৃত্য প্রাচীন ভারতে চৌষট্টি কলার অন্যতম বলে গণিত হয়েছে। মানবের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করবার ক্ষমতাও শুকের গুরুত্ব ও গৌরব অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। পাখি হয়েও যে মানবের স্বরে কথা কইতে পারে, সে নিশ্চয়ই অসাধারণ এবং বিজ্ঞ।

শুকের এই বিদ্যাবত্তার পশ্চাতে প্রাচীন ভারতে শুকের সম্পর্কে আর একটি ধারণাও কার্যকরী হয়েছে, শুককে 'পবিত্র' বা পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করা। বিদ্যার সঙ্গে পবিত্রতার একটি যোগ আছে। শুক পাখি প্রখ্যাত জ্ঞানী ও মুনি শুকদেবের প্রতীক। শুকদেব মহাভারতকার ব্যাসদেবের পুত্র, অপ্সরা ঘৃতাচী তাঁর মাতা, গর্ভধারণের প্রাক্কালে ঘৃতাচী একটি স্ত্রী শুকপাখির রূপ ধরেছিলেন বলে কথিত হয়। শুকদেবের পবিত্রতার প্রসঙ্গে মহাভারতে একটি কাহিনী চলিত আছে: পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হচ্ছিল। এক কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হলে দেবরাজ ইন্দ্রের ঘণ্টা একবার বেজে ওঠে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেই ভোজের শেষে উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলেন। শুকদেবের খুব ইচ্ছে হলো, এই ভোজসভায় তিনিও যোগ দেন। তিনি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসে পাণ্ডবদের সেই যজ্ঞস্থলে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না ভীড়ের জন্য। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন, শ্রীকৃষ্ণ এক-রাশ এঁটো পাতা নিজে এনে ফেলে দিলেন। সেই ভুক্তাবশেষ খাদ্যই খাবার ইচ্ছে হলো শুকদেবের। তিনি এক শুক পাখির রূপ ধরে তাই খেতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের ঘণ্টা শতরবে দীর্ঘক্ষণ ধরে বেজে উঠল। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে এর কারণ শুধালেন। কৃষ্ণ বললেন, প্রখ্যাত ব্রহ্মবেত্তা কেউ একজন ভোজন করছেন, যা কোটি ব্রাহ্মণের ভোজনের সমতুল্য, তারই ফল এই। কৃষ্ণ তখন উচ্ছিষ্ট ভোজনে রত শুকরূপী শুকদেবকে দেখিয়ে দিলেন।

পৌরাণিক ঘটনাবলীকে যাঁরা নৈসর্গিক জগতের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চান, তাঁরাও শুকপাখির মধ্যে এই দিকটি দেখতে পাবেন। এর পূর্ববর্তী আলোচনায়, চাঁদের সঙ্গে

শুকপাখির এ সাম্যতা দেখেছি, চাঁদ ও শুকপাখি উভয়েই উভয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। চাঁদ রাত্রির আলোকস্বরূপ, অন্ধকার অজ্ঞানতার প্রতীক। চাঁদ রাত্রি দূর করে, যেন অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে; চাঁদের প্রতীক রূপে শুকও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে তার বিজ্ঞতার প্রমাণ দেয়।

বিজ্ঞ বলেই ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশেও বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বাহনরূপে শুককে দেখতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরাম সরস্বতীর সঙ্গে তাই শুকের উল্লেখ করেছেন: "শিরে শোভে ইন্দুকলা, করে শোভে রূপমালা, শুকশিশু শোভে বাম করে।" কথিত আছে, সরস্বতী পুরাণ বর্ণনা করবার জন্যে নিজেই শুক-পাখির রূপ ধারণ করেছিলেন।

বিজ্ঞতার প্রতীক বলেই শুক কেবল বর্তমানের কালসীমায় বন্দী নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুক তার অতীত জীবন সম্পর্কে অবহিত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে একাধিক ক্ষেত্রে শুককে অতীত চারণা করতে দেখা গেছে। এসব উদাহরণ বহুপরিচিত। মধ্যযুগের এক কবির রসনা থেকে অনতিপরিচিত একটি উদারহণ দিই। অযোধ্যার জায়স গ্রামের কবি মালিক মহম্মদ (মৃত্যু ১৫৪২ খ্রীঃ) লিখেছিলেন 'পদ্মাবতি কাব্য'। রোসাঙ্গ রাজসভার কবি আলাওল তাই অবলম্বন করে লেখেন 'পদ্মাবতী'। পদ্মাবতীর কাহিনীতে একটি আধ্যাত্মিক রূপক আছে, যা মালিক মহম্মদ নিজেই উপসংহারে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেন মশায়ের ভাষায়: "চৌদ্দ ভুবনের সবকিছু আছে মানুষের ঘটে। চিতোর হইতেছে মানবদেহ, রাজা রত্নসেন মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মাবতী (পদ্মিনী) বুদ্ধি, শুক পথ নির্দেশকারী গুরু..."

বস্তুত শুকের এই 'গুরু' রূপে অবতীর্ণ হওয়া প্রাচীন ভারতের সংস্কারের সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ। জায়সীর কাব্যের একটি খণ্ডের নামই 'শুকখণ্ড'। পদ্মা-বতীর প্রশ্নের উত্তর দিত পিঞ্জরাশ্রিত শুক। জায়সীর কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে, শুক ব্রাহ্মণের মতো বেদজ্ঞ, বেদমন্ত্র উচ্চারণে সমর্থ। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর একটি প্রবন্ধে ('জায়সী ও আলাওল': সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শীতসংখ্যা, ১৩৭৩) মূল জায়সীর কাব্য থেকে একটি শুক পাখির বর্ণনার অনুবাদ করেছেন এইভাবে: "এক ব্রাহ্মণ একটি শুক পক্ষী এনেছে, সে শুক স্বর্ণকান্তি এবং অনুপম, তার কণ্ঠদেশে শ্যাম ও রক্তিম দুটি রেখা। তার পাখা এবং পৃষ্ঠদেশ রক্তিমবর্ণে চিত্রিত। তবে দুই নয়ন আরক্তিম এবং চঞ্চুও রক্তবর্ণ এবং তার বাণী অমৃত সদৃশ। তার মস্তকে টিকা এবং স্কন্ধে ব্রহ্মসূত্র। মনে হয় সে যেন কবি অথবা চতুর সহদেব।"

এই শুক চিতোরের রাজা রত্নসেনের কাছে নিজের নাম বলেছে হীরামণি। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর সেবা করেই সে মানুষের ভাষা শিখেছে। আন্দামানের পৌরাণিক বিশ্বাসানুযায়ীও শুকপাখি পূর্বজন্মে মানুষ ছিল।

হীরামণি-শুকের বুদ্ধিমত্তার একটি ভালো উদাহরণ এই কাব্যে মেলে। অনেক পাখির গায়েই নানাবর্ণের রেখা থাকে। রাজা রত্নসেনের সঙ্গে আলাপের সময় হীরামণি-শুক একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে: "প্রেমের তত্ত্ব একমাত্র ময়ূর জানে, যার রোমে

রোমে বাগপাশের চিহ্ন অংকিত আছে। তার পাখায় বারবার এ চিহ্ন ধরা পড়ে। সে উড়ে যেতে পারে না এবং এ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এ কারণে সে মৃত্যু কামনা ক'রে চীৎকার করে এবং ক্রোধে সর্প ভক্ষণ করে। পণ্ডুক নামক একপ্রকার কপোত এবং শুক তাদের গ্রীবায় এ বন্ধনের চিহ্ন ধারণ করেছে। যার গ্রীবায় এই চিহ্ন পড়েছে সে আপন প্রাণ সমর্পণ করতে চায়।"

"তিতির পক্ষীর গলায় এ ফাঁদের চিহ্ন আছে বলে সে অনবরত আর্তনাদ করে। তা না হলে সে কেন আর্তনাদ করে আপন গলায় ব্যাধের রজ্জুকে আমন্ত্রণ করে আনে।"

শুক পাখি পাখির দেহ-রেখা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তার সত্যতা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। কিংবা যে Aetiological myth-এর ধরণে ব্যাখ্যাটি প্রদত্ত হয়েছে, সে myth-ও এখানে আলোচ্য নয়। এখানে লক্ষ করবার বিষয় দুটি: প্রথমত, শুকের মুখ দিয়েই একটি গভীর তত্ত্ব-কথা বলানোর মধ্যে শুকের বিদ্যাবত্তার প্রমাণ এবং শুকের প্রসঙ্গে বা শুকের মুখ দিয়েই ময়ূর, তিতির ও কপোতের উল্লেখ। এই দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করছি।

অভিজাত সাহিত্য ছাড়াও পল্লীসাহিত্যেও শুক সম্পর্কে একই ধারণা দেখা যায়। 'মৈমনসিংহগীতিকা'র 'কাজলরেখা' নামীয় রূপকথাতেও দেখি শুকের নাম 'ধর্মমতি-শুক'। শুকের পরামর্শেই হৃতসম্পদ সাধু ধনেশ্বর ফিরে পেল। কাজলরেখার ভবিষ্যৎ শুক অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিল। বারো বৎসর কাজলরেখাকে নানা বিড়ম্বনা সইতে হবে, তার থেকে তার পরিত্রাণ নেই। 'ধর্মমতিশুক' ভবিষ্যতে যা ঘটবে বলে বলেছে, বাস্তবেও তাই হয়েছে। শুকের দীর্ঘদর্শিতা এখানে প্রমাণিত।

অভিজ্ঞ ও দীর্ঘদর্শী বলেই মানুষের অতীত জীবনও শুকের জানা বলে কল্পিত হয়। কলকাতার ফুটপাথে তথাকথিত জ্যোতির্বিদের অভাব নেই। প্রায়ই দেখা যায়, এঁরা খাঁচায় বন্দী একটি টিয়ে সঙ্গে নিয়ে বসেছেন। যিনি ভবিষ্যৎ জানতে চাইবেন, তাঁর অতীত জীবনের কর্মফল-লিখিতপত্র ওই শুক টেনে বের করে দেয়, এবং তারই পটভূমিকায় জিজ্ঞাসুর ভবিষ্যৎ কথিত হয়। শুকের অতীতচারিতার সঙ্গে মানুষের অতীত জীবন এখানে একাকার হয়ে গেছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'পূজা-পার্বণ' (আশ্বিন ১৩৫৮) বইতে লিখেছেন: "আমি পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময়ে কোন কোন পাণ্ডার হাতে শুকপক্ষী·· দেখিয়াছি।"— পৃ. ৩৭.

জায়সীর কাব্যে আমরা শুকের মুখে ময়ূর, তিতির ও কপোতের নামোচ্চারণ শুনেছি। অর্থাৎ এরা যেন সমভাবাপন্ন পাখি, একই ভাবের প্রতীক। বস্তুতই তাই। শুকের মুখে এই তিনটি পাখি, মোট চারটি মিলে এখানে একটি Composite symbol রচনা করেছে। যদিও প্রত্যেকেই পৃথকভাবে একই ভাবেরও প্রতীক।

উত্তরভারতের ফতেপুর জেলা থেকে ডঃ উইলিয়ম ক্রুক কর্তৃক সংগৃহীত একটি গল্প (Folk-tales from Northern India: The Indian Antiquary,

July, 1924) দেখা যায়ঃ একদিন একটি কোকিল ইন্দ্রের রাজসভায় গিয়ে এতো সুন্দর গান গাইল যে ইন্দ্র তাতে বিশেষ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মর্তে এমন গান আর কে কে গাইতে পারে। জবাবে কোকিল যাদের নাম বলল, তার মধ্যে আছে—ময়ূর ময়না, শুক, মৌমাছি ইত্যাদি। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখব—উল্লিখিত সব ক'টি পাখিই বিদ্যার প্রতীক।

শুকের মতো ময়ূরও গৃহপালিত পাখি। শুক-প্রলাপনের মতো ভবন-শিখীকে নাচানোও প্রাচীন ভারতের নারীর কাছে এক আদরণীয় বিষয় ছিল। রাজসভার সঙ্গে শুকের যেমন নিবিড় ও গভীর যোগ ময়ূরের সঙ্গেও তাই। ময়ূর রাজবংশের প্রতীক, রাজার উষ্ণীষে ময়ূরের পালক ব্যবহৃত হয়, রাজমুদ্রায় ময়ূরের প্রতিকৃতি গৃহীত হয়েছে। কলাপধারী ময়ূরের শোভাও রাজতুল্য। হিতোপদেশের 'বিগ্রহকথা'তে ময়ূর-রাজ্যের একজন বিজ্ঞ সভাসদ শুক। শুকের দেহবর্ণের দুটিই, সবুজ ও লাল, ময়ূরের পালকে দেখা যায়। সূর্য, রামধনু, মেঘ—তিনের সঙ্গেই ময়ূরের যোগ আছেঃ প্রতিদিন সকালে সূর্য উঠলে ময়ূর সূর্যকে অভিনন্দন জানায়, আসামের নাগাদের একটি লোককথায় এ কথা আছে; একটি জাতক-কাহিনীতে ময়ূরের সূর্যবন্দনা করে অমর হবার কথা আছে; মেঘ ও বর্ষা ময়ূরের আনন্দ ও কলাপ-বিস্তারের কারণ, রামধনুর সাত রং ময়ূরের দেহবর্ণে। ময়ূরের সঙ্গে যেমন সূর্যের, শুকের সঙ্গে তেমনি চন্দ্রের যোগ। চন্দ্র-সূর্য এখানে সমার্থক। কাজেই শুক বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রতীক বলে ময়ূরও তাই। এই জন্যেই ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষত জৈনদের মতে, বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বাহনরূপে ময়ূরকে দেখা যায়। ময়ূরের কলাপবিস্তার যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আলোক-বিস্তার, কেননা ময়ূর সূর্যের সঙ্গে যুক্ত। 'কলাপব্যাকরণ' নামটিও লক্ষণীয়।

ময়ূরের সঙ্গেও একাধিক পাখির নাম করা হয়েছে, হাঁস ও তিতিরের নাম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যেমন, বৌদ্ধ জাতকগুলোতে। 'মহাময়ূরজাতক' (সং ৪৯১) এবং 'মহাহংসজাতক' (সং ৫৩৩) এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'মহাহংসজাতক'-এ ময়ূরের সঙ্গে হাঁসের নাম এবং 'মহাময়ূরজাতকে' ময়ূর, হাঁস ও তিতিরের নাম এক সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। একসঙ্গে উল্লিখিত হওয়া একই ভাবনার প্রতীক হওয়া। হয়েছেও তাই। পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ বলতে এইসব পাখিরই নাম একত্রে ও এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং জায়সীর কাব্যে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ শুক কর্তৃক তিতিরের নামোল্লেখ পূর্ণরূপে ভারতীয় ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে।

ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত বলেই তিত্তিরজাতকে (সং ৪৩৮) তিতিরকে বেদ-পরায়ণ ও বেদ-পারঙ্গম রূপে লক্ষ করা যায়। তিতির রূপ ধারণ করেই উশীর সকল বেদজ্ঞান গ্রহণ করা হয়েছিল, যার ফলে গ্রন্থের নাম হয় 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ'। শুধু ভারতেই নয়, তিতিরের intelligence' এবং 'Prophetic Virtue' ইউরোপেও ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রীক প্রবাদ অনুসারে তিতিরের পা হলো 'a deceitful foot',

'তিতির সম্পর্কে গ্রীসদেশে একটি 'Aetiological myth চলিত আছে : তিতিরকে সেখানে বলে 'Daedola'। কারণ daedalus, যিনি বহু বিষয়ের আবিষ্কর্তা (এবং সে কারণে পরম বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ), তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র Talaus-এর বিজ্ঞতায় ও কর্মদক্ষতায় ঈর্ষাকাতর হবে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করতে চান। দেবতারা Talaus-কে করুণাবশত একটি তিতিরে পরিণত করে দেন। Daedalus এবং Talaus উভয়ের বিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা তিতিরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। Aldrovandi তাঁর 'Ornithology'তে লিখেছেন, বাড়িতে বিষ তৈরী হতে দেখে পোষা তিতির চীৎকার করে ডেকে ওঠে। Edda-তে তিতিরের দীর্ঘদর্শিতার কথা আগে একবার উল্লেখ করেছি।

জায়সীর কাব্যে শুকপাখিকে পণ্ডুক নামে একপ্রকার কপোতের নাম উচ্চারণ করতে শোনা গেছে। 'কপোত' বলতে ঘুঘু এবং পারাবত দুই-ই বোঝায়। ঘুঘুর বিদ্যাবত্তার কথা যদিও শোনা যায় না, তবে অন্তত একটি ক্ষেত্রে পারাবত (কবুতর)-এর বিদ্যা-বিচক্ষণতার উদাহরণ পেয়েছি। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' (তৃতীয়-খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮)-র 'ভেলুয়া' পালাতে দেখি,

> গাছের উপর বসিয়াছে কৈতরের ঝাঁক।
> তার মাঝে এক কৈতরের অচরিত ডাক ॥
> অচরিত কথা সে যে মানুষের স্বরে।
> বলেমা তৈয়ব কৈতর মুখে মুখে পড়ে ॥
> শুনিয়া কৈতরের মুখে কোরাণের বাণী।
> আমির সাধু ভাবে তারে কেমন ধরি আনি ॥—পৃ ৮৮-৮৯

কবুতরের কণ্ঠে কোরাণের বাণী অবশ্যই তার বিদ্যাবত্তার সূচক। দীনেশচন্দ্র এখানে 'কৈতর' বলতে কোন পাখি বুঝিয়েছেন, তা বলেন নি। সম্প্রতি ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তাঁর সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (তৃতীয়খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭১)-য় উক্ত পালাটিই "ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা" নামে প্রকাশ করেছেন। উদ্ধৃত ক'টি পঙক্তি তাঁর সংগ্রহেও আছে। পাদটীকায় (পৃ. ১১৪) তিনি 'কৈতর' শব্দের সহজগ্রাহ্য স্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করেছেন, "টিয়া বা ময়না"। সহজগ্রাহ্য স্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করে এই যে তিনি "টিয়া বা ময়না" করেছেন, তা নিশ্চয়ই দেশাচারজাত বা সংস্কার-প্রভাবিত কোনো সত্য। তাই যদি হয়, 'কৈতর' অর্থে 'টিয়ে'কে নিয়ে শুকপাখির 'কপোত' ('কৈতর') নাম উল্লেখ করবার একটি কারণ পাওয়া যায়।

পূর্বের উল্লিখিত জাতক দুটিতে ময়ূরের সঙ্গে হাঁসের নাম উল্লিখিত হয়েছিল। ময়ূর যদি বিদ্যা-বিজ্ঞতার প্রতীক হয়, হাঁসও তবে তাই। পূর্বভারতের সর্বত্রই বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বাহন হাঁস। এতে বিদ্যার সঙ্গে হাঁসের যোগ স্পষ্টীকৃত হয়। বিদ্যার অন্তর্নিহিত পবিত্রতার প্রতীক যেন শুভ্র-শ্বেতবর্ণ, হাঁসের গাত্রবর্ণে যা দৃষ্ট।

সবস্বতীর হাঁসের সঙ্গে দেখা যায় পদ্ম। পদ্মের পূর্ণ প্রস্ফুটিত দলগুলো পূর্ণ বিকশিত জ্ঞানের প্রতীক। পদ্ম ও হাঁস—দুই-ই জলজ। বৈদিক সরস্বতীও একটি নদীর নাম। ময়ূরের সঙ্গে মেঘ ও বর্ষার যোগ আছে, অতএব ময়ূরও জলের সঙ্গে যুক্ত, হাঁসের মতো। ময়ূর যেমন সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, হাঁসও তাই। 'জবনহংসজাতকে' (সং ৪৭৬) দেখা গেছে, মহাসত্ত্বরূপী হংসরাজ সূর্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধিতা বটে, কিন্তু সূর্য ও হংসের একত্র উল্লেখ এদের সম্পর্কও নির্দেশ করে। হাঁসের সঙ্গে সূর্যের সম্পৃক্ততা নিয়ে আগেই আলোচনা করে এসেছি। তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে হাঁসের পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এইভাবে হাঁস ও ময়ূর একাত্ম হয়ে গেছে বিদ্যার প্রতীক রূপে।

অন্যান্য যে সব পাখি বিজ্ঞতার প্রতীক রূপে খ্যাত তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলো—প্যাঁচা। গ্রীসদেশে প্যাঁচাকে বলে "Bird of wisdom." প্যাঁচার মুখাকৃতি অতি গম্ভীর, পণ্ডিতেরা সচারাচর গম্ভীর হয়ে থাকে, কোটরে থাকাকালে প্যাঁচা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির মতো মাথা নাড়ে, বৃদ্ধ ব্যক্তির ভূয়োদর্শন বশতঃ তাকে জ্ঞানী মনে করা হয়। প্যাঁচার চোখের পাতা নেই, চোখের মণি তাই সর্বদাই জ্বলজ্বলে দেখায়. এই আলোকময়-দৃষ্টি জ্ঞানদৃষ্টির প্রতীক। সর্বোপরি, নিশাচর প্যাঁচা রাতের অন্ধকারেও স্বচ্ছন্দে চারণা করতে পারে, যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আলোকময় 'জ্ঞানদৃষ্টি' মেলে চলতে পারে। প্যাঁচা সম্পর্কে এই ধারণা ইউরোপের, ভারতের নয়। ইউরোপে প্যাঁচাকে মৃত্যুর সূচক বলে মনে করা হলেও তাকে বিজ্ঞতার প্রতীকও মনে করা হয়েছে। ভারতে প্যাঁচা মৃত্যুর প্রতীক ও সূচক হয়েও ধনসম্পদেরও প্রতীক হয়েছে।

তাহলে প্যাঁচার প্রতীকতার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ত্রই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য প্যাঁচা নানা ধরণের আছে, সে কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

বিজ্ঞতার প্রতীক বলেই গ্রীসে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী Athene-র প্রিয়পাখি হলো প্যাঁচা। কিন্তু ইউরোপে প্যাঁচা সদর্থে কেবল বিজ্ঞই নয়, কিঞ্চিৎ দূষিত অর্থে একে 'ধূর্ত'ও বলা হয়েছে। যেমন একটি নীতিগল্পে : প্যাঁচা অন্যান্য পাখিদের এই বলে সাবধান করে দিচ্ছে, পাখিরা যেন ওক গাছ জন্মাতে না দেয়, কারণ ওক গাছে এক ধরণের পরগাছা হয়, যা দিয়ে পাখিদের শিকারিরা ধরে ফেলে—প্যাঁচার বিজ্ঞতার এই অধঃপতিত দিক, যা ধূর্ততা, তা মহাভারতেও মেলে। মহাভারতেও কুকর্মে আসক্ত ও দক্ষ ব্যক্তি, যে ভবিষ্যৎ ঘটনা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায়, তাকে প্যাঁচা বলা হয়েছে। রামায়ণের শেষের দিকে একটি গল্প আছে : একটি নীড়ের অধিকার নিয়ে শকুন-পেচকের দ্বন্দ্ব। রামের কাছে তাই তারা এসেছে বিচারের জন্যে। রামের প্রশ্নের উত্তরে শকুন বলল, পৃথিবীতে যতো দিন হলো মানববসতি ততোদিন সে এই নীড় দখল করে আছে। পেচক বললে, পৃথিবীতে যতোদিন বৃক্ষ সৃষ্টি হয়েছে, ততোদিন হলো সে ওই নীড়ের অধিবাসী। রামচন্দ্র পেচককেই গৃহের মালিক বলে রায় দিলেন, কেননা মানবজাতির তুলনায় বৃক্ষ অনেক প্রাচীন। প্যাঁচা রামের কাছ

থেকে এই প্রকার বিচার পাবার প্রত্যাশা নিয়েই আপন চাতুর্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে ওই উত্তর দিয়েছিল।

প্যাঁচার এই বিজ্ঞতার পশ্চাতে একটি কারণ আছে। 'পঞ্চতন্ত্রে' 'কথাসরিৎসাগরে' আমরা দেখেছি, প্যাঁচা পাখিদের রাজা নির্বাচিত হয়েছে। প্রাচীনকালে সেই ব্যক্তিই রাজা নির্বাচিত হতো, বিদ্যা-বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় যে অন্যান্যদের ওপরে। কাজেই প্যাঁচার বিজ্ঞতা এবং তার রাজা নির্বাচিত হওয়া একটি যৌক্তিকতার সূত্রে আবদ্ধ।

শুক-ময়ূর-হাঁস-তিতিরকে যেমন একটি গুচ্ছে আবদ্ধ দেখা গিয়েছিল, প্যাঁচার সঙ্গে তেমনি কাককে দেখা যায়। কাক ধূর্ততার প্রতীক বলে সর্বত্র স্বীকৃত, 'ধূর্ত' বললে কাককে অধঃপতিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু কাককে যখন 'সর্বজ্ঞ' ও 'দৈবজ্ঞ' বলে স্বীকার করে তাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় ভারতের সর্বত্র, তখন কাকের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবই প্রকাশিত হয়। বশিষ্ঠ রামায়ণে এক কাক-ভূষণ্ডের উল্লেখ আছে। এই কাক নানা প্রাণায়াম ও যোগভ্যাসাদি দ্বারা অনন্ত জীবনপ্রাপ্ত হয়েছিল। কৈলাস পর্বতে, কল্পবৃক্ষে উপবেশন করে এই কাক বশিষ্ঠের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে জানিয়েছে, সে বিষ্ণুর শততম, বশিষ্ঠের অষ্টম এবং কৃষ্ণের দশম জন্ম অবলোকন করেছে। এখানে কাকের বিজ্ঞতা ও সর্বজ্ঞতা তার অনন্ত জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। এই বিজ্ঞতা অধঃপতিত হয়ে ধূর্ততায় এবং শেষে ছলনায় রূপ নিয়েছে। মহাভারতের নল দময়ন্তীর উপাখ্যানে শনি কর্তৃক নলকে ছলনার ক্ষেত্রে কাক শনির সহায়ক হয়েছে। কাকের রূপ ধরেই শনি নলের দেহে প্রবেশ করেন। আইরিশ ভাষায় 'Raven's knowledge' বলে যে ফ্রেজটি চালু আছে, তার অর্থ হলো : 'to see all and know all'. স্মরণ করা যেতে পারে, Koronis-এর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ অ্যাপোলোর কাছে কাকই নিয়ে আসে।

কাকের সঙ্গে প্যাঁচার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। "কাক-প্যাঁচা" ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সহচর শব্দও বটে। কাকের সম্পর্কে যেমন বিরুদ্ধ মনোভাব, প্যাঁচার সম্পর্কেও তাই। প্যাঁচা নিশাচর পাখি, কাকের গাত্রবর্ণও সেই অন্ধকারেরই প্রতীক। উপরন্তু দিনের পাখি হওয়া সত্ত্বেও কাক কখনো কখনো ভুলক্রমে রাতেও ডেকে ফেলে, এতেও তার নিশাচরত্ব ধরা পড়ে। কাক-প্যাঁচা উভয়েই-মৃত্যুর সূচক বলে কথিত। এগুলো যেমন কাক-প্যাঁচার সাদৃশ্য ও সংযোগের দিক, তেমনি বৈসাদৃশ্য ও বিরোধের দিকও আছে। কাক-প্যাঁচার দ্বন্দ্ব-কথা পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগরে কথিত হয়েছে। প্যাঁচা পাখিদের রাজা নির্বাচিত হলে কাকই তার প্রতিবাদ করে। প্যাঁচাকে বলে 'কাকারি'। পাণিনিতে 'কাকোলূকিকা' শব্দটি আছে, যার অর্থ প্যাঁচার মতো কাক, কাক-প্যাঁচার যুদ্ধকথা অ্যারিস্টটলও উল্লেখ করেছেন। ইটালীতে "পরম বিপদ" বোঝাতে 'the owls amongst the crows' বলা হয়। এই বিরোধও এক ধরণের সংযোগ। সুতরাং কাক-প্যাঁচা দুটি পাখিই একই ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছে। একের গুণাগুণ অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

বিদ্যার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অপ্রধান পাখিদের মধ্যে আছে—কোকিল, নাইটিঙ্গেল

এবং নীলকণ্ঠ। কোকিল ও নাইটিঙ্গেল ('ফিলোমেলা') দুটিই সুকণ্ঠের জন্য প্রখ্যাত, দুটিই অতএব এক। ইউরোপীয়দের কাছে যে পাখি নাইটিঙ্গেল, ভারতীয়দের কাছে তাই কোকিল। দুইয়ের রূপের একাত্মতা এখানে অভিন্নতার হেতু নয়, দুইয়ের সুকণ্ঠ ও অন্যান্য আসঙ্গ বিবেচনায় এখানে এক বলে কথিত হলো। প্রাচীন ভারতের শিক্ষণীয় বিদ্যা ('কলা') বলতে চৌষট্টি রকমের 'কলা' ছিল, গান যার মধ্যে অন্যতম প্রধান দিক। এইজন্যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সংগীত ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এরই ফলে সুকণ্ঠের প্রতীক কোথাও কোথাও সরস্বতীর বাহনও। 'কোকিলবাহিনী সরস্বতী' বা 'কোকিলারূঢ়া সরস্বতী'র উদ্ভব এমন করেই হয়েছে। শুকের সংগে সরস্বতীর সংযোগ আগে দেখে এসেছি। শুক প্রিয়ভাষিতার জন্যে প্রখ্যাত। শুকের প্রিয়ভাষিতা কোকিলের সুগায়কতার সংগে সম্মিলিত হয়ে উভয়কে এখানে একাত্ম করে তুলেছে।

কোকিল পাশ্চাত্ত্য দেশে শ্রেষ্ঠ 'oracular bird' রূপে পরিচিত। কোকিল দিবসের প্রহর ঘোষণা করতে পারে, মানুষের আয়ু কতদিন বলতে পারে, কুমারী কন্যার বিবাহ কতোদিন পরে হবে তাও তার জানা। যে কোকিল এতো সংবাদ দিতে পারে সে নিশ্চয়ই পরম প্রাজ্ঞ। কাক ও কোকিলের রূপগত সাদৃশ্য, একে অপরের পালনকর্তা, কাকের প্রাজ্ঞতা কোকিলে সঞ্চারিত।

পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে (যেমন, হাওড়া, ২৪পরগণা) বিশ্বাস আছে, সরস্বতী পুজোর দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখলে বিদ্যালাভ হয়। 'পথের পাঁচালি'তে হরিহর সরস্বতী পুজার দিনই অপুকে নীলকণ্ঠ পাখি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। উত্তর আমেরিকার সমুদ্রতীরবর্তী ইণ্ডিয়ান উপজাতিরা নীলকণ্ঠ (The blue jay)-কে সৃষ্টিকর্তার সম্মান দেয় বটে ; কিন্তু সে সংগে ছল-চাতুরী-প্রতারণায় তাকে দক্ষও বলা হয়েছে। এই ছল-চাতুরী-প্রতারণা বুদ্ধির নিন্দাত্মক দিক। এরই প্রশংসাত্মক দিক হিসাবে নীলকণ্ঠকে বিদ্যা-বুদ্ধির সংগে যুক্ত করা যায়। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সংগে উত্তর উপকূলবর্তী উপজাতীয়রা যে সব ভালো-মন্দ কাজের কর্তা হিসাবে দাঁড়-কাকের নাম করে থাকে, ওই দেশেরই দক্ষিণঅঞ্চলের গভীরতর অংশে তা নীলকণ্ঠের প্রতি আরোপিত হয়। অর্থাৎ নীলকণ্ঠ ও দাঁড়কাক তাহলে সমভাবাত্মক পাখি হলো। কাকের সঙ্গে প্যাঁচার সংযোগ লক্ষ করে এসেছি, এখন কাকের সঙ্গে নীলকণ্ঠের যোগ দেখা গেল। সুতরাং, কাক, প্যাঁচা, নীলকণ্ঠ একাত্ম হলো। কাক-প্যাঁচার মতো নীলকণ্ঠ সম্পর্কেও দুই বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যাচ্ছে।

চক্রবাক জাতকে (সং ৪৫১) দেখা যায় চক্রবাক একটি কাককে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। তাহলে চক্রবাকও জ্ঞানী, এবং জ্ঞান-বিদ্যার প্রসংগে আবার এলো কাক। 'হিতোপদেশে'র 'বিগ্রহ' কথাতেও চক্রবাককে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী, হংসরাজের মন্ত্রী হিসাবে দেখা গেছে। চক্রবাক জলজ পাখি,—সারসও তাই। রাশিয়া, সিসিলি এবং ভারতের অনেক গল্পে সারস কনিষ্ঠপুত্রদের অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের পথপ্রদর্শক হয়েছে। পঞ্চতন্ত্র ও

কথাসরিৎসাগরের গল্পে সারস প্রতারক পাখি, মাছদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার অছিলায় তাদের খেয়ে ফেলেছে। কদর্থে সারসও এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও চতুর।

এই প্রসঙ্গে লোককথার একটি বিশেষ প্রসঙ্গোপকরণ (Motif) উল্লেখ করা যেতে পারে : 'Animal thief'—কৌশলপূর্ণ চতুর মানবেতর প্রাণী কি করে স্বেচ্ছায় বা প্রভুদ্বারা আদিষ্ট হয়ে দ্রব্যাদি চুরি করে। পাখির মধ্যে আছে কাক, ম্যাগপাই, আবাবিল (Swallow) ও শুক। এই চৌর্যও হীনার্থে এদের চাতুর্যের প্রতীক।

পাখি নানাভাবে প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ বলেই 'Angury' শব্দের উদ্ভবের সঙ্গেও সে কথা জড়িয়ে আছে। সত্যের সঙ্গে জড়ানো বলে 'Bird of truth' বা 'সত্যের পাখি'র উদ্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পাখির এই বিজ্ঞতাই তাকে 'weather prophet' করে তুলেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করেছি॥

·১০·

ধন রত্ন, রাজকীয়তা এবং যুদ্ধবিগ্রহের প্রতীক রূপেও পাখিকে পাওয়া যায়। এক হিসেবে এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি অন্তর্লীন সাদৃশ্য আছে, এই জন্যে এদের আলোচনা একসঙ্গে করছি। রাজারাই যুদ্ধ বিগ্রহাদি করে থাকেন এবং ধনসম্পদ তাঁদেরই বেশি। সুতরাং রাজকীয়তার প্রতীকরূপে পাখিকে দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা পাখির রাজ-প্রতিবেশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। যেমন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ছড়ায় ; তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রবাদে ; চতুর্থ পরিচ্ছেদে ধাঁধায় ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লোককথায় ; সপ্তম পরিচ্ছেদে জাতক, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, আরব্য উপন্যাস ও ঈশপের নীতিগল্পে পাখির রাজ-প্রতিবেশ ও রাজকীয়তা সম্পর্কে স-দৃষ্টান্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছি। উপর্যুক্ত পরিচ্ছেদগুলোতে পাখির সঙ্গে ধনসম্পদের যোগের কথাও বলা গেছে মাঝে মাঝে। এখন এ বিষয়ে আর দু-চার কথা বলছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়ত্রই সব পাখির একটি রাজা কল্পিত হয়েছে। প্রাচ্যে গরুড়, পাশ্চাত্ত্যে ঈগল বা স্বর্ণ ঈগল (The Golden Eagle)। কিন্তু, প্রাচ্য দেশে সমস্ত পাখির সম্রাটরূপে গরুড়ের কথা বলা হলেও, গরুড়ের সম্রাটত্বে সংশয় পোষণ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা ফিঙে, চড়ুই, ময়ূর, হাঁস, সারস ইত্যাদি পাখিকেও রাজা হতে দেখেছি। গরুড়ের সম্রাটত্বে সংশয় পোষণ করে নতুন রাজা নির্বাচিত হয়েছে পাঁচা, যদিও কাকের প্রতিবাদে তা শেষ পর্যন্ত সঠিক কার্যকরী হতে পারে নি। কাককেও রাজা রূপে দেখেছি।

প্রাচ্যের গরুড় এবং পাশ্চাত্যের ঈগল (স্বর্ণঈগল) আসলে একই পাখি। এখানে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। গরুড়ের সম্রাটত্বে যেমন সংশয় এসেছে, সম্ভবত ঈগলের সম্রাটত্বেও একদা সংশয় দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত গল্পের উল্লেখ আগেই করেছি : কোন্ পাখি কত উঁচুতে উঠতে পারে. সে বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছিল, ঈগল সহজেই সবার উঁচুতে উঠে গেল, কিন্তু সে টের পায় নি—তারই পক্ষপুটে লুকিয়েছিলো ক্ষুদ্র একটি wren পাখি, এইবার সে ক্লান্ত ঈগলকে অনায়াসে পরাস্ত করল আর একটু ওপরে উঠে। পাশ্চাত্যে প্রচলিত এই গল্পটি আমি ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং বাঙলাদেশের মালদহ জেলাতেও পেয়েছি। তবে, কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে।

মালদহে (গ্রাম : বাবলা, পোঃ মেহেরাপুর, কালিয়াচক, সাহাবুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক সংগৃহীত) চলিত গল্পটির সারাংশ এই : পাখিদের মধ্যে উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো ; ফিঙে কিছুদূর উঠেই চালাকি করে শকুনের পিঠের ওপর চেপে বসল। শকুন তা টেরও পেল না। তারপর ক্লান্ত শকুন যেই জয়ী হবে, সেই তখুনি ফিঙে আরও উঁচুতে উঠে রাজা হলো। দক্ষিণ ভারতেও গল্পটি প্রচলিত আছে ; সিংহলে গল্পটির পাঠ (Glimpses of singhalese social life : The Indian Antiquary, september, 1904 : A.A. Perera) কিঞ্চিৎ ভিন্ন : কাক ও ফিঙে ছিলো খুড়ো আর ভাইপো। একদিন তারা বাজী ধরল, কে বেশী ভার বহন করে উঁচুতে উঠতে পারে। বিজয়ী বিজিতকে মস্তকে আঘাত করবে। প্রতিযোগিতার দিন কাক নিল তুলো, ফিঙে নিল নুন, দুজনেই ওপরে উঠতে লাগল। মেঘের কাছে এসে পোঁছতেই মেঘ তুলোকে ভিজিয়ে ভারী করে দিল, নুনকে গলিয়ে নিশ্চিহ্ন করল। ফিঙের পক্ষে তখন উঁচুতে ওঠা সহজ হলো।

তেলেগুদের মধ্যেও প্রায় এই ধরণের একটি কাহিনী পাওয়া যায় (Some notes on the folklore of Telegus : The Indian Antiquary, April 1897: G. R. Subraniah Pantulu) ; তবে, এখানে কাহিনীটিকে একটু নীতিগন্ধী করে ফেলা হয়েছে। গল্পটি এই : সমুদ্রতীরবর্তী একটি বটবৃক্ষে বসে একটি কাক একদা দেখতে পেল, একটি রাজহাঁস মানস সরোবরের দিকে উড়ে যাচ্ছে, কাকেরও সেখানে যাবার বাসনা হলো। রাজহাঁস তাকে নিতে চাইল না, কারণ কাক অতদূরে উড়ে যেতে পারবে না। তখন আরম্ভ হলো কাকের উড্ডয়ন ক্ষমতা প্রদর্শন। কাক প্রথমে জয়ী হলো, রাজহাঁসের চেয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে শীঘ্রই পড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখে হাঁস তাকে নিজ পক্ষপুটে ধারণ করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে এলো। অন্য গল্পগুলির 'উচ্চতা' এখানে 'দূরত্বে' পরিণত হয়েছে। কাক এখানেও হেরেছে। মানসসরোবরে (অবশ্যই এটি আধুনিক সংযোজন) গিয়ে পোঁছানো যেন রাজত্বলাভের লক্ষ্যভেদ করা। জাতকে, কথাসরিৎসাগরে, পঞ্চতন্ত্রে হাঁসকে রাজা হতে দেখা গেছে। হাঁস ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় খুব বড়ো ভূমিকা নিয়েছে, 'মানসসরোবর' তারই আভাস দেয়। 'ধর্ম' বলতে আদিম মানুষের কাছে যাদু-ঐন্দ্রজালিকতাই

ছিল। ঐন্দ্রজালিকরাই রাজা হতেন। কাজেই হাঁসের আধ্যাত্মিক আবরণ তার রাজ-প্রতিবেশকেই সমর্থন করে।

সব গল্পে একই ভাবনার কথা। প্রতিযোগিতা, ছলনা, চাতুর্য এবং শেষে জয়ী হওয়া। ঈগল শক্তিমান পাখী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্রকায় Wren-এর বুদ্ধিতে পরাভূত, ফিঙের কাছে যেমন শকুন। অথবা শক্তিমান গরুড়ের বিকল্পে যখন রাজা হিসেবে প্যাঁচাকে নির্বাচিত করা হয়; তখনও এই একই মনোভাব ধরা পড়ে। কাক ও ফিঙেকে রাজা হতে ভারতীয় গল্পে বহুবার দেখা গেছে। ভারতীয় গল্পে আরও দেখা যায়, ক্ষুদ্র পাখিদেরও রাজা রূপে উল্লেখ করা হয়, এবং এমন কি, রাজার সঙ্গে বিরোধিতা করতেও টুনটুনি, চড়ুই ইত্যাদি পাখিকে দেখা যায়, তাবা তাদের বুদ্ধিতে রাজাকেও পরাভূত করেছে। রাজার সঙ্গে এই বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এক ধরণের রাজ-আসঙ্গ, পাখির রাজপ্রতিবেশকেই তা স্ফুটতর করে। পাশ্চাত্ত্যে Wren-কে ঈগলের তুলনায় বুদ্ধিমান করে তোলা হলেও ঈশপের গল্পে চাতককে রাজকন্যা বলে উল্লেখ করতে দেখেছি।

চড়ুই, টুনটুনি প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় দুর্বল পাখীকে রাজা বা শক্তিশালী প্রাণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বুদ্ধিতে জিততে দেখা যায় ভারতীয় গল্পে, একটু আগেই তার উল্লেখ করেছি। এখন তার দু-একটি উদাহরণ দিই। সর্বক্ষেত্রেই চড়ুই, টুনটুনি বুদ্ধিতে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা, বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছে। যে জনগোষ্ঠীর কাছে এইসব পাখি 'টোটেম' রূপে স্বীকৃত ছিল, মনে হয়, তারাই এই 'টোটেমকে' রাজত্বের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাজার সম্মানে বিভূষিত করবার জন্যে এই ধরণের কাহিনীর উদ্ভাবন করেছে। উত্তরভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত একটি গল্পে (North Indian notes and quaries, August 1893, p. 83-84) দেখা যায়, একটি বাবুই ('পোদনা') পাখি 'পোদনীকে' রাজা হরণ করলে, কি ভাবে জব্দ করেছে। বাবুইয়ের বুদ্ধিমত্তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজার সঙ্গে 'বিরাটত্বে'র একটি আসঙ্গ থাকায়, হাতীকেও সেই রাজার অনুরূপ মনে করা হয়েছে। এই জন্যেই গল্পে দেখা যায়, হাতীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালে চড়ুই (বাবুই) তার শুঁড়ের ভেতর প্রবেশ করে তাকে নাজেহাল করেছে, হাতী চড়ুয়ের কাছে হেরে গেছে (The weaver bird and the elephant : The Indian Antiquary : May 1925. p. 30). উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই'য়ের 'টুনটুনি আর রাজার কথা' গল্পে টুনটুনি ও রাজার বিরোধিতা এবং বারবার রাজার জব্দ হবার কথা আছে। এই বিরোধিতা ও বিজয় টুনটুনির রাজপ্রতিবেশকে উজ্জ্বলতর করে। এই বইয়ের একাধিক গল্পে (যেমন, 'টুনটুনি আর নাপিতের কথা,' 'উকুনে বুড়ীর কথা'), টুনটুনির সঙ্গে হাতির যোগ দেখি, হাতির বিরাটত্ব রাজারই বিরাটত্বকে নির্দেশ করে, আগেই তা বলেছি। এই হাতিকে পরিশেষে বাঘ ('চড়াই আর বাঘের কথা') বা মহিষ ('চড়াই আর কাকের কথা') হতেও দেখা যায়, অর্থ সেই এক। চড়ুই আর

কাকের বিরোধিতায় গল্প নিয়ে ভারতের নানা অঞ্চলে একাধিক গল্প মেলে। গল্পে কাককে রাজা হতে, অথবা অপর পাখি রাজা হলে (যেমন পঁ্যাচা) তার প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। Knowles-এর Folk tales sf Kashmir-এর একটি গল্পে আছে : একটি কাক এক কুম্ভকারের শিশুকন্যাকে অপহরণ করে তাকে লালন করতে থাকে। শেষে এক রাজার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়। কাকের রাজ-আসঙ্গ এই গল্প থেকে বোঝা যায়। কাশ্মীর থেকে পাওয়া, এই গ্রন্থেরই অপর একটি গল্পে দেখা যায়, পঁ্যাচা পাখিদের রাজার মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে, রাজা সমস্যা সমাধানের জন্যে পঁ্যাচার কাছে মন্ত্রণা চাইছে। উত্তর ভারতের মির্জাপুর জেলা থেকে পাওয়া একটি গল্পে (The Indian Antiquary, July, 1924, P 5) দেখা যায়, একটি কোকিলের কাছে রাজা সরাসরি জব্দ না হলেও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়েছেন।

শুধু রাজা নয়, রাণীর সঙ্গেও পাখির আসঙ্গ দেখা যায়, এই জন্যই রাণী মন্ত্রবলে পাখি হয়ে যান, যেমন 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'শীতবসন্ত' রূপকথায় সতীনের ষড়যন্ত্রে রাণী টিয়ে পাখিতে পরিণত হন। কিংবা রাণীর গর্ভে পাখি-সন্তান জন্ম নেয়, যেমন উক্ত গ্রন্থেরই 'বুদ্ধুভুতুম'-এ রাণীর গর্ভে এখানে প্যাঁচা জন্ম নিয়েছে। রাণীদের সঙ্গে পাখির উৎসঙ্গ বিষয়ে একটি এযাবৎ অপ্রকাশিত লোককথা বলি। ষাট বছরের বৃদ্ধা মহিলা যোগমায়া লাহিড়ীর (গ্রাম : দিলালপুর, পাবনা সদর) কাছ থেকে মৎকর্তৃক সংগৃহীত। লোককথাটি এই : রাজা বড়ো রাণীকেই বেশি ভালোবাসেন, ছোটোরাণীকে বনবাস দিলেন। ছোটরাণী ছাগল চরিয়ে খায়, একদিন তার ঘুমের মধ্যে চড়ুইরা এসে দাঁতগুলো খুলে নিয়ে গেল। পরে একদিন রাণীর দাঁত সোনার করে দিল। রাণী এখানে পাখির সাহায্য পেয়েছে। অবশ্য এই লোককথারই চড়ুইরা বড়ো রাণীকে কুৎসিৎ করে দিয়েছে।

এই জন্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজবংশ ও রাজপতাকা পাখির দ্বারা চিহ্নিত। রাজার উষ্ণীষ ও মুকুটেও থাকে পাখির পালক। ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে যে সব রাজকীয় বস্তু আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা (Notes on the Regalia kept at the Toshakana of the Government of India: The Indian Antiquary, February 1926, p. 22) করতে গিয়ে রায় বাহাদুর B.A Gupta মন্তব্য করেছেন :

"The 'morchel' is a sign of Royality, and a pair of them should be held on each side of a king or prince of the Royal Blood Krishna the eighth incarnation of Vishnu, wore a peacock feather in his crown as a sign of Divine power . Mayurdhvaj, lit. One with a peacock on his flag, was a royal title of the ancient Maurya Dynasty · ."

"...The peacock throne of Delhi was an emblem of imperial power and the white peacock was a sign of Royality in Burma····"

জীবনজী জামসেদজী মোদী তাঁর একটি প্রবন্ধে (A few notes on the ancient

and modern folklore about the peacock : journal of the Anthropological society of Bombay, Vol ix, No 8, p. 544-554) লিখেছেন, ময়ূরের পালক প্রজা-কর্তৃক রাজাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়। "There are 'eyes' as it were on its feathers So a presentation of its feather to the kings indicates a wish that the king may have many eyes upon his subjects."

ভারতে যেমন ময়ূর ও ময়ূরের পালক ব্যবহৃত হয়, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকাতে তেমনি উটপাখি the ostrich। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ উটপাখির পালকের 'ব্যাজ' পরিধান করে থাকেন। পৃথিবীর অনেক দেশের-পতাকায় ঈগলের প্রতিমূর্তি থাকে। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক হলো American eagle, জিউস্-এর রাজদণ্ডের ওপর ঈগলকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়। জিউস্-এর ভগ্নী Here-র রাজদণ্ডের ওপর কোকিলকে বসে থাকতে দেখা যেত। ভারতে ছিল "গরুড়-লাঞ্ছন-ধ্বজ", "ময়ূর-ধ্বজ"। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ স্টেটের রাজপরিবারের প্রতীক হলো ময়ূর।

মোগল ও অন্যান্য সম্রাটদের হাতে কখনও কখনও থাকত ঈগল। ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে এবং রাণীরাও বকের পালক পরিধান করতেন। পালক টুপিতে লাগান হতো, এইজন্য কেউ কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে ইংরাজীতে বলা হয়, "টুপির পালক-সংখ্যা বাড়ানো।" সম্ভবত কেউ কোনো বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে রাজানুগ্রহের প্রতীক রূপে পাখির পালক পুরস্কার পেত। নইলে টুপির পালকসংখ্যা বাড়ানো কৃতিত্বের পরিচায়ক হতো না। ইংলণ্ডের রাজন্যবর্গের শ্যেনপ্রিয়তা সুবিদিত। এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের দশম পরিচ্ছেদে আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। E.T.Dalton তাঁর 'Descriptive Ethnology of Bengal' বইতে লিখছেন, আসামের কুকি উপজাতির রাজারা ফিঙের পালক পরিধান করেন। (p.53)

রাজকীয়তার সঙ্গে ধন-সম্পদ জড়িত। বহু ক্ষেত্রেই পাখির সঙ্গে ধন-সম্পদকে জড়িত হতে দেখা যায়। এই ধন-সম্পদ প্রধানত তিনভাবে দেখা যায় :

নির্বিশেষভাবে অর্থ, টাকা-পয়সা ; সোনা-দানা অলঙ্কারাদি ; মণিমুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তরাদি। পাখির সঙ্গে এদের যোগ দু-রকমের হয়ে থাকে : এক, পাখি নিজেই ধন-বৈভবের মালিক ; এমন কি, এর প্রতি আসক্তি বশত সে চৌর্যবৃত্তি পর্যন্ত অবলম্বন করে বলে কথিত ; দুই নিজে এই সম্পদের অধিকারী না হয়েও প্রিয়পাত্র কাউকে যাচিত ও অযাচিত ভাবে তা প্রাপ্তির পথে সহায়তা করে থাকে। এই ধন-সম্পদের আভাসের জন্যেই পাখির গায়ের পীতাভ রঙকে স্বর্ণ-সদৃশ বলে মনে করা হয়। এই জন্যেই 'স্বর্ণ ঈগল' (The golden eagle), 'স্বর্ণচাতক', 'স্বর্ণচূড়', 'সোনাচড়া', 'মানিকজোড়' (এদের দুটি পা এক জোড়া মানিকের মতো), ইত্যাদি নাম চয়নের মধ্যে পাখির দৈহিক বিশেষত্বকে ধন-সম্পদের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদে পাখিবিশেষের নাম 'ধনহারা' পাখি। কোথাও কোথাও হাঁড়ীচাঁচাকে বলে 'টাকাচোর' পাখি। নদীয়া জেলায় বসন্তবউরীকে বলে 'স্যাকরা পাখি', স্যাকরা সোনার গহনা তৈরী করবার সময় হাতুড়ির যে শব্দ করে থাকে, এ পাখির ডাক সেই রকম বলে এই নাম। ইংরাজীতে বলে 'কপার-স্মিথবার্ড'। পাবনা জেলায় বিশ্বাস আছে, হুতোম প্যাঁচা নিজের ধন লুকিয়ে

রেখে স্থানটি ভুলে গেছে, সেই ধন-লোকেই সে পাগল হয়ে পাখি হয়ে গেছে। তেমনি, পূর্ববঙ্গে বিশ্বাস আছে, 'চোখ গেল' বা 'পাপিয়া' এই বলে ডাকে : 'চৈত্তার বউ গো, টাকা দে গো'। যে-সব ময়নার কর্ণরেখা হলুদ বর্ণের, তাদের বলে—'সোনাকানী ময়না'; আর সাদা হলে—'রূপাকানী'।

'চোখ গেল' পাখি এবং ইটালীর স্বর্ণমুদ্রাকে 'owl's eye' বলা—এই সব তথ্যের প্রসঙ্গে চিল সম্পর্কে একটি তথ্যের উল্লেখ করি। উত্তরভারতের "...Muhamadan women allege that young kites do not open their eyes till some gold is placed in the nest, and that this is the reason why kites sometimes carry off gold ornaments." Ramgharib Choube : North Indian Notes and quaries, May, 1894, P.35)। চিল-ঈগল-গরুড়ের সঙ্গে ধন-সম্পদের কথা পরে বলছি।

এইজন্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় পাখির প্রতিকৃতি দেওয়া থাকে। ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রাতে পাওয়া গেছে ময়ূরের প্রতিকৃতি। ময়ূর ছাড়া প্রাচীন ভারতের মুদ্রায় গরুড়ের মূর্তিও মিলেছে। ব্রহ্মদেশের মুদ্রাতেও ময়ূর দেখা যায়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দিয়েছি। শুধু প্রাচ্যই নয়, পাশ্চাত্যেও মুদ্রার সঙ্গে পাখির যোগ দেখা যায়। তাঁর 'Zoological Mythology' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে Gubernatis লিখেছেন "in Athens certain coins bearing the effigies of an owl were called owls, and in Italy golden coins are vulgarly called owl's eyes".—P. 250.

অর্থ ও বিত্তের সঙ্গে প্যাঁচার সংযোগ বাংলাদেশে অতি পরিচিত। সে জন্যেই লক্ষ্মীর বাহন এখানে প্যাঁচা, প্যাঁচা বিভিন্ন ধরণের আছে। লক্ষ্মীর বাহন রূপে পাওয়া যায় 'লক্ষ্মী-প্যাঁচা'। হুতোম প্যাঁচা অত্যন্ত অশুভ পাখি বলে পরিচিত হলেও এ পাখির সঙ্গেও ধনের আসঙ্গ কল্পিত হয়েছে। প্যাঁচা কেন লক্ষ্মীর বাহন ও ধনের প্রতীক হলো তা' একটি আলোচ্য প্রসঙ্গ বটে। লক্ষ্মীপ্যাঁচা দেখতে সাদা হয়, শুভ্রতাই কি পাখির প্রতি এই মনোভাবের কারণ? লক্ষ্মীর সঙ্গে অলক্ষ্মীর সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের বহু গৃহে লক্ষ্মীপুজোর আগে গৃহের বহিরাঙ্গনে অলক্ষ্মীর পুজো (যেমন, কোজাগরী পূর্ণিমা এবং শ্যামাপুজোর দিন) করা হয়। তাহলে অলক্ষ্মীও দেবী। বাংলাদেশে প্রচলিত কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোর ব্রতকথায় এইজন্যে অলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ আছে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা কি প্যাঁচার দু রকমের দেহবর্ণ (শুভ্র ও কৃষ্ণ)—এবং শুভ-অশুভ এই দু-রকমের বিপরীত মনোভাবের প্রতীক? ঋগ্বেদে অলক্ষ্মীর নাম 'তাড়ায়ী' (১০,১৫৫) এবং 'নির্ঋতি' (১০, ১৬৫)। নির্ঋতির সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে দুটি পাখি—কপোত এবং উলূক। পারাবত ও পেচক দুই-ই ধনসম্পদের সঙ্গে জড়িত বলে বাংলাদেশে বিশ্বাস আছে। পারাবতের প্রসঙ্গে পরে আসছি। 'পেচক' শব্দটি অনার্য শব্দ বলে কথিত হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে, পেচক অনার্যদের ধন-সম্পদের প্রতীক বলে গণিত ছিল। কালক্রমে পেচক উলূক-রূপে এবং নির্ঋতি অলক্ষ্মীরূপে পরিচিত হয়ে গেছে। সম্ভবত এই জন্যেই লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর পুজো একই কালে করা হয়।

পারাবত সম্পর্কেও এইজন্য বিরুদ্ধ বিশ্বাস চলিত আছে। পারাবতও ধনের প্রতীক, কিন্তু সর্বদা এবং সর্বথা নয়, 'তিন গুণ তের দোষ, তবে বুকে কবুতর পোষ'—এই প্রবাদ বাক্যেই দোষের পরিমাণ গুণের চেয়ে বহু বেশি করে প্রদর্শিত। পারাবত স্বেচ্ছায় উড়ে এসে কোনো গৃহস্থ বাড়িতে বাসা বাঁধলে অবশ্যই তা তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধির-সম্ভাবনা সূচিত করে; তাহলে ওই পাবাবত বন্য পারাবত। কখনো গৃহস্থ নিজেই পারাবতকে গৃহে আনলে কপালগুণে তা সমৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে গুণের চেয়ে বৈগুণ্যই অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়ে বলে বিশ্বাস। মানভূম থেকে পাওয়া একটি লোকসঙ্গীতের পঙক্তিতে "পায়রা রাজা" পেয়েছি। তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে স্তবকটি উদ্ধৃত করেছি।

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় গরুড়ের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। গরুড়কে অবশ্য ধনের প্রতীকরূপে আর বিশেষ দেখি না, কিন্তু গরুড়ের পাশ্চাত্ত্য 'কাউন্টারপার্ট' ঈগলকে ধনের সঙ্গে জড়িত দেখা যায়। গরুড়ের প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য এই : মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী অনুসারে যে দেবতার যে-বাহন, সেই দেবতার স্ত্রীদেরও সেই বাহন হওয়া উচিত। বিষ্ণুর বাহন গরুড়, অতএব লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা না হয়ে গরুড় হওয়া উচিত ছিল। এজন্যে কেউ কেউ অনুমান করে থাকেন "পেচককে গরুড়ের স্ত্রী-সংস্করণ বলিয়াই বোধ হয়" (লক্ষ্মী : বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ ২৩৮-২-২ : ক্ষেত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়)।

মৈমনসিংহে 'ফতাচিল'-এর সংগে ধন-সম্পদের যোগ আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। পশ্চিমবংগে বিশ্বাস আছে, শংখচিল কারো বাড়িতে এসে বসলে সে প্রচুর ধনসম্পদ পায়।

বিরুদ্ধ সংস্কার চড়ুই পাখি সম্পর্কেও আছে। 'মৈমনসিংহগীতিকা'র 'দস্যু কেনারামের পালা'য় আছে,

> দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত।
> উড়িয়ে যাইবে যখন তেউর পক্ষীর মত॥

'তেউরপক্ষী' অর্থাৎ চড়ুই সুদিন গত হলে বাড়ি থেকে উড়ে যায়।

চড়ুই তবে 'সুদিন' অর্থাৎ বিত্ত-বৈভবের প্রতীক? ভারতের মধ্যপ্রদেশে এর বিপরীত সংস্কার বর্তমান আছে : "It sparrows nest is a house-eaves…the owner will fall into poverty.' Superstitions among Hindus in the central provinces : The Indian Antiquary, February, 1900, p. 60 : M. R. Pedlow). মালদহ জেলার মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, 'গোরাইয়া' (অর্থাৎ চড়ুই) কৃপণের বাড়িতে বাসা বাঁধে না। কার্পণ্যও ধনের সংগে যুক্ত।

চড়ুই-টুনটুনি প্রভৃতি ক্ষুদ্রকার হীনবল পাখিকে আমরা রাজার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখেছি। ধনসম্পদের প্রতিস্পর্ধিতাও এখানে আছে। 'টুনটুনির বই'তে 'টুনটুনি আর রাজার কথা'য় টুনটুনি রাজারই একটি টাকা নিয়ে ধনের গর্ব করছে এই বলে : 'রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরে সে ধন আছে।' টুনটুনি শুধু রাজপ্রতিবেশই প্রাপ্ত হয় নি এখানে, পরন্তু রাজসম্পদও লাভ করেছে। গল্পটি উত্তর

চক্‌চকে ও উজ্জ্বল পদার্থের ওপর বহু পাখির এক অস্বাভাবিক মনোযোগ ও আসক্তি দেখা যায়। ম্যাগপাইয়ের নাম এ বিষয়ে সকলের আগে করা যায়। ম্যাগ-পাইয়ের বাসাতে নানা উজ্জ্বল পদার্থ (যেমন, উজ্জ্বল কাগজ, ভাঙা কাঁচের টুকরো ইত্যাদি) মেলে। অস্ট্রেলিয়ার Lower bird যে বাসা তৈরী করে, তা উদ্যানবাটিকার মতো, তাতে বাস করে না সে: নানা রঙীন চকচকে পদার্থ দিয়ে, অপূর্ব রুচিসম্মত ভঙ্গিতে তা সাজায়। টুনটুনির বাসাতেও কাঁচের টুকরো, রঙীন পুঁতি ইত্যাদি দেখা যায়। 'বৃহৎ সংহিতা'-য় লিখিত আছে, খঞ্জন যেখানে বমন করে, সেখানে খনন করলে কাঁচ পাওয়া যায়। আরো বলা হয়েছে, স্ত্রী ও পুরুষ খঞ্জনের সঙ্গম-স্থলে গুপ্তধন মেলে। বাবুই পাখি জোনাকি ধরে এনে খানিকটা কাদা-মাটির মধ্যে তা গুঁজে দেয়। জোনাকিও উজ্জ্বল। এই সব ঔজ্জ্বল্য মুদ্রা ও ধাতুখণ্ডের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তুলনীয়। এ ছাড়া, কোনো কোনো পাখির বাসাতে থাকে সাপের খোলস। নরম পদার্থ বলে সাপের খোলস আরামদায়ক বস্তু, পাখিরা তা সংগ্রহ করে নিজের বাসায় পেতে নেয়। সাপ ধন-রত্নের প্রতীক বলে পৃথিবীর বহুদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এই সব কারণ একত্র হয়ে পাখির সঙ্গে ধন-রত্নের সংযোগ-কথা প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে।

সাধারণত বৃহৎ ও শক্তিশালী পাখিদেরই একটি বিশেষ মর্যাদা দেবার প্রবণতা লক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় পাখিদেরও অনেক বিশেষত্ব লক্ষ করে সেই প্রকার মর্যাদা-মণ্ডিত করা হয়েছে। চড়ুই-টুনটুনির মতো ক্ষুদ্রকায় পাখির স্বর্ণ-সংযোগ কেবল ভারতেই নয়, পাশ্চাত্যেও লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে রাশিয়ার একটি গল্পের কথা তুলে ধরছি। রাশিয়ার প্রখ্যাত লোককথা সংগ্রাহক Afanassieff-এর সংগ্রহের পঞ্চম খণ্ডের ৩৮-সংখ্যক গল্পে পাই: একটি ছোটো পাখি এক জমিদারের ক্ষেতের ফসল প্রতিদিন করে নষ্ট করে দিত। এজন্যে ক্ষেত পাহারা দিত তিন ভাই। তাদের মধ্যে যে সবার ছোটো এবং সবচেয়ে বোকা, সে একদিন পাখিটি ধরে রাজার কাছে বেচে দিলে। রাজা পাখিটিকে তালাচাবি দিয়ে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখলেন। রাজার ছেলে বন্দী পাখিটিকে মুক্ত করে দিলে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে পাখিটি তাকে দিলে একটি ঘোড়া (যা তিনবার যুদ্ধে জয়লাভ করল), একটি সোনার আপেল, যা দিয়ে সে একটি রাজকন্যা লাভ করতে সমর্থ হলো। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে পাখি-কর্তৃক প্রিয়পাত্রকে স্বর্ণসম্পদ প্রদানের নিদর্শন ভারত থেকেও মেলে। অযাচিতভাবে অকারণেই ধন-দানের ঘটনাও দেখা যায়। গুজরাটে বিশ্বাস আছে, কোনো ব্যক্তির বিদেশ যাত্রাকালে ময়ূর যদি একবার বা তিনবার ডাকে তবে তার ধনপ্রাপ্তি হয়।

পাখির সঙ্গে ধন-সম্পদের যোগের প্রসঙ্গে composite symbol রূপে পাওয়া যায় সাপকে। সাপও ধনরত্নের প্রতীক বলে এই ব্যাপার ঘটেছে। আমাদের বঙ্গীয় রূপকথা-লোককথাতেই এর নিদর্শন রয়েছে। উড়িষ্যার ভুঁইয়ারা করমপুজোর প্রাঙ্গণে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে, জীবন্ত পাখি ও সাপকে একসঙ্গে ছেড়ে দেয়।

এইবার পাখির সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের আসঙ্গের কথা বলি। পাখিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের

প্রতীক করবার উপাদান পাখির প্রকৃতির মধ্যেই লুকানো আছে। মুরগী, বুলবুলি, তিতির, কোড়া প্রভৃতি পাখি চমৎকার যোদ্ধা। মধ্যযুগের অশ্বারোহী বীরপুরুষদের প্রতীক ছিল 'শ্যেন'। এমন কি, মহিলারাও এ প্রতীক ধারণ করতেন। মধ্যযুগের অশ্বারোহী বীরপুরুষ ও মহিলাদের চিতা বা সমাধির ওপর তাঁদের সম্মানসূচক 'শ্যেন' অঙ্কিত হতো। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে বিজয়ী বীরকে বিজিত ব্যক্তির তরবারী ও শ্যেনকে সম্মান প্রদর্শন করতে হতো। সেই তরবারী ও শ্যেন বিজয়ী অধিকার করতে পারতেন না। প্রখ্যাত বীর অ্যাটিলা (Attila)-র সামরিক বাহিনীর প্রতীক ছিল শ্যেন। ঈগলকেও এ বিষয়ে প্রতীক হতে দেখা যায়। টাইটান (Titan)-দের বিরুদ্ধে জিউসের যুদ্ধকালে ঈগল তাঁর বর্শা এগিয়ে দিয়েছিল। এইজন্যেই জিউস যুদ্ধের প্রতীকরূপে ঈগলমূর্তি গ্রহণ করেন। গল্ (The Gauls)-রা তাদের হেলমেটে ঝুঁটিওয়ালা ভরত পাখির মূর্তি ব্যবহার করত।

মুরগীকে প্রাচীনকালে বলা হতো 'Son of Mars' : মার্স্ হলেন রোমানদের রণদেবতা। মুরগীর ঝুঁটিকে কেশরওয়ালা সিংহও নাকি ভয় পায়। এইজন্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহে জিতবার জন্যে অনেকেই মুরগীর প্রতিমূর্তি গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে মুরগীকে পুজো করতেও দেখা যায়। মুরগীর ডাক বিজয়ের সূচনা করে বলে বিশ্বাস। Plutarch লিখেছেন, Lacedoemonian-রা যুদ্ধে জয়ের জন্যে রণদেবতা মার্স্-এর কাছে মুরগী বলি দিত। Pallas-এর শিরস্ত্রাণে, Idomeneus-এর ঢালে, Caria-র অধিবাসীদের বর্শা-বল্লমের ডগায় মুরগী, মুরগীর পালক বা প্রতিকৃতি থাকত। Caria-র অধিবাসীরা বর্শা-বল্লমের ডগায় মুরগী, মুরগীর পালক বা ঝুঁটির আকারে পরিধান করত বলে পারশ্যবাসীরা ওদের নামই দিয়েছিল 'মুরগী'। বিশ্ব-বিশ্রুত ম্যারাথন-যুদ্ধের প্রাক্কালে Miltiades নাকি সৈন্যদের মুরগীর লড়াই দেখিয়ে উত্তেজিত করেন। একই কথা Themistocles সম্পর্কেও কথিত হয়ে থাকে। ভেন-দেশীয় লোকেরা যুদ্ধ-যাত্রার কালে সঙ্গে দুটি মুরগী নিয়ে যেত ঃ একটি দিনের প্রহর ঘোষণা করবার জন্যে ; অপরটি সৈন্যদের উত্তেজিত করবার জন্যে। প্রাচীন রোমানরা যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মুরগীর মাধ্যমেই শুভাশুভ নির্ণয় করে নিত !

মুরগীর পেটে পাথর হয় বলে বিশ্বাস। এই পাথর গিলে খেলে মানুষ শক্তি, সাহস ও শৌর্য-বীর্য লাভ করে বলে স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা মনে করে।

পাখির সঙ্গে যুদ্ধের এই যোগ অন্য ভাবেও দেখা হয়েছে। পাখি তার আগমন-নিষ্ক্রমণ দ্বারা আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত দিতে পারে। প্রখ্যাত লোকচারণিক Alexander H. Krappe তাঁর একটি সুলিখিত প্রবন্ধে (Warning Animals : Folklore (London) : Vol. Lix, March 1948, pp. 8—15) এ বিষয়ে লিখেছেন : "……just prior to the French invasion (under Louis xiv) all storks on the right bank of the Rhine (Baden-Durlach and else where) left their nest and even their young ones, as though they foresaw the coming devastation. Among Swiss country-folk an early departure of migretory birds means war. Similarly, if storks leave

their nests and move to other nests constructed hurriedly on trees in the field, it is a sign of impending war."

এ সব কারণে পাখিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতীক বলে স্বীকার করা হয়েছে ॥

১১...

ফল-ফসলের প্রাচুর্য-প্রচুরতা ও কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধির প্রতীক রূপেও পাখি গৃহীত হয়েছে। সূর্যরশ্মি ব্যতীত কৃষিকর্ম সম্ভব নয়। সূর্যরশ্মির প্রাকৃত ও যথার্থ ভূমিকা ছাড়াও একটি আলংকারিক ও রূপকময় অর্থ আছে: প্রখর সূর্যালোক পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। কৃষিকর্মের ভূমি স্ত্রী-দেহ। সূর্যই তাই সকল ফসল উৎপাদনের মূল কর্তা। এই জন্যই যে সব পাখী 'Sun bird' এবং 'Solar bird', দেখা যায়, তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে fecundity ও fertility-র প্রতীক হয়েছে। জমি উপযুক্ত পরিমাণে উর্বর হলে তবেই প্রচুর শস্য জন্মায়। এইজন্যে যাদের সঙ্গে 'প্রচুরতা'র সংস্রব আছে, তারাই উর্বরতার প্রতীক হয়েছে। যেমন, সাপ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি। এরা এককালে একসঙ্গে বা পর পর ডিম পেড়ে যায়। সংখ্যা এখানে প্রাথমিক ও সহজ দৃষ্টিতেই 'প্রচুরতা'-জ্ঞাপক হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আরো একটি দিকও আছে: নিশ্ছিদ্র ডিমের খোলা যেন এমন একটি সম্পুট যা সঞ্চয়েরও নির্দেশক। উর্বরতার প্রতীক-জ্ঞানেই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের রাভারমণীরা গর্ভবতী হলে ডিম খায় না। উর্বরতার সঙ্গে সঞ্চয়ের একটি যোগ আছে বলেই রাভাদের বাড়ির উত্তর ঘরের উত্তর কোণে যে 'থানশিরি' ('স্থানশ্রী') থাকে, তাতে একটি মাটির পাত্রে কিছু চাল ও ডিম দেওয়া হয়।

শুধু যে কৃষিকর্মের সঙ্গেই এই প্রাচুর্য ও উর্বরতা যুক্ত, তা নয়। নারী বসুন্ধরা তুল্যা, নারীর সন্তান বসুন্ধরার ফুল-ফল-ফসলের মতো। এই জন্যে উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত পাখি প্রসবের সঙ্গে যুক্ত, অথবা গৃহদেবতার প্রিয় হয়ে থাকে। যেমন, মুরগী ল্যাটোনা (Latona)-র প্রসবকালে মুরগী সহায়ক হয়েছিল। সহজ প্রসবের সঙ্গে এখনও মুরগী জড়িত। সেই জন্যেই গৃহদেবতা 'Lar'-এর প্রিয়। এর ফলে মুরগী মানুষেরই বিকল্প বা প্রতীক হয়ে গেছে। তাই, বহু আচার-অনুষ্ঠানে যে সব ক্ষেত্রে প্রাচীন কালে নরবলি দেওয়া হতো, সে সব স্থলে মানুষের বদলে মুরগীই বলি দেওয়া হয়।

জন্মের সঙ্গে কারণ রূপে থাকে বিবাহ। এই জন্যেই দক্ষিণ স্লাভদের বিবাহে মুরগী একটি ভূমিকা নিয়ে থাকে। হাঙ্গেরীতে বিয়ের শোভাযাত্রার বরের হাতে থাকে একটি মুরগী অথবা মুরগীর প্রতিকৃতি। ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত বিবাহে যৌতুক হিসেবে হাঁস-মুরগী দিতেই হয়। কোথাও বা বাগদান কালে পাত্রীর বাড়ি থেকে এক জোড়া হাঁস পাত্রের বাড়িতে প্রেরণ করা হয়। শুধু প্রাচ্যেই নয়, ফ্রান্স ও মস্কোতে নব দম্পতিকে হাঁস উপহার দেওয়া হয়। চীন দেশে বিয়ের দিনের বিশেষ

বিশেষ অনুষ্ঠান হলো—প্রত্যূষে ও প্রদোষে সূর্যের প্রতি হাঁস উৎসর্গ করা। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী ও উপজাতিদের বিবাহের মধ্যেও এ প্রথা চলিত আছে। ভারতে ও চীনে হাঁস দাম্পত্যনিষ্ঠা ও পুংশক্তির প্রতীক, এখানে এ প্রসঙ্গে সে কথা আবার স্মরণ করা যেতে পারে।

এই জন্যেই সাইবেরিয়ার ওঝারা বন্ধ্যা নারীকে গর্ভধারণক্ষম করাবার জন্যে নারীকে অর্ধশায়িত করে তার কোলে একটি পাখি বা তৈরি করা নকল পাখি ফেলে দেয়। ঠিক যেন বরিশাল জেলার হাতুড়ে কবিরাজদের গৃহীত পদ্ধতি: "মঙ্গলবারে উড়ন্ত পায়রার দেহ থেকে খসে পড়া কোনো পালক যদি মাটিতে পড়বার আগেই লুফে নিয়ে বন্ধ্যা নারীর দেহে স্পর্শ করানো যায় তবে সে সন্তানবতী হয়।" পায়রা এখানে উর্বরতার প্রতীক, পালকটি একটি জননেন্দ্রিয়। পায়রার উর্বরতা শক্তির জন্যেই "বিয়ের পর যদি বারবার কারো বউ মরে যায়, তবে আর একটি বিয়ে করবার আগে সে পায়রা বা কলা গাছ বিয়ে করে নেয়।" আমার মনে হয়, পায়রা এখানে কেবলই অশুভ দৃষ্টির প্রকোপকে দূরীভূত করবে না; সেই সঙ্গে পারিবারিক জনশক্তির বর্ধনকারিণীর জীবনও নিরাপদ করবে।

ময়ূরও এই রকম উর্বরতার প্রতীক। "পুত্র কামনায় বাঙলাদেশে কার্তিক পুজোর রীতি আছে। তার মানে, বোঝা যাচ্ছে কার্তিক জনন-দেবতা, উর্বরতা বৃদ্ধির প্রতীক; সে দিক থেকে কৃষি দেবতাও।" যথার্থই তাই। তবে, কার্তিক নিজে যতখানি, তার চেয়ে তাঁর বাহন ময়ূর এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ময়ূরের সন্তানোৎপাদন সম্পর্কে সারা ভারতে নানা প্রকার বিশ্বাস চলিত আছে এ জন্যেই। ভারতের বহু মানুষের মনেই এই বিশ্বাস আছে, সঙ্গম ব্যতীতই ময়ূরী গর্ভবতী হয়—ময়ূরের ভূপাতিত রেতঃ পান করে অথবা তার অশ্রু পান করে। সংগম ব্যতীতই যে পাখি সন্তানোৎপাদনে সক্ষম বলে কথিত হয়, স্বাভাবিক কারণেই সে পাখি উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এই জন্যেই রাজপুতদের বিবাহকালে গৃহদ্বারে নির্মিত তোরণের ওপর ময়ূরমূর্তি স্থাপিত থাকে। গুজরাটীদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, কোনো ব্যক্তির বিদেশ যাত্রার কালে, ময়ূর যদি দুবার ডাকে, তবে তার স্ত্রী-লাভ বা বিবাহ হবে।

ঘুঘু পাখিও উর্বরতার প্রতীক। প্রেম ও উর্বরতার অনেক দেবতার (যেমন, Ishtar এবং Aphrodite) কাছেই এ পাখি প্রিয়তা অর্জন করেছে এ জন্যে। এ কারণেই ওই সব দেবতার নামে এককালে ঘুঘু উৎসর্গ করা বা বলি দেওয়া হতো।

অতঃপর ডিমের প্রসঙ্গ। প্রাচীনকাল থেকেই ডিম নানা ভাবনার প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে। মানুষ এবং শস্যক্ষেত্র—উভয়ক্ষেত্রেই এটি উর্বরতা বৃদ্ধির প্রতীক। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে একটি নিয়ম ছিল: নব বিবাহিত বধূকে তার শ্বশুরালয়ে প্রথম প্রবেশ করেই একটি ডিম ভাঙতে হতো, যাতে সে সন্তানবতী হতে পারে। জার্মান এবং স্লাভরা ইস্টারের পূর্ববর্তী বৃহস্পতিবার দিন তাদের লাঙলে ডিম, রুটি, ময়দা মিশ্রিত করে মাখাত, যাতে ফসল ভালো হয়। পোলট্রিকে অমংগল-মুক্ত করবার জন্যে নানা সংস্কার চলিত ছিল: মধ্য আমেরিকার Miskito Indian-রা ডিমের খোলা জমিয়ে রাখত। চেকোস্লোভাকিয়াতে Shrove Tuesday-তে একজন

লোক সারা অঙ্গে খড়কুটোর পোষাক পরে গ্রামের চারদিকে ঘুরত, স্ত্রীলোকেরা তার সেই পোষাক থেকে খড়কুটো নিয়ে মুরগীর খোঁয়াড়ে রেখে দিত।

ধর্ম ঠাকুরের পুজো এবং শিবের গাজন আসলে সূর্যের পুজো। সূর্যের রঙ, সাদা (রোদে সব কিছু দেখা যায় বলে) এবং কোনো প্রকার 'রঞ্জনতা' যাতে নেই সেই 'নিরঞ্জন'কে সাদা বলে কল্পনা করবার জন্যে জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-রঙপুরে ধর্মের উদ্দেশে শ্বেত পারাবত উৎসর্গ করা হয়; বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন তিস্তা নদীর উদ্দেশে ওই অঞ্চলের মুসলমানেরা শ্বেত মুরগী নিবেদন করে থাকে। সূর্য ও নদী কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি করে, এবং তিস্তাও এখানে সূর্যরূপে কল্পিত। পশ্চিমবঙ্গে-ও ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশে হাঁস-পায়রা বলি দেওয়া হয়। ছোটো-নাগপুরের 'কিষাণ' বা 'নাগেশ্বর' উপজাতির লোকেরা সূর্য পুজার কালে সাদা মুরগী উৎসর্গ করে। ধর্ম ও শিব যদি সূর্য হন, এবং পৃথিবীর বহু দেশে যেখানে সূর্যের উদ্দেশে মুরগী নিবেদন করা হয়, সেখানে সহজেই এদের মধ্যে একটি যোগ অনুভব করা যায়। মুরগী থেকে তেমনি মুরগীর ডিমে এটি সঞ্চারিত হয়েছে সীমান্ত বাঙলায়।

ধলভূম, সিংভূম এবং মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে শিবের গাজন উপলক্ষে যে ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে বলে 'কামিনা' ঘট। তাঁর 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' (প্রথম সং, ফাল্গুন ১৩৭১) বইতে ডঃ সুধীরকুমার করণ লিখেছেন: "কামিনা ঘট' মাথায় বহন করে পাটভক্তা যে পথ দিয়ে আসে, সে পথের উপর একটি মুরগীর ডিম ভেঙে ফেলার নিয়ম আছে। কোন কোন অঞ্চলে ডিমটিকে না ভেঙে রাস্তার উপর মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়; সেই রাস্তা মাড়িয়ে গাজনের ভক্তগণকে আসতে হয়।"—পৃ ৫৭।

এবং, তারপর: "অন্যান্য হিন্দু দেবীর ঘটের মতো কামিনা ঘটকে বিসর্জন দেওয়া হয় না। কোন কোন অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে একটি মুরগীর ডিম রাখা হয়, তার ওপরে কামিনা ঘটকে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়।"—পৃ. ৫৮।

মাটির ভেতর ডিম রাখা বসুন্ধরার গর্ভস্থ ফসল এবং গুপ্তধনের প্রতীক। শস্য ক্ষেতের উর্বরতা বাড়াতে মুরগীর ভূমিকা প্রসঙ্গে আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই।

ধান রোপণ ও কর্তনের বিভিন্ন স্তরে সাঁওতালরা মুরগী উৎসর্গ করে থাকে। যেমন, আষাঢ় মাসে ধানের চারা তৈরী করবার সময় প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটি করে মুরগি উৎসর্গ করতে হয়। একে বলে 'এরোছিম'। 'ছিম' মানে মুরগি। ধান রোয়া শেষ হলে শ্রাবণ মাসে ভালো ফসলের আশায় দেবতার উদ্দেশে মুরগি নিবেদন করা হয়। একে 'হাড়িয়া ছিম' বলে। পৌষমাসে ধান কাটা শেষ হলে হয় 'সহরায় পরব'। 'সহরায়' স্নানের পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামের নায়কের কাছে তিনটে মুরগি নিয়ে আসা হয়। দুটো সাদা, আর একটি বাদামী রঙের। পরদিন সকালে নায়ক স্নান সেরে পূর্বদিকে (কারণ, এদিকেই সূর্য ওঠে) রেখে বাদামী রঙের মুরগিটিকে জলের ছিটে এবং ডানা-মাথায় সিঁদুর দিয়ে পবিত্র করে নিয়ে, ঘরের চালের ওপর দিয়ে চারিয়ে বেড়ায়। তখনকার উচ্চারিত মন্ত্রে দেবতা ও পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদ কামনা করা হয়; ঘরের চাল স্পষ্টতই আকাশ ও সূর্য।

এই অনুষ্ঠানেরই অঙ্গ হিসেবে ছেলে-মেয়েদের গাওয়া একটি গানে মুরগিকে 'মা' বলা হয়েছে, যার অনুবাদ এই,

কুকড়া মা ডাকি গেল,
পাওয়া মা পাটি খেল। ..

'কুকড়া মা' মাতা বসুন্ধরা এখানে।

দার্জিলিঙ জেলার লিম্বু উপজাতির লোকেরা বছরের চাষবাস শুরু করবার আগে বিশেষ দেবীর উদ্দেশে হাঁস ইত্যাদি বলি দেয়। দক্ষিণ মানভূমের অধিবাসী, সাঁওতালদের একটি উপ বিভাগ হলো "দেশওয়ালী মাঝি"। ধান কাটবার আগে এদের পুরোহিত ('এলয়া') 'জাতল' পুজো করেন। তারপর গ্রামের প্রত্যেক ধান-ক্ষেত থেকে এক মুঠো করে ধান নিয়ে এসে মুরগী ও পাখিদের খেতে দেওয়া হয়। এর পর ধান কাটা শুরু হয়। এ হলো মুরগীর কৃপায় যে ধান পাওয়া গেছে, সেই ধান ঘরে তোলার আগে মুরগিকে নিবেদন করা। E. T Dalton তাঁর 'Descriptive Ethnology of Bengal' (Reprinted, 1960) বইতে লিখেছেন (P.138): বিহার ও বাঙলার ভূঁইয়া উপজাতির লোকরা ধান রোপণের পূর্বে তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'বোরাম'-এর উদ্দেশে সাদা মুরগী উৎসর্গ করে। ওই বইতেই ডাল্টন আরো লিখেছেন (P. 147), বেঁদকর-কেওঞ্জর-শবর উপজাতীয়েরা 'ঠাকুর' নামে এক দেবীর উপাসনা করে থাকে। প্রতি দশ বৎসরে তাঁর উদ্দেশে অন্যান্য পশুসহ বারোটি মুরগী একসঙ্গে নিবেদন করা হয়। আমার মনে হয়, এই বারোটি মুরগী সূর্যের দ্বাদশ রাশির প্রতীক।

ভারতের এক বিশেষ কুকি গোষ্ঠির 'Chhokona নামে শস্যোৎসবের সময় একটি লাল মুরগির গলা হাতে টিপে হত্যা করে পূর্বদিকে, সূর্যের প্রতি নিবেদন করা হয়,—রোদ ও বৃষ্টির কামনায়। মুরগিটির এই লাল রঙ উদীয়মান সূর্যের রঙ (Ramesh Chandra Roy : Notes on the Chawte Kuki clan : Man in India : Vol XVI, Nos. 2+3, April-September, 1936, pp 135—155)। ননীমাধব চৌধুরী তাঁর একটি প্রবন্ধে (The Sun as a Folk-God : Man in India, Vol. XXI, No 1. January-March, 1941, pp. 1—14) জানিয়েছেন, কেঁওঝর ও বোনাই-এর ভূঁইয়ারা সূর্যকে 'ধরম দেও' বলে এবং শস্য রোপণের কালে তাঁর উদ্দেশে শ্বেত মুরগি নিবেদন করে। এই শ্বেত রঙ পূর্ণরূপে উদিত সূর্যের রঙ।

উর্বরতার প্রতীক বলেই রাঢ় বঙ্গ এবং বাঙলার সংলগ্ন বিহার অঞ্চলে 'কুক্কুটী ব্রতে'র প্রচলন হয়েছে। 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' (প্রথম সং ১৯৭২) গ্রন্থে ডাঃ অমলেন্দু মিত্র আরো কিছু তথ্য দিয়েছেন: সিউড়ী থানায় রাইপুর গ্রামে বাউরীদের এক দেবীকে পাওয়া যায়, যিনি 'মুরগীঠাকরুণ' নামে পরিচিতা। এই 'মুরগী ঠাকরুণ'কে তিনি শস্যদেবী বলে মনে করেন। সত্যিই তাই। তাঁর আর একটি তথ্য : "সঁওতালি ভাষায় 'পাহুড়' অর্থ—উৎসর্গের জন্যে রক্ষিত মোরগ। . পাহুড় অর্থে মোরগ গ্রহণ করে অনুমান করা যেতে পারে যে শব্দটি অষ্ট্রিক মূল থেকে জৈনরা প্রাকৃতে গ্রহণ করে থাকবেন। পরে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।" পৃ. ৩০-৩১

মুরগীকে শস্যের সঙ্গে যুক্ত করে অথবা শস্যেরই প্রতীক করে পৃথিবীর বহুদেশেই দেখা হয়েছে বলে মুরগী 'Corn spirit' রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'The golden-bough' (Abridged edition, 1971) বইতে Sir J. G. Frazer-এ বিষয়ে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন (pp. 592—594)। তাঁর প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমার এই মনে হয়েছে ঃ—ভারতীয় এবং প্রাচ্য কৃষকদের কাছে, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে শস্য রোপণ কালেই মুরগীর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য কৃষকদের কাছে কিন্তু রোপণকালে মুরগী-সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠান নেই, অন্তত ফ্রেজার তা দেন নি; পাশ্চাত্ত্য দেশে ফসল কাটার কালেই কেবল মুরগীকে নিয়ে নানা আচার-সংস্কার দেখা যায়। এই জন্যে শস্য তুলে নেবার পর শেষ আঁটি বাঁধার সঙ্গে মুরগীকে নিয়ে নানা দেশে এতো আচার-সংস্কার; এই জন্যেই ফসলকাটার পর জীবন্ত মুরগী ক্ষেতে ছেড়ে দেবার কথা বলা হয়েছে—একই কারণে ক্ষেতে মুরগী হত্যাও করা হয়। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দুই বিপরীত মনোভাব ধরা পড়েছে ঃ মুরগীর উর্বরতা শক্তির প্রতি একটি শুভ ও দৈবী বিশ্বাস, সৃষ্টিশক্তির প্রতি একটি শ্রদ্ধাসম্মত কৃতজ্ঞতার বোধ প্রাচ্য দেশে যে পরিমাণে মেলে পাশ্চাত্ত্যের আচার-বিশ্বাসের মধ্যে সে ভাবটি নেই; যেন একটি 'অপদেবতা'র ভাব মুরগীর প্রতি আরোপিত হয়েছে।

পাখির এই বিশেষ শক্তির জন্যেই পাখির দৈহিক দিককে অনুকরণ করে শস্যক্ষেত্রে বা বিশেষ-বিশেষ দিনে নাচা হয়, যাকে বলে 'Imitative dance' বা 'Mimetic dance'. এই অনুকরণাত্মক ও অভিনয়াত্মক নৃত্য, যা 'পক্ষিনৃত্য' নামে কথিত, তারও মূল উদ্দেশ্য পাখির উর্বরতা শক্তিকে শস্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত করে দেওয়া। উর্বরতার সঙ্গে যৌনক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে বলেই পাখি লিঙ্গ, প্রেম ও বিবাহের প্রতীক হয়েছে। যৌনক্রিয়ার ফল নারী-দেহেই সংলগ্ন থাকে; আমরা আগেই দেখেছি, প্রেম ও বিবাহের গানে পুরুষ যতখানি পাখির প্রতীক হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে হয়েছে নারী। পাখির মধ্যে রমণীধর্ম পুরুষের ধর্ম অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট॥

১২·

এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে এবং সপ্তম পরিচ্ছেদের শুরুতে যে কথাগুলো বলেছিলাম, নতুন প্রসঙ্গে যাবার আগে সে কথাগুলো আর একবার স্মরণ করা দরকার। বলেছিলাম, পাখিকে অবলম্বন করে রচিত কিছু প্রতীককে খুবই সহজ যুক্তিতে বুঝে নেওয়া যায়, তাতে কোনো গভীর রহস্য-জটিলতা নেই। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তারই দৃষ্টান্ত দিয়েছি। সপ্তম থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যা প্রতিপাদন করতে চেয়েছি, তা হলো, বেশির ভাগ প্রতীকই কোনো সরল-সহজ-স্বাভাবিক যুক্তির পথ ধরে রচিত হয় নি। তাতে আছে জাতির ইতিহাস-সংস্কৃতির নানা মিশ্রণ, উত্থান-পতন; তাতে আছে, যাদু ও রহস্যের কুহেলিকা; তাতে আছে, প্রত্যক্ষ

কারণের বদলে পরোক্ষ নানা জটিল দিক। এই জন্যেই আমার মনে হয়, এখানে সভ্যতার অগ্রগতি ও বিবর্ধন এবং বিবর্তন ধরা পড়ে : সভ্যতার আদিস্তরেই সরল-সহজ প্রতীকগুলো আবির্ভূত হয়েছে ; এক-একটি জাতির জীবনে নানা সংস্কৃতি ও শাসনের মিশ্রণের ফলেই পরে এসেছে জটিলতা-গভীরতা-রহস্য।

এই জন্যেই সভ্য মানুষের গ্রন্থ-শাস্ত্রাদিতে যখন পাখিকে প্রতীক হতে দেখা যায়, তখন পাখির কোনো চিহ্নই আর মেলে না ; পাখি তখন কিছু চিহ্ন ও সংকেতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তা আরো জটিল হয়ে দেখা দেয়। এর চমৎকার ও চূড়ান্ত উদাহরণ, ভারতীয় নাচের মুদ্রায় প্রতীক হিসেবে পাখি। কেবলমাত্র দুটি হাতের দশটি আঙুলের নানা রকম বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এক-একটি বিশেষ ধরণের পাখিকে নির্দেশ করবার জন্যে হাজার বছর ধরে যেখানে একটি পরিপূর্ণ শাস্ত্রই গড়ে উঠেছে, সেখানে পক্ষি-প্রতীকতা কতো উচ্চ, সূক্ষ্ম ও গভীর এবং জটিল, সহজেই তা অনুমেয়। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

প্রতীকের ক্ষেত্রে আর একটি জটিলতা সেখানে, যেখানে মানুষই পাখিতে পরিণত হয় এবং এক-একজনের বিশেষত্ব অনুযায়ী এক-একটি বিশেষ ধরণের পাখিতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রসঙ্গে 'Aetiological myth'-এর কথা অবশ্যই ওঠে। অধিকাংশ 'B rd myth'-গুলোতেই দেখা যায়, পাখিরা সবাই আগে মানুষ ছিল ; তাদের পূর্বজন্মে কৃত দোষ-গুণ অনুযায়ী এক-একটি পাখিতে পরিশেষে পরিণত হয়েছে। উল্টো করে বললে বলা যায়, এক-একটি পাখিকে এক-একটি মানবিক ভাবের প্রতীক যেমন করা হয়েছে, তেমনি মানুষের এক-একটি কাজকে এক-একটি পাখির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মানুষ ও পাখি এভাবে এখানে একাত্ম হয়ে গেছে : স্টীথ টমসন তাঁর ছয় খণ্ডে পূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত সূচীগ্রন্থে বিভিন্ন লোককথায় তা লক্ষ করেছেন। ঘুঘু মানুষে পরিণত হচ্ছে (D354), মানুষ ঘুঘুতে পরিণত হচ্ছে (D154·1), ঘুঘুরূপে মানুষের পুনরুজ্জীবন ঘটছে (E613 6)। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যে সব প্রতীকের কথা বলেছি, তার সবই পাখির রূপ-গুণ-কর্ম-বিশেষত্বকে ভিত্তি করে মানবিক জগতের ভাবনার দ্যোতক। কিন্তু মানবিক জগৎ থেকে পাখির জগতে কি ভাবে প্রতীক সঞ্চারিত হয় ('Bird-myth'-গুলো প্রায় সবই এই দলে পড়ে) তার উদাহরণ দেওয়া হয় নি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা 'Bird myth'-নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কাজেই সেখানেই এর উদাহরণ দিয়েছি। অন্য দু-একটি দৃষ্টান্ত এই :

যেমন, সাঁওতালদের মধ্যে : স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত নারীকে সাঁওতালরা বলে 'ছাড়ই কুড়ী'। 'সাঁওতালী কথা' (দ্বিতীয় সং ১৯৫৫) গ্রন্থের লেখক সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক জানাচ্ছেন : "ছাড়ই কুড়ী ময়না পাখী কেবল মাথার বাহার"! "ছাড়ই কুড়ী সবুজ বুলবুল, হাজার রকমে ডাকে"। "ছাড়ই কুড়ী তিতির পাখী, সকলকে ভুলিয়ে নেয়"।—পৃ. ৮৪।

পাখির কিছু কিছু দৈহিক ক্ষমতা বা বিশেষত্ব মানুষের মতো বলেই এই ধরণের কল্পনা করা হয়। শকুনশিশুর কান্না ঠিক মানবশিশুর কান্নার মতো। কোনো কোনো পাখির হাসি মানুষের মতো, যেমন—'কুকাবুরা'র হাসি। শেফিল্ডে Curlew-কে বলে 'Gabriel's hounds'; এদের সম্মিলিত ডাককে সত্যিই শিকারি কুকুর বলে মনে হয়। Curlew যখন নিম্নস্বরে ডাকে, তখন মানুষের কথা বলার মতো শোনায়। এই জন্যেই Curlew-কে goblin বলে মনে করা হয়। দুটি হুতোম প্যাঁচার নিম্নস্বরের ডাককেও মানুষের কথা বলে মনে হয়। অথবা, 'অট্টহাস' পাখির হাসি (জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের অন্তর্গত অরণ্যে এ পাখি দেখা যায়, দীর্ঘদেহী)। Thompson Indian-রা the great northern diver পাখিকে বলে 'the loon'. এই 'লুন 'পাখির ডাকের সংগে মনুষ্য-কণ্ঠের সাদৃশ্য আছে। যে সব শকুনির মাথায় লাল মাংসের ঝুঁটি আছে তাকে 'গৃধিনী' বলে; 'গৃধিনী' থেকে ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মেই 'গিন্নী' শকুন হতে পারে, হয়েছেও। কিন্তু, ওই লাল ঝুঁটি সধবা নারীর সিঁদুরের প্রতিরূপ বলে মনে হওয়ায়, এই 'গিন্নী' শব্দ 'গৃধিনী' ও 'গৃহিণী' শব্দের সংগে মিলে গেছে। মানুষই এখানে পাখিতে পরিণত। সাদৃশ্যবোধই সকল Bird myth-এর মূল উৎস।

সাদৃশ্য ছাড়া এর অপর কারণ এক-একটি পাখি সম্পর্কে বিশেষ বিশ্বাস অথবা, এক পাখি সম্পর্কে চলিত কোনো বিশ্বাস নানা কারণে অপর পাখিতে সঞ্চারিত হয়ে পড়া। যেমন, স্কটল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডে রাজহাঁস বা মরাল (the swan) হত্যা করা অকল্যাণ-জনক; তাই কোথাও কোথাও বিশ্বাস আছে, ধর্মপ্রাণা কুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা রাজহাঁস হয়ে যায়। রাশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে মনে করা হয়, মৃত শিশুরা আবাবিল (the swallow) হয়ে যায়। ব্রিটানিতে বিশ্বাস আছে, যে সব বালকেরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই মারা যায়, তারা পাখি হয়ে যায়। গ্রেট ব্রিটেনের পূর্ব উপকূলের জেলেদের বিশ্বাস, তারা মরলে সিন্ধু-শকুন (the sea-gull) হয়ে যাবে। আইরিশ জেলেরা বিশ্বাস করে, যারা সমুদ্রে ডুবে মরে, তারা সিন্ধু-শকুন হয়। ব্রিটানিতে ছেলেরা বিশ্বাস করে, জাহাজের যে 'কাপ্তান' নাবিকদের প্রতি অত্যাচার করে, তারাই Petrel পাখিতে পরিণত হয়। অন্য বিশ্বাস অনুযায়ী, Petrel পাখিরা হলো সলিল-সমাধিস্থ জাহাজকর্মী, জীবিত জাহাজ-কর্মীদের প্রতি সমবেদনাপূর্ণ; কখনো বা সাগর-জলে ডোবা ব্যক্তিদের ওপর উড়ে বেড়ানো পাখি। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে Petrel-কে তাই অশুভকারী এক পাখী রূপে দেখা হয়। পোর্তুগালে মনে করা হয়, খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার আগেই যে সব শিশুর মৃত্যু ঘটে তারাই হয় "Seven whistlers"। মাথার উপর 'Golden Plover' ডাকলে ল্যাংকাশায়ারে বিশ্বাস করা হয়, যে সব ইহুদি যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল, তাদেরই আত্মা ওভাবে ডাকছে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের এক-একটি গুণ ধর্ম-বিশেষত্ব নিয়ে মানুষ এক-এক ধরণের পাখি হয়ে উঠেছে। কিন্তু জটিলতা এখানে নয়। এক দেশে বা অঞ্চলে প্রযুক্ত

ও কল্যাণময় কর্মের সূচক রূপে মানুষ যে পাখিটিকে বেছে নেয়, অন্য অঞ্চলে বা দেশেও যে সেই পাখিটিই সেই কর্মের প্রতীক রূপে গৃহীত হবে, এমন কোনো কথা নেই। হয়েছেও তাই। একদেশের পক্ষে যা শুভ কর্মের প্রতীক অপর দেশে তাই ই আবার অশুভ কর্মের সূচক। পাখির প্রতীকত্তা সম্পর্কে বিরুদ্ধ ও বিপরীত ধারণা এই ভাবেই জন্ম নেয়। এক পাখি সম্পর্কে চলিত সংস্কার-বিশ্বাস অপর পাখিতে সঞ্চালিত হয়। সাধারণ মানুষের পাখি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টির অভাবেই একাধিক পাখি এক নামে মিশে যায়।

কিন্তু, কেবল সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক বোধের অসম্পূর্ণতার ফলেই যে বিভিন্ন নামের পাখি সংমিশ্রিত হয় বা এক পাখির সম্পর্কীয় ধারণা অন্য পাখিতে সংক্রামিত হয়, তা সর্বাংশে সত্য নয়। আরো বড়ো কারণ এর পেছনে আছে। সাংস্কৃতিক জগতের নানা উত্থান-পতন, বিস্মরণ ও বিপ্লব ইত্যাদি কারণেই এটি ঘটে, উপরন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস-ভূগোলও এই মিশ্রণ ও বিস্মরণের পশ্চাতে থাকে।

যেমন, Curlew'-কে 'Seven Whistlers' বলে ভুল করার পেছনে আছে দুয়ের কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য। তেমনি 'Seven Whistlers'-কে 'Gabriel's hounds' বলার পেছনে আছে 'Wild Hunt' বিশ্বাস। জার্মানী প্রভৃতি দেশে বিশ্বাস আছে, ঝড়ের রাতে আকাশচারী অশরীরী আত্মা শিকারী বন্য কুকুর হয়ে ঘুরে বেড়ায়, পার্থিব কুকুরেরা সেই ডাকে সুর মেলায়। এখানেও কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য মিশ্রণের কারণ। এক ধরণের দাঁড়কাক (the Raven)-কে 'Odin' (প্রাচীন ব্রিটনদের মৃত্যুর দেবতা বিশেষ)-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। এর থেকেই Night Raven সম্পর্কে নানা সংস্কারের কারণ বোঝা যায়। Night Raven-এর পা কুকুরের মতো বলে কল্পনা করা হয়। যেহেতু 'Night Raven' এবং 'Odin' একাত্মা, এবং যেহেতু কল্পনা করা হয়, Odin বন্য শিকারি কুকুরদের নিয়ে আকাশে যখন চলে বেড়ান, মাটির শিকারী কুকুররাও ডেকে ওঠে, সেই হেতু Night Raven (এবং অন্যান্য সব নিশাচর পাখি) মানুষের মৃত্যু ও মন্দভাগ্যের সূচনা করে। সবার মূলে তাই রয়েছে 'Wild Hunt myth'।

খ্রীষ্টধর্মে প্রচারের পূর্বে গ্রীস ও রোমে ময়ূর শুভশক্তির প্রতীক ছিল ; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবার পর ময়ূর সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়েছিল, নতুবা ইংলণ্ডে ময়ূর অশুভ শক্তির প্রতীক বলে বিবেচিত হতো না। অথচ, প্রাচ্য সংস্কৃতিতে আজও ময়ূর এক শুভশক্তি বলে বিবেচিত। দাঁড়কাক (the Raven) সম্পর্কেও ব্রিটেন ও ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বিপরীত বিশ্বাস আছে, শুভ ও অশুভতার মিশ্রণে। অনেকের ধারণা, এখানেও প্রাচীন গ্রীকদের 'Heathenism' এবং তার পরবর্তীকালে খ্রীষ্ট-সংস্কৃতি এর পেছনে কাজ করেছে। প্রাচীন গ্রীসে কাককে সূর্যের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বেশ শুভশক্তির প্রতীক করা হয়েছিল ; সপ্তদশ শতকের শেষে আয়ারল্যাণ্ডে বিশ্বাস ছিল, শ্বেত-পক্ষ দাঁড়কাক কোনো মানুষের ডান হাতের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ডাকলে তা শুভংকর। কিন্তু, কাকের সঙ্গে মৃত্যুর আসঙ্গকেও সেই সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ভারতবর্ষেও কাক সম্পর্কে দুই বিরুদ্ধ সংস্কার চলিত। একদিকে

কাক বিজ্ঞ ও মৃতের প্রতি নিবেদিত পিণ্ড গ্রহণ করে বলে সম্মানিত, অপরদিকে অশুভকারী বলে নিন্দার্হ। ম্যাগপাই সম্পর্কেও এই বিরুদ্ধ বিশ্বাস চলিত আছে। কাক থেকেই ম্যাগপাইতে এ বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে হয়। যে সব পাখি মৃত্যুর সূচক (যেমন, কাক, পেঁচা, শকুন, 'ডাইভার') তারা যে কোনো কারণেই হোক একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কাকের ক্ষমতা বা বিশেষত্ব ক্রমান্বয়ে একাধিক পাখিতে সঞ্চারিত হয়েছে। যেমন 'Swan' থেকে Duck, Goose, Crane, Flemingo-তে ভাবনাটি সঞ্চারিত। যেমন, শ্যেন-বাজ-ঈগল-চিল-শকুন ; কিংবা কোকিল-সারস-Heathcock-তিতির-নাইটিঙ্গেল-আবাবিল-চড়ুই-হুপো ; কিংবা, কাক-প্যাঁচা-সারস-ম্যাগপাই ; কিংবা, কাঠঠোকরা-মার্টিন-ভরত-বটের ; কিংবা, হাঁস-মুরগী ; কিংবা, কপোত-ঘুঘু-হাঁস-পাতিহাঁস-রাজহাঁস ,—এই সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে, কয়েকটি পাখি মিলে এক-একটি গুচ্ছ রচনা করে, একের ধারণা অপরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ফলে প্রতীকের মধ্যে আসে জটিলতা, বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য।

দেব-দেবীদের বাহনও এক প্রকার প্রতীকই বটে। বাহনগুলো দেবদেবীদের প্রতীক হিসেবে আজ পরিণত ; কিন্তু আদিতে ছিল ঠিক তার বিপরীত : বাহনগুলিই ছিল মূল দেবতা, তার পর বাহন আজ অপ্রধান হয়ে পড়েছে। প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন মিশরে বহু দেবদেবী পশু-পাখির আকৃতি নিয়েছেন, অথবা খাঁটি পশু-পাখির রূপই বহাল আছে। অর্ধমানব, অর্ধপক্ষীর রূপ নিয়ে অর্থাৎ Theriomorphic রূপ নিয়ে মিশরের অনেক দেবদেবীই আছেন। ভারতে Theriomorphic রূপ বলতে সম্ভবত গণেশ এবং গরুড় ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই, সর্প দেবতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানবী রূপ ধরেছেন, ক্বচিৎ তাঁর এই মিশ্র মূর্তি মেলে। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকের বাহনগুলো তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে নিজস্ব রূপকে অবিকৃতই রেখেছে। অন্যান্য দেবদেবীর বাহনের মধ্যে ব্রহ্মার হংস ; বিষ্ণুর গরুড় ; শনির শকুনি, কামদেবের শুক, ইত্যাদি সকলেরই পরিচিত। পক্ষিপূজাকে ভিত্তি করে এইসব দেবদেবীর বাহন কল্পিত হয়েছে। সরস্বতীর বাহন রূপে ময়ূর, হাঁস ও কোকিল—এই তিনটি পাখির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কোকিল পার্বতীর প্রতীক বলে ভারতের কোনো কোনো অংশে গৃহীত, ওই সব অঞ্চলে 'কোকিলব্রত' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৌদ্ধদেবী মহামায়ূরীর বাহন ময়ূর। মহাযানী বৌদ্ধদের অমিতাভ-র বাহন হাঁস বা ময়ূর ; এবং অমোঘসিদ্ধির বাহন গরুড়। জৈনদের মধ্যে ময়ূরকে বাহন করবার প্রবণতা অধিক। জৈনদের দেবসেনাপতি হরিনৈগমেষের ও সরস্বতীর বাহন ময়ূর। জৈন-তীর্থংকর বাসুপূজ্যের যক্ষকুমারের পতাকা-চিহ্ন ময়ূর ; তীর্থংকর শান্তিনাথের যক্ষিণী মহামানসীর চিহ্ন হলো ময়ূর। ধর্মঠাকুরের বাহন—উলূক।

উত্তরবঙ্গে (জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রঙপুর, দিনাজপুর) যে মনসার মূর্তি পাওয়া যায়, তা হলো এক জোড়া রক্তিম বর্ণের হাঁসের ওপর নারীরূপা উপবিষ্টা মনসা। বীরভূম জেলার সিউড়ী থানার অন্তর্গত কালীপুর গ্রামে যে তিনটি মনসা-মূর্তি আছে, তার একটির নাম 'হংসবাহিনী' ; অজয় নদীর তিন মাইল উত্তরে ঘুরিষা

গ্রামেও 'হংসবাহিনী' মনসা আছেন। 'হংসেশ্বরী' নামেও পশ্চিমবঙ্গে মনসাকে পাওয়া যায়। "মনসার ধূপাচার" নামে গ্রন্থে মনসাকে পাখির ডিম্বজাত বলা হয়েছে। সাপ থেকেই পাখির উদ্ভব হয়েছে, জীববিজ্ঞানীরা এ কথা বলেন। সুতরাং, মনসার বাহন হাঁস হওয়া যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে পাখিকে নিয়ে আঞ্চলিক প্রতীকতা দেখা যায়। যেমন, আসামে রাতের বেলায় চুনকে বলে 'বক'। কুমিল্লা জেলায় পুলিশকে বলা হয় "লাল-মোরগ"। রাজশাহীতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় "সারি-শুয়া"। হাঙ্গেরিতে লাল মুরগী আগুনের প্রতীক ॥

·১৩

পাখিকে অবলম্বন করে স্বপ্নের ব্যাখ্যার মধ্যেই পাখির প্রতীকতার চূড়ান্ত দিকটি প্রতিফলিত হয় বলে আমার মনে হয়। স্বপ্ন আজ আর নিছক স্বপ্ন নয় বা এলোমেলো ভাবে দেখা কতকগুলি অর্থহীন দৃশ্য-ঘটনা নয়, তা মানুষের মনের অবচেতনার বা নির্জ্ঞানলোকের খবর বয়ে আনে। সে হিসেবে স্বপ্ন মনের সেই গহন লোকের প্রতীক। অপর দিকে, সেই স্বপ্ন জাগ্রত মনের সচেতনতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যখন ব্যাখ্যাত হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাও করা হয় প্রতীকের আলোকেই; 'প্রতীক'-এর নিরিখেই যখন স্বপ্ন ব্যাখ্যাত হয়, তখন তাকে আর নিছক স্বপ্ন বলে না, তা হয় 'স্বপ্নতত্ত্ব'। মনস্তত্ত্বে এ 'তত্ত্ব' এক বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, স্বপ্নের মধ্যে দু'জায়গায় প্রতীক রয়েছে: যিনি স্বপ্নের দ্রষ্টা, তাঁর অবচেতন মনের প্রতীক রূপে; এবং যিনি তার ব্যাখ্যা করছেন, তিনি যে সূত্র বা তত্ত্ব বা দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করছেন, তার মধ্যে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যায় মধ্যে তফাত আছে। যখন এই ব্যাখ্যাকার মনস্তাত্ত্বিকের সূক্ষ্মতা ও প্রাজ্ঞতা নিয়ে, দর্শনতত্ত্বের জটিল ও বিচিত্র সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করেন, তখন তার মধ্যে থাকে একটি বিজ্ঞানচেতনা, এবং বিজ্ঞান মানেই objectivity ও যুক্তি; এই objectivity ও যুক্তি মোটামুটি ভাবে Rigid, তা একদেশ ও একমানুষ সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য, অপরদেশের অপর মানুষ সম্পর্কেও তেমনি। এখানে generali--sation-এর জন্যে আঞ্চলিক বিশ্বাস এবং লোক-বিশ্বাস (the folk belief) তেমন কাজ করে না।

এ হলো অভিজাত ও শিক্ষিত মানুষের স্বপ্নের কথা। কিন্তু আদিম মানুষের স্বপ্নদর্শন এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যা দুই-ই ভিন্ন। এখানে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নকে নিজের মনের অবচেতনার এক বিশিষ্ট, স্বাধীন এবং একান্ত একটি দিক বলে মানে না, মনে করে, কোনো এক রহস্যময় শক্তি এর পশ্চাতে কারণ রূপে থাকে। অনেক আদিম সমাজেই বিশ্বাস আছে, ঘুমের সময় আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে অন্যত্র পরিভ্রমণ করতে চলে যায়। স্বপ্ন হলো, আত্মার সেই রহস্যময় দুঃসাহসিক অভিযান। ফ্রেজার বলেন

আত্মা এই সময় নানা কাজ করে বেড়ায়। "The soul of a sleeper is supposed to wander away from his body and actually to visit the places, to see the persons, and to perform the acts of which he dreams."—The golden bough. P. 239. আত্মা তখন অন্যান্য ও পূর্ববর্তী মৃতব্যক্তির ভ্রমণশীল আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। সেই সব মৃতব্যক্তির আত্মাই ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মার মাধ্যমে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করেন: "Hence occurrences in dreams are portentous, for they indicate the will of the powerful dead and may therefore be used to foretell the future."—Standard dictionary of folklore, legend and mythology, P. 324.

পূর্বপুরুষ এবং সকল মৃতব্যক্তির আত্মা স্বপ্নের মাধ্যমে যে দৃশ্য-ঘটনা ব্যক্ত করলেন, তার ব্যাখ্যাও রহস্যময়। এখানেও স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন নয়। এখানেও স্বপ্নকে বাচ্যার্থে না নিয়ে লক্ষ্যার্থে নিতে হয়। স্বপ্নের মাধ্যমে এই শুভাশুভ নির্ণয়কে বলে "oneiromancy"; প্রাচীন কাল থেকেই স্বপ্নের ফলাফল বিচারকে অবলম্বন করে একটি শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্যে তো বটেই, পাশ্চাত্যেও এ বিষয়ে-গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। এইসব গ্রন্থ 'Dream book' নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে স্বপ্নের ফলাফল সম্পর্কে অনেক গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছে। স্বপ্নকে এখানে পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্যের আলোকে বিচার করা হয়। স্বপ্নদ্রষ্টার শয়নভঙ্গি, রাত্রির বিভিন্ন প্রহর, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের তিথি – ইত্যাদির পটভূমিকায় এখানে স্বপ্নফল নির্দেশ করা হয়।

পাখিকে অবলম্বন করে যে সব স্বপ্ন দেখা হয়, তার ব্যাখ্যাতেও পাখির উড়ে আসা, উড়ে যাওয়া, ডানে বা বাঁয়ে। পাখির ডাক, পাখির সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাখির এক-একটি ভঙ্গি এক-একটি ভাবনার প্রতীক।

ভারতের কোনো-কোনো আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, পাখিকে নিয়ে নানা ক্রিয়াচারের ফলে আশ্চর্যজনক নানা স্বপ্ন দেখা যায়।

স্বপ্নকে যদি ঘুমের সময় আত্মার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা কর্মাবলী রূপে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে 'Animal guardian'-এর প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে পড়ে। 'Animal guardian' হলো শিকারি পশু বা পাখিকে ব্যক্তিগত জীবনের রক্ষক বা অভিভাবকরূপে কল্পনা করে ওই বিশেষ পশু বা পাখির মূর্তি বা দেহ সঙ্গে রাখা। Hopi ভ্রমণকারীরা রাতে স্বপ্নভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সেই মূর্তি বা দেহ বালিশের তলায় রেখে দেয়, কারণ দেহ যখন ঘুমোচ্ছে, তখন অন্য শক্তিশালী আত্মা এসে দেহকে বা এই দেহেরই দুর্বলতর আত্মাকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে নানা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখিয়ে।

পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কার দিয়ে স্বপ্ন ব্যাখ্যার মৌখিক ও লৈখিক উভয় প্রকার শাস্ত্রই গড়ে তুলেছে। তবে, ভারতবর্ষ ও আরবদেশ যেন এ বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করেছে। ভারতের কথা পরে বলছি, আগে আরবের কথা বলি। আরবদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় স্বপ্নের বিষয়ের শ্রেণী ও তার প্রকৃতি (Class, kind and nature) বিচার একটি বড়ো দিক। A. S.

Jayakar তাঁর একটি সুদীর্ঘ ও সুলিখিত প্রবন্ধের (Arab interpretation of dreams about the lower animals : Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. VI, No 2) প্রারম্ভেই মন্তব্য করেছেন : "In regard to class, if the things are trees, beasts of prey or brids, they mean men···if the bird be a peacock, it means a persian, and if it be a male Ostrich, it means a Badawee or desert Arab. In regard to nature,···if it be a bird, it means a given to travelling : if it be a peacock, it m ans a handsome and wealthy person or foreign king, and so also an eagle may mean a king ; but if it be a crow. it means perfidious, unrightous and lying man."—P. 67

দেখা যাচ্ছে, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে পাখির গুণ-ধর্মেরও ভিন্নতা আসছে, ভারতবর্ষের স্বপ্ন-ব্যাখ্যাতেও তা দেখি। এ ভেদ ও ভিন্নতা অন্য অঞ্চলেও অনুসৃত হয়। ময়ূরের সঙ্গে সৌন্দর্য ও সম্পদের যোগ থেকে অনুমান করা সহজ, গ্রীস দেশের ময়ূর সম্পর্কে প্রীতিপূর্ণ ধারণা আরব দেশেও বহাল আছে। ঈগলকে রাজপ্রতিবেশে লক্ষ করা ইউরোপ-আমেরিকায় এক সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু কাক সম্পর্কে বিরূপ ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। এক-একটি পাখীকে নির্দিষ্ট একটি ভাবনার প্রতীকরূপে স্থির করে তারই আলোকে আরব দেশে স্বপ্নের ব্যাখ্যা-বিচার করা হয়।

শ্রীরাধারমণ স্মৃতিতীর্থ তাঁর "বৃহৎ স্বপ্নফল বিচার" (রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা-১, প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা নেই) নামক গ্রন্থে পাখিকে দু'ভাগে লক্ষ করেছেন : সাধারণভাবে যে কোনো পাখি ; এবং বিশেষ ভাবে কোনো একটি পাখি। তাঁর আলোচনা বলতে কিছুই নেই, কেবল নিছক বিবৃতি মাত্র। এইজন্যে তাঁর গ্রন্থ কোনো বিশিষ্টতার মর্যাদা দাবী করতে পারে না। এ. এস. জয়কারের সঙ্গে রাধারমণ স্মৃতিতীর্থের দৃষ্টিকোণের তুলনা করলে দেখা যায়, জয়কার যেখানে যুক্তি-বিশ্লেষণ ও ব্যাপকতার পরিচয় দিয়েছেন, স্মৃতিতীর্থ সেখানে বিবৃতি-সর্বস্বতার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে আছেন। স্মৃতিতীর্থ মশাই সাধারণভাবে পাখি-বিষয়ক স্বপ্নের ফল এই ভাবে বিবৃত করেছেন :

"স্বপ্নে পাখী দেখলে —অদূরে ভবিষ্যতে সৌভাগ্য সূচিত হয়ে থাকে। পাখী ধরা —অর্থলাভ ও সৌভাগ্যোদয়। পাখীর ডাক শুনলে—খুশী ও সুখ।

যদি পাখীর মৃত্যু দৃষ্ট হয় - এরূপ স্বপ্ন দুর্ভাগ্যসূচক। পাখীদের এদিক ওদিক উড়তে দেখলে—অর্থহানি। যদি কেউ খাঁচায় আবদ্ধ পাখীকে খুলে নিয়ে নিজের হাতে তুলে নেয় – এরূপ স্বপ্ন উন্নতি ও সাফল্যসূচক।

দানা দিয়ে পাখীকে, ফাঁদ পেতে ধরা—ক্ষতিকারক। কোন পাখীর ডিম দেখা— সৌভাগ্য সূচক।

ছোটপাখীদের লড়াই করতে দেখলে—বুঝতে হবে যে বিপদ আসন্ন। কিন্তু পাখীরা যদি উড়ে যায় তবে তা মঙ্গলজনক।"—পৃ. ১৪৬

পাখি সম্পর্কীয় এই কথাগুলো থেকে সহজেই কয়েকটি সত্য নিষ্কাশিত করে নেওয়া যায়ঃ পাখির দর্শনই সম্পদ ও সৌভাগ্যের সূচক, তার ডিমও তাই; বিপরীত কারণে পাখীর যুদ্ধ, বন্দীদশা ও মৃত্যু দর্শন দুর্ভাগ্যজনক। পাখির চাঞ্চল্য ভাগ্যেরও অস্থিরতাসূচক। দেখা যাচ্ছে, এই স্বপ্নতত্ত্বের মধ্যে কোনো গভীর রহস্য বা জটিলতা তেমন নেই; পাখি সম্পর্কে চলিত সরল ও সাধারণ ধারণাগুলিই এখানে স্বপ্ন বিচারের মূল কথা হয়েছে মাত্র।

পাখি-বিষয়ক স্বপ্নের ফলাফলকে আমি কয়েকটি প্রসঙ্গে বিন্যস্ত করেছি। নীচে তা প্রদত্ত হলোঃ

জন্মঃ মীর্জাপুর জেলার (প্রাক্তন যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত) দক্ষিণ অংশে দ্রাবিড় সম্ভূত এক জাতি বাস করে, তাদের বলে 'চেরো'। চেরোদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, বুলবুল্ পাখির স্বপ্ন দেখলে পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যত্র বিশ্বাস আছে, বিবাহিতা নারী যদি স্বপ্নে পারাবত দর্শন করে তবে সে শীঘ্রই গর্ভবতী হবে। বোম্বাইয়ের জনসাধারণের মধ্যেও এই ধরণের বিশ্বাস আছে। তবে তার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। পারাবত যদি কারো হাতে ধরা থাকে, তবে কন্যা সন্তান হয়; আর যদি তা পারাবতের বাচ্চা হয়, তবে তার স্ত্রী বহুসন্তানবতী হয়। চড়ুইয়ের বাসা দেখলেও বহু সন্তান হয়, বোম্বাইয়ের বিশ্বাস অনুযায়ী। গর্ভবতী মহিলা চিলের স্বপ্ন দেখলে তার সুদর্শন সন্তান হয়। 'তুতীনামা'তে বর্ণিত আছে, গর্ভবতী রমণী ময়ূরের স্বপ্ন দেখলে সন্তান সুদর্শন হয়। গর্ভবতী নারী তোতা পাখির স্বপ্ন দেখলে কন্যা সন্তান প্রসব করে। হাঁস বা মুরগীর ডিমে তৈরী খাদ্যের স্বপ্ন দেখা পরিবারে নতুন শিশুর আগমন সূচনা করে। ডিমসহ মুরগী দেখলে অধিক সন্তান হয়। আরবরা বিশ্বাস করে, গর্ভবতী স্ত্রীলোক বাদুড়ের স্বপ্ন দেখলে সহজে প্রসব হয়। স্বপ্নে কাকের সঙ্গে কথা বললে কুসন্তান জন্মায়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ঘুঘুর স্বপ্ন দেখলে তার পুরুষ সন্তান হবে। যদি কোনো রমণী স্বপ্ন দেখেন—তিনি একটি ঈগল প্রসব করেছেন, তবে তার অর্থ হলোঃ তাঁর সন্তান রাজকর্মী হবে অথবা একজন কুস্তিগীর। কেউ যদি স্বপ্নে দেখেন—তিনি শ্যেন কর্তৃক তাড়িত হচ্ছেন, তার অর্থঃ তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী একটি বীর সন্তান প্রসব করবেন। পায়রার পাখা ছেঁটে দিচ্ছেন, এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে স্ত্রীকেই যেন উড়তে নিষেধ করেছেন; অর্থাৎ স্ত্রীকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখতে চাওয়া হয়। স্ত্রী গর্ভবতী ও আসন্নপ্রসবা হলেই তিনি গৃহে আবদ্ধ থাকেন। অতএব পায়রার পক্ষশাতন মানে স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া। চড়ুইয়ের স্বপ্ন দেখলে পুরুষ সন্তান হয়। অনেক চড়ুই অনেক সন্তানের প্রতীক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শকুন 'বেজম্মা' সন্তানের প্রতীক। ঈগলের বাচ্চাও তাই।

মৃত্যু; রোগঃ কাক স্বপ্নদ্রষ্টার মাথার ওপর বসলে স্বপ্নদ্রষ্টা মারাত্মকরোগে আক্রান্ত হবে এবং আকস্মিকভাবে তার মৃত্যু হবে। আরবরা মনে করে, কাক ঠোঁট দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে, এর মানে—স্বপ্নদ্রষ্টা কর্তৃক তার ভ্রাতাকে হত্যা করা; যদি কাক স্বপ্নদ্রষ্টারই দেহে আঁচড় কাটছে দেখা যায়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টার শীঘ্রই মৃত্যু

হবে অথবা রোগ বা যন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হবেন। কাকেরা দীর্ঘজীবী, তাই কাকের স্বপ্ন অনেক সময় বৃদ্ধাকে নির্দেশ করে। কাকের স্বপ্ন কবর খনন কারী, কবর খনন করা, মৃতদেহ সমাধিস্থ করা এবং তা খুনী ও হত্যাকারীকেও নির্দেশ করে।

গাছে উপবিষ্ট তোতাপাখি দেখলে স্বপ্নদ্রষ্টা রোগগ্রস্ত হবে। স্বপ্নে ঘরের ছাদে প্যাঁচা দেখলে সমস্ত পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; স্বপ্নদ্রষ্টার মাথার ওপর উড়লে তার নিশ্চিত মৃত্যুর ইংগিত দেয়। বিবাহিত মহিলা প্যাঁচার স্বপ্ন দেখলে স্বামীর রোগজনিত কারণে মানসিক ক্লেশ পায়। ঘরের ছাদে ঈগলকে দেখলেও মৃত্যুর দূত এসেছে বলে মনে করা হয়। যদি কোনো ধনী ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন, তিনি ঈগলের পিঠে চেপেছেন, তবে তা তাঁর মৃত্যুর ইংগিত বাহী; কেননা, প্রাচীনকালে ধনী ও মহৎব্যক্তির মৃতদেহ ঈগলের প্রতিমূর্তি দ্বারা চিহ্নিত হত। যে রাজা প্রজাদের সম্পত্তি স্বসাৎ করেন, স্বপ্নে শ্যেনকে হত্যা সেই রাজাকেই হত্যার সূচক, রাজা ও শ্যেন এখানে একাত্ম। চিল ধরবার পর হাতের থেকে তা পালিয়ে যাওয়া স্বপ্নদ্রষ্টার একটি সন্তানের মৃত্যুর নির্দেশক।

পারাবতের স্বপ্ন মৃতের গুণাবলীর সূচনা করে। রোগীর মাথার ওপর পারাবত দর্শনও মৃত্যুর ইংগিত দেয়। স্ত্রী পারাবত স্বপ্নদ্রষ্টার কাছ থেকে উড়ে যাওয়া তার পত্নীর মৃত্যুকে নির্দেশ করে। পারাবত এখানে নারী।

সন্তান অসুস্থ থাকাকালে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে, সে চড়ুই পাখি হত্যা করছে, তবে তার সন্তান মারা যাবে।

শকুনের স্বপ্ন নির্দেশ করে—যারা সমাধিভূমিতেই বাস করে এবং মৃতদেহ ধৌত করে —তাদের। তার কারণ, শকুন শহরে প্রবেশ করে না এবং মৃতদেহ খেয়ে থাকে। বাড়ীতে অসুস্থ লোক থাকলে শকুনের স্বপ্ন তার মৃত্যুর ইংগিত বহন করে; কোনো অসুস্থ লোক না থাকলে গৃহস্বামীই মারা যাবেন বা রোগে আক্রান্ত হবেন। শকুন নিহত হয়েছে, এমন ব্যাপার স্বপ্নে দেখা রাজার মৃত্যুর সূচক, শকুন ও রাজা তখন অভিন্ন।

বিবাহ, প্রেম, অবৈধ-প্রেম ঃ ডিমের স্বপ্ন দেখার অর্থ- বিবাহ। ভাঙা ডিমের স্বপ্ন দেখলে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হবে; অথবা আগের থেকেই ঝগড়া থাকলে তা মিটমাট হয়ে যাবে। বিবাহিতা মহিলা স্বপ্নে কোকিল দেখলে বা তার গান শুনলে ধরে নিতে হবে—তাঁর স্বামী তাঁকে ভালোবাসবেন না। জোড়া তিতির পাখি দর্শন ব্যর্থ প্রেমের সূচনা করে। অবিবাহিতা নারী প্যাঁচার স্বপ্ন দেখলে নীচকুলে বিয়ে হয়।

রামগরীব চৌবে তাঁর একটি প্রবন্ধে (Hindu belifs about dreams: Journal of the Anthropological Society of Bombay : Vol V., No. 5, pp 308-317 , লিখেছেন যে, কোনো পুরুষ যদি স্বপ্নে, মুরগী বা জল-মুরগীকে দেখে সংগে সংগেই জেগে উঠতে পারে, তবে নিশ্চয়ই কোনো মিষ্টভাষিণী ও প্রিয়দর্শনা নারীর সংগে তার বিয়ে হবে। এর মধ্যে "সংগে সঙ্গে জেগে ওঠা"-র ব্যাপারটি লক্ষ করবার।

আরবদের মধ্যে বাদুড়ের স্বপ্ন—দুই স্ত্রীকে নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহে জর্জরিত গৃহাভ্যন্তর অবস্থা জ্ঞাপন করে। মুরগীর স্বপ্ন যৌন-ক্ষমতার অতিরেককে প্রকাশ করে।

সারসের মাংসের স্বপ্ন বিবাহকে নির্দেশ করে, কারণ, সারসেরা ওড়বার সময়ে দুটিতে জোড় ভাঙে না। অনেকের মতে, কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে সারস নিয়েছে, তবে নীচ উপজাতির পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বাড়ীতে কাক দেখা—স্ত্রীর সঙ্গে অসচ্চরিত্রের পুরুষের অবৈধ-প্রণয়ের সূচক। ময়ূর সুদর্শনা স্ত্রীর প্রতীক। স্ত্রী-পারাবতের গুঞ্জন শুনলে সে স্ত্রীর কাছে তিরস্কৃত হবে। স্ত্রী-পারাবত নিজের কাছ থেকে দূরে উড়ে চলে যাওয়া—স্ত্রী-কে পরিত্যাগ (Divorce) করা। কখনো পারাবত সতী স্ত্রী-র প্রতীক হয়। চড়ুইও সৎ ও সুন্দরী স্ত্রী-কে নির্দেশ করে।

নারী ঃ স্বপ্নে অনেক পাখিই নারীর প্রতীক ; পুরুষের প্রতীক রূপে ক্বচিৎ কোনো কোনো পাখির নাম মেলে বটে, তবে তা পরিমাণে কম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই ; আরবদের মধ্যে মোরগ বলতে গৃহস্থ এবং মুরগী গৃহিণী। হাঁস স্ত্রীলোক বা বালিকা-বাচক। চিলের মতো পাখিকেও আরবরা স্বপ্নে নারীর প্রতীক বলে মনে করে, এটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুক পাখিও নারী রূপে কল্পিত হয়। ময়ূরী বিদেশিনী বা পারশ্য দেশীয় সম্পদ ও সৌন্দর্যময়ী নারীকে বোঝায়, তবে তা শুভজনক নয়। ময়ূরী অ-মুসলমান নারীকেও বোঝায়। এই বিশ্বাসের মধ্যে ধর্মীয় আবরণ এসে পড়েছে এবং বোঝাই যায়, তা আধুনিক। তেমনি, স্ত্রী-পারাবত ভাগ্যবতী আরব রমণীকে নির্দেশ করে, যিনি স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে পছন্দ করেন না। বাড়ীর ছাদে পারাবত একদল নারীর প্রতীক। নিজেকে অনেক পারাবতের মালিক রূপে যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, সে ক্রীতদাসীর ব্যবসায়ে রত হয়। অপরের কাছ থেকে আবাবিল (the swallow) ধার করবার স্বপ্ন দেখলে সে নারীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। ঘুঘু ধার্মিক স্ত্রীলোককে নির্দেশ করে। শকুনের স্বপ্ন পাপী স্ত্রীলোকের নির্দেশক।

রাজা, রাজত্ব, রাজপাট, রাজক্ষমতা ঃ রাজদ্বারে কাকের স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নদ্রষ্টা সত্বর অপরাধী হয়। ঈগলকে আপন কর্তৃত্বাধীনে স্বপ্নে যদি কোনো রাজা দেখেন, তার অর্থ—তিনি শত্রু দমন করবেন, দুষ্টশক্তির হাত থেকে রেহাই পাবেন। কারণ স্বপ্নে ঈগলের পাখা তীরের প্রতীক। শ্যেন হলো কর্তৃত্বের প্রতীক, কাজেই শ্যেনের স্বপ্ন শাসনাধিকারকে নির্দেশ করে। কারো হাত থেকে শ্যেন পালিয়ে যাওয়ার অর্থ—শাসন ও কর্তৃত্বের ক্ষমতা লোপ পাওয়া। স্বপ্নে শ্যেন কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া তাই কোনো সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি-কর্তৃক নিগৃহীত হওয়া। চিলও যুদ্ধ-বিগ্রহকে নির্দেশ করে। চিল স্বেচ্ছাচারী, নীচ ও হীন রাজার প্রতীক, যেহেতু চিল খুব একটা উঁচুতে উঠতে পারে না। এর ছোঁ মারবার প্রবণতার জন্যে একে স্বেচ্ছাচারী রাজা বলে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখেন, তিনি চিল অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন, তবে তার এমন পুত্র জন্মাবে যে, বয়ঃসন্ধি-কালেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। প্যাঁচার স্বপ্ন এক গম্ভীর প্রকৃতির রাজার নির্দেশক, যার ভয়ে প্রজার পিত্তকোষ (gall-bladder) চূর্ণ হয়ে যায়। প্যাঁচা রাত্রির পাখি, এই জন্যে তা সাহস ও নির্ভীকতার নির্দেশক। ময়ূর স্বপ্নে বিদেশী ব্যক্তি অথবা পারস্য সম্রাট বলে বিবেচিত। ময়ূরের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্বপ্ন দেখলে পারস্য সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। শকুন-ধারণের স্বপ্ন রক্তপাত ও যুদ্ধের সূচক। খৃষ্টান বিশ্বাস,

অনুসারে বহুসংখ্যক বিশেষ ধরণের শকুনের (the aquiline Vulture) সমাবেশ বহু অস্ত্রধারী সৈন্যের প্রতীক, যারা নগরী অবরোধ করে অন্যায়ভাবে দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করবে। শকুন রাজার প্রতীক, কাজেই শকুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের অর্থ হলো, রাজা স্বপ্নদ্রষ্টার প্রতি বিরূপ হবেন। কারণ, সলোমন অন্যান্য পাখিদের ওপর কর্তৃত্ব করবার জন্যে শকুনকেই নিযুক্ত করেছিলেন। অনুগত ও বাধ্য শকুনের স্বপ্ন দেখলে রাজ্যলাভ হয়। নিহত শকুনের স্বপ্ন রাজার মৃত্যুর সূচক। শকুনের স্বপ্ন সাধারণ ভাবে শত্রু-দমন, সাহস-প্রদর্শন এবং শক্তি-সম্মান অর্জন করা বোঝায়।

বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ: বাদুড় নিশাচর, এইজন্যে বাদুড়ের স্বপ্ন সাহস ও নির্ভীকতা-সূচক। আরবদের কাছে বাদুড় ধার্মিক মানুষের প্রতীক। আরবদেশেই বাদুড় ডাইনী বা যাদুকরী। মুরগীর স্বপ্ন ধার্মিক, ধর্মপ্রচারক, ভক্ত ও কোরাণ পাঠককে সূচিত করে। মুরগী ন্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে সক্রিয় ভাবে তার অনুষ্ঠান করে না। যেমন, মুরগী নিজে নমাজ পড়ে না, কিন্তু অপরকে নমাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুরগী প্রহরীকে নির্দেশ করে। কখনও বা মুক্তমনের মানুষের প্রতীক, আবার কখনও দাসত্বের ; 'নোয়া' (Noah)-র কাছে মুরগী বাঁধা পড়েছে, তাই সে উড়তে পারে না, দাসের মতো বন্দী থাকে। কখনও আবার যে মানুষ দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের জন্যে যুদ্ধ করে, মুরগী তারই প্রতীক হয় স্বপ্নে। যদি স্বপ্নে দৃষ্ট মুরগীটি দুঝুঁটিওলা এবং সাদা হয়, তবে সে নমাজ পাঠ ও প্রার্থনার স্মারক হবে ; স্বপ্নে এই মুরগীকে যে হত্যা করবে, সে কখনও নমাজের স্মারকের আহ্বান শুনতে পাবে না।

শীতকালে সারসের স্বপ্ন চুরি-ডাকাতির সূচক। সন্তানকামী মানুষদের কাছে তা শুভ, কারণ, সারস বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে খুব যত্ন করে থাকে। কাক চতুর ও ধূর্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। জীবিকার ক্ষেত্রে কাক লোলুপতার প্রতীক। মেঠোকাকের (the field crow) স্বপ্ন দোষে-গুণে মিশ্রিত বেজন্মা মানুষের ইঙ্গিতবাহী। হাঁস ধার্মিক ও নীতিবাদী মানুষের সূচক। হংস-মাংস সহজেই পাওয়া যায় বলে হাঁসের স্বপ্ন উদ্বেগহীন জীবনের প্রতীক। জলচারী বলে হাঁসের স্বপ্ন দেখলে নাবিক, ধীবর বা জলবাহকের কর্ম গ্রহণ করতে হয়। ঈগলের স্বপ্ন দেখলে ধার্মিক ব্যক্তি নিজেকে ক্রমেই জনতা থেকে সরিয়ে নিয়ে নিঃসঙ্গ, একক জীবন যাপন করবেন। স্বপ্নে ঈগলের বাচ্চার মাংস খাওয়া লৌল্যের নিদর্শন। অনেক সময় ঈগলের স্বপ্ন দেখা স্বপ্নদ্রষ্টার মারমুখী ভাবকে নির্দেশ করে, যার কাছ থেকে কারোরই রেহাই নেই। চিলের স্বপ্নও স্বপ্নদ্রষ্টার সমরমুখিতার সূচক। কখনও বা চিলের স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার দোষ ও অপরাধকে বোঝায়। বহুসংখ্যক চিলের অর্থ একদল ডাকাত—যুদ্ধ, ঔদ্ধত্য, বহুদেবতায় বিশ্বাস করা যাদের বিশেষত্ব। নীচ ব্যক্তিকেও বোঝায়। শুকের স্বপ্ন মিথ্যাবাদী হবার নির্দেশক। ময়ূরের স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের রূপগুণের জন্যে গর্ববোধ বোঝায়। স্বপ্নে পারাবতকে আহ্বান ও খাদ্যদান এবং পারাবত ও কাককে একত্র সংগ্রহ করবার অর্থ হলো—স্বপ্নদ্রষ্টা প্রাক-বিবাহ যৌন ব্যাভিচারে এবং 'কুট্টনী'র কর্মে লিপ্ত হবে।

পারাবতের গুঞ্জন অসার বাক্যের প্রতীক। চড়ুইয়ের স্বপ্ন সমর্থ, কর্মঠ, চতুর এবং নিজের বৈষয়িক বিষয়ে সচেতন বৃদ্ধব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

আয়-উপার্জন, ধন-সম্পদ : কোনো পুরুষ উপবিষ্ট পায়রাকে স্বপ্নে দেখলে সে অর্থ ও ঐশ্বর্য লাভ করবে। খাঁচার মধ্যে পারাবত দর্শনের অর্থ—গুপ্তধন লাভ করা। কোকিল দর্শন বা কোকিলের গান শ্রবণ দ্রষ্টার ধনহানি এবং কষ্টে ধন উপার্জনের নির্দেশক। শুধু কাকের স্বপ্ন দেখা ব্যবসায়ীর পক্ষে ক্ষতিকারক। খাঁচাসহ পাখী : আয়বৃদ্ধি। চিল উড়তে দেখা : অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন। তিতির পাখিকে গাছে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলে উত্তরাধিকারসূত্রে ধনপ্রাপ্তি হয়; বিবাহিতা স্ত্রীলোক এই স্বপ্ন দেখলে তার মায়ের কাছ থেকে অর্থ পায়। শ্যেন বা বাজ ব্যবসায়ে সাফল্যের সূচনা করে। বহু মুরগী বহু অর্থের নির্দেশক। খাবার জন্যে মুরগী কাটার স্বপ্ন দেখা—অতি ব্যয় হওয়া। ব্যবসায়ী স্বপ্নে সারস দেখলে প্রচুর অর্থাগম হবে। ঘুঘু দেখা ও ঘুঘুর ডাক শোনা অর্থ-ক্ষতির নির্দেশক। ঘুঘু পাখি উড়ে যেতে দেখা—অর্থহানি কোনোক্রমে এড়ানো। চাতক পাখি দেখা—অভাব ও অর্থকষ্ট, যেহেতু মেঘের কাছে চাতক জল প্রার্থনা করে।

আরবদের বিশ্বাস : বুলবুল সম্পদশালী পুরুষ বা নারীকে বোঝায়। সারসের স্বপ্ন দরিদ্র ও বিদেশী ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। সারসের পিঠে চড়বার স্বপ্ন দেখলে সে গরীব হবে। যদি কেউ নিজের অধিকারে বহু সারসকে দেখে অথবা উপহার হিসেবে অন্য কারো কাছ থেকে পায়, তাহলে সে অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হবে। কাক ধারণ করবার স্বপ্ন দেখলে বহু কষ্টে অবৈধ অর্থ উপার্জন করে। কাকের মাংস খাবার স্বপ্ন-দর্শন-অর্থ—চোরের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া। ঘুঘুর স্বপ্নও অর্থের প্রতীক। হাঁসের মাংস খাবার অর্থ : ক্রীতদাসীর ব্যবসা করে অর্থোপার্জন। দরিদ্র ব্যক্তি যদি স্বপ্ন দেখে, সে ঈগলের পিঠে চেপেছে, তবে তার ধনপ্রাপ্তি হবে। হাতের থেকে ঈগল চলে যাওয়া, ধন অন্তর্হিত হওয়া; যদি হাতে ঈগলের একটি পাখা বেঁধে থাকে, তবে ধনের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকা বোঝায়। স্বপ্নে বহু সংখ্যক চড়ুই ধারণ বহু অর্থের ইঙ্গিত দেয়। আবাবিল-ও ধনের নির্দেশক। অন্যায়ভাবে বা শক্তির দ্বারা অর্থ উপার্জনও নির্দেশ করে আবাবিল। যার বাড়িতে আবাবিল বাসা বাঁধে, দিন দিন উত্তরোত্তর এইভাবে তার ধনবৃদ্ধি হয়। কোলভরা ডিমের স্বপ্ন ধন-সম্পদের সূচনা করে, নিগ্রোদের মতে।

জ্ঞান, বিদ্যা : আরবদের মতে, বুলবুলের স্বপ্ন দেখলে এমন সন্তান জন্মায় যে কোরাণপাঠে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। মুরগীর স্বপ্ন কোরাণ-পাঠককে নির্দেশ করে। কেউ বলেন, মুরগীর স্বপ্নও বিজ্ঞ ও পণ্ডিতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার সূচক। কেউ মনে করেন, ঘুঘুর স্বপ্ন কবিতা পাঠরত এবং সুকণ্ঠ ব্যক্তির প্রতীক। শুক পাখিকে 'দার্শনিক' এবং শুকের বাচ্চাকে 'দার্শনিকের সন্তান' বলে মনে করা হয়। চড়ুয়ের স্বপ্ন গল্প-কথক, হাসির গল্প-কথক এবং আমুদে ব্যক্তির প্রতীক। চড়ুইয়ের কিচির-মিচির সুবাক্য ও বিজ্ঞানের সূচক।

অন্যান্য বিচিত্র দিক : ঈগলপাখি দেখা—অপদস্থ হওয়া; কিন্তু ঈগল পাখি

মারতে দেখা : সম্মান বৃদ্ধি হওয়া। স্বপ্নে পারাবতকে হত্যা করা : চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া ; কিন্তু বেড়াল দ্বারা সেই পারাবত নিহত হলে স্বপ্নদ্রষ্টার বিশেষ বিপদ সূচনা করে। উড়ন্ত তোতা পাখি : চিন্তা-মুক্ততা ; তোতাপাখি হত্যা : শত্রুর বশ্যতা স্বীকার ; বেড়াল দ্বারা তোতা আক্রান্ত হওয়া : বিরোধিগণকে পরাভূত করা ; খাঁচায় বদ্ধ তোতা পাখি : আপদ-বিপদের ইঙ্গিত ; মরা তোতা পাখি দেখা : কপট বন্ধুর প্রতারণা সত্ত্বেও সাফল্যের সূচনা। জীবন্ত কাককে ধরা : শত্রুকে পরাভূত করা ; স্বপ্নদ্রষ্টার মাথার ওপর দিয়ে কাক উড়ে যাওয়া : শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়া। বক দর্শন : শত্রু বিনষ্ট হওয়া। পুরুষ-কর্তৃক মাটিতে উপবিষ্ট তোতা দেখা : বন্ধু লাভ। মোরগের ডাক শোনা সৌভাগ্যের লক্ষণ। বিধবা রমণীর সারসের স্বপ্ন দেখা : তাঁর পবিত্রতার প্রমাণ। পরীক্ষার্থীর পক্ষে সারসের স্বপ্ন তার সাফল্যের ইঙ্গিতবাহী। টিয়ে পাখি : পারিবারিক শান্তি। টিয়ে উড়ে যেতে দেখা : মানসিক চিন্তা। চড়ুই পাখি দেখা : প্রতিষ্ঠা পাওয়া। মরা চিল দেখা : অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া। শালিক পাখি দেখা : দূরস্থিত পরিজনের সংবাদ পাওয়া।

আরবদের মতে, বাদুড়ের স্বপ্ন স্থলপথ বা সমুদ্র পথের যাত্রীর পক্ষে শুভ নয়। বাদুড়ের স্বপ্ন আত্মীয়-বান্ধবের সঙ্গে মিলনও সূচিত করে। ক্ষেতে বা গাছে কাকের স্বপ্ন দেখা খারাপ। অপর ব্যক্তি কর্তৃক স্বপ্নদ্রষ্টাকে কাক দান : স্বপ্নদ্রষ্টা সুখী হবে ; হাঁসের সঙ্গে কথা বলার স্বপ্ন দেখলে স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্মান ও উচ্চপদ প্রাপ্তি হয় ; শহরে বা বাড়িতে হাঁসের ডাকের শব্দ শোনা : বিপদের সম্ভাবনা ; শকুনের স্বপ্ন দুর্ভাগ্যের সূচনা করে। ময়ূরের স্বপ্ন প্রাচুর্য থেকে অভাবগ্রস্ততায় পতনের ইঙ্গিত দেয়। স্ত্রী পারাবতকে নিজের দিকে আসতে দেখা এবং নিজের সে দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ : পত্রলাভ। বাড়ির থেকে আবাবিলকে বেরিয়ে যেতে দেখা : আত্মীয়-স্বজনদের দূরে যাত্রা করা। আবাবিলের ডাক শুভকর্মের প্রতীক। আবাবিলকে তাড়না করলে বাড়িতে চোর আসে।

স্বপ্নে পাখির ডাক শোনারও এক-একটি অর্থ আছে। তাও প্রতীকের সঙ্গে জড়িত। ওপরে বিভিন্ন পাখির বিষয়ে স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনাকালে তার উদাহরণ প্রসঙ্গত দিয়ে এসেছি। বোম্বাইয়ের জনসাধারণের মধ্যে স্বপ্নে বিভিন্ন পাখির ডাক সম্পর্কে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। Bomanjee Byramjee Patel লিখেছেন (Journal of Anthropological Society of Bombay, Vol. VII. No. "If one hears the voice of a kite, he will be secret in formation; of an owl, he will be belide; of a partridge, peacock or nightingle, he will hear music of a light order; of a crow, he will have to deal with bad persons; of fowls and sparrows, he will get a beautiful wife; of a duck or hen, he will get bad news;......", P. 141. প্যাঁচার ডাক সম্পর্কে : "If one sees an owl or hears its vice, it is a sign of evil luck"—P. 140.

অন্যান্য বিচিত্র দিকের মধ্যে কাকের স্বপ্ন সম্পর্কে উক্ত লেখক মন্তব্য করেছেন : "If one sees a crow or a crow being hunted, it is a bad omen. If one sees a large flock of crows, his city will be visited by a large enemy. If he sees the crow picking away something in his beak from the house, there will be a theft committed in the house."

কাক সম্পর্কে এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিরুদ্ধ ও বিচিত্র কথা খুঁজে পাই। স্বপ্নে কাক-শিকার-দর্শন যাদের কাছে অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হয়, নিশ্চয়ই একদা কাক তাদের ছিল গোত্রের প্রতীক; 'টোটেম' হত্যা নিষিদ্ধ, স্বপ্নেও তা ছায়া ফেলেছে; কিন্তু যে গোষ্ঠীর কাছে 'টোটেম' নয়, তাদের কাছে এক ঝাঁক কাক দর্শনই আবার অমঙ্গলজনক। কাক বাড়ি থেকে ঠোঁটে করে কিছু নিয়ে যাচ্ছে, স্বপ্নে তা দেখলে বাড়িতে চুরি হয়—এই তথ্যটিকে অন্য দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে কাক যেমন চৌর্যপ্রবণ, তেমনি সারা বিশ্বের লোককথাতেও দেখা যায়, কাক ঠোঁটে করে নায়িকার বা অপর কারো অলংকার অসতর্ক মুহূর্তে নিয়ে পালাচ্ছে।

ঠিক একই ভঙ্গিতে চড়ুই সম্পর্কে বোম্বাইয়ের জনসাধারণের স্বপ্ন-বিশ্বাসকে আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। চড়ুই যাদের কাছে সৃষ্টিকর্তা অথবা 'টোটেম', নীড় থেকে চড়ুই-এর নিষ্ক্রমণ দর্শন তাদের কাছে সম্মান-প্রাপ্তির সম্ভাবনা সূচিত করে; এবং চড়ুই হত্যা ক্ষতির : "If one sees a sparrow coming out of its nest, he will gain honour; if young ones of the sparrow, superiority over others; ...and if he sees killing a sparrow, he will incur some loss."

১৪·

এই অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষাংশে আমরা 'composite symbol' বা সংমিশ্রিত প্রতীকের কথা উত্থাপন করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখন সে সম্পর্কে আর একটু আলোচনা করা যাচ্ছে।

নৈসর্গিক জগতের বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর সঙ্গে পাখির সংমিশ্রণ লক্ষ করেছিলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পাখি থেকে অন্যান্য প্রাণী, গাছ, ফুল-ফল ইত্যাদির নামকরণ কিভাবে হয়েছে, তার আলোচনা করেছি ও দৃষ্টান্ত দিয়েছি; ওই আলোচনা থেকে অন্তত এটুকু স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যাবে যে, পাখি অন্যান্য প্রাণী ও নৈসর্গিক জগতের সঙ্গে কী গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। এই সব দৃষ্টান্ত প্রতীকের নয় বটে, কিন্তু সংমিশ্রিত প্রতীকের ব্যাপকতা ও জটিলতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে ওদের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। তেমনি, তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি, আভিজাত ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, পাখি অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে কি ভাবে জড়িত।

এসবই হলো সংমিশ্রিত প্রতীকের ভূমিকা, অথবা তার সরলীকৃত দিক কিংবা অসম্পূর্ণতার।

পাখির সঙ্গে অন্য বস্তু, ভাব ও প্রাণীর সংযোগ-সম্পৃক্ততা মাত্রই 'সংমিশ্রিত প্রতীক' হয়ে ওঠে না, এ কথা বলে বোঝাবার আবশ্যকও নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা যায়, পাখির সঙ্গে অন্যবস্তুর ও প্রাণীর সংমিশ্রণের এতো পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত নিখিল বিশ্বে পাওয়া যায় নি যে, সবগুলো থেকেই এক-একটি প্রতীক-সংকেতকে উদ্ধার করা যেতে পারে। তবু, আমার স্বল্প-সংগৃহীত দৃষ্টান্তমালা থেকে কোনো অর্থ-সংকেত উদ্ধার করা সম্ভব কিনা তার চেষ্টা করছি। সর্বক্ষেত্রেই যে অর্থ-সংকেত-প্রতীক উদ্ধার বা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে এমন কথা অবশ্যই বলি না।

পাখি ও পাথর : চতুর্থ অধ্যায়ের ষোড়শ পরিচ্ছেদে আমরা পাখির সঙ্গে পাথর ও মণিখণ্ডের সংযোগের কথা উল্লেখ করেছি। সেখানেই 'Swallow stone' 'Shamir stone'; 'Eagle stone', 'Cornia' প্রভৃতির উল্লেখ করে তাদের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছি। পাখির মণি ও পাথর সম্পর্কে অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা যায়। ম্যাগপাইয়ের বাসাতে নুড়িপাথর মেলে। মুরগীর পেটে পাথর হয়, ইউরোপ আমেরিকায় বিশ্বাস আছে, সেই পাথর খেলে মুরগীর মতোই সাহসী ও বীরযোদ্ধা হওয়া যায়। বর্তকপাখি তার যাত্রাপথে ছোটো-ছোটো নুড়ি পাথর নাকি ফেলে রেখে যায়, যাতে সে পথ চিনে তার পূর্বস্থানে ফিরে আসতে পারে। বিভিন্ন লোককথাতেও এই সংযোগ দেখা যায়। জার্মানী এবং বাঙলাদেশ থেকে পাওয়া লোক-কথায় দেখি, 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' নিশীথে গাছে বসে রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করেছে; সেই বিপদ কাটাবার পথও উল্লেখ করে, শ্রোতার কাছে একটি taboo-ও ঘোষণা করছে, শ্রোতা তা বলে দিলে নিজেই প্রস্তরীভূত হবেন। লোককথায় যেখানে Motif হিসেবে 'Magic conflict' আছে, সেখানেও এটি দেখা যায়। যেমন গ্রীক গল্পে : জোভ (Jove) ল্যাটোনা (Latona)-র সঙ্গে সহবাস করে আপন ভগ্নী অ্যাসটারিয়েন (Asterien)-কেও তার সঙ্গে সহবাস করতে বললেন। দেবতারা তখন করুণা করে অ্যাসটারিয়েনকে একটি বর্তক পাখিতে পরিণত করে দিলেন। জোভ একটি ঈগল পাখি হয়ে ওই বর্তককে আক্রমণ করতে গেলে দেবতারা তাকে পাথরে পরিণত করে দেন।

পাখি ও গাছ-পালা, তরু-লতা, ফুল-ফল : যে আকাশ পাখির স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র, ঋগ্বেদে সেই আকাশ বৃক্ষরূপে কল্পিত হয়েছে। শ্যেন যে সোম আহরণ করেছে, সেই সোমও একটি লতা-বৃক্ষ। সোম-সদৃশ অপর বৃক্ষ, ইন্দো-ইরানীয় সংস্কৃতিতে পাওয়া গেছে—'Haoma'। পর্বতের সানুদেশ থেকে শ্যেন-সদৃশ স্বর্গীয় পাখিই এ বৃক্ষকে মর্তে এনেছিল। শ্যেনের সোম আনায়নকালে কৃশানু তীর ছোড়ে এবং শ্যেনের একটি নখ উড়ে যায়। ঋগ্বেদ (৪. ২৭. ৪) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩. ৩. ২৬) অনুযায়ী কৃশানুর তীরে পতিত শ্যেনের পালক থেকেই গাছের সৃষ্টি হয়। ঋগ্বেদেই অশ্বিদ্বয় বলেছে, পাখি (কারো মতে শুক, কারো মতে ময়ূর বা অন্য কোন পাখি) এবং গাছের মধ্যে হরিদ্বর্ণ তারাই সঞ্চারিত করেছে, যার

জন্যে উক্ত পাখিদের বলে 'হারয়'। শুক পাখি গাছের মতোই সবুজ। বৌদ্ধযুগের একটি সংস্কৃত শ্লোকে আবদ্ধ একটি কাহিনীর অংশ এই : একটি শুক যে অশোক বৃক্ষে বাস করত, গাছটি শুকিয়ে যেতেই শুকেরও মরে যেতে বাসনা হলো। চীন ও পারস্য থেকে ইউরোপে প্রচলিত হওয়া এক ধরণের ফুল গাছের নাম—'লাইলাক'। স্কটল্যান্ডের প্রান্ত-অঞ্চলের জনসাধারণ বিশ্বাস করে, এই ফুলের প্রথম বীজ এক বৃদ্ধার উদ্যানে এনে ফেলে একটি শ্যেন। পাখির দ্বারা বৃক্ষ আনায়ন ও বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধি বাস্তবের একটি ঘটনা থেকে সঞ্চারিত হতে পারে। এখনও দেখা যায়, কাক প্রভৃতি যে-সব পাখিরা বটের ফল খেয়ে থাকে, ঘরের দেওয়াল, ছাদ প্রভৃতি স্থানের যেখানেই তারা মলত্যাগ করে, সেখানেই বটের চারা গজিয়ে ওঠে। Ostiak-রা যে গাছে ঈগল থাকে সে গাছকেও পুজো করে। অবশ্য, নিগ্রীটনের লোকেরা মনে করে, ঈগল-বাজের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে রোপিত কলা গাছের ফল ভালো হয় না। পাখির স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের জন্যে অনেক সময় গাছ তৈরী করে দেওয়া হয়। ইউরোপের কোনো-কোনো অঞ্চলে ম্যাগপাই হত্যা অশুভজনক বলে বিবেচিত হয়; এই জন্যে ম্যাগপাইয়ের সম্মানে heath নামে বেনা জাতীয় এক প্রকার গুল্ম এবং লরেল নামে জলপাই জাতীয় এক ধরণের গাছের ডাল গাছে বেঁধে দেওয়া হত। 'আনারসীকন্যা' নামে পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া একটি লোককথায় দেখা যায়, নায়ককে পাখি ফল আহরণ করতে বলেছে, কার্যসিদ্ধির জন্যে। আরব্য উপন্যাসে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত উত্তর ভারতের বহু লোককথায় দেখা যায়, অলৌকিক রম্য উদ্যানে পাখিরা মুক্তারূপী ফল খাচ্ছে।

প্রাচীন ভারতীয় কল্পনায় এক বৃক্ষে জীব ও ঈশ্বররূপী দুটি পাখির ('দ্বিখগ') অস্তিত্ব দেখা যায় (তুল : মুণ্ডকোপনিষদ : ৩. ১. ১)। উপনিষদে অশ্বত্থকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে 'ব্রহ্মাবৃক্ষে'র কথা বলা হয়েছে। আবেস্তা-য় 'হাওমা-বৃক্ষ' দুটি : একটি শ্বেত, অপরটি পিঙ্গল। "The Gokart or Gaokarena, the white Haoma rises from the midst of the sea Vouro-Kash, where it sprang up on the first day, is the tree of the solar Egale. ..' বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সাহিত্যে পূর্ণতার প্রতীকরূপে গাছের কল্পনা করা হয়েছে। কোথাও বা মনে করা হয়, সত্য উপলব্ধিকারীরাই ওই বৃক্ষে আরোহণে সমর্থ, তারা তখন যেন পাখির মতো পাখা পায়। যারা সত্য উপলব্ধিতে অসমর্থ, তারা পাখা প্রাপ্ত হয় না, অতএব বৃক্ষতলে পড়ে যায়। বাঙলার একাধিক লোককথায় 'সত্যের গাছ'-এর প্রসঙ্গ আছে : নায়ক-নায়িকাকে বিপদে এসব গাছই দ্বিধাদীর্ণ হয়ে আশ্রয় দেয়। তখন ওইসব চরিত্রগুলোকে পাখির মতো মনে হয়। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী তাদের আলাপনে যে 'সত্য' দর্শন করিয়ে থাকে, তাও তো গাছেই বসে। যে সব গাছ এসব ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয়, তাদের অধিকাংশই বট, বেল, অশ্বত্থ। দক্ষিণ বিহারের গয়া জেলার কাহারদের মধ্যে চলিত একটি গল্পে (Gazetteer of the Ganga district : Calcutta : The Bengal secretariat book depot, 1906, P. 94 : L. S. S. O'Mally) দেখা যায়, একটি অশ্বত্থ ('পিপুল') গাছ ময়ূরীর রূপ ধরে

রাজা জরাসন্ধের জাত-মান রক্ষা করেছে। তেমনি গাছের অশুভ প্রভাব পাখির ওপর পড়ে বলে কল্পিত হয়েছে। হলুদ রঙের 'ড্যাফোডিল' ফুলকে Man-দ্বীপে বলে 'goose leek'; এ ফুল বাড়িতে আনলে নাকি হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয় না।

বিভিন্ন প্রকার পাখির নামকরণে কিভাবে নানা গাছ, ফুল, ফল ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি।

হাঁসের সঙ্গে গাছের যোগের অপর একটি দৃষ্টান্ত পাই 'মহাশুক জাতক' (সং ৪২৯) থেকে। এতে দেখা যায়, এক উডুম্বর বৃক্ষে এক নিঃস্পৃহ ও তুষ্টচিত্ত শুকরাজ বাস করতেন। বোধিসত্ত্ব এক হংসের রূপ ধরে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুকনো ডুমুর গাছকে শাখাপ্রশাখায় এবং মধুর ফলে পূর্ণ করে দিলেন। এই আখ্যানে গাছ, পাখি ও জল একত্র সমাবিষ্ট হয়েছে।

পাখি ও সাপ: পৃথিবীর বহু অঞ্চলের আদিম মানুষের মধ্যে পাখি ও সাপকে সংমিশ্রিত করবার প্রবণতা দেখা গেছে। অনেক প্রাচীন 'সীলে'-ও তা দেখা যায়। দুটি প্রাণীই অণ্ডজ, উর্বরতার প্রতীক, পরস্পরের খাদ্যখাদক। ঋতু বিশেষে পাখি পালক পরিবর্তন করে, প্রতি শীতে সাপ খোলস পাল্টায়। যাযাবর পাখিরা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে অন্তর্হিত হয়, সাপ যেমন প্রতি শীতে বিবরে অদৃশ্য হয়। সাপ থেকেই পাখির উদ্ভব হয়েছে। মধ্যযুগের পৌরাণিক সাহিত্যে ও কল্পনায় তাই উড়ুক্কু সাপের অস্তিত্ব দেখা যায়। পাখি নভোচারী বলে ঋগ্বেদে মেঘও সর্পসদৃশ ('অহি') হয়েছে। পাখিকে যে সব সংমিশ্রণে দেখা যায়, সাপকেও সেই সব অনুষঙ্গে দেখা যায়। যেমন, জলের সঙ্গে সাপ বা গাছের সঙ্গে সাপ। বাঙলা রূপকথায় দেখা যায়, নিশীথ রাতে গাছের ওপর যখন ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী নিভৃত আলাপনে রত, তখন বৃক্ষের নিচেই কোথাও থাকে সাপ। পাখি ও সাপের বিরোধের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন সম্ভবত ঋগ্বেদেই মেলে (১ ৩২ ১৪), যেখানে সর্পদানব অহীকে পরাভূত করে শ্যেন দ্রুত উড়ে গেছে। ভারতীয় সাহিত্যে এর অপর প্রাচীন উদাহরণ হলো কদ্রু-বিনতার সপত্নী-দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে গরুড়-সর্পের দ্বন্দ্ব-কথা। মহাভারতে ভীম যখন সর্পদ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, তখন একটি পাখা, একটি চোখ, একটি পা নিয়ে ভয়ঙ্কর-দর্শন কালো রঙের একটি বর্তক পাখির আবির্ভাব ঘটে। Pliny লিখেছেন, শকুনের পালক পোড়ালে, তার গন্ধে সাপ পালিয়ে যায়।

'ঠাকুরমার ঝুলি'-র অন্তর্গত একটি কথায় গাছ, সাপ ও পাখির সহাবস্থান দেখা যায়। পারস্যের কবি ফরিদ-উদ্-দীন অত্তার তাঁর (The) Language of Birds বইতে লিখেছেন, ময়ূরই শয়তানকে সপ্তশীর্ষ সর্পের ছদ্মবেশে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল। সীতা হরণকালে রাবণ বলেছিলেন, তিনি পক্ষবান্ সর্পের মতো সীতাকে নিয়ে যাবেন।

পাখি ও চতুষ্পদ প্রাণী: এক পাখি সম্পর্কে আরোপিত বিশ্বাস যেমন অন্য পাখিতে সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনি পাখি থেকে নানা চতুষ্পদ প্রাণীতে হয় তা সঞ্চারিত নয় সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। বেদে 'বৃক' শব্দের অর্থ নেকড়ে এবং কাক। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়, নেকড়ে কর্তৃক গ্রাসোদ্যত বর্তক পাখিকে উদ্ধার করেছে (১. ১১২. ৮)।

তাহলে নেকড়ের সঙ্গে কাক ও বর্তক পাখির সংমিশ্রণ দেখা গেল। অশ্বিদ্বয়কে স্বর্ণপক্ষ হংস বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে তাই 'পক্ষীরাজ ঘোড়ার' কল্পনার জন্ম দিয়েছে, পাখি ও ঘোড়া এক হয়ে গেছে। অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে শুকপাখির সংযোগের কথা আগেই লক্ষ করেছি। Oppianos লিখেছেন, প্রাচীন গ্রীসে শুক ও নেকড়েকে একত্র চরানো হত, কারণ নেকড়ে নাকি এই সবুজ বর্ণের পাখি ভালোবাসে। ইন্দ্রের অশ্ব ময়ূর পালকে সজ্জিত (৩. ৪৫. ১), সে অশ্বের ল্যাজও ময়ূরের মতো (৮. ১. ২৫)।

পাখির সঙ্গে হরিণকে দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ার শিল্পে। এ জাতীয় সংমিশ্রণের প্রথম উদ্ভব ক্ষেত্র সম্ভবত ভারত, কেননা হরপ্পা থেকে যে সব 'সীল' পাওয়া গেছে, তাতেও পশু-পাখির সংমিশ্রণ দেখা যায়। ভারত থেকেই এই সংমিশ্রণের প্রবণতা ইন্দোনেশিয়াতে গেছে। সম্ভবত, এর মধ্যে পাখির গতির সঙ্গে হরিণের গতিকে মিলিত করে দেওয়া হয়েছে।

কাক কেন বেড়ালের ল্যাজ ঠোকরায়, সে বিষয়ে একটি কার্য-কারণাত্মক কাহিনী বিহার থেকে পাওয়া গেছে। কাকের সঙ্গে বেড়ালের সংযোগ এতে স্পষ্ট হয়েছে।

Stith Thompson-এর 'Motif-index of folk literature' (Second Printing, 1966)-এও এই সংমিশ্রণজাত 'Motif'-এর উল্লেখ দেখা যায়: Horse born of egg. Mythical hero will come riding on such a horse (B 19. 3). Bird horse (B 41). Pegasus: winged horse (B 41. 1). Flying horse. Sometimes represented as having wings, sometimes as going through the air by magic (B 41. 2.). Crows reveal the killing of mare (B 131. 1). Winged dogs in wild hunt (E 501. 4 1 7). Griffin: Half lion, half eagle (B 42), Bird bear (B 44). Vasa Mortis : Bird with four heads, middle like a whale, feathers and feet of a griffin (B 46). Bird with crocodile head (B 49. 1), ইত্যাদি।

এক প্রাণীর মধ্যে একাধিক প্রাণীর সংমিশ্রণই পরিশেষে একই পরিস্থিতি, পরিবেশ ও অনুষঙ্গে পাখির সঙ্গে একাধিক চতুষ্পদ প্রাণীকে সংমিশ্রিত করে নিতে সাহায্য করেছে বলে মনে হয়।

পাখি: চোখ ও ঘুম: পাখির সঙ্গে চোখ ও চোখের সঙ্গে ঘুমের প্রসঙ্গ বার বার দেখা যায়। 'Bird's eye view' আজ ইংরেজী ইডিয়মে পরিণত হয়েছে, পাখির দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার কথা স্মরণ করে। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখা যায়, রাজা ব্রহ্মদত্তের পক্ষী 'পূজনী' তার পুত্রহন্তা রাজকুমারের চোখ দুটি নষ্ট করে দিয়েছিল। 'লটুকা জাতকে' (সং ৩৫৭) দেখা যায়, এক লটুকা পাখি তার সন্তান-হন্তা এক হাতির চোখ উপড়ে নিয়েছে। পোষা সারিকা নাকি পালকের চোখ সুযোগ পেলেই ঠুকরে দেয়। White Russia-তে একদা এক কাল্পনিক পাখির কথা বলা হত, নাম 'Diedka' (='the little one'), এর চোখ আগুনের মত। হুপো সম্পর্কে ইউরোপে বিশ্বাস আছে, হুপো বুড়ো হয়ে অন্ধ হলে হুপোর বাচ্চারা এক ধরণের

তৃণ-গুল্ম ঘষে ওই অন্ধত্ব সারিয়ে তোলে। ভারতীয় পুরাণকথা অনুসারে ময়ূরকে 'সহস্রাক্ষ' বলা হয়, ময়ূরের পাখায় চোখের মতো নক্‌শা থেকে। মানুষের নানা রকম চক্ষুপীড়ায় ময়ূরের পাখা পুড়িয়ে সেই ধোঁয়া দিলে তার উপশম হয়, এ বিশ্বাস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয়ত্রই আছে। প্যাঁচার চোখ সম্পর্কে পৃথিবীর নানা দেশে নানা সংস্কার আছে। প্যাঁচার চোখে পাতা নেই বলে তা সর্বদাই জ্বলজ্বল করে। এই উজ্জ্বলতার জন্যেই সে অন্ধকারেও দৃষ্টিবান্, অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকারেও সে প্রজ্ঞাবানের দৃষ্টি পায়; এই জন্যেই প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানের দেবী অ্যাথিনার প্রতীক হলো, প্যাঁচা। এই জন্যে ভারতে বিশ্বাস আছে, প্যাঁচার চোখ খেলে অন্ধকারেও দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরাতে প্যাঁচাকে বিজ্ঞ বলা হয় এ জন্যেই। প্যাঁচার চোখ খেলে যৌবন ও যৌন ক্ষমতা ফিরে আসে বলে উত্তর ভারতে বিশ্বাস আছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্যাঁচার চোখ সম্পর্কে নানা বিশ্বাস-সংস্কার প্রচলিত আছে। আমেরিকার Kiowa এবং অন্যান্য উপজাতির মানুষেরা বিশ্বাস করে, কাকেরা পূর্বে সাদাই ছিল, সাপের চোখ খেয়েই তাদের বর্ণ কালো হয়েছে। পাখির সঙ্গে সাপের সংযোগ এতে আবার ধরা পড়ে। ঘুঘুর ডান দিকের পাখার রক্ত নেত্র-দাহের উপশমকারী, এ বিশ্বাস ইউরোপ ও আমেরিকায় এখনও বলবতী। শ্যেন-শকুন-বাজ-ঈগলের দৃষ্টি সম্পর্কে পৃথিবীর সব দেশের ভাষাতে ফ্রেজ-ইডিয়ম ও প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। মাছরাঙা পাখির দৃষ্টির এতই জোর যে, অব্যর্থ ভাবে সে জল থেকে মাছ তুলে নিতে পারে। একটি সার্কাস-পার্টির এক রিং-মাস্টার একদা আমায় বলেছিল, সার্কাসে তারা যে ছোরাছুরি দিয়ে লক্ষ্যভেদের খেলা দেখায়, তাদের বিশ্বাস, মাছরাঙাই তাদের তা শিখিয়েছে।

পাখির এই চোখ সম্পর্কে বিশ্বাস-সংস্কার অতঃপর ঘুম ও স্বপ্নের সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে। দক্ষিণ মহাসাগর ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধানত দেখা যায় যে দীর্ঘাকৃতির সমুদ্রচারী অ্যালবাট্রস পাখি, তার সম্পর্কে বিশ্বাস আছে, সে নাকি উড়তে উড়তেই ঘুমোয়। দূর থেকে দেখলে তাই মনে হয়, পাখিটি এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বাস আছে, নাইটিঙ্গেল কখনোই ঘুমোয় না। West phalia-তে বিশ্বাস আছে, নাইটিঙ্গেল পূর্বের জন্মে ছিল একজন মেষপালিকা, প্রেমিক-পুরুষকে আশ্বাস দিয়ে যে ক্রমাগতই বিবাহ স্থগিত রাখত, প্রেমিক-পুরুষটির চোখের ঘুম তাতে ব্যাহত হত। অবশেষে সেই প্রেমিক-পুরুষটি নাইটিঙ্গেলকে অভিশাপ দেয়, তার মতো নাইটিঙ্গেলেরও চোখের ঘুম চিরতরে দূর হোক। এখনও বিশ্বাস করা হয়, নাইটিঙ্গেলের চোখ জলে গুলে কাউকে খাইয়ে দিলে, চিরতরে সে আর ঘুমুতে পারবে না। ফিনল্যান্ড, জার্মানী ও ইংলণ্ডে এ বিষয়ে অন্য গল্প চলিত আছে: সৃষ্টিকালে বিধাতা কোনো কীট-বিশেষকে এবং নাইটিংগেলকে একটি করে চোখ দিয়েছিলেন: একদা নাইটিঙ্গেল ওই কীট-বিশেষের কাছ থেকে তার একটি চোখ ধার নিয়ে ফেরত দিতে ভুলে যায়। সেই থেকে ওই কীটটি অন্ধ হয়ে যায়, তাই বর্তমানে 'Blind warm' নামে পরিচিত। স্টিথ থম্পসনের মটিফ সূচীর অভিধান অনুসারে এটি A. 2241.5 নামে পরিচিত।

বাঙলা ভাষায় ঘুমপাড়ানী গান বলতে যে গানটি সবচেয়ে বেশি পরিচিত, সেটি হলো—'ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী মোদের বাড়ি যেয়ো'। এই গানটির অধিকাংশ কথান্তরেই দেখা যাবে, শেষ পঙ্‌ক্তিতে আছে—'ফুড়ুক ফুড়ুক করে' সে যেন আবার চলে যায় ; কিংবা আম-কাঁঠালের ডালে গিয়ে বসে। স্পষ্টই বোঝা যায়, ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী আসলে একটি পাখি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঘুমপাড়ানী গানে তাই পাখির কথা বলা হয়েছে।

সবুজ রঙের দীর্ঘ ল্যাজওলা এক ধরনের পাখিকে বলে 'ল্যাজেকাঠি' পাখি। খুলনা জেলায় এ পাখির নাম 'সুঁইচোরা,' গত জন্মে সে নাকি সুঁচ চুরি করেছিল। রাতের বেলায় শিশু ও অল্পবয়সী বালকেরা না ঘুমুলে খুলনা জেলার মহিলারা বলে থাকেন, সুঁইচোরা পাখি এসে চোখে সুঁচ ফুটিয়ে দেবে।

পাখির সঙ্গে স্বপ্ন কিভাবে জড়িত, আগেই তার আলোচনা করেছি। স্বপ্নের মধ্যে নানা আজগুবী ও অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। উদাহরণ দিয়ে তা শেষ করা যাবে না। কেবল ইউরোপের একটি বিশ্বাসের কথা বলি : যদি কেউ হুপোর রক্ত কপালের দু-পাশে মেখে ঘুমুতে যায়, তবে রাতের বেলায় স্বপ্নে সে নানা আজগুবী ও আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখতে পাবে।

ভারতীয় লোককথায় পাখির চোখ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। লালবিহারী দে-সংগৃহীত একটি কথায় দেখি, পাখির বিষ্ঠা দিয়ে মানুষের অন্ধত্ব ঘোচানো হচ্ছে। 'কথাসরিৎসাগরে'র একটি কথায় দেখা যায়, আসল রাজকুমারী এক কুরূপা নারীর ছলনায় প্রবঞ্চিতা হয়েছেন ; ওই কুরূপা নারীই রাজকুমারী সেজে বসেছে। আসল রাজকুমারীকে জলে ফেলে দিলে প্রথমে তিনি হন একটি রক্তপদ্ম, পরে একটি উদ্যান। তার চোখ দুটি টিয়ে ও ময়না পাখির রূপ ধরে, সংলাপের মাধ্যমে সব রহস্য ফাঁস করে দেয়।

ঘুম ও স্বপ্নকে আদিম মানুষ এক পরম রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল। ঘুম ও স্বপ্নের সময় মানুষের আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে অন্যত্র চলে যায় বলে তারা বিশ্বাস করেছে। 'external soul' এবং 'seperable soul'-এর ধারণা তারই ফলে জন্ম নেয়। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, সেই আত্মা যখন বহুশ পাখি রূপেই কল্পিত হয়ে থাকে, তখন ঘুম, স্বপ্ন এবং পাখির চোখ নতুন এক অর্থ-ব্যঞ্জনা নিয়ে তাদের কাছে ধরা দেবে।

পাখি ও জল, মাছ, নৌকো : অনেক পাখিই জলচারী, কাজেই তাদের সঙ্গে জলের যোগ স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে জলের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন পাখিকেও লোক-চারণার ক্ষেত্রে জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কোনো ভাবকে স্পষ্ট করে তুলতে দেখা যায়। এখানেই রহস্য নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

পাখির সঙ্গে জলের সম্পর্ক মূলত দু'দিক থেকে লক্ষ করা যায় : প্রথমত, যেসব পাখির ডাক ও আনাগোনা বর্ষা, মেঘ ও বজ্রের সূচনা করে, সেই সব 'Rain bird', 'Thunder bird' এবং 'Pluvial god' রূপে পাখি ; এ অধ্যায়ে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব না, পরবর্তী অধ্যায়ে তা করব। কিন্তু দ্বিতীয় আর একটি দিক

আছে, যে দিক থেকে দেখলে পাখির সঙ্গে সাধারণভাবে জল, নদী, ঝর্ণা, কুয়ো এবং অন্য তরল পদার্থের (যেমন, 'রক্ত', 'অমৃত') সংযোগ লক্ষ করা যায়। এই দ্বিতীয় দিকটিই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য। পাখির জন্ম-বৃদ্ধির সঙ্গে জলের যোগকেও এ প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মাছরাঙার মতো, Halcyone পাখির নাম এ বিষয়ে সকলের আগে করা যেতে পারে। গ্রীক পুরাণে এ সম্পর্কে একটি বহুপরিচিত কাহিনী মেলে : AEolus-এর কন্যার নাম ছিল Alcyone বা Halcyone ; তার বিয়ে হয় Ceyx-এর সঙ্গে ; Ceyx সমুদ্রের জলে ডুবে মারা যায় ; দেবতারা Alcyone-কে সে সংবাদ স্বপ্নে জানিয়ে দেন ; Alcyone শোকে অভিভূত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় ; দেবতারা করুণা করে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই Halcyone পাখিতে পরিণত করে দেন। সমুদ্রেই এরা সংসার পাতে। নাবিকদের মধ্যে আজও এ বিশ্বাস আছে যে, বছরের সবচেয়ে ছোটো দিনের সাত দিন আগে ও সাতদিন পরে (অর্থাৎ এক পক্ষ কাল) সমুদ্রের জল দেবতারা স্থির রাখেন। কোনো প্রকার ঝঞ্ঝা তখন থাকে না। Halcyone পাখিদের ডিম পাড়া ও বাচ্চা ফোটানোর সুযোগ দেবার জন্যেই সমুদ্রকে শান্ত ও স্থির রাখা হয়, এরই ফলে এই পক্ষকালকে Halcyone days বলা হয়। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে এ পাখি খুব দেখা যায়।

আইরিশ জেলেরা আবার বিশ্বাস করে, যারা জলে ডুবে মরে, তারাই জন্মান্তরে সিন্ধু শকুন (Seagull) হয়।

প্রাচীন ভারতীয় কল্পনায় পাখি ও জল—এই দুই প্রসঙ্গ নানা বৈচিত্র্য ও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, বিরোধ। 'হিতোপদেশে'র 'সুহৃদ্ভেদ' কথায় দেখি —সমুদ্রতীরে এক টিট্টিভ-দম্পতি বাস করে, সমুদ্র প্রতিবারই এই পক্ষি-দম্পতির সদ্যোজাত অণ্ড বিনষ্ট করে। অবশেষে টিট্টিভ-দম্পতি পক্ষিরাজ গরুড়ের কাছে যায় এবং গরুড় নারায়ণকে দিয়ে সমুদ্রকে শাসন করায়। পাখির রাজা গরুড় হলো বিষ্ণু বা নারায়ণের বাহন। 'নার' বা জল 'অয়ন' বা আশ্রয় যাঁর, তিনিই হলেন 'নারায়ণ'। নারায়ণ একদিকে নিজে জলশায়িত, অপরদিকে পাখির রাজা গরুড় তাঁরই বাহন। সমুদ্রের সঙ্গে পাখির বিরোধ এমন করেই এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। 'হিতোপদেশে'র 'বিগ্রহ' কথাতে দেখা যায়, সব পাখিরা গরুড়ের 'যাত্রামহোৎসব' অনুষ্ঠানে সমুদ্রতীরে সমবেত হয়ে তার মাহাত্ম্য খ্যাপন করছে। এখানেও গরুড় সমুদ্র-সম্পৃক্ত। 'বিগ্রহ' এবং 'সন্ধি' কথার সবটাই রাজহংস ও ময়ূর—স্থল ও জলের দুই পাখির রাজার বিরোধ ও সন্ধির কথা। যুদ্ধে স্থলচারী পাখির রাজা ময়ূর জিতেছে। এ কি জল থেকে স্থলের উদ্ভবের ইঙ্গিত ? বক যেহেতু উভচারী, সেহেতু এই যুদ্ধে সে দুই রাজার দূত রূপে কল্পিত হয়েছে। এইভাবে, বিরোধের মধ্য দিয়েও স্থলের পাখিকে জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিরোধও এক ধরণের সম্পৃক্ততা।

'বক ব্রহ্মজাতকে' (সং ৪০৫) বকব্রহ্মের সঙ্গে জলের যোগ বিশেষভাবে দেখা যায়। বকব্রহ্মা একবার মরুকান্তারে গঙ্গাস্রোত প্রেরণ করে একদল বণিকের তৃষ্ণানিবারণ করেন। তিনি এক জন্মে গঙ্গাতীরে তপস্যা করতেন ; অপর এক জন্মে তিনি 'এণি' নামে এক নদীর ধারে বাস করতেন।

যে ইন্দ্র জলদেবতা, Pluvial God, তিনি ময়ূরের রূপ ধারণ করেছেন, কখনো বা কোকিলের। কোকিলের একটি প্রতিশব্দ হলো 'দাত্যূহ', যার অন্যতম অর্থ 'মেঘ'।

কাকের সঙ্গে জলের আসঙ্গ খুবই দেখা যায়। ঈশপের গল্পে তৃষ্ণার্ত কাককে কলসীর ভেতর পাথর ফেলে জল খেতে দেখা যায়। সংস্কৃতে জল-ভরা পূর্ণ নদীকে 'কাকপেয়া' (পালি: 'কাকপেয্যা') বলে। কারণ, তীরে বসেই কাক গলা বাড়িয়ে জল খেতে পারে তাতে। গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী'-তে 'ধকার ব্রজ্যা'য় লিখিত হয়েছে, কাকের স্নান অনাবৃষ্টির সূচনা করে ('কাকানামভিষেকেহকারণতাং বৃষ্টিবনুভর্বত্তি')। ভারতের কোনো-কোনো অঞ্চলের ঠগ ও ডাকাতেরা নদী-পুকুরের ধারে কোনো গাছে বসা কাককে শুভ চিহ্ন বলে মনে করে, ঠিক যেমন জলপানরত খঞ্জন দর্শন শুভ বলে 'বৃহৎসংহিতা'য় লিখিত হয়েছে। 'কাকস্নান,' 'কাকচক্ষুর মতো জল' ইত্যাদি বিশিষ্টার্থক শব্দ-গুচ্ছ প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

কাকের সঙ্গে জলের এই সংযোগ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে কাককুণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাহিনীটি এই: মালয়ের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একদা জীবন্ত বিষ্ণুর প্রতি-মূর্তি পুজো করতে চাইলেন। জীবন্ত বিষ্ণুর খোঁজে দিকে-দিকে তিনি দূত প্রেরণ করলেন। তাঁর এক ব্রাহ্মণ দূত, নাম বিদ্যাপতি, খুঁজতে-খুঁজতে বঙ্গোপসাগরের কূলে এসে শুনলেন, শবর শ্রেণীর এক অরণ্যচারীদের রাজা বনের ভেতর জীবন্ত বিষ্ণুর মূর্তি পুজো করে থাকেন। বিদ্যাপতি সে পুজো দেখবার জন্যে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। সেখানে ছিল একটি পুকুর। একটি কাক মরে সে পুকুরে পড়ে গেল। কিন্তু জলের এমনই মাহাত্ম্য যে কাকটি তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর রূপ ধরে স্বর্গে চলে গেল। কাকটিকে এইভাবে বিষ্ণুতে পরিণত হতে দেখে বিদ্যাপতিও মুক্তি কামনায় সেই জলে ডুবে মরতে গেলেন। সেই সময় দৈববাণী হলো, তিনি যেন তা না করেন। অতঃপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেখানে জগন্নাথের মন্দির তৈরি করে বিষ্ণুর উদ্দেশে তা নিবেদন করেন। পুরীর মন্দিরের পশ্চিমদিকে আজও এই কুণ্ডটি রক্ষিত আছে। সব তীর্থযাত্রীই মুক্তি ও মোক্ষ কামনায় এই কুণ্ডের জল স্পর্শ করে আসেন। এটি 'রোহিণীকুণ্ড' নামে পরিচিত।

এই কিংবদন্তীর সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হলো—কাকের জলে ডোবা ও তার বিষ্ণুরূপ প্রাপ্তি। জায়গাটি বঙ্গোপসাগরের কাছে। সাগরের সঙ্গে পাখির যোগ গরুড়ের মাধ্যমে পূর্বেই লক্ষ করে এসেছি।

বকের সঙ্গে জলের সম্পৃক্ততা নিতান্তই স্বাভাবিক। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অঞ্চল বিশেষে বিশ্বাস আছে, সমস্ত জলাভূমি একদা কালো রঙের বকেরই অধিকারে ছিল, পরে সাদা বক তা দখল করে নেয়। খুব বেশি বন্যা হলে পূর্ববঙ্গের উপভাষায় বলে 'বগাডল' অর্থাৎ বকের পাখার মতো আদিগন্ত শুভ্র জলের রাশি। একটি রুশ লোককথায় দেখা যায়, Stork এবং Heron পরস্পরকে বিবাহপ্রস্তাব ও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছে পর্যায়ক্রমে আবহমান কাল, জলাশয়ে। একটি রুমানিয়ান লোককথায় পাই: অনেক বিপদ সহ্য করে একটি

জলচর পাখি 'পেলিকান' সম্পর্কে মধ্যযুগে ধারণা ছিল যে, এ পাখি নিজের বুকের রক্ত পান করিয়ে শাবকদের প্রতিপালন করে। ডাহুক সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিম উভয়-বঙ্গেই বিশ্বাস আছে, সারারাত ধরে ডেকে-ডেকে ডাহুক-মাতার কণ্ঠ থেকে যখন রক্ত নির্গত হয়ে ডিমের ওপর ঝরে পড়ে, তখন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে, নয়ত ফোটে না। ডাহুকের ডিমের ওপর লাল ছিটে দেখে এ ধারণার জন্ম হতে পারে নিশ্চয়ই ; তবে এ রক্তের যাদু-ধর্মও স্বীকার্য।

ক্রমপুঞ্জিত লোককথা (Cumulative Folktale)-গুলোতে ক্রমাগত কার্য-কারণ-বিহীন ঘটনা ঘটে যায়, যা কিনা এক শিথিল অর্থে যাদুময়। যেমন, সিংহল থেকে পাওয়া একটি লোককথায় (Village Folktales of Ceylon : vol, I, London, Luzac and Co. 1910 ; H. Parker. pp 201-205) একটি বটের পাখি পাহাড়ের খাঁজে হারিয়ে যাওয়া ডিম উদ্ধারের জন্যে পর পর কটি বস্তু ও প্রাণীর কাছে যাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগ নেই,—একবার একটি জলপাত্রের কাছেও গেছে। জলপাত্র বর্তকের অনুরোধ রাখে নি। কিন্তু বিহার ও পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া অপর দুটি ক্রমপুঞ্জিত লোককথায় পাখির সঙ্গে যে জলের যোগ দেখি, তাতে বিহারী লোককথাটিতে জল পাখির অনুরোধ রক্ষা করেছে। বিহারী কথাটিতে আছে : সাপ রাণীকে কামড়াতে অস্বীকার করলে নায়ক টিয়ে পাখি-লাঠিকে বললে সাপকে মেরে ফেলতে, আগুনকে বললে লাঠিকে পোড়াতে, সমুদ্রকে বললে আগুনকে নেবাতে। তাহলে পাখির সঙ্গে পাই ; সাপ, লাঠি, আগুন, জল। পূর্ববঙ্গীয় কথাটিতে আছে : বেড়াল ইঁদুরকে হত্যা করতে রাজী না হওয়ায় টুনটুনি লাঠিকে বললে বেড়ালকে মেরে ফেলতে, সমুদ্রকে বললে আগুন নেবাতে, হাতীকে বললে সমুদ্র-শোষণ করতে, মশাকে বললে হাতীকে কামড়াতে। এখানে পাচ্ছি পাখির সঙ্গে : বেড়াল, ইঁদুর, লাঠি, সমুদ্র, হাতী ও মশা। পাখির সঙ্গে জলের যোগ প্রদর্শনই এ ক্ষেত্রে আমার মূল উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যে সব প্রাণীর সঙ্গে এর আগে বা পরে আমরা পাখির সংযোগ লক্ষ করব সবগুলোই এখানে পাই। বস্তুত, যে সব ক্রমপুঞ্জিত লোককথার নায়ক পাখি, তা উল্লিখিত 'composite symbol'-এর পটভূমিকাতেই আলোচ্য ও বিবেচ্য।

পাখির সংগে উল্লিখিত এই জল শেষে জলাধার, কূপ ও নদীতে রূপ নিয়েছে। নদীর নামকরণে অথবা নদীর রক্ষক-দেবতারূপে পাখির নাম তাই দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম সাইবেরিয়ার ostyak-দের তিন জন প্রধান দেবতার অন্যতম হলেন 'হংসদেবতা'। ইনি পাখিদের, বিশেষত 'ob' নদীর রক্ষক। প্রতি বসন্তে এই নদীর তীরে এসে হাঁসেরা তাদের পালক পায়। পাঞ্জাব থেকে সংগৃহীত একটি লোককথায় (F. A. Steel : Tales of the Punjab told by the people : London, Macmillan and Co, 1884, pp, 195-196) ময়ূরকে বলা হয়েছে 'The lord of the five river',

১. অবশ্য অনেকে এই ময়ূরাক্ষী' শব্দকে মংগল প্রভাবজাত একটি শব্দ বলে মনে করেন। দ্রঃ রাঢ়ভূমিতে ইন্দো-মঙ্গল প্রভাব (কথা সাহিত্য : শ্রাবণ, ১৩৮১, পৃ, ১২৪৮-১২৫২) ডঃ অমলেন্দু মিত্র।

লক্ষ করা প্রয়োজন, পাঞ্জাব পঞ্চনদীর দেশ। বাঙলা দেশের 'ময়ূরাক্ষী' 'কপোতাক্ষ' প্রভৃতি নদীর নাম সকলেরই জানা। দুটিতেই জলের সঙ্গে পাখির চোখের সম্পর্ক ধরা পড়েছে, 'কাকচক্ষু' জলের কথাও এ প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করা যেতে পারে। জলপাইগুড়ি জেলার একটি অখ্যাত নদীর নাম 'পারোকাটা'। 'পারাবত' শব্দ থেকে 'পারো' শব্দ এসেছে। 'কপোতাক্ষ' শব্দের তদ্ভব-রূপ 'কবোদাক' পেয়েছি। 'কালিন্দী' উপন্যাসে তারাশংকর 'ময়ূরাক্ষী'র তদ্ভব-রূপ দিয়েছেন 'মৌরক্ষী'। পাখির নামে নদীর নাম খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে। পূর্ণতোয়া নদীকে যে 'কাকপেয়া' বলা হত প্রাচীন ভারতে, আগেই তার উল্লেখ করেছি।

এই সব কারণেই হুপো এবং হামিং বার্ড সম্পর্কে নানা বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে জল নিয়ে। হুপো খাদ্য অন্বেষণের জন্যে জঞ্জাল ইত্যাদি নাড়া-চাড়া করে, বারবার মাথা তোলে, ঝুঁটি খোলে, এর থেকে আরবরা বিশ্বাস করে, হুপো কুয়ো এবং ঝর্ণা খুঁজে বেড়াচ্ছে। পূর্ব ব্রাজিলে বিশ্বাস আছে, 'হামিংবার্ড' একদা সব জল 'ধারণ' করে নিয়েছিল, মানুষের ব্যবহারযোগ্য জলটুকু পর্যন্ত ছিল না। ম্যাগপাই সম্পর্কে বিশ্বাস এই ঃ মহাপ্লাবনের সময় সকলেই এসে নোয়ার 'আর্কে' ঠাঁই নিল। আসে নি কেবল ম্যাগপাই। সে এক উঁচু খুঁটিতেই আশ্রয় নিয়েছিল। ম্যাগপাইয়ের জল-প্রিয়তা এতে পরিস্ফুট হয়েছে। এ যথার্থেই 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে'। বৃষ্টির সময় বাবুই নাকি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে ভেজে।

জল থেকে ক্রমে মাছ এবং নৌকোর সঙ্গে পাখির সংযোগ এসে গেছে। মাছ যেমন জলে সাঁতার দেয়, পাখিও তেমনি বাতাসে ভাসে। সাঁতার দেবার জন্যে পাখির মতো মাছের আছে পাখা, উড়ুক্কু মাছের কল্পনাও করা হয়েছে তাই। মাছের আঁষ, পাখির পালক; পাখির চোখের মতো মাছের চোখের সম্পর্কেও মানুষের নানা কৌতূহল, নানা কল্পনা। অনেক পাখিই মৎস্যাশী। মাছ-রাঙা নাকি জলের গভীরতম অংশে লুকানো মাছকেও স্পষ্ট দেখতে পায়। 'কুরর' বা মেছোঈগল ('মাছমৌরল') নাকি এক বিচিত্র সুরে জলাশয়ের ওপর ডাকে, মাছ সেই গানে সম্মোহিত হয়ে ওপরে ভেসে উঠলেই তারা ছোঁ মেরে তুলে নেয়। ওই ডাক নাকি মাছেরা শত চেষ্টাতেও এড়াতে পারে না। মধ্যযুগে ইউরোপের কোনো-কোনো অঞ্চলে মাছ পাখির বিকল্প হয়ে উঠেছিল। Donegal, Ireland প্রভৃতি স্থানে প্রতি শুক্রবার মাছ স্থানে 'Barnacle goose' খাওয়া হত, কারণ এ পাখি জলেই জন্মায় বলে বিশ্বাস ছিল। পাখি ও মাছ উভয়েই অণ্ডজ এবং উভয়েই প্রাচুর্য ও উর্বরতার প্রতীক। পাখি যেমন দূর আকাশের অথবা অদেখা রাজ্যের প্রাণী, মাছ তেমনি জলতলে অদৃশ্য, একারণে দুটি প্রাণী সম্পর্কে মানুষের অনেক কৌতূহল আছে। জলের মাধ্যমে মাছ ধরাগর্ভের ও বসুন্ধরার নিকটবর্তী বলে বিবেচিত, অতএব বসুন্ধরার উর্বরতা মাছেও সঞ্চারিত।

স্টিথ টম্পসনের মোটিফ-সূচীতে একটি মোটিফ এই পাই ঃ "A goose dives for a reflected star in the night, thinking it a shiny fish" (J. 1791.8) হুপোর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি রুমানিয়ান লোককথা পাওয়া গেছে ঃ এক মেছুনী তার ছেলের সাজা হিসেবে হুপো হয়ে যায়। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (দ্বিতীয় খণ্ড,

দ্বিতীয় সংখ্যা : ক. বি. ১১২৬ -র 'মাণিকতারা বা ডাকাতের পালা'-তে অ ছে কালপ্যাঁচা ডেকে বাড়িতে যাতে অমঙ্গল না ঘটায় সে জন্যে—

পেচার ডাক শুইন্যা নারী অমনি কয় ত্বরাতারি,
ডাইক না রে কাল পেচা আর
বোয়াল মাছ ভাইজা দিমু শৈল মাছ পুইড়া দিমু,
বুকের সোনা বুকে দেও আমার। —পৃ. ২৪৪

ঢাকার মাঘমণ্ডলের ব্রতকথার ছড়াতে কাককে মাছ দেবার কথা বলা হয়েছে। মাঘমণ্ডলের 'মণ্ডল'টি সূর্য-মণ্ডলের প্রতীক। কাককে সূর্য-সম্পৃক্ত করে সেই কাককে মাছ উপহার দেওয়া হচ্ছে :

··বউর লাইগ্যা আনছেন কি? —কুইয়া পুঁটি!
খাইব না, ছুঁইব না, শিয়রে থুইব,
রাইত পোহাইলে কাকেরে দিব।
সেই কাক তোমার কি কাম করে?
—রাইত পোহাইলে বাসি কাম করে!

তাঁর 'Zoological Mythology' (vol II, 1872) বইতে A. de. Gubernatis 'টুরিন' (Turin) থেকে পাওয়া একটি অপ্রকাশিত লোককথা সংকলিত করেছেন (P 322, পাদটীকা) : এখানে প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রী ব্যাভিচারী হয়েছে ; তার সতীত্ব সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্যে বিদেশগামী স্বামী বাড়িতে রেখে গেছে খাঁচায় একটি শুক পাখি। বাড়িতে নাগর এলে ওই কুলটা নারী খাঁচাটিকে কাপড়ে ঢেকে রেখে নাগরের জন্য মাছ ভাজতে বসেছে। আবৃত খাঁচায় বসে পাখিটি সেই শব্দ শুনে ভেবেছে, বুঝি বৃষ্টি নেমেছে। এই কাহিনীতে পাখি, মাছ ও জল (বৃষ্টি) একত্র সমাবিষ্ট হয়েছে। Gubernatis অবশ্য এর মধ্যে phallicism-এর ইঙ্গিত পেয়েছেন।

ক্রমপুঞ্জিত কাহিনীগুলোর যেখানে নায়ক বা মূল চরিত্র পাখি, সেখানে প্রায়ই পাখির সঙ্গে মাছের সংযোগ লক্ষ করেছি। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া একটি কথায় : কাক চিংড়ি মাছকে খেতে চাইল, তারপর একে একে কাক নদী, কুমোর, কামার ইত্যাদির কাছে গেল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'তে পূর্ববঙ্গ থেকে সংগৃহীত 'উকুনে বুড়ির কথা' নামে চমৎকার একটি ক্রমপুঞ্জিত লোককথা আছে। এখানে দেখি, বক উকুনে বুড়িকে শোল মাছ রাঁধতে বলেছে।

লোককথার একটি প্রসঙ্গোপকরণ (Motif) হলো 'Magic conflict'। ক্রমপুঞ্জিত লোককথার সঙ্গে 'যাদুময় যুদ্ধে'-র একটি সাদৃশ্য আমার চোখে ধরা পড়ে। ক্রমপুঞ্জিত লোককথাতে যেমন অসংলগ্ন বস্তু ও প্রাণীর কাছে পর-পর যাওয়া হয়, 'Magic conflict'-এও তেমনি পর-পর অসংলগ্ন বস্তু বা প্রাণীর রূপ ধরা হয়। এবং সেই রূপান্তরের কালে পাখির পর মাছের রূপ বা মাছের পর পাখির রূপ-ধারণ দেখা যায়।

১. পাখির সঙ্গে নৌকোর সম্পৃক্ততার দিকটি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ধাঁধার আলোচনা কালে, আমরা লক্ষ করেছিলাম। পাখিতোলা নৌকো

যেন পাখা মেলা একটি পাখি। বিভিন্ন আকৃতির নৌকোর নামচয়নে পাখির নামের কথাও আগে উল্লেখ করেছি। সমুদ্রগামী নৌকো এবং জাহাজের নাবিকেরা পাখি সম্পর্কে নানা বিশ্বাস পোষণ করে। কারণ, নৌকো ও জাহাজের নিরাপত্তা নদী সমুদ্রের ঝড়-ঝঞ্ঝার সঙ্গে জড়িত, এবং পাখিরাই 'Weather Prophet' রূপে কল্পিত। জলপাইগুড়ি কোচবিহারের রাজবংশীরা এক কাঠের নৌকা তৈরির আগে এখনও পাখি উড়িয়ে থাকে।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'র বিভিন্ন পালায় গান রচয়িতাগণ বারবার পাখি ও নৌকোর অভিন্নতা ও একাত্মতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা লোককবি ছিলেন। কেবলমাত্র একজন কবি বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ করে একটি রচনায় যদি এই অভিন্নতা ও একাত্মতার কথা বলতেন, তবে তাকে একটি সাহিত্যিক মূল্য মাত্রই দেওয়া যেত; কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে, ওই অঞ্চলের প্রায় সব কবিই, যখনই সুযোগ পাওয়া গেছে, অব্যর্থ ভাবে এই অভিন্নতার উল্লেখ করেছেনই, তখন এটিকে সাহিত্যিক প্রথা মনে না করে একটি সামাজিক বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। যেহেতু তাঁরা লোককবি ছিলেন, অতএব লোকজীবনের বিশ্বাসাদিও তাঁদের রচনায় প্রতিবিম্বিত হবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই :—

১. পক্ষী নয় পক্ষী নয়রে উড়াইয়া দিছে পাল।
এই সে নৌকায় উঠ্যা যাইবাম যা থাকে কপাল॥ —মহুয়া

২. আট দাঁড়ে মারে টান জাতি বন্ধু জানে।
পংখী উড়া করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্মবনে॥ —মহুয়া

৩. ষোল দাঁড়ের পাগল পানসী পক্ষী উড়া দিল।—মইষাল বন্ধু

৪. দাঁড়ের টানে কোশা যেন পংখী উড়া করে।—দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি

৫. পবনের মত কোশা পংখী উড়া দিলা।—ঐ

৬. পক্ষীর মতন ডিঙা উড়িয়া চলিল।—ভেলুয়া

কাককে নৌকোর কাণ্ডারী রূপে দেখি 'গোপীচন্দ্রের গানে'র এই পঙক্তিতে : 'কাগা কাণ্ডারী নৌকার'। বহু পরিচিত ছেলেভুলানো ছড়ার একটি পঙক্তি : 'সাতটি কাকে দাঁড় বায়'। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয়, একদা নাবিক-গোষ্ঠীর দেবতা ছিল কাক।

পাখি ও আগুন : আগুন জলেরই বিপরীত পদার্থ; বৈপরীত্যও এক ধরনের সাদৃশ্য। যে জলের সঙ্গে পাখির যোগ এত গভীর, ব্যাপক ও বিচিত্র, বিপরীত পদার্থ হিসাবে, বলা বাহুল্য, আগুনের কথা এসে পড়া অত্যন্তই স্বাভাবিক। অথবা আগুনের বিপরীতে জল। অথবা, সৃষ্টির দুই প্রধান উপকরণ - আগুন ও জল — দুইই একসঙ্গে পাখির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। জল থেকে অন্যান্য তরল পদার্থ, মাছ, নৌকো ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসে পড়েছে, আগুন থেকেও তেমনি আলোক ও উজ্জ্বলতা, তার বিপরীত অন্ধকার, এবং শেষে সূর্য এসে গেছে।

জল ও আগুনের মধ্যে জলই প্রাচীনতর। জল মানুষকে সৃষ্টি করতে হয়নি,

সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী জলমগ্নই ছিল। মেঘ থেকে জল স্বতই ঝরে পড়ে। দাবানল ও বাড়বানলের মাধ্যমে নৈসর্গিক জগতে স্বয়ংসৃষ্ট আগুন দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বিরল-দর্শন এবং অরণ্যচারী আদিম মানুষের কাছে ছিল ভয়াবহ বিপদের কারণ। সম্ভবত বজ্র ও বিদ্যুতের মধ্যেই মানুষ প্রথম অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করেছিল। মানুষ কিছু দূর অগ্রসর না হয়ে আগুন আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় নি।

আগুনের আবিষ্কার মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি বড়ো আবিষ্কার। আবিষ্কার করবার পর মানুষ বুঝল, এতো সহজে যে আগুন জ্বালানো যায়, নিশ্চয়ই এতোদিন তা অন্য কোথাও লুকানো ছিল। কেউ হয়তো ইচ্ছে করে এই আগুনকে পৃথিবীতে আসতে দেয় নি; কেউ হয়তো চুরি করে এ আগুনকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। এরই ফলে এলো নানা কল্পনা। আগুন পৃথিবী থেকে বহু দূরে, হয়তো স্বর্গে, হয়তো অন্যত্র ছিল; কোনো পশু বা পাখি তা সেখান থেকে নিয়ে এসেছে। যে সব গোষ্ঠীর কাছে পাখি পূর্বপুরুষের প্রতীক, গোত্রের প্রতীক, ব্যক্তিগত জীবনের প্রতীক, তারা পাখিকে সৃষ্টিকর্তা জ্ঞানে আগুনেরও সৃষ্টিকর্তা বা আনায়নকারী রূপে নির্দেশ করেছে। যে আগুনের এত প্রচণ্ড ক্ষমতা, গুহামুখে যা প্রজ্বলিত করলে কেবল নৈশ অন্ধকারই দূর হয় না, হিংস্র জন্তুর হাত থেকেও যা রক্ষা করে, প্রচণ্ড শীতে যে দেয় তাপ, তার আবিষ্কার যে তুচ্ছ মানুষ করতে পারে, আদিম মানুষ তা ভাবতেও পারে নি; সে গৌরব অকুণ্ঠ চিত্তে তারা পশু-পাখিকেই বিলিয়ে দিয়েছে।

আগুন থেকেই পাখির জন্ম, অগ্নিদাহ বা অগ্নিসংযোগের ফলে পাখির গাত্রবর্ণের পরিবর্তন, এবং অগ্নিদাহে পাখির মৃত্যু, প্রথমেই এই Motif-টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কিছু কার্যকারণাত্মক কাহিনী (Aetiological myth)-ও মেলে। ক্রমপুঞ্জিত লোককথাগুলিতে পাখির সঙ্গে আগুনকে বহুশই দেখা যায়।

প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক কল্পনাতে ফিনিক্স পাখি নিজেই আগুনে পুড়ে মৃত এবং আপন ভস্ম থেকেই তার পুনর্জন্ম ঘটত সঙ্গে-সঙ্গেই। পারস্যের 'হোমা' নামীয় পৌরাণিক পাখি জীবনে একবার মাত্র ডিম পাড়ত বলে কথিত হয়; এ পাখিও মৃত্যু হলে আপন চিতাগ্নি থেকে পুনর্জন্ম লাভ করত বলে বিশ্বাস করা হয়। ফিনিক্সের এই অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার পৌরাণিক ব্যাপারটি এ যুগের এক সত্য ঘটনার সঙ্গে উপমিত হয়েছে (দ্রঃ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ: 'নাই কেন সেই পাখি', আনন্দবাজার পত্রিকা: ১২ ভাদ্র, ১৩৭৯): "আসামের হাফলং-এর নিকটে একটি পার্বত্য উপত্যকার গ্রামে এই রহস্যের [পাখিদের অগ্নিতে আত্মাহুতির] ব্যাপারটি ঘটিয়া থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের আকাশে যে কয়েকটি রাত্রিতে চাঁদ থাকে না, সেই কয়েকটি রাত্রিতে গ্রামবাসীরা মাঠের উপর জ্বলন্ত পেট্রোম্যাক্স বাতি সাজাইয়া রাখে। অন্ধকার রাত্রির বাতাসে পাখার শব্দ উচ্ছ্বসিত করিয়া নানা জাতের অজস্র পাখী উড়িয়া আসে ও মাঠের ওইসব জ্বলন্ত বাতির কাছে ঝাঁপাইয়া পড়িতে থাকে।" পতঙ্গের অগ্নি-তৃষ্ণা যেমন বাস্তব সত্য, পাখির অগ্নি-তৃষ্ণাও তেমনি এই তথ্যের দ্বারা সমর্থিত।

এই জন্যেই আগুন ও ব্রহ্ম-কে অনেক সময় ভারতীয় পৌরাণিক কল্পনাতেও পাখির

উদ্ভবের মূলে দেখা যায়। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে একটি কাহিনী আছে: ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতির পুত্র ত্রিশিরা। পিতা-পুত্র উভয়েই ইন্দ্রের বিরোধী ছিলেন। ত্রিশিরা-র তিনটি শির ছিল। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির মতো তাঁর তিনটি মাথা। ইন্দ্রের বজ্রে তাঁর মৃত্যু হয়। এক সূত্রধর ত্রিশিরার মস্তক ছেদন করলে প্রথম মুণ্ড থেকে চাতক, দ্বিতীয় মুণ্ড থেকে শ্যেন এবং তৃতীয় মুণ্ড থেকে তিতির পাখিদের জন্ম হয়। এই কাহিনীর মধ্যে যেটি আমাদের লক্ষ করবার বিষয় তা হলো, ইন্দ্রের বজ্র এবং ত্রিশিরার অগ্নিবৎ একটি মুণ্ড।

শুধু জন্মই নয়, আগুনের মাধ্যমে দূরস্থিত অনুপস্থিত পাখির আবির্ভাব সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয়েছে। পারস্যের কবি ফিরদৌসীর প্রখ্যাত রচনা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে: Alburs পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় 'শিমুর্গ' পাখির বাসা, অসহায় শিশু Sal সেখানে ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত হয়ে আসে। শিশু সলকে শিমুর্গ পরিচর্যায় সুস্থ করে তুলল। বিদায় দেবার সময় শিমুর্গ তার একটি পালক সল-কে দিয়ে বলল, সেই পালক আগুনে নিক্ষেপ করলেই তার সাহায্যার্থে শিমুর্গ আবির্ভূত হবে। একই ব্যাপার ঘটেছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র বুদ্ধু-ভুতুমের কাহিনীতে। এখানেও দেখা যায়, প্যাঁচার পালক পোড়াতেই ভুতুম ছুটে এসেছে।

ঋগ্বেদে শ্যেন অগ্নিরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। 'জারিতা', পক্ষিবিশেষ, অগ্নি সম্বন্ধে তাঁর রচিত কটি ঋক মন্ত্র আছে। ঋগ্বেদে গৃহে অগ্নির উত্থানকে জলমধ্যে হংসের সন্তরণ বলা হয়েছে। (১ ৬৫. ৯)। দশম মণ্ডলের ১৬৫-সংখ্যক সূক্তে কপোতকে নির্ঋতি ও যমের দূত বলা হয়েছে। কপোত অগ্নি স্পর্শ করলে, তা মহা অমঙ্গলের সূচনা করে বলে উক্ত আছে। প্রসঙ্গত, মহাভারতের শ্যেন-কপোতের প্রখ্যাত উপাখ্যান স্মরণ করা যায়। ইন্দ্র শ্যেনের এবং অগ্নি কপোতের রূপ ধরে শিবিকে ছলনা করতে এসেছিলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে বজ্রের, এবং বজ্রের গর্ভের আগুনের সঙ্গে শ্যেনকে জড়িত দেখা যায়। রোমান পুরাণ অনুসারে ঈগল দেবরাজ Zeus-এর বাহন এবং বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পৃক্ত; ঈগল বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয় না বলে কল্পিত। এই জন্যে, ঝড়ে যাতে ফলন্ত শস্য নষ্ট না হয় ঈগলের ডানা শস্যক্ষেত্রে পুঁতে রাখা হয়। চিলের কথাও এই সঙ্গে ওঠে। বছরের কয়েক মাস চিল দেখতে পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন, চিলরা তখন রাবণের চিতায় কাঠ দিতে লঙ্কায় চলে যায়, কারণ রাবণের চিতা এখনও জ্বলে চলেছে। অগ্নি কপোত রূপ ধারণ করেছিলেন বলেই সম্ভবত পরবর্তী কালে কপোতের নামান্তর হয়—'দহন'। পক্ষিবিদ্যার দিক থেকে 'কপোত' বলতে সমশ্রেণীর পাখী ঘুঘুকেও বোঝায়। এই জন্যে প্রাচীন ভারতে ঘুঘুকে 'গৃহনাশন', ভীষণ', 'অগ্নিসহায়', 'দহন' প্রভৃতি বলা হয়েছে।

কপোত বা ঘুঘুর সঙ্গে অগ্নির এই সংযোগ শুভ ও অশুভ উভয় প্রকার বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছে। আমেরিকায় বিশ্বাস আছে, Turtle dove মানুষকে বজ্র, বিদ্যুৎ ও আগুন থেকে রক্ষা করে। একটি তেলেগু লোককথায় ঘুঘুর এই অগ্নি-সম্পৃক্ততা একটি ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে (Telegu Folklore: The Indian Antiquary, January 1906, pp 31-32: T. Sivasankaram.)। গল্পটি

মূলত প্রেমের গল্প। স্ত্রী-ঘুঘু যে ব্যাধের হাতে ধরা পড়েছে, সেই ব্যাধকেই আগুন জেলে শীত থেকে রক্ষা করেছে পুরুষ-ঘুঘু। ঠোঁটে করে সে শুকনো পাতা-খড় কুড়িয়ে এনেছে, একটি লাঠির মাথায় একটু আগুন নিয়ে এসেছে কাছের গ্রাম থেকে। সেই আগুনেই পুরুষ-ঘুঘুটি নিজেকে আহুতি দিয়ে ব্যাধের খাদ্য হয়েছে: এবং পরিশেষে, স্ত্রী-ঘুঘুও আগুনে আত্মসমর্পণ করেছে। ঘুঘুর অগ্নি-সম্পৃক্ততা এই কথায় খুবই স্পষ্ট।

কাকের সংগে আগুনের যোগ সম্ভবত সর্বাধিক। যে সব পাখির রঙ কালো বা কালোর দিকে বা চিত্রিত, তাদের সংগেই আগুনের যোগ বেশী, কাহিনীও বেশি মেলে। আগুনে পুড়লে পদার্থ কালো হয়ে যায়, এই জন্যেই এ সব পাখির সংগে আগুনের সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। যেমন, কাক, ফিঙে, চড়ুই, খঞ্জন ইত্যাদি। এই সব পাখির কাহিনী ও এদের সম্পর্কীয় বিশ্বাসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা আগুনের জন্ম, মর্তে তা নিয়ে আসা অথবা অগ্নি-ধারণের সংগে যুক্ত নয়; আগুন সামাজিক জীবনে বিশেষ পরিচিত হবার পর এ সব পাখির সংগে আগুনের যোগ ঘটেছে। তথাপি এদের অগ্নি-সংযোগ লক্ষ করবার মতো।
কাক সম্পর্কীয় প্রবাদেও কাকের এই যোগ ধরা পড়ে; 'কাকের উপর কামানের চোট,' মহাভারতের গল্প স্মরণ করে 'কাগী-বগী ভস্ম করা' ইত্যাদি। 'দগ্ধকাক' বলতে দ্রোণকাক বা দাঁড়কাক। ঢাকার মাঘমণ্ডলের ব্রতের ছড়ায় আছে: 'কাইয়া করে কা কা, আথার মাটি খা খা।' মরক্কোর মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, কাক আগে ছিল কামার, আগুন নিয়ে যার কারবার। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া একটি অতি-পরিচিত 'ক্রমপুঞ্জিত লোককথা'য় দেখি, কাক কামারের কাছে কাস্তে এবং গৃহস্থের কাছে আগুন চাইছে: 'গেরস্ত ভাই, দাও ত আগুন, গড়বে কাস্তে।' এই ধরণের কথার সব কটিতেই দেখা যায়, সেই আগুনে পুড়েই কাক মরল। 'দগ্ধকাক' এই নাম তখন যথার্থ বলে মনে হয়।

'কথাসরিৎ সাগরে'-র একটি কথায় অবশ্য কাকই প্যাঁচাদের পুড়িয়ে মেরেছে। কাক-প্যাঁচার দ্বন্দ্ব চলছিল। চিরজীবি নামে চতুর কাক কৌশলে অবমর্দ নামীয় প্যাঁচাদের নেতা ও অন্যান্য প্যাঁচাদের নীড়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। চিরজীবী এমন করে অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে।

ছোটোনাগপুরের মুণ্ডারীদের মধ্যে প্রচলিত একটি কথায় (Descriptive Ethnology of Bengal, Reprint 1960; E T. Dalton, P. 185) কাকের সঙ্গে অন্যান্য পাখিরাও যুক্ত হয়েছে। সিং বোঙ্গার সেবা করতে রাজী না হওয়ায় তিনি স্বর্গ থেকে অনেক মানুষদের বিতাড়িত করে দিলেন। তারা মর্তে এসে যে জায়গায় বসতি করলে, তার নাম 'তেরাশি পিঁড়ি, একাশি বাড়ি'। এখানে এসে খনিতে তারা পেল আকরিক লোহা; দিনরাত চুল্লি জেলে তা থেকে লোহা তৈরি করতে থাকল। এই আগুনে ঘাস ও গাছ পুড়ে গেল, ধোঁয়া এবং অগ্নিকণা আকাশে গিয়ে অসুবিধের সৃষ্টি করল। সিং বোঙ্গা নির্দেশ দিলেন, যে হয় কেবল দিনে, নয় কেবল রাতে চুল্লি জ্বালাতে; কিন্তু তারা কেউ তা মানল না। সিং বোঙ্গা তখন আকাশ থেকে দুটি ফিঙে, একটি প্যাঁচাকে পাঠালেন। মানুষরা চিমটে

দিয়ে তাদের লেজের ক্ষতিসাধন করলে। ফিঙের লেজ আজও তাই চেরা। তারপর তিনি পাঠালেন একটি কাক ও একটি 'লিপি' ('ভরত') পাখিকে। কাকেরা তখন সাদাই ছিল, কিন্তু চুল্লির আগুনেই তারা কালো হয়ে গেল। আগুনে 'লিপি' পাখিও পুড়ে লাল হলো। অতঃপর সিং বোংগা নিজেই মর্তে এলেন।...

কথাটি লৌহযুগের পরবর্তীকালীন, বলাবাহুল্য। কাকের সঙ্গে এর আগে প্যাঁচাকে আগুনের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেছি, এখানে আবার তা দেখা গেল। ফিঙের সঙ্গে আগুনের যোগের কথা পরে বলছি। 'লিপি' বা 'ভরত' পাখির মতো চড়ুই, তিতির ও খঞ্জনের সঙ্গে আগুনের সম্পর্ক লক্ষ করেছি।

শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকের ওফেলিয়া প্যাঁচাকে বলেছে 'বেকার' অর্থাৎ রুটিওলার মেয়ে। এক রুটিওয়ালী যখন আগুনে রুটি সেঁকছিল, যিশু তার কাছে একখানা রুটি চান। রুটিওয়ালী তা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কৃপণ-কন্যাই মা-কে তা দিতে দেয়নি। যিশুর অভিশাপেই সে মেয়েটি পঁ্যাচা হয়ে 'Heugh, heugh, heugh' বলতে-বলতে উড়ে যায়। রুটি সেঁকার উনুনের আগুনটাই, এখানে আমাদের লক্ষ করবার দিক। এই রকম 'Chimney swallow' নামের মধ্যে উনুনের চিমনিটি ধরা পড়েছে। Standard dictionary of folklore, legend and mythology-তে একটি তথ্য পাচ্ছি: "Penobscot Indians say the screech-owl, if mocked, will burn up the mocker in his camp ;..." P. 838.

আমি যে ক'টি রূপপুঞ্জিত লোককথায় কাককে নায়ক বা মূল চরিত্র হতে দেখেছি, তার প্রায় সব ক'টিতেই কাককে জল ও আগুনের সঙ্গে পাশাপাশি বা পর-পর সংযুক্ত হতে দেখেছি।

ফিঙেকে ওড়িশায় বলে 'কাজলিপাতি'। সেখানে পাখিটিকে খুবই প্রতিশোধ-প্রবণ বলে মনে করা হয়। যদি কেউ এর বাসা ভেঙে দেয়, তাহলে পাখিটি তাকে অনুসরণ করে তার বাসা চিনে আসে; এবং সুযোগ-সুবিধে মতো কোনো বাড়ি থেকে জ্বলন্ত অংগার মুখে করে এনে তার ঘরের চালে নিক্ষেপ করে। কুঁড়ে ঘর হলে তা পুড়ে যায়। পাখির বাসা ও আগুনের সংযোগ আবো দেখা যায়। জার্মানীতে বিশ্বাস আছে, সারস চিরতরে তার নীড় পরিত্যাগ করলে ওই অঞ্চলে আগুন লাগে বা অন্য বিপদ উপস্থিত হয়। একটি সাঁওতালী লোককথায় (Folklore of the Santal Parganas . London, David Nutt, 1909, PP 289—292; C. H. Bompas) দেখা যায়: পরিত্যক্ত দুটি শিশুকে একটি রাজ-শকুন মাতৃস্নেহে লালন করতে থাকল, শিশু দুটি বড়ো হবে তাদের পিতা-মাতার কাছে চলে গেল। তখন রাজশকুন ও পিতামাতা শিশু দুটিকে অধিকার করবার জন্যে টানাটানি করতে থাকলে তারা দ্বিধাছিন্ন হয়ে গেল। রাজ-শকুন মৃতদেহের অর্ধেক নিয়ে তার কুলায়ে রেখে অগ্নিসংস্কার করল। আগুন আবিষ্কারের অনেক পরে এই কথা রচিত হয়েছে।

পুরুষ চড়ুইয়ের গায়ের গভীর খয়েরি রঙের ব্যাখ্যা করে 'কার্যকারণাত্মক কাহিনী' (Aetiological myth) পেয়েছি। বাঙলাদেশের কথাটি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'বিহংগ পুরাণ' অংশে উদ্ধৃত করেছি। সিংহল থেকে কথাটির যে রূপান্তর পাই (Glimpses of Singhalese Social Life: The Indian

Antiquary, September, 1904, P. 230 : Arthur A. Perera), তাতে দেখি, চড়ুই-দম্পতির নীড়ে আগুন লাগলে, চড়ুইনী ভয়ে পালিয়ে যায় ; চড়ুই অগ্নিতাপ সহ্য করে বাচ্চাদের বাঁচায়। তখন তার দেহ পুড়ে এই রঙের হয়ে যায়। এই রকম কার্য-কারণাত্মক কথা রবিন রেডব্রেস্ট সম্পর্কে ইউরোপে চলিত আছে। এ পাখি প্রতিদিন নরকে গিয়ে নরকাগ্নিতে জল নিক্ষেপ করে, এবং সে কারণেই তার বুক পুড়ে লাল হয়ে গেছে। পাখি আগুন ও জল আবার একত্র দেখা গেল। এই কল্পনায় নরকেও অগ্নির অবস্থান লক্ষ করি, হিন্দু-পুরাণের মতোই।

উত্তর আমেরিকার মেউক উপজাতির মধ্যে রবিন-রেডব্রেস্ট সম্পর্কে অবশ্য ভিন্ন বিশ্বাস চলিত আছে। তাদের বিশ্বাস, রবিন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠোঁটে বহন করে দিনমান গাছের ডালে ঘুরে বেড়িয়ে, রাতের বেলায় সেই আগুন নিজের বুকে লুকিয়ে রাখে। তাতেই তার বুক পুড়ে এমন হয়ে যায়। নিজের দেহে এমন করে আগুন রক্ষা করবার অপর সুন্দর উদাহরণ পূর্ববঙ্গ থেকে পাই। ফরিদপুর জেলায় 'আলৈয়া' নামে একটি পাখির সম্পর্কে বিশ্বাস আছে, পাখিটি তার কণ্ঠে অগ্নি রক্ষা করে আসছে এবং 'অক্' করে শব্দ করলেই সে আগুন বেরিয়ে আসবে।

ইউরোপীয় বিশ্বাস অনুসারে wren নামে ক্ষুদ্র গায়ক পাখিই মানুষের ব্যবহারের জন্যে স্বর্গ থেকে আগুন নিয়ে আসে। আগুন নিয়ে আসবার সময়ই তার ল্যাজ পুড়ে যায়, আজও তেমনিই আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপজাতি বিশেষের মধ্যে চলিত লোককথায় বলা হয়েছে, আগুন ছিল সিংহের কাছে, তারই কাছ থেকে বুদ্ধি-চাতুর্যে মানুষ আগুন নিয়ে এসেছে।

আন্দামানী লোককথায় আগুন এনেছে মাছরাঙা (Bird mythology : The Calcutta Review, July 1901, P. 74 : "R.R.P.")। আগেই বলেছি, প্রায়ই আগুনের সঙ্গে জলকে দেখা যায়। এখানেও তাই। দেশ জুড়ে এক মহাপ্লাবনের ফলে সব আগুন নিবে গেল। চারজন মাত্র লোক জীবিত রইল। তারা শীতার্ত দেখে একটি মাছরাঙা এসে তাদের সাহায্য করতে চাইল। আগুনের সন্ধানে মাছরাঙা আকাশে উড়ে গিয়ে এক দেবতার পাশে একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দেখতে পেল। পিঠে করে সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড সে বহন করে আনতে চাইল। হঠাৎ সেটি দেবতার গায়েই পড়ে যায়। তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডটি ছুঁড়ে মাছরাঙাকে আঘাত করতে চাইলেন। লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় তা মাছরাঙার গায়ে লাগল না, তা গিয়ে পড়ল সেইখানে, যেখানে চারজন মানুষ ধরাতলে শীতে কাঁপছে। তখন থেকেই পৃথিবীতে আগুন এল। আগুনের সঙ্গে যুক্ত সব পাখির গাত্রবর্ণ একটি বড়ো ভূমিকা নেয়, পূর্বে বলেছি। মাছরাঙার গায়ের রঙটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে।

আন্দামানেরই আদিবাসীদের মধ্যে এ বিষয়ে আর একটি কথা চলিত আছে : পৃথিবীতে আগে আগুন ছিল না ; তা ছিল স্বর্গে, নয়তো কোনো অপ্রাকৃত জগতে। তাই মানুষ তখন আগুনের ব্যবহারও জানত না। Biliku, Bilik, Puluga, Oluga প্রভৃতি নামের এক বৃহদাকার প্রাণীই পৃথিবীকে ও আন্দামান বাসীদের সৃষ্টি করেছে। সেখানেও তখন আগুন ছিল না। একদিন মাছরাঙা পাখি উড়ে গিয়ে Biliku যখন ঘুমুচ্ছে, তখন তার কাছ থেকে আগুন চুরি করে এনে

আন্দামানবাসীদের পূর্বপুরুষের হাতে দেয়। আগুন চুরির কথা টের পেয়ে Biliku মাছরাঙাকে লক্ষ্য করে একটি অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ছুঁড়ে মারল (The Hand book of Folklore : London, Sidgvick and Jackson Ltd, 1914, pp. 110 -111 : C. S. Burne)।

আগুনের প্রসঙ্গে গাছ ও কাষ্ঠখণ্ডের কথা আগেও পেয়েছি। পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া একটি শ্লোকে ('পূর্ববঙ্গের মেয়েলি শ্লোক : 'প্রতিভা' পত্রিকা, ১৩২২) পাচ্ছি : 'কোড়াইল্যা, আর করিছ না কো-কো-র আশা/আগুনদা পোড়াইছি তোর কো-কো-র বাসা।' 'কোড়াইল্যা' অর্থাৎ কাঠ-কুড়ুলে বা কাঠঠোকরা। কাঠঠোকরার বাসা আগুন দিয়ে পোড়াবার কথা বলা হয়েছে। কাঠে-কাঠে ঘর্ষণের ফলেই দাবানলের উদ্ভব হয়; কাঠঠোকরার ঠোঁট দিয়ে কাঠে বারংবার আঘাত সেই ঘর্ষণের দিক এবং এ কারণেই আগুন আনায়নকালে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের উল্লেখ পাই বিভিন্ন দেশের কাহিনীতে। মাথায় রঙীন ঝুঁটি থাকবার দরুণই কাঠঠোকরা বিশ্বের বহু অঞ্চলে 'Fire bird' রূপে পরিচয় লাভ করেছে।

কাঠের থেকেই এসেছে কয়লা ও অঙ্গারের দিক। তাও প্রকারান্তরে আগুনের সঙ্গেই যুক্ত। 'বৃহৎ সংহিতা'য় লিখিত হয়েছে, খঞ্জন যেখানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে, সেখানে মাটির তলায় অঙ্গার মেলে। ভারতীয় মতের মৃত্তিকা-গর্ভস্থিত এই অঙ্গার শেষে খনিজ কয়লায় পরিণত হয়েছে পাশ্চাত্য বিশ্বাসে। Welsh-এর কয়লাখনির কর্মীরা খনির ওপর দিয়ে ঘুঘু উড়ে যাওয়া পরম বিপদের ইঙ্গিত বলে মনে করে। ঘুঘুর সঙ্গে আগুনের যোগের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

'The Golden Bough' (Abridged, 1971) বইতে James George Frazer এ বিষয়ে আর দু-একটি তথ্য দিয়েছেন (p. 926)। ক্যালিফোর্নিয়ার Senal Indian-রা মনে করে, পৃথিবী পূর্বে একটি অগ্নিপিণ্ড ছিল, সেই আগুন গাছ-পালায় আশ্রয় নিয়েছে। তাই কাঠে-কাঠে ঘর্ষণ করলে আজও আগুন বের হয়। ক্যালি-ফোর্নিয়ার Maidu Indian-রাও প্রায় এই ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে। ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপের নাম Namoluk, সেখানে বিশ্বাস আছে, দেবতারাই মানুষকে আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। অগ্নিশিখার চতুর দেবতা Olofaet আগুন দেন 'mwi' নামে এক ধরণের পাখিকে, ঠোঁটে করে সেই আগুন পৃথিবীতে নিয়ে আসতে বলেন। পাখিটি সেই আগুন নিয়ে গাছের ডালে-ডালে ঘুরে অগ্নিক্ষয় করতে থাকল, আগুন গাছের মধ্যে সঞ্চারিত হলো। আজও তাই কাঠে-কাঠে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে! এভাবে পাখি, গাছ ও আগুন এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে।

জলের সঙ্গে পাখির যোগের ফলে যেমন তাতে একটি যাদুধর্মিতার দিককে লক্ষ করা গিয়েছিল, আগুনের সম্পর্কেও তাই ঘটেছে। মহাভারতের নল রাজার উপাখ্যানের যে উত্তর-ভারতীয় লৌকিক ও মৌখিক রূপ পাওয়া গেছে (The black Partridge : North Indian notes and quaries, January 1893, p 171) তাতে এটি স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। শনির কোপে নলরাজা একে-একে স্ত্রী-পুত্র সবই হারালেন, খাদ্যও তাঁর জোটে না প্রতিদিন। একদিন কিছু তিতির পাখি ধরে তাই পুড়িয়ে তিনি যেই খেতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি শনির মহিমায় তারা বেঁচে উঠে

'শুভান তেরে কুদ্‌রত' অর্থাৎ 'তোমার মহিমা অসীম' এই বলে উড়ে চলে গেল। অগ্নিদগ্ধ পাখির এই প্রাণলাভ পৌরাণিক আর দু-পাঁচটা কাহিনীর মতো দেবতার কৃপা-কণার ফল বলে অবশ্যই বিবেচনা করা যেত ; কিন্তু যেহেতু আগুনের সঙ্গে জলের যোগ লক্ষ করেছি, এবং জলের সঙ্গে যাদুর, পাখি আছে দুটি ক্ষেত্রের সংযোজক সাধারণ উপকরণ রূপে, সেহেতু একে নিছক দৈবী করুণা বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় না। যেমন, পূর্বে উল্লিখিত পূর্ব ব্রাজিলের মানুষদের হামিং বার্ড সম্পর্কে একটি বিশ্বাস ঃ হামিং বার্ড একদা পৃথিবীর সব জল দখল করে নিয়েছিল ; তেমনি, উত্তর আমেরিকার মেউকদের বিশ্বাস, রবিন পাখি আগুন এনে নিজের বুকে এমন করেই রেখে দিয়েছিল যে পৃথিবীতে আলোটুকু মাত্র ছিল না। জল ও আগুন পাখির মাধ্যমে কি ভাবে এক হয়ে গেছে, এই দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে।

আগুন অন্ধকার দূর করে, অতএব আলোকের উৎস রূপে সূর্য-চন্দ্রের পরেই আগুনের স্থান। এই কারণেই আগুন সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এক দিকে যেমন, তেমনি বিপরীত পদার্থ জলের মতো, বিপরীত সত্তা অন্ধকারের সঙ্গেও মিশ্রিত হয়ে গেছে। বৈদিক ঋষিদের যজ্ঞ, অগ্নি সম্পর্কে নানা আচার ও সংস্কারকে অনেকেই সূর্য-উপাসনার একটি দিক বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। যেন আগুন জেলে সূর্যের তেজ ও দীপ্তি আরো বাড়িয়ে দেওয়া। পাশ্চাত্য নৃতাত্ত্বিকেরা অনেকেই এই যজ্ঞা-নুষ্ঠানকে একটি 'ম্যাজিক' বলতে চেয়েছেন তাই। সে যাই হোক, আগুনের সঙ্গে সূর্যের একটি সহজ যোগকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। ওপরে আমরা পাখির সঙ্গে আগুনের যোগ দেখে এসেছি ; পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়েই পাখির সঙ্গে সূর্যের যোগ দেখতে পাবো। অর্থাৎ পাখি মাঝখানে থেকে আগুন ও সূর্যের মধ্যে যোগসাধন করেছে। সূর্য ধ্বান্তারি, অন্ধকারের শত্রু, তিনিই রাত্রির অন্ধকার দূর করে প্রভাতকে সম্ভাবিত করেন ; এই জন্যে সূর্যের সঙ্গে অন্ধকারের আসঙ্গ আছে ; এবং সূর্যের সঙ্গে পাখি জড়িত বলে, পাখির সঙ্গেও অন্ধকার জড়িত হয়ে গেছে। হেলেনীয় পুরাণ অনুসারে ঈগলকে আলোক আনায়নকারী বলা হয়।

এর চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই আসামের বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের মধ্যে 'Thim-Zing' নামে এক মহা অন্ধকারের পরিকল্পনায়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো, "এক ব্যাপক অন্ধকারের সৃষ্টি।" আসামের লুসাই-কুকিদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে (The Lushai-Kuki clans : London, Macmillan and Co, 1912 ; p, 93 : J Shakespeare)। তাদের বিশ্বাস, 'Awk' নামে এক অতি-প্রাকৃত প্রাণী যখন সূর্যকে গ্রাস করে, তখনই হয় সূর্যগ্রহণ। একবার এই সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীতে প্রচণ্ড অন্ধকার ঘনিয়ে হলো 'Thim-Zing'। ওই ব্যাপক অন্ধকারের সময় মানুষ, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক জগতেও ঘটল ব্যাপক রূপান্তর। মানুষরা পশু-পাখিতে রূপান্তরিত হতে থাকল। লুসাই-কুকিদের মধ্যে যারা মণ্ডল-প্রধান-রাজা তারা হলো বিরাট ঠোঁটওলা ধনেশ পাখি এবং ফিঙে। পূর্বজন্মে তাদের ভাত নাড়বার কাঠিটিই ধনেশ পাখির ঠোঁটে রূপ নিয়েছে। থাডো (Thado)-দের বিশ্বাস, 'Thim-Zing'-এর পর সৃষ্টি অন্ধকারে বিলুপ্ত হলে একটি সাদা মুরগি সূর্যকে ডেকে আনে। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় উত্তর আমেরিকার মেউকদের রবিন

পাখি সম্পর্কে কাহিনী ঃ আগুন আনবার সময় রবিন তার বুকে আগুন রেখে সমস্ত পৃথিবীকেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল।

বাবুই পাখি জোনাকি ধরে কাদা-গোবরের পিণ্ডের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ঘর আলোকিত করে। এই আলো আগুনের নামান্তর এবং তা পাখির সঙ্গে আগুনের যোগকে দৃঢ়তর করে॥

১৫·

'সংমিশ্রিত প্রতীক' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পাখির সঙ্গে নানা ভাব, বস্তু ও প্রাণীর সংযুক্তি লক্ষ করলাম। এই সংমিশ্রণগুলো বহুশঃ খুব ব্যাপকতা ও পুষ্টি লাভ করে কোনো বিশিষ্ট অর্থ-ব্যঞ্জক সংকেত-প্রতীকে সর্বত্র পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি, অথবা একদা তা হয়ে উঠলেও আজ তা বিলুপ্ত। তবে পাখির সঙ্গে গাছ ও মাছকে এবং কিছু চতুষ্পদ প্রাণীকে 'প্রতীক' হয়ে উঠতে দেখা গেছে। যাই হোক, এ বিষয়ে গভীরতর গবেষণা না হলে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। আমরা কেবল এই সংমিশ্রণগুলো প্রদর্শন করেই তাই ক্ষান্ত রইলুম।

কিন্তু কেন এই বিচিত্র সংমিশ্রণ, তার সম্ভাব্য কারণাদি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। আমার মতে, সে কারণ আলোচনা করতে হবে লোকমানস ও লোক-মনস্তত্ত্বের পটভূমিকায়, তাদের বিচিত্র বিশ্বাস-পরায়ণ মনের আলোকে। আধুনিক যুগের অনেক গবেষকই লোকসাহিত্য ও লোকচারণা (Folk-lore)-র অনেক দিক ও উপকরণকে বিজ্ঞানের ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে চাইছেন। তাঁরা ভুলে যান, সভ্য সমাজ যে বিজ্ঞান ও যুক্তির ধার ধারে, লোকসমাজে তার মূল্য কানা-কড়িও নয়; অতএব সেই সমাজের আচার-বিশ্বাসকে বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অর্থহীন ও বিড়ম্বনা মাত্র। তা ছাড়া, সভ্য সমাজের যুক্তি ও বিজ্ঞানের নিরিখে লোকসমাজের রীতি-নীতিকে বিচার করলে তা হবে একপেশে কেননা, লোক-চারণা (Folk lore)-র দুটি দিক আছে : এর একদিক হলো, সভ্য সমাজের মানুষ, যাঁরা আলোচক, গবেষক, নিরীক্ষক; অপরদিক হলো, সেই লোকসমাজ, যারা বিচিত্র আচার-বিশ্বাস, রীতি-নীতির অনুসরণকারী। এই দু'দিক মিলিয়েই লোকচারণার পরিপূর্ণ দিক। বিজ্ঞান ও যুক্তির দিক থেকে দেখলে কেবল ওই প্রথম দিক থেকেই দেখা হয়।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, লোকসমাজে যুক্তির স্থান নেই। অবশ্যই আছে। তবে তার স্বরূপ আলাদা, তা তাদের মন, মনস্তত্ত্ব ও বিচিত্র বিশ্বাসের অনুসারী। এই জন্যেই প্রখ্যাত গবেষক Alexander Haggerty Krappe-লিখিত 'The science of folklore' (Methuen and co. ltd ; 36 Essex Street : Strand : W. G. 2, Reprinted 1962)-গ্রন্থের সব মতামতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি নি। যেমন, দুটি অঞ্চলে পশু-পাখি সম্পর্কে কোনো বিপরীত বিশ্বাসের উপস্থিতি দেখে

Krappe মনে করেন, ভুল বোঝাবুঝি এবং অন্য কোনো প্রখ্যাত কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সেটি ঘটে ; Migratory legend-এর কথাও তিনি বলেন। কিন্তু বিপরীত বিশ্বাসও যে এক ধরণের সমর্থনই, তাই যে লোকমনস্তত্ত্ব, Krappe তা স্থানে-স্থানে বিস্মৃত হয়েছেন ; Krappe তাঁর গ্রন্থের পাদটীকায় A.D. Gubernatis-এর 'Zoological Mythology' গ্রন্থখানিকে 'extremely uncritical' বলে কটাক্ষ করেছেন। Gubernatis প্রাচীনপন্থী গবেষক, কিন্তু তাঁর লোকমনস্তত্ত্বের বোধ, আমার মতে, বেশ গভীর। এক অঞ্চলের বিশ্বাস যে অপর অঞ্চলে নীত ও স্বীকৃত হয়, Krappe-এর মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পেছনে থাকে 'false analogy' এবং 'false logic' ; কিন্তু সেই 'false' ব্যাপারই যে লোক-সমাজের কাছে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে, সেটাই যে তাদের বিশেষত্ব, এবং সেই দিক থেকেই তা আলোচ্য, Krappe তা মনে করেন না ; এবং করেন না বলেই এইসব বিশ্বাসের যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি অন্বেষণে তিনি ব্যাপৃত হয়েছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন বলে মনে হয়।

লোক-মানসের এই বিচিত্র মনস্তত্ত্বের জন্যেই 'Cumulative folk-tale' এবং 'Magic conflict' এই Motif-এর মধ্যে যে আপাত-অসংগত ও অসংলগ্ন ব্যক্তি-বস্তু-প্রাণী ও ভাবের পর-পর সমাবেশ ঘটে থাকে,—ওপরের আলোচনায় তা দেখাতে চেয়েছি। ওই সব যুক্তিহীন পারম্পর্য ও অসংলগ্নতার হেতু নির্ণয় করতে হবে ওই সব ব্যক্তি-বস্তু-প্রাণী-ভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধে লোকমানসের এবং মনোভাবটির আলোকে। আমার মনে হয়, তবেই পাখি থেকে অন্যান্য প্রাণী-ভাব ও বস্তুতে যাওয়া বা পাখির সঙ্গে তাদের একত্র সমাবেশের কারণ খুঁজে মিলবে।

যেমন, একটি পাখি সম্পর্কে একটি অঞ্চলে যে বিশেষ একটি বিশ্বাস চলিত থাকে, পরবর্তীকালে সেই দেশেই, কিংবা সে দেশ থেকে নীত অন্য দেশে, সেই বিশেষ বিশ্বাসটি অন্য পাখিতেও সঞ্চারিত হয়ে যায়, এমন কি বিপরীত বিশ্বাসও। ময়ূর সম্পর্কে ভারতের মানুষ শুভ ধারণা পোষণ করে থাকে, ভারত থেকে গ্রীসে নীত হবার পরও সে ধারণা রোমে গিয়ে বলবৎ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ইউরোপের খৃষ্ট-সংস্কৃতিই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ধারণা খারাপ হয়ে যায়। যেহেতু ভারত থেকেই ময়ূর ইউরোপে গেছে, অতএব Krappe-এর অনুসরণে আমাদেরও কি বিশ্বাস করতে হবে, ময়ূর সম্পর্কে সেই খারাপ মনোভাবটিও ভারত থেকেই রপ্তানি করা হয়েছে ? এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসের মূল কারণ যে লোকমনস্তত্ব, নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণের উত্থান-পতন-সংমিশ্রণ, Krappe তা মানেন না।

পাখি থেকে যে অন্য বস্তু বা প্রাণীতে লোকমানস গতায়াত করেছে, তার পেছনে তেমনি আছে এক অত্যন্ত সহজ, স্থূল, বাস্তব যোগ ও যুক্তি ; আছে Homoeopathic, Imitative এবং Contageous Magic-এর জন্য উপকরণ-উপাদানের প্রভাব। সেই সংগে কিছু পরিমাণে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও ধারণা-শক্তির অভাবও আছে বই কি ; কিন্তু তাও তাদের নিজস্ব যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করা হয়। এমন কি, লোকসমাজের সেই রীতি সভ্যসমাজও গ্রহণ করে, কেননা, লোকসমাজকে ভিত্তি করেই সভ্যসমাজ গড়ে-বেড়ে উঠেছে।

"পাখি ও ভাষা" নামে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বিস্তৃত দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছি যে, পাখির নামচয়নে লোকমানস কতো বিচিত্র উপকরণকে গ্রহণ করেছে। তাতে দেখেছি, নানা রকম ফুল-ফল, গাছপালা; জল, রঙ, সময় (যেমন, রাত্রি); অন্যান্য প্রাণী; পাখির দৈহিক বিশেষত্ব থেকে তার ঐশ্বর্যবোধকতা; তার প্রকৃতি, ইত্যাদি কতো বিচিত্র দিক থেকে উপকরণ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিবেশ ও উপকরণগুলিই composite symbol-এর প্রাথমিক উপাদান। তাই নানা আচার-বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতীকতার অর্থ-গৌরব প্রাপ্ত হয়েছে কালক্রমে। সেই সঙ্গে আছে একই নামে একাধিক পাখির নামকরণ (দ্রঃ উক্ত অধ্যায়ের ১৯-সংখ্যক পরিচ্ছেদ)। পক্ষি-নামের অর্থগত পরিবর্তনও (দ্রঃ উক্ত অধ্যায়ের ২৫-সংখ্যক পরিচ্ছেদ) এ বিষয়ে মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়েরই ২৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি, কী করে পাখি থেকে অন্য প্রাণী, গাছ-ফুল, বিভিন্ন বস্তু-যন্ত্র, প্রভৃতির নামকরণ করা হয়েছে। ২৮-সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি, কী করে পাখির রূপ-গুণ-অভ্যাস-সংস্কার অনুযায়ী মানুষেরও দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নির্দেশিত হয়। এ সবের মধ্যেই পাখির সঙ্গে অন্য বস্তু ও প্রাণীর সংশ্রবটি পরিস্ফুট হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত এই বিষয়টিকেই এবার অন্যভাবে দেখা যাক। 'কোকনদ' শব্দের অর্থ হলো, যা কোক পাখিকে শব্দ করায়, অর্থাৎ রক্তোৎপল বা লালপদ্ম। এর থেকে পাখির সঙ্গে পাই: জল, ফুল, লালরঙ। 'কথাসরিৎসাগরে'র একটি কথায় দেখি, নায়িকা পাখিতে রূপান্তরিত হবার পূর্ববর্তী স্তরে একটি রক্তপদ্মে পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং ওই কথায় পাখি ও রক্তপদ্মের সংমিশ্রণ ঘটাতে যে মানস কাজ করেছে, সেই মানসই 'কোকনদ' শব্দের জন্ম দিয়েছে। 'কোকিলাক্ষ' গাছ হলো, কোকিলের চোখের মত লাল ফুল হয় যে গাছের, কুলেখাড়া গাছ। এ গাছেরই নামান্তর হলো 'শৃগালিকা'। অতএব, গাছ, কোকিল, শৃগাল ও লালরঙ একত্র মিশ্রিত হয়ে গেল এখানে, যার ফলে পাখি ও চতুষ্পদ প্রাণী অভিন্ন হয়ে যেতে পারে। নয়াফটকী লতাকে বলে 'পারাবতপদী', যার নামান্তর 'কাকজঙ্ঘা', কাক ও পারাবত-কে মিশ্রিত হবার সুযোগ দিল এটি। 'ময়ূর' বলতে পাখি বিশেষও বটে, আবার 'অপামার্গ' গাছও। 'হংসপদী' বৃক্ষের নামান্তর 'গোধাপদী', হাঁসের সঙ্গে গোধা-র যোগের পথ খুলে দিয়েছে এটি।

'কাকোদর' শব্দের অর্থ, অমরকোষের টীকা অনুসারে, কাকের মতো কুৎসিত উদর যার, অর্থাৎ সাপ। সাপ ও কাককে তাই একত্র সমাবিষ্ট হতে দেখা যায়। এবং এই যোগের ফলে দেখা যায়: মহাভারতের পরীক্ষিৎ তক্ষকের (তখন এটিকে সাপ বলে মনে করা হত) দংশনে মৃত হবার পূর্বে শুক পাখির মুখে হরিকথা শ্রবণ করে পূত হচ্ছেন। 'দ্বিজরাজ' বলতে পক্ষীন্দ্র গরুড় এবং সর্পরাজ অনন্ত—উভয়কেই বোঝায়। 'ধৃতরাষ্ট্র' শব্দের অর্থ হলো: সর্পবিশেষ, এবং কৃষ্ণবর্ণচঞ্চুচরণযুক্ত শ্বেতহংস বিশেষ। 'ধ্বজী' বলতে ফণাধর সর্প এবং শিখাবান্ ময়ূর—দুই-ই। 'হরি' শব্দের অর্থ একদিকে সাপ, অপর দিকে শুক, হংস, ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি পাখি।-'স'-বলতে ঈশ্বর, সাপ, পাখি, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ইত্যাদি বোঝায়।

ঋগ্বেদে হংস অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের বাহন (৪.৪৫.৪); সাদা রঙের ঘোড়া

বলতে পাই 'হাঁসা ঘোড়া'; 'হংস' বলতে বিষ্ণু, শিব, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, কামদেব প্রভৃতিকেও বোঝায়। হাঁস থেকে সহজেই চতুষ্পদ প্রাণী ও নানা দেবতায় চলে যাওয়া যায়। 'বিষ্ণুপুরাণে'র এক কাহিনী অনুসারে শতধনু রাজাকে বিভিন্ন জন্মে কুকুর, শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূর হয়ে জন্মাতে হয়। একজন মানুষের সঙ্গে এতোগুলো প্রাণী এখানে সংযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ও ঔষধাদিতে 'পঞ্চপিত্তে'র প্রয়োজন। 'পঞ্চপিত্ত'হলো, বরাহ, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত। এখানে ময়ূর থেকে অন্যান্য প্রাণীতে চলে যাওয়া খুবই সংগত। 'গন্ধর্ব' বলতে অনেকেই . হাহা, হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, গোমায়ু, তুম্বুরু নন্দি, প্রভৃতি। এ ছাড়া 'গন্ধর্ব' বলতে পুংস্কোকিল, ঘোটক, খেচর ইত্যাদি। এই একই শব্দের মধ্যে পাখি ও চতুষ্পদ প্রাণী ধরা পড়েছে।

সম্ভবত চতুষ্পদ প্রাণী অথবা তার গাত্রবর্ণ সম্পর্কে পাখির কৌতূহল বা আকর্ষণ লক্ষ করা গিয়েছিল। শৃগাল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণী হাঁস-মুরগী-ময়ূর খেয়ে থাকে। 'গো-বক' গোরুর পিঠের পোকা বেছে দেয়, ঠিক যেমন 'crocodile bird' ডাঙায় উঠে শুয়ে থাকা কুমীরের দাঁতের পোকা বেছে দেয়। ময়ূর নাকি চিতাবাঘ দেখতে, বিশেষত এর গায়ে কালো ও হলুদ রঙের সমাবেশ দেখতে খুবই ভালোবাসে ; চিতা বাঘ দেখলে সম্মোহিতের মতো স্থির হয়ে সে তাই দেখে। মধ্যভারতের আদিবাসীরা অনেকে চিতাবাঘের চামড়া পরে ময়ূরকে ওইভাবে সম্মোহিত করে শিকার করে। আসামের একটি খাসিয়া কথায় (How the peacock got his beautiful feathers : Folk tales of the Khasis, London : Macmillan and Co. 1920 ; PP. 10-17 ; Mrs. Rafy) পাই : আকাশের ময়ূরকে প্রেম-মোহিত করবার জন্যে ধরাতলে নারীর আকৃতিতে সর্ষের ক্ষেত তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। সর্ষের হলুদ ফুল এবং চিতাবাঘের হলুদ রঙ দুই এক হয়ে গিয়ে ময়ূরের সঙ্গে দুই অসংলগ্ন প্রাণী ও ফুলকে একত্র আবদ্ধ করেছে।

পৌরাণিক এক-একটি প্রাণীর সৃষ্টির পশ্চাতেও সংমিশ্রণকে লক্ষ করা যায়। স্টিথ টম্পসনের মোটিফ-সূচীতে এই সব সংমিশ্রিত প্রাণীর বহু উদাহরণ মিলবে। দু-একটা এই : Dragon as compound animal (B. 11. 2. 1.) : ড্রাগনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীকে (সাপ, কুমীর, মাছ) যেমন লক্ষ করা হয়েছে, তেমনি এর পাখা ও মাথা শ্যেন-বাজ-ঈগলের বলে কল্পিত। চীন দেশের কল্পনায় ড্রাগনের মধ্যে আছে, ষাঁড় বাঘ, ঈগল, হরিণ, উট, সাপ, মুরগী প্রভৃতি। ইজিপ্টের কল্পনায় এতে আছে— সিংহী, শ্যেন, মানুষ। টম্পসন B 11. 2. 1. 1 থেকে B. 11. 2. 1. 12 পর্যন্ত মোটিফগুলোতে ড্রাগনের সঙ্গে নানা প্রাণীর সংমিশ্রণ দেখিয়েছেন। সেই সব প্রাণীর মধ্যে পাখি একটি প্রধান দিক, ফলে পাখির সঙ্গে বিভিন্ন প্রাণীর সংযোগ পৌরাণিক দিক থেকেও লক্ষ করি।

আর একটি পৌরাণিক প্রাণী 'Basilisk' : A mythical lizard or serpent whose hissing drives away all other serpents (B. 12.)। এর জন্ম : 'Basilisk hatched from cock's egg. Usually a seven-year-old cock. Egg must lie in manure' (B. 12. 11.)।

আইরিশ পুরাণে পাওয়া যায় : Bird with head of gold and wings of silver (B. 15. 7. 3.) ; Bird with fiery beak (B. 15. 7. 13) ; Bird with tail of fire (B 15 7.) ; Giant bird pulls up oak tree by roots (B 31. 6. 2) ; Giant bird alighting on oak tree causes it to tremble (B 31. 6. 2. 1) ; Bird with golden head (B. 101. 1) ; Bird with wings of silver (B 101. 1. 1)।

অন্যান্য কয়েকটি পৌরাণিক প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাখি : Sphinx (B.51) : মুখ নারীর, দেহ ও ল্যাজ সিংহের, পাখা পাখির ; Harpy (B 52) : গ্রীক কল্পনায় এরা পাখি, কিন্তু বাহু ও স্তন স্ত্রীলোকের। Siren (B 53) : পাখি, কিন্তু মুণ্ডটি স্ত্রীলোকের। গরুড় (B 56) : উর্ধ্বাংশ পাখির, নিম্নাংশ মানুষের। Finngalkn (B 57) : আইসল্যাণ্ডের কল্পনায় পাখি, কিন্তু মুণ্ড মানুষের ॥

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

পাখি : সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টিপুরাণ

ভৌতিক পৃথিবীর সৃষ্টিতে মৌলিক উপাদান বলতে এই ক'টি : ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম : Fire, air, sky, water and earth : আব্, আতস্, খাক্ ও বাত। সদ্য-সমাপ্ত পঞ্চম অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়েছি যে, উপর্যুক্ত সব ক'টি মৌলিক উপাদানের সঙ্গে পাখির কী নিবিড় ও গভীর যোগ রয়েছে। এই সংযোগের ফলেই, ওইসব উপাদানের সমবায়ে গড়া ভৌতিক জগতের সৃষ্টিতেও পাখির ভূমিকা বিশ্বের তাবৎ দেশের পুরাকথা ও লোককথায় স্বীকৃত হয়েছে। পাখির সঙ্গে, অপরিহার্য ভাবে তাই, cosmology এবং cosmogony-র কথা উঠে পড়ে।

লোককথায় এবং লৌকিক পুরাকথায় পাখিকে হয় সরাসরি বিশ্বসৃষ্টিকর্তা নয়ত, সৃষ্টিকর্তা ভগবানের সক্রিয় সহযোগী রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে, শেষেরটাই বেশি। পাখির আকৃতিও এখানে লক্ষণীয় বিষয়। পাখি হয় তার অবিকৃত Zoomorphic রূপ নিয়ে উপস্থিত এখানে; নয়ত, Theriomorphic রূপ নিয়ে, অর্ধ-নরাকৃতি দেবতা হয়ে দেখা দেয়। যতো জটিলতা এই মিশ্রতার মধ্যে। কেবল পক্ষিরূপে বা কেবল Anthropomorphic রূপে জটিলতা তত নেই। যে রূপেই পাখিকে দেখা হোক না, মানতেই হবে, পাখি একটি গোষ্ঠীর 'Totem' রূপে স্বীকৃতি না পেলে, কিংবা কোনো গোষ্ঠীর দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাদের 'culture hero' হয়ে না উঠলে, অথবা, আরো পরিণত স্তরে 'Bird cult'-এর প্রবর্তন না হলে, পাখিকে বিশ্বসৃষ্টির কর্তা বলে স্বীকৃতি দেবার প্রবণতাই আসত না। কেননা, এক-একটি গোষ্ঠীর কাছে তাদের সৃষ্টিকথা তাদেরই সংস্কার-বিশ্বাস দিয়ে গড়া এবং অন্য গোষ্ঠীর সৃষ্টিকথার সঙ্গে তাদের মিল নেই।

সৃষ্টির তিনটি দিক : স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। তিনটি দিকের সৃষ্টির সঙ্গেই পাখি জড়িত। মানুষও পাখি-কর্তৃক সৃষ্ট বলে কথিত হয়েছে, ঠিক তেমনি বিপরীতভাবে মানুষ থেকে পাখি। পাখির সঙ্গে জড়িত সৃষ্টিকথাকে তাই এই ক'টি দিক থেকে আমরা আলোচনা করতে পারি :

১. স্বর্গ, আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, তারকা-নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টিতে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত পাখি;
২. মর্ত সৃষ্টিতে পাখি; মর্তের সঙ্গে যুক্ত নদী-পাহাড়-গাছ প্রভৃতি সৃষ্টিতে পাখি; স্থান-অঞ্চল-নদীর নামচয়নে পাখি;
৩. প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক জগৎ, ঋতু বিবর্তনে পাখি;
৪. নরক, পাতাল ও পাখি;
৫. পাখি থেকে মানুষের সৃষ্টি;
৬. মানুষ থেকে পাখির সৃষ্টি।

পাখির সঙ্গে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দিকের সম্পর্কটি, এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। মানুষ থেকে রূপান্তরিত (Transformed) হয়ে পাখি হওয়াই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্যতম আলোচ্য বিষয়, কাজেই সেখানেই তা করা হয়েছে।

কেন পাখিকে এই সৃষ্টিকর্তার গৌরব প্রদান করা হয়েছে? এর প্রথম কারণ, আগেই বলেছি, পাঞ্চভৌতিক জগতের সকল উপাদানের সঙ্গেই পাখির নিবিড় যোগ। দ্বিতীয় কারণ, এটাই প্রচলিত ব্যাখ্যা, যে জনগোষ্ঠী পাখিকে তাদের 'totem' বলে মানে বা পাখি তাদের 'Culture hero', অথবা Bird-cult-এর ধারক, তারাই পাখির মাহাত্ম্য স্থাপন করবার জন্যে, পাখিকে সৃষ্টিকর্তার গৌরব অর্পণ করে থাকে। তৃতীয় কারণ, পাখির মধ্যে এক অলৌকিক প্রতিভা ও শক্তিকে আদিম মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। দূরে আকাশে উঠে পাখি যেন এক অদৃশ্য ও রহস্যময় দৈবশক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে আসে, যেন সেই দৈবীশক্তির অংশ-বিশেষও প্রাপ্ত হয়। এরই ফলে পাখির মধ্যে সৃষ্টিশক্তির অস্তিত্ব কল্পিত হয়ে থাকে। চতুর্থ কারণটি সেই তুলনায় অনেক বাস্তব। পাখির শিল্পসৃষ্টির চাতুর্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে। বাবুই বা টুনটুনির নীড় নির্মাণের দক্ষতা আদিম মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। কে জানে, প্রথম ঝুড়ি তৈরির 'মডেল'টি মানুষ কোনো পাখির বাসা থেকেই পেয়েছিল কি না!

এই সব কারণেই পাখিকে পৃথিবীর প্রথম প্রাণিরূপেও কল্পনা করা হয়েছে। Aristophanes তাঁর 'Ornithes'-এ লিখেছেন, 'Lark' বা ভরত পাখিই হল পৃথিবীর প্রথম প্রাণী; এমন কি, Zeus, Kronos প্রভৃতি দেবতা এবং টাইটানদেরও পূর্ববর্তী। খ্রীষ্টানরা অবশ্য আর একটু কমিয়ে বলেন; তবে, দেব-সংযোগ তাঁরাও স্বীকার করেন। তাই যীশু ভরত পাখির পিতা বলে তাঁদের কাছে কল্পিত।

কিন্তু একদিনেই পাখিকে এই গৌরব দেওয়া হয় নি। প্রথমতঃ, সৃষ্টির এক একটি দিকের (যেমন মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, আগুন) সঙ্গে পাখি সংযুক্ত হয়েছে, তারপর তাকে বিশ্বসৃষ্টির অধিকারী করা হয়েছে। এই জন্যেই মনে হয়, সৃষ্টিকর্তারূপে পাখির পরিচয়, পাঞ্চভৌতিক জগতের এক-একটি দিকের সঙ্গে পাখির সম্পৃক্ততার পরবর্তী স্তরের। শুধুই পাঞ্চভৌতিক জগতের বিভিন্ন দিক নয়, মানুষের জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, তার ভূত-ভবিষ্যতের সঙ্গেও পাখি যুক্ত হবার পর তবেই যেন তাকে সৃষ্টিকর্তারূপে গণ্য করা হয়েছে।

সৃষ্টি-কথায় পাখি বলতে পাখির দুটি রূপ ব্যক্ত হয়েছে। একটিতে, সাধারণভাবে, নির্বিশেষ যে কোনো পাখি; অপরটিতে বিশেষ নামের সবিশেষ পাখি। আমার মনে হয়, সৃষ্টি-কথাতে যেখানে নির্বিশেষ পাখির কথা, সেখানেই তা প্রাচীন। কাহিনী যতই অর্বাচীন হয়েছে, পাখিও ততো সবিশেষ হয়েছে। সবিশেষ পাখির নামেও বিভ্রাট ঘটেছে। বিস্মৃতিবশত এক পাখির নামের পরিবর্তে অন্য পাখির নামোল্লেখ আশ্চর্যের কিছু নয়; কিংবা, প্রবলতর অপর এক গোষ্ঠীকর্তৃক আক্রান্ত

ও পরাভূত হবার ফলে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা পাখিকে পরিত্যাগ করে বিজয়িগোষ্ঠীর পাখিকে সৃষ্টিকর্তা রূপে প্রদর্শন করাও হতে পারে। অন্ততঃ দুটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ মনোভাব যে সৃষ্টি-কথায় ধরা পড়েই, তার চমৎকার উদাহরণ বাইবেলের মহাপ্লাবনের পর সৃষ্টি-কথাতেই আছে।

মহাপ্লাবনের পর ডাঙা উঠেছে কিনা দেখবার জন্যে তাঁর 'আর্ক্' থেকে নোয়া প্রথম প্রেরণ করেছিলেন দাঁড় কাককে। দাঁড় কাক ফিরে আসে নি বলে নোয়া তাকে অভিশাপ দিয়ে কৃষ্ণকায় করে দিয়েছেন বলে কথিত হয়। দাঁড় কাক ফিরে না আসবার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই: অনেক মৃতদেহ দেখে কাক লোভে পড়ে আপন কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছে। যে কাককে অনেক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, তার ফিরে না আসবার এই সহজবোধ্য স্থূল কারণ যথেষ্ট বলে অনেকেই মনে করবেন না। অন্য দিকে ঘুঘু জলপাই শাখা ঠোঁটে করে ফিরে এসেছে, সে তাই নোয়ার প্রীতি-ধন্য হয়ে শ্বেতকায় হয়েছে, এবং তার ফিরে আসবার সহজবোধ্য কারণ এই বলা হয়: অন্ততঃ তখন জলের মধ্যে গাছ জেগে উঠেছে।

কিন্তু দাঁড় কাক ও ঘুঘুর এই বিপরীতমুখী আচরণ অন্য কোনো গূঢ় সত্যের ইঙ্গিত দেয় বলে মনে করি। ওই দুই পাখি দুই বিবদমান ভিন্ন গোষ্ঠীর totem ছিল। দুটি গোষ্ঠীর কাছেই পাখি দুটি 'Rain bird' রূপে গণিত ছিল, তাই জলপ্লাবনের কাহিনীর সঙ্গে পাখি দুটি জড়িত হয়েছে। যে গোষ্ঠীর কাছে ঘুঘু ছিল totem, তারাই ছিল শক্তিশালী, তাই হীনবল গোষ্ঠীর totem কাককে এমন কলঙ্কে ডোবানো হয়েছে। সকলেই জানেন, বাইবেলের জলপ্লাবনের কাহিনী একটি মিশ্র ও অর্বাচীন কাহিনী। এ যে মিশ্র কাহিনী, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ ইরান-ব্যাবিলন থেকে এর নানা রূপান্তর ও কথান্তর প্রাপ্তিতে। মিশ্র কাহিনীতে কিভাবে দুই গোষ্ঠী মিশ্রিত হয়েছে, দুই পাখির আচরণেই তার প্রমাণ আছে।

ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটেছে আসামের 'দেউরি' উপজাতীয়দের একটি লোক কথায় (Folk lore of Assam, National book trust, New Delhi, January 1972: Jogesh Das, P. 26): আদিতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন, ভগবান থাকতেন স্বর্গে। সৃষ্টির বাসনায় তিনি ময়ূর ও 'টিম্‌টিমু' পাখিকে মর্তে প্রেরণ করলেন, স্থল দেখা দিয়েছে কিনা জানবার জন্যে। নানা সুন্দর-সুন্দর পাথর দেখে ময়ূর তার কর্তব্য বিস্মৃত হল, কিন্তু 'টিমটিম' পাখি স্বর্গে গিয়ে জানাল: স্থল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। ভগবান তখন মর্তে এসে সৃষ্টিকার্য সমাধা করলেন। ময়ূর অনুতপ্ত হয়ে বিধাতার কাছে ক্ষমা চাইল, এবং ময়ূরকে ক্ষমা তো করলেনই, উপরন্তু ময়ূরের পাখা দিয়েই যে বিধাতার শিরোভূষণ তৈরী হবে, তা বললেন। কর্তব্য পালন করেও 'টিম্‌টিমু' যে গৌরব পায় নি, অপরাধী ময়ূর তা পেয়েছে। বাইবেলের ঘুঘু এবং দেউরি-কথার ময়ূর এক। দুটিই বিশেষ গোষ্ঠীর প্রীতিধন্য। পাখির প্রস্তর মনস্কতার কথা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা

করেছি। সৃষ্টি-পুরাণে এই পাথর পাখির ডিমের বিকল্প হয়ে উঠেছে, একটু পরেই তা দেখাব।

সৃষ্টি-কার্যে পাখির সক্রিয়তার মধ্যেও দুটি ভাগ আছে। প্রথমত, পাখি নিজেই সচেতনভাবে, স্বতোপ্রণোদিত হয়ে, সৃষ্টিকার্যে সক্রিয় হলো; এ ব্যাপার, বলা বাহুল্য, বিশেষ চোখে পড়ে না; দ্বিতীয়ত, পাখি দেবতার সহযোগী রূপে বা তাঁর আজ্ঞাবহ দাস রূপে সৃষ্টিকার্য করতে পারে; এটাই বেশি দেখি। মনে হয়, প্রাথমিক স্তরে অবিকৃত পাখিরূপেই, স্বতোপ্রণোদিত হয়ে পাখি সৃষ্টিকার্য করেছিল বলে কল্পিত হয়েছিল; বিবর্তনের ফলে, অবশেষে, পাখিকে নরাকৃতি দেবতার সহযোগী সৃষ্টিকর্তা রূপে অধঃপতিত হতে হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী কথন ও শ্রবণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিকতার কড়াকড়ি আছে। বছরের কোনো নির্দিষ্ট দিনে বা বিশেষ কোনো ব্রত-পার্বণের উপলক্ষে অথবা জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোনো উৎসবে এসব কথা-কাহিনী বলা ও শোনা হয়। এতে এইসব কথার সঙ্গে ধর্ম ও আনুষ্ঠানিকতার একটি অনুষঙ্গ এসে পড়ে প্রথমত। দ্বিতীয়ত, সে কারণেই এগুলো বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে, সহজে বা সহসা তার পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটে না এবং একই কারণে তা সহজে বিলুপ্তও হয়ে যায় না। তৃতীয়ত, প্রত্যেক জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব কল্পনা ও বিশ্বাস দিয়ে যে সৃষ্টিকথা রচনা করে, তাকেই তারা সত্য ও প্রামাণ্য বলে মনে করে, অন্যদের সৃষ্টিকথা নয়।

যেমন, সাঁওতালদের মধ্যে সন্তান জন্মের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের 'কথা' বলা হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'চাচো ছেটিয়ের'। পান-ভোজনের পর 'বিন্তিকাথা' (অর্থাৎ 'ধর্মকথা') রূপে 'সৃষ্টিকথা' বলা হয়। কাহিনী কথনের শেষে গৃহস্থের পক্ষ থেকে সমবেত মানুষদের বলা হয়: "আপনাদের পাঁচজনের নিকট এই মিনতি করিতেছি যে আমরা কাকের মত ছিলাম, বকের মতো সাদা হইলাম, আপনারা পাঁচজনে সাক্ষী থাকুন।' (সাঁওতালী সংস্কার: প্রবাসী, পৌষ ১৩৩২: দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল)। আসামের মিকির উপজাতীয়দের শ্রাদ্ধের সময় মন্ত্র হিসেবে একটি লোকসঙ্গীতে সৃষ্টিকথা গীত হয়ে থাকে। গানটিতে বলা হয়, একটি পাখির একাধিক ডিম থেকেই মানবজাতির এক-একটি শাখা এবং মিকিরগণ উদ্ভূত হয়েছে। ওরাওঁদের সৃষ্টিকথা কথনকালে কেবল আনুষ্ঠানিকতাই লক্ষিত হয় না, কিছু আচারও পালন করা। শরৎচন্দ্র রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে (The Gods of the oraons: Man in India; September, 1922, Vol. II No. 3, PP. 137—157) ওরাওঁদের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান দেবতা 'ধর্মেশে'র পূজা ও সৃষ্টিকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

The only ceremony in which Dharmes alone is invoked and in which sacrifice is offered to him alone is the *Danda Katta* (tooth breaking) or *Bhelwaphari* (Bhelwa twig splitting) ceremony

referred to in the oraon legend of the genesis of the race. And it is only at this ceremony that the traditional oraon story of the genesis is ceremonially recited by the officiant. The sacrifice consists only of an egg which is inserted in the forked end of a split bhelwa (scmicarpus anaeardium) twig and is in the manner of imitative magic, broken with prayers to Dharmes…

পূর্ববঙ্গের কাউয়াপীরের ব্রতানুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন পাখির উদ্ভব বা সৃষ্টিকথা বর্ণিত হয় (The cult of the harvest deitives of Bengal : Indian Folklore : October-Decmber 1957 : PP. 11-20 : A. Bhattacarya)। 'কাউয়াপীর' শস্যোৎসবের দেবতা, পাখির উৎপাত থেকে শস্য রক্ষার জন্যেই তাঁর পুজো করা হয়। যে কোনো রবি বা বৃহস্পতিবার এই পুজো হয়। কোনো গাছের নীচে, কলাপাতার অগ্রভাগে এঁর উদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। পুজোর পর পাখিদের তা খেতে দেওয়া হয়। অতঃপর বিভিন্ন পাখির সৃষ্টি ও উৎপত্তি সম্পর্কে নানা 'কথা' কথিত হয়।

মানুষ, পাখি ও পৃথিবীর এই সৃষ্টিকথা বর্ণনার মধ্যে যে আনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালনের দিকটি আছে, আসলে তা একটি ঐন্দ্রজালিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সৃষ্টিকথা এখানে মন্ত্রবৎ। আর সকলেই টোটেম, মন্ত্র যাদুকর্মেরই নামান্তর মাত্র। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে যে সব সৃষ্টিকথা বর্ণিত হয়েছে, তাও আনুষ্ঠানিকতা ও ধর্মীয়বন্ধনের সূত্রে কাহিনীতে এসেছে॥

…২…

সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি বলা যায়—আদিম বা প্রাথমিক বা মৌলিক সৃষ্টি; অপরটিকে অপ্রাথমিক বা দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি বলা যেতে পারে। মৌখিক পুরাকথায় এবং লোককথায় মৌলিক বা প্রাথমিক সৃষ্টির কাহিনী বড়োই কম। বেশির ভাগই অপ্রাথমিক বা দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি-কাহিনী। 'দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি' বলতে এই বোঝানো হয়: একটি বিরাট বিপর্যয়ের ফলে আদিম বা প্রাথমিক পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, কেবল দুটি প্রাণী বা কিছু মানবেতর প্রাণী রক্ষা পেল, তারাই আবার নতুন করে সৃষ্টি আরম্ভ করল। যে মানুষ দুটি রক্ষা পেল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা একটি পারিবারিক বন্ধনে বাঁধা, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না (যেমন, ভাই-বোন; মাতা-পুত্র; পিতা-কন্যা, কদাচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়); পরিশেষে

তারাই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করতে থাকে। মানবেতর যে সব প্রাণী এই বিপর্যয়ে রক্ষা পায়, তার মধ্যে প্রধানতম হল—পাখি। বহু ক্ষেত্রেই তাই পাখিকে দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টিতে বিধাতার সহযোগী হতে দেখা যায়। এখানেই পাখির সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের যোগ লক্ষিত হয়।

দুই সৃষ্টির মধ্যে তাহলে একটি ধ্বংসের দিক আছে। কেন ধ্বংসের কথা কল্পিত হয়েছে? আদিম মানুষ 'সর্বপ্রাণবাদ' (Animism)-এ বিশ্বাসী হবার দরুন, জড় ও নিশ্চেতন পৃথিবীকেও একটি প্রাণময়ী সত্তা রূপে লক্ষ করেছিল; এবং যারই প্রাণ আছে, তারই মরণ আছে, এই সরল যুক্তিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে পৃথিবীর ধ্বংসের কল্পনা করেছে। হিন্দুপুরাণে স্পষ্টই চারটি যুগ (সত্য, কলি, দ্বাপর ও ত্রেতা) কল্পিত হয়েছে। এক-একটি যুগের শেষে মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, সৃষ্টি জলমগ্ন হবে, পদ্মনাভ বিষ্ণু তখন অনন্তনাগের আশ্রয়ে শায়িত থাকবেন, অতঃপর তাঁরই নাভিপদ্ম থেকে নতুনতর পৃথিবী সম্ভাবিত হবে। পারস্য সৃষ্টিতত্ত্বে পৃথিবীর স্থিতিকাল বারো হাজার বছর রূপে কল্পিত হয়েছে। এই বারো হাজার বছরকে আবার চারভাগে (তুলনীয়: হিন্দু চার যুগ) ভাগ করা হয়েছে, প্রতি ভাগে তিন হাজার বছর করে। এই যুগ বিভাগ এক ধরনের পূর্বনির্দিষ্ট, গাণিতিক, এবং কোনো বিশেষ কারণহীন; নির্দিষ্ট এক কালের শেষে পূর্বনির্ধারিত আর এক কালের আগমন মাত্র। এ অলঙ্ঘ্য, অপ্রতিরোধ্য।

কিন্তু কখনও কখনও অভিজাত পুরাকথায় এবং লৌকিক পুরাকথাতেও এই যুগ বিভাগ ও ধ্বংসের পেছনে কারণ প্রদর্শন করা হয়। তখন একটি যুগের স্থায়িত্বের কোনো পূর্বনির্দিষ্ট কালসীমা থাকে না, কেবল একটি বিশেষ ঘটনা ঘটায়, তারই প্রতিফল রূপে আদিসৃষ্টি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যেমন, বাইবেলে একটি বিশেষ অপরাধের ফলেই যেন সেখানে মহাপ্লাবন ঘটল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের যুগে যুগে সম্ভাবিত হবার পেছনেও যেন একটি কার্য-কারণ সূত্র পাওয়া যায়: সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্যে, দুষ্কৃতকারীকে বিনাশ করবার জন্যে, ধর্মের গ্লানি দূরীভূত করবার জন্যে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে, তিনি সম্ভাবিত হবেন। সুতরাং আদিসৃষ্টি এবং পরবর্তী সৃষ্টি—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যে ধ্বংসের কল্পনা করা হয়েছে, সেই ধ্বংসও দুই প্রকারের: একটি পূর্বনির্ধারিত ও অকারণ; অপরটি বিশেষ কোনো কারণে এবং অকস্মাৎ। প্রথম প্রকারের ধ্বংসের মধ্যেই আদিম মানস ধরা পড়েছে; দ্বিতীয় প্রকার ধ্বংসের মধ্যে উদ্দেশ্য ও নীতিবাদ স্পষ্ট হওয়ায় তার মধ্যে সচেতনতা এসে পড়েছে।

এই ধ্বংস কেবল মর্তলোক বা পৃথিবী সম্পর্কেই নয়, স্বর্গেও এই ধ্বংস বা তার পরোক্ষ দিক ঘটেছে। বহুদেশের পৌরাণিক কথাতেই স্বর্গে দেব-দানবের যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে, এবং সেই যুদ্ধে দেবতাদেরও অন্ততঃ একবার দানবদের হাতে পরাভব ঘটেছে। হিন্দু পুরাণে স্বর্গের এই যুদ্ধ ও দেবতাদের পরাভবের কথা সকলেরই জানা, তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। টিউটনিক পুরাণের কথা

বলি। টিউটনরা অর্থাৎ জার্মান ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয়গণ বিশ্বাস করত, এই পৃথিবী এবং দেবতারা একদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হবেই। দেবতারা সেখানে দানবের হাতে পরাভূত হয়েছেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পৌরাণিক গ্রন্থদ্বয় 'এডা' (The Eddas)তে এই অংশটির নাম 'Gotterdammerung' অর্থাৎ 'The twilight of the Gods'; আইসল্যাণ্ডের ভাষায় একে বলা হয়েছে, 'ragnarok' অর্থাৎ 'the fatal destiny, the end of the gods'. জগদ্বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতশিল্পী ভাগ্‌নার (Wagner)-এর অপেরার জন্যে এই "দেবতাদের গোধূলি" আজ বিশ্বব্যাপী পরিচয় লাভ করেছে। এই যুদ্ধে সকল দেবতাই দানবের হাতে নিহত হলেন, সকল মানুষ পৃথিবী থেকে বিতাড়িত হল, এমন কি পৃথিবীর আকৃতিই পরিবর্তিত হতে থাকল। দানব Surt সমস্ত পৃথিবীকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল; সব নদী ও সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল, পৃথিবী জলের তলায় চলে গেল। তারপর আবার সৃষ্টি হল, আবার পৃথিবীর উত্থান হল, আবার শস্য হল, নতুন একটি সূর্যও দেখা দিল। নতুন দেবতারাও এলেন। নতুন মানুষও সম্ভাবিত হল, কেননা এই বিরাট ধ্বংসেও সব মানুষ মরে যায় নি। Yggdrasil নামে অ্যাস (Ash) গাছে আবৃত হয়ে শিশিরবিন্দু পান করে তারা তখন বেঁচে ছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ ও দেবতা, স্বর্গ ও মর্তের পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাহিনী সারা পৃথিবীতেই আছে। এই কল্পনা কোনো বিশেষ এক দেশের কোনো বিশেষ এক জনগোষ্ঠীর নয়, তা নিখিল বিশ্বের। সুতরাং মধ্য ভারতের বিভিন্ন আদিবাসীদের সৃষ্টিকথায় এই ধ্বংসের দিকে লক্ষ করে ভেরিয়র এল্‌উইন্‌ যখন তাঁর 'Myths of middle India' (Oxford university press, 1949), বইতে মন্তব্য করেন, এ হল "Wide spread epic or puranic influnence' (P. 5), তখন তা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এলউইন বইগা, ভূঁইয়া, বীর-হোড়, চেরো, গোঁড়, মুণ্ডা এবং সাঁওতালদের সৃষ্টি-কাহিনীর উদ্বোধনী অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, তাতে 'Classical tone' কেমন বজায় আছে (P. 4-5)। প্রত্যেক কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশের সাদৃশ্য দেখেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এল্‌উইন্‌ ভেবে দেখেন নি, বিশ্বের আদিম মানুষের কথা-কাহিনীর বিষয়বস্তুতে এবং রচনাভঙ্গিতে মিল আছে; সৃষ্টি ধ্বংস হওয়া কেবল হিন্দু পুরাণেই নেই; জল-প্লাবনের ফলে সৃষ্টি ধ্বংস হবার কাহিনী ভারতের বাইরে প্রচুরই মেলে; এবং এই ভারতবর্ষেই, আসাম ও হিমালয়-সন্নিহিত আদিবাসীদের সৃষ্টি-কথায় ধ্বংসের কারণরূপে জলপ্লাবনের বদলে এক বিশ্বব্যাপী 'অন্ধকার'-এর কথা বলা হয়েছে।

মৌলিক সৃষ্টি ধ্বংস হয়েছে নানা ভাবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা মহাপ্লাবনের ফলে। এ ছাড়া পাই আগুনে পুড়ে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হল; এক বিশ্ববিলোপী 'অন্ধকার' এসে পৃথিবীকে গ্রাস করল; কখনো বা পৃথিবী উল্টে গেল। তারপর নতুন করে পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি হল। এই দ্বিতীয়স্তরের সৃষ্টিকালে কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আমার চোখে পড়েঃ

১. যে কোনো একটি বা একজোড়া নর বা নর-নারী বেঁচে থাকে। জোড়া

হলে তাদের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য নয়, ভারতীয় কাহিনীতেই এটি বেশি দেখা যায়। এরা ভাই-বোন, মাতা-পুত্র বা পিতা-কন্যা। তারা কোনো ঝুড়ি, লাউয়ের খোল অথবা অন্য কোনো পশু-প্রাণীর পেটে, কিংবা কোনো ঝর্ণার তলে বা পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় পায়।

২ যেখানেই যাক না এই সৃষ্টিতে গাছ থাকবেই। ভারতীয় কথাগুলিতে পদ্ম, লাক্ষা, করম, বট এবং সর্বাধিক পরিমাণে শিমুল গাছের নাম মেলে। এই গাছকে 'সৃষ্টিবৃক্ষ' (The cosmic tree) বা 'বিশ্ববৃক্ষে' (The earth tree)-র প্রতীক দিক বলে গ্রহণ করা যায়।

৩. নদী, ঝর্ণা, সমুদ্রের আসঙ্গ। আগুনে পুড়ে ধ্বংস হলেও জলের প্রসঙ্গ থাকেই।

৪. পাখির দৌত্য; সাধারণত যে সব পাখি sunbird, solarbird (যেমন কাক, ঈগল) কিংবা Rain bird (যেমন, ঘুঘু, কাঠঠোকরা) তারাই প্রেরিত হয় জলমগ্ন সৃষ্টির মধ্যে স্থলভাগ জেগে উঠেছে কিনা দেখবার জন্যে। কখনো একটি মাত্র পাখি প্রেরিত হয়, কখনো বা পর-পর, একাধিক। ওই সব ক্ষেত্রে পাখি ছাড়া অন্য প্রাণীও প্রেরিত হয়।

৫. সৃষ্টিকার্যে জলচারী প্রাণী (যেমন, মাছ, কচ্ছপ, কাঁকড়া, কেঁচো), বিবরচারী প্রাণী (ইঁদুর, সাপ) এবং জলচারী পাখি (হাঁস, পানকৌড়ি) প্রভৃতির সক্রিয় সহায়তা। জলচারী পাখির বদলে যেখানে সৌর-পাখিকে দেখা যাবে, সেখানে কাহিনীকে মিশ্র এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলতে হবে, কেননা জলমগ্নতার পর জলচারী পাখিই জলের তল থেকে মাটি আনতে পারে। এইখানে জলচারী ও সৌর পাখি অন্যান্য প্রাণী (জলচারী ও বিবরচারী) দের মিলে-মিশে Composite symbol-এর সৃষ্টি করেছে।

৬. সৃষ্টির জলমগ্নতার দরুণ মাটি দুষ্প্রাপ্য হওয়া; মাটি আনতে হয় পাতালে যেতে হয়, নয় স্বর্গে। স্বর্গ বা পাহাড় বা উচ্চলোক থেকে মাটি এনেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিল-ঈগল-বাজ-শকুন প্রভৃতি শক্তিশালী, তীক্ষ্ম নখসম্পন্ন, দূরগামী পাখি। এরা solar bird, সূর্য-সম্পৃক্ততায় উর্ধ্বলোকচারী। কাক মূলত solar bird হলেও সে Thunderbirdও বটে, এই জন্যে জলভেদ করে পাতালে যেতেও তাকে দেখা যায়। একই সঙ্গে solar ও thunder bird হবার দরুন কাক সারা পৃথিবীর সৃষ্টিকথাতে সবচেয়ে বেশি ও বড়ো ভূমিকা নিয়েছে।

৭. জলের তলা থেকে মাটি আনবার সময় প্রতিরোধ ও যুদ্ধ।

৮. কাদামাটি দিয়ে পাখি বা মনুষ্য-মূর্তি নির্মাণ করে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। এই কাদা-মাটি জলের সঙ্গে যুক্ত।

অনেক সৃষ্টিকথাতেই দেখা যায়, যে পাখিটি সৃষ্টিকার্যে অংশ নেয়, সে বাস্তব ও স্বাভাবিক পাখি নয়; তার উদ্ভব বা জন্ম বিচিত্র, অস্বাভাবিক ও যাদুময়। সৃষ্টিকর্তা বিধাতার গাত্রমল, ঘাম, থুথু, এমন কি, তাঁর প্রস্রাব ও রেতঃ থেকেও সহসৃষ্টিকারী পাখির জন্ম হচ্ছে; কখনো তাঁর দেহের বিশেষ দিক থেকে (যেমন

তাঁর বাম কুক্ষি থেকে) সে পাখির জন্ম হচ্ছে। আগেই বলেছি, সৃষ্টিকথা মন্ত্রবৎ ইন্দ্রজালময়, এর প্রতিটি স্তরেই 'ম্যাজিক' প্রধান ভূমিকা নিয়েছে।

যেমন, আমেরিকার কোনো বিশেষ উপজাতীয়দের (The Hopi or Moqui American Indians) সৃষ্টি-পত্তনের কাহিনীতে দেখা যায়, দু'জন দেবী মিলে প্রথম প্রাণী হিসেবে কাদা-মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন একটি wren (এক প্রকার ক্ষুদ্র গায়ক পাখি) ; তারপর মন্ত্র পড়ে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে উড়িয়ে দিয়েছেন অপরাপর জীব-জন্তুর খোঁজে। কখনো বা পাখিই পাখি সৃষ্টি করে। যেমন, উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদের সৃষ্টিকথায় ; ঈগল ও কাক মিলে একটি হাঁস সৃষ্টি করল তাদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনবার জন্যে, সৃষ্টি তখন জলমগ্ন। তারা সেই জলের গভীরে হাঁসটিকে ছেড়ে দিল, জল-তল থেকে কিছু কাদা-মাটি সংগ্রহ করে আনবার জন্য।

সহজেই বোঝা যায়, কাহিনীটিতে মিশ্রণ ঘটেছে। দেখেছি, পাখি যেখানে নিজে জলচারী হয়েও সৃষ্টিকারী হয়, সেখানে সে সহায়করূপে একটি জলচারী বা জলসম্পৃক্ত প্রাণীকে বেছে নেয়। আলোচ্য কাহিনীটিতে ঈগল-কাকের সহায়ক হয়েছে জলচারী হাঁস। অনুমান করা যেতে পারে, কাহিনীটির আদিস্তরে হয়তো হাঁসই ছিল স্বয়ং সৃষ্টিকারী, নানান ধরণের পরিবর্তনের ফলে সে অধঃপতিত হয়ে সহ-সৃষ্টিকারীতে অবনমিত হয়েছে। কাক, ঈগল ও হাঁসের মিশ্রণ ও একীকরণও পরবর্তী স্তরকে, অন্তত একাধিক স্তরকে, নির্দেশ করে। গ্রীক পুরাণের কাহিনী অনুসারে অ্যাপোলো কাককেই জল আনতে বলেছিলেন। অ্যাপোলোর এই কাক কখনো বা ঈগলে পরিণত হয়েছে। অ্যাপোলো সূর্য-দেবতা। সূর্যের মাধ্যমেই তাহলে কাক ও ঈগলের একীভবন ঘটেছে। ঈগল কাক উভয়েই solar bird বটে, তবে কাক বেশি পরিমাণে thunder bird। কিন্তু, চীন, জাপান, উত্তর-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় কাক বা দাঁড়কাক Solar bird। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে সূর্যের প্রাখর্য ও তীব্রতা বেশি, সেখানে ঈগলের প্রভাব বেশি। আর যেসব অঞ্চল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, সেখানে কাকের প্রভাব অধিক। কিন্তু যেখানে কাক ঈগল একই ভাবনার ইঙ্গিতবাহী হয়ে একীভূত হয়ে যায়, সেখানে? আর, সঙ্গে থাকে হাঁস? সেখানে বৃষ্টি ও রোদ সূর্যের এই দুই মূর্তি এক সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে একটি সংমিশ্রিত সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। সূর্যের অয়নকে ভিত্তি করে পৃথিবীর সব দেশে প্রাচীন কাল থেকে নানা আচার-সংস্কার-বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে হাঁস সম্পর্কে। রাঢ়ের অধিকাংশ গ্রাম দেবতা ও গ্রাম দেবীরই বার্ষিক পূজার কাল পৌষের সংক্রান্তি (মকর সংক্রান্তি) থেকে মাঘ মাসের মধ্যে, কারণ ওই সময়েই সূর্যের দাক্ষিণায়ন হয় ; এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেবদেবীর উদ্দেশে হাঁস (সঙ্গে পায়রা ও মুরগীও থাকে) উৎসর্গ করা হয়। আমার মনে হয়, যে জনগোষ্ঠী সূর্য-সংস্কৃতির ধারক, তারাই তিনটি পাখিকে মিশ্রিত করে নিয়েছিল এবং এই মিশ্রণই স্বয়ং প্রমাণিত করে—কালের দিক থেকে তা আধুনিক। এই রকম, কাক ও ময়ূরের মিশ্রণ মুসলমান সৃষ্টিকথায় মেলে।

ডিম থেকে যেমন রূপসাদৃশ্যে পাথর, পর্বত-গুহা ও নারিকেল সৃষ্টির উৎসরূপে গৃহীত হয়েছে, জল থেকে তেমনি রক্ত এবং অশ্রু। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়েছি, তরলতার সাদৃশ্যে জল কেমন করে রক্ত ও অশ্রুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। মুসলমান সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লার অশ্রু থেকেই পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে, এবং ময়ূর সেখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। পণ্ডিত রামগরীব চৌবে জানাচ্ছেন (Foiklore of the peocock : North Indian Notes and Queries, Fubruary, 1895, P. 197) : আল্লা সর্বপ্রথমে একটি সহস্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ সৃষ্টি করলেন, এবং পয়গম্বরকে ময়ূরের বেশে সেই বৃক্ষে স্থাপনা করলেন। সেই ময়ূরের মধ্যেই তিনি আপনার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখে আনন্দে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করলেন, এবং সেই অশ্রু থেকেই পৃথিবী সৃষ্ট হল। মোটিফটি স্টিথ টম্পসনও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে লক্ষণীয় বিষয়, প্রথমত, জল ও অশ্রুর অভিন্নতা ; দ্বিতীয়ত, ময়ূর সম্পর্কে ভারতীয় সংস্কার : পুরুষ ময়ূরের অশ্রু পান করেই ময়ূরী গর্ভবতী হয়। তৃতীয়ত, কাক যেমন জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ময়ূর তেমনি বর্ষার, ফলে কাক ও ময়ূর এখানে অভিন্ন। কাকের সঙ্গে নীলকণ্ঠকেও মিশ্রিত হতে দেখা যায় আমেরিকার কোনো কোনো উপজাতীয়দের সৃষ্টি-কাহিনীতে। উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবাসী অনেক উপজাতীয়রা দাঁড়কাককে যে সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে, দক্ষিণ-উপকূলের লোকেরা সেই ক্ষমতা নীলকণ্ঠের ওপর আরোপ করে।

ভারতীয় পুরাণ অনুসারে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাহন হলো হাঁস, এবং এই হাঁস স্বতই সৃষ্টিকালের পূর্ববর্তী স্তরের 'জল'-কেই নির্দেশ করে। এসব ক্ষেত্রে হাঁস 'Cosmic gander' হয়ে উঠেছে। এই হাঁস বাস্তব, স্বাভাবিক ও প্রাকৃত। কিন্তু Finno-Ugric পুরাণ-কাহিনীতে দেখা যায়, মহপ্লাবনের কালে নায়ক হংসীর রূপ ধারণ করে ভ্রমণ করছে ; এই হাঁস অস্বাভাবিক, অপ্রাকৃত ও অবাস্তব, সে মানুষেরই transformed রূপ। যে করেই দেখা যাক না, সৃষ্টিকারী পাখির মধ্যে এক ধরণের 'Mana' স্বীকৃত হয়েছে এবং সে কারণেই প্রায়শ ও পাখিরা অস্বাভাবিকতা ও ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা প্রভাবিত ॥

পাখিকে সৃষ্টিকারী রূপে লক্ষ করবার আগে তার ধ্বংসক্ষম মূর্তিটা লক্ষ করে নেয়া যেতে পারে। যে শক্তিতে পাখি ভাঙে, সে শক্তিতেই সে গড়ে। ভাঙা-গড়া একই শক্তির দুই প্রকাশ মাত্র। পদাবলীর শ্রীরাধা বলেছিলেন : গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল/ভাঙিয়া গড়িতে পারে, সে বড়ো বিরল। পাখি 'ভাঙিয়া গড়িতে পারে,' অতএব শক্তিমত্তায় ও সৃষ্টি-ক্ষমতায় সে 'বিরল'।

এই জন্যেই পাখিকে দৈত্যে ও রাক্ষস রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কখনো বা সে মানুষের প্রতি অতি হিংস্র আচরণে মেতে ওঠে। যে পাখিই পৃথিবীতে প্রথম জল এনেছে (উদাহরণ পরে দিয়েছি) সেই পাখিই আবার পৃথিবীর সব জল এক সময়ে আকর্ষণ করে নেয় বলে কল্পিত হয়েছে। পূর্ব ব্রাজিলে বিশ্বাস আছে, হামিংবার্ড একবার পৃথিবীর সব জল আপন দেহে ধারণ করে নিয়েছিল, মানুষের ব্যবহার্য এক ফোঁটা জলও ছিল না।

ব্রাজিলের Tupinamba-দের এক প্রধান বজ্র দানবের নাম হল 'Tupan'; Tupan-এর বাসগৃহ ছিল পশ্চিম দিকে, কিন্তু তাঁর মা Nandecy থাকতেন পূর্ব দিকে। Tupan যতো বারই তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে পূর্বদিকে যেতেন ততবারই ঝড় উঠত। যে ডিঙি নৌকোতে Tupan পাড়ি দিতেন, তা চালনা করত তাঁরই দুটি অনুচর পাখি। এই পাখি দুটিকেই ব্রাজিলের ইণ্ডিয়ানরা ঝড়ের সূচনা-কারী বলে বিশ্বাস করে। যতক্ষণ না পুত্র মাতার কাছে নিরাপদে পৌঁছান, ততক্ষণ এই বিধ্বংসী ঝড় চলতে থাকে।

এস্কিমোদের পুরাকথায় আছে : ওদের সমুদ্রদেবীর নাম Sedna, তিনি Angusta-র কন্যা ছিলেন। Sedna-কে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় Kokksant; সে আসলে একটি সামুদ্রিক পাখি, মহাশঙ্খচিল। Angusta যখন Sedna কে উদ্ধার করে গৃহে ফিরছেন তখন Kokksant পক্ষিরূপ ধারণ করে সমুদ্রে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করল, সেই ঝড়ে ভীত হয়ে পিতা তাঁর কন্যাকে জলে ফেলে দিলেন।

কুইন্সল্যাণ্ডের একটি কাহিনীতে : একদা একটি কুরর বা মেছোঈগল জলের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে রাখল, যাতে তা খেয়ে মাছেরা মরে গেলে সে সহজেই খেয়ে নিতে পারে। কুররের অনুপস্থিতিতে একটি কুকো বা মাহোকা (Pheasant) এসে তার বর্শা দিয়ে সেই মাছ শিকার করে নিল। কুরর এসে কুকোর বর্শাটি একটি গাছের মগডালে লুকিয়ে রাখল। কুকো তখন এক প্রচণ্ড বন্যার সৃষ্টি করলে, সেই প্রচণ্ড বন্যায় ভেসে গিয়ে কুরর আজও সমুদ্রচারী হয়ে আছে।

জার্মানী ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণে দৈত্যকে ঈগল রূপ ধারণ করতে দেখা যায়। একদিন Loki, Odin এবং Hœnir এই তিন দেবতা মর্তে ভ্রমণ কালে ক্ষুধার্ত হয়ে একটি ষাঁড় পুড়িয়ে খাবেন বলে মনস্থ করলেন; একটি ঈগল গাছের ডালে বসে এমন এক মন্ত্রোচ্চারণ করলে যে, আগুনে ষাঁড়টি দগ্ধ হল না। ঈগলের ক্ষমতার কাছে দেবতারা অসহায় হয়ে রইলেন, এবং দেবতাদের সঙ্গে একত্র আহারের শর্তে ঈগল তার মন্ত্র প্রত্যাহার করে নিলে। এই ঈগলটি ছিল 'Thjazi' নামে একটি দৈত্য

এই দৈত্যরূপী পাখি মানব বা মানব শিশু দিনের পর দিন ভক্ষণ করে যাচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবী থেকেই মেলে। আমি ভারত থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথমটি একটি সাঁওতালী 'কথা' : পাহাড়ের ওপর থাকত এক চিল-দম্পতি। নিজেদের শাবকদের খাওয়াবার জন্যে প্রতিদিন নিকটবর্তী গ্রাম থেকে তারা মানুষের শিশু শিকার

করে নিয়ে আসত। কিন্তু কেউ তাদের মারতে পারত না। অবশেষে দুই সাহসী ভাই —'কারা' ও 'গুজা' তাদের নাম, তারাই একদিন তীর দিয়ে পাখি দুটিকে হত্যা করে ফেলল। তীরবিদ্ধ হয়ে চিল দুটি যেখানে পড়ল, সেখানে একটি গভীর খাদের সৃষ্টি হল। এই ধরণের কথার প্রায় সর্বত্রই পাখি-দৈত্যের মৃত্যু ঘটে এবং তাদের মৃত্যুও স্বাভাবিক-সরল ভাবে ঘটে না, মৃত্যুর পর বিশেষ কোনো প্রমাণ চিহ্ন থেকে যায়, এবং হত্যাকারীরা (একজন বা একজোড়া, দুই ভাই, দুইবন্ধু) শেষে 'Culture hero' হয়ে যায়।

অপর দুটি দৃষ্টান্ত আসাম থেকে নিচ্ছি। আসামের Khampti উপজাতীয়দের একটি কাহিনী এই: প্রাচীনকালে এক, অতিকায় পাখি প্রত্যহ মানবশিশু ছোঁ মেরে নিয়ে Nam yun উপত্যকার এক উঁচু পাহাড়ে (পাহাড়টির নাম 'Noi kham' অর্থাৎ 'সোনার পাহাড়') চলে যেত। এই পাহাড়ে ছিল প্রকাণ্ড একটি গাছ, গাছটির ডালপালা সোনা-রুপোর, তার উচ্চতম শাখায় বসে ধরে-আনা শিকার খেত। গাছটি Khampti দের কাছে পবিত্র বলে স্বীকৃত হত। অন্য কোনো গাছ সেই বিরাট পাখিটির দেহের ভার সইতে পারত না। অবশেষে সেই পবিত্র গাছটি কেটে ফেলতেই পাখিটির আশ্রয় নেবার স্থান রইল না; সদা নদীর ধারে একটি পাহাড়ে পাখিটিকে চারজন (দুই জোড়া) তীরবিদ্ধ করেছিল। গাছটি ফেলায় সেখানে একটি দীঘির সৃষ্টি হল, তাতে অনেক জলজ গুল্ম জন্মাল। প্রতি বৎসর শীতকালে পরস্পর ঘর্ষণের ফলে এতে আগুন ধরে যায়। মোটিফ হিসেবে এতে পাই: পাখি, গাছ, নদী, জল, আগুন ও সোনারুপো।

কামেং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের Sherdukpen-দের একটি কথায়: Jachung নামে দুটি পাখি (এরা দম্পতি) প্রত্যহ মানুষ নিয়ে যেত। Lopong-chungba পাখি দুটিকে জব্দ করবার নানা কৌশল প্রয়োগ করলেন। অবশেষে তাঁর দুটি ভাইকে বললেন পাখি দুটির সঙ্গে নাচতে। পাখি দুটি যখন নাচে বিভোর, তখন Lopong-chungba বৃদ্ধারমণীর ছদ্মবেশে, ফাঁদ পেতে পাখি দুটিকে ধরে ফেললেন; তারপর তাঁর দুটি ভাইকে সেই পাখির মাংস খেতে দিলেন। তারপর তাঁর দু ভাইয়ের বিষ্ঠা থেকে কোনো শয়তান যাতে না জন্মায়, সে জন্যে কুকুরকে তা খেতে দিলেন এবং কুকুরের বিষ্ঠা মুরগীকে খেতে দিলেন। এই জন্যে কুকুর ও মুরগী আজও বিষ্ঠা খায়। দৈত্যবৎ নরমাংসভোজী পাখি এখানে শেষ পর্যন্ত 'শয়তানে' রূপ নিয়েছে।

এরই ফলে এর একটি গঠনাত্মক দিকও ধরা পড়ে। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পুরাণে এক জায়গায় বলা আছে: দৈত্যরূপী এক নেকড়ে, নাম তার Fenrir, সে দেবতাদের বিশেষ শত্রু। বহু কষ্টে Fenrir-কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, কারণ, যে কোনো শেকলই সে ছিঁড়ে ফেলে। তখন যে শেকল দিয়ে তাকে বাধা হল তা ছ'টি উপাদানে তৈরি, তার মধ্যে একটি উপাদান হল, পাখির থুথু বা লালা।

দৈত্যরূপ ধারণ ছাড়াও, অন্য রূপেও পাখি ধ্বংস-সাধনে সক্ষম। এর উদাহরণ মেলে মার্কণ্ডের পুরাণ থেকে: রাজা হরিশ্চন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ। হরিশ্চন্দ্রের

জীবনে নানা বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিলেন বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ তাই বিশ্বামিত্রকে অভিশাপ দিয়ে একটি বকে পরিণত করে দিলেন। বিশ্বামিত্রও প্রতিশোধ নেবার জন্যে বশিষ্ঠকে আর একটি পাখিতে পরিণত করেন। পক্ষিবেশে এই দুই ঋষি এমন ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন যে, পৃথিবী কম্পিত হয়ে ওঠে। অবশেষে ব্রহ্মা এসে এই কলহ মেটান। এখানে লক্ষ করতে হবে, যুযুধান পাখি দুটি সহজ, স্বাভাবিক পাখি নয়, transformed।

তাহলে পাখির এই ঝড়-বন্যা সৃষ্টির ক্ষমতা, দৈত্যরূপে ধ্বংসের ক্ষমতা বা যুদ্ধ করে পৃথিবী কাঁপিয়ে তোলবার ক্ষমতা—এ সবই পাখির এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও শক্তিমত্তাকে নির্দেশ করে। পাখির এই ক্ষমতাই তার সৃষ্টি-ক্ষমতারূপে প্রদর্শিত হয়েছে সৃষ্টি-পুরাণের কাহিনীতে। এই দুই ক্ষমতায় কোনো বিরোধ নেই, বরং এক ধরণের সামঞ্জস্যই চোখে পড়ে; এই সামঞ্জস্য অন্বেষণের মধ্যেই লোকমনস্তত্ত্বের সারসত্য নিহিত আছে॥

এতক্ষণ ভূমিকা করা যাচ্ছিল, এইবার সৃষ্টি-ক্ষেত্রে পাখির কর্মকাণ্ডের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। প্রথমে মৌলিক বা আদি স্তরের সৃষ্টিতে পাখির ভূমিকা কি ও কেমন, সে কথা বলি।

মৌলিক বা আদি স্তরের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আরো ক'টি কথা বলে নিই। দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টির পূর্বে জলমগ্নতাই যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বংসের কারণ হয়েছে, মৌলিক সৃষ্টির পূর্বেও তেমনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখা যায়। দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টির একটিই মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে,—যেহেতু একদা সৃষ্টি ছিল, অতএব আবার তা সৃষ্টি করা, এ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য সেখানে নেই। কিন্তু প্রাথমিক সৃষ্টির পেছনে একাধিক উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল হতে পারে। সৃষ্টিকর্তা কেন সৃষ্টি করবেন? 'এক' 'বহু' হবেন; তিনি নিঃসঙ্গ জীবনে বৈচিত্র্য আনবেন; তিনি আগে পৃথিবী সৃষ্টি করবেন, না, আগে মানুষ সৃষ্টি করবেন; পৃথিবীই যদি আগে সৃষ্টি করেন, তবে আগে গাছপালা ও অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করে শেষে মানুষ সৃষ্টি করবেন, নাকি, আগেই মানুষ সৃষ্টি করে পরে গাছ-পালা ও মানবেতর প্রাণী সৃষ্টি করবেন—ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্য সৃষ্টির পথে থাকতে পারে। বাধা-বিপত্তি ও প্রতিরোধ দুই স্তরের সৃষ্টি-কালেই দেখা যায়। দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টির প্রধান বাধা হল—মাটির দুষ্প্রাপ্যতা। যে মাটি দিয়ে মৌলিক স্তরের সৃষ্টি গড়া ছিল, সেই মাটি হয় কেউ লুকিয়ে রেখেছে, নয় চুরি করেছে, নয়ত গিলে খেয়ে পাতালে চলে গেছে, কিংবা সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গেছে; যে করেই দেখা যাক

না, মাটি বড়োই দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। মাটির সন্ধান পেলেও মাটি সহজে ও সহসা আনা যাচ্ছে না, হয় যুদ্ধ করে আনতে হচ্ছে, নয় জলই সে মাটিকে ধুয়ে নিচ্ছে। মৌলিক স্তরের সৃষ্টিকালেও এমন বাধা দেখা যায়, তবে পরিমাণে কম। এই স্তরের সৃষ্টিতে প্রধান বাধা এসেছে সূর্য এবং 'পক্ষীরাজ' ঘোড়ার কাছ থেকে, দুটিই এক, কারণ, সূর্যের রথ অশ্বই টানে। 'পক্ষীরাজ' শব্দের দুটি অর্থ : এক, পাখাওলা ঘোড়া ; দুই, পাখিদের রাজা। মধ্যভারতের আদিবাসী বীরহোড় ও মুন্ডাদের সৃষ্টি-কথায় দেখা যায়, সিংবোঙ্গা কাদা-মাটি দিয়ে প্রথম যে মনুষ্য-মূর্তি নির্মাণ করে রোদে শুকোতে দিয়েছেন, 'পক্ষীরাজ' তা ভেঙে দিয়েছে। সাঁওতালদের একটি সৃষ্টিকথাতে দেখি, 'মলিন বুড়ী' ঠাকুরজীউয়ের নির্দেশানুসারে মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ গড়ে রোদে শুকুতে দিলে "সিং-সাদোম" (অর্থাৎ "দিবাঅশ্ব", সূর্য) তা মাড়িয়ে দিয়ে যায়। এই একই কাহিনীতে আছে, ঠাকুরজীউয়ের প্রথম সৃষ্টি হাঁস-হাঁসিনের প্রথম ডিম "রাঘপ বুয়ার" এসে খেয়ে যায়। মধ্যভারতের আর একটি উপজাতি,—আগারিয়া (করেলি, মান্দলা জেলা), তাদের সৃষ্টি-কথাতে আছে, ভগবান জলের ওপর পদ্মপাতা বিছিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সূর্য তা শুকিয়ে ফেলল। এই প্রতিবোধের মুখে পাখি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে, কি প্রাথমিক স্তরের সৃষ্টিতে, কি দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টিতে।

'ধর্মমঙ্গলে' ও 'শূন্যপুরাণে' মৌলিক সৃষ্টির ভালো উদাহরণ পাওয়া যায়। কবি রূপরামের কাব্যে (রূপরামের ধর্মমঙ্গল : প্রথম খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৫১ : ডঃ সুকুমার সেন এবং পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত) সৃষ্টি কথা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

মনে ভাবি নিরঞ্জন কিসে হবে ত্রিভুবন
নিঃশ্বাস ছাড়িল চক্রপানি।
তাহে জন্ম একপক্ষ সেইজন মহাদক্ষ
নাম তার উলুক মহামুনি ॥ ···

নিরঞ্জনের নাসাপথে উলুকের জন্ম হলে তিনি "কৌতুকে বসিলা পক্ষরাজের উপর।" এভাবে কতকাল চলে গেল, তখন 'শ্রমযুক্ত' উলুক ঠাকুরের কাছে নিবেদন করল,

কোনখানে বসিব এমন নাহি স্থল।
তৃষ্ণায় আকুল তবু কোথা পাব জল ॥
উলুকের বচন শুনিঞা নিরঞ্জন।
মুখ হৈতে অমৃত ফেলিল ততক্ষণ ॥
সেই হৈতে হইলেন জলের সঞ্চার।
জল বিনে জীবজন্তু সকলি অসার ॥

এই সৃষ্টি-কাহিনীটিকে একটি প্রাথমিক স্তরের সৃষ্টি-কাহিনী বলবার হেতু এই,—এখানে জল সৃষ্টি দিয়েই শুরু হয়েছে ; অন্য কথাগুলিতে দেখা যায়, জল যেন আগের থেকেই সৃষ্টি করা ছিল, নয়ত সৃষ্টি জলমগ্ন থাকবে কেন।

'শূন্যপুরাণে' (রামাই পণ্ডিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৩১৪; নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত)-র সৃষ্টি-কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ধর্ম মহাশূন্য থেকে জন্ম নিয়ে চৌদ্দ যুগ অবস্থান করছিলেন, এমন সময় তাঁর হাই থেকে উলুকের জন্ম হল।

উল্লুকের পিঠে প্রভু বৈসে জোগ-ধেআনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বম্ভ জানে॥
খুধায় তৃসায় পক্ষর দহেন্ত কলেবর।
উল্লুক বলেন্ত পরভুর সহিতে নারি ভর॥

ধর্ম তাঁর 'মুখের অমৃত' দিয়ে উলুকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করলেন। তারপর 'পরভুর বিম্বুকে জল হইল আচম্বিতে।' দুজনে জলে ভাসতে লাগলেন। উলুক ডুবে রসাতল গেল।

উল্লুকের বীরপাক খসিআ পড়িল।
জনমিল পরমহংস জলেত ভাসিল॥
ছুটিল পবমহংস জোজন সাত জাঅ।
ঠাকুর উল্লুকের দুহু উঠিআ রহাঅ॥

হাঁস পালাতে পাবল না, প্রভুকে দর্শন করবার জন্যে ফিরে এল। নিরঞ্জন হাঁসকেও তাঁর জন্ম-বিবরণ জিজ্ঞেস করলেন এবং হাঁসের পিঠে 'তিলেক বিরাম' নিলেন। এভাবে কয়েকযুগ গেল। ভার সইতে না পেরে হংস নিরঞ্জনকে ফেলে পালাল। তারপর কূর্মের সৃষ্টি। কূর্ম ও উলুকের ওপর ভর করে প্রভু বিরাজ করতে থাকলেন। তখন উলুক পরামর্শ দিল: 'দেবতা হইআ কতই ভাসিঞা বেড়াঅ'; অতএব, 'জলের উপরে করু ছিষ্টির সাজন'...'তবে সে হইব প্রভু ছিষ্টির পত্তন।' উলুকের কথামত ধর্মরাজের সোনার পইতা জলে ফেলে দেওয়া হলে তা থেকে সহস্র ফণা নিয়ে বাসুকীর জন্ম হল। ঠাকুরের কানের কুণ্ডল থেকে সৃষ্টি হল ভেকের, তা বাসুকীর খাদ্য হল। অতঃপর প্রভুর দেহ নিঃসৃত স্বেদ থেকে আদ্যাশক্তির জন্ম হল। ধর্ম হলেন আদ্যার পিতা, উলুক তাঁর খুড়ো। তারপর সৃষ্টি আরম্ভ হল।

এই সৃষ্টি-কথায় সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় উলুকের সক্রিয়তা। বস্তুত উলুকই সব বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে গেছে, প্রভু নিরঞ্জন তা পালন করে গেছেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, জলচর পাখি হাঁসের উপস্থিতি, যদিও সে কোনো স্পষ্ট ভূমিকা নেয় নি। তৃতীয়ত, পাখির সঙ্গে সাপের সংযোগ, যা সারা পৃথিবীতে এক প্রাচীন Composite symbol। বস্তুত, যেখানেই জল, সেখানেই পাখি বা সাপ থাকেই।

সৃষ্টির সঙ্গে জলের যোগ অতি গভীর। 'ধর্মমঙ্গল' এবং 'শূন্যপুরাণ' উভয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি-কথাতেই দেখলাম, জল অভাবে উলুক কষ্ট পাচ্ছে, এবং দেবতার মুখামৃতই তার তৃষ্ণা নিবারক হয়েছে। পাখির সঙ্গে জলের এই যোগের ফলে দেখি পাখিই মানুষকে জলের প্রথম সন্ধান দিচ্ছে। যেমন, আসামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীতে (দ্রঃ Myths of the North-East Frontier

of India : North-East Frontier agency, Shillong, Govt. of India : 1st edition 1958, Reprint 1968 : Verrier Elwin) ।

এল্‌উইনের প্রাগুক্ত গ্রন্থে অন্তত তিনটি বিভিন্ন অসমীয়া উপজাতীয়দের কথা পাই, যেখানে পাখিই জলের সন্ধান মানুষকে দিয়েছে। Hrusso (বুড়াগাঁও, কামেং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন)-দের একটি কথায় (P. 80-81) দেখা যায়, মানুষ ও মানবেতর প্রাণী যখন সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, তখন Horsi-Basam নামে একটি পাখি সূর্যোদয়ের দেশে, যেখানে একটি বিরাট সাপ পাকে পাকে জড়িয়ে আঁকড়ে আছে একটি দীঘিতে তাবৎ জল, সেখানে গিয়ে সেই সাপের চোখ ঠুকরে, তার পাক খুলিয়ে, পৃথিবীতে জল আনল প্রথম। লক্ষ করবার বিষয়, Horsi-Basam পাখি সর্বদা নদীতীরেই থাকে। Minyong (পাংগিন, সিয়াং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন)-দের একটি কথায় (P. 84-85) দেখি, একটি হাঁস আগে আগে বিষ্ঠা ত্যাগ করতে করতে যাচ্ছে, এবং তৃষ্ণার্ত মানুষ সেই হাঁসকেই অনুসরণ করে সর্বপ্রথম জলের সন্ধান পেল। Moklum (লোংকে, তিরাপ ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন)-দের একটি কথায় (P. 85) আবার পাখি, জল ও সাপকে একত্র হতে দেখা যায় : সব জল পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল, পর্বতের এক চূড়ায় থাকত একটি মুরগী, অপর চূড়ায় থাকত একটি সাপ। একদিন মুরগী ও সাপ পরামর্শ করে পাহাড়ের দু দিক খুঁড়ে সব জল ছেড়ে দিল। সেই জলের ধারার একটি হল 'তিরাপ' নদী, আর একটি ব্রহ্মপুত্র।

'ধর্মমঙ্গলে' ও 'শূন্যপুরাণে' যে ধরণের সৃষ্টিকথা পাওয়া যায়, অনুরূপ সৃষ্টিকথা ভারতের বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। মীর্জাপুর জেলার (ভূতপূর্ব যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত) দক্ষিণ দিকে, দ্রাবিড়-সম্ভূত এক জাতি বাস করে, তারা 'চেরো' নামে পরিচিত। এই চেরোদের সৃষ্টিকথা (Enthnographical Notes on the cheros : Man in India, Vol IX, No. 4, December 1929, Pp. 205-222 : D. D. Agarwal) এই রকম :

আদিতে ছিল সব জলমগ্ন, সেই জলে ফুটেছিল একটি 'কমল'। পাতালে থাকতেন ভগবান, একদিন কূর্মের পিঠে চেপে তিনি ওপরে এলেন। সেই কমলের ওপর উপবিষ্ট হয়ে কূর্মকে তিনি আদেশ করলেন, পাতাল থেকে কিছু মাটি আনতে। কূর্ম আদেশানুসারে তার পিঠে করে পাতাল থেকে মাটি নিয়ে আসতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওপরে ভেসে ওঠবার আগেই মাটি জলে ধুয়ে যেতে লাগল। ভগবানের আদেশে ইঁদুরও এ কাজ করতে গিয়ে সফল হল না। তখন ভগবান তাঁর নিজস্ব ভৃত্য গরুড়কে বললেন, দূরে উড়ে গিয়ে সেখান থেকে সৃষ্টির জন্যে কাদা-মাটি আনতে। গরুড় স্বর্গ থেকে মুখে করে মাটি এনে ভগবানকে দিল। ভগবান সেই মাটি তাঁর হাতে ঘষে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন, সংগে সংগে স্থল সৃষ্টি হল।

একটি গাড়োয়ালি সৃষ্টি-কথায় (Folklore of Garhwal : The Vishvabhararti Quarterly, IV, 1926 : T. D. Gariola) : আদিতে কিছুই

ছিল না—পৃথিবী না, আকাশ না, জল না। কেবল গুরু নিরংকর ছিলেন। একদা তিনি তাঁর দক্ষিণ দিক ঘর্ষণ করলেন, তার ফলে জন্ম নিল শকুনি। তিনি বাঁ দিক ঘষলেন, তাতে জন্মাল একটি পুরুষ শকুনি। স্ত্রীটির নাম সোনী-গরুড়ী, পুরুষটির নাম ব্রহ্ম-গরুড়। ব্রহ্ম-গরুড় সোনী-গরুড়ীকে বিয়ে করতে চাইল, কিন্তু সোনী-গরুড়ী এই বলে আপত্তি করলে যে, তারা একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট জীব, অতএব ভাই-বোন এবং সে কারণেই বিয়ে হতে পারে না। ব্রহ্ম-গরুড়ের কুদর্শন রূপ নিয়েও সোনী-গরুড়ী কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করলে। ব্রহ্ম-গরুড় কাঁদতে থাকল। সোনী-গরুড়ী তাতে অনুতপ্ত হয়ে ব্রহ্ম-গরুড়ের চোখের জল মাটি থেকে তুলে নিল। সেই অশ্রু তার গর্ভ সঞ্চার করালে। তারপর সে ব্রহ্ম-গরুড়ের সঙ্গে উড়ে গেল, তাকে বলল নীড় নির্মাণ করতে, যাতে সে ডিম পাড়তে পারে। ব্রহ্ম-গরুড় এবার সোনী-গরুড়ীর সতীত্ব সম্পর্কে কটাক্ষ করলে এবং জানালে, সে কুদর্শনা বলে তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে অসমর্থ। সোনী-গরুড়ী তখন কাঁদতে আরম্ভ করলে। তাতে ব্রহ্ম-গরুড়ের দয়া হল। সে বললে, জল নেই, স্থল সেই, কোথায় নীড় নির্মাণ করব, এসো, আমার ডানাতেই ডিম পাড়ো। সোনী-গরুড়ী বলল, তুমি বিষ্ণুর বাহন, তোমার ডানাতে কি ডিম পাড়তে পারি। প্রসূত ডিম তাই নীচে পড়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল: নীচের দিকটা হলো পৃথিবী, আর ওপরের দিকটা হল স্বর্গ। ডিমের জলীয় পদার্থ হল—সাগর; এবং তার কুসুম হল—মাটি। এইভাবে নিরংকর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

একটি লাদাকী সৃষ্টি-কথাতে পাই: প্রথমে ছিল শুধুই জল, সেই জল থেকে উদ্ভূত হল তৃণভূমির। এই তৃণভূমির ওপর সৃষ্ট হল তিনটে পাহাড়, তিনটেই সাদা, লাল আর নীল রঙের জহরতের পাহাড়। সেই তিনটে পাহাড়ের ওপর দেখা দিল তিনটি চন্দন গাছ, সাদা, নীল ও লাল রঙের। তিনটি গাছে তিনটি পাখি হল—সাদাতে বুনো ঈগল; নীল গাছে হল 'বীরু জোলমো'; এবং লাল গাছে হল মুরগী। এভাবেই ক্রমে জগৎ সৃষ্টি হল।

সাঁওতালদের একাধিক সৃষ্টি-কথা পাওয়া গেছে। বিহারের সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সৃষ্টিকথা এই রকম: তখন ছিল কেবল জল, কোথাও স্থল ছিল না। তার মধ্যে ছিলেন ঠাকুর এবং মারাং বুরু। মুণ্ডারা ছিল এঁদের দুজনের মন্ত্রণা-দাতা। একদিন একজন মুণ্ডা ঠাকুরকে মানুষ সৃষ্টির কথা বলল। ঠাকুর তখন জলের ফেনা দিয়ে দুটি মূর্তি নির্মাণ করলেন। তারপর তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবার সময় ভুলে মানুষের প্রাণের বদলে পাখির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। ফলে মূর্তি দুটি পাখি হয়ে উড়ে চলে গেল, তাদের আর দেখা গেল না। বারোমাস পরে পাখি দুটি ফিরে এসে ঠাকুরকে একটু শুকনো ডাঙা দিতে অনুরোধ করলে, যাতে তারা সেখানে বাস করতে পারে। ঠাকুর এবং মুণ্ডারা সব মাছ, কাঁকড়া এবং কেঁচোদের বললেন, জলের তলা থেকে মাটি তুলে আনতে, কিন্তু কেউ তা পারল না। অবশেষে কূর্মকে জলের তলায় মাটিতে বাঁধা হল, কেঁচো এবং কেন্নোরা কূর্মের পিঠে মাটি জমা করল, তাই জমতে-জমতে একটি দ্বীপের সৃষ্টি হল। সেই

দ্বীপে ঠাকুর একটি গাছ এবং কিছু ঘাস-তৃণ রোপণ করলেন। সেই দ্বীপে, সেই পাখি দুটি-হাঁসা এবং হাঁসিন—বাসা তৈরি করলে, হাঁসিন দুটি ডিম পাড়লে। সেই ডিম দুটি থেকে দুটি মানব শিশুর জন্ম হল: একটি নর, অপরটি নারী। এরাই পরে সব মানুষের জনক-জননী হল। সাঁওতালরা নরটিকে বলে 'পিলচু হরম,' নারীটিকে বলে 'পিলচু বুড়ী'।

প্রায় এই কথারই অনুরূপ, সাঁওতালদের আর একটি সৃষ্টিকথা এই: সৃষ্টি ছিল আদিতে জলময়। তারপর সর্বপ্রথমে জলচারী প্রাণীর সৃষ্টি হল। সৃষ্টিকর্তা ঠাকুর তাঁর নিজের বুক চিরে দুটি পাখি তৈরি করলেন: হাঁস ও হাঁসিন। পাখি দুটিকে তিনি তাঁর হাতে বসালেন, তারপর ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। কোথাও স্থলভূমি না পেয়ে তারা ফিরে এল। এই পাখি দুটির বসবাসের জন্যেই ঠাকুরকে স্থল সৃষ্টি করতে হল। তাদের দুটি ডিম থেকেই প্রথম দুটি মানুষের জন্ম হল। সে মানুষ দুটি বড়ো হতেই পাখি দুটির ভাবনা হল, এদের কোথায় রাখা যাবে। ঠাকুরের নির্দেশে পাখি দুটি, সূর্য যেদিকে অস্ত যায়, সেদিকে উড়ে গিয়ে "হিহিড়ি-পিপড়ি" নামে একটি স্থান পেল। সেখানে পিঠে করে বয়ে নিয়ে তারা মানুষ দুটিকে রাখল। তারপর তারা কোথায় উড়ে গেল, কে জানে।

উত্তর আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদের সৃষ্টিকথা (An introduction to folklore : London, David Nutt, 1897, P. 257 : Marian Roalfe Cox) তেও প্রায় একই ব্যাপার দেখা যায়: জলময় সৃষ্টিতে প্রাণী বলতে কেবল ছিল একটি ঈগল এবং একটি কাক। একটি কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে দু'জনে কথা-বার্তা বলত। একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যে একদিন কাক ও ঈগল মিলে একটি হাঁস তৈরি করলে। হাঁসটি একদিন জলের তলায় গিয়ে ঠোঁটে করে কিছু মাটি নিয়ে এল। ঈগল ও কাক এর আগে কোনোদিন মাটি চোখে দেখে নি। কিন্তু এ দিয়ে যে বিরাট একটা কিছু গড়া যায়, তা বুঝল। হাঁসকে তারা তাই আরো মাটি আনতে বলল। হাঁসের আনা মাটি, সেই কাটা গাছের গুঁড়িটার দু'পাশে কাক ও ঈগল স্তূপীকৃত করতে লাগল। ইতিমধ্যে ঈগলকে কিছুদিনের জন্যে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, কাক নিজের ভাগে মাটি বেশী করে নিয়েছে। কালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস, ঈগলের মাটির স্তূপই তাদের উপকূলের পাহাড়। কাকের স্তূপটি হল—সিয়েরা নিভেদা। কাকের অসাধুতার জন্যে ঈগল রেগে গিয়ে স্তূপ পাল্টে নিল। সেইজন্যে পাহাড় আজও তেমনি আছে। ঈগলকে লোকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু কাককে ঘৃণা করে।

ওপরে যে ক'টি মৌলিক সৃষ্টি-কথার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তার মধ্যে দেখা যায়: কোনো-কোনোটিতে গাছ আছে। এই গাছ ঠিক 'cosmic tree' বা 'earth tree' না হলেও, সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। জল সব ক'টিতেই আছে। সেই সঙ্গে জলচর পাখি এবং কাক-ঈগল-পেঁচা প্রভৃতি পাখি। এই গাছ-জল-পাখির একটি সম্মিলিত চিত্র পাই টিউটনিক পুরাণের সৃষ্টি-কথাতে। টিউটনিক পুরাণে

কথিত হয়, yggdrasil নামে একটি অ্যাস (Ash) গাছ এই পৃথিবীকে বহন করে আছে। এই গাছের তলাতে থাকেন তিনজন ভাগ্যদেবী (the three Norns)। গাছটির একটি শেকড়ের নীচে Nidhogg নামে একটি দানবাকৃতির প্রাণী নিরন্তর গর্জন করে চলেছে। চারটি পুরুষ হরিণ গাছটির শেকড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে। তথাপি ওই তিনজন ভাগ্যদেবীর জল নিষেকের ফলে গাছটি বেঁচে আছে। তাঁরা Mimir নামে একটি ঝর্ণা থেকে জল এনে গাছটির গোড়ায় সেচন করেন। সেই ঝর্ণায় এক জোড়া মরাল নিরবধি কাল ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই মরাল জোড়াই বর্তমান পৃথিবীর তাবৎ মরালের পিতৃপুরুষ বা পূর্বপুরুষ।

উপর্যুক্ত সৃষ্টিকথাগুলি বিশ্লেষণ করলে, এই প্রকার মন্তব্য করা যেতে পারে :

১. সব ক'টিতেই দেখা যায়, আদিতে সৃষ্টি ছিল জলময়। এই Motif হল : Primeval water : A 810. প্রাচীন গ্রীক ও সেমেটিক সৃষ্টি পুরাণেও পৃথিবীর আদিকাল জলমগ্ন। ভারতীয় পুরাণে তো কথাই নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫. ৫.), ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭. ১০ ১), ঐতরেয় উপনিষদে (১. ১. ৩) বারংবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। রামায়ণেও সৃষ্টিপুরাণের প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্ম বরাহরূপ ধারণ করে সেই জলের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। বিষ্ণু-পুরাণেও এই একই কথা আছে।

২. পৃথিবী, মানুষ, গাছ-পালা ও মানবেতর প্রাণীর সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই Motif : creation of Universe by creator. The creator is existing before all things : A 610.

৩. 'শূন্যপুরাণে' সৃষ্টিকথায় উলুককে কিছু সক্রিয় দেখা যায়, ঠাকুরকে সৃষ্টিতে সেই-ই উদ্বুদ্ধ করেছে, যদিও সেও ঠাকুরেরই সৃষ্টি। যাই হোক, মোটামুটিভাবে সৃষ্টিকর্তাদের স্বতোপ্রণোদিত হয়েই সৃষ্টি করতে দেখা যায়। Motif : Spontaneous creation : A 620।

৪. পাখির ডিম থেকেই মানুষ এবং পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে। Motif : Mankind originates from eggs : A 1222. হাওয়াই দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি কাহিনীতে : Universe from cosmic fowl : A 647. ফিনিস সৃষ্টি কাহিনীতে : Creation from duck's egg : A 641.2. অবশ্য সাঁওতাল কাহিনীটিতে হাঁসা-হাঁসিন কেবল মানুষ সৃষ্টি করেছে, বিশ্ব সৃষ্টি করে নি।

৫. মানুষ বা পৃথিবী সৃষ্টি করবার জন্যে যে সব পাখি সৃষ্টি করা হল, তারা দু-একটি ক্ষেত্রে জোড়ায়-জোড়ায় (যেমন হাঁসা-হাঁসিন ; শকন-শকুনী) সৃষ্ট হয়েছে। Motif : all things created in pairs : A 601.1.

৬. যে সব পাখি এই সৃষ্টিকার্যে সহায়ক হয়েছে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ও বাস্তব পাখি যেমন আছে, তেমনি অলৌকিক ও অপ্রাকৃত প্রক্রিয়ায় জাত পাখি পাই। যেমন, ঠাকুরের বুক চিরে, অথবা তাঁর ডান ও বাম দিক থেকে, অথবা তাঁর গাত্রমল থেকে জাত পাখিকে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে, পাখি-কর্তৃকই কাদা-মাটি দিয়ে

পাখি সৃষ্টি। পুরুষের অশ্রু পান করে নারীর গর্ভবতী হওয়া, জলের ফেনা দ্বারা মনুষ্যমূর্তি নির্মাণ, অথবা পাখির ডিম থেকে মানুষের জন্ম—ইত্যাদি "অস্বাভাবিক জন্ম"-কেও এখানে লক্ষ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে যাদু ও ইন্দ্রজাল মূল ভূমিকা নিয়েছে।

৭. এই যাদু ও ইন্দ্রজাল সৃষ্টি-ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পাখি-কর্তৃক পাতাল থেকে আনীত মাটি যখন সৃষ্টিকর্তা তাঁর হাতে ঘষে জলের ওপর ছড়িয়ে দেন, তখন পুরো কর্মটাই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রজাল হয়ে ওঠে। একটি ভিল সৃষ্টিকথাতে দেখি, পাখি-কর্তৃক আনীত মাটিতে ভগবান তাঁর রক্ত মিশিয়ে তবে ছড়িয়ে দিলেন।

৮. সৃষ্টির জন্যে যে মাটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা দূর অঞ্চল থেকে বহু আয়াসে সংগ্রহ করা গেছে। পাতাল থেকে সেই মাটি সহজে আনা যায় নি; কখনো বা উচ্চ পর্বতের শীর্ষ থেকে, কখনো বা উচ্চতর লোক স্বর্গ থেকে সেই মাটি আনতে হয়েছে। দূরত্ব, দুষ্প্রাপ্যতা ও দুরূহতা মাটির মধ্যে একপ্রকার ঐন্দ্রজালিকতার সঞ্চার করেছে। লক্ষ করা যায়, জলের সংস্পর্শ থাকলেও সর্বক্ষেত্রেই জলচর পাখিই মাটি আনে নি, কাক, ঈগল, শকুন, গরুড় (সব ক'টিই সূর্য, বজ্র বা মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত) প্রভৃতি পাখিরাও সৃষ্টির জন্য সে মাটি এনেছে। এই সব পাখির মধ্যে solar ও thunder bird রূপে অনেককেই সনাক্ত করা যায়। কিন্তু উলূক বা পেচক lunar biId, মৃত্যুর সংগেও তা জড়িত। মৃত্যুর আসঙ্গ কাক ও শকুনের মধ্যেও আছে।

৯. পাখির সঙ্গে জল, সাপ ও গাছকে সংমিশ্রিত হতে দেখা গেছে।

১০. অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পাখিকেই সৃষ্টিকর্তারূপে দেখেছি, মানুষ বা ভগবানের কোনো প্রসঙ্গ এটিতে নেই। পাখিকে খাঁটি সৃষ্টিকর্তারূপে এটিতেই (উত্তর আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদের সৃষ্টিকথাতে) দেখি॥

কিছু-কিছু সৃষ্টিকথা পাই, যেগুলিকে আদি স্তবের মৌলিক সৃষ্টিকথা বলা চলে না, আবার ধ্বংসোত্তর দ্বিতীয়স্তবের সৃষ্টিকথাও বলা যায় না। এগুলোকে তাই সন্দেহজনক মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টিকথা বলে নির্দেশ করতে পারি। এমন স্তরের কয়েকটি নিদর্শন এখন উপস্থিত করি।

এই ধরণের সৃষ্টিকথার মধ্যে মধ্যভারতের গোঁড়দের সৃষ্টিকথাটি উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপুরাণের সঙ্গে গোঁড়দের সৃষ্টিপুরাণের সাদৃশ্য ডঃ সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল তাঁদের প্রাগুক্ত গ্রন্থে লক্ষ করেছেন। গোঁড়দের সৃষ্টিকথা নিয়ে ভেরিয়র এলুইন অন্ততঃ তিনটি স্থানে আলোচনা করেছেন: Songs of the forest: the poetry of the Gonds: 1935, PP. 18-12: Shamrao Hivel and Vrerier Elwin; দ্বিতীয়টি: A Gond magician · The

Illustrated weekly of India : Sunday, 6th June, 1937, PP. 22–65. এবং তৃতীয়টি : Myths of middle India (Oxford University Press, 1949, P. 38) ; এটি মাণ্ডলা জেলার পাতানগড় থেকে সংগৃহীত। এই তিনটি কাহিনী সংমিশ্রিত করলে গোঁড়দের সৃষ্টিকাহিনী এই রকম দাঁড়ায় :

আদিতে পৃথিবী ছিল জলময়। ভগবান তখন একটি পদ্মপত্রে ভাসছিলেন। পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর গাত্রমল থেকে একটি কাক সৃষ্টি করে তাকে স্থলের খোঁজে পাঠালেন। কাক কোথাও খাদ্য, স্থল এবং উপবেশনের ঠাঁই না পেয়ে শেষে চক্রমল ছত্রী নামে এক বিরাট কূর্মের (পরবর্তীকালে ভেরিয়র এলউইন সংশোধন করে বলেছেন, কূর্ম নয়, কাঁকড়া) ওপর উপবেশন করলে। কাকের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে কূর্ম মাটির সন্ধানে জলের তলে ডুব দিল। পৃথিবীর সব মাটি জল-রাজা ও জল-রানী গিলে খেয়ে নরকে গিয়েছিল। কূর্ম তাদের গলা টিপে তাদের কাছ থেকে এক দলা মাটি আদায় করে নিল এবং কাকের মাধ্যমে তা ভগবানের কাছে পাঠিয়ে দিল।...অতঃপর সেই মাটি থেকেই পৃথিবী সৃষ্ট হল।

তারপর দ্বিতীয় সংগ্রহটিতে আর একটু পাই : ভগবানের সৃষ্টির সহযোগী হলেন 'পবন দশোরী'। দেবতাদের জন্ম হল, তারপর হল অরণ্য, তারপর গোরু এবং সবার শেষে মানুষ।

তৃতীয় সংগ্রহটিতে কিছু নতুনত্ব আছে : জল ছাড়া আদিতে কিছুই ছিল না। কেবল একটি পদ্মফুল তাতে ভাসছিল, 'মহাদেও' তাতে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর গাত্রমল থেকে একটি কাক সৃষ্টি করে তিনি সেটিকে মাটি আনতে প্রেরণ করলেন। কাক অনেক উড়ে শেষে কক্রমল ক্ষত্রি (চক্রমল ছত্রী নয়, এবং কূর্ম নয়) নামে এক কাঁকড়ার দাঁড়ের ওপর এসে বসল। তারপর কথাবার্তার পর, দু'জনে মিলে গেল 'সিংগার দ্বীপে'। সেখানে জলরাজা ও জলরানীর কাছে মাটি ছিল। চক্রমল তাদের খুড়ো-খুড়ী বলে সম্বোধন করে কিছু মাটি ধার চাইল। তারা তা দিতেও চাইল। কিন্তু কাক ও চক্রমলের খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেতে দিল, খেয়ে তারা মাতাল ও অচেতন হয়ে পড়ল। তখন জলরাজা ও জলরানী মাটি নিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু কক্রমল ঠিক সময়ে জেগে উঠে দাঁড় দিয়ে তাদের চেপে ধরল এবং তাদের মুখ থেকে মাটি কেড়ে নিয়ে কাককে দিল।

কাক সেই মাটি নিয়ে মহাদেওকে দিল। মহাদেও পদ্মপাতার সাতটি পত্রপুট তৈরি করে, প্রত্যেকটিতে একটু-একটু করে রেখে তা মন্থন করতে লাগলেন। শেষে ভাবলেন চক্রমল ক্ষত্রীকে। সে একটি স্ত্রী মাকড়সা। তাকে বললেন, সমুদ্রজলে জাল বুনতে। মাকড়সা জাল বুনল। মহাদেও তখন সেই সাতটি পত্রপুট সেই জলের ওপর রেখে পদ্মপাতা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। এই হাওয়া পেয়ে জালের নানা প্রান্তে সেই মাটি ছড়িয়ে পড়ল এবং তাতে সাত-রকমের মাটি তৈরি হল।

মহাদেও তখন ভীমসেনকে বললেন, মাটি শক্ত হয়েছে কি না দেখতে। ভীমসেন মাটিতে নামতেই তাঁর পা গেল ডুবে। তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন, ফলে

সৃষ্টি হল পাহাড়ের।

গোঁড়দের সৃষ্টিকথাতে কাকের এই ভূমিকা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র মিত্র একটি সুন্দর প্রবন্ধ (The crow in the creation myth of the Gonds: The qtly Journal of the mythic society of Bangalore : Vol. XXXIV, No. 2, October 1945, PP. 91—95) লিখেছিলেন।

মধ্য ভারতের আর এক উপজাতি—বইগা। এই বইগাদের সৃষ্টিকথা প্রায় গোঁড়দেরই মত : এখানেও ভগবান একটি কাক সৃষ্টি করে মাটি আনতে তাকে প্রেরণ করলেন, কাক কক্রমল ক্ষত্রী নামে বিপুলকায় কাঁকড়ার ওপর উপবেশন করল, কাঁকড়া তাকে জলের তলে নিয়ে গেল। বইগা-কথায় যে মাটি গিলেছে, তার নাম 'গিছনা রাজা'। এখানেও কাঁকড়া শক্তি প্রয়োগ করে মাটি বমন করালে একুশটি ডেলা হয়ে সে মাটি বের হল। কাক ভগবানের কাছে সে মাটি নিয়ে গেল। গোঁড়-কথার স্ত্রী-মাকড়সা বইগা-কথায় এক কুমারী হয়েছে। সেই কুমারী পত্রপুটে রক্ষিত মাটি আট দিন নয় রাত ধরে মন্থন করতে থাকল। তারপর একটি-একটি চাপাটির মতো ভগবান পৃথিবীকে জলের ওপর বসিয়ে দিলেন।

অন্য একটি বইগা-কথায় দেখা যায় : কাক-আনীত সেই মাটি ভগবান কাককেই ফিরিয়ে দিলেন এবং জলের মধ্যে বীজের মতো বপন করে দিতে বললেন। কাক তাই করল, এবং ক'দিন পর থেকে স্থল দেখা দিতে লাগল।

আগারিয়া (করেলি, মান্দলা জেলা)-দের সৃষ্টিকথা এই : ভগবান জলের ওপর পদ্মপাতা বিছিয়ে সৃষ্টি করতে গেলেন, কিন্তু সূর্য তা শুকিয়ে ফেলল। তারপর তিনি লাক্ষা দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করে যেই তাতে বসতে গেলেন, অমনি তা চূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি নিজের বুকের মল থেকে একটি কাক সৃষ্টি করে, তাকে আড়াই ফোঁটা স্তন দুগ্ধ খেতে দিলেন। এতে কাক কোনোদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হবে না। তারপর দু'জনে মাটির সন্ধানে গেলেন। কাক উড়ে-উড়ে ক্লান্ত হল, তার জন্মদাতাই তার বড়ো শত্রু, এই মনে হল। এই চিন্তা করে কক্রমল ক্ষত্রী নামে এক বিরাট কাঁকড়ার ওপর বসল। কক্রমল জলের নীচে গিয়ে দেখল, জলরাজা ও জলরাণী বারো বছর ধরে ঘুমুচ্ছে। জলরাজাকে জাগাতে, সে জানাল, নিজাম-রাজার কাছে মাটি আছে ; কিন্তু কক্রমল তার গলা টিপে ধরতেই সে ছোটো-ছোটো মাটির পিণ্ড বমন করল। কক্রমলের কাছ থেকে সেই মাটি নিয়ে কাক ভগবানকে দিলে তিনি তা দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

সাঁওতালদের একটি সৃষ্টিকথা (The traditions of the Santals : Journal of the Bihar and Orissa research society, vol. II : A Campbell)-তে আছে : আদিতে ছিল কেবল জল, কেবল ছিলেন 'ঠাকুর জীউ'। জলের নীচে একটি পর্বত গুহাতে থাকত 'মালিন বুড়ী'। ঠাকুরজীউ তাঁর ভৃত্যদের মাধ্যমে মালিন বুড়ীকে মানুষ তৈরি করতে বললেন। কেউ বলে সমুদ্রতলের এক অপ্রাকৃত প্রাণি-সঞ্জাত ফেনা দিয়ে, কেউ বলে শক্ত মাটি দিয়ে মালিনবুড়ী, দুটি মানুষ তৈরি করলো। ঠাকুরজীউ তখন দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। মানুষ তৈরি করে

মালিনবুড়ী তা রোদে শুকুতে দিলে 'সিং-সাদোম' (অর্থাৎ 'দিবা-অশ্ব') তা পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার মানুষ তৈরী করে মালিনবুড়ী 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা'র জন্যে ঠাকুরজীউয়ের কাছে নিয়ে গেল। ঠাকুরজীউ বললেন, দরজার মাথায় চৌকাঠের ওপর পাখির প্রাণ আছে, তা এনো না; কড়িকাঠের ওপর মানুষের প্রাণ আছে, তাই নিয়ে এসো। কিন্তু বেঁটে-খাটো বলে মালিনবুড়ী চৌকাঠের ওপর থেকে পাখির প্রাণই নিয়ে এসে ঠাকুরজীউকে দিলে, সেই প্রাণ তিনি মূর্তি দুটিতে প্রতিষ্ঠা করতেই তারা পাখি হয়ে উড়ে স্বর্গে চলে গেল। কেউ বলে সেখানে তারা বারো মাস, কেউ বলে বারো বছর, ছিল। পাখি দুটি হল 'হাঁস' ও 'হাঁসিন'। তারা ফিরে এসে ঠাকুরকে বলল, তাদের থাকবার ঠাঁই চাই। ঠাকুর তাদের বাস করবার জন্যে তখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তাতে জন্মাল একটি সুন্দর করম গাছ। এই গাছের গোড়ায় হাঁস-হাঁসিন ঘাস দিয়ে নীড় নির্মাণ করলে, হাঁসিন দুটি ডিম পাড়লে। কিন্তু 'রাঘপ পার' এসে তা খেয়ে ফেলল। ঠাকুরকে তা জানাতে পরের বার ডিম পাড়বার পর, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি 'জাহের এরা' নামে এক স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করলেন। সেই ডিম দুটি থেকে একটি নর ও একটি নারীর জন্ম হল। এদের নাম 'পিলচু হরম' ও পিলচু বুড়ী'। এরাই প্রথম নর-নারী।

আগারিয়াদের একটি কথায় পাওয়া যায়: হীরামন নামে এক স্ত্রীলোক ছিল, তার মা ছিল রাক্ষসী। হীরামন কাদা-মাটি দিয়ে একটি শুকপাখি তৈরি করে সোনার খাঁচায় রেখে দিয়েছিল। রামচন্দ্র সেই রাক্ষসীকে পরাভূত করে সেই শুক পাখিটিকে স্পর্শ করতেই, সেটি তৎক্ষণাৎ এই পৃথিবীতে পরিণত হল (Motif: A 822.1.)।

আসামের Tagin (বাগরি, সুবনশিরি ফ্রণ্টিয়ার ডিভিশন)-দের সৃষ্টিকথা এই রকম: আকাশ-দেবতা Nido পুরুষ, তিনি আকাশে থাকতেন; ধরিত্রী Sichi, স্ত্রীলোক, তিনি পৃথিবীতে থাকতেন। একদা তাঁদের মধ্যে কলহ হয়। নিডো আকাশ থেকে কিছু নেমে সিচি এবং পৃথিবীর সব প্রাণীকে ক্রমাগত ক'দিন ধরে হত্যা করবার ভয় দেখাতে লাগলেন। তখন জলস্থলের সকল প্রাণীর 'কেবং' অর্থাৎ সভা বসল। 'চিচিন জারিন' নামে একটি ছোটো পাখি পরামর্শ দিল, নিডো এবং সিচি উভয়কেই তাদের বৃষকে পরিত্যাগ করে, নাগাড়ে দশ দিন ঘরে থাকতে হবে, তার আগে বের হলে তাদের দেহ-সৌন্দর্যের হানি হবে। সিচি আগেই বের হন বলে তাঁর দেহ বিকৃত হয়ে পাহাড়-পর্বত সৃষ্ট হল। নিডো বের হন নি বলে আকাশ আজও নিখুঁত সুন্দর। কাহিনীটি এলউইনের সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

উত্তর আমেরিকার আরিজোনা-র হোপী (Hopi or Moqui American Indians)-দের সৃষ্টিপুরাণে (Folklore in the Old Testament : Abridged Edition, New york, The Macmillan Co., 1923, P. 13 : J. G. Frazer) আছে: সৃষ্টির পূর্বে কেবল ছিল জল। সেই জলে বাস করতেন দু'জন অলৌকিক দেবী, তাঁদের নাম Huruing এবং Wupti. একজন থাকতেন পূর্ব পাড়ে, আর

একজন পশ্চিম পাড়ে। সূর্য তাঁর প্রতিদিনের আকাশ পরিক্রমার সময় দেখতেন —পৃথিবীতে কোনো জন-প্রাণী নেই। এ কথা ওই দুই দেবীকে জানাতে তাঁরা কাদা-মাটি দিয়ে তৈরি করলেন একটি Wren পাখি, তারপর মন্ত্র পড়ে সেই পাখিতে তাঁরা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন, শেষে কোথাও কোনো প্রাণী আছে কি না, তাই দেখবার জন্যে সেটিকে উড়িয়ে দিলেন। পাখি কোনো প্রাণীর সন্ধান পেল না। তখন ওই দুই দেবী একই ভাবে বহু রকমের পশু-পাখি সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন। অবশেষে তাঁরা মানুষ সৃষ্টি করতে চাইলেন। পূর্ব দিকের দেবী কাদা-মাটি দিয়ে প্রথমে সৃষ্টি করলেন স্ত্রী, তারপর পুরুষ। তারপর, মন্ত্র পড়ে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন।

উত্তর আমেরিকারই আর একটি উপজাতি 'হুরোন' (The Huron Indians)-দের সৃষ্টিপুরাণও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় (An introduction to folklore : London, David Nutt, 1897, PP. 284-256 : Marian Roalfe Cox)। এতে পাই : প্রথমে ছিল কেবল জল, জলচারী প্রাণী আর পাখি। এই সময়ে আকাশ থেকে একজন স্ত্রীলোক ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। জলের ওপর তখন দুটি লুন loon) পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের ডানাতে সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরে নিল। কূর্ম সেই পাখি দুটিকে তার পিঠে আশ্রয় দিল। তখন সেই স্ত্রীলোকের জন্যে স্থলের প্রয়োজন হল। বিভিন্ন জলচারী প্রাণী মাটি আনতে জলতলে গেল, কিন্তু মাটি ধুয়ে যাবার জন্যে কেউ তা আনতে পারল না, অবশেষে ব্যাঙ আনল মাটি। কূর্মের পিঠে স্থল সৃষ্টি হল। স্ত্রীলোকটির দুটি সন্তান হল : একটি মানুষের গুণাবলীর প্রতীক, অপরটি দোষাবলীর।…

সৃষ্টিপুরাণের দৃষ্টান্ত হিসেবে ওপরে ক'টি 'কথা' দেওয়া গেল. এবার সেগুলো সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। কেন এগুলোকে মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টিকথা বলেছি, তার কারণ বলি সবার আগে। আদিস্তরের সৃষ্টিকথার সঙ্গে এগুলোর প্রধান তফাৎ হলো, এগুলোতে যেন সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়ে গেছে, তার প্রমাণ আছে; অথচ সে সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এমন ইঙ্গিতও নেই। যেমন, নলরাজা ও নলরাণীর এবং গিছনা রাজার মাটি গিলে খাওয়া ও তা লুকিয়ে রাখা। এটি স্বতঃই প্রমাণিত করে, সৃষ্টি আগেই হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ সহযোগী সৃষ্টিকর্তা বা কর্ত্রী রূপে চরিত্রদের পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'পবন দশোরী', ভীমসেন, মালিন বুড়ী, ইত্যাদি।

মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টিকথার বিষয়বস্তু ও গঠনরীতি আদিস্তরের সৃষ্টিকথার মতোই। এই স্তরের সৃষ্টিকথা সম্পর্কে এই প্রকার মন্তব্য করা যেতে পারে :

১. সৃষ্টিকার্যের আরম্ভকালেই একপ্রকার বাধা, তা সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই হোক না, অনেক দেশের সৃষ্টিকথাতে লক্ষ করেছি। এ যেন জরথুস্ত্রবাদীদের সৃষ্টিপুরাণের সৃষ্টি ও ধ্বংসের দুই বিপরীত দেবতার—আহুর মাজদা ও আহ্রিমানের প্রতিস্পর্ধিতা। এই বাধার মধ্যে এক ধরণের রহস্যবোধও আছে।

একটি অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী যেন এই সৃষ্টিকার্যের প্রতি স্তরে বিপত্তির সৃষ্টি করতে চায়; কখনো বা সে শক্তি দৃশ্যও হয়ে ওঠে। এরই ফলে, জলমগ্ন ভূ-ভাগের মধ্যে স্থলের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের জন্যে যতোবার যে-কোনো পাখিই প্রেরিত হোক না কেন, সে অবধারিত নিয়মে ফিরে আসবেই। পাখির প্রাথমিক কর্ম-প্রয়াস এখানে ব্যর্থ হবেই। কিন্তু পাখির মধ্যে কর্মশক্তির উৎস এতোই বেশি পরিমাণে লক্ষ করা হয়েছে যে, তার দ্বিতীয় প্রয়াস কালে সে সাফল্য অর্জন করেছে। এ যেমন পাখির দিক থেকে, তেমনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার বা তাঁর সহযোগী সৃষ্টিকর্তার প্রাথমিক বৈফল্যও দেখা যায়। এ বিষয়ে এই অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আগেই আলোচনা করেছি।

২. এই প্রতিবোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে নলরাজা ও গিছনা রাজার মাটি গিলে পাতালে লুকিয়ে থাকায়, মাটি না দেবার জন্যে নলরাজার ছলনা-প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ায় এবং শেষে তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাটি দখল করে আনায়। এই যুদ্ধের মধ্যে এক আদিম মনোভাবের চমৎকার বিকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রতিরোধ যেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, তেমনি অপর এক প্রতিরোধ হল —অস্পষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ এক-এক করে একাধিক প্রাণী জলতলে প্রেরিত হচ্ছে, কিন্তু, মাটি নিয়ে ওঠবার প্রাক্কালে জল সে মাটি ধুয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। জলই এখানে এক বিরুদ্ধ শক্তি বলে কল্পিত। সব সৃষ্টিকথাগুলোকে এই সব বিভিন্ন প্রতিরোধের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, যেন ইঙ্গিতে বলতে চাওয়া হচ্ছে, এক বিরুদ্ধ-পক্ষ কখনই চায় না সৃষ্টিকার্য হোক। সে বা তারা কোন্ লোকবাসী? তারা হয় স্বর্গলোক নয় পাতালবাসী। দুই লোকই অদৃশ্য, দূরবর্তী, দুরধিগম্য ও রহস্যময়।

ঝড়-জলের মধ্যে চেতনপদার্থরূপে এখানে এক ধরণের শক্তি আরোপ করা হয়েছে। একে একটি 'water-spirit' বলা যায়, কোথাও বা তা 'peg-o-nail' নামে পরিচিত, যা শুভাশুভ দুই-ই সাধন করতে সক্ষম। লোকসাহিত্যে যাদুকর্মে ও রূপান্তর সংঘটনে বহুশঃই জল ছিটোনো হয়। নরওয়েতে বিশ্বাস আছে, কেউ ডুবে মরবার আগে ভাইভার পাখি ডাকে। আয়ার্ল্যাণ্ডে মনে করা হয়, জলে ডুবে-মরা লোক পাখি হয়। জলের মধ্যে একটি সৃষ্টিশক্তি আছে, আসামে তাঁকে 'ভাণ্ডারীদেবী' বলে, তাঁরই কৃপাতে জলের ফসল মাছ সৃষ্ট হয়। জল ও পাতাল যেমন একদিকে, তেমনি স্বর্গ আর একদিকে। স্বর্গ থেকে যেমন মাটি আনা হয়েছে, তেমনি সৃষ্টির এক বিশিষ্ট উপাদান আগুনও স্বর্গ থেকেই আনীত বলে কল্পিত হয়েছে। যে ভাবেই দেখা যাক না, সৃষ্টিক্ষেত্রে স্বর্গ ও পাতাল যাদুময়তার শুভাশুভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩. এই প্রতিরোধ ও যাদুধর্মিতার ফলেই সৃষ্টিকথাতে রাক্ষসের আগমন ঘটেছে। আগারিয়াদের একটি সৃষ্টিকথাতে দেখা যায়, রাক্ষসীর কন্যা হীরামতী যেন সৃষ্টিকে অকেজো করে রেখেছিল; রামচন্দ্র এখানে কোনো 'Culture-hero', তাঁরই যাদুময় স্পর্শমাত্রই সেই রাক্ষসীর প্রতিরোধক্ষমতা যেন দূরীভূত হল।

রাক্ষস এখানে স্পষ্টরূপে সৃষ্টিক্ষেত্রে বিরুদ্ধশক্তির ভূমিকা নিয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সৃষ্টিকথাতেও দৈত্যের দেহ থেকে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ভাগবত পুরাণের সৃষ্টিকথাতে দেখা যায়, সৃষ্টির প্রথম স্তরেই, ব্রহ্মার ভুলের জন্যেই প্রথমে সৃষ্ট হল যক্ষ ও রাক্ষসেরা। মার্জিত পৌরাণিক কাহিনীতেও সৃষ্টিক্ষেত্রে দৈত্য-দানব-রাক্ষসের বিপক্ষতা দেখা যায়।

৪ একাধিক কথায় কাদা-মাটি বা জলের ফেনা দিয়ে তৈরি পক্ষিমূর্তি বা মানবমূর্তির কথা আছে। মানবমূর্তি নির্মাণ করে ভুল করে পাখির প্রাণ তাতে প্রতিষ্ঠা করা, অথবা পাখির ডিম থেকে প্রথম মানুষের সৃষ্টি হওয়া, পাখি ও মানুষের একাত্মতা প্রমাণিত করে। প্রথম পাখি সৃষ্টি করে যেমন তার বাসস্থানের জন্য স্থলভূমি সৃষ্টির আবশ্যক হয়েছিল, তেমনি প্রথম মানুষের সৃষ্টির পরও স্থলভূমি সৃষ্টির আবশ্যক হয়েছে। পাখিতে ও মানুষে কোনো ভেদ এখানে করা হয় নি। নরাকৃতি দেবতার সৃষ্টিকর্মে তাই পাখি সহকর্মী হয়েছে আপন সৃষ্টি-ক্ষমতা নিয়ে॥

বেশির ভাগ আদি স্তরের সৃষ্টিকাহিনী ডিম-ঘটিত। এই ডিম মাছ, কচ্ছপ, কুমীর, সাপ ও পাখি, যে কোনো প্রাণীরই হতে পারে; তবে, যে হেতু পাখিরও হতে পারে, সে হেতুই এটিকে আমরা একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে মনে করি। আর, কয়েকটি সৃষ্টিকথাতে তো স্পষ্টই পাখির ডিমের উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ডিমের মধ্যেও দুটি ভাগ আছে, যেমন পাখির মধ্যে দেখা গেছে। একদিকে আছে, জৈব, স্বাভাবিক ও বাস্তব ডিম; অপর দিকে অজৈব, অস্বাভাবিক ও অবাস্তব ডিম। 'জৈব' হলেও অবাস্তব ডিম সৃষ্টিকথাতে পেয়েছি, যেমন, গাছের ডিম কল্পিত হয়েছে। এরই ফলে স্তন্যপায়ী মানুষের ডিম কল্পিত হয়েছে, যেমন কিনা বিপরীতভাবে অণ্ডজ পাখির গর্ভে মানুষের জন্মকথা বিবৃত হয়েছে। The Science of Folklore গ্রন্থের লেখক A. H. Krappe যদি এর মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজতে বসেন, তবে তার বাড়া বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। লোকচারণার ক্ষেত্রে সেইটুকুই বিজ্ঞান খোঁজা যেতে পারে, যেটুকু সহজ-সরল সাধারণ-স্বাভাবিক ও প্রাথমিক দৃষ্টিতে পাওয়া যায়, তার বেশি নয়। বরং কেন এই মানসিকতা, সেই মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারই লোকচারণিকের কর্তব্য হওয়া উচিত। স্তন্যপায়ী ও অণ্ডজ প্রাণীর এই সংমিশ্রণের মধ্যে যে আদিম লোকমানসটি ক্রিয়াশীল, তা হল: সৃষ্টি এতো বিশাল, ব্যাপক ও রহস্যময় ব্যাপার যে, সহজ ও সাধারণ ভাবে তাও যে রূপ গ্রহণ করতে পারে, তা আদিম মানুষ বিশ্বাসই করতে পারত না। একা বিশেষ এক

ধরণের প্রাণীর পক্ষে যেন তা সম্ভব বলেও বিবেচিত হয় নি। তার মধ্যে রহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছে বলেই এই সংমিশ্রণ।

সৃষ্টির মধ্যে এই সংমিশ্রণের জন্যেই হাঁসের ডিমকে উত্তর বাঙলার লোক-সাধারণ বলে 'হাঁসের ফল', হাঁস যেন এখানে গাছ। ঠিক যেমন ইংলণ্ড-আয়ার্ল্যাণ্ডের নাবিকদের বিশ্বাস, 'Barnacle goose'-এর জন্ম হয় জাহাজের ভাঙা কাঠ, সুতরাং গাছ থেকে। Encylopaedia of Superstitions (Rider and company: London, Ec4 : E and M. A. Radford-সঙ্কলিত) গ্রন্থে এই খবরটি দিয়ে একটি চমৎকার মন্তব্যও তুলে দেওয়া হয়েছে: "When our first Parents were made of mud, can we be surprised that a bird should be born of a tree?"—P. 28। এই মানসিকতার দরুনই আন্দামানের লোকদের বিশ্বাস (The Andaman Islanders: Cambridge, 1922, P. 192: A. R Brown) সৃষ্টির প্রথম মানুষ (এর নাম 'Jutpu') বাঁশের গ্রন্থির মধ্যে জন্ম নেয়, ঠিক ডিমের মতো। একটি বাঙলা লোককথায় দেখি (The Story of swet-Basanta: Folktales of Bengal, Reprint 1910, P. 107: The Rev. L. B. Dey) পাখির ডিম থেকেই নায়িকার জন্ম হয়েছে। 'মনসার ধুপাচার' নামে একটি কাব্যানুযায়ী মনসা একটি পাখির ডিম থেকে জন্মেছেন।

সৃষ্টির সঙ্গে ডিমের যোগ পৃথিবীর সব দেশের লোকমানস অনুভব করেছে। এরই ফলে 'world egg theory'-র জন্ম হয়েছে, ডিম তখন 'cosmic egg'-এ পরিণত হয়েছে। আসলে ডিম উর্বরতার প্রতীক, এবং সেই উর্বরতার সুবাদেই ধরাগর্ভের প্রতীক। ধরার অভ্যন্তরে যে শক্তি সুপ্ত হয়ে থাকে, শস্যরূপে তাই প্রকাশিত হয়, ডিমের খোলসের মধ্যে যেমন থাকে প্রাণের ভ্রূণ। ডিম সেদ্ধ করে তার খোলস ছাড়ালে তা নীলাভ আকাশের অবিকল প্রতিরূপ হয়ে যায়, কাজেই ডিমকে আকাশ বলতে মানুষের কোনো অসুবিধে হয় নি। বেশির ভাগ সৃষ্টিকথাতেই স্থলভাগ জলমগ্ন বলে কথিত হয়েছে; ডিমের কুসুম সেই স্থলভাগ, এবং সেই কুসুম ডিমের জলীয় পদার্থে (অর্থাৎ Albumen) ডোবা থাকে। একটু পরেই দেখতে পাবো, 'Cosmic egg' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলজাত।

ডিমের খোলস যেমন প্রাণের ভ্রূণ ধারণ করে, ধরাগর্ভ তেমনি নানা শক্তিকে ধারণ করে থাকে। লাঙলের সীতায় যে সীতার উদ্ভব ঘটেছিল ধরাগর্ভ থেকে, প্রাথমিক ভাবে সেও তো ডিমের মতো একটি সম্পুটে রক্ষিত ছিল। আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার 'অস্ট্রিচ' অর্থাৎ উটপাখি সম্পর্কে বিশ্বাস আছে, বালুকার অভ্যন্তরে, পাঁচ-ছ ফুট গর্ত করে, স্ত্রী উটপাখি ডিম পেড়েই নাকি তা পরিত্যাগ করে চলে যায় (A Dictionary of the Bible, Fourth Revised edition, 1954, P. 559: J. D. Davis), বালুকার উষ্ণতাতেই তা ফোটে। যেন ধরাগর্ভের কোনো অদৃশ্য শক্তি সেই ডিমে তাপ দিয়ে তা ফোটায়। ধরাগর্ভের সঙ্গে এই ধরণের যোগ-সাদৃশ্যেই ডিম সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টিপুরাণের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। হয়ে গেছে বলেই ওরাওঁদের সৃষ্টিকথা কথন-

শ্রবণকালে গাছের পল্লব দিয়ে ডিম ভেদ করবার প্রথা আছে। সৃষ্টির সঙ্গে দৈত্য-রাক্ষসের সংযোগের কথা আগেই বলেছি। Tyrol-এ তাই কালো মুরগীকে সাত বছরের বেশি বাঁচতে দেওয়া হয় না, কেননা, তখন তার ডিম থেকে একটি শতায়ু দৈত্যের জন্ম হতে পারে। ডিম সম্পর্কে এই ধরণের মনোভাব থেকেই ইংলণ্ডের লোকদের বিশ্বাস আছে, Barn owl বা Screech owl জোড়ায়-জোড়ায় ডিম পাড়ে; বেজোড় সংখ্যায় ওদের বড়ো ভয়। পূর্ব আফ্রিকার অনেক উপজাতি ডিম খাওয়াকেই এক ভয়ঙ্কর কর্ম বলে মনে করে (The Indian Antiquary : May 1929, P. 82)। এই সব কারণেই 'Oomancy' (ডিম-দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়)-র সৃষ্টি হয়েছে।

স্টীথ টম্পসন তাঁর Motif Index of Folk literature (2nd printing 1966) বইতে ডিম থেকে বিশ্বসৃষ্টির বিভিন্ন দিকগুলো এক-একটি 'মোটিফ' রূপে দেখিয়েছেন। কয়েকটির উল্লেখ করছি : ভারতীয় পুরাণে : world as egg : A 655 (তুঃ ব্রহ্মজাত অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড)। অন্যত্র : Origin of sky from egg brought from primeval water : A 701. 1। ফিনিস, এসথোনিয়ান, ভারতীয়, হাওয়াই, মাওরি পুরাণ অনুসারে : Cosmic egg, The Universe brought forth from an egg, A 641. গ্রীক ও ইন্দোনেশীয় পুরাণানুসারে : Heaven and earth from egg. They are the two Halves of an egg shell ..A 641. 1.। বোর্নিওর পুরাণ অনুসারে : Earth from egg from bottom of sea recoverd by bird : A. 812 2. ভারতীয় পুরাণ অনুসারে : Earth from egg breaking on primeval water : A 814. 9. ডিমের থেকেই মানুষের জন্ম : Man created from egg formed from sea-foam : 1261. 2. ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই তালিকার দিকে এক নজর তাকালেই দেখা যায়, সৃষ্টির ক্ষেত্রে ডিমের সঙ্গে জলের যোগ প্রায় অচ্ছেদ্য। দ্বিতীয়ত, 'ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব' (The wold-:egg theory) একটি বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব, সব দেশেই তা পরিচিত।

প্রসঙ্গত আরো দু-একটি কথা মনে জাগে। গুহাচারী আদিম মানুষ গুহা-গর্ভে নিরাপদে থাকত, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার আধিক্য থেকে পরিত্রাণ পেত। কখনও কি সেই নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে গুহাকেই একটি ডিমের খোলস বলে তার মনে হয় নি? এরই ফলে, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টির উৎসরূপেও ডিমকে তারা অনায়াসেই নির্দেশ করতে পেরেছে। যেমন, উত্তর-পশ্চিম বোর্ণিও-র সৃষ্টিকথায় : সমুদ্রে পাওয়া দুটি ডিম থেকে দুটি পাখি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করল; পৃথিবীর বেড় আকাশের চেয়ে বড়ো হওয়াতে পৃথিবীকে আকাশের মাপে কুঞ্চিত হতে হল, আর তারই ফলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হল পাহাড়-পর্বত-উপত্যকার। এই পাহাড়ের প্রস্তরময়তার আসঙ্গে শেষ পর্যন্ত ডিম ও পাথর অভিন্ন ও একাত্ম হয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। ডিমের সঙ্গে একপ্রান্তে যুক্ত তরল পদার্থ জল, অপর প্রান্তে কঠিন পদার্থ পাথর। নিউ ব্রিটেনের বেইনিং (the Bainings)-দের সৃষ্টি পুরাণে আছে : আদিতে ছিল কেবল চন্দ্র ও সূর্য। তাদের সন্তানগণ হল—পাথর ও পাখিরা। পাথরগুলো হল পুরুষ, পাখিগুলো নারী; তাদেরই মিলনে প্রথম বেইনিংদের জন্মহয়। (মোটিফ : A

1271.2)। পাখি ও পাথরের যোগ পূর্বের অধ্যায়েই বিস্তৃতভাবে লক্ষ করে এসেছি। এই পাথর থেকেই পাথরের মতো গোলাকার ও দৃঢ় ফলে আদিম-মানস সঞ্চারিত হয়েছে। Gazelle Peninsula-র একটি সৃষ্টিকথায় পাচ্ছি, দেবতা প্রথম দুটি নারীর সৃষ্টি করেছেন, দুটি নারিকেল থেকে।

ওপরে 'Egg-myth' (কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন, সম্ভবত ইংরেজ লোক-চারণিক Andrew Lang) ও 'Egg-lore' সম্পর্কে যে সামান্য আলোচনা করা হল, তা থেকে দেখা যায়, সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে মোট তিনটি দিক ডিমের সঙ্গে জড়িত: ১. স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিধাতা বা দেবতারা ডিম্বজাত ২. পৃথিবীর প্রথম নর বা নারী ডিম্বজাত ৩. পৃথিবীর স্থলভাগ ডিম্বজাত।

এখন এই তিনটি দিকের সামান্য কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত দিই ॥

...৭

ঈজিপশীয় পুরাণে দেখা যায়, সূর্য-দেবতা Ra ডিম্বজাত, এই ডিমটি সৃষ্টি-পূর্বকালীন জলতল থেকে উত্থিত। মৈমনসিংহের গারোপাহাড়ের অধিবাসী, বিশেষ কোনো-কোনো উপজাতি বিশ্বাস করে, প্রথম দেবতা ডিমের থেকে জন্ম নিয়েছেন। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনী এই: এক বুড়ী একটি ডিম পেয়ে তার বাড়িতে এনে সযত্নে রেখে দিল; ক'দিন পরেই তা ফেটে তার থেকে একটি শিশু জন্মাল, জন্মেই সে কথা বলতে থাকল এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে দেবতা বা 'সংস্কৃতি নায়কে' (Culture hero) পরিণত হল। পলিনেশিয়ার সৃষ্টি-কাহিনীতে (Myths and Legends of all Nations : New york, 1960, P. 206 : Herbert Spencer Robinson and Knox Wilso) আছে: সৃষ্টির পূর্বে Taaroa থাকতেন স্বর্গে, ডিমের ভেতর, পরিপূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে। তারপর স্বর্গেই সে ডিম ফেটে তিনি (পুরুষ) বের হন এবং এক কন্যা সৃষ্টি করেন। সেই কন্যার সহায়তায় তিনি পৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশ সৃষ্টি করেন।

ডিমের থেকেই সৃষ্টিকর্তার জন্মলাভ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ ভারতীয় পুরাণেই মেলে। এখানে বিশ্বকে 'ব্রহ্মাণ্ড' বলার মধ্যেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি, ডিম থাকলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জল থাকে, ভারতীয় পুরাণেও তার ব্যতিক্রম নেই। প্রাচীনতম ভারতীয় সৃষ্টিকথা ঋগ্বেদে জল থেকেই বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে (১০, ১২১ ; ১০, ১২৯)। ব্রহ্মা এই জলে 'হিরণ্যগর্ভ' রূপে জন্ম নিয়েছেন। সৃষ্টি-প্রারম্ভিক জলে সৃষ্টি-পুরুষ তাঁর বীর্য নিক্ষেপ করলে, সেই বীর্য এক হিরণ্যবর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হয়, তার থেকেই ব্রহ্মার জন্ম। স্বর্ণডিম্ব বা স্বর্ণগর্ভরূপে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি হয়ে তিনি স্বর্গ ও মর্তকে রক্ষা করেন বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ)। শতপথ ব্রাহ্মণ (৯.১.৬ ; ১—১১), ছান্দোগ্য উপনিষদ (৩.১৯ ; ১—৩), তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২.৮.১৪), মনুস্মৃতি (১.৫—১৩) প্রভৃতিতে

হয় জল নয় ডিমের প্রসঙ্গ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, জল থেকেই স্বর্ণ ডিম্বের সৃষ্টি হল, এবং সেই ডিম থেকে প্রস্ফুট হলেন প্রজাপতি। কিন্তু প্রজাপতির দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, তিনি 'ভূঃ' শব্দ উচ্চারণ করলে, সেই শব্দ থেকেই পৃথিবী সৃষ্টি হল। মনুস্মৃতি অনুসারে, সৃষ্টিকর্তা জলে তাঁর 'বীজ' রাখলেন, তাই স্বর্ণডিম্ব হল। এই ডিমের মধ্যে ব্রহ্মা এক বছর বাস করলেন। সেই ডিম দু-আধখানা হয়ে, একভাগ হল স্বর্গ, অপর ভাগ মর্ত।

ভারতীয় পুরাণের 'Mundane Egg' বা 'Cosmic Egg'-এর এই জলে ভাসমানতার সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপের সৃষ্টি কথার বেশ মিল আছে।

শুধু সৃষ্টি নয়, ধ্বংসের সময়ও বিষ্ণু ডিম্বরূপ ধারণ করে বটপত্রে ভাসমান থাকবেন, ভারতীয় পুরাণে এ কল্পনাও করা হয়েছে। ডিমের সঙ্গে একদিকে জল, অপরদিকে তেমনি গাছকে (আলোচ্য উদাহরণে 'বটপত্র') জড়িত হতে দেখি। সতীন্দ্র নারায়ণ রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে (Trees in rituals and folklore : Journal of the Anthropological Society of Bombay : Vol. XIV, No. 5, PP. 602–603) এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডিমের সঙ্গে গাছের যোগ পাশ্চাত্য লোকচারণিকগণও লক্ষ করেছেন (দ্রঃ Funk Wagnall's standard dictionary of folklore, mythology and legend, New york, 1949, P. 341)।

ডিম থেকে কি করে প্রথম নর-নারীর সৃষ্টি হল, এবার তার দৃষ্টান্ত দু-একটি দিই: পূর্ব আসামের লোক-সমাজে বিশ্বাস আছে, শ্রেষ্ঠ শক্তি-সম্পন্ন দেবতা 'pha' তাঁর এক নারী সহচরী সৃষ্টি করলেন, তাঁর নিজেরই দেহ থেকে। এই স্ত্রীলোকটি চারটি ডিম পেড়ে তাতে তা দিল, কালক্রমে চারটি সন্তানের জন্ম হল। একটি কাছাড়ী কাহিনীতে পাই: সৃষ্টির আদিতে ছিল এক গভীর নীরবতা। সেই স্তব্ধতা থেকে জন্ম হল একটি নর ও একটি নারীর। নারীটি সাতটি ডিম পাড়ল। প্রথম দু'টি ডিম থেকে দেবতা, রাজা ও মানুষের সৃষ্টি হল, এই মানুষরাই কাছাড়ীদের পূর্বপুরুষ। সপ্তম ডিম থেকে উদ্ভূত অপদেবতা সকল রোগব্যাধির হেতু। এই বোড়োদের আর একটি কথায়: ভগবান আহোমগুরু দুটি পাখি সৃষ্টি করলেন। স্ত্রী পাখিটি তিনটি ডিম পাড়ল। হাজার বছর চলে গেল, তথাপি ডিম ফুটল না। স্ত্রী পাখিটি তখন একটি ডিম ভাঙ্গল (এটি বিনতা-কর্তৃক অকালে ডিম ফাটিয়ে অরুণের জন্ম সম্ভাবিত করবার অনুরূপ), আহোমগুরুর নির্দেশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতেই দুষ্ট গ্রহ, পোকা-মাকড় ও গাছের জন্ম হল। বাকী দুটি ডিম থেকে হাজার বছর পর মানুষের জন্ম হল।

এই কথাগুলিতে দেখা যায়, মানুষ ও পাখি—উভয়েই ডিম পেড়েছে; এই ডিম তাই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুই-ই। একই সঙ্গে মানুষ ও রোগব্যাধ ও দুষ্টগ্রহের একই মাতৃজঠরে জন্ম হয়েছে, এই সমতা আদিম মানসের পরিচায়ক। ডিমের সংখ্যা বেজোড়, তা লক্ষ করা দরকার।

নিউজিল্যাণ্ডের সৃষ্টিকথাতে প্রথম মানবের সৃষ্টি ও বসতি ঘটেছে এই ভাবে : একটি ডিম থেকে এক বুড়ো আর এক বুড়ী জন্ম নেয়। সৃষ্টি তখন জলে ডোবা ছিল, আকাশ থেকে একটি পাখি সেই ডিমটি সেই জলে ফেলে দেয় (ঠিক এ ভাবেই পলিনেশিয়ার সৃষ্টি ঘটেছে ; তবে সেখানে মানুষ সৃষ্টির কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে স্থলভাগ সৃষ্টির কথা)। পাখির সক্রিয়তা এখানে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক জোড়া বালক-বালিকাকে সঙ্গে করে, ডিঙি নৌকোয় চেপে ওই বুড়ো-বুড়ী প্রথম অধিবাসী হিসেবে নিউজিল্যাণ্ডে আসে।

অ্যাডমিরালটি দ্বীপের সৃষ্টিকথাতে আছে : একটি ঘুঘু বা ওই ধরণের পাখি কয়েকটি ডিম পাড়ল ; কয়েকটি থেকে একই ধরণের জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হল, বাকী কটি থেকে মানুষ জন্মাল। এই সৃষ্টিকথার সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত আসামের কাছাড়ীদের সৃষ্টিকথার বিশেষ মিল আছে। পাখির ডিম থেকে প্রথম মানুষ জন্মাবার কাহিনী অন্যান্য অঞ্চলেও (যেমন ফিজি, ইস্টার আইল্যাণ্ড, টোরেস প্রণালী, মিনাডানাও) প্রচলিত আছে। ডিম যেখানে পাখির ডিম, আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের মিল তারই মধ্যে।

এইবার গ্রীক ব্যাবিলনীয়, ঈজিপশীয় ও ফিনিসীয় সৃষ্টিপুরাণের কথা বলি। এই চারটি সংস্কৃতির সৃষ্টিকথা নানাভাবে সংমিশ্রিত এবং একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ফিলো (Philo) দেখাতে চেয়েছিলেন, গ্রীক পুরাণ ফিনিসীয় পুরাণের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। এই সব সৃষ্টিতত্ত্বে কোনো সজীব প্রাণী বা জৈব পদার্থ সৃষ্টিকার্য করে নি, তা যেন এক অজৈব, অ-প্রাণ, বস্তুময় পদার্থ দ্বারা, নিজে-নিজেই (এ জন্যেই একে বলা হয় 'Spontaneous creation') সৃষ্টি হয়েছে। বাতাস ও অন্ধকারের মধ্যে যে অমূর্ত এক পিণ্ড থেকে এই সৃষ্টি স্বতই হয়েছে, তা ঈজিপ্টের 'Cosmic egg'-এর ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। অরফিউস (Orpheus) এক সৃষ্টিপুরাণে বিশ্বাস করতেন বলে কথিত হয় : 'কাল' (Time : Kronos) সৃষ্টি করল এক অমূর্ত পিণ্ডাবস্থাকে (chaos) এবং বায়ুতরংগ (Aether)-কে। কালক্রমে 'chaos' থেকে হল একটি উজ্জ্বল ও রজত-শুভ্র ডিম্ব। এই ডিম থেকেই বীর নায়ক Phanes-এর জন্ম হয়।

ডিমের থেকে প্রথম নর বা নারীর সৃষ্টিপ্রসঙ্গে, অপর একটি প্রসঙ্গ স্বতই এসে পড়ে। এইভাবে জন্ম যেহেতু অস্বাভাবিক, স্টিথ টম্পসন সেই হেতু এটিকে তাঁর মোটিফ-সূচীতে 'Un-natural birth' motif বলেছেন, এবং ডিম থেকে মানুষের জন্মকে তিনি T542 সংখ্যাভুক্ত করেছেন। কেবল যে সৃষ্টির প্রথম নর-নারীর এভাবে জন্ম হতে পারে তাই নয়, লোককথা ও লোকচারণাতে বহুশই দেখা যায়, নায়ক-নায়িকা, রাজা বা ওঝার জন্মও হচ্ছে এই ভাবে। সাধারণভাবে জাত মানুষের মধ্যে লোকমানস কোনো অলৌকিকতা এবং অসাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ দেখে না ; তারা চায় রহস্য, তার চায় যাদু, তারা চায় অতিলৌকিকতা ও অলৌকিতা। যিনি রাজা বা ওঝা হবেন, অথবা বিশিষ্ট কাহিনীর নায়ক বা নায়িকা, সাধারণ মানুষের

মতোই তাঁরও জন্ম হলে তাঁকে কিছুই অলৌকিক করে দেখা হল না ; অথচ, তাকে নানা অসাধ্য সাধন করতে হবে, সে জন্যে তাঁকেও অসাধারণ রূপে জন্ম নিতে হবে। এরই ফলে বীর নায়ক Phanes-এর এই প্রকার জন্ম কল্পিত হয়েছে।

এবং সেই একই মনোভাবের ফলে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ স্টেটের রাজবংশের উদ্ভবও ময়ূরের ডিম থেকে হয়েছে বলে কথিত হয়। ময়ূরের ডিম ভেঙ্গে এই রাজবংশের প্রথম রাজার জন্ম হয়েছে বলেই বংশের নাম "ময়ূরভঞ্জ"। এই ব্যাপারটি ময়ূরভঞ্জ স্টেটের বামনঘাটি সাবডিভিশনের 'খান্তা' পরগণার খণ্ডদেউলি গ্রামের কয়েকজন রাখাল বালক-কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি তাম্রফলকে কথিত হয়েছে (The Journal of the Bihar and Orissa Research society : Vol. IV, PP. 172-177 ।

সভ্যতার বিবর্তনের ফলে আদিম মানসও ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। অসম্ভবের প্রতি একটা অবিশ্বাসের প্রবণতা তাদের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এরই ফলে সৃষ্টিকথারও পরিবর্তন ঘটছে। ডিম থেকে মানুষের জন্ম হওয়াকে কোনো-কোনো লোকমানস আর যেন স্বীকার করতে চাইছে না ; কাজেই, মানুষ থেকেই মানুষের জন্ম হওয়াকেই তারা বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক বলে মনে করে, হোক সে মানুষ কাদামাটির তৈরী। Larousse Encyclopaedia of Mythology-র ভূমিকাতে Robert Graves বড়ো চমৎকার করে লিখেছেন : "Even myths of origin get altered or discarded. Promethus' creation of men from clay superseded the hatching of all nature from a world-egg laid by the ancient Mediterranean Dove-goddes Eurynome—a myth common also in Polynesia, where the goddess is called Tangaroa."—P. VI.

পরিশেষে ডিম থেকে এই পৃথিবী সৃষ্ট হবার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করি।

এ বিষয়ের প্রথম উদাহরণ প্রাগুক্ত, অরফিউস-কথিত গ্রীক সৃষ্টিকথাটিকেই নেয়া যেতে পারে। 'কাল' (time)-এর আদেশানুক্রমে যে বিরাট বিশ্বাণ্ড সৃষ্ট হল, তাই দু'আধখানা হয়ে ভেংগে পড়ল। ডিমের মধ্যবর্তী অংশ "প্রেম" হয়ে বেরিয়ে এল, বাকী দুই অর্ধ স্বর্গ ও মর্ত হল। এই ধরনের সৃষ্টিকথায় বৈচিত্র্য বড়োই কম, একই ভঙ্গিতে সব ক'টি রচিত। যে সব 'কথা'য় একটি ডিম ভেংগে দু'আধখানা হয়েছে, অপরিহার্য নিয়মে সেখানে তা থেকে স্বর্গ, মর্ত, সমুদ্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই ডিম কখনো স্বাভাবিক পাখির, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্বর্গের বা গভীর জলতলের। যে সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পাখির ডিম নয়, সে সব ক্ষেত্রে পাখি ওই ডিম আনায়ন, পতন ও ভগ্ন করবার দায়িত্ব নিয়ে সৃষ্টিকর্মে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্বচিৎ, একটির বদলে পাই দুটি ডিম, যেমন উত্তর-পশ্চিম বোর্নিওতে : দুটি পাখি প্রাথমিক সমুদ্রের (the Primeval Sea) ওপর উড়ে, তারপর তাতে ডুব দিয়ে তুলে আনল দু ধরণের ডিম ; তারই একটি থেকে স্বর্গ, অপরটি থেকে মর্ত হল। একটি ভেঙেই দু'আধখানা হোক, আর দুটিই হোক, 'জোড়া' সর্বত্রই থাকে। এই পাখি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্বিশেষ পাখি, তবে সবিশেষ পাখিরও নাম মেলে,

যেমন, ঘুঘু বা শকুনের। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লিখিত উত্তর ভারতের গাড়োয়ালী কথাটির নাম করা যেতে পারে।

এই ধরণের সৃষ্টিকথাব মধ্যে Finno-Ugric সংস্কৃতির পুরাণ Kalevala (Lonrot-কর্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্ট সনে সংগৃহীত ও সংকলিত)-তে কথিত কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য : Luonnotar (আক্ষরিক অর্থ : "প্রকৃতির কন্যা") স্বর্গে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন এবং বন্ধ্যা কৌমার্য নিয়ে কাল কাটাতে-কাটাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আকাশ থেকে নীচে সাগবে ঝাঁপ দিলেন এবং সাগরের শ্বেত ফেনাগ্রে ভেসে রইলেন। সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত তাঁকে প্রজননক্ষম করে তুলল। সাত শ' বছর ধরে তিনি ওভাবেই ভেসে রইলেন। নিজের দুর্ভাগ্যে তিনি যখন বিষাদগ্রস্ত, তখন সেখানে এল একটি ঈগল (মতান্তবে হাঁস)। ঈগলও মহাসমুদ্রে নীড় নির্মাণের চেষ্টা করছিল। Luonnotar-এর হাঁটুর ওপর নীড় নির্মাণ করে সে ডিম পাড়ল, তিন দিন ধবে তা দিল। Luonnotar প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করে পা গুটোতেই ডিমটা পড়ে গেল, একেবাবে পাতালেব অতল গহ্ববে। সেই ডিমটি থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দিক সৃষ্ট হল, বাকীটা Luonnotar নিজেই সৃষ্টি করলেন।

ভেরিয়র এল্‌উইনের 'Myths of the North-East Frontier of India' (Reprint : 1968) বইতে এ বিষয়ে বেশ ক'টি দৃষ্টান্ত মিলবে। যেমন হিলু মিরিদের একটি কথায় (P. 16) দেখানো হয়েছে, মানুষের গর্ভজাত ডিম থেকে কেমন করে পৃথিবী এবং ছোটো-বড়ো পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। (Hrusso Aka)-দের একটি কথায় (P. 17) আছে, কি কবে দুটি ডিমের সংঘর্ষের ফলে তার থেকে বেরিয়ে এল পৃথিবী এবং পৃথিবীর স্বামী আকাশ; ক্ষুদ্রতর স্বামীর বাহুবন্ধনে ধরা দেবার যোগ্য হতে গিয়েই আকাবে বৃহৎ পৃথিবীর কুঞ্চন হল এবং সেই প্রেমের থেকেই সব ধরণের গাছ ও প্রাণীর জন্ম হল। হিলু-মিরিদের আর একটি কথায় (P. 80) প্রদর্শিত হয়েছে, পাহাড়ের সানুদেশে জনৈক উপদেবীর প্রসূত একটির পর একটি ডিম্বজাত জলই কি করে তাবৎ নদীগুলিকে জলপূর্ণ করেছে। ডিমের থেকেই নদীর জল সৃষ্টি হওয়া বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ, যে যে ক্ষেত্রে ডিম থেকেই পৃথিবীর উদ্ভব কল্পিত হয়েছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই ডিম জলজাত বলে কথিত হয়েছে।

বলেছি, ডিম থাকে হয় বহু ঊর্ধ্বলোকে, নয় বহু নিম্নলোকে। এই ডিমের মাধ্যমেই সৃষ্টির সংগে তাই আকাশ ও পাতালের প্রসঙ্গ এভাবে এসে গেছে। এই ডিমের সংগেই জড়িত একদিকে জল, অপর দিকে গাছ। কিভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে ডিমের যোগ আছে, এতক্ষণ তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি॥

অনন্তর এই সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

কিন্তু সর্বত্রই এক বা অভিন্ন ভঙ্গিতে এই ধ্বংস সাধিত হয় নি, সৃষ্টিও যেমন একভাবে হয় নি। এক মহাপ্লাবনের ফলে এই প্রলয় উপস্থিত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি দেখি,—ঠিক যেমন সৃষ্টির আদিতেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জলের অস্তিত্বই উল্লিখিত হয়েছে। এইভাবে, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে এক সাদৃশ্যকে তুলে ধরে, লোকমানস তাদের সামঞ্জস্য-জ্ঞানকেই পরিস্ফুট করেছে।

সৃষ্টির এই ধ্বংসের পরিকল্পনাটিই প্রমাণিত করে, যুগের দিক থেকে এটি পরবর্তী কালীন। বাইবেলের বিশ্ব বিখ্যাত জেনেসিসের কাহিনীর যে প্রাচীন পাঠ পাওয়া গেছে, তাতে ধ্বংসের কথা নেই। তা পাওয়া যায় ইরানীদের পাঠে, ইস্রায়েলীদের পাঠে নয়। ইরানীদের কল্পনায়, জরায় জীর্ণ আদিম সৃষ্টি ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং তার মধ্যে এক নতুনতর পৃথিবী সম্ভাবিত হবে। ইরানীদের দ্বৈতবাদ (দুই বিশ্বের অস্তিত্ব কল্পনা করায়) এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

Monism বা 'একেশ্বরবাদ' যেহেতু 'Dualism' বা 'দ্বৈতবাদের' তুলনায় প্রাচীনতর, সেই হেতু, যতদিন লোকমানসে 'দ্বৈতবাদ' একটি বিশেষ অর্থ নিয়ে না ধরা দিয়েছে, ততদিন দ্বি-বিশ্বের কল্পনাও করা হয় নি, অতএব প্রাথমিক সৃষ্টির ধ্বংসের কথাও ওঠে নি। 'দ্বৈতবাদ' শব্দকে এখানে কোনো দার্শনিক অর্থে কিন্তু নিচ্ছি না, তা হলে একটি বড়ো ভুলের মধ্যে গিয়ে আমরা নিক্ষিপ্ত হবো। 'দ্বৈতবাদ' বলতে বরং 'দ্বৈতানুভূতি' বলা যেতে পারেঃ যেখানে লোকমানস দেহ ও আত্মাকে seperable বলে মনে করে, যেখানে মর্তের সঙ্গে স্বর্গ ও নরককেও কল্পনা করে, যেখানে মৃত পূর্বপুরুষের আত্মাকে জীবিত বর্তমান উত্তর পুরুষের জীবন ও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত থাকতে দেখা যায়, সেখানেই এই দ্বৈতানুভূতি ক্রিয়াশীল। এবং এই মনোভাবের ফল হিসেবেই স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে দুই বিশ্বের পরিকল্পনা এসে গেছে।

ধ্বংসের নানা কারণ প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটি আমার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়, সেটি একটি আকস্মিক ঘটনার ওপর নির্ভরশীলঃ South Shropshire এবং Worcestershire-এ বিশ্বাস আছে, seven whistlers পাখিরা ছ'টিতে মিলে বাকী একটিকে নিরবধি কাল খুঁজে বেড়াচ্ছে, এবং সেটি যদি দৈবাৎ এই ছ'টির সঙ্গে মিলিত হয়, তবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে! পাখির অস্বাভাবিক দেশান্তরী হওয়াকে ইহুদি-রা সৃষ্টি-শেষের লক্ষণ বলে মনে করে থাকে (Motif : A1002.2.4)। অন্যত্র পাইঃ সৃষ্টির শেষ দিনে ঘুঘুর ডিম থেকে তিনটি অশ্ব নির্গত হওয়া (Motif : A1091.1)। আইরিশ পুরাণে Bird describes doomsday : B143.2 ; এ বিশ্বাসের মধ্যে আর কিছু থাক বা নাই থাক, অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে, পাখি সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ের সঙ্গেই সমপরিমাণে যুক্ত।

ধ্বংস সম্পর্কে এই আসন্ন আশঙ্কা বা সচেতন প্রতীক্ষা, এককথায় যাকে বলতে পারি Apprehension, তা কিন্তু কি লৌকিক পুরাণে কি অভিজাত পুরাণে —সর্বত্রই এবং সর্বদাই প্রদত্ত হয়েছে। একটি বড়ো ধ্বংস এগিয়ে আসছে, এই

সংবাদ পেয়ে নোয়া সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' এই ধ্বংসের ইঙ্গিত মনুকে প্রথম দিয়েছে একটি মাছ, মাছটিই মনুকে জলপ্লাবনের কালে রক্ষা করেছে। মহাভারতেও এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি আছে। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসীদের ধ্বংস-কথাতে কোথাও হঠাৎ করে এই ধ্বংস এসে পড়ে নি, আশঙ্কাময় প্রতীক্ষার পর তা এসেছে।

ভারতীয় পুরাণে ধ্বংস সৃষ্টিরই অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গীভূত একটি দিক। এখানে ব্রহ্মা প্রতিদিন সৃষ্টি করে প্রতিদিনই ধ্বংস করেন। ব্রহ্মার এক-একটি দিনকে বলে 'কল্প'। কল্প বা দিন হল ৪,৩২০,000,000 পার্থিব বৎসরের সমান। এই সময়টি ১,000 মহাযুগে বিভক্ত, প্রতি ভাগে চারটি করে যুগ : সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। যতই যুগ এগিয়েছে, ততই শুভ বোধ ও সুনীতির হ্রস্বায়ন ঘটেছে, তাই সত্য যুগের ধর্মের চার পা, ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে কলিতে এক পা-য়ে এসে ঠেকেছে। ভাগবতে বলা হয়েছে, দুর্নীতির ভরা পূর্ণ হলে কলিযুগে নানাভাবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। কল্পনা করা হয়েছে : বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন। তিনি আসবেন যোদ্ধার বেশে, হাতে ধ্বংসের তরবারি ও চক্র নিয়ে, একটি পক্ষবান্ শ্বেত অশ্বে চেপে। ঘোড়াটি সম্মুখের ডান পা উঁচিয়ে আছে, সেই পা-টি ফেললেই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রাচীন গ্রীক কবির কল্পনায় সৃষ্টির স্থায়িত্বকাল পাঁচটি যুগে বিভক্ত। পারস্যের যুগ-বিভাগের কথা আগেই বলেছি।

এ যেমন পূর্ব নির্দিষ্ট ধ্বংস, তেমনি আকস্মিক এবং অনিয়মিত ধ্বংসও আছে। দেবরোষ এসব ধ্বংসের মূল কারণ। খেয়ালী দেবতার প্রীতি বালির বাঁধের মতো, সহজেই তিনি রুষ্ট হয়ে জলে ডুবিয়ে সৃষ্টি ভাসিয়ে দেন, নয়ত আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে তোলেন ; ক্ষণপরেই তুচ্ছতর কারণে তুষ্ট হয়ে ফের সৃষ্টি-কর্মে আনন্দময় আত্মনিয়োগ করে থাকেন, এবং আত্মগ্লানিতে নিজেই কাতর হয়ে ওঠেন। কখনো বা এই ধ্বংসকর্মের জন্যে তিনি স্বজনকর্তৃক নিন্দিতও হয়ে থাকেন। এ বিষয়ে মুণ্ডা ও খাড়িয়াদের দুটি ধ্বংসকথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

মুণ্ডাদের একটি ধ্বংসকথাতে আছে : সিংবোঙ্গা একদা প্রচণ্ড অগ্নি বর্ষণ করে পৃথিবী ধ্বংস করলেন। কিন্তু তাঁর ভগ্নি 'নাগে এরা' একটি ঝর্ণার তলায় এক ভাই ও এক বোনকে বাঁচিয়ে রাখলেন। অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে সিংবোঙ্গা স্ত্রী-কর্তৃক নিন্দিত হলেন। চড়ুই, কাঠঠোকরা ও অন্যান্য পাখিদের তিনি প্রেরণ করলেন দূত হিসেবে, কেউ বেঁচে আছে কিনা দেখতে। কাক 'নাগে এরা' এবং ওই ভাই-বোনের বেঁচে থাকবার সংবাদ সিংবোঙ্গাকে দিল। ..

খাড়িয়াদের ধ্বংস-কাহিনী এমনতর : শ্রেষ্ঠ দেবতা Ponomosor কাদামাটি দিয়ে দুটি নর-নারী তৈরি করেছিলেন, তারপর অনেক মানুষ জন্মাল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা ফলন্ত গাছ কাটতে থাকলে তিনি রেগে গিয়ে প্রথম এক প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করলেন (তাতে গাছের পাতারা সব পাখিতে পরিণত হয়ে গেল) ; দ্বিতীয় বার রেগে

জলপ্লাবন ঘটালেন, ক'জন মাত্র লোক পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে রইল ; তৃতীয় আর একবার রেগে তিনি অগ্নিবর্ষণ করে সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেললেন। অনন্তর প্রথামত, তিনি অনুতপ্ত হলেন, কাককে প্রেরণ করলেন দূত হিসেবে। কাক এসে খবর দিলে, পৃথিবীতে তখন কেবল এক ভাই আর এক বোন বেঁচে আছে।

সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, প্রাণিজগৎ একেবার নিশ্চিহ্ন হয় না ; এবং সৃষ্টিকার্যে যেমন দ্বন্দ্ব-প্রতিরোধ দেখা গিয়েছিল, ধ্বংসকার্যের বেলাতেও তাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দূত হিসেবে প্রেরিত হচ্ছে —কাক। অন্য পাখি প্রেরিত হলেও সাফল্য অর্জন করেছে কাকই বেশি। বাইবেলের কাহিনীতে কাক ফিরে আসে নি বটে, কিন্তু অন্যত্র ফিরে এসেছে। স্টিথ টম্পসনের মোটিফ-সূচী অনুসারে এটিকে এই ক'টি দিক থেকে লক্ষ করা যায় : Helpful bird. B450. Bird as messenger : B 291.1. Bird scouts sent out from ark : A1021.2. Vulture sent out as scout to see whether earth has cooled from world-fire : A 1039.1. Raven does not return to ark in obediance to Noah : Punished : A2234.1.1. Ravens as attendants of gods : A 165.0.1. Creator sends crow, after creating her to scout for earth nucleus : A 812.3.

কাককে দূত হিসেবে সর্বাধিক পরিমাণে পাঠাবার কারণ আছে। প্রাচীন ভারতে, বিশেষতঃ বৌদ্ধসাহিত্যে 'দিশাকাকে'র উল্লেখ পাওয়া যায় সমুদ্রযাত্রাকারীরা দিক ও স্থল নির্ণয়ের জন্যে কাক ছেড়ে দিত ; কাক তার 'নিসর্গ প্রতিভা' দিয়ে স্থলভাগের দিকে উড়ে যেত, তাকে অনুসরণ করে স্থলের সন্ধান পাওয়া যেত। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে ভারতের নাবিকদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন ছিল। শোনা যায়, আইসল্যাণ্ড নাকি এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে। আবহাওয়া সম্পর্কে কাকের প্রতিভাও এই সঙ্গে কাজ করেছে। টিউটনিক পুরাণের সবচেয়ে মান্য দেবতা wodin বা odin-এর দু'কাঁধে বসে থাকত দুটি কাক। কাক দুটির একটির নাম 'Hugin' (অর্থাৎ 'চিন্তা'), অপরটির নাম 'Munin' (অর্থাৎ "স্মৃতি")। প্রতিদিন ওডিন কাক দুটিকে তাঁর দূতরূপে পৃথিবীর দূরতম প্রতিটি অঞ্চলে প্রেরণ করতেন ; জীবিত ও মৃত সকল প্রাণীর কাছ থেকে সর্বপ্রকার সংবাদ সংগ্রহ করে কাক দুটি ওডিনের কানে ফিসফিস করে তাই বলত। কাকের এই দেব-সান্নিধ্য "ধর্মপূজা পদ্ধতি"-তেও দেখা যায়। এখানে কাক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, খোদা প্রথম কোথায় জন্ম নেবেন ; ধর্ম তার উত্তর দিচ্ছেন।

পারস্য সৃষ্টি-কাহিনীতে কাক-বিশেষকে দৌত্যকাজ করতে দেখা গেছে। পারস্য সৃষ্টি-কাহিনীতে আগে গাছপালা, তারপর আগুন, তারপর পশুপাখি এবং সবার শেষে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। Ahura Mazda এক শক্তিশালী ষাঁড়কে

সৃষ্টি করলেন। ষাঁড়টি একটি দৈত্য-বিশেষ। এমন সময় জন্মালেন মিথ্রদেব। তাঁর এক হাতে একটি মশাল, অন্য হাতে ছুরি। এক নদীর ধারে, একটি ডুমুর গাছের তলায়, পাহাড় থেকে তাঁর জন্ম হল। মিথ্র সূর্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। তারপর সেই দৈত্য ষাঁড়টিকে শিং ধরে শায়েস্তা করলেন, তার পিঠে চড়ে বসলেন। তখন সূর্যের কাছ থেকে দূতরূপে এল একটি দাঁড়কাক ('Verethragna-raven'), সে বলল, ছুরি দিয়ে সেই ষাঁড়কে হত্যা করতে। মিথ্র তাই করলে সেই ষাঁড়ের দেহ ও রক্ত থেকে নানা ধরণের জীবজন্তুর উদ্ভব হল। লক্ষ করি, এই বিশেষ সৃষ্টির পূর্বেই কাকটির অস্তিত্ব ছিল ; এবং কাকের সঙ্গে সূর্যের সংযোগ আবার দেখা গেল।

অবশ্য নির্বিশেষ পাখিকেও দেবতার দূত হতে দেখা যায়, যেমন, আফ্রিকার বুশম্যানদের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'Cagn'-এর দূত হল পাখিরা। পাখিরাই চারদিকের সংবাদ তাঁকে জানাত।

সৃষ্টিকার্যে কাকের কর্ম দুটি : এক, জলমগ্ন স্থলভাগ জেগে উঠেছে কি না, সে সংবাদ দেবতাকে জানানো ; এখানে কাকের ভূমিকা নিতান্তই নিষ্ক্রিয় এবং কেবলই সংবাদদাতার। দুই, ধ্বংসোত্তর সৃষ্টির জন্যে কাককে মাটি সংগ্রহ করে আনতে বলা। স্বাভাবিক কারণেই কাক এই কার্যে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ, সে জলচারী পাখি নয়, অতএব মাটি আনাও তার পক্ষে অসম্ভব। তথাপি কেন কাককেই মাটি আনতে বলা ? কাক দেবতার দূত ও অনুচর, আবহাওয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ, এবং নানা আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে কল্পিত ; সবচেয়ে বড়ো যোগ সূর্যের সঙ্গে, যে সূর্য জল ও বৃষ্টির মূল কারণ। এই সূর্যের সংস্পর্শেই হাঁস ও কাক অভিন্ন হয়েছে, নতুবা জলচারী হাঁসকেই মাটি সংগ্রহ করে আনতে বলা প্রাচীনতর, আগেই সেকথা বলেছি। সূর্যের সম্পৃক্ততার ফলেই এসেছে শ্যেন-বাজ-ঈগলের কথা।

কিন্তু যেখানে সৃষ্টি আগুনে পুড়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, সেখানে দূত হিসেবে পাই শকুনকে, যদিও কাকের সঙ্গেও অগ্নির যোগ পূর্বে লক্ষ করে এসেছি।

জল ও আগুন ছাড়া, কদাচিৎ দেখা যায়, কোনো বিশেষ প্রাণী বা দেবতা সৃষ্টিকে গিলে খেয়ে সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছেন। যেমন, আফ্রিকার বুশম্যানদের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'I Kaggen' (Cagn)-এর স্ত্রী Hyrax একদা প্রাণিসহ গোটা পৃথিবীটাই গিলে খেয়েছিলেন, পরে অবশ্য বমন করে তা বের করে দেন। মধ্যভারতের থেকেও এর দৃষ্টান্ত মেলে। মধ্যভারতের গদাবা উপজাতির কাহিনীতে এক 'দানো' কর্তৃক এবং মুরিয়া উপজাতির কাহিনীতে এক কীট কর্তৃক পৃথিবী গিলিত হবার কথা আছে। নলরাজা ও গিছনা রাজার মাটি গিলে খাবার কথা স্মরণ করবার মতো, এই প্রসঙ্গে। কাক-সহ কাঁকড়া বা কূর্ম সেই মাটি উদ্ধার করে এনেছিল।

আমেরিকার Algonquin গোষ্ঠীর Montagnais-দের সৃষ্টিকথায় আছে : Michabo (ইনি "The Great Hare")-র শিকার-সহচর নেকড়েরা একদা একটি

দীঘিতে পড়ে ডুবে যায়, তিনি একটি পাখির মারফত সে সংবাদ পেয়ে দীঘিতে যেই নেমেছেন, অমনি প্রবল বন্যায় সৃষ্টি ডুবে গেল। পৃথিবী আবার সৃষ্টি করবার জন্যে দাঁড়কাককে তিনি মাটি আনতে বললেন, কিন্তু কাক চেষ্টা করেও তা আনতে পারল না। শেষে ইঁদুর আনল সেই মাটি।

'ম্যাজিক' বা 'যাদু' সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক সাধারণ ব্যাপার। এর দুটি উদাহরণ দিই। ইন্দোনেশিয়া, পলিনেশিয়া এবং বিশেষতঃ মেলানেশিয়াতে ও অস্ট্রেলিয়াতে (বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায়) পশুপাখি সম্পর্কীয় পুরাণ খুবই মেলে। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াস্থিত এক উপজাতীয়দের 'কথা'-য় আছে: মহাপ্লাবনের কালে সব মানুষ পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছিল; জল বেড়ে শেষে পাহাড়ের মাথাকেও ডুবিয়ে দিল। সেই জল যেই সব মানুষের পাদস্পর্শ করল, অমনি সবাই কৃষ্ণ মরালে পরিণত হল। এতে দুটি তথ্য নিষ্কাশিত হয়ঃ প্রথমত, এই জল যাদুগুণ সম্পন্ন; দ্বিতীয়তঃ, ধ্বংসকালে প্রাণীর ব্যাপক রূপান্তর (Transformati n) গ্রহণ।

ধ্বংসকালে এই ব্যাপক রূপান্তর আসাম ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ বিভিন্ন উপজাতির কাহিনীতে মেলে, তবে তা একটু অন্য ভাবে। এক সর্ব-ব্যাপক 'অন্ধকার' দ্বারা এই পৃথিবী আবৃত হবার কথা বলা হয়েছে। লাখের-দেব সৃষ্টিকথায় বলা হয়েছে, কুকুর সূর্যকে গ্রাস করলে সে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এই 'অন্ধকার'কে বলা হয়েছে 'Awk,' কখনো 'Thimzing'। তখন বহু মানুষের পাখিতে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। স্টিথ টম্পসন এটি একটি মোটিফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন: Great darkness due to awk swallowing the sun : A 721.2.1. এই ধরণের অপর একটি মোটিফ : Sun swallowed and spit out In theft of sun, the ravan (or devil) thus succeeds : A 721. 2.

যাই হোক, জলের অন্তর্নিহিত যাদুধর্ম একদিকে যেমন প্রলয়কালে রূপান্তর সাধন করেছে, অপরদিকে তেমনি নতুন মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার ক্যানারিয়ানদের 'কথা-'য় পাই : প্রবল প্লাবনে দুই ভাই মাত্র বাঁচল। তারা 'Huaca-ynan' পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খাদ্যাভাব হলে, দুটি ম্যাকাও (Macaw) পাখি ক্যানারিয়ান রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের অনুপস্থিতিতে রেঁধে-বেড়ে রেখে যেত। একদিন ছোটো পাখিটা ধরা পড়ল, তাকে দু ভাই বিয়ে করল। তাদের সন্তানরাই হল ক্যানারিয়ানরা। সেই থেকে ওরা 'Huaca ynan' পাহাড়কে পবিত্র বলে মনে করে, ম্যাকাও পাখিকে পূজো করে এবং এর পালক দিয়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে দেহ-সজ্জা করে। জলপ্লাবন কেবল নব মানবগোষ্ঠীর জন্ম দেয় নি, তাদের 'সংস্কৃতি'রও অঙ্গীভূত হয়ে গেছে এখানে।

ভারতীয় ধ্বংস-কাহিনীর একাধিক উদাহরণ ভেরিয়র এলউইন সংগৃহীত 'Myths of middle India' (1949) এবং 'Myths of the North-east Frontier of India' (Reprinted : 19 8) বই দুখানিতে মজুদ আছে। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। তবে, সেগুলিকে অবলম্বন করে দু-একটি মন্তব্য করা যেতে পারে :

১. মধ্যভারতের সৃষ্টিকথাতে দেবতার দূত হিসেবে কাককেই বেশিবার পাওয়া যায়, উত্তর-পূর্ব আসাম সীমান্তের কথায়, তেমনি মেলে মুরগীকে। আসলে কাক ও মুরগী উভয়েই সূর্য-সম্পৃক্ত। দূত হিসেবে যে কাককে প্রেরণ করা হয়েছে, সে কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমন সাধারণ, স্বাভাবিক পাখি, তেমনি কয়েকটি ক্ষেত্রে তার উদ্ভব দেবতার গাত্র-মল থেকে, অতএব অস্বাভাবিক ও যাদুময়। কাকের পরবর্তী দূত হিসেবে একটি কাহিনীতে পাওয়া যায় ঈগলকে, কাক ও ঈগল বহুশই এক হয়ে গেছে। একটিতে চিলকেও দূত হিসেবে দেখা যায়, কিন্তু সে চিল দেবতার গাত্রমলজাত। একটিতে দেখি চোখের পিচুটি থেকে ময়না পাখি তৈরি করতে।

২. কাক সর্বত্রই শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় নি; একটি কাহিনীতে কাক দেবতাকে মিথ্যে সংবাদ দিয়েছে, এবং সে মিথ্যে সংবাদ দেবার কারণ কাকের লোল্য। এই লোল্য ঈগলের মধ্যেও দেখা গেছে। কাক ও ঈগলের এই অধঃপতন থেকে মনে হয়, এই দুটি পাখির ওপর দেবত্ব আরোপে যেন একটি বাধা এসে পড়েছে, অন্তত ওই জনগোষ্ঠীতে কাক বা ঈগল যে তার 'টোটেম' হিসেবে স্বীকৃতি পেতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তা বোঝা যায়।

৩. কাক কেঁচোকে এনে দিয়েছে, কেঁচোর পেট চিরে মাটি নিয়ে নতুন সৃষ্টি হয়েছে; কিংবা কূর্মের কাছ থেকে মাটি নিয়ে এসেছে।

৪. উত্তর-পূর্ব আসাম সীমান্তে ধ্বংসোত্তর সৃষ্টিতে প্রথম প্রাণী রূপে মুরগীকে দেখা যায়।

৫. মধ্যভারতের একটি কাহিনীতে কাক স্বর্গে গেছে।

৬. গাছ ও পাহাড় অধিকাংশ কথাতেই আছে। সৃষ্টিকাহিনীতে গাছের সঙ্গে পাখির যোগ সারা পৃথিবীতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি মোটিফের নাম করা যায়: Golden cock in earth-tree : A ৪7৪. ১. 6 ; wise eagle in the earth-tree : A ৪78. 3. 4. আবেস্তায় শ্বেতবর্ণের 'হাওমা' বৃক্ষ সৃষ্টির প্রথম দিনে Vourokash সমুদ্র থেকে উদ্ভূত। ওই বৃক্ষকে বলা হয়েছে 'the tree of solar eagle' (পাখিটি হল 'Soena', ভারতীয় শ্যেন)। জলপ্লাবনের ফলে উচ্চবৃক্ষে আশ্রয় নেওয়া কিংবা দেবতার দূত হয়ে পাখির গাছে বসা, কেবল ভারতেই নয়, পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত আন্দামানের সৃষ্টিকথা থেকে (Remarks on the Andaman Islanders and their country : The Indian Antiquary, May, 1925, P. ৪6 : R C. Temple) দিচ্ছি: মহাপ্লাবনের ফলে মানুষ ও পাখি সবাই গাছের ওপর আশ্রয় নিয়েছিল; বন্যার শেষে মানুষ নীচে নেমে এসেছে, পাখি আজও গাছেই আছে॥
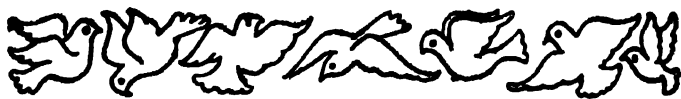
সৃষ্টি ও ধ্বংসোত্তর সৃষ্টির সঙ্গে পাখির সংযোগ এতক্ষণ প্রদর্শিত হল। কিন্তু সৃষ্টি সংরক্ষণ ও অরক্ষণের মধ্যেও পাখির বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সক্রিয়তা সঞ্চারিত হয়েছে, দেখা যায়। এই বোধের ফলে পাখিকে সৃষ্টি 'চুরি' করতেও দেখি। এই সব কারণেই মানুষ নদী-পাহাড় এবং স্থানের নামকরণে ও নামচয়নে পাখিকেই স্মরণ করেছে।

মধ্যভারতের ধনওয়ার উপজাতীয়দের (বরভটা, আপবোরা জমিদারী) মধ্যে বিশ্বাস আছে, পৃথিবী যখন স্থির হয় নি, মা বসুন্ধরা তখন পাখিদের সৃষ্টি করলেন। তখন পাখিদের ছিল চারটে করে পা। কিন্তু মা বসুন্ধরা পরে তাদের দুটি করে পা নিয়ে নিলেন এবং তাদের পৃথিবীর তলদেশে পাঠিয়ে দিলেন। স্তম্ভ বা খুঁটির ওপর যেমন ঘর দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি কোটি-কোটি পাখির পায়ের ওপর এই পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর ওপরেও এটি ঘটেছে। উত্তর বাঙলার রাজবংশীদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, খঞ্জন যে মাটিতে বসেই ঘনঘন ল্যাজ নাড়ে, তার আসল কারণ, ল্যাজ নেড়ে-নেড়ে সে অনুভব করতে চায়, পৃথিবী তার ভার বহনে সক্ষম কি না। এই জন্যেই এ পাখিকে সেখানে বলে 'ভুঁইদাকো'। জাতককাহিনীর 'ধর্মধ্বজজা কে' (সং ৩৮৪) এই ব্যাপারটি একটি কাকের প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, একটি কাক সর্বদাই এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকত, কেননা তার ভয় ছিল, পাছে সে দুটি পা-ই রাখলে এ পৃথিবী ভেঙে পড়ে!

কেল্টিক পুরাণের 'the lonely Crane of Inniskea'-র কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। গল্দের সমুদ্র দেবতা Ler-এর প্রথমাপত্নী Aebh একটি কন্যা ও তিনটি পুত্র রেখে মারা গেলে, Ler তখন Aebh-এর সহোদরা Aeife-কে বিয়ে করলেন। Aeife সন্তানহীনা ছিলেন, তাই বোন-সতীনের সন্তানদের মন্ত্র পড়ে চারটি মরালে পরিণত করে দিলেন। আরো অভিশাপ দিলেন, তিনশ' বছর করে তিনটি জায়গায় তাদের এভাবে কাটাতে হবে। Ler এর সন্তানদের অভিশাপের একটি দশা কেটেছে Mayo সাগরের পরপারে ইনিস্‌কিয়া দ্বীপে। সেখানে এক নিঃসঙ্গ সারস তাদের বান্ধব ছিল। এই সারসটি Wonders of Ireland নামে প্রখ্যাত। এটি "...has lived upon that island ever since the beginning of the world, and will be still sitting there on the day of judgment"—Celtic myth and legend poetry and Romance, p. 146.

এবারে পাখির স্থান 'চুরি'র কথা বলি। পাখির মধ্যে চৌর্যবৃত্তি খুবই লক্ষিত হয়, লোককথায় পাখির এই বৃত্তিটি একটি 'মোটিফ' রূপে পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়েছে।

কার নিকোবরের একটি 'কথা'য় (Folk-tales of the Car Nicobarese : The Indian Antiquary, August, 1921, p 236-237 : the Rev. G. White head) আছে : বহুপূর্বে কার নিকোবরের দক্ষিণ উপকূলে Kakana নামে একটি দ্বীপ ছিল। একটি Sa Ka (এক ধরণের কীটভোজী ছোটো পাখি) সেই দ্বীপটি চুরি করে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চাইল। এক দিন রাতে দ্বীপটি সে মাথায় করে নিজের দেশের দিকে নিয়ে চলল। কিন্তু তার তুলনায় দ্বীপটি বেশি ভারি বলে সে দ্রুত চলতে পারছিল না ; কাজেই গন্তব্য স্থলে পৌঁছবার পূর্বেই রাত শেষ হয়ে গেল। লোক-লজ্জার ভয়ে দ্বীপটিকে সে তাড়াতাড়ি যেমন-তেমন করে কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তা উল্টে গেল। দ্বীপটি আজও সেই ভাবেই পড়ে আছে, এটি নিশানা হিসেবে কাজ করে। (মোটিফ : Bird steals island : B 172.11 ।

দৈত্যকর্তৃক সৃষ্টি উল্টে দিয়ে তা ধ্বংস করবার নজীর মধ্যভারতের কাহিনীতে পেয়েছি। এখানে ধ্বংসের বাসনা নেই, আছে তা অধিকার করবার কামনা। একটি অঞ্চলকে মাথায় করে বহন করবার সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্ত 'হিন্দুস্থানী উপকথা' (অনুবাদিকা : সীতা ও শান্তাদেবী : অভ্যুদয়সংস্করণ : ১৯৬৭)র "রানে ও জাট চাষার কথা" (পৃ. ১১—১৯) রচনায় পাই।

পাখির বুদ্ধিতে সৃষ্টি রক্ষা পাবার একটি কাহিনী আসামের খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে : শিলংয়ের আট-দশ মাইল পশ্চিমে, খাসিয়া উপত্যকায়, একটি পাহাড়ের মাথায় একটি গাছ,—'আই-ঈ- আই' গাছ। গাছটি এত ঘন-পল্লব যে রোদ ভেদ করে না, কাজেই তার জন্যে জমিতে কোথাও শস্য জন্মায় না। একদল কাঠুরিয়া সেই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে ; কিন্তু প্রতিদিনই তারা দেখে আগের দিনের কাটা অংশ পরদিন জোড়া লেগে যায়। একটি ধূসর রঙের ছোটো পাখি ওদের বলল, 'ইউক্লা' নামে একটি বাঘ এসে প্রতিরাতে কাটা অংশ চেটে জোড়া লাগিয়ে দেয়। পাখিটির পরামর্শ অনুসারে সেদিন কাটা অংশে তারা একটি কুড়ুল রেখে দিল। বাঘ সে রাতে কাটা অংশ চাটতে এসে সেই কুড়ুলে আহত হয়ে অন্যরাজ্যে চলে গেল। অবশেষে গাছটি কাটা সম্ভব হল, আবার চাষবাস হতে লাগল, পাখির বুদ্ধিতেই সৃষ্টি রক্ষা পেল।

লোহিত উপত্যকার লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের কামন মিশমি-দের 'কথা'তে আছে : দুই শক্তিশালী ভাই, Draku এবং Supaidang, পৃথিবীর যাবতীয় পাহাড়-পর্বত সমান করে পৃথিবীকে সমতলভূমিতে পরিণত করতে লাগল ; cherrai নামে একটি ছোটো পাখি দেখল, এই ভাবে পাহাড়-পর্বত ভেঙে ফেললে সমূহ সর্বনাশ ঘটবে। পাখিটি তখন বুদ্ধি করে দুই ভাইকে তাদের পিতা-মাতা ও স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, ওরা এই প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক কর্ম ফেলে বাড়ি ফিরে গেল, সৃষ্টি রক্ষা পেল।

আমেরিকার Iroquoi-দের পুরাকথায় Hino, নামে এক দানব-দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। Hino-র অনুচর ছিল এক বিরাট ঈগল, নাম— oshadagea ; ঈগলটির

নিবাস ছিল পশ্চিমাকাশে, সে আপন পিঠের গহ্বরে একটি বিরাট শিশিরের দীঘি বহন করে বেড়াত। ধ্বংসের আগুনে এই পৃথিবী যখন পুড়ে খাক্ হতে থাকে, oshadagea তখন ঊর্দ্ধ আকাশে উঠে দুই পাখা ছড়িয়ে, তার শিশিরের দীঘি থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ফেলে পৃথিবীর শ্যামলিমা ফিরিয়ে আনে। Algonquin Indian-দের মধ্যেও এক পাখির কল্পনা করা হয়েছে, যে পৃথিবীকে শস্যশ্যামল করে রাখে।

এস্কিমোদের জলপ্লাবনের কাহিনীতে দেখা যায়, জলপ্লাবনের পর প্রচণ্ড শীতে মানুষ ও প্রাণীরা মৃতকল্প হয়ে পড়ল। তখন একটি ওঝা, নাম তার Anodijum (শব্দটির আক্ষরিক অর্থ: 'পেচকের পুত্র') প্রলয়সৃষ্টিকারী ঝড়কে থামতে আজ্ঞা করলেই ঝড় থেমে গেল। 'পেচকের পুত্র' এই ভাবে সৃষ্টি রক্ষা করল।

সৃষ্টি-সংরক্ষণের ফলেই কোনো স্থানের আবিষ্কারে বা তার নাম-করণে পাখিকে দেখা যায়। ছোটো একটি নদীর তীরে রোম নগরী প্রতিষ্ঠার পেছনে Mars-এর দুই যমজ সন্তান Romulus এবং Remus-এর দুটি গিরিশৃঙ্গে উপবেশন করে, পাখির গতিবিধি দর্শন কি ভাবে কাজ করেছিল, সকলেরই তা জানা। পাখির গতিবিধি থেকেই এই দুই ভাই রোমের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছিল। আকাশের যে দিকটি গণনাকারী ওঝা Romulus-এর বলে নির্দেশ করে, সে দিকে সে দেখতে পায় বারোটি শকুন; Remus দেখতে পায় তার দিকে ছ'টি শকুন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণে ছ'টি দ্বীপের নাম মেলে, তার মধ্যে একটি 'ক্রৌঞ্চদ্বীপ'। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'পৌরাণিক উপাখ্যান' (মাঘ, ১৩৬১) বইতে লিখেছেন: "ককেশাস পর্বতের নাম ক্রৌঞ্চ। হয়ত ক্রৌঞ্চ পক্ষীর আকারে ককেশাস পর্বত দেখিয়া ক্রৌঞ্চ,…" (পৃ ১১)।

ক্রৌঞ্চ পর্বত হিমালয়ের পুত্র, মতান্তরে পৌত্র রূপেও উল্লিখিত হয়। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে, বলির পুত্র বাণাসুর এই ক্রৌঞ্চ-পর্বত আশ্রয় করে দেবগণকে পর্যুদস্ত করলে, কার্তিকেয় শক্তিদ্বারা এই পর্বত ভেদ করে দেন। এই ভিন্নস্থানকে বলে 'ক্রৌঞ্চরন্ধ্র'। বর্ষাকালে এই পথ দিয়েই হাঁসেরা মেরুপর্বত ও মানসসরোবরে যায় বলে এটিকে 'হংসদ্বার'ও বলে। মেঘদূতে কালিদাস এটিকে 'হংসদ্বার' বলেই উল্লেখ করেছেন,

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্ ॥

পাখির এই আসা-যাওয়ার সংস্রব থেকেই এখানে পাহাড়ের এই নামকরণ হয়েছে; ঠিক যেমন, পিকিং (peking, peiping)-এর প্রাচীন বাড়ী ও অট্টালিকাগুলিতে প্রভূত পরিমাণে আবাবিলের বাস দেখে পিকিং শহরের আর একটি নাম হয়েছে, "the city of swallows"।

মৈমনসিংহ অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নাম—'কাগমারী'। (তুলনীয়, মোটিফ: Hills from flapping of primeval bird: A 961. 1.) নদী ও জলের সঙ্গে

পাখির যোগ স্পষ্ট হয় এই নামগুলি থেকে : কাকদ্বীপ। কাকখালি (কোচবিহারের একটি নদীর নাম)। 'ময়ূরাক্ষী,' 'কপোতাক্ষ' প্রভৃতি নাম তো অতি পরিচিতই।

অন্যান্য কয়েকটি স্থান ও নদীর নাম এই : কাক : কাগাপাড়া (কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে) ;

বক : বকখালি। বগজুড়ি (ঢাকা)। বগলাহাগা, বগিলাহাগা (কোচবিহার)। বগারমেলা, বগিলাগাড়ী (বগুড়া)। বকচর, বকদ্বীপ (যশোহর-খুলনা)।

চিল : চিলাপাথার, চিলাপাতা (জলপাইগুড়ি)। চিলমারী (রঙপুর)। চিলাডিঙ্গি (হুগলি)।

শকুন : শিগনীহাগা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'সুগুনী' পাই)। গিধনী (ঝাড়খন্ড)।

প্যাঁচা : প্যাঁচাকোলা (বাঁকুড়া)।

ঘুঘু, পায়রা : ঘুঘুডাঙ্গা। পায়রাডাঙ্গা (২৪ পরগণা)। পারো কাটা (নদী, জলপাইগুড়ি)

হাঁস : পাকুড় হাঁস (বীরভূম)। হাঁসরাজ (বগুড়া)। হাঁসড়া (বীরভূম)। হাঁসাডো (ঢাকা)। 'কথাসরিৎসাগরে'র একটি কাহিনীতে পশ্চিম সমুদ্রে অবস্থিত 'হংস' দ্বীপের নাম উল্লিখিত আছে।

শুক, ময়না, চন্দনা : ময়না (মেদিনীপুর)। চন্দনা (নদীর নাম)। শুকনিবাস। ময়নাপুর (আরামবাগ)। শুকজোড়া (সাঁওতাল পরগণা)। সিয়ান শুক বাজার (মেদিনীপুর)।

মুরগী : মুরগাঘুটু (ঝাড়খন্ড)।

বাবুই : বাবুইজোড় (বীরভূম, খয়রা থানা)।

ময়ূর : ময়ূরেশ্বর, ময়ূর ঝর্ণা, ময়ূর নাচন (বীরভূম, বাঁকুড়া)।

এ ছাড়া জলপাইগুড়ি থেকে পাই : হরিতালগুড়ি, ডাউকিমারী, পানিকোয়াড়ী। নিউজিল্যান্ডের নামান্তর 'Kiwi', এই নামের এক ধরণের ছোট পাখা-অলা পাখির প্রাচুর্যের জন্যই এই নাম হয়েছে। পাখি থেকে যেমন স্থানের নাম হয়, স্থান থেকেও তেমনি পাখির নামকরণ হয়ে থাকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে ভারত থেকে পাওয়া কয়েকটি মোটিফের উল্লেখ করি : Village founded on spot when cock crows : B 155 2 1.; Birds indicate the place where a town is to be built : B 153 2. 3; Land of pigeons : B 222. 1; Land of peacock : B 222. 2; Land of Parakeets : B 222. 3.; Land of Parrots : B 222.4. ||

...১০...

মানুষের সাংস্কৃতিক জগতের দু-একটি বিষয়ের আবিষ্কার ও সৃষ্টির সঙ্গেও পাখি জড়িত। মানুষের খাদ্য, পানীয় ও সাংসারিক প্রয়োজনে আগুনের আবিষ্কারকে এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা যায়। ভাষার কথাও বলা যায়।

খাদ্য বলতে শস্য, এবং তা জন্মায় গাছে। পাখির সঙ্গে গাছের সংযোগের কথা পূর্ববর্তী পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে খাড়িয়াদের একটি ধ্বংস-কাহিনীতে, কি করে গাছের পাতা থেকেই পাখির সৃষ্টি হল, তার কথা বলেছি। একটি বৈগা কথায় শুক বা টিয়ে পাখি সৃষ্টি করা হয়েছে গাছ বিশেষের পাতা দিয়ে এবং পাখিটির পাখা তৈরি করা হয়েছে পদ্মপাতা দিয়ে। একটি গোঁড় কথায় দেখা যায়, দুটি স্ত্রীলোক 'গোল মোহর' গাছের পাতা দিয়ে পাখিটির দেহ এবং তার ফুল দিয়ে পাখিটির ঠোঁট তৈরি করেছে। টিয়ের ঠোঁট প্রায়ই লাল পলাশের সঙ্গে উপমিত হয়। বরিশাল থেকে পাওয়া একটি কথায় দেখি, সুপুরির ডাল দিয়ে পাখি তৈরি করা হচ্ছে।

এই জন্যেই সৃষ্টিকালীন কয়েকটি পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা দেয়, যেমন গাছের সঙ্গে পাখির। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সৃষ্টিকালে একটি গাছের ভূমিকা থাকে, হয় প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষভাবে, অন্তত একটি গাছ থাকেই। বিশেষ করে পাখি যেখানে সৃষ্টি-কারী বা সৃষ্টিকারীর সহযোগী। স্টিথ টম্পসন এ বিষয়ে কয়েকটি মোটিফের উল্লেখ করেছেন ; সৃষ্টি ও ধ্বংস দুইই এতে আছে, তবে সৃষ্টিই বেশি. আইরিশ পুরাণে : Giant bird pulls up oak tree by roots : B 31. 6. 2. , Giant bird alighting on oak tree causes it to tremble : B 3 . 6. 2 . ; Devastating birds destroy grass : B 33. 1. . ; Black birds destroy crops : B 33. 1. 3. ; পারশ্য পুরাণে : Camrosh : Giant bird which collects seeds and sees that they are properly placed. : 3 5

wise eagle in the earth-tree : A 878. 3. 3. ; Hawk in the earth-tree : A 878. 3. 4. Golden cock in earth-tree : A 878.3.6.

গাছের সঙ্গে এই যোগের ফলে খাদ্য-শস্যের আবিষ্কারের পেছনেও পাখিকে স্বীকার করা হয়েছে। আমেরিকার Iroquoian পুরাণে 'Ga-gaah' নামে এক কাককে মেলে। এই কাক সূর্যলোকে বাস করে ; সেখান থেকে পৃথিবীতে আসবার কালে সে তার কানের মধ্যে এক দানা শস্য নিয়ে আসে ; পৃথিবীতে এই প্রথম শস্যদানা। তা মাটিতে রোপণ করা হল, এবং যথাকালে তা শস্যোৎপাদন করে ইণ্ডিয়ানদের জীবন রক্ষা করল। কাক যেহেতু পৃথিবীতে প্রথম শস্য এনেছে, সেই হেতুই দেখা যায়, শস্য পেকে উঠলে কাকই প্রতি বৎসর প্রথম শস্য খায়।

মধ্যভারতের ভাইনা (কেন্দা জমিদারী)-দের একটি কাহিনীতে (Myths of Middle India : Elwin, P. 314-315) দেখা যায়, পৃথিবীতে প্রথম শস্য এনেছে শুক পাখি। পৃথিবীতে তখন এক কণা শস্য ছিল না, মানুষ শুনতে পেল—পাতালে এক গোখরো সাপের ফণায় শস্য আছে। ভীমসেন প্রেরিত শুক পাখি গোখরো সাপের ফণা কেটে একদানা শস্য নিয়ে এল ; আসবার সময় তার ঠোঁট থেকে সেই শস্য-দানা একটি ঘন বাঁশঝাড়ের কাছে পড়ে যায়। জনৈক ব্যক্তি সেই শস্য দানাটি কুড়িয়ে পেয়ে তার ভাণ্ডারে রাখতেই তা পরিমাণে অসম্ভব রকম

বেশি হয়ে গেল। কথাটির শেষ অংশে অন্য কাহিনী অকারণে এসে পড়েছে বলে মনে করি। যাই হোক, সেই শস্য সবাই ভাগ করে নিলে।

ওপরের দুটি কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

১. প্রথম শস্যদানা হয় স্বর্গ, নয় পাতাল থেকে আনীত ;

২. সংখ্যায় তা একটি মাত্র ; কিন্তু তা যাদুগুণময় ;

৩ তার সঙ্গে সাপ ও গাছ জড়িত ; সাপ উর্বরতার প্রতীক এবং পাখির সংযোগে সাপ থাকবার দরুন এটি ঘটেছে ;

৪. একটিতে কাক যেন স্বেচ্ছায়, করুণা পরবশ হয়ে, নিজের কানের মধ্যে পুরে সে শস্য-দানা নিয়ে এসেছে, সক্রিয়তা তাই এখানে বেশি ; অপরটিতে শুক প্রেরিত হয়েছে তা আনতে, কাজেই তার মধ্যে প্রত্যক্ষতা নেই। উপরন্তু, রহস্য ও আদিমতা ঠোঁটে ধরে আনবার চাইতে কানে পুরে আনায় অনেক বেশি পরিস্ফুট।

আসামের ইদু-মিশমী (দিরং উপত্যকা, লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন)-দের একটি কথায় (Myths of the North-East Frontier of India : Elwin, p 378 পাচ্ছি : মানুষ ধান-চাল কি পদার্থ তা আগে জানত না ; পাহাড়ের দেবতা Gallan চড়ুই পাখিকে ধান চাষের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। চড়ুই পাখিই মানুষকে চাষের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলে। চড়ুই এই শর্ত করে নিল : ক্ষেত থেকে সে যত খুশি ধান খেতে পারবে। এই জন্যেই আজও দেখা যায়, ধান পাকতে শুরু করলে চড়ুই-ই তা প্রথম খায় ; ঠিক Iroquoian-দের কাক যেমন প্রথম শস্য খায়। এখানে শস্য-সংস্কৃতির বাহক হয়েছে চড়ুই। পর্বতদেবতা মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে সরাসরি মানুষকে কৃষিকর্ম শেখান নি, চড়ুইয়ের মাধ্যমে তা শিখিয়েছেন ; চড়ুইকে তিনি স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং বিনাশর্তে তা শিখিয়েছেন : কিন্তু চড়ুই তা শর্তসহ মানুষকে শিখিয়েছে। কেন চড়ুই ধান পাকলেই সবার আগে ধান খেতে আসে, এই actiological myth সৃষ্টির প্রবণতাই এতে তাই বড়ো হয়ে উঠেছে।

পারশ্য সৃষ্টি কাহিনীর Saena এবং Camrosh-এর ভূমিকা সেই তুলনায় নিঃশর্ত এবং আদিমতর স্তরকে নির্দেশ করে। নাম-সাদৃশ্যে Saena শ্যেনবৎ পাখি-বিশেষ ; সে থাকত Vouru-Kasha সাগর থেকে উত্থিত এক সর্বরোগহর বৃক্ষে। শ্যেন এই গাছ থেকেই সব গাছের বীজ নিক্ষেপ করে দিত। Camrosh তারই সহযোগী পাখি ; তার কাজ ছিল, শ্যেন-কর্তৃক ছড়ানো বীজ যাতে বৃষ্টি ধারার সঙ্গে মিশে সৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে পারে, তাই দেখা।

খাদ্যের পর পানীয় আবিষ্কারেও পাখি মানুষকে পথ দেখিয়েছে। এলুইন সংগৃহীত মধ্যভারতের কয়েকটি কথাতে দেখা যায়, মহুয়া ফুলের মদ খেয়ে পাখিরাই মাতাল হয়ে মানুষকে তা খেতে প্রণোদিত করেছে। স্টিথ টম্পসন ভারত থেকেই এটি গ্রহণ করে, একটি মোটিফরূপে তাকে নির্দেশ করেছেন : Liquor discovered when birds get drunk : A 1427.0.1. এলুউইন তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থ দুটিতে

গ্নটি কয়েক এমন কথা সংকলিত করেছেন: দুটি বইগা কথাতে (p. 3?7 ; p. 462-463) একটি লন্‌ঝিয়া স'ওরাদের কথায় (p. 342) ; এবং চতুর্থটি আসামের হিল্ মিরি-দের কথায় (p 239-240)। তিনি দেখিয়েছেন, আপনা থেকেই সৃষ্ট মদের সংবাদ মানুষকে পাখি কিভাবে দিয়েছে, অথবা, কৃত্রিম উপায়ে মদ তৈরির পদ্ধতি কিভাবে পাখি শিখে নিচ্ছে। বইগা এবং লন্‌ঝিয়া স'ওরাদের কথার মধ্যে আদিমতার ছাপ আছে। এই তিনটি কথাতেই দেখা যায়, মদ কেউ সৃষ্টি করে নি, গাছের কোটরের মধ্যে বৃষ্টির জল জমেছিল, তাতেই মহুয়া ফুল পড়ে, আপনা থেকেই তা মদে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পাখিরা তাই খেয়ে মাতাল হয়েছে, এবং তাদের দেখেই মানুষ প্রথম মদের সন্ধান ও স্বাদ পেল। সৃষ্টির ক্ষেত্রে, পাখির সংগে গাছের যোগ আর এক প্রস্থ প্রমাণিত হল। কিন্তু আসামের হিল মিরি-দের কথাতে খেনো মদ কিভাবে তৈরি করতে হয়, তার পদ্ধতি একটি পাখি দেখে আসামের অন্যত্র উড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ হল ; সে দেখে এসেছে, অতি নোংরা পদার্থ দিয়ে মদ গাঁজাবার বীজ' তৈরি হয়, এই জন্যেই ব্রাহ্মণরা খেনো মদ খায় না। কথাটিতে অর্বাচীনতা অতি স্পষ্ট।

খাদ্য-পানীয়ের পর পরিধেয় বস্ত্র। এখানেও পাখি। আসামের সিয়াং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের বোরি-দের একটি সৃষ্টি-পুরাণে দেখা যায়, চিলের নরম পালক থেকে সুতো তৈরি করে তাই দিয়েই বস্ত্র বয়ন করা হচ্ছে (Elwin : p. 222)।

পাখিই মানুষকে আগুন এনে দিয়েছে, পৃথিবীর বহু দেশের সৃষ্টিপুরাণে তা বলা হয়েছে, এ বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি ও উদাহরণ দিয়েছি। সেখানেই দেখিয়েছি, মানুষকে প্রথম জল এনে দিয়েছে পাখিই। বর্তমান অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদেও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তা দেখিয়েছি। আসামের হিল-মিরিদের একটি কথায় দেখা যায়, পাখিরাই মানুষকে প্রথম কাঁদতে এবং পৃথিবীতে একত্র বসবাস করতে শিখিয়েছে।

ভাষা, সাহিত্য ও সংগীত শিক্ষার সংগেও পাখির যোগ আছে। আমেরিকার আজটেক-দের একটি পুরাকথা এই রকম: মহাপ্লাবনের ফলে পৃথিবীর সব মানুষ নিশ্চিহ্ন হল। কেবল Cox-coxtli এবং তার স্ত্রী Xochiquetzal একটি নৌকো করে Colhuacan পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে রইল। তাদের অনেক ছেলেপুলে হল। কিন্তু কেউই কথা বলতে পারত না। অবশেষে একটি গাছের মগডালে বসে একটি ঘুঘু ওই শিশুদের ভাষা শেখালে। তবে, প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকের ভাষা পৃথক হওয়াতে পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারত না।

টিউটনিক পুরাণে Odin হলেন কাব্য-কবিতারও দেবতা। Aesir এবং Vanir-এর সম্মিলিত থুথু থেকে জন্ম নেয় Kvasir, সে সবার চেয়ে জ্ঞানী হয়ে ওঠে। দুটি খর্বকায় ব্যক্তি Kvasirকে হত্যা করে তার রক্ত মধুর সংগে মিশিয়ে একটি কড়াই ও দুটি কলসীতে রেখে দেয়। পাত্র দুটির নাম যথাক্রমে 'Odrerir' এবং 'Hydromel'। যে কেউ ওই পাত্র থেকে মধুরক্ত পান করবে, সেই হবে কবি, দ্রষ্টা,

ঋষি। Odin অনেক ছলনা ও কৌশল করে তা পান করে ঈগলের রূপ ধরে পালিয়ে গেছেন।

কোলদের গানের মধ্যে কেন সুরেলা ভাব নেই এবং কেমন করেই বা ঢোল-ধামসা ইত্যাদি বাজাতে শিখেছে, সে বিষয়ে একটি কথা প্রচলিত আছে (Folklore of the Kols : Man in India, Vol. XXIV, No. 4, December 1944, pp. 261-268 : W. G. Griffiths): একদা ভগবান সব জাতের মানুষদের ডেকে বললেন, সবাইকে তিনি বর দেবেন। একে-একে সব জাতের মানুষরাই ভগবানের কাছ থেকে বর চেয়ে নিল। কিন্তু কোলরা এল না। তার কারণ, ভগবানের কাছে আসবার সময় পথে তারা দেখতে পেল কতকগুলি 'সাতভাই' পাখি "পে-পে-পে" করে সমস্বরে নিদারুণ চীৎকার করছে; কোলরা ভাবলে, এই বিশৃঙ্খল ধ্বনিই বুঝি ভগবান তাদের জাতকে বর হিসেবে দিলেন। পথের থেকেই তারা তাই ফিরে গেল। পাখির ওই চীৎকার থেকেই কোলরা গান গাইতে ও ধামসা বাজাতে শিখল॥

·১১·

আকাশের সঙ্গে পাখির যোগ আচ্ছেদ্য। আকাশের সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের যোগ, এই কারণে গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টিকথার মধ্যেও পাখি তার নিজস্ব প্রভাবটুকু ফেলেছে। পাখির সঙ্গে আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্রের যোগ আমরা দু দিক থেকে লক্ষ করতে পারি: প্রথমত, আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টিকথায় পাখির ভূমিকা; দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিকথা ছাড়াও, পৌরাণিক নানা আখ্যানে, পাখি ও গ্রহ-নক্ষত্রের যোগ।

ইউরোপীয় সৃষ্টিতত্ত্বের কোনো-কোনো কাহিনীতে বলা হয়েছে, আবাবিল (the swallow) পাখিই ভগবানকে আকাশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। পাখি এখানে সহযোগী সৃষ্টিকর্তা।

এই আকাশের সব গ্রহের মধ্যে প্রধান সূর্য, তিনি গ্রহপতি। সাধারণ প্রাণীর মতো এই সূর্যের জন্ম-মৃত্যু কল্পিত হয়েছে। উদয় ও অস্তকালে সূর্যের গোলাকৃতি সহজেই ডিমের সঙ্গে একে যুক্ত করে ফেলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার Euahlayi উপজাতির লোকেরা মনে করে, সূর্যের জন্ম হয়েছে এমু (Emu) পাখির ডিম থেকে। তাদের মতে, আগে কোনো সূর্য ছিল না, কেবল ছিল চাঁদ ও তারা। একদা এক ব্যক্তির সঙ্গে একটি এমু পাখির বন্ধুত্ব হয়, সে বন্ধুত্ব ভেঙে একদিন উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হল। লোকটি রেগে গিয়ে এমু পাখির নীড় থেকে একটি বড়ো ডিম তুলে নিয়ে আকাশের দিকে সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। আকাশে তখন দেবতারা কাঠ স্তূপীকৃত করে আগুন জ্বেলেছিলেন। ছুঁড়ে দেওয়া ডিমটা

সেই আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়লে তা একটি জ্বলন্ত পিণ্ডে পরিণত হয়, ফলে সূর্যের উদ্ভব হয়। দেবতারা স্থির করলেন, তাঁরা প্রতিদিনই এভাবে কাঠ জ্বালবেন ; সেই থেকে দেবতারা কাঠ জ্বেলে আসছেন এবং সূর্যের জন্ম হচ্ছে।

ভারতীয় পুরাণে সূর্যের সঙ্গে অরুণ ও গরুড় জড়িত, এবং এদেরও জন্ম ডিম থেকে। কশ্যপের ঔরসে, বিনতার গর্ভে এদের জন্ম হয় ডিম রূপে। বিনতা অরুণকে অকালে ডিম ভেঙে বের করেন, অরুণ তাই দুর্বল বলে কথিত হয় ; অপর দিকে পরিণত কালে ডিম ভেদ করে বহির্গত গরুড় সুপুষ্ট ও সবলকায় রূপে কথিত। অরুণ সূর্য-সারথি, গরুড় বিষ্ণুর বাহন। গরুড় জন্ম নেবার পরই পিতা কশ্যপের নির্দেশে গজকচ্ছপ ভক্ষণের জন্যে এক বটবৃক্ষের শাখায় উপবেশন করলে তা ভেঙে যায়। লক্ষণীয়, সৃষ্টির মধ্যে গাছকে আবার দেখা গেল। ইজিপ্টের সূর্য-দেবতা Ra-ও ডিম জাত।

সূর্যের উদয় পৃথিবীর সব আদিম মানসকে বিস্মিত করেছে ; এবং আশ্চর্যের কথা, সেই বিস্ময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাখির কাহিনী দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। লাল মুরগি অরুণ-রাগ রূপে কল্পিত হয়েছে। তেমন সাদা মুরগি পূর্ণরূপে উদিত সূর্য, কেননা সূর্য সব কিছুকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করায়, স্পষ্টতার প্রতিমূর্তি এই শ্বেতবর্ণ। প্রত্যুষের ঘোষণাকারী রূপে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর প্রিয় পাখি হল মুরগী। মেক্সিকোতে সূর্যের উদ্দেশে তাই মুরগি উৎসর্গ করা হয়। জাপানের Ise নামক স্থানে যে সূর্যদেবী Amaterasu-র মন্দির আছে, সেই দেবীর বেদীতলে, মাটিতে, বহু মুরগী সংযুক্ত থাকে।

সূর্যসংস্কৃতি ও সূর্যোপাসনার প্রচার ও প্রচলন প্রাচীন ইজিপ্টে বিশেষভাবে দেখা গেছে। সেখানকার সূর্যদেবতা Ra ডিম্বজাত, তাঁর মুখও শ্যেনের মতো। সূর্যের উদয় ও অস্তের সঙ্গে অভিন্ন একটি পাখির কল্পনা ইজিপ্টে করা হয়েছিল, যাকে বলা যায়, "the Bird Bennu"। এই পাখি "worshipped at Heliopolis as the soul of Osiris, he was also connected with the cult of Ra and was perhaps even a secondary form of Ra. He is identified, though not with certainity, with the phoenix who, according to Hérodotus' Heliopolitan guides, resembled the eagle in shape and size, while Bennu was more like a lapwing or a heron."—Larousse Encylopaedia of Mythology, P. 46.

উক্ত গ্রন্থেই ইজিপ্টের সূর্য সম্পর্কে মন্তব্য (P. 11) এই: He [সূর্য] was......sld to be a faicon with speckled wings flying through space, or the right eye only of the great devine bird. Another conception of him was that of an egg laid daily by the celestial goose, or more frequently a gigantic scarab rolling before him the

incandescent globe of the sun as, on earth, the sacred scarab rolls the ball of dung in which it has deposited its eggs."

সূর্যের উদয়ের যুক্ত পাখিদের কাহিনীর মধ্যে মুরগীকেই বেশি দেখা যায়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। যেমন, আও নাগাদের একটি কথায় (The Ao Nagas : London, Macmillan and Co., 1926, P 314 : J. p. Mills) : সূর্যের প্রচণ্ড তাপে অতিষ্ঠ হয়ে একদা সব মানুষ সূর্যের কাছে সে জন্যে অভিযোগ করলে, অভিমানবশত সূর্য তারপর দিন থেকে আর উঠলেন না, গোটা সৃষ্টি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। অনেক অনুরোধেও সূর্য উঠতে চাইলেন না। অবশেষে একটি মুরগী গিয়ে বললে, আমার ফেরবার পথে বন-বেড়াল আমাকে আক্রমণ করতে পারে ; আমি ভয় পেয়ে ডেকে উঠলে, তুমি আমার সাহায্যের জন্যে প্রকাশিত হয়ো। মুরগি এক ছলনার আশ্রয় নিলে : বন-বেড়াল আসে নি, তথাপি সে ডেকে উঠলো এবং শর্তমত সূর্যও প্রকাশিত হলেন। এই জন্যেই প্রতিদিন মুরগি ডাকলে সূর্য ওঠে।

প্রায় এই রকমেরই একটি. কথা মেলে পূর্ব হিমালয়ের সিকিমের লেপচাদের মধ্যে (Folklore and customs of the Lepchas of Sikkim : The Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal : Vol. XXI, No. 4. 1925, New Series, pp. 363-365 : C. de. Beawvoir stocks) : আগে ছিল দুই সূর্য, তারা দুটি ভাই। একজন দিনে আলো দিত, আর একজন রাতে, কাজেই মানুষ সর্বদাই প্রচণ্ড উত্তাপে অসুবিধের মধ্যে কাটাত। সব প্রাণী মিলে সভা ডেকে স্থির করলে, একটি সূর্যকে মেরে ফেলতে হবে। ব্যাঙ স্বেচ্ছায় সে ভার নিলে। সে মোরগ-ঝুঁটি ফুলের গাছ (Red cock's comb plant) থেকে তৈরি করলে তীর, তাই দিয়ে বড়ো সূর্য-ভাইকে হত্যা করলে। তাই দেখে ছোটো সূর্য-ভাই ভয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে এক টুকরো কালো কাপড় দিয়ে তার দেহ আবৃত করে রইল। ফলে সারা পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

এখানে মুরগী সূর্যের প্রতি Hostile, মুরগী এখানে মোরগঝুঁটি ফুল, অর্থাৎ গাছে রূপান্তরিত, সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে গাছের ভূমিকা দেখা গেল।

বড়ো সূর্য-ভাইয়ের মৃত্যুর পর পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবার কাহিনী আসামের লুসাই কুকিদের মধ্যেও চলিত আছে। এই অন্ধকার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক বিরাট ও ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এই অন্ধকারের সময়েই লুসাই-কুকি মোড়লেরা হয় ফিঙে, নয় সাতভাই পাখিতে পরিণত হয়েছে।

এই দুই সূর্য-ভাই দুই বোনে পরিণত হয়েছে (Myths of the North-East Frontier of India, pp. 52-54)। সিয়াং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের Minyong-দের 'কথা'তে পাওয়া যায় : পৃথিবীর দুটি কন্যার দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তাদের মৃত্যুর পর সৃষ্টিও অন্ধকারে ডুবল। তাদের মৃত্যুর পর, তাদের চোখের মধ্যে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বকে মূর্তিমতী করে পুনরায় প্রাণ দেওয়া হল। বড়ো জনের নাম Sedi-Irkong Bomong এবং ছোটো জনের নাম Sedi-Irkong Bong ;

বড়ো বোন ঘর ছেড়ে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হল। ছোটো বোনের আলোক-উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে হত্যা করা হলে, বড়ো বোন শোকে ভয়ে-বিহ্বল হন, এবং একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল। ফলে পৃথিবী আবার অন্ধকারে নিপতিত হল। অবশেষে মুরগীর সক্রিয় প্রচেষ্টাতেই আবার আলোক ফিরে এল।

দক্ষিণ বিহারের গঙ্গা জেলার কাহারদের মধ্যে চলিত 'কথা' এই : গঙ্গা জেলার উত্তর প্রান্তে গিরিয়াক নামক স্থানে রাজা জরাসন্ধের একটি উদ্যান ছিল, খরায় সেটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। রাজা ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি এক রাত্রির মধ্যে গঙ্গা নদী থেকে খাল কেটে জলধারা এনে উদ্যানটি রক্ষা করতে পারবে, তিনি তাকে তাঁর জামাতা করবেন, সঙ্গে দেবেন অর্ধেক রাজত্ব। কাহার জাতীয় এক প্রধান এই কর্মে ব্রতী হল। মাটি উঁচু করে বাঁধ দিয়ে রাতারাতি গঙ্গা নদী থেকে জল আনবার কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে, এমন সময় রাজা জরাসন্ধ প্রমাদ গণলেন : শেষ পর্যন্ত এক নীচু জাতীয় কাহারের সঙ্গেই বুঝি কন্যার বিবাহ দিতে হয়, এই সময় একটি অশ্বত্থ (পিপুল) গাছ রাজাকে রক্ষা করল। সে সহসা একটি মুরগীর রূপ ধরে ডাকতে লাগল, যেন রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠেছে, অতএব শর্তমত সেই কাহার প্রধান রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব পেলেন না।

এই কথাটিতে পাখির সঙ্গে গাছের একাত্মতা, মুরগীর সঙ্গে সূর্যের সংযোগ, এবং সূর্যোদয়ের জন্যে মুরগীর ছলনা (তুলনীয় পূর্বোক্ত আও নাগাদের কথাটিতে মুরগীর ছলনা করে সূর্যকে ওঠানো) প্রভৃতি বিশেষত্ব চোখে পড়ে।

এক রাতের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট শর্ত (প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাজগুলি থাকে কিছু নির্মাণ করা) পূরণ করা হতে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে সূর্য উঠে সব কিছু ভণ্ডুল করে দেবার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেই একাধিক রয়েছে। দুটির কথা বলি। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার মল্লারপুর থানায় এটি কাক-সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় : মল্লারপুরের তিন দিক ঘিরে বিরাট একটি বিল আছে। কথিত হয়, গঙ্গা নদীর সঙ্গে এক রাত্রের মধ্যে খাল কেটে এই বিলকে যুক্ত করবার এক ব্রত গৃহীত হয়। তখন শুক্লপক্ষ চলছিল। রাত তখনও পোহায় নি, কিন্তু কাকেরা জ্যোৎস্নাকেই ভোর ভেবে ডেকে উঠল। কাজেই এক রাতের মধ্যে যতটুকু কাজ হল, তার বেশি বিলটিকে আর গঙ্গার নিকটবর্তী আজও করা সম্ভব হয় নি।

এখানে মুরগীর বদলে কাকের ডাকে সূর্য উঠেছে, এবং কাক ভুল করে ডেকে উঠেছে, কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ছলনা করে নি।

দ্বিতীয় উদাহরণটি 'কালিকাপুরাণে' পাওয়া যায়। 'কালিকাপুরাণ' প্রাচীন কামরূপে সংকলিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। রাজা নরক একদা দেবী কামাখ্যা-কে বিয়ে করতে চাইলেন। দেবী একটি শর্ত আরোপ করলেন : এক রাত্রির মধ্যে নরককে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সানুদেশ পর্যন্ত, যেখানে দেবীর মন্দির, তার পাদদেশ পর্যন্ত একটি পাথরের সিঁড়ি তৈরী করে দিতে হবে। রাজা নরক লোকদের নিয়ে কাজে লেগে গেলেন। রাত শেষ হবার আগেই সিঁড়ি তৈরির কাজ শেষ হতে চলল দেখে দেবী কামাখ্যা একটি মুরগীর রূপ ধরে ডাকতে থাকলেন, যেন সূর্য উঠেছে। ক্রোধে রাজা

নরক সেই মুরগীটিকে তরবারি দিয়ে কেটে ফেললেন । স্থানটির নাম আজও "কুকুড়া-কাটা চাঁক" নামে রয়ে গেছে।

একই ব্যাপার ইন্দ্র-অহল্যার উপাখ্যানে ঘটেছে। ইন্দ্র যখন অহল্যার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত, তখন একটি মুরগী ডেকে ওঠায়, সূর্যের উদয়কাল ঘোষিত হয়। এখানেও মুরগীর ডাক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, ছলনাময় এবং রূপান্তর গ্রহণ আছে।

রাজা কংসের একটি উপাখ্যানেও মুরগীর এই ভূমিকা দেখি। এই পৌরাণিক কাহিনীটি, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও রঙপুরের রাজবংশীদের মধ্যে এই লৌকিক ও আঞ্চলিক রূপ লাভ করেছে: মুরগী ছিল রাজা কংসের অনুগত অনুচর। কংসের কৃতকর্মের জন্যে তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করলে; হত্যার মুহূর্তটি নির্দিষ্ট হল, সূর্যোদয়ের কালে। মুরগী সে ষড়যন্ত্র টের পায়। সে তাই সূর্যোদয়ের ক্ষণে কংসকে এই বলে সাবধান করে দিল: কংসরে, সারু সারু (সরে যা, সরে যা)। আজও মুরগী তাই বলে ডাকে এবং সে সময়েই সূর্য ওঠে। বাঙলা দেশের অন্যত্র শোনা যায়: 'কংস রে, ওঠ, ওঠ'। ঠিক একই কথা শোনা যায় ঘুঘু প্রসঙ্গে। ঘুঘু নাকি প্রত্যূষে এই বলে ডাকে: 'সূর্য ঠাকুর, ওঠো, ওঠো'।

আসামের তিরাপ ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের Nocte উপজাতীয়দের মধ্যে বিশ্বাস আছে, মুরগীর আদেশেই চন্দ্র-সূর্য আকাশে ওঠে ও ডোবে। মুরগী 'বু বু' করে ডাকলে সূর্য ওঠে এবং 'নক্ নক্' করে ডাকলে সূর্য ডোবে। তিরাপ ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের Moklum-দের মধ্যে চলিত একটি কথায় বলা হয়েছে, মুরগী প্রথমে আকাশেই বসবাস করত।

সিয়াং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের Minyong-দের একটি 'কথা' এই রকম: Doini নামে সূর্য এবং Rollo নামে চন্দ্র দুজনে একই স্থানে প্রস্রাব করত, সেখানে জন্মাল একটি কাঁঠাল গাছ, গাছটি কাটা হলে তার এক টুকরো বকফাল মাটি ভেদ করে পাতালে চলে গেল, সেই বাকল থেকে জন্ম নিল একটি মুরগী। আস্তে আস্তে সে বড়ো হতে লাগলো। এই সময়টাতে সূর্য একদিনও দেখা দেয় নি। সৃষ্টি ছিল অন্ধকারে ডুবে। মুরগীটি তখন চন্দ্র-সূর্যের বাড়িতে গিয়ে ডাকতে লাগল: 'কো কো কো' তার খানিক পরেই সূর্য তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

কামেং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের Hrusso-দের 'কথায় আছে: Awa নামে এক ভল্লুক সদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে সূর্যের কন্যা Jusam-এর বিয়ে হল। বিয়েতে সূর্য তার কন্যাকে উপহার দিয়েছেন—একটি যাদুময় মুরগীর পাখা। এই কথাটিতে আছে, একটি শকুন Jusam-এর পুত্র কন্যাদের বলছে, মৃতদেহ অন্বেষণ করে তাদের রক্ত সূর্যের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ। সূর্যের দৌহিত্রদের শকুন তার পিঠে করে বহন করেছে। কথাটিতে সূর্যের আসঙ্গে মুরগীর সঙ্গে শকুন মিশ্রিত হয়েছে, যার জন্যে শকুন এখানে solar bird হয়ে উঠেছে। শকুন যে রক্ত এনে সূর্যকে দেয়, স্পষ্টই তা উদয় ও অস্তকালে সূর্যের লাল রঙ। দৃষ্টান্তগুলোর সব কটি এলউইনের গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

মুরগীর ডাক ও সূর্য ওঠার এই প্রসংগটি শেষে কিছু ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। জে. জে. মোদী তাঁর একটি প্রবন্ধে (A few beliefs of the west : The journal of the Anthropological society of Bombay : Vol. XIV, No. 5. pp 579-587) লিখেছেন : "When Adam was creaaed he did not know what the time was and therefore when he ought to say his prayers. Accordingly, he asked God to let him know the time So God made the cock, in order that its might crow ·Among the Iranians also, the cock is associated with the duty of early rising and saying prayers. A cock is specially spoken of as '*Pouru darsh*' *i e.* one who sees (the coming of the sun) before hand."

সূর্যকে কে আগে দেখে, বা সূর্য সর্বপ্রথমে কোথায় দেখা দেন, এ নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশস্থ উত্তর ভারতে, দুই পাখির একটি সুন্দর কাহিনী (North Indian Notes and quiries : January, 1894, p. 180) চলিত আছে : বহু শতাব্দী পূর্বে 'কালচুনিয়া' এবং 'মোনাল' পাখির মধ্যে এক তর্ক উপস্থিত হয়েছিল : পাহাড়ের অন্ধকার কোনে থাকে কালচুনিয়া পাখি : তার মতে সূর্য প্রথম দেখা দেয় পাহাড়ের নিম্নাংশে। মোনাল পাখির মতে, সূর্য প্রথম দেখা দেন পাহাড়ের ঊর্ধ্বাংশে। ঠিক হল, যে জিতবে সে অপরের পায়ের ফাঁক দিয়ে হেঁটে যাবে। মোনাল পরদিন পাহাড়ের মাথায় থেকে সর্ব প্রথম সূর্যের দেখা পেল, নীচে বসে কালচুনিয়া স্বাভাবিক ভাবেই সূর্যের দেখা তখনও পায় নি। মোনাল এসে ঘুমন্ত কালচুনিয়ার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে হেঁটে গেল। এই জন্যেই কালচুনিয়া (অর্থাৎ এই জাতীয় পাখি) লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে, যেন মোনাল তার পায়ে আঘাত হেনে গেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় সূর্যোদয়ের সংগে যুক্ত হয়েছে 'কুকুবুরা' (Kukubura) নামে পাখির হাসি সৃষ্টিকর্তা প্রথমে শুকতারাকে সূর্যোদয় ঘোষণা করবার কাজ দিলেন, কিন্তু সেটি কিছু অসুবিধেজনক বলে মনে হওয়ায় 'কুকুবুরা' পাখিকে বললেন, শুকতারার আলোক ক্ষীণ হয়ে আসতে দেখলেই এ পাখি যেন এক বিশেষ ভংগিতে হাসবার মতো ডাকে, তাহলেই লোকে বুঝবে, সূর্যোদয়ের ক্ষণ আসন্ন। কুকুবুরা যে ভংগিতে ডাকে বা হাসে, সেই ভংগিটি স্মরণ করেই এর নামান্তর হয়েছে 'the gourgourgahgah'.

সূর্য ওঠার সংগে কাককেও জড়িত দেখি। এর দৃষ্টান্ত আগেই একটি দিয়েছি। জাপানে সূর্যদেবী Amaterasu-র দূত রূপে 'Yata-Garasu' নামে একাধিক পা বিশিষ্ট এক কাককে পুজো করা হত। গ্রীক দেশেও কাকসূর্যের দূত রূপে কল্পিত। ইউরোপে কোথাও-কোথাও কাকিল সূর্য বা সূর্যরশ্মির সংগে সম্পৃক্ত।

হাঁস ও ময়ূর, সূর্যের সংগে জড়িত আর দুটি পাখি। সূর্যের সংগে হাঁসের

যোগের ফলেই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কালে বিভিন্ন দেশে হাঁস খাবার রীতি আছে। 'জবন হংস জাতকে' (সং ৪৭৬) মহাসত্ত্বরূপী হংসরাজকে সূর্যের গতির সংগে প্রতিস্পর্ধিতা করতে দেখা যায়। 'মহাময়ূর জাতকে' (সং ৪৯১) এক ময়ূরকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে সূর্যের স্তব করেই সর্বপ্রকার বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে দেখি।

তাহলে সূর্যের সংগে সম্পৃক্ত পাখি রূপে এই ক'টি পাখিকে এখানে দেখা গেল : শ্যেন, মুরগী, কাক, কোকিল, ঘুঘু, হাঁস ও ময়ূর। এছাড়া আছে সোনাল এবং 'কুকুবুরা' ॥

...১২...

উত্তর অস্ট্রেলিয়ার warramunga-দের মধ্যে বিশ্বাস আছে, চাঁদ পৃথিবীর মাটিতেই জন্মেছিল প্রথমে : তখন সে একটি পুরুষলোক ছিল। একদা একটি স্ত্রীলোকের সংগে সে যখন গল্প করছিল, তখন দুটি শ্যেনের অসাবধানতায় সেখানে আগুন লেগে যায়, যাতে স্ত্রীলোকটি বিশেষভাবে পুড়ে যায়। চাঁদ তখন নিজের একটি শিরা কেটে স্ত্রীলোকটির গায়ে ঢেলে, তাকে বাঁচিয়ে তোলে। পরে তারা দুজনে আকাশে চলে যায়। পাখি এখানে সক্রিয় ভূমিকা নেয় নি, কেবল প্রসঙ্গগত উপস্থিত মাত্র। চাঁদের সংগে এখানে শ্যেন, আগুন ও রক্তকে দেখি।

ঈজিপ্টে চাঁদের সংগে জড়িত পাখি 'Ibis',—সারস জাতীয়, বাঁকা ঠোঁট, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পাখি।

ভারতীয় পুরাণে চাঁদের সংগে ময়ূরের যোগ কল্পিত হয়েছে। 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' (আশ্বিন, ১৩৭৪) গ্রন্থে বেলাবাসিনী ও অহনা গুহ মন্তব্য করেছেন : "অত্রি ঋষির পুত্র আত্রেয় চন্দ্র,...। কলা পরিমাণে ক্ষয়িত এবং শুক্লপক্ষে এক কলা করে পূর্ণিত হয় বলে চন্দ্র কলাপী,... এবং কলাপী চন্দ্রের প্রতীক শিখীকলাপ কৃষ্ণের শিরোভূষণ।"—পৃ. ১৮৮।

চাঁদের প্রসংগে অমাবস্যার কথা ওঠে। উক্ত গ্রন্থেই 'অমরকোষে'র একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছে : "নিঃশেষচন্দ্র অমাবস্যার নাম 'কুহূ' অমাবস্যা। কোকিলের একবার কুহূ ধ্বনিতে যতটুকু সময় লাগে, তাই কুহূ অমাবস্যার স্থায়িত্বকাল।"—পৃ. ১০১।

তারপর চন্দ্র-সূর্যের 'গ্রহণে'র কথা। পূর্বে উল্লিখিত আসামের তিরাপ ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের Nocte উপজাতিদের 'কথা'তে দেখেছি, মুরগীর 'বুবু' ডাকে সূর্য ওঠে এবং "নক নক" ডাকে চন্দ্র ওঠে। কথাটির পরবর্তী অংশ এই : একদা পৃথিবীর সব প্রাণীদের মধ্যে প্রচণ্ড হানাহানি বেধে গেল। মুরগীই ছিল তখন রাজা। হানাহানির কথা শুনে মুরগী-রাজা ভীষণ রেগে গেল। রেগে একই সংগে বলতে থাকল, 'বুবু' আর 'নক নক'। এ শুনে সূর্য উঠবে কি চন্দ্র উঠবে, কেউ তা বুঝতে

পারল না। দুজনেই এক সঙ্গে আকাশে দেখা দিল। সবাই ভয় পেয়ে গেল। এখনও মুরগীরা রেগে গেলে 'বুবু নক নক' করে এবং অমন করে ডাকলেই তখন 'গ্রহণ' হয়।

'ছায়াপথে'র সঙ্গেও মুরগী জড়িত। ঢাকা জেলায় বিশ্বাস আছে, মুরগী ছায়াপথের দিকে মুখ করে ডিমে তা দেয়। আমেরিকার কোনো কোনো Algonquian গোষ্ঠীর মানুষের ছায়াপথকে "Bird's Path" বলে থাকে; কারণ, এক দেশ থেকে অপর দেশে যাবার কালে পাখি ছায়াপথের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পথ অনুসরণ করেই চলে।

হেরা বা জুনোর প্রিয় পাখি ময়ূর। হেরার একটি নাম আইসিস্ (Isis)। আইসিসকে কখনো-কখনো রামধনু রূপে গ্রহণ করা হয়। যেহেতু ময়ূরের পাখায় রামধনুর রঙগুলি আছে, অতএব, আইসিস (হেরা, জুনো) ময়ূরকে তাঁর প্রিয় পাখি রূপে নির্বাচিত করেছেন॥

নক্ষত্র ও তারকার সঙ্গেই পাখির যোগ বেশি দেখা যায়।

বছরের সব দিন সব নক্ষত্র দেখা যায় না, এক-একটি বিশেষ দিনে বিশেষ-বিশেষ নক্ষত্র দেখা যায়। যেমন, ২১ ডিসেম্বর মধ্য রাত্রিতে, ২১ জানুয়ারি রাত্রি দশটায়, ২০ ফেব্রুয়ারী রাত্রি আটটায়, এবং ২১ মার্চ সন্ধ্যা ছ'টায় যে সব নক্ষত্র দেখা যাবে, তার মধ্যে আছে 'সিগনাস' ('রাজহংস')। ২১ জুন মধ্য রাত্রিতে, ২১ জুলাই রাত্রি দশটার সময়, ২১ আগস্ট রাত্রি আটটার সময় যে সব নক্ষত্র দেখা যাবে তার মধ্যে আছে 'অ্যাকুইলা' ('শ্রবণা', ঈগল)। এই রকম বিভিন্ন নক্ষত্রের দর্শন-অদর্শন নিয়ে পাখি-সংক্রান্ত নানা আখ্যান-উপাখ্যান পৃথিবীর সব দেশেই রচিত হয়েছে। এর উদাহরণ একটু পরে দিচ্ছি।

এইখানে 'নক্ষত্র' ও 'তারকার মধ্যে পার্থক্যটি বুঝে নিতে হবে। তারকা (star) হল এক-একটি বিভিন্ন, একক পদার্থ; নক্ষত্র (constellation) হল গুচ্ছবদ্ধ, পুঞ্জীকৃত পদার্থ। বহু নক্ষত্রের সমাবেশ এক-একটি রূপকল্পনার আভাসকে ফুটিয়ে তোলে, তখন ওই রূপ-কল্পনা অনুযায়ী নক্ষত্র-পুঞ্জের নামকরণ এবং সে সম্পর্কে গল্প কাহিনী প্রচলিত হয়। তারকা সম্পর্কেও এই ভাবে গল্প-কাহিনী প্রচলিত হয়েছে।

একমাত্র গ্রহপতি সূর্য স্থির আছেন, আর সবাই একটি নির্দিষ্ট পথে, বিশেষ নিয়ম ও সময় অনুসরণ করে, ঘুরে চলছে। চন্দ্রের বৃত্তাকারে ভ্রমণের পথ (অর্থাৎ

('ক্রান্তিবৃত্ত', 'অর্যমনের পথ') ২৭ বা ২৮টি নক্ষত্রের সাহায্যে নির্দেশ করবার প্রয়াস ভারতে ঋগ্বেদের আমলেই দেখা গিয়েছিল। চীন, ব্যাবিলন ও আরব দেশেও সে প্রয়াস হয়েছিল। চীনে ৩০০ বছর আগে এটি প্রচলিত ছিল।

কক্ষপথে চন্দ্রের আবর্তনের চারি দিকে চারটি প্রাণীর অবস্থান চীনে কল্পিত হয়েছিল। তার মধ্যে দক্ষিণ দিকেরটির নাম 'the Vermilian Bird' অর্থাৎ চীনীয় ফনিক্স। যে ২৮টি নক্ষত্রের দ্বারা চন্দ্রের কক্ষপথ চিহ্নিত তার মধ্যে দশম, দ্বাদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশতি নক্ষত্রের আকৃতির মধ্যে বিভিন্ন পাখিকে কল্পনা করা হয়েছে :

দশম নক্ষত্র : Nü, the Girl, ··Represented by the Bat···

দ্বাদশ নক্ষত্র : Wei, Danger,···Represented by swallow

সপ্তদশ নক্ষত্র : Wei, the Stomach,···Representd by the pheasant

অষ্টাদশ নক্ষত্র : Mao ··Represented by the cock···

ঊনবিংশ নক্ষত্র : Pi, the End,···Represented by the Raven···

—Encyclopedia of chinese symbolism and art motives, pp363-367.

২৮টি নক্ষত্রকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারমধ্যে দ্বাবিংশ থেকে অষ্টাবিংশ পর্যন্ত নক্ষত্রকে 'Vermilion on Bird' বলা হয়।

সপ্তর্ষি (the great Bear) কে ভারতীয় জ্যোতিষে 'শিখণ্ডী,' ময়ূরের পাখার মতো তা উজ্জ্বল বলে ফল জ্যোতিষে বৃহস্পতি গ্রহেরও এক নাম 'চিত্রশিখণ্ডীজ'। সিংহরাশিস্থ নক্ষত্র বিশেষ ল্যাটিন শব্দ Regulas (স্বর্ণশীর্ষ পাখিবিশেষ) দ্বারা ব্যক্ত হয়।

ত্রিবেণী প্রসাদ সিংহ তাঁর একটি প্রবন্ধে (The Astro-nomical origin of Hindu mythology : The Journal of the Bihar Research society : Vol. XXX IX, part III, September, 1953. pp. 293-305) কয়েকটি পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন স্বাতী নক্ষত্র সম্পর্কে : চাতক পাখি স্বাতী নক্ষত্রের জল ছাড়া অন্য জল দারুণ গ্রীষ্মেও পান করে না বলে কথিত হয়। Under on old Indian belief, the "Nakshatras" were responsible for rain, and when the sun occupied the same position as a rain giving Nakshatras, there was rain. The rain of the "Hasta Nakshatra," popularly kmown as Hathia in Northern India (the constellation corves) is famous as the rain which makes on mars the winter paddy. The rain of "Svati" which falls in the early winter is wellknown as being the only source of water, which will quench the thirst of the chataka,···"

পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে দক্ষিণ খগোলে (the southern constellation) নাম দিয়েছে ফিনিক্স পাখি, ভারতীয় জ্যোতিষে তাকেই বলা হয়েছে 'কাক ভুশুণ্ডী,' কখনো

বা ক্রৌঞ্চ। উত্তর খগোলে (the Northern constellatin)-র দুটি প্রধান তারা হল 'Cygnns' ও 'Cepheus'. "cygnus, the swan, was in Aralia—Al Rukh,—the equivalent of the Sanskrit "Garura,"...At a later date, perhaps the Greek name for the constellation filtered on to India and with the Greek name Lyna for the adjaceft constellation which eontains the star Abahijit, suggestea the story of Saraswati,...reposing on a swan and holding Lyre.".

ভারতীয় খগোলচিত্রে যা 'শ্রবণা নক্ষত্র' পাশ্চাত্যে তাই 'Aquila' বা 'Eagle.' 'Standard dictionary of folklore, mythology and legend'-এ মন্তব্য করা হয়েছে,..."a constellation of northern hemisphere, described as flying east ward a cross the Milky way. It was interpreted as an eagle alike by the ancient Hebrews, Greeks and Romans. The Hebrew name for it was Neshr (Eeagle, Falcon, or Vulture The Arabs called it 'O kab', Black. Eagle. To the early Turks it was Taushangjil or hunting Eagle ..." p. 69.

যোগেশ চন্দ্র রায় তাঁর বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল (চৈত্র, ১৩৬৩) হইতে এ সম্পর্কে আর একটু তথ্য দিয়েছেন। তিনি 'শ্রবণা' (Aquila) নক্ষত্র-প্রসঙ্গে লিখেছেন "বিষ্ণু শ্রবণার দেবতা। ঋগ্‌বেদে শ্রবণা নাম নাই। ঋষিগণ শ্রবণা নক্ষত্রে শ্যেন পক্ষী দেখিতেন। শ্যেন পক্ষী পুরাণে গরুড়। ঋগ্‌বেদে ইহার নাম গরুত্মান্‌ ও সুপর্ণ।...' পৃ. ১৯.

Larousse Encylopedia of mythology-তে ওশেনিয়ার Torres প্রণালী প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে, In Torres straits the constellation of the Eagle is an ogress,..." p. 471.

আমেরিকার বিভিন্ন ইণ্ডিয়ানরা সূর্যের পরেই প্রভাতী তারা-কে শক্তিশালী বলে মনে করে। প্রভাতী তারার যে মূর্তি তারা কল্পনা করেছে, তা এই: 'on his head he wears a downy eagle's feather stained red, the image of the breath of life.'

প্রভাতীতারা সম্পর্কে আমেরিকার Iroquoi-দের মধ্যে একটি কাহিনী চলিত আছে: একদিন স্বর্গ থেকে এক স্বর্গীয় হরিণ মর্তে নেমে এসেছিল; শিকারী Sesondowah তারই পশ্চাদ্ধাবন করতে-করতে স্বর্গে সূর্যের নিবাসস্থলের ওপরে এসে পৌঁছল। ঊষা দেবী তাকে বন্দী করে তাঁর দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করলেন। স্বর্গ থেকেই একদিন Sesondowah উঁকি দিয়ে তার মর্তবাসী প্রেমিকাকে দেখতে পেল। একদা বসন্তকালে সে একটি নীল পাখির রূপ ধরে তার প্রেমিকার কাছে এল। তারপর গ্রীষ্মকালে সে হল একটি কৃষ্ণ পাখি, শরতে হল প্রকাণ্ড একটি শাহীবাজ (Falcon), সেই শাহীবাজ হয়েই Sesondowah তার প্রেমিকাকে নিয়ে স্বর্গে গেল। এদিকে

স্বর্গ থেকে পালিয়ে মর্তে এসেছিল বলে উষা দেবী তাকে তাঁর দোর-গোড়াতে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন। এবং তার প্রেমিকাকে একটি তারকাতে পরিণত করে নিজের কপালে টিপের মতো পরে নিলেন। এটিকেই বলে প্রভাতীতারা, পাখি কর্তৃক তা মর্ত থেকে স্বর্গে নীত হয়েছে।

এই প্রভাতী তারা সম্পর্কেই আমেরিকার Black feet-দের কাহিনী: প্রভাতী তারা একদিন পৃথিবীতে এসে একজন রূপসী ইণ্ডিয়ান-কন্যা, Soatsaki-কে বিয়ে করে আকাশে নিয়ে গেল। Soatsaki-র একটি কন্যা হল, নাম "ছোটো তারা"। তার ছেলের গালে ছিল একটি দাগ, এই জন্যে তার নাম 'Poia'। Soatsaki-কে তার শ্বশুর সূর্য পৃথিবীতে নির্বাসিত করলে। Poia বড়ো হয়ে এক মোড়লের কন্যার প্রেমে পড়ল, কিন্তু গালে দাগ বলে কন্যাটি তাকে বিয়ে করতে রাজী হল না। Poia স্বর্গে গিয়ে দেখল, তার পিতা 'প্রভাতী তারা' সাতটি পাখি-দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। Poia সেই পাখি-দৈত্যদের হত্যা করল।...

Lyra (উত্তরাকাশের তারকাপুঞ্জ বিশেষ) তারকাপুঞ্জের অভিজিৎ Vega) নক্ষত্র এবং শ্রবণা (Aquila) নক্ষত্র পুঞ্জের Altair নক্ষত্র সম্পর্কে একটি চমৎকার প্রেমের গল্প চীন দেশে চলিত আছে। দার্শনিক Huai Nan Tzu এটি ব্যক্ত করেছেন (Encyclopedia of chinese symbolism and art motives, P 369-370)। কাহিনীটি 'Larausse Encyclopedia of mythology' (P. 399) গ্রন্থেও আছে। চীনের সর্বত্রই কাহিনীটি প্রচলিত; অনেক কবি ও সাহিত্যিকও কাহিনীটির রূপক-উপমা ব্যবহার করে থাকেন। কাহিনীটির দুটি রূপ চলিত আছে: একটি আনুষ্ঠানিক ও সংক্ষিপ্ত রূপ; অপরটি লৌকিক রূপ। আনুষ্ঠানিক কাহিনীটিতে কোনো পাখির প্রসঙ্গ নেই, অতএব তা আমাদের আলোচ্যও নয়। লৌকিক কাহিনীটি এই: এক সরল প্রকৃতির রাখাল ছিল; তার একটি ষাঁড় ছিল, সেটি অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্। ষাঁড়টির কথামত রাখাল একদিন নদীর ধারে গিয়ে দেখতে পেল, স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রাদি পাড়ে রেখে নাইতে নেমেছে, এবং ষাঁড়ের নির্দেশ মতোই একটি বস্ত্র নিয়ে এসে বাড়িতে একটি কুয়োর মধ্যে লুকিয়ে রাখল। সে কাপড়টি ছিল স্বর্গের দেবতাদের পিতা yu-ti-র কন্যা chih-nii-এর; কৌতুকবশত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সখীদের সঙ্গে জলকেলি করছিলেন। যাই হোক, কাপড়ের জন্যে তিনি স্বর্গে ফিরে যেতে পারলেন না, রাখালের ঘরেই ঘরণী হয়ে রয়ে গেলেন, কালক্রমে তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হল। তারপর একদিন রাখালের কাছ থেকে জেনে নিলেন, কোথায় আছে কাপড়, তাই পরে তিনি চলে গেলেন স্বর্গে। এদিকে ষাঁড়ের সাহায্যে রাখালও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে স্বর্গে উপস্থিত হল। সব শুনে yu-ti তখন রাখালকে নদীর পশ্চিম দিকের একটি তারার দেবতা করে দিলেন; আর কন্যা chih-nii কে নদীর পূর্ব দিকের দেবী। বলে দিলেন, প্রতি সাতদিনে তারা একবার করে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। কিন্তু তারা ভুল বুঝলেন, ভাবলেন, বছরে এক বার সাক্ষাৎ করতে পারবেন; এবং সে দিনটি হল—বছরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিন। আজও তাই ঘটে আসছে। নদী পেরোবার সেতুটি সেদিন, প্রতি বছর, তৈরি

করে দেয় ম্যাগপাই পাখিরা। সেদিন ম্যাগপাইরা মর্ত থেকে স্বর্গে গিয়ে গাছের পল্লব দিয়ে পায়ে-হাঁটা সেতু তৈরি করে। উত্তর চীনে বিশ্বাস আছে, সেদিন বৃষ্টি হবেই হবে, অন্তত সকাল বেলায় তখন ভরা বর্ষাকাল থাকে। তারা মনে করে, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের আনন্দাশ্রু সে দিন বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। আরো বিশ্বাস আছে, এই দিন মর্তে একটিও ম্যাগপাইকে দেখা যাবে না, সেতুবন্ধনের জন্যে সবাই সেদিন স্বর্গে যায়। এই নদী হল—ছায়াপথ। রাখাল হয় 'Altair' তার স্ত্রী হয় 'vega'।

এতক্ষণ যে সব কাহিনীর উল্লেখ করা হল, সব ক'টিতেই প্রেম একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। অভিশাপ, বিচ্ছেদ, রূপান্তর প্রায় সব ক'টিতেই Motif হিসাবে আছে; স্বর্গ ও মর্তে গমনাগমন প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব। পাখি সর্বত্র সক্রিয় ভূমিকা না নিলেও প্রাসঙ্গিক ভাবে উপস্থিত আছে।

পরিশেষে ভারতের মুণ্ডাদের তারকাপুঞ্জের নামকরণ ও পরিচয়নের কথা বলি। শরৎচন্দ্র ভূষণ ভাদুড়ী তাঁর একটি প্রবন্ধে (Astronomy of the Mundas and their star myths · Man in India Vol II, Nos 1 and 2, March and June 1922, PP 69-77) এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভগবান সিং বোঙ্গা একদা হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে লাঙল ও লাঙলের ফাল তৈরি করছিলেন, আকাশে। যে মুহূর্তে তিনি তৈরি করা শেষ করেছেন, অমনি খানিক দূরেই দেখতে পেলেন একটি 'পাঁড়কি' অর্থাৎ ঘুঘু) তার ডিমে তা দিচ্ছে। ঘুঘুটি শিকার করবার জন্যে তিনি তাঁর হাতুড়ি ছুঁড়ে দিলেন, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় একটি গাছের ডালে তা ঝুলে রইল। সিংবোঙ্গার এই হাতুড়ি মুণ্ডাদের জ্যোতিষে "মুগার ইপিল" (অর্থাৎ: "হাতুড়ি তারকা") নামে পরিচিত। 'Aldebaran' তাদের 'পাঁড়কি'; এবং রোহিণী (the Hyades নক্ষত্রপুঞ্জের বিভিন্ন নক্ষত্র হল ওই ঘুঘুর ডিমগুলি।

রোহিণী নক্ষত্রপুঞ্জ হল বৃষরাশিস্থ পঞ্চনক্ষত্রের সমষ্টি। এদের মধ্যে উজ্জ্বলতম ও বৃষ্টিসংঘটক হল Aldebaran নক্ষত্র। গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত আছে, দৈত্য আটলাস এবং প্লাইঅ্যানির পঞ্চকন্যা বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার জন্যে দায়ী। এই বৃষ্টিজল আসলে তাদের ভ্রাতা Hyas-এর মৃত্যুর জন্যে ফেলা অশ্রু। লক্ষণীয় ব্যাপার এই, মুণ্ডাদের বিশ্বাসেও 'পাঁড়কি' নক্ষত্রে বৃষ্টি হয়ে থাকে।

চীনা কথায় মিলনের আনন্দাশ্রু এখানে বিচ্ছেদের শোকাশ্রুতে পরিণত। ওখানে ছিল ম্যাগপাইদের ঠোঁটে গাছের পল্লব, এখানে দেখি, লাঙল তৈরির জন্যে গাছ। আমার বারংবার বলা কথাটি আবার আবৃত্তি করি: সৃষ্টির ক্ষেত্রে জল, গাছ আর সাপ, —পাখি থাকলে, থাকবেই থাকবে॥

সপ্তম অধ্যায়

পাখি : দেবতা, অপদেবতা

মানসিক, প্রাকৃতিক ও নানা আধিভৌতিক জগতের সঙ্গে পাখির যোগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর আধিদৈবিক জগতের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়েছে। মানসিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে মানুষের আত্মা ও প্রেতাত্মার সঙ্গে পাখি যুক্ত হয়ে পড়েছে। অদৃশ্য আত্মা-প্রেতাত্মার ক্ষমতার দুটি দিক আছে, একটি ক্ষেমংকর অপরটি ভয়ংকর। আত্মা-প্রেতাত্মা মানেই মৃত পূর্ব-পুরুষ, তাদের শুভ কামনার জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে পূজা-নৈবেদ্য নিবেদিত হয়। এমনি করেই এই মৃত পূর্ব-পুরুষেরা দেবতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় একদিন, কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত দেবতার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

দেবতার উদ্ভব যখন আদিম মানসে ঘটে নি, তখনও কিন্তু তারা একটি অদৃশ্য, রহস্যময়, সর্বব্যাপক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। সে শক্তিকে লঙ্ঘন করা আদিম মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সর্বব্যাপক শক্তিই একদিন, নানা কারুকার্যময় অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে দেবতা হয়ে উঠল। জড় জগতের মধ্যে সর্বত্রসঞ্চারী এই শক্তিকেই বলা হয়েছে 'সর্বপ্রাণবাদ' (Animism)। এই মতবাদের মূল কথা হল, প্রাকৃতিক ও জড়জগতের মধ্যে একটি চেতনা ও ব্যক্তিত্ব আরোপ করা। এই চেতনা ও ব্যক্তিত্ব বলতে 'আত্মা'কে বোঝানো হয়। জীবিত অথবা মৃত মানুষের, মানুষ বা মানবেতর প্রাণীর আত্মায় বিশ্বাস করে তাদের পুজো করাও এই মতবাদের একটি দিক। অর্থাৎ মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, পাহাড়-পাথর—সর্ববস্তুতেই একটি জীবন্ত, অতিপ্রাকৃত চেতনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। সেই চেতনাটি অতুলনীয়, অত্যাশ্চর্য, আত্মসচেতন একটি সত্তা। সে সত্তার উদ্দেশ্য, বুদ্ধি, স্মৃতি, আশা, ভয়, আবেগ—ইত্যাদির বোধ আছে। তা কোনো অলীক, মায়াময়, ভূত-প্রেতের রূপাকৃতিতে প্রকাশিত হতে পারে। এই সত্তাটি কোনো ব্যক্তিদেহ বা অন্য কোনো জড়বস্তুর শরীর রূপাশ্রয় থেকে বিচ্ছেদ-যোগ্য ; তা সদা-সর্বত্র ব্যক্তি বা বস্তু-লগ্ন না-ও হতে পারে ; তা কখনো কখনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নও হতে পারে।

Animism বা সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে পাখির দেবত্ব অর্জন কোন্ সূত্রে গ্রথিত, এবার সে কথা বলি। পাখি নানা দেশে আত্মার প্রতীক রূপে কল্পিত হয়েছে, মৃত পূর্ব-পুরুষের প্রতীক রূপেও পাখিকে দেখা হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদের মধ্যে যেহেতু মানবেতর প্রাণীতে আত্মার আরোপের প্রসঙ্গ আছে, মৃত পূর্ব-পুরুষদের আত্মার কথা

আছে, অতএব খুব সহজ ও সঙ্গত কারণেই, সর্বপ্রাণবাদের মাধ্যমে পাখি একদিন দেবতা বা কোনো ঐশী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদের মধ্যে যেমন শুভাশুভ নানা বোধ-চেতনা দেখা যায়, পাখির মধ্যেও তা আছে : পাখি সৃষ্টি করতে পারে, ধ্বংসও করতে পারে ; পাখি দেব ও দানব, দুইই হতে পারে। তাই পাখিকেও তুষ্ট করবার জন্যে তাকে পুজো-নৈবেদ্য নিবেদন করার প্রসঙ্গটি এসে গেছে। পাখির মধ্যে যে Mana, Orenda, বা Soul stuff ইত্যাদিকে লক্ষ করা হয়েছে, তাও সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত হতে সাহায্য করেছে।

জড় ও নিষ্প্রাণ পদার্থকে তুষ্ট করবার জন্যে যখন পুজোর প্রচলন হল, তখন তার Hylomorphic রূপটাকেই পুজো করা হত। জড়বস্তু থেকে ক্রমে, অথবা একই সঙ্গে, চেতনময় প্রাণীকেও পুজো করবার প্রথা এল, – প্রথমে এল মানবেতর প্রাণী ও গাছপালা। মানবেতর প্রাণীকে তার Zoomorphic রূপে এবং গাছ-পালাকে তার Phytomorphicরূপে পুজো করা হত। পাখিকেও তার Zoomorphic রূপেই প্রথমে পুজো করা হত। তারপর পাখির Theriomorphic এবং Anthropomorphic রূপ প্রাপ্তির ফলে সেই-সেই রূপেই পক্ষি-পুজোর প্রবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু Zoomo rphic দিকটি বরাবরই পরোক্ষভাবে প্রবাহিত ছিল। প্রাকৃতিক ও জড়জগৎকে পুজো করা আর Zoomorphic রূপে পাখিকে পুজো করা প্রায় এক ও অভিন্ন ব্যাপার ॥

২
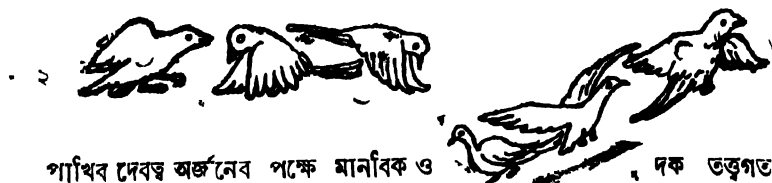
পাখির দেবত্ব অর্জনের পক্ষে মানবিক ও ... দিক তত্ত্বগত দিক থেকে সহায়ক হয়েছে। Ritualistic দিক থেকে ... করা হয়েছে। এবার সেই দিকের কথা বলব।

এইখানেই ধর্মের সঙ্গে যাদু মন্ত্রের সংযোগের কথা ওঠে। আদিম সমাজে ধর্ম বলতে কোনো বিশুদ্ধ চেতনাকে বোঝানো হত না। ধর্ম সেখানে অনেকটাই যাদু হিসেবে পরিচিত ছিল। এই জন্যেই তাদের ধর্মবোধকে বলা হয় "Magico-religious"। তাদের কাছে ধর্ম ছিল এই : মানুষ ও প্রকৃতিকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে, নানাভাবে তাকে তুষ্ট করাই ছিল ধর্ম। ধর্মের দুটি দিক : একদিকে তা তত্ত্বমাত্র, অপর দিকে সেই তত্ত্বের রূপায়ণ বা আচার-অনুষ্ঠানের দিক। 'The Golden Bough' বইতে ফ্রেজার এটিকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে : একদিকে 'Faith' ও 'Belief' ; অপরদিকে 'works' ও 'practice'। ধর্মকে প্রাকৃত জগতের নিয়ন্ত্রণকারী একটি অপ্রাকৃত, অলৌকিক ও অমানবিক শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করে, নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই শক্তিকে বশ করবার প্রবৃত্তি, প্রয়াস ও প্রেরণার মধ্যে স্বতই অপর একটি সত্যও স্বীকৃত হয়ে যায় : ওই শক্তি সব সময়েই একই ভাবে ও ভঙ্গিতে কাজ করে না, তা কখনো তুষ্ট কখনো রুষ্ট হয়, তা ভয়ংকর ও

ক্ষেমংকর দুই-ই হতে পারে। আচার-অনুষ্ঠান পালন করবার অর্থ হল—যাতে সে শক্তি হিংস্র হয়ে বিধ্বংসী কোনো কাজ করে না ফেলে। অর্থাৎ ওই শক্তির একটি 'elasticity' ও 'variability'কে স্বীকার করা হয়েছে। এই পরিবর্তনশীলতার ফলেই শক্তির একটি 'conscious' ও Personal' দিকও ধরা পড়ে।

ধর্ম ও যাদুর এই সংমিশ্রণ ও অসম্পূর্ণ উপস্থিতির ফলেই, ধর্মের মধ্যে যাদুকর্ম এসে গেছে। সেই যাদুকর্মই তখন ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মের সঙ্গে যাদু মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। যাজক পুরোহিতরা এই কারণেই যাদুশক্তিতে বলীয়ান বলে কল্পিত হয়েছে। ফ্রান্সে বিশ্বাস ছিল, পুরোহিতরা নানা মন্ত্র-ইন্দ্রজাল জানেন; এবং প্রকৃতই তাঁরা অনেক সময়ে যাদু-অনুষ্ঠান করতেনও। প্রাচীন ইজিপ্টে যাদুকরেরা শ্রেষ্ঠ দেবতাকেও মন্ত্র দ্বারা বশে আনতে পারতেন বলে বিশ্বাস করা হত; এবং সেই সব দেবতারা বশ্যতা স্বীকার না করলে যাদুকরেরা তাঁদের ধ্বংস করবারও হুমকি দিত!

পাখিকে দেবতা-জ্ঞানে, পাখি-দ্বারাই যাদুকর্ম অনুষ্ঠানের দু' একটি দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়। আমেরিকার বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে, িশ্বতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কালে নৃত্যাভিনয় হয়ে থাকে। সেই সময়ে 'Birdmask' বা পাখির মুখোস পরবার প্রথা আছে। এতে যে ব্যক্তি পাখির মুখোস পরেছে সে স্বয়ং পক্ষি দেবতায় পরিণত হয় যেন; নয়তো পক্ষিদেবতার সম্মুখেই সে নাচের মাধ্যমে শুভংকর কর্ম ক'রে, যেন 'অনুকরণাত্মক যাদু' (Imitative Magic)-র মাধ্যমে তা প্রদর্শন করে।

ঠিক একই ব্যাপার ঘটে Animal mime বা Animal dance-এর মধ্যে। যেমন, পাখির দুই ডানার অনুকরণে দুই বাহু আন্দোলন করে নাচালে বৃষ্টি হবে, এই যাদুকর্মটি। এখানে পাখি হয় নিজেই 'Rain god', অথবা বৃষ্টি-দেবতার কাছ থেকে বৃষ্টি আনায়ন করবার ক্ষমতার মধ্যে কালক্রমে পাখিরই দেবতা হয়ে ওঠা। কখনো বা পাখির পালক পরিধান করে (যেমন আমেরিকার Hopi-রা) পুরোপুরি পাখির নকল করা।

নানাদিক থেকে নানাভাবে পাখি 'পবিত্রতা' অর্জন করেছিল। এরই ফলে অন্যান্য বস্তু ও প্রাণী থেকে পাখি যেন খানিকটা পৃথক, স্বতন্ত্র ও উচ্চতর একটি স্তরের অন্তর্গত হয়ে যায়; পাখি তখন 'spirit-helper' রূপে পরিগণিত হয়। নানা যাদুঘটিত আচার-অনুষ্ঠানে পাখির পালক, রক্ত, নাড়ীভুঁড়ি, ঠোঁট, নখ, ডিম ও নীড়, এমন কি তার বিষ্ঠা পর্যন্ত অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়। Spirit-কে আয়ত্ত করবার জন্যে, যাদুকর্মের সহায়করূপে পাখির পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গৃহীত হতে-হতে অবশেষে পাখিই স্বয়ং Spirit হয়ে উপদেবতা বা দেবতায় উন্নীত হয়ে যায়॥

মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে কোন প্রাণী সর্বাগ্রে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে
পাখির দেবত্ব সম্পর্কে আলোচনা কালে তা একটি সংগত ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

"Bird deities in China" (Mcmlii : Artibus Asiae : Asconda,
Switzerland, 1952) বইটিতে Florance Waterbury এই প্রশ্নটি তুলেছেন।
তাঁর মতে মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে সাপই সর্বপ্রথম দেবত্ব অর্জন করেছে। এশিয়া
ও আফ্রিকাতেই সর্পপূজার উদ্ভব ঘটে, পরে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

Waterbury-র এই মন্তব্যের সমীচীনতা অনেকেই স্বীকার করবেন, আমিও
করি। কিভাবে সর্পপূজা থেকে পক্ষিপূজার উদ্ভব বা পরিণতি ঘটল সে
আলোচনা প্রত্যাশিত থাকলেও Waterbury তা করেন নি। তাঁর মন্তব্যকে ভিত্তি
করেই আমি এই প্রকার যুক্তিকে এর পেছনে লক্ষ করেছি :

পৃথিবীর কোনো প্রতীক বা আইডিয়াকেই চিরকাল অবিকৃত ও অপরিবর্তিত থাকতে
দেখা যায় না, কালে কালে তার বিবর্তন বা বিকৃতি ঘটবেই। এই ভাবেই এক প্রতীকের
সঙ্গী হিসেবে আর একটি এসে জোটে, ফলে composite-symbol এর উদ্ভব ঘটে।
সাপের সম্পর্কেও তাই ঘটেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়েছি, পাখির সঙ্গে জল, আগুন,
মাটি, সাপ, অমরতা, উর্বরতা ইত্যাদি নানা ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। ঠিক এই
সবগুলি ভাবনাই সাপের সম্পর্কে মেলে। ফলে, সর্পপূজা থেকে পক্ষি-পূজাতে
বিবর্তিত হতে বিলম্ব হয় নি। সাপের পক্ষিবৎ ডানা এই জন্যেই কল্পিত হয়েছিল।
গ্রীসে কল্পিত হতো মৃত্যুর পর আত্মা সাপ হয়ে যায় ; কিন্তু cicero-র সময়ে রোমে
বিশ্বাস ছিল, মহৎ ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর আকাশের দিকে উড়ে যায় : গ্রীসের 'সাপ'
ও রোমের 'উড়ন্ত' আত্মা (যে ভাব স্বতই পাখিকে নির্দেশ করছে) কালক্রমে পাখিও
সাপকে একাত্ম করে দেয়, আত্মার ক্ষেত্রে। Democritus বিশ্বাস করতেন এবং
সারা ইউরোপেই সাধারণভাবে বিশ্বাস ছিল, পাখি থেকেই সাপের উদ্ভব ঘটেছে।

সাপ ও পাখি যে কেবল প্রত্যক্ষতই পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রিত তাই নয় ; 'গাছে'র
মাধ্যমে সাপ ও পাখি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। টিউটনিক পুরাণের বিখ্যাত yggdra-
sil বৃক্ষে ঈগল প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বহু সাপও বাস করত। জার্মানদের
পূর্বপুরুষ "অশ্বদেবতা" বলে কল্পিত হলেও তারা নিজেদের "বৃক্ষ" সম্ভূত বলে মনে
করত। এই বৃক্ষ আবার প্যাঁচা, শকুন প্রভৃতি পাখির রূপ ধারণ করতে পারত।
গাছ, পাখি, সাপ ও চতুষ্পদ প্রাণী-সব এখানে একাকার হয়ে গেছে।

অশ্বের সঙ্গে পাখির এই যোগ প্রাচীন ভারতেও দেখা গেছে। বাজসনেয়ি
সংহিতায় (২৫.৬) কথিত আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের কর্তিত দেহের দুই শ্রোণি
দুই ক্রৌঞ্চের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হত। বাজসনেয়ি সংহিতাতেই (২৫.৪) আবার

বলা হয়েছে, অশ্বমেধের অশ্বের দেহের দুই দিকের পঞ্জর দুটি চক্রবাকের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হত। উক্ত গ্রন্থেই (২১. ৭) অশ্বমেধের অশ্বের পিত্ত চাষ পক্ষীর উদ্দেশে প্রদানের কথা আছে। ঋগ্বেদে (১।১৬১) বলা হয়েছে, অশ্বমেধের অশ্বের শ্যেন পাখির মতো পাখা এবং হরিণের মতো পা আছে।

অর্থাৎ পাখির সঙ্গে কেবল সাপই নয়, গাছ ও অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীও সংযুক্ত হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই দেবত্ব অর্জন করে পুজো পেয়েছে।

বাজসনেয় সংহিতায় ২৪. ২০. ৩৬) বর্ষা ঋতু এবং সর্পের জন্যে তিতির পাখির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্য আমেরিকার Yucatan- এর লোকেরা এক দেবতার পুজো করে, তাঁর নাম "Cukulcan" অর্থাৎ "bird snake' মেক্সিকোর Aztec-রা এক-একজন দেবতাকে এক-এক দিকের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেয়। তেমনি একজন Huitzilopochiti, ইনি হলেন "humming bird of the south" অর্থাৎ He of the south" তাঁর দৈহিক রূপের পরিচয় এই : "His attributes were humming bird's feathers fastened to his left leg a snake of fire, and a stick curved in the shape of a snake"—Larousse Encyclopedia of Mythology, P. 443.

কেবল ধর্মেই নয়, শিল্পকলাতেও "The bird and the snake motive" একটি উল্লেখযোগ্য motive পৃথিবীর বহুদেশের ধর্মে ও শিল্পে পাখি-সাপকে একত্র সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। "Myths and symbols in Indian Art and civilization" (Bollingen series No. 6, 4th printing, 963) বইতে Heinrich Zimmer "The serpent and the bird" (PP. 2-76) অংশে এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতে কদ্রু-বিনতা ও সর্প গরুড়ের কাহিনীতে বিভিন্ন শিল্পকলায় এই Motive অনেকেই লক্ষ করেছেন। জিমার এর মতে, এই মোটিভ মেসোপোটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জন্ম নিয়ে প্রাগার্য যুগে ভারতে প্রবেশ করেছে। পাখি ও সাপ দুই বিপরীত সত্যের ইঙ্গিত দেয়। পাখি যেমন আকাশ ও অন্তরীক্ষের, সাপ তেমন মর্ত মাটির ও জলের প্রতীক। সুমেরীয় সভ্যতার সাপ-ঈগলের বিশিষ্ট সংমিশ্রণ পৃথিবীর বহু দেশেই নীত হয়েছে। ইউরোপ ও ভারতবর্ষে এটি দুই অর্থে গৃহীত হয়েছে : "Wheroas in western sradition the Spiritual antagonism of bird and serpent is commonly understood and stressed, the opposition, as symoolized in India, is strictly that of the natural elements : sun force against the liquid energy of the earthly Waters"—P.75 ভারতের প্রকৃতিক জগতের সত্যের আলোকে এই বিরোধকে দেখা হয় : সূর্যের প্রচণ্ড ও প্রখর উত্তাপে ক্রুদ্ধ হয়ে, 'সুপর্ণ' গরুড় যেন নিষ্ঠুর ভাবে আবহমান সৃষ্টিশক্তিরূপিণী ও জীবনশক্তির প্রতীক জল (সাপ)-কে আক্রমণ করে। এই জন্যেই ভারতে গরুড়কে বলা হয় 'নাগান্তক', 'নাগাশন', 'ভুজগান্তক', 'পন্নগাশন'। সাপেকে হত্যা করতে পারে বলেই যেন গরুড় এক রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী রূপে বিবেচিত হয়েছে, তারই ফলে সে দেবতা হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই এখনও বিশ্বাস

করা হয়, পুরীতে যে গরুড়স্তম্ভ আছে, তা আলিঙ্গন করলে সর্প-দংশনের যন্ত্রণার উপশম হয়। গরুড় আপন দেবত্ব প্রভাবেই তা দূর করে দিতে সমর্থ।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, গরুড় বিষ্ণুর বাহন, বিষ্ণুকে তার আপন স্কন্ধে বহন করে। ক্যাম্বোডিয়ার স্থাপত্যে দেখা যায়, কেবল বিষ্ণুই নয়, স্বর্গরূপে কল্পিত একটি গোটা মন্দিরকেই গরুড় বহন করছে। এতে গরুড়ের দেবত্ব অধিকতর স্বীকৃত।

এই বিষ্ণুর মাধ্যমেই সাপ-পাখির চিরন্তন দ্বন্দ্বের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। গরুড় বিষ্ণুর বাহন, নারায়ণ আবার সমুদ্রচারী অনন্তনাগের ওপর শয়ান। জলই এখানে পাখি ও সাপের সমন্বয় সাধন করেছে।

প্রাণি পুজোর মধ্যে সাপই সর্বপ্রথম, এই মতকে স্বীকার করে নিলে দেখা যায়, সাপের প্রতিদ্বন্দ্বী পাখি সেই সাপকে পরাভূত করে আপন দেবমহিমায় নিজেকে বিজয়ীর গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে ॥

দেবত্বে অধিষ্ঠিত পাখি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান —এমন কে নে ধর্মসম্প্রদায় নেই, যার সঙ্গে পাখির কিছু না কিছু যোগ নেই।

ময়ূরের পালক হিন্দু দেবতার পাখা হয়েছে, কৃষ্ণের মুকুটে তা স্থান পেয়েছে। পিতল ও তামার পুজোর বাসনে পাখির প্রতিমূর্তি ও রূপাকৃতি গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন পাখি দেবতাদের বাহন হয়েছে। কোকিল, গরুড় প্রভৃতি সরাসরি পুজো পায়। গরুড় বিষ্ণুর বাহন বলে দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবদের কাছে বিশেষ ভক্তির পাত্র। বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের কাছে এবং বাঙলার লোক-সংস্কৃতিতে শুক-সারী রাধাকৃষ্ণের প্রতিবেশের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। এখানে শুক কৃষ্ণের রূপ-গুণ, আর সারী রাধার রূপ-গুণ ব্যাখ্যা ক'রে পরস্পরের সঙ্গে মনোরম কলহ করে। সব দেশের বৌদ্ধরাই মনে করত, বন্দী পাখিকে মুক্ত করে দিলে আগামী জন্মে মুক্তি মিলবে। এই জন্যে বন্দী পাখি কিনে তারা আকাশে উড়িয়ে দেন। বৌদ্ধরা অহিংস, ফিনিক্স পাখি কোনো প্রাণী হত্যা করে না বলে চীনের বৌদ্ধদের কাছে এ পাখি অত্যন্ত প্রিয়।

মুসলমান ধর্মে দেখা যায়, আল্লা পরমেশ্বরকে একটি ময়ূর রূপে প্রথমে সৃষ্টি করে সহস্রশাখা-বিশিষ্ট একটি গাছে স্থাপনা করলেন। ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাঙলা দেশে মুরশিদী-মারফতী ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক গানে এই ময়ূরকে দেখা যায়। যেমন মৈমনসিংহের এক ফকিরের একটি "নূরতত্ত্ব" বিষয়ক গানে (মোমেন শাহীর লোকসাহিত্য : দ্বিতীয় প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৫। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : রওশন ইজদানী। পৃ. ১৩-১৪) দেখা যায় :

দারাখেতে ময়ূরপঙ্খী বইছে শূন্যাকার।
বিনা মেঘে বিন্দু ঝরে, ডিম্ব হইল তৈয়ার॥
মউয়ের মাথায় নূরের জ্যোতি
চন্দ্র সূর্য রাহুস্থিতি,
আদ্য নূরের রওশন ছিল
সেই ময়ূরের গায়॥ ...

ইউরোপে St. Christopher সম্পর্কে এই কিংবদন্তী চলিত আছে: তিনি তির কাঁধে যিশুকে বহন করে নিয়ে চলেন: ভরত পাখির সঙ্গে এখানে একটি যোগ আছে। ভরত পাখি নাকি St. Christopher-কে দেখে আদৌ ভয় পায় না; কারণ তাঁর কাঁধে ভরত পাখি তার আপন জনক ভগবান যিশুকেই দেখতে পায়। ভরত পাখির পিতা যিশুর মৃত্যু হলে যিশুকে নিজের মাথায় সমাধিস্থ করে।

St. Martin's day-র কাছাকাছি সময়েই কাককে নাকি দেখা যায়। সেই জন্যে ইউরোপের অঞ্চল বিশেষে কাককে বলা হয় "Avis St. Martini' ঠিক এরই সঙ্গে তুলনা করা যায় পূর্ববঙ্গের জালালী কৈতরে'ছ কথা: খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহ্ জালাল নামে এক সাধক-পুরুষ আরবের এমেন প্রদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়াই শুধু আসেন নি, এসেছিল নীল রঙের পায়রাকে এখনও তাই "জালালী কৈতর" বলা হয়।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ময়ূর কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। বগুড়া জেলার যোগীরভবন নামে গ্রামে একটি মঠবাড়ি আছে; সেখানকার সেবাইতরা হলেন গোরক্ষনাথের মতানুবর্তী এবং কানফট্ যোগিসম্প্রদায় ভুক্ত। প্রভাস চন্দ্র সেন তাঁর "বগুড়ার ইতিহাস" (১৯১২) বইটিতে এঁদের সম্পর্কে লিখেছেন, "ইঁহারা গৈরিক বসন ও কৃষ্ণবর্ণ ফিতার পাগড়ী ব্যবহার করেন। ইঁহারা ময়ূর পাখা নির্মিত পাখা হস্তে ধারণ করেন, ঐ পাখার না 'মরছল'। ইঁহাদের বিশ্বাস ঐ মরছল হস্তে থাকিলে ভূত প্রেতাদির কোন উপদ্রবের আশংখা থাকে না।"—পৃ. ৫৭-৫৮। স্পষ্টই বোঝা যা, এখানে ধর্ম ও যাদু সংমিশ্রিত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের অবলুপ্ত একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নাম 'মত্তময়ূর শৈব সম্প্রদায়'। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে (মত্তময়ূর শৈব সন্ন্যাসী: প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, পৃ. ২৬৫-২৭২) এই সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়েছেন: প্রায় হাজার বছর পূর্বে মালব ও মহারাষ্ট্র দেশে এই মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের উদ্ভব কাহিনী সম্পর্কে বলা হয়: শিব কৈলাস পর্বতে আপন অনুচর-পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর যদি কেকারব করত, তবে শিবের অনুচরদের কেউ কেউ মত্ত হয়ে নাচতে থাকত। কেকারবে দুটি মাত্র স্বর আছে: ষড়জ ও ঋষভ কোমল। শিবের গণদল মাত্র ওই দুটি স্বর অবলম্বন করেই নাচতেন। শিব তাঁদের সেই নৃত্য দর্শন করে প্রীত হয়ে এই বর দেন: তোমরা পৃথিবীতে গিয়ে 'মত্ত-ময়ূর' নামে প্রসিদ্ধ হও এবং "অষ্টাবিংশতি শিবতত্ত্ব মধ্যে তোমাদের গণনা হইবে।"

এ'রাই মত্তময়ূর শৈব সম্প্রদায় রূপে পরিচিত হন। ময়ূর এখানে প্রত্যক্ষভাবে একটি সম্প্রদায়ের উৎস হয়েছে।

কিন্তু এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল yezidi দের ময়ূরোপাসনা। ইয়েজিদিরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আর্মেনিয়ার সর্বত্র, কুর্দিস্তান ও ককেশাস পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। শয়তানের (the devil) মূর্তিরূপে "Malik-i-Tawans" মানে এরা ময়ূরের উপাসনা করে। এ উপাসনা অতি প্রাচীন কালের, একে বলা হয়েছে "survival of Tammuz worship"। ইয়েজিদিরা বিশ্বাস করে, বিদ্রোহ ও লোভবশত বাইবেল-বর্ণিত শয়তান Lucifer যে আধ্যাত্মিক মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আবার তাকে সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে সুযোগ দেওয়া উচিত। "Malik-i-ta'us" অর্থ হল "the Peacock Angel" শয়তান ময়ূররূপ ধারণ করে পুনরায় স্বর্গে গিয়ে দেবদূত হয়েছে, এই তারা বিশ্বাস করে। ময়ূরের মূর্তি পেতল বা অন্য কোনো পদার্থ দ্বারা গড়ে তার উপাসনা করা হয়।

আমার মতে ইয়েজিদিদের এই ময়ূরোপসনা মূলত সূর্য (সঙ্গে চন্দ্র) উপাসনা। লুসিফার বাইবেল-বর্ণিত এক শয়তান বটে; কিন্তু শব্দটির অপর অর্থ শুকতারা বা শুক্রগ্রহ বা Venus ইয়েজিদিরা চন্দ্র-সূর্যের উপাসনা করে থাকে। সূর্যের উদয় ও অস্তকালে তারা সূর্যের বন্দনা করে। চলিত বিশ্বাস এই, সূর্যের ওঠা ও ডোবার কালেই শয়তান মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়। শুকতারা ভোরের তারা, অর্থাৎ তখন সূর্য ওঠবার সময়। সূর্যের সাতটি রঙই ময়ূরের পাখার রঙে বর্তমান। সূর্য ও ময়ূর এইভাবে এক হয়ে যায়; ভারতীয় কল্পনাতেও ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু ময়ূরের পালকের 'চোখ' হয়েছে। ইন্দ্র মেঘরাজও বটেন। সূর্যের আলো মেঘের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করলে তবেই হয় রামধনু, যে রামধনুর সাত রঙ ময়ূরের পাখাতে বর্তমান।

বৌদ্ধ জাতকের অন্তর্গত 'মহাময়ূর জাতক' (সং ৪৯১)-কে এখানে অপরিহার্যরূপে মনে পড়ে। এই ময়ূর এক অসাধারণ ময়ূর, তার মাংস খেলে লোকে অজর ও অমর হয় বলে কথিত হয়েছে। কিন্তু কেউ সে ময়ূরকে বন্দী করতে পারে না। কারণ, প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে সূর্যের স্তব-বন্দনা করে সে সর্ব প্রকার বিপদ-মুক্ত হয়ে থাকত। কিন্তু যেদিন সে কামাচারী হয়েছে, তারপরই সে পাশবন্দী হয়েছে॥

এতক্ষণ বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে পাখির প্রসঙ্গ কিভাবে আছে, তারই সামান্য পরিচয় দেওয়া গেল। এইবার পক্ষি-উপাসনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাখির মোট তিনটি রূপ পাওয়া যায়: যথার্থ ও অবিকৃত পক্ষিমূর্তি; অর্ধপক্ষী ও অর্ধমানবিক মূর্তি; পুরো নররূপী দেবতার 'বাহন' রূপে পাখি। মোট এই তিন মূর্তিতে পাখিকে উপাসনা করা হয়।

যথার্থ ও অবিকৃত পাখিকে অর্থাৎ তার zoomorphic রূপটিকে পুজো করবার মধ্যে অনেকগুলি দিক আছে। প্রথমতঃ, পাখির সত্য ও বাস্তব মূর্তির উপাসনা; আবার, ছবি-চিত্র-আলপনায়, খোদাই করা বা পাথরের তৈরি পাখির প্রকৃত ও অবিকৃত মূর্তিও আছে। দুইই zoomorphic, কিন্তু একটি সত্য ও বাস্তব পাখিকে পুজো, অপরটি তার শিল্পায়িত যথার্থ মূর্তি। দ্বিতীয়ত, সত্য ও বাস্তব পাখিকে সম্পূর্ণ-রূপে গ্রহণ না করে তার দেহের অঙ্গ বা অংশ বিশেষকে (যেমন, পালক) পুজানুষ্ঠানের অংগ করে নেওয়া। তৃতীয়ত, সত্য ও বাস্তব পাখিকে বলি দেওয়া, বলি দিয়ে রেঁধে খাওয়া, অথবা জীবন্ত অবস্থায় দেবতার নামে উড়িয়ে দিয়ে উৎসর্গ করা—এ সবের মধ্যে পাখির দেবমহিমা কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা লক্ষ করা।

ভারতবর্ষে zoomorphic রূপে পাখিকে যেখানেই পুজো করা হয়, সেখানেই তার পেছনে পৌরাণিকতার একটি আবরণ দেওয়া হয়েছে। মানুষের রোগ-শোক থেকে পরিত্রাণের জন্যে, সুখসম্পদ ও জনশক্তি বৃদ্ধির কামনায় যেখানে পাখিকে বিশুদ্ধ পাখিরূপেই পুজো করা হয়; অথবা, কৃষিকর্ম ও মেঘ-বৃষ্টির জন্যে যেখানে পাখিকে পুজো করা হয়,—সেখানেই পাখি-পুজোর আদিম ও প্রাচীন দিককে খুঁজে মেলে। পৌরাণিকতার আবরণ প্রদান পরবর্তী ও আধুনিক স্তরের প্রভাবের ফল।

পৌরাণিকতার প্রভাবের দৃষ্টান্তই দিই সবার আগে। তামিলনাড়ু রাজ্যের চংলেপুট জেলার একটি প্রখ্যাত পক্ষিতীর্থের নাম—তিরুক্কলিক্কুনরম্। বেদগিরি পাহাড়ের মাথায়, ১৫২ মিটার উচ্চ, ৫০০ ধাপ সিঁড়ির পর এই মন্দির। পর্বতশীর্ষে স্বয়ম্ভু শিবের মন্দির, সামান্য নীচে গুহা-মধ্যে পার্বতী মূর্তি। "পাশেই একটি বিশাল শিলার উপর প্রতিদিন ১০টা হইতে ১টার মধ্যে দুইটি শ্বেতপক্ষী একসংগে বা পৃথকভাবে মন্দিরের পুজারীর হাত হইতে আহার্য গ্রহণ করে; কখনও কখনও শুধু একটি পক্ষী আসে। প্রবাদ আছে যে, পক্ষী দুইটি শাপভ্রষ্ট ঋষিভ্রাতা অথি ও শম্ভু, কাশী হইতে রামেশ্বরের পথে প্রত্যহ এইখানে বিশ্রাম করেন। তাঁহারা যথাক্রমে শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন এবং ইহাঁদের মধ্যে কে বড় ইহা মীমাংসার জন্য শিবের শরণাপন্ন হন। শিব বলেন, উভয়েই সমান কিন্তু ইহা ভক্তদের মনঃপূত হয় না। ক্রুদ্ধ শিবের শাপে তখন ইহাঁরা পক্ষীতে পরিণত হন। আবার কেহ কেহ বলেন, পক্ষী দুইটি হর-পার্বতী।"

"...এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে...মুন্ডর কোইল মন্দিরের মধ্যে নন্দীতীর্থম সরোবর। কথিত আছে গরুড়কে আঘাত করার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যে নন্দী এইখানে তপস্যা করেন।"—ভারতকোষ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

এই বিবৃতি পাঠ করে সহজেই বোঝা যায়, এটির রচনাভঙ্গিতে লোককথার রচনা-ভঙ্গিই গৃহীত হয়েছে। দ্বন্দ্ব, অভিশাপ, রূপান্তর প্রভৃতি 'মোটিফ' এতে আছে। শিব পার্বতী আসলে ছিল fertility বা উর্বরতার প্রতীক রূপে নর-নারীর মিলিত সত্তা, যার ফলে শস্য উৎপাদিত হয়, পাখি দুটি আসলে সেই উর্বরতারই প্রতীক। জোড় বাঁধা, সমলিঙ্গের বা বিপরীত লিংগের প্রাণীর উপস্থিতি লোকচারণায় (folklore)

এক সাধারণ 'মোটিফ'। পরবর্তীকালে এতেই পৌরাণিক কাহিনীর প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।

গরুড় দক্ষিণ ভারতে বিশেষ পূজা-সম্মান পেয়ে থাকে। গরুড় বিষ্ণুর বাহন, দক্ষিণ ভারতে অনন্তের প্রতীক, কেননা, বৃত্তাকারে তা আকাশে ওড়ে। মুভরকোইলের যে নন্দীতীর্থম সরোবরের কথা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে, সে সরোবরটি লক্ষ করবার মত। যেখানে পাপ-অন্যায়বোধ ও প্রায়শ্চিত্ত, সেখানে জলের উপস্থিতি লোকচারণায় দেখা যায়, যেন ওই জলে পাপ-তাপ ধুয়ে মুছে যায়, জলের এমনই যাদুগুণ। গরুড়কে আঘাত করবার জন্যে নন্দীর পাপ হবার মধ্যেই গরুড়কে দেবতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। গরুড় কেন দেবতা? এর পেছনে কেবল বিষ্ণুর বাহন তথ্যটা লক্ষ করলে বলতে হবে, বিষ্ণু যে দেবত্ব লাভ করেছেন, পূর্বে ও প্রথমে গরুড়ই তা লাভ করেছিল, কালক্রমে নররূপী দেবতার বাহন মাত্রে সে পর্যবসিত হয়েছে। গরুড়ের আদিম পরিচয় তাই বিষ্ণুর বাহন রূপে নয়, জল ও সাপের সংমিশ্রণের মধ্যে। বিষ্ণু বা নারায়ণ অনন্ত নাগের ওপর, সমুদ্রে শয়ান আছেন। সাপেরা কুণ্ডলী পাকিয়ে বৃত্ত রচনা করে, সাপ জল ও পৃথিবীর প্রতীক, গরুড় তেমনি বৃত্ত রচনা করে আকাশে ওড়ে বলে অনন্তের প্রতীক হয়েছে। গরুড় সাপকে হত্যা করে, তার ক্ষমতা অসাধারণ। অর্থাৎ জলের ওপরও তার প্রভুত্ব। এই জন্যেই গরুড় দেবত্ব অর্জন করেছিল। এই জন্যেই গরুড় পক্ষিরাজ। বা রাজাই দেবতা হয়, এখানেও তাই। 'হিতোপদেশে'র 'বিগ্রহ' কথাতে দেখা যায় সমস্ত পৃথিবী মিলে সমুদ্রতীরে ভগবান গরুড়ের 'যাত্রা মহোৎসব' করছে।

এই সব কারণেই গরুড়কে ইংরিজিতে Brahminy Kite বলা হয়, যেহেতু ভারতে দেবতা ও ব্রাহ্মণে তফাত নেই। দক্ষিণ ভারতের অনেক হিন্দুই গরুড়ের উদ্দেশে কাঁচা মাংস খণ্ড নিক্ষেপ করেন, গরুড় যদি সেই মাংসখণ্ড গ্রহণ করে, তবে নিক্ষেপকারী মনে করেন, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, বিষ্ণু তুষ্ট হবেন।

আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে গরুড়ের প্রতি এই মাংসখণ্ড নিক্ষেপ গরুড়ের দেবত্বকে আর একবার প্রমাণিত করে। কিন্তু এর মধ্যে একটু জটিলতা আছে। আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ একবার অভিযান করতে ভারতেও এসেছিল। এখানে এসে দেখে, সর্প-অধ্যুষিত উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায় ছড়িয়ে থাকা সর্প-মাণিক্য আহরণের জন্যে বণিকেরা কাঁচা মাংস সেখানে ছুঁড়ে দেয়, মাংসের গায়ে সেই ছড়িয়ে-থাকা মণি-মাণিক্য জড়িয়ে পড়ে, ঈগলেরা তাদের শাবককে সেই মাংস নিয়ে খাওয়ায়, বণিকেরা ঈগলের নীড় থেকে সেই মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করে। অর্থাৎ ঈগল মণি-মাণিক্য দাতা, সে দেবতার মতোই ধনদান করতে পারে, এ বিশ্বাস এখানে কার্যকরী হয়েছে। আবার, এই মণি-মাণিক্য ঈগলের নিজস্ব নয়, সাপের, যে সাপকে ঈগল পরাভূত করতে পারে সহজেই। ঈগলই গরুড়।

শ্যেন, ঈগল ও গরুড় সমার্থক। ঈগল-শ্যেন ঋগ্বেদ ও আবেস্তায় বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। আরব্য উপন্যাসের Roc পাখি আর পারস্যকাহিনীর 'সিমুর্গ'...

প্রকারান্তরে ঈগল-শ্যেন-গরুড়ই। এমন পাখিকে আঘাত করে নন্দী অবশ্যই পাপ কর্ম করেছিলেন। ostiak-রা তাই ঈগলের পুজো করে; অস্ট্রেলিয়ার কোনো-কোনো উপজাতীয়দের মধ্যে 'Eagle cult' প্রচলিত আছে। পাঁচ হাজার বছর আগে, মেসোপোটামিয়ার Lagash শহরে ঈগল পুজো পেত। Hittite-রা ঈগলের জন্যে মন্দির পর্যন্ত তৈরি করে দিয়েছিল। কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ঈগল প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "The Eagle, he was lord above"।

ঈগলের সঙ্গে Zews-এর সংস্রব থেকে একটি পৌরাণিকতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে বটে, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার লোকজীবনে তখন পৌরাণিকতার প্রসঙ্গ ততখানি বড়ো হয়ে দেখা দেয় না, যতখানি ভারতে দেখা দেয়।

উত্তর বঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে গরুড়ের পুজো করা হয়; তিথি হিসেবে মতান্তরে অমাবস্যার কথাও শোনা যায়। গরুড়কে সেখানে বলা হয় 'গোড়লবীর'। এই 'গোড়লবীর'-কে রামায়ণের জটায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের মতে এই গোড়লবীরই রামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ দিয়েছে (রামায়ণে যা সম্পাতি করেছে), এবং রামচন্দ্র ও লব-কুশকে নাগপাশ থেকে উদ্ধার করেছে। কখনো বা এই গোড়লবীরকে "বলরামের ভাই" বলা হয়েছে। এই কল্পনার সঙ্গে 'শঙ্করচিল' বা 'গোবিন্দ' নামের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

বৈশাখ মাসে গোড়লবীরের পুজো করবার উদ্দেশ্য বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, সর্পভয় ও অন্যান্য ভয় থেকে সম্বৎসর মুক্ত থাকবার জন্যে এ পুজো করা হয় (সর্পভয় দূর করবার জন্যে বাঙলা দেশে এখনও তিনবার গরুড়ের নাম উচ্চারণ করবার প্রথা আছে)। গরুড়ের সঙ্গে সর্পের বিরোধ সুপ্রাচীন কাল থেকেই, কদ্রু-বিনতার সপত্নীসুলভ দ্বন্দ্বের মধ্যে। আবার কেউ বা বলেন, গোরুর প্রতি যাতে কুনজর না পড়ে, তারই জন্যে এ পুজো। গরুড়ের সঙ্গে 'গোরু' শব্দের ধ্বনিসাম্য এবং গরুড়জাতীয় শকুনাদি কর্তৃক মৃত গোরুর মাংসভক্ষণ এর পেছনে কাজ করেছে। তবে, এর মধ্যে ধর্ম অপেক্ষা যাদু বেশী: ঠিক যেন ঋগ্বেদে অমঙ্গল সাধন যাতে না করে, সেই জন্যে প্যাঁচাকে স্তববন্দনা করা। এর পুজোচার-টুকু ধর্মের দিক, কিন্তু উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণই যাদুক্রিয়াঘটিত। গরুড় যেন যাদুদ্বারা বশযোগ্য একটি লোকদেবতা, কোনো পৌরাণিকতার আবরণ যেন এখানে নেই।

হিন্দীতে গরুড়কে 'ব্রাহ্মণী চিল' বলে। এ ছাড়া একে বাঙলায় 'শঙ্কর চিল,' 'চণ্ডী চিল,' 'ঠাকুর চিল,' 'মা শঙ্খেশ্বরী,' ইত্যাদি বলা হয়, সবই দেবত্বজ্ঞাপক, পৌরাণিকতার আবরণে আবৃত "সংস্কৃতে বলা হয় ক্ষেমংকরী"। শঙ্খের মতো শুভ্র বলেই সহজেই 'মা শঙ্খেশ্বরী' হয়ে গেছে, অতঃপর ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে 'শঙ্খচিল,' বা 'শাঁকচিল,' হিন্দীতে 'ধোবিয়া চিল' সেই ধবলতার কথাই নির্দেশ করছে। এই সব নাম ও বিশেষণের মধ্যে, zoomorphic গরুড়ের মধ্যে, কেবল পৌরাণিকতার স্পর্শই লাগে নি, ধীরে-ধীরে তাতে মানবরূপের প্রভাব পড়ছে এবং এমন করেই গরুড় অর্ধমানবাকৃত Theiromorphic রূপ প্রাপ্ত হয়েছে অতঃপর।

তাহলে zoomorphic গরুড়ের মধ্যে একদিকে পৌরাণিকতা অপর দিকে মানবাকৃতির প্রভাব পড়ে তাতে এনেছে অভিনবত্ব ও মিশ্রণ। যে পৌরাণিক কাহিনীটি গরুড়ের সঙ্গে যুক্ত সেটি এই : কংস অত্যাচারী রাজা ছিলেন। একদিন কংস দৈবক্রমে জানতে পারলেন, 'তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে' দৈবকীর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করবেন। কংসের কারাগারে দেবকীর সন্তান প্রসব, নন্দের ঘরে সেই সন্তান প্রেরণ, নন্দের কন্যাকে বিনিময়ে আনয়ন এবং সেই শিশুকন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হতেই একটি শংকর চিলে পরিণত হয়ে সে উড়ে গেল, বলে গেল সেই কথা, গিয়ে হল বিষ্ণুর বাহন। আজও শংকর চিলকে দেখলেই বালকেরা বলে,

শংকর চিলের ঘটি বাটি / গোদা চিলের মুখে লাথ॥

ছড়াটির কথান্তর এই :

শংখচিলকে ঘটি-বাটি, ডোম চিলকে কুরুশে কাটি ;

অতোদূর না যেতে পারি, অন্তর থেকে প্রণাম করি॥

এই ছড়াতেই শংকর চিলের অসাধারণত্ব ও দেবত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ শংকর চিলকে "গোবিন্দ"ও বলে থাকেন। যেহেতু এ পাখির সঙ্গে কৃষ্ণের হত্যা জড়িয়ে আছে এবং কৃষ্ণের নামান্তর "গোবিন্দ"। স্ত্রী ও পুরুষ—এই উভয় রূপেই এ পাখিকে দেবত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শংখচিল বা শংকর চিলের প্রসঙ্গে 'গোদা চিল' বা ডোম চিলের নাম একই নিঃশ্বাসে করা হয়েছে। গোদা চিলের মুখে লাথি মারবার কথা বলা হয়েছে বটে কিন্তু চিলও দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। চিলের প্রসংগেও সামান্য পৌরাণিকতার স্পর্শ অনুভূত হয়, যদিও পৌরাণিকতা-বিহীন নিছক লোকদেবতা রূপেই চিলকে বেশি পরিমাণে দেখা হয়েছে।

চিল-পুজোর যে সব দৃষ্টান্ত আমরা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি, তাতে চিলকে সত্য, বাস্তব চিলরূপে পুজো না করে তার মৃণ্ময়মূর্তি গড়ে পুজো করবার দিকটি পাই। একেই আমরা বলেছি পরোক্ষ Zoomorphic দিক। মনে হয়, একদা প্রত্যক্ষ রূপকেই পুজো করা হত, এখন তার মূর্তি গড়ে পুজো হয়।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে 'দুতিবাহন' দেবতাকে প্রসন্ন করবার জন্যে এবং বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা রমণীর সন্তান-কামনায় উড়িষ্যাতে 'দুতিয়াওসা' অর্থাৎ 'দ্বিতীয়া উপবাস' ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। কুমারী ও বিধবারাও এ ব্রত করতে পারে। ব্রতের পূর্বদিন তারা ঘাটে গিয়ে দুটি বেদী তৈরি করে তাতে একটি চিল ও একটি শকুনের মূর্তি আঁকে। দ্বিতীয় দিনেও ডালায় করে বিবিধ পুজা-উপচার নিয়ে সেই চিল-শকুনকে পুজো করা হয়। তৃতীয় দিন সকালে সেই চিল-শকুনকে ভোগ নিবেদন করা হয়। মৃতবৎসা রমণীর শিশুসন্তানকে ঘাটে দাঁড় করিয়ে, তার মাথায় চাঁদোয়ার মতো পুজোয় ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড টাঙিয়ে, তার ওপর বিবিধ উপচার নিক্ষেপ করে। বালক-বালিকারা তাই কাড়াকাড়ি করে খায়, ঠিক যেমন চিল-শকুন খাদ্য-বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।

ওড়িশার 'দ্যুতিবাহন' দেবতার প্রসংগে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ির 'জিতুয়া' বা 'জিতাপরব' অবশ্যই স্মরণযোগ্য। 'জিতুয়া' জিমূতবাহনের পুজো। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী অথবা গৌণচান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীকে জিতাষ্টমী' বলা হয়। জলপাইগুড়িতে একে বলে 'জিতুয়া', বাঁকুড়া জেলাতে বলে 'জিতা পরব'। অপুত্রক রমণী এই ব্রত পালন করলে সন্তানবতী হন। বাঁকুড়াতে ব্রতের স্থানে ব্রতিনীগণ মৃন্ময় শেয়াল-শকুন স্থাপন করে। ব্রতের দিন রাতে চারপ্রহরে চারবার পুজো করবার পর, পরদিন সকালে সেই শেয়াল-শকুন জলে বিসর্জন দিয়ে স্নান করা হয়। জলপাই-গুড়ির 'জিতুয়া' ব্রতে কিন্তু শেয়াল-শকুনের মৃন্ময় মূর্তি গড়া হয় না, কিন্তু ব্রতকথায় সেই শেয়াল-শকুনকে পাওয়া যায়। মনে হয়, একদা শেয়াল-শকুনের মূর্তি নির্মাণ বা অংকনের প্রথা ছিল, আজ তা লুপ্ত হয়েছে। মেদিনীপুরে এই ব্রতকে বলে 'জিতার গোট'। বিহারের 'জিতিয়া পরবে' চিল ও শেয়ালকে 'ধুঁধুল' নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

ওড়িশার 'দুতিয়াওসা'র চিল-শকুন বাঙলা দেশে শেয়াল-শকুনে পরিণত হয়েছে; শেয়াল অবশ্য ওড়িশাতেও দেওয়া হয়। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য চিল ও শকুন। চিল ও শকুন এখানে স্বর্লোক হিসেবে উপস্থিত, অতএব তারা পুংজননেন্দ্রিয়ের নয়, নারীত্বেরই প্রতীক। তাদের শুভেচ্ছাতেই বন্ধ্যা ও মৃতবৎসাগণ পুত্রবতী হয়। বিশেষ তিথি ও মাসের বাধ্যবাধকতা, দ্যুতিবাহন জিমূত বাহনের নাম ও প্রসঙ্গ এতে পৌরাণিকতার প্রভাব অর্পণ করেছে, কিন্তু এর লোকচারিত্র্য তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নি। পুজানুষ্ঠানটি মানবিক জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বোম্বাইতে বিশ্বাস আছে, গর্ভবতী রমণী চিলের স্বপ্ন দেখলে পুংসন্তানের জননী হয়। শশা, ধুঁধুল ইত্যাদি নৈবেদ্য স্পষ্টতই পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক।

বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, কোংকণ, প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে, ওড়িশায় এবং অন্যত্র 'কোকিল ব্রত' অনুষ্ঠিত হয়। 'কোকিল ব্রতে'র মধ্যে পৌরাণিক প্রভাব প্রবল; অনুষ্ঠানটি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, একদা Zoomorphic রূপেই কোকিলকে পুজো করা হত; এখন তা পরোক্ষ রূপ ধরেছে। স্বর্ণময়, মৃন্ময় ইত্যাদি নানা ধরণের কোকিল গড়ে এখন পুজো করা হয়।

কোকিল ব্রতে কোকিল দুর্গা বা পার্বতীর প্রতীক। দক্ষরাজ তাঁর যজ্ঞে কন্যা-জামাতাকে নিমন্ত্রণ করলেন না; সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিত্রালয়ে এলেন। পতিনিন্দা শুনে তিনি দেহত্যাগ করলেন, যজ্ঞাগ্নিতে দেহ নিপতিত হওয়ায় তা অশুচি ও অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাবার অপরাধে সতী শিবের চোখে হলেন অপরাধী, শিবের অভিশাপে সতী কোকিল রূপ প্রাপ্ত হলেন। ব্রহ্মা তখন শিবকে সদয় হতে বললেন। সদয় হয়ে শিব কোকিলরূপা সতীকে বললেন, হাজার-হাজার বছর কোকিল রূপ ধারণের পর তিনি শাপমুক্ত হবেন, শিব আবার তাঁকে সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করবেন। এই সময়ের মধ্যে সকল নর-নারী সতীকে কোকিল দেবী জ্ঞানে পুজো করবে। যে-যে বৎসর আষাঢ় মাস "অধিক মাস' হবে, সেই বৎসর

আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা থেকে শ্রাবণের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস এই ব্রত পালিত হবে। যে নারীরা এই ব্রত পালন করবে, তারা কোনোদিন বিধবা হবে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, আষাঢ় মাসের শেষ দিন থেকে শ্রাবণের শেষ দিন পর্যন্ত এই ব্রত পালিত হয়।

স্কন্দপুরাণে (অষ্টম : ৪২-৪৩)-র অন্তর্গত "কোকিল মাহাত্ম্য" অংশে কোকিল কেন শ্রদ্ধার্হ, তার বিবরণ আছে।

পূজার পদ্ধতি স্থানে-স্থানে ঈষৎ ভিন্ন। পশ্চিম ভারতের কোঙ্কণ অঞ্চলের (Folklore of the Konkon : The Indian Antiquary (suppl), 1914, p 84) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "This bird is specially worshipped by high caste Hindu women for the period of one month,…… which is held in the month ashadha at intervals of twenty years." ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই যোগ দেখা গিয়েছিল।

পশ্চিম ভারতে "কোকিল ব্রত" এই ভাবে উদ্‌যাপিত হয় (Hindu holidays and ceremonials, 1919, pp. 106—108 : V. A. Gupte) : ব্রত-ধারিণীরা আষাঢ় মাসে যে কোনো জলাশয়ে সকালে স্নান করে প্রতিদিন বাড়ি ফিরে স্বর্ণনির্মিত কোকিল-প্রতিমার পুজো করে। কোকিলের চোখ লাল বলে তা 'রুবি' পাথরের তৈরি করানো হয়; পা দুটি রুপোর। সামর্থ্য না হলে তিলের গুঁড়ো দিয়ে কোকিল মূর্তি তৈরি করেও পুজো করা হয়। সারাদিন উপবাস করে, দিনে শুধু একবার আহার করা চলবে : দিনমানে অন্তত একবার কোকিলের ডাক না শোনা পর্যন্ত কিন্তু খাদ্য স্পর্শ করা যাবে না। এই Taboo-তেই মনে হয়, একদা বাস্তব কোকিলকেই পুজো করা হত।

অনেকে এই স্বর্ণময় কোকিলকে রৌপ্য-নির্মিত আম্রবৃক্ষে স্থাপন করে পুজো করে। রাও বাহাদুর পি. বি. যোশী তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে (The festival of the cuckoo : Journal of the Anthropological society of Bombay : Vol. IX, No. 8. pp. 554-567) এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। দিনে অন্তত একবার কোকিলের ডাক শুনতে হবে অথবা একবার কোকিল দর্শন করতে হবে।

উত্তর ভারতের "কোকিলব্রত" সম্পর্কেও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে (North Indian Notes and Quaries : December, 1894 : p. 151)। এখানেও একমাস ব্রহ্মচর্য পালন, বিশেষ শপথ গ্রহণপূর্বক ব্রতগ্রহণ, জলাশয়ে স্নান, ইত্যাদির কথা আছে। কোকিলকে পুজা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে পুজাস্থান 'পঞ্চামৃত' দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়। কোকিল দেবীকে শাড়ী, গয়না, গন্ধদ্রব্যে সাজানো হয়। পরিশেষে একটি সোনার কোকিলমূর্তি গড়ে কোনো ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়।

ওড়িশার কোকিলব্রত ঈষৎ ভিন্ন ধরণের। কুঞ্জবিহারী দাস তাঁর গ্রন্থে (A study of orrissan folklore, 1953, p. 47) এ বিষয়ে লিখেছেন : "The Virgins

construct a statue of the cuckoo, keep it in a mango tree after due worship and sing songs of the spring season. This is peculiar to Balasore".

এ পর্যন্ত যে সব তথ্য পরিবেশিত হলো, তা থেকে দেখা গেল, কোকিলকে নারীরূপে দেখা হয়েছে ; তার পৌরাণিক আসঙ্গটি এখানে প্রবল। বাস্তব কোকিল এবং হাতে-গড়া কৃত্রিম কোকিল—দুই রূপেই কোকিল পূজ্য। কিন্তু লক্ষ-করবার বিষয়, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ভরা বর্ষায় কোকিল পুজো করা হয়, ওড়িশায় সেখানে বসন্তকালের গান গাইবার প্রসঙ্গ আছে। কোকিলকে বসন্তকালেই বেশি দেখা যায়, অনেকে তো এমন কথাও বলেন, বর্ষায় কোকিল পরিযায়ী হয় (যদিও হয় না)। বর্ষায় বিরল-দর্শন বলেই কি কোকিলের মর্যাদা তখন বৃদ্ধি পায় ? আম গাছের আসঙ্গ শস্যের দিককে নির্দেশ করে, আর ভারতের কৃষিকাজ সবই বর্ষাকালে, যদিও আমের সঙ্গে বসন্ত ও গ্রীষ্মেরই যোগ কেবল ! তথাপি, সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানটিকে একটি শস্যোৎসব বলে মনে করা যায়, তবে কোনো-কোনো অঞ্চলে এটি আবার কেবল অভিজাত মহিলাদেরই ব্রতানুষ্ঠান বলে কথিত হয়। কোকিল পার্বতী বা দুর্গা রূপা, দুর্গার বোধনকালে যে 'নব পত্রিকা'র প্রবেশের প্রসঙ্গ আছে, তা বিশুদ্ধ বৃক্ষোপাসনা। কোকিল ব্রতের আমগাছ কি তারই দ্যোতনা করে ?

এই কোকিল ব্রতের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার জয়দুর্গার পুজোর কথা তুলনা করবার মতো। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'Cult of Joya Durga' প্রবন্ধে (All India oriental conference : Sixth session, Patna, December, 1930 : পঠিত) বলেছেন, জয়দুর্গা পুজোর সঙ্গে অন্যান্য যে সব উপদেবতার পুজো করতে হয়, তাদের মধ্যে একজন "কোকিলাক্ষ", ইনি ব্যাঘ্রবাহন। 'দুর্গা' এবং 'কোকিল' এই দুটি দিক কি উপর্যুক্ত কোকিলব্রতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় ?

দেবী দুর্গার কথা যখন উঠলই, তখন এই প্রসঙ্গে দুর্গার সঙ্গে জড়িত কিছু পক্ষি-সংস্কারের ও আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভগবতী ভবানী "ময়ূর কুক্কুটাবৃতা" রূপে বর্ণিতা হয়েছেন। দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর খঞ্জনদর্শন বিশেষ শুভজনক বলে স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হয়েছে। আশ্বিন মাসে খঞ্জন দেখলেই পাবনা জেলার লোকেরা তাকে দেবী জ্ঞানে প্রণাম করে থাকে, ইংলণ্ডের কৃষকেরাও খঞ্জন (the wagtail) দেখলেই তার উদ্দেশে মাথা নত করে ; কারণ, তাদের মতে এ পাখি কৃষিকর্মের অনুকূল আবহাওয়া আনয়ন করে। বিহারে বিশ্বাস করা হয়, রামচন্দ্র ধরাতলে এ পাখিকে প্রতি বৎসর

পাঠিয়ে থাকেন—কৃষিকর্মের ভালো-মন্দের বিবরণ জানতে। আশ্বিন মাসেই এ পাখি দেখা যায় বেশি করে, দেবীর বিসর্জনের পর এ পাখিও বিদায় নেয়, এ পাখি ফিরে গেলে তবেই পরবর্তী বৎসরের ফলোৎপাদনের ব্যবস্থা করেন রামচন্দ্র।

রামচন্দ্রের সঙ্গে খঞ্জনকে সম্পৃক্ত করবার ফলে রামচন্দ্র একটি কৃষিদেবতা হয়ে উঠেছেন। রামচন্দ্রই শরৎকালে দেবী দুর্গার অকাল-বোধন করেছেন; রামচন্দ্র ও দুর্গা এইভাবে সম্পৃক্ত। যে সীতাকে রামচন্দ্র বিয়ে করেছেন সেই 'সীতা' শব্দের অর্থ লাঙলের ফাল-রেখা, অর্থাৎ রামচন্দ্রের কৃষি দেবত্ব এতে স্পষ্ট হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তির দিনই হৈমন্তিক বা আমন ধান 'ফুলোয়', অর্থাৎ ধানের শীষ ওঠে, সমস্ত বঙ্গীয় কৃষককুল এদিন এক অনুষ্ঠান পালন করে।

খঞ্জন যেমন রামের দূত, বিহারে তেমনি নীলকণ্ঠ সীতার দূত। নীলকণ্ঠ পাখি দেখলেই তাই বলা হয়,

নীলকণ্ঠ নীলওয়ারি বারি / সীতা সে কহি দীহ ভেঁট অঁকওয়ারী॥

অর্থাৎ: নীলকণ্ঠ, তুমি নীল-সবুজ উদ্যানের অধিবাসী; সীতাকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ো।

নীলকণ্ঠ পাখি দেখলে বিদ্যালাভ হয় বলে সরস্বতী পুজোর দিন এ পাখি দেখার সংস্কার পশ্চিমবঙ্গে কোনো-কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে হরিহর অপুকে নিয়ে সরস্বতী পুজোর দিনই নীলকণ্ঠ পাখি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেই কোথাও-কোথাও বিজয়া দশমীর দিন নীলকণ্ঠ দর্শন শুভজনক বলে বিশ্বাস করা হয়, যদিও 'তিথ্যাদিতত্ত্বে' এই দিন খঞ্জন দর্শনই শুভজনক বলে কথিত হয়েছে।

তাহলে খঞ্জনের সংগে নীলকণ্ঠ এবং দুর্গার সংগে সরস্বতী তালগোল পাকিয়ে গেছে। এই সংমিশ্রণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের একটি বিশিষ্ট পুজোর মধ্যে মেলে। "উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পুজো-পার্বণ" গ্রন্থে শ্রীগিরিজাশংকর রায় একটি তথ্য (পৃ: ৫২) জানাচ্ছেন: উত্তরবঙ্গে বিজয়াদশমীর দিনই দুপুর বেলায় সরস্বতী পুজো হয়ে যায়। পুজোর উপকরণের মধ্যে বিশেষ উপকরণ হল "যাত্রাসি" (গিরিজাশংকর রায় লিখেছেন "যাত্রাসি") নামক পুষ্পের পল্লব। যোগেশচন্দ্র দাস তাঁর 'Folklore of Assam' (১৯৭২) বইতে লিখেছেন (p. 47), আহোমরা সুবচনী (শুভচণ্ডী) পুজোর দিনই সরস্বতীকেও পুজো, বলি ইত্যাদি নিবেদন করে থাকে, যেহেতু সুবচনী দুর্গাই এবং সরস্বতী তাঁর কন্যা। এইসব পুজোর মধ্যেই খঞ্জন-নীলকণ্ঠের মিশ্রণের কারণ পাই।

গিরিজাশংকর রায়ের কথিত 'যাত্রাসি' পুষ্পনাম বটে, কিন্তু 'যাত্রাসি' প্রান্ত-উত্তরবঙ্গেরই একটি পাখিরও নাম। 'যাত্রাসি' মানে 'যাত্রাসিদ্ধি'। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রঙপুর জেলায় বিজয়াদশমীর পর থেকে কালীপুজো পর্যন্ত 'যাত্রাসি'

পাখি দেখলেই তাঁর শুভশংসা কামনায় করজোড়ে প্রণাম করা হয়। কেউ-কেউ এটিকে বলে 'যাত্রাকালী' পাখি, যেহেতু সময়টি কালীপুজোর। 'যাত্রা' বলতে বিজিগীষুর যুদ্ধার্থ যাত্রা, অগ্রহায়ণ মাসেই তা প্রশস্ত বলে মনু (৭. ১৮২) নির্দেশ করেছেন: 'মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যায়াদ্ যাত্রাং মহীপতিঃ।'' 'বৃহৎসংহিতা'য় (৮৬·৩) যাত্রাশাস্ত্র কারকরূপে "যাত্রাকার" শব্দ মেলে। লক্ষ করা দরকার, উত্তরবংগে বিজয়াদশমীর দিন গৃহস্থলীর দ্রব্যাদি ও লাঙল-জোয়াল ইত্যাদি ধোয়া-মোছা করা হয়, দিনটিকে 'হালযাত্রা' বলা হয়। মধ্যবংগে ও পূর্ববংগে বিজয়াদশমীর দিন অপরাহ্ণ বেলায় প্রতি গৃহিণী অঙ্গনে আলপনা দিয়ে দেবীর 'যাত্রা'য় মঙ্গল কামনা করে জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করে থাকেন, তাকে বলে 'যাত্রাঘট'।

'যাত্রাসি' পাখির মতো বীরভূমের মানিকজোড় পাখি সম্পর্কে বিজয়াদশমীর দিন কিছু আচার-সংস্কার পালন করা হয়। সে দিন মাণিকজোড় পাখির দর্শন করা বীরভূমের কৃষকদের এক অবশ্য পালনীয় কর্ম। এমন কি, সূর্যাস্ত পর্যন্তও যদি সেদিন এ পাখির দর্শন না মেলে, তথাপি তারা জলস্পর্শও করে না। না দেখা পর্যন্ত তারা এক আতঙ্কিত অবস্থায় সময় কাটায়। পাখিটি বিরল দর্শন, তথাপি তারা মনে করে তাদের পুণ্য ফলেই সেদিন তারা পাখিটিকে দেখতে পাবে এবং বছরটা তাদের পক্ষে শুভ হবে। শুভ অর্থাৎ ভালো কৃষিকাজ হবে। এই পুণ্য তারা অর্জন করে দেবী ভগবতী বা দুর্গারূপা গোরুর সেবা-যত্ন করে। ঐদিন তাই চাষ করতে নেই, লাঙল-জোয়াল ধুতে-মুছতে হয়, একে বলে "চাষ তোলা"।

তাহলে বিজয়াদশমীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের 'যাত্রাসি' এবং পশ্চিমবঙ্গের মাণিকজোড় মিলে গেছে। আগেই বলেছি, আশ্বিন-সংক্রান্তির দিনই ধানের শীষ ওঠে বলে বিশ্বাস। বিজয়াদশমীর দিন অঙ্গনে স্থাপিত 'যাত্রাঘট' শস্যপূর্ণ খামারের প্রতীক। প্রান্ত-উত্তরবংগে কোনো-কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, এই দিনই আসামের দিক থেকে উড়ে-আসা কোনো পাখির দল যদি সদ্যোজাত ধানের শীষ ঠুকরে খায়, তবেই সে বছর ভালো ধান হয়। পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে মৌসুমী বায়ু উদ্ভূত হয়ে আসামের পাহাড়ের ধাক্কা খেয়ে পুনরায় বিপরীত পথে যাত্রা করে, এই মৌসুমী বায়ুজাত বৃষ্টিই আমন ধানের বৃদ্ধির কারণ। এইজন্যেই আসামের দিক থেকে উড়ে-আসা পাখির শস্যোৎপাদন করবার ক্ষমতায় বিশ্বাস করা হয়েছে; পাখি এখানে বৃষ্টির বিকল্প।

নীলকণ্ঠ-খঞ্জন, দুর্গা-সরস্বতীর মিশ্রণ প্রসংগে আমরা যাত্রাসি-মাণিকজোড়ের কথায় গিয়ে পড়েছিলাম। আবার নীলকণ্ঠের প্রসংগে ফেরা যাক। শিবের এক নাম নীলকণ্ঠ। বিশ্বাস এই: বিহারের দশহরার দিন এবং বাঙলার বিজয়াদশমীর দিন শিব নীলকণ্ঠ পাখির রূপ ধরে মর্তে আসেন, দুর্গাকে আবার কৈলাসে নিয়ে যেতে। তাই দুর্গাপুজোর পর নীলকণ্ঠ পাখিকে আর দেখা যায় না, এবং বিজয়াদশমীর দিন দেখা শুভজনক। দশহরার শেষ দিনে বিহারের হাথুয়ার মহারাজা প্রতিবৎসর একজোড়া নীলকণ্ঠ পাখি আকাশে উড়িয়ে দিতেন, যেহেতু সেদিন এ পাখি দেখা শুভ. একদা কলকাতাতেও বিজয়াদশমীর দিন দুর্গা প্রতিমা

ভাসানোর সময় নদীতে এ পাখি ওড়ানো হত। সাধারণতঃ যারা প্রতিমা ভাসায়, তারাই ওড়াত। এ প্রথা এখন প্রায় উঠেই গেছে। নাগপুরের মহারাজাও দশহরার দিন এ পাখি আকাশে উড়িয়ে দিতেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অন্যান্য উৎসবের সময় নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হয়। যে সব দরিদ্র লোকেরা বেদে, শিকারী বা পাখি-ধরাদের কাছ থেকে উচ্চ-মূল্যে সেদিন এ পাখি কিনতে পারে না, তারা দশহরার দিন ঝোপে-ঝাড়ে গিয়ে অন্তত একবার দেখে আসে। বণিকরাও প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে বিজয়াদশমীর দিন নীলকণ্ঠ পাখি দর্শন করে।

নীলকণ্ঠ পাখি এতোই শুভসূচক যে, এ পাখি দেখলেই বাঙলা দেশে এই ছড়া বলা হয়ঃ

> নীলকণ্ঠ গদাধর, তোমার পায়ে একশ' গড়।
> তুমি রইলে ডালে, আমি রইলুম খালে ;
> দেখা হয় যেন মরণ কালে।

নীলকণ্ঠ এখানে গদাধর অর্থাৎ বিষ্ণু। মরণকালে কেউ এ পাখির দর্শন পেলে মনে করে, মর্তেই সে স্বর্গের বিষ্ণুকে দেখতে পেল। নীলকণ্ঠ এখানে soul bird-ও বটে।

এক নীলকণ্ঠের মধ্যে তাহলে সীতা, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ও বিষ্ণু এসে মিলিত হয়েছেন। মনে হয়, বিভিন্ন যুগে পাখিটির সম্পর্কে সংস্কার ও বিশ্বাসের বিবর্তন ঘটেছে ; কিংবা ভ্রমক্রমে এক সংস্কারের সঙ্গে অপর পাখির সংস্কারকে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। দশহরা, দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজো—তিনটে পূজো একত্র হয়ে মিশে গেছে। দুর্গা শস্যদেবী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের "দশবিধ পাপহরা" দশহরার দিন গঙ্গা পূজো হয়, গঙ্গা হরজটা-নিঃসৃতা। দুর্গা ও গঙ্গা উভয়েই শিবের সহধর্মিণী। বিজয়া দশমীকে বহুস্থানে দশহরা বলা হয়, 'দশমী' তিথি উভয় ক্ষেত্রেই আছে। মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয় "গঙ্গা প্রাপ্তি" ঘটেছে। মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর কানে যে তারক-ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করা হয়, তা এইঃ "গঙ্গা, নারায়ণ, ব্রহ্মা।" নারায়ণ ও ব্রহ্মের নামের সঙ্গে ত্রয়ীর তৃতীয় নাম শিবও এসে গেছেন। এইভাবে শিব-দুর্গা-গঙ্গাকে একসূত্রে গাঁথা যায়। বিজয়া দশমীর দিন, দেবীর বিসর্জনের পর, কুলাচার অনুযায়ী "অপরাজিতা' পূজো হয়ে থাকে। অপরাজিতা দেবী বটেন, কিন্তু ফুলেরও নাম। অপরাজিতার রঙ নীল, এইজন্যে অপরাজিতা ফুলের নামান্তর—নীলকণ্ঠ। নীল রঙের সূত্র ধরেই নীলকণ্ঠ পাখি ও নীলকণ্ঠ মহাদেবকে একাত্ম করে নেওয়া যায়। আগেই বলেছি, দুর্গা শস্য-দেবী। পক্ষিতত্ত্ববিদদের মতে নীলকণ্ঠ মাছরাঙা গোত্রীয় পাখি। মাছরাঙা Rain bird রূপে সুপরিচিত, অনেক সময় স্বয়ং নীলকণ্ঠও Rain bird। নীলকণ্ঠের মাধ্যমে দেবী দুর্গা জড়িত, অতএব শস্য-দেবী দুর্গা ও জলদেবী গঙ্গাকে অভিন্ন বলে মনে করা যায়। নীলকণ্ঠের নীল রঙ অতঃপর ময়ূরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, যে ময়ূর

অনেক সময় সরস্বতীর বাহন, অনেক ক্ষেত্রে নীলকণ্ঠই সরস্বতীর বাহন রূপে উল্লিখিত হয়েছে। তদুপরি সরস্বতী দুর্গার কন্যা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গাকে "ময়ূর-কুক্কুটাবৃতা" বলা হয়েছে ॥

.. ৭...

Zoomorphic রূপে পাখিকে পুজো নিবেদনের মধ্যে পৌরাণিকতার প্রভাব অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা শিবদুর্গা-সরস্বতীর প্রসঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সেই মূল প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরে যাই।

পাখির Zoomorphic রূপ ও তার Anthropomorphic রূপের সংমিশ্রণ ও রূপান্তর ধারণের সুন্দর উদাহরণ পাচ্ছি তামিলনাড়ুর সালেম জেলার শুকবনেশ্বর থেকে। F. J. Richards তাঁর লেখা একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে Stala Putana : Qtly Journal of the mythic Society of Bangalore : Vol. V, No 1, PP.17-18) এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সালেম জেলায় অবস্থিত শুকবনেশ্বর মন্দিরটি নবম শতক বা তারও পূর্ববর্তী কালে স্থাপিত হয় ; স্থলপুরাণে এই মন্দিরটি সম্পর্কে একটি কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে : কলিযুগে ব্যাসের পুত্র ব্রহ্মার বিরাগভাজন হলেন, তার ফলে ব্যাসপুত্র শুক পাখিতে পরিণত হলেন। শুকরূপ ধারণ করে ব্যাসপুত্র শুকদেব রাজা হলেন এবং সালেম মন্দিরে পুজো পেতে লাগলেন। কিন্তু মানুষের ক্ষেতের ফলমূল শস্যাদিও আহরণ করতে লাগলেন। কৃষকেরা অতিষ্ঠ হয়ে একদিন শুকরাজ ও তাঁর অনুচরদের তীরধনুক নিয়ে আক্রমণ করলে। ভয়ে শুকরাজ মন্দিরের ভেতর শিবলিঙ্গের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন ; কিন্তু প্রজারা সেখানেও তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করল। হত্যা করার জন্য যে আঘাত হানা হয়, দৈবাৎ সে ঘাতক শিবলিঙ্গতেও লাগায় লিঙ্গ থেকে রক্তপাত হতে থাকল। এই অপরাধে কাতর হয়ে ঘাতক আত্মহত্যা করলে। মৃত ব্যাসপুত্র তাঁর শুকরূপ পরিত্যাগ করে পুনরায় মানবরূপ ফিরে পেলেন। ওই ঘটনারই স্মরণে সালেমের এই মন্দিরের নাম হয়—'শুকবনেশ্বর। শস্য রক্ষা করবার জন্য শুকদেবতাকে হত্যা করা হয়, সুতরাং এই পক্ষিদেবতা কৃষিকর্মের ক্ষতিকারক,—এ হিসেবে এর পশ্চাতে কৃষিকর্মকেই খুঁজে পাই।

প্রাচীন ইজিপ্টে সারস প্রত্যক্ষভাবে পূজিত হত। ইজিপ্টেই 'Bennu' পাখি এক প্রধান পক্ষিদেবতা। এই পাখি যদিও পৌরাণিক ও কাল্পনিক, প্রাচীন ইজিপ্টবাসীরা এটিকে বাস্তব বলেই মনে করত। এটিতেও 'শুকবনেশ্বরে'র পক্ষিদেবতার মধ্যে মানুষ ও পক্ষিমূর্তির বিনিময় ঘটেছে। Osiris-এর আত্মারূপী এই পাখি Heliopolis-এ পুজো পেত। 'Ra'-র সঙ্গেও এ পাখি জড়িত। Larousse Encyclopedia of Mythology (19.9) গ্রন্থে Bennu সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে : "He is

identified, though not with certainity, with the Phoenix who, according to Herodotuas, Helopotitan guides, resembled the eagle in shape and size, while Bennu was more like a lapwing or a heron The Phoneix, it was said, appeared in Egypt only once every five hundred years. When the phoenix was born in the depths of Arabia he flew swiftly to the temple of Helioplis with the body of his father which, Coated with myrrh, he there piously buried.''—P.46

এই প্রসঙ্গে চীনের Phoenix পাখির কথা বলি। ফিনিক্স চীনদেশে সবচেয়ে সম্মানিত পাখি। যে চারটি ইতর প্রাণীকে চীনদেশে সম্মান করা হয়, ফিনিক্স তাদের অন্যতম। চীনের শিল্প-সাহিত্যেও ফিনিকস একটি বড়ো ও প্রধান 'মোটিফ'। চীন ভাষায় পাখিটিকে বলে The feng huang অর্থাৎ "the Emperor of all birds," পাখিটির পরিচয় ও দৈহিক বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করলে এটিকে একটি কাল্পনিক ও মিশ্রপ্রাণী বলে মনে হয়। এর সম্মুখ দিকটা বন্য হাঁসের মতো, গলা আবাবিলের মতো, ঠোঁট মুরগীর মতো, ঘাড় সাপের মতো, ল্যাজ মাছের মতো (ল্যাজে সাধারণত বারোটি পাখা থাকে, কিন্তু যে বৎসর 'অধিকমাস' হয়, সে বছর তেরটি পাখা থাকে), কপাল সারসের মতো, পিঠ কচ্ছপের মতো। উচ্চতা পাঁচ হাত। পাখার রঙ পাঁচটি প্রধান 'গুণ'-এর সমন্বয়ে। ল্যাজের দিকটা একটি বিশিষ্ট চীনীয় সঙ্গীতযন্ত্রের মতো। দেশে যখন শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ চলছে, তখনই কেবল এর আবির্ভাব ঘটে; দুটি ফিনিক্সকে কখনই এক সঙ্গে আবির্ভূত হতে দেখা যাবে না। যখন ফিনিক্স ওড়ে, তখন এক ঝাঁক ছোটো পাখি এর সঙ্গে ওড়ে। আরব্য ফিনিক্স এক রকমের ঈগলই; চীনীয় ফিনিক্স কাল্পনিক; এ যেন, "··as it were a kind of inanimate yet superbly elegant statue, which they had full liberty to vivify and embellish with every benevolent quality, and make it throughout perfectly beautiful and good." এর মধ্যে এক অসাধারণত্ব, ও দেবত্ব আছে বলেই বিশেষ চীনীয় নৌকো 'Junk'-এর হালে এ পাখি স্থূলভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকে: পাখা মেলে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে। "It presides over the southern quadrant of the heavens, and therefore symbolizes sun and wormth for summer and harvest"। আরও বলা হয়েছে: "This divine bird is the product of the sun or of fire, hence it is often pictured gazing on a ball of fire. The sun being the yang or active principle, the Phoenix has great influence in the begetting of children."—Encyclopedia of Chinese symbolism and Art motives." pp. 320-322.

ফিনিক্স sun এবং fire bird; সৌর পাখি রূপে উর্বরতার প্রতীক, যে উর্বরতা নারী-দেহে সন্তান রূপে এবং ভূমিতে শস্য রূপে দেখা দেয়। ফিনিক্স পৌরাণিক ও

কাল্পনিক পাখি বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবিক জগতের সুখ-সমৃদ্ধি ও উর্বরতার লৌকিক দেবতা রূপেই তার শেষ পরিচয়।

খ্রীষ্ট পুরাণ ও খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গেও কয়েকটি পাখি যুক্ত হয়েছে, যদিও এরা দেবতার স্তরে উন্নত হতে পারে নি। পাখিকে 'পবিত্র' বলে মানা হয়েছে, দেবতার আসঙ্গও তাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যাকে 'দেবতা' বা 'উপদেবতা' বলা যায়, খ্রীষ্ট পুরাণে পাখিকে তা যেন দেওয়া হয় নি। তবু দেবতার আসঙ্গ আছে বলে তার আলোচনা এখানে করছি। খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাস করা হয় 'Devine spirit' কপোত-ঘুঘুর রূপাকৃতি গ্রহণ করে। শয়তান নিজেকে যে কোনো রূপ ও আকৃতিতে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু কপোত ঘুঘু এতই পবিত্র যে তার রূপ ধারণ করতে পারে না। ভগবান ঘুঘুর রূপ ধারণ করতে পারেন ম্যাথু: ৩·১৬)। যিশুর মা, কুমারী মেরীকে যেদিন (২৫ শে মার্চ) সংবাদ দেওয়া হয়, তিনি মা হবেন, সেই Announciation-এর দিন ঈশ্বর মেরির কাছে একটি ঘুঘু-কপোতের রূপ ধরে এসেছিলেন (গিব্রিয়েল নামে এক দেবদূত মেরিকে এই সংবাদ দেয়)। নোয়ার 'আর্ক' থেকেই (মতান্তরে মেসোপোটমিয়াতে) কপোত-ঘুঘুর উদ্ভব হয় বলে কথিত আছে। All fool's day বা April fool's day-র প্রকৃত উদ্ভব আজও অজানা, একাধিক কারণ এর পশ্চাতে আছে বলে মনে করা হয়। তার মধ্যে একটি: ' the fruitless mission of the dove sent out from the ark by Nooh". যিশুর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একাধিক পাখি। যিশুর ক্রুশের কাঁটা তুলতে গিয়েই ক্রসবিল পাখির ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেছে; বুক পেতে সেই ব্যথার রক্ত গ্রহণ করেছে বলে রবিন রেড ব্রেস্ট-এর বুক লাল। তেমনি চড়ুই ও ম্যাগপাই তখন নিষ্ঠুর আচরণ করে ছিল বলে অশুভ ও অপবিত্র পাখিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রীস ও রোমের অনেক পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে পাখির প্রতিবেশ লক্ষ করা যায়। গ্রীক মন্দিরগুলিতে পবিত্রজ্ঞানে হংসমূর্তি রক্ষিত থাকত। Juno-র রোমস্থিত মন্দির খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে হাঁসদের দ্বারাই বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। প্রতিবৎসর ওই হাঁসদের সম্মানে একটি সোনার হংসী নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। ময়ূর ও ময়ূর পালক দেবী জুনোর অতিপ্রিয়। ইজিপ্টের দেবতাদের অঙ্গ শোভার জন্যও ময়ূর পালক ব্যবহৃত হত। এর সঙ্গে কাশীর ভৈরবনাথের পুরোহিতের হস্তস্থিত ময়ূর-পুচ্ছ নির্মিত দণ্ডের কথা তুলনা করা যায়: সেই দণ্ডটি দিয়েই তিনি পাপীকে সাজা দেন, বা ক্ষমা করেন। গ্রীকদেবী Hera-র মন্দিরেও ময়ূর-পুচ্ছ রক্ষিত হত। কিন্তু ময়ূর পালক হেরা ও জুনো, গ্রীক ও রোমান দুই দেবীর কাছে পবিত্র বলে গৃহীত এবং ময়ূর পালকের বিশিষ্ট ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও পরবর্তীকালে তা অব্যাহত থাকে নি। পুরোহিত ব্যতীত মন্দিরের ময়ূরপুচ্ছে কারোই হাত দেবার অধিকার ছিল না, এ বিষয়ে taboo ছিল, ছুঁলে মহাপাপ হত, যার শাস্তি তখন মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ছিল। এরই ফলে কালে-কালে ময়ূর পালক অশুভতার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে গোটা ইউরোপে। আসলে

খ্রীষ্টপূর্ব Pegan সংস্কৃতি ও খ্রীষ্টোত্তর সংস্কৃতির পার্থক্য এখানে ক্রিয়াশীল হয়েছে। মুসলমানেরা যেমন বিশ্বাস করেন, ময়ূরই স্বর্গের "দুষ্ট-দুয়ার', খুলে দেওয়ায় শয়তান স্বর্গে ঢুকে পড়েছে। উল্টো দিকে চীনের কল্পনানুসারে আকাশের সর্বোচ্চস্তরের দেবতা yu-ti-র পত্নী wang-ma niang niang-কে কখনো-কখনো ময়ূরসহ অঙ্কিত করা হয়।

কয়েকজন রোমান দেবদেবীর সঙ্গে পাখির উৎসঙ্গ বেশ দেখা যায়। কৃষি ও যুদ্ধের দেবতা Mars এর অন্যতম প্রিয় প্রাণী হল—কাঠঠোকরা। Mercury-র প্রিয় বাহন-মুরগী। রোমান কল্পনায় দেবী Minerva-র কোনো মূর্তি নেই; কিন্তু Etrms can দের কল্পনায় মিনার্ভার পক্ষিবৎ পক্ষ আছে বলে কল্পিত হয়েছে। তেমনি দেবী Fortuna কেও কদাচিৎ পাখা-সহ কল্পনা করা হয়েছে।

টিউটনিক পুরাণের সবচেয়ে মান্য দেবতা হলেন woden (জার্মানীতে) বা odin (স্কান্ডিনেভিয়ায়)। ও ডিনের (দুটি শ্বেতকায়, পরে কৃষ্ণকায়) কাক ছিল, তারাই চরাচরের তাবৎ ওডিনকে দিত। তেমনি ব্ল্যাক আফ্রিকার বুশম্যানদের সেরা দেবতা 'cagn'-এর দূত ত পাখিরাই। কেল্টিক পুরাণের পাতাল দেবী Rhiannon এর প্রধান সম্পদ ছিল বাহন হিসেবে তিনটে পাখি। দেবী রিয়ানের এই পাখি তিনটের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল: তারা গান গেয়ে মরা মানুষ বাঁচাতে পারত, জীবন্ত মানুষকে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন করতে পারত।

রাজা সলোমন বা সুলেমান সম্পর্কে নানা কাহিনী কিংবদন্তী পৌরা নিকতার কাছাকাছি গেছে। যেহেতু সলোমনের প্রিয় পাখি ছিল হুপো সেই হেতু মুসলমান গণ হুপোকে শ্রদ্ধা করে দেবতার মতো।

ভারতীয় ও ধর্মে পাখির প্রভাবের কথা সুবিদিত ও সুপরিচিত। গরুড়, হাঁস, পেঁচা, ময়ূর, নীলকণ্ঠ, শ্যেন এখানে দেবতার বাহন। ব্রহ্মার বাহন হাঁস, মনসার বাহনও হাঁস, সরস্বতীর বাহনও হাঁস; সরস্বতীর বাহন ময়ূর, নীলকণ্ঠ এবং কোকিলও বটে। শ্যেন শনির বাহন। ময়ূর কার্তিকের বাহন। জৈনরাও ময়ূর-পালক দিয়ে দেবতার দেহ মার্জনা করে, ভারতের বিভিন্ন ধর্মেই ময়ূরের পাখা দেবতাকে বাতাস করতে লাগে। বাসুদেব ভিখারিরা ময়ূর পালক পুজো করে থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির সংগেও ময়ূর পালকের গভীর যোগ আছে। কচ্ছে ময়ূর ধরা নিষিদ্ধ। জাঠ ও খোঁড় দের কাছে ময়ূর দেবতুল্য॥
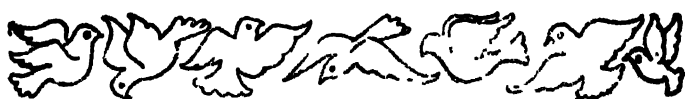
পৌরানিক ও অর্ধপৌরানিক দেবদেবীর সংগে অবিকৃত ও বাস্তব পাখির যোগা-যোগের কথা এ পর্যন্ত কথিত হলো। এইবার কিছু কিছু শাস্ত্রীয়, ধর্মীয় আচার-

অনুষ্ঠান ও লৌকিক ক্রিয়াচার ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাখির যোগাযোগের কথা বলি।

যেমন, বকের সঙ্গে কার্তিক মাসে পালনীয় একটি আচার জড়িত আছে। 'তিথি-তত্ত্বে' লিখিত হয়েছে,

একাদশীং সমারভ্য যাবৎ পঞ্চদশী ভবেৎ
বকোঽপি তত্র নাশ্নীয়াৎ মীনং মাংসঞ্চ কিং নরঃ ॥

কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই পাঁচদিন মানুষ দূরে থাক, বকও মাছ খায় না। এই পাঁচ দিনকে তাই "বক পঞ্চক" বলে। এই প্রসঙ্গে ওড়িশার "রাই-দামোদর ব্রতে"র কথা উল্লেখ যোগ্য। এই ব্রত গোটা কার্তিক মাস ধরে ওড়িশার সর্ব স্থানের বিধবারা পালন করে থাকেন। প্রতিদিন 'রাই' ও 'লক্ষ্মী' সহ দামোদরের পুজো করে। ব্রতের চূড়ান্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পুরীতে, কার্তিক মাসের শেষ পাঁচ দিনে। এই পাঁচ দিনকে বলা হয় "বগ পঞ্চক", এ সময়ে বকেরা পবিত্র হয় ও মাছ খায় না। তাহলে 'বক পঞ্চক" বলতে একটি তিথি নির্দিষ্ট, অপরটি তারিখ অনুযায়ী। কিন্তু দুটিতেই মৎস্যাশী বকও নিরামিষাশী হয়ে দেবত্ব অর্জন করে যেন।

হাওড়া জেলার আমতা থানার রঞ্জবার গ্রামে লক্ষীপ্যাঁচা সম্পর্কে একটি আচার চলিত আছে। লক্ষীপ্যাঁচা বাড়িতেই অন্ধকার কোণে, মন্দিরের ছাদে, ধানের গোলায় দিনমানে থাকে। কোনো অখাদ্য কুখাদ্য নাকি খায় না। অনেকে পাত্রে করে দুধ কলা দিয়ে থাকে প্যাঁচার প্রীতি কামনায়। বিশ্বাস এই, লক্ষীপ্যাঁচা সারাদিন অনাহারে থেকে সন্ধ্যে বেলায় দিনের প্রথম খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে একটি taboo আছে : লক্ষীপ্যাঁচার খাদ্য গ্রহণের পূর্বে কেউ যদি কৌতুক করে তাকে "প্যাঁচাপ্যাঁচা" বলে ডাকে, তবে সে সন্ধ্যায় সে অনাহারেই থাকে। লক্ষী প্যাঁচা উপবাসী থাকুক, এ কেউ চায় না, তাই কেউ তাকে 'প্যাঁচা' বলে ডাকেও না। এই নিষেধের মধ্যেই লক্ষী প্যাঁচার দেবত্ব স্বীকৃত হয়েছে। প্রায় একই ব্যাপার বাদুড় সম্পর্কেও দেখা যায়। বাদুড় কৃষ্ণের জীব, কাজেই বাদুড় খাদ্য ভাবে কষ্ট পাক, এ অনেকেই চায় না। কোনো ফলের গাছে বাদুড় এসে বসলে মন্ত্রবৎ একটি ছড়া বলা হয় : বাদুড় মিতা / যা খাবি তা তিতা। অর্থাৎ এই মন্ত্রবৎ ছড়ায় বাদুড়ের ভোজ্য বস্ত তাবৎ তিক্ত হয়ে উঠুক। কিন্তু তাতে বাদুড়ের সত্যিই অসুবিধে হবে বলে উল্টো ছড়া Antidote হিসেবে বলা হয় : বাদুড়, বাদুড় মিতা / যা খাবি তা মিঠা। তৎক্ষণাৎ বাদুড়ের ভোজ্য মিঠে হয়ে যায় বলে মনে করা হয়।

প্যাঁচাকে এই দেবত্ব দানের একটি সুন্দর উদাহরণ পাই ক্যালিফোর্নিয়ার Peru Indian-দের পুরা কথায় : স্বর্গের সর্বশক্তিমান দেবতা Niparaya-র তিন পুত্রের মধ্যে একজনের নাম 'quaayayp' অর্থাৎ 'মানুষ'। quaayayp দাক্ষিণাত্যের

ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের মধ্যে বসবাস করতে থাকেন; কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। আজও তিনি মৃত হয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু তাঁর দেহ বিনষ্ট হয় নি, আজও রক্ত ঝরে পড়ছে অবিরাম। তিনি কথা বলেন না, কিন্তু একটি প্যাঁচা তাঁর সঙ্গে কথা বলে। এতে প্যাঁচার দুটি দিক পরিস্ফুট হয়: একদিকে সে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, অপরদিকে দেবতার সঙ্গে।

মৃত্যু মানেই পূর্বপুরুষের সঙ্গে যোগ, হাওড়ার লক্ষ্মী প্যাঁচা সংক্রান্ত আচারটি লক্ষ করলে সহজেই মনে হয় লক্ষ্মীপ্যাঁচা এখানে ধনদেবীর সঙ্গে যতখানি যুক্ত, তার চেয়ে বেশি সে পূর্বপুরুষের প্রতীক। বস্তুত সেই পথেই লক্ষ্মীপ্যাঁচা এখানে দেবত্ব অর্জন করেছে।

কাকও পিতৃপুরুষের প্রতীক। কাকের মাধ্যমেই, পশ্চিম ভারতে, প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপক্ষের সূচনা হলে, মৃত পূর্বপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডাদি নিবেদিত হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গে মৃতা শৌচকালে কাকের উদ্দেশে দেওয়া হয় 'কাকলি' (<কাকবলি)। মরণের পর আশ্রাদ্ধ দিবস প্রতিদিন গৃহাঙ্গনে কেউ দেয় শুকনো চাল, কেউ বা কলাপাতায় করে রাঁধা ভাত। কাক না খেলে অশৌচপালনকারীও খেতে পারে না। কাকের মাধ্যমেই মৃতাত্মা অন্নগ্রহণ করে বলে বিশ্বাস। কাকের প্রতি এই 'বলি' দানপ্রথা বাঙলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই চলিত আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বিশেষত্ব হলো—অশৌচপালনকারী জানতে চায়, মৃতাত্মা কাকের মাধ্যমে নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করেছে কি না। দূরে হাত জোড় করে শ্রদ্ধাবিনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অশৌচপালনকারী কাককে সেই খাদ্য গ্রহণ করতে বারংবার অনুনয় করে। কাকে কোনো কারণে তা গ্রহণ না করলে কোনো অনিয়ম বা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে করা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্তও কাক যদি তা গ্রহণ না করে তবে অশৌচপালনকারী অনাহারেই থাকে।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে (Folkcustom and folklore of the Sylhet district in India: Man in India: Vol X, No. 4, December 193o, PP. 244-270) শ্রীহট্ট জেলার একটি প্রথার কথা বলেছেন। এখানে মৃতাশৌচ কাল ব্যতীত এবং দেবী কালীর কাছে এই নৈবেদ্যদানের কথা বলা হয়েছে: When a man goes to worship Kali at Fāljur in Jaintia, he makes an offering to the crows of the place, as well If immediately after the offering is made, a crow comes in and takes away everything, the worshipper is satisfied that the goddess has accepted his puja."

তান্ত্রিক উপাসনাতেও কাককে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।

বিয়ের দিন পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করবার প্রথা আছে ভারতে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে পূর্বপুরুষ মনে করে কাককে বিয়ের দিন পুজো করা হয়। কন্যার পিতা বিয়ের আগের দিন কন্যাকে নিয়ে পাত্রের গৃহে উপস্থিত হন। যাবার আগে কনের বাপ কাক পুজো করে থাকেন। কলায় বাকলে (এরা বলে ঢোনা,' 'ঢনা'<

দোনা) আতপচাল, ফলমূল এবং হাতখানেক লম্বা সাধারণ স্তরের সাদা নতুন কাপড় মন্ত্রসহ কাকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। পূর্ববঙ্গে নবান্নের পূর্বদিন গলবস্ত্রে, করজোড়ে যথারীতি কাককে নিমন্ত্রণ জানানো হয়, এবং নবান্নের দিন কাককে ভোজ্য নিবেদন করা হয়।

চীনেও বিয়ের দিন হাঁসের উদ্দেশে ভোজ্য নিবেদিত হয়। ওদের বিশ্বাস, হাঁসেরা দুবার পতিগ্রহণ করে না। এই জন্যে বিয়ের দিন হাঁস পূজ্য। আসলে হাঁস এখানে Ancestor bird রূপে পুজো পায়। 'Encyclopedia of chinese symbolism and Art motives' বইতে বলা হয়েছে · "a libation is powred out to the geese on the occasion of the bridegroom fetching his bride from her father's house "-P.214.

প্রায়শ্চিত্ত, যজ্ঞ, বলি ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে পাখির দেবত্ব হয়তো সর্বাংশে প্রত্যক্ষ রূপে স্বীকৃত বা পরিস্ফুট হয় না, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে যে হয়, তাতে সংশয় নেই।

আধুনিক ইহুদিরা মুরগীকে scape-goat হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। প্রতি বৎসর একটি ছাগলের ওপর ইহুদিদের পুরোহিত সকলের দোষের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে প্রান্তরের মধ্যে ছেড়ে দিত। দোষ বা অপরাধ এখানে একটি seperable ও objective বস্তু যেন, মানুষের মন থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে কোনো বস্তুবৎ ছাগপৃষ্ঠে চাপিয়ে দূর করে দেওয়া যায় এবং জনগণকে সংশোধিত করা যায়। আসলে এ এক ধরনের ম্যাজিকই বটে। কালক্রমে ছাগলের স্থান নিয়েছে মুরগী। দোষ স্খালন ও প্রায়শ্চিত্তের জন্যে সকল দোষের বোঝা মুরগীর অন্ত্রের মধ্যে চালান করে দিয়ে সেই মুরগীকে ঘরের চালে চরানো হয়। ঘরের চাল মানে আকাশ। মুরগী শুধু আত্মাকেই বহন করে স্বর্গে নিয়ে যায় না, দোষকেও বহন করতে সক্ষম। মুরগীর সেই ক্ষমতা ও শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়েছে, যে ক্ষমতার বলে অপরের দোষ ও পাপ বহন করেও নিজে সে দোষী-পাপী হবে না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতের যজ্ঞস্থলের আকৃতি পক্ষিসদৃশ। রামায়ণে অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলটি গরুড়সদৃশ দেখা যায়। এই অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে অশ্বের দেহটি ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, চাষ প্রভৃতি পাখিকে কি ভাবে বন্টন করে দেওয়া হত। বাজসনেয় সংহিতা (২৪.৩৪) এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫.৫.২০) অন্তরীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞে 'অলজ' (চিল জাতীয়) পাখির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতকের মধ্যে 'লোহকুম্ভি জাতকে' (সং ৩১৪)

দেখা যায়, কোশল রাজের মঙ্গলের জন্যে যে যজ্ঞ করা হচ্ছে, তাতে চারটি করে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বর্তক ও অন্যান্য পাখিও বধ করে আহুতি দেওয়া হয়েছে।

এর বিপরীত দিকটি এখানেই উল্লেখযোগ্য : পাখিকে অপবিত্র মনে করা, এবং পাখির স্পর্শে পূজাদ্রব্য অপবিত্র হয়ে যাওয়ার বিশ্বাস, এবং তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন। যেমন, কারো গৃহে শকুন এসে বসলে অথবা কারো দেহে শকুনের পালক বা বিষ্ঠা নিপাতিত হলে তাকে অবশ্যই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে হয়। মৃতপ্রাণীর মাংস খায় বলে শকুন মৃত্যুর সূচক হয়ে গেছে, এবং সে জন্যই এ আচার। আসামে শুধু শকুনই নয়, ফিঙেও যদি বাড়িতে সে ঢোকে তবে পূজার্চনা ও নামসংকীর্তনাদি করতে হয়। ডঃ নির্মলপ্রভা বৰদলৈ তাঁর "অসমৰ লোক সংস্কৃতি" (১৯৭২) গ্রন্থে লিখেছেন (পৃ: ৯৭) : "ঘৰত ফেঁচা সোমালে, ঘৰৰ চালত শগুণ পৰিলেও তেনেকৈ ক্ষণন্তে অশুভ। এনে অশুভ ঘটনা ঘটিলে শুভকামনাৰে ঘৰত পূজা-সেৱা কৰা বা নাম পতাৰ বিধান আছে।"

বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্র গুলিতে কাক স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি অশুচি হতে তার শুদ্ধীকরণের উপায় ও আচার বর্ণিত হয়েছে। ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী" (পৌষ, ১৩৬৮) বইটিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভবদেব নামক জনৈক স্মার্ত বলেছেন, কাংস্য পাত্রাদি কাকাদি-কর্তৃক স্পৃষ্ট হবার জন্যে দূষিত হয়ে পড়লে দশবিধ ক্ষার প্রয়োগ করে তা শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। প্রখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে, কাকাদির মস্তকোপরি পতনেব ফলে যে দোষ জন্মায়, তা থেকে মুক্ত হবার জন্যে বিশিষ্ট দেবতাদের অর্চনা, ব্রাহ্মণ ভোজন ও তাঁদের গো ও সুবর্ণদান কবতে হয়। শুধু কাকই নয়, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, বনকুক্কুট, বনকপোত প্রভৃতির গৃহপ্রবেশ ও মস্তকে পতন-জাত দোষ-স্খালনেরও এই একই বিধান।

দেবদেবীর তুষ্টি বিধানের জন্যে তাঁদের উদ্দেশে পাখি বলি দেওয়া, বলি দেওয়া পাখির মাংস রেঁধে খাওয়া, অথবা তার রক্ত দেহে মেখে নেওয়া, অথবা জীবন্ত পাখিকে উৎসর্গ করে উড়িয়ে দেওয়া,—ইত্যাদি নানা প্রথা চলিত আছে সারা পৃথিবীতেই। মূলত হাঁস, মুরগী ও পায়রা—এই সব গৃহপালিত পাখিই উৎসর্গ করা হয়, ক্বচিৎ অন্য দু-একটি পাখির নাম শোনা যায়। হাঁস-মুরগীর ডিমও উৎসর্গ করা হয়।

এই বলিদান ও উৎসর্গ করবার মধ্যে ক'টি ব্যাপার আছে। একটি সহজ ও স্পষ্ট : দেবতার খাদ্য হিসেবে এ সব পাখি হত্যা করা হল, এখানে দেবতা ও পাখি পৃথক দুই সত্তা ; কিন্তু তা জটিল হয়ে পড়ে যখন বলি-প্রদত্ত পাখির মাংস রেঁধে খাওয়া হয় বা তা রক্ত গায়ে মেখে নেওয়া হয়। দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত পাখি নিজেই তখন দেবতা হয়ে মানুষের দৈহিক রোগ ও ঐহিক সুখ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় কি ? আবার, হত্যা না করে জীবন্ত পাখিকে উড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেও কি পাখিকে দেবত্বে উন্নয়নের কথা নেই ? দেবতার সংস্পর্শে পাখি নিজেই এসব ক্ষেত্রে যেন দেবতা না হলেও কাছাকাছি চলে গেছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে দেবতার উদ্দেশে পায়রাকে

উড়িয়ে দেবার সময় বলা হয়—"হরেকৃষ্ণ রাম—পারোয়ার নাম।" এই উক্তির মধ্যে পারাবত ও হর-কৃষ্ণ ও রাম অভিন্ন হয়ে গেছে। জৈন ও বৌদ্ধরা বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে বন্দী পাখি কিনে আকাশে উড়িয়ে দেয়, সেখানেও এক ধরনের Innitative Magic আছে: এই পাখি যেমন মুক্ত হল, আমার আত্মাও তদ্রূপ মুক্তি পাবে। অথবা, পাখি তার আপন দেব মহিমায় তাকে মুক্তি এনে দেবে। এই অধ্যায়েই পূর্বে উল্লেখ করেছি, দশাহরার দিন নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হয় বিহারে, কিংবা বিজয়া দশমীর দিন কলকাতায়। নীলকণ্ঠ তার নাম সাদৃশ্যে নীলকণ্ঠ শিবের সঙ্গে একাত্ম; এবং শিব যেন দুর্গাকে তিন দিন পর পুনবায় কৈলাসে নিয়ে গেলেন, আকাশ পথে, তাই তাকে আকাশে ওড়ানো। ওড়িশাতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এবং সাধারণ ভাবে কার্তিক মাসে বদ্ধ ও বন্দী পাখি (যেমন. ফিঙে, দোয়েল, বসন্ত বৌরি) কিনে উড়িয়ে দেওয়া হয়। কোজাগরী পূর্ণিমা অর্থাৎ লক্ষ্মী পূর্ণিমার সঙ্গে প্যাঁচা এবং কার্তিক মাসের সঙ্গে "বকপঞ্চকে"র সংযোগ হেতুই এটি সেখানে পালিত হয়। এ সবের মধ্যেই পাখির দেবত্ব স্বীকৃত।

স্মৃতিশাস্ত্রে দেবী দুর্গার কাছে "তিন পক্ষের ন্যূন বয়স্ক পক্ষী" বলিদান নিষিদ্ধ হয়েছে। আধুনিক যুগে দুর্গার কাছে আব পাখি বলি দেওয়া হয না। ফরিদপুর জেলার জয় দুর্গার পুজোর সঙ্গে ভুবনেশ্ববী দেবী পুজো হয়; তখন ভুবনেশ্বরী দেবীর উদ্দেশে হাঁস বলি দিতে হয়। মালাবাবে দেবীর কালীর কাছে মুরগী বলি দেওয়া হয়। ননীগোপাল চক্রবর্তী জানাচ্ছেন (মালাবারে লৌকিক সংস্কার : প্রবাসী : ভাদ্র ১৩৫৮, পৃ. ৪২৮-৪৩১) : "কালীমাতার বাৎসরিক উৎসব 'ভরণী' নামে খ্যাত। ইহা প্রতি মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।… এই পর্ব উপলক্ষে বহু মোরগ দেবীর বেদীমূলে বলি দেওয়া হয়। লোকের বিশ্বাস, মোরগ-বলির সংখ্যার উপর যাত্রিগণের পুন্যসঞ্চয়ের মান যথেষ্ট নির্ভর করে।"

যে সব হাঁস-মুরগী-পায়রা বলি দেওয়া বা উৎসর্গ করা হয়। তাদের 'রঙে'র ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বলির উদ্দেশ্য, দেবতার প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে এই রঙের বিশেষ কার্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে। যেমন উঠন্ত ও ডুবন্ত সূর্যের রঙ লাল বলে লাল মোরগ দেওয়া, কিংবা দিবা সূর্যের উদ্দেশে সাদা মোরগ বা সাদা হাঁস। এ সব ক্ষেত্রে Sympathetic Magic-এর অন্তর্ভুক্ত Hamoepathic Magic ক্রিয়াশীল, যেমন কালীর উদ্দেশে কালো পাঁঠা।

মধ্য ওড়িশার দেশীয় রাজ্য পাল লহড়ার জুয়াঙদের পুজোর বিবরণে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু লিখেছেন (উপজাতিদের আত্মকরণের হিন্দু পদ্ধতি : লোক সংস্কৃতি, দ্বিতীয় পর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৯, পৃ. ২৩) যে, দেব-দেবীদের উদ্দেশে দুটি কালো রঙের মোরগ বলি দিয়ে গ্রামের বারোয়ারী ঘরে সংরক্ষিত ঢাক-ঢোল গুলির ওপর তাদের রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয়। দেবতার প্রতি নিবেদিত পাখি দেবত্ব অর্জন করাতেই

তার রক্তের মধ্যে এক অসাধারণ যাদুক্ষমতা লক্ষ করা হয়েছে, যার প্রসাদে ওইসব জড় বস্তু সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

"জুয়াঙ্গ জাতি" (প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩৪১ ; পৃ. ৮০৪-৮০৯) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু লিখেছেন : "মজাংই হইল জুয়াঙ্গদের বৃহত্তর সামাজিক জীবনের কেন্দ্র।...মজাং ঘরের যে দুইটি খুঁটি, জুয়াঙ্গদের বিশ্বাস তাহাকেই জগতের আদিকারণ বুঢ়াম বুঢ়া ও বুঢ়াম বুড়ির বাস। তাহার কাছে কালো রঙের মুরাগ বলি দিতে হয়।"

"ভিজানো আলোচাল পিণ্ডের মতো নয়টি জায়গায় মাটিতে রাখা হইল এবং তাহার পর দুইটি কালো মুরগী তাহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মুরগী দুটি চাল খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধরিয়া বলি দেওয়া হইল ও রক্ত মজাঙের চাঙ্গুর উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইল।"

বলিদানের প্রথাও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। তারকচন্দ্র রায়চৌধুরী "The Bhumij of Mayurbhanj" (Man in India : Vol. IX, Nos 2+3, June—September, 1929, pp. 95—115) নিবন্ধে লিখেছেন, ধানের চারা যখন ৯।১০ ইঞ্চি হয়, তখন আষাঢ় মাসের যে কোনো দিন, খানুয়া-পিড়ার সিন্দুরেগোড় গ্রামের গ্রাম দেবতা ঠাকুরাণীর উদ্দেশে যে কোনো রঙের মুরগীকে উৎসর্গ করে। পুজাস্থানে ছড়ানো চাল মুরগীটি যদি না খায়, তবে আর একটি মুরগী নিয়ে আসা হয়।

ঝাড়গ্রাম, ধলভূম প্রভৃতি সীমান্ত বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তির যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে দেখা যায়, কোনো 'বীর' বা 'গুণী' নিজেই দেবতা হয়ে ওঠেন ; দেবতার বদলে নিজেই মুরগীর মুণ্ডটা দাঁতে ছিঁড়ে দেহের সমস্ত রক্ত চুষে খান এবং মুণ্ডহীন ধড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন। ডাঃ সুধীর-কুমার করণের "সীমান্ত বাঙলার লোক যান" (প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭১) বইতে (পৃ. ৭৫ -এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বলিদানের পদ্ধতি বিশেষত্ব মণ্ডিত। বৈশাখ মাসের যে কোনো দিন, সূর্যাস্তের পূর্বে গৃহস্থ পুজা নিবেদন করে সূর্যের দিকে একটি বা একজোড়া পায়রা উড়িয়ে দেয়। সূর্য মানে ধর্মঠাকুর। অনেকেই এই ধর্মের নামে শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দেয়। জল্পেশনাদেবের কাছে শিব চতুর্দশীর দিন পারাবত মানত করা হয়। ওইদিন বাণেশ্বরের কাছেও পাখি বলি হয়। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত চোপানিগ্রামে মহাকাল ঠাকুরের কাছে হাঁস-পায়রা-মোরগ ও ডিম নিবেদন করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার রহৎপুর গ্রামে মাশানের কাছে পায়রা বলি দিয়ে, সেটি আগুনে ঝলসে নিয়ে চাল-ভাজার সঙ্গে পুজোয় অংশ গ্রহণকারীরা খেয়ে থাকে। 'মদনকাম' দেবতার কাছেও পায়রা মানত করা হয়। ফাল্গুন 'বথা'র পুজোতে পায়রা বলি দিয়ে তার মাংস রেঁধে

ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমার অন্তর্গত চিক্‌লীগুড়ি গ্রামে 'বুড়াঠাকুরে'র (শিব) পুজোতে হাঁস, মুরগী, পায়রার মাথা মোচড় দিয়ে ছিঁড়ে উৎসর্গ করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির দিন চড়কপুজোর সময় একটি জীবন্ত শ্বেত পারাবত ছেড়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তিব পিঠে বঁড়শী বিঁধিয়ে চড়কে ঘুরবে, বঁড়শী বিন্ধ করবার সময় তার হাতে একটি জীবন্ত পায়রা দিতে হয়, সে তার মাথাটি ছিঁড়ে, রক্তটুকু নিঃশেষে পান কবে মাটিতে ফেলে দেয়। 'ভাণ্ডাণী' নামে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের এক অর্ধ-লৌকিক দেবীর উদ্দেশে এক বা একাধিক জোড়া পায়রা মানত করা হয়; পায়রাকে কূপের জলে স্নান করিয়ে তেল-সিঁদুর দেবার মধ্যে তার পবিত্রীকরণ উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার। খাঁড়ার ঘায়ে পারাবতের মুণ্ড ছিন্ন করা হয়, আবার হাত দিয়েও টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হয়, এটাই আসল প্রথা ছিল। এক জোড়া পায়রা হলে পুরো-হিত একটি পান। উত্তরবঙ্গের ধর্মজীবনে কামাখ্যাদেবীর প্রভাব বেশ দেখা যায়। কামাখ্যা দেবীর কাছে পূর্বে কুক্কুটাদিও বলি দেওয়া হত। অম্বুবাচীর সময় উত্তর-বঙ্গের বালকেরা 'আমাতি' ঠাকুরের নামে পথরোধ করে পাথিকের কাছে চাঁদা আদায় করে, এবং 'আমাতি' ঠাকুরের কাছে পায়রা, অভাবে শালিক পর্যন্ত বলি দেয়। বলি দেওয়া পায়রার মাংস রেঁধে খায়। দেবী বিষহরি বা মনসার উদ্দেশে পায়রা বলি দিয়ে তেল বা ঘিয়ে নতুন সাদা কাপড়ে সিক্ত করে পায়রার মুণ্ডটি জড়িয়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, একে বলে 'ভগা' < ভোগ) দেওয়া। এই 'ভগা' দেওয়া উত্তরবঙ্গের এক বৈশিষ্ট্য। দেবীকে অগ্নিপক্ক খাদ্যদ্রব্য নিবেদনের প্রথা এতে স্পষ্ট, সেই তুলনায় কাঁচা মাংস স-রক্ত প্রদান যেন আদিমতর দিককে নির্দেশ করে। গ্রামদেবতা 'গারাম' ঠাকুরের পুজোর সময় জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে 'পাগেলাপীরের' উদ্দেশে পশ্চিম দিকে মুখ করে, সালাম জানিয়ে একটি লাল মোরগ ছেড়ে দেওয়া হয়, মুসলমান বালকেরা মারামারি করে যে পারে সেই মুরগীটা লুটে নেয়। দেবী তিস্তার উদ্দেশেও মুসলমানেরা বৈশাখ মাসেব যে কোনো দিন সূর্যাস্ত কালে সাদা মুরগী উড়িয়ে দেয়, পায়ে বা গলায় এক টুকরো নতুন সাদা কাপড় বেঁধে দিয়ে। এটি স্পষ্টই হিন্দু সংস্কার। দেবীর উদ্দেশে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করা হল যেন। কিন্তু যখনই মুরগীটিকেই বস্ত্র দেওয়া হল, স্বয়ং মুরগীটাই যেন দেবী হয়ে গেল তখন। উত্তরবঙ্গে ভূমিদেবীকে বলে "ক্ষেতিলক্ষ্মী"। বৃহস্পতিবাব যুক্ত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি এবং সে যোগাযোগ না হলে কার্তিক মাসের প্রথম দিনে এঁর পুজো হয়। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেতিলক্ষ্মীর বিশেষ প্রাণীর রক্ত-মাংসের প্রতি প্রীতি দেখা যায়, এবং সেই অনুসারে তাঁকে তৃপ্ত করা না হলে গৃহস্থের নানা অমঙ্গল ঘটে থাকে। হাঁসের রক্ত খেয়ে যে ক্ষেতিলক্ষ্মী তৃপ্তি পান, তাঁকে বলা হয় "হাঁস-খওয়া" (হাঁস-খাওয়া)। শালবনের দেবতা 'শালশিরি' (<শালশ্রী)-র উদ্দেশে মোরগ ছেড়ে দেওয়া হয়।

পারাবত উত্তরবঙ্গের দেবদেবীর কাছে এতো বেশি পরিমাণে প্রদত্ত হয় যে, শেষ পর্যন্ত এই পারাবত একটি বিশিষ্ট আলংকারিক মর্যাদা লাভ করেছে। তখন

zoo morphic রূপের প্রত্যক্ষতা ছাড়িয়ে একটি পরোক্ষ দিক তাতে এসে পড়েছে। যেমন, কালীর চক্ষুদানের সময় লৌকিক ভাষায় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাতে আছে; "সনার পায়রা উপার (রূপোর) ঠোঁট, হে কালী চক্ষুদান করেছু তোক"। কিংবা গঙ্গাসাগর পূজার মন্ত্রের একস্থানে আছে: "ভক্তকে নাগিরা সুবর্ণের পারো (পারাবত) মুই দেছ' ছাড়িয়া।" পারাবতের এই সুবর্ণত্বকে আমি শুধু এর অসাধারণত্ব বলেই মনে করি না, স্বয়ং এর দেবত্বও এতে লক্ষ্য করা যেতে পারে। পাখিই যে দেব অনুষঙ্গে দেবতা হয়ে ওঠে, অথবা পাখির নিজস্ব গুণধর্মেই, তার অপর প্রমাণ মেলে—গুণী যখন 'দেহবন্ধ' করেন, তার মন্ত্রের এক জায়গায় বলা হয়েছে, পাখিই ডাকিনীদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—

সাত সমুন্দর চাত্তক গছা, ওইঠে আছে কর্য়ার ভাসা, কুরুয়া ছাড়িলেক আও;
আজিকার গুণমন্ত্রে ষোলশ' ডাহেনা-ডাহেনীর গুণমন্ত্র বাও-বাতাস দেও।।'[১]

এই কারণেই দেখা যায়, কৌটিল্যের কালে ময়ূর, তোতা, ময়না প্রভৃতি পাখি পবিত্র বলে ঘোষিত হয়েছিল এবং নিছক মাংসের জন্যে কোনো কোনো পাখি হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়েছিল।

আবার, এই কারণেই, বলিরূপে প্রদত্ত পাখির উদ্ভব ও জন্মও সাধারণ রূপে হয়েছে বলে স্বীকৃত হয় না। যেন দেবতার মতো পাখির জন্মও কোন্ এক অলৌকিক ও অসাধারণ রূপে ঘটে থাকে। ভারতে যে পাখির দেব-আসঙ্গ সর্বাধিক, সেই ময়ূরের জন্ম সম্পর্কে একন্যেই নানা বিচিত্র বিশ্বাস আছে। অরুণাচলের লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিশনের ইদুমিশ্মিদের মধ্যে মুরগীর জন্ম সম্পর্কে একটি কাহিনী (Myths of the North-East Frotier of India, Reprint: 1968: V, Elwin, P 379) চলিত আছে. আজও দেবতাদের কাছে মুরগী বলি দেবার সময় গল্পটি কথিত হয়ে থাকে: অনেকদিন আগে জনৈক 'ইগু' পুরোহিত আকাশের পাখিদের তাকিয়ে ভাবতেন, দেবতাদের তুষ্ট করবার জন্যে কোন্ প্রাণী বলি দেওয়া যায়? একদিন সে ডিমের মতো গোলাকার একটি পাথর পেল। পরদিন সেটি থেকে একটি বাচ্চা বেরিয়ে এল, তার পাখা, নখ বা ঝুঁটি কিছুই নেই। একটি কাঁটা গাছের ওপর সেটিকে রেখে দেওয়াতে, সেই গাছের কাঁটার ছোঁয়াতেই বাচ্চাটির হল নখ; গাছের পাতা হল তার পাখা; কাছেই ছিল একটা রক্তের পুকুর, বাচ্চা সেখানে উড়ে গিয়ে রক্ত পান করতেই তার দেহে হল রক্ত। কালক্রমে সে একটি পরিপূর্ণ মুরগী হয়ে আসামে এল, ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল, এবং মানুষেরা মুরগীদের দেবতার কাছে উৎসর্গ করতে থাকল।

আমার মতে, Tree cult ও River cult পাখির মধ্যে এখানে সুন্দর ভাবে মিলে

---

১. রাজবংশীদের মন্ত্র ও আচার সম্পর্কে তথ্যাদির জন্যে শ্রীগিরিজাশংকর রায়ের নিকট ঋণী রইলাম।

গেছে। গাছ ও নদী আদিম মানুষের উপাস্য আর দু'টি দিক। যে মনোভাবের ফলে মুরগীর এই অলৌকিক জন্মকথা কথিত হয়, তারই ফলে পারাবত সুবর্ণ-নির্মিত হয়ে যায়।

দেবতার উদ্দেশে পাখিকে এ ভাবে বলি দেবার প্রথা বিশ্বের বহু অঞ্চলেই চলিত ছিল বা আছে। জীবনকৃষ্ণ গণ এ বিষয়ে তাঁর লেখা একটি নিবন্ধে (Cultural affinities fetmeen India and Africa : Man in India : Vol. XIII, No 1, January-March 1933 pp. 1754) এই মন্তব্য করেছেন : "Domesticated fowl which is non regarded as food, is also the main offering in certain rituals and sacrifices from chota-Nagpor, East Bengal, Assam, Burma to the pacific regions It originated, as has been accepted by Darwin, some where in south-eastern Asia,where alone the "combed-chickens" are found in a wild state whence it gradually spread throughout the world. Again as Johnston points out, it might have been brought to East Afriea and Madagascar from Persia or India by the Arabs."

ভারত থেকেই যাওয়া সম্ভব। কারণ, ভাবতেই মুরগী প্রথম বন্য অবস্থা থেকে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত হয়। মুরগী ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী এখানে বলি দেওয়া হয়। সেই প্রথা উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে ধূসর অতীতকাল থেকে উজ্জ্বল বর্তমানকাল পর্যন্ত সমভাবে বলবতী আছে॥

·১০...

এইবার খাঁটি লৌকিক দেব-দেবীদের সঙ্গে পাখির যোগের কথা, এবং পক্ষিরূপেই দেবদেবীদের কথা বলি। কিছু-কিছু লৌকিক দেবদেবীর কথা অবশ্য ওপরে প্রসঙ্গত বলে এসেছি। যেমন, পূর্বপুরুষরূপে কাক ও হাঁসের কথা; কিংবা, উত্তরবঙ্গের ভূমিদেবীর কথা। এখন এ বিষয়ে অন্যান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে।

কি অভিজাত সমাজে, কি অনভিজাত সমাজে,—কোনো সমাজেই বলিদান নিঃস্বার্থ নয়। পূজা ও ব্রতধারীর দৈহিক ও ঐহিক সুখ কামনার ব্যক্ত উদ্দেশ্য এখানে এতো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে বলেই স্বার্থময়তার কদর্যতার বদলে এক ধরনের আদিম সারল্য এসে তাকে স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করে দেয়।

আদিম সমাজে বিশ্বাস, কৃষিকর্মে সাফল্য দেবতা ও পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদেরই ফল। এইজন্যে কৃষিকর্মের সঙ্গে পাখি বেশ কভাবে জড়িত: পাখি নিজে দেবতা রূপে পূর্বপুরুষরূপে এবং আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞরূপে পুজো পেয়ে থাকে।

আশ্বিন সংক্রান্তিতে ধানের শীষ্ ওঠে বলে সারা ভারতে এদিনে বিশেষ আচার পালন করা হয়। অনেক সময় তা পহেলা কার্তিকে গিয়ে দাঁড়ায়। Dang states-এর Mavachi-দের একটি অনুষ্ঠান এই : "On the first day of the month of Kartik, they worship figuers of the stork which they drow on their grainbins and on the walls of their houses by the entrance"—Man in India, Vol. XXVI, March 1946, P. 71.

আষাঢ় মাসে (তখন ধান্যাদি রোপণের কাল অথবা বর্ষা বলে অন্যান্য কৃষিকর্ম) পাঁচ দিন ধরে গুজরাটের কোনো কোনো জাতির কুমারী মেয়েরা এক ব্রত করে, তার নাম 'আলুনন' (নুন খাওয়া বারণ, তাই এই নাম) ব্রত। এই ব্রতের একটি গানে (Songs of the Anavils of Gujrat : Man in India : Vol. XXX, Nos 2 + 3, April-September 195o, PP. 29-55 : T. B. Naik) সারসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে :

The crane comes and the crane goes
It loafs here and there
Whom does the crane carry away ?
It carries arvey Pushpa Vahu ;
And Maghubhai rans after it……

ভারতীয় বারমাস্যা গানগুলি যদি মূলে কৃষিসঙ্গীত হয়ে থাকে, আমি পূর্বে দেখিয়েছি, তাহলে বারমাসী গানগুলিতে বর্ষার খুব প্রাধান্য দেখা যায়, এবং বর্ষার প্রসঙ্গেই ভারতীয় বারমাস্যাগুলিতে সর্বাধিক পক্ষি-নাম পাওয়া যায়।

এই জন্যেই নবান্নের দিন পাখিকে নবান্নের অংশ দেবার রীতি আছে। পূর্ববঙ্গে কাককে করজোড়ে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গেও নবান্নের দিন পাখিকে নবান্ন নিবেদন করা হয়। রেভাঃ লালবিহারী দে তাঁর "গোবিন্দ সামন্ত" (অনুবাদ ও সম্পাদনা : দেবীপদ ভট্টাচার্য। 'মনীষা' সংস্করণ ; আশ্বিন ১৩৭৪) বইটিতে বর্ধমান অঞ্চলের নবান্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন (পৃ. ১১৪) পাখিদের উদ্দেশে থালায় করে নবান্ন উঁচু জায়গায় নিবেদন করা হয়। প্রান্ত উত্তর বঙ্গে 'মাহাবারিক' এক বিশেষ পাখির উদ্দেশে নবান্ন নিবেদন করা হয়।

এইখানে 'মাহাবারিক' পাখির একটু পরিচয় দিই। প্রান্তউত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট উচ্চারণ পদ্ধতির জন্য 'মহা' 'মাহা' হয়েছে। যে পাখি বিশেষ ভাবে অমঙ্গল ও বিপদ হরণ করে, নিবারণ করে, এই হিসেবে হওয়া উচিত ছিল 'মহাবারী', তাই 'মহাবারিক'। পাখিটি বাড়ীর সংলগ্ন আম-কাঁঠাল-কলা-সুপুরি বাগানেই থাকে, অর্থাৎ গৃহবাসী বলা যায়। রাতে বাড়ীতে চোর, শেয়াল বা বন বিড়াল দেখলেই ভীতস্বরে ডেকে গৃহস্থকে সজাগ করে দেয়। বাড়ীর রক্ষাকারী অভিভাবক মনে করে, আমি এটিকে 'Tutelary god' বলতে চাই।

এই 'মহাবারি'কের উদ্দেশে 'পুষ্ণা অর্থাৎ পৌষ পার্বণের দিনে (অঞ্চল বিশেষে দোলপূর্ণিমার দিন) প্রথম পিঠে তৈরি করে নিবেদন করা হয়। পৌষপার্বণ এগিয়ে এলেই এ পাখি নাকি করুণকণ্ঠে কেঁদে ক্ষুধা ব্যক্ত করতে থাকে। তখন এর ডাক এই রকম : "টি-শু-টি-শু টিশ্"। স্ত্রীলোকেরা শুনলে বলে "হু'ন্দ্যাখ্, মাহাধারিকটা কান্দিবা ধইচে !" তারপর পাখিটিকে' ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে বলে। বাড়ীর উত্তর দিকে মাহাবারিক কাঁদলে কেউ মারা যাবে, দক্ষিণ দিকে কাঁদলে চুরি হবে। ছেলে-পুলেরা দুষ্টুমী করলে বাতে এসে গায়ে আঁচড় দেয়। পৌষ পার্বণের দিন পিঠে করে, কলার বাকলে ঘরের চালে তা দেওয়া হয়। অনেকে জল ও তুলসীপাতা দিয়ে পুজো করে। কোথাও বা পিঠে 'খিরল খাস' দিয়ে ফুঁড়ে দেয়। সন্ধ্যে বেলায়, বাড়ীর দক্ষিণ দিকের চালে তা দেওয়া হয়। গৃহিনীই দেয়, দিয়ে প্রণাম করে। দেবার একটি নিয়ম আছে : হয় "পাঁচভার-এক বোঝা", নয় "সাতভার-এক বোঝা"। অর্থাৎ 'খিরল-কাঠির' একদিকে থাকে পাঁচটা বা সাতটা, অপর দিকে কেবল একটা। পিঠের সঙ্গে 'ত্যালোয়া'(<তিল+উয়া) পিঠে দেওয়া হয়, তিলের গুঁড়ো দিয়ে তা তৈরি হয়।

কৃষিকর্মের সঙ্গে 'উর্বরতা' গভীর ভাবে যুক্ত। উর্বরতার কেবল ভূমি প্রসঙ্গেই নয়, নারী দেহ প্রসঙ্গেও যুক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু অঞ্চলে প্রেম ও উর্বরতার অনেক দেবীর কাছে (যেমন, Ishtar, Aphrodite) কপোত বা ঘুঘু উৎসর্গ করা হয়। বাঙলা বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে যে 'কুক্কুটীব্রত' পালিত হয়, তাতে কুক্কুটকে সরাসরি দেবত্বের স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোবিন্দানন্দ নামে এক স্মৃতি গ্রন্থকার ''কুক্কুটি-মর্কটি'' ব্রতের নাম করেছেন ; কিন্তু আসলে এ দেবী নিতান্তই লৌকিক। পহেলা মাঘকে রাঢ় অঞ্চলের 'ভূমিপুত্র'রা বলে 'আখ্যান' বা 'আখ্যেনদিন'। এই দিন বীরভূমে যে সব দেবদেবী পুজো পান তাঁদের মধ্যে আছেন 'পায়রা চন্ডী', 'মুরগী ঠাকরুণ', 'সাতভাই'। সিউড়ী থানার রাইপুর গ্রামে 'মুরগীঠাকরুণ'– বাউরী সম্প্রদায় কর্তৃক পুজিতা হন। সিউড়ী থানারই লখীন্দরপুর গ্রামে ক্ষীরবৃক্ষের তলায় ডোম সম্প্রদায় সাতটি মাটির ঢিবি গড়ে, মুরগী বলি দিয়ে 'সাত ভাইয়ের' পুজো করে পয়লা মাঘ। ডাঃ অমলেন্দু মিত্র তাঁর "রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর" (প্রথম সং ১৯৭২) বইটিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

গারোদের মধ্যে যারা 'আবেং' গারো, ধান কাটা শেষ হলে নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের প্রথমে একটি শস্যোৎসব করে। প্রথমে *Rongdik mite*-এর পুজো করা হয়। ইনি লক্ষ্মীরূপা, তন্ডুল ভান্ডারে থাকেন। যে পাত্রটিতে চাল থাকে, সন্ধ্যায় পুরোহির এসে তার গলা সুতো দিয়ে বাঁধে, চারদিকে তুলোর গোলা ঝুলিয়ে দেয়। দা দিয়ে তিনটি মুরগী কেটে সেই পাত্রটিতে ও তুলোর গোলায় রক্ত মাখিয়ে দেয়, পালক গুলো পাত্রটির সঙ্গে বেঁধে দেয়। তারপর গৃহদেবতার নামে একটি লাল মোরগ উৎসর্গ করা হয়। রক্ত পালক ইত্যাদি বাড়ীর সম্মুখের দেওয়ালে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘরের যে খুঁটিতে গৃহদেবতা বাস করেন বলে বিশ্বাস করা হয় সেখানেও একটি মুরগী বলি দিয়ে রক্ত-পালক লাগিয়ে দেওয়া হয়।

আসামের বিভিন্ন নাগাজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত পাখি হলো 'ধনেশ'। দেবতা জ্ঞানে ধনেশের ঠোঁট ও পালক দেহে পরিধান করা হয়। নাগা 'মোরাং গুলিতে (পাড়ার যে বারোয়ারী ঘরে অবিবাহিত যুবকেরা রাত্রিযাপন করে, তাকে 'মোরাং' বলে) ধনেশের প্রতিমূর্তি এঁকে রাখা হয়। ধনেশের নানাবিধ রোগহরণের ক্ষমতাও আছে। শীতের সুরুতে কলকাতার পথে-পথে মধ্যভারতের আদিবাসীদের জীবন্ত ধনেশ পাখিসহ নানা টোটকা ঔষধ বিক্রয় করতে দেখা যায়। ক্রেতাকে ঔষধ দেবার সময় পার্শ্বস্থিত জীবন্ত ধনেশের গায়ে ছুঁইয়ে, প্রণাম করে, সেই ঔষধ দিতে স্বচক্ষেই দেখেছি।

লোকদেবতা রূপে ময়ূরেব উপাসনা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে চলিত আছে। J. M. Campbell মন্তব্য করেছেন: "The god Hirava of the vârîls and kôlîs of Thânâ is a bundle of Peacock feathers. At the Dîvalı (october-November) Vârlî boys of Thânâ put a Peacock feather into a brass pot, and dance round it."—Notes on the spirit basis of belıef and custom: The Indian Antiquary, August 1895, P. 221.

North Indian Notes and Qmeries (February 1895, P. 197)-এ বিষয়ে একটু ভিন্ন খবর দেওয়া হয়েছে: "The varils and kols of Thana worship Peacock's feathers on their days" এ উদাহরণের মধ্যে লক্ষণীর দিক, গোটা ময়ূর অপেক্ষা কেবল তাব পালকটুকুর মধ্যেই দেবত্ব বা যাদুধর্মকে আবিষ্কার বরা হয়েছে। অংশই এখানে পূর্ণতাকে নির্দেশ করছে, এতে ময়ূরের দেবত্ব অধিকতর স্বীকৃত।

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ স্টেটের রাজপরিবারে বিশ্বাস আছে, এঁদের প্রথম পুরুষ ময়ূরের ডিম-সঞ্জাত। এই জন্যে এ রাজ্যে ময়ূরহত্যা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ভারতে ময়ূর উপাসনা সম্পর্কে Edgar Thurston তাঁর বইতে (Omens and Superstitions of Southern India: London: T Fısher unwin, 1912, PP. 199-201) মূল্যবান সংবাদ দিয়েছেন। গুমসুর (Goomsur) অঞ্চলের খোঁড়দের একটি সম্প্রদায়ের নাম 'মালিয়া', নানাপ্রকার সুখ-সম্পদ লাভের জন্য "Thada pennoo" নামে ময়ূরের পুজো করে থাকে। এমন কি, নরবলি পর্যন্ত এঁর কাছে দেওয়া হয়। যাকে বলি দেওয়া হয়, সেই-ই যেন দেবত্ব পায়, তাই তাকে বলে 'Mariah' (ময়ূর)। পেতলের ময়ূরমূর্তি নির্মাণ করে তারা তা সমাধিস্থ করে। সেই সমাধিভূমির ওপরেই পুজো-বলির ইত্যাদি হয়ে থাকে।

বনদেবতা ও শিকার দেবতারূপেও পাখিকে দেখা হয়েছে। পহেলা এপ্রিল অর্থাৎ All fool's Dayকে স্কটল্যান্ডে বলা হয় "hunting the gowk (cuckoo)". ম্যাগপাইকেও শিকারদেবতা জেনে সম্মান করা হয়। "The Jicarilla Apache Indians leave offerings of hoofs, offal, and other waste parts from

their kill for magpie in thanks for success in hunting"—Standard dictionary of folklore, mytholagy and legend, P. 665.

উত্তরবঙ্গের বনদেবতা 'শালশিরি'র উদ্দেশে মুরগী উৎসর্গের কথা আগে বলেছি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক বনের দেবী হলেন "বনবিবি", এ'র উদ্দেশে মুসলমানেরা গভীর অরণ্যে মুরগী ছেড়ে দিয়ে আসে। সুন্দর বনের ২০নং দ্বীপ "মা বনবিবির মোরগ জঙ্গল" নামে খ্যাত। যখনই কোনো নৌকো এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যায়, সে যে ধর্মের লোকই হোক না, একটু থেকে হাত জোড় করে বনবিবির উদ্দেশ্যে প্রণাম করে, কেউ এ দ্বীপে নামে না। এই দ্বীপের কাছে এলেই নৌকোর যাত্রীরা শতশত মোরগ-মুরগীর সমবেত কণ্ঠে চীৎকার শুনতে পায়। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে বনবিবির উদ্দেশ্যে সবাই জোড়া জোড়া মোরগ মুরগী দেয়, কেউ সে সব মুরগী স্পর্শ করে না। সেদিন ওখানে ছোটোখাটো একটি মেলা বসে। "বনবাসী মানুষ জনের এখনও বিশ্বাস যে, প্রতিটি প্রহরে মা বনবিবির চেলা এই বন-মোরগেরা মায়ের তন্দ্রা ভাঙায়। কারণ দক্ষিণ রায় (ব্যাঘ্র দেবতা) আর বড়গাজী খাঁ সাহেবের দীর্ঘদিনের যুদ্ধ মিটিয়ে মা বড় ক্লান্ত।'—আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৮০।

রোগ মহামারীর উপশমকারী রূপে এবং এক অঞ্চলের রোগ অপর অঞ্চলে বহনকারী রূপেও পাখি অসাধারণত্ব লাভ করেছে। যেমন, মানুষের দোষ-অপরাধ মুরগী মানুষের কাছ থেকে দূরে, স্বর্গাঞ্চলে বহন করে নিতে সক্ষম বলে কল্পিত, তেমনি এক অঞ্চলের রোগ-মহামারীও।

নেপালী হিন্দুরা রোগমুক্তির জন্যে তিস্তা নদীর পুজো করে। পুজোতে লাগে দুটি পায়রা। তিস্তা নদীর নামে সে দুটি বলি দিয়ে তার মাংস নদীর পাড়েই রোগীকে খেতে হয়। 'টোটো'রা রোগশোকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে 'গোরোম' (<গ্রাম, গ্রামদেবতা)-এর পুজো করে। এজন্যে লাগে পনেরটি পায়রা, একটি হাঁস এবং কিছু হাঁস-মুরগীর ডিম। ভূতপ্রেত, দৈত্যদানবের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে 'পিদুয়া' নামে যে প্রভাবশালী দেবতার অর্চনা করা হয়, তাতে লাগে তিনটে সাদা মোরগ, দুটি পায়রা ইত্যাদি।

Edgar Thurston তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে (PP. 35—36) দক্ষিণভারতের গোদাবরী জেলার Koyi-দের একটি পুজানুষ্ঠানের কথা বলেছেন। গ্রামে কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে ওরা গ্রামের বাইরে, একটি নিমগাছের তলায় পুজা-মণ্ডপ তৈরি করে; উইয়ের ঢিবির মাটি দিয়ে একটি স্ত্রীমূর্তি গড়ে, তারপর তাকে বস্ত্রাবৃতা করে, গলদেশে কয়েকটি ময়ূরপুচ্ছ বেঁধে দেয়। এতেই দেশ থেকে মহামারী দূর হয়।

ডি. এন. মজুমদার তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধে (Social organisation amongst the korwas : Man in India : Vol. X, Nos 2+3, April—

September 1930, PP. 104—115). উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুরের কোরওয়াদের একটি প্রথার কথা বলেছেন। গ্রামে মহামারী দেখা দিলে একটি মুরগীর পায়ে একটুকরো কাপড় বেঁধে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। গ্রামে যাতে ফের ফিরে না আসে, সেজন্যে সতর্ক থাকা হয়। কাপড় বাঁধা থাকে বলে উৎসর্গের মুরগী হিসেবে তা চিহ্নিত হয়ে যায়, কেউ তা হত্যা করে না। মুরগীটি গ্রামান্তরে চলে গেলে, তারাও আবার সেটিকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চালান করে দেয়। কেউ এদের হত্যা করলে সামাজিক অপরাধ হয়। মুরগীটিই তখন দেবী হয়ে যায়, নইলে তাকে হত্যা করা অপরাধ বলে গণিত হবে কেন? ডি. এন. মজুমদার তাঁর আর একটি প্রবন্ধে (Disease, death and divination: Man in India: Vol. XIII Nos 2+3, April-September 1933, PP 132-134)ও এ কথা লিখেছেন। তবে সেখানে মুরগীটি, এবং তার বাঁ পায়ে যে একটুকরো কাপড় বাঁধা হয়, তার রঙ 'লাল' বলেছেন। এখানে 'লাল' রঙ একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে ॥
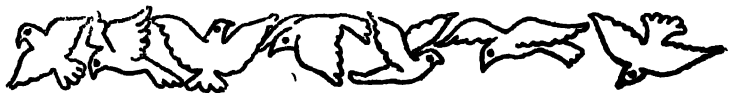
Theriomorphic রূপে পক্ষিদেবতার প্রসঙ্গে এবারে আসছি।

অর্ধ-পক্ষী, অর্ধ-নররূপ ধারী দেবতার সংখ্যা সম্ভবত ইজিপ্টেই বেশি। ইজিপ্টের পৃথ্বী দেবতা Geb-এর মুখ-মাথা হাঁসের মতো। শ্যেনের মুণ্ড এই দেবতাদের ধড়ে দেখা যায়: Sokar; Harakhte-Ra; Horus; Mont শকুনের মুখ Nekhbet-এর ধড়ে। Thoth-এর ধড়ে Ibis পাখির মাথা।

গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য দু-একজন দেবদেবীর মূর্তিতে পাখিকে দেখা যায়। দেবরাজ Zeus-এর মুখমণ্ডল ঈগলের মতো। এ ছাড়া কোকিল ও কাঠঠোকরাটিকেও জিউসের সঙ্গে দেখা যায়। রোমান দেবী মিনার্ভার পাখির মতো পাখা আছে বলে কল্পিত; দেবী Fortuna-রও পাখা কল্পিত হয়েছে। রোমান কল্পনায় পাতাল দেবতাদের একজন হলেন Tuchulcha; তাঁর স্ত্রী দানবী, এঁর ঠোঁট পাখির ঠোঁটের মতো। এস্কিমোদের একজন প্রধান দেবতা Koodjanuk, ইনি পুরুষ দেবতা। পৃথিবী সৃষ্টি-কালে ইনি ছিলেন প্রকাণ্ড একটি পাখি, মাথাটি কালো, দেহটি সাদা এবং ঠোঁটটি পাখির মতো বাঁকা। ইনি ক্ষেমঙ্কর, তুষ্ট হয়ে মানুষকে বর দেন।

পারস্য পুরাণের রক্ষকারী দেবতা Darius-এর যে মূর্তি ভাস্করেরা তৈরি করেছেন, তাতে দেখা যায় এঁর মুখে অ্যাসিরীয়ার লোকদের মতো দাড়ি রয়েছে, কিন্তু দেহটি জ্যামিতিক ভঙ্গিতে পাখির পালকে সজ্জিত; চমৎকার এক জোড়া পাখাও তাঁর রয়েছে এবং খাড়া একটি ল্যাজ।

চীনের একজন লৌকিক কৃষিদেবতার নাম 'Pa-cha', ইনি পঙ্গপাল প্রভৃতি নানা পোকা-মাকড়ের হাত থেকে শস্য রক্ষা করেন। এঁর পরনে শায়া, ঠোঁট ও পা পাখির মতো, হাতের নখ পাখির নখের মতো; ইনি শায়া পরলেও পুরুষ-দেবতা।

ভারতীয় পুরাণে এই ধরনের সংমিশ্রিত দেবতা বড়োই বিরল। বেদ ও ব্রাহ্মণে অগ্নিকে ঈগলরূপে কল্পনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সংমিশ্রণ নেই। ভারতীয় পুরাণে ও লোকজীবনে হয় বাস্তব ও বিশুদ্ধ বা পরোক্ষ পক্ষিমূর্তি, হয়তো নররূপী দেবতার বাহনরূপে পক্ষী, এ দুটোই দেখা যায়, মাঝখানের সংমিশ্রিত স্তর নয়। এক গরুড় ছাড়া এমন সংমিশ্রণ আমার চোখে এখন পর্যন্ত পড়ে নি।

কিন্তু ভারতীয় লোকজীবনে, ব্রতে, পুতুলে ও নানা আনুষ্ঠানিক দিকের মধ্যে Theriomorphism-এর উদাহরণ বেশ দেখা যায়। মোহেঞ্জোদাড়ো থেকে একটি মাটির কলসী পাওয়া গেছে, যার মুখটুকুতে পাখির মুখের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে; এটি এখন পাকিস্তান সরকারের Archaeology বিভাগে জমা আছে। আসামের গোয়ালপাড়ার আকাশকান্দী এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার হরিনারায়ণপুর থেকে যে সব মাটির ও পোড়া মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে, তাতেও মুখগুলি প্যাঁচার মতো চ্যাপ্টা, চোখ গোল। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান থেকে বহু সরা, মাটির পাত্র, শোলার পট মিলেছে, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, Theriomorphism একদা বেশ প্রচলিত ছিল।

সুবচনীব্রত, সেঁজতিব্রত, ইত্যাদি নানা ব্রতানুষ্ঠানের কালে হাঁস, চিল, ময়না, বাবুই ইত্যাদি zoomorphic রূপে অঙ্কিত বা গঠিত হয়। কিন্তু এদের অর্ধমানবায়িত রূপ স্পষ্টরূপে দেবত্ব অর্জন করে নি, কিন্তু একদা যে করেছিল তার প্রমাণ বিভিন্ন পোড়ামাটির মূর্তিতে, মাটির কলসী ইত্যাদিতে, শোলা ও সরা ওপর লোকচিত্রে ছড়িয়ে আছে।

Theriomorphic দেবতা মানেই 'Composite deity'; টোটেম রূপে, পূর্বপুরুষ রূপে, ভূমি, শস্য ও প্রজনন শক্তি রূপে যে পাখি দেবতা হয়ে উঠেছিল, ক্রমে মানবিক বোধ প্রখর হয়ে ওঠায় তাতে নরদেহ এসে পড়ে; কখনো এর বিপরীত ব্যাপার ঘটে—পক্ষিদেহে নর-মুণ্ড, যেমন পূর্ব পুরুষ রূপে কল্পিত 'ক্ষেমা-ক্ষেমী' (<ক্ষেম+আ, <ক্ষেম ঈ, মঙ্গলকারী অর্থের চিত্র।

সংমিশ্রিত রূপটি মধ্যবর্তী স্তরের, জটিলতাও এই জন্যে এতে বেশি। নররূপ ও পক্ষি রূপের প্রাধান্যের পরিমাণেও কোনো কোনো সময় এই জটিলতা বেশ স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। ইজিপশীয় দেবতা Thoth বা Tehuti সচরাচর আইবিস পাখির মুণ্ডসহ কল্পিত হতেন বটে, আবার কখনো বা সরাসরি কেবল ওই আইবিস রূপেও কল্পিত হতেন। তেমনি Thoth-এর মন্ত্রী Maat কেবল অস্ট্রিচ পাখির পাখা দ্বারাই (গোটা পাখিটি নয়) চিহ্নিত হতেন। আমার মনে হয়, কোনো পাখিকে পুরোপুরি গ্রহণ না করে তাকে কেবল আংশিক রূপে গ্রহণ করবার মধ্যেই Theriomorphism-এর প্রথম স্তরে দেখা দিয়েছিল। ঠিক ভারতবর্ষে যেমন,

গোটা ময়ূরকে পূজো না করে প্রতীক রূপে ময়ূরের এক গোছা পালককে পূজো করা। এতে Zoomorphism-এর শেকড় যে নড়ে উঠেছে তা বোঝা যায়।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক দেবতার সঙ্গে অপর দেবতার একত্রীকরণ ও স্বাঙ্গীকরণ ততই ঘটেছে। নানা কারণে এই অভিন্নতা এসে গেছে। ইজিপ্টেই যেমন সূর্য দেবতা Ra-র সঙ্গে শ্যেন দেবতা Heru বা Horus মিলিত হয়ে যান। দুই দেবতার মিলনই Theriomorphism-এর মূল কথা। 'Ra' অপর এক দেবতা 'Amen'-এর সঙ্গেও মিশ্রিত হন। Amen-এব নানা মূর্তি কল্পিত হয়েছে ; তাঁর সাধারণ মূর্তি হল—মুখটি মানুষের মতো, মুখে দাড়ি ; কিন্তু মাথায় দুটি খাড়া, লম্বা পালক ; অর্থাৎ কেবল token হিসেবে পাখি। পরবর্তী কালে যেই Ra-র সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে, অমনি মুখটি পুরোপুরি শ্যেনের মতো হয়ে গেছে। Amer-Ra-র স্ত্রী Mut (the 'world mother') কখনো কেবল মানুষের মুণ্ডসহ, পক্ষধারী ; কখনো কেবল শকুনেব মুণ্ডধারী।

এই সব তথ্য থেকে এই সত্য বোঝা যায়, দেবদেবীর রূপকল্পনার এই অস্থিরতা ও পরিবর্তনময়তা মানুষকে একটি জটিল মানসাম্বন্দ্বেব মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। পাখি ও মানুষ কাকে সে নেবে, এবং কতখানি নেবে, নিলে কোন্ ভঙ্গিতে নেবে—এই প্রশ্ন মানুষকে তখন সবচেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ করে রেখেছিল।

এই দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ভাবে ভারতীয় জনজীবনকেও সংক্ষুব্ধ করেছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় সংস্কৃতির প্রভাবে অথবা মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে অন্যত্র সেই দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান হয়ে গেছে : তারা পৌত্তলিকতাকেই বিসর্জন দিয়ে এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছেন। ভারতের পক্ষে সেই দ্বন্দ্ব থেকে আজও উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি। এখনও এখানে গোরু দেবী ভগবতী, হাতীর মাথাটি নিয়ে গণেশ আজও দিব্যি পুজো পেয়ে যান। দ্বন্দ্বটা পৌরাণিক ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা লৌকিক ক্ষেত্রে। তাই যে সব পক্ষিরূপা দেবী একদা পুজো পেতেন, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া বা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি, স্বীকার করাও নয় ; এবং তাই আজ শিশুর খেলনা রূপে তাকে মধ্যপথেই রেখে দেওয়া হয়েছে। তারা আজ শিশুর খেলনার বিষয় হয়ে পড়েছে। যে-সব পোড়ামাটির পুতুল এখন খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, একদা তারাই ছিল দেব-দেবী। এইসব পোড়ামাটির পুতুল গুলিতে অনেক প্রাচীন লৌকিক দেবদেবী লুকিয়ে আছেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (যেমন ২৪ পরগণার হরিনারায়ণপুর, মেদিনীপুরের নাড়াজোল ; পাবনা ও মৈমন সিংহ ; উড়িষ্যার বালাসোর ও বড়পালি) পক্ষিমুণ্ড সহ নরদেহী পুতুল পাওয়া গেছে। এই মিশ্রিত রূপের পেছনে একদিকে রয়েছে মধ্যবর্তী স্তরের দেব-দেবীর রূপকল্পনা ; অপর দিকে আছে বিভিন্ন সংস্কৃতিরও সংমিশ্রণ।

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় তাঁর "The Ritual Art of the Bratas of Bengal" (January, 1961) বইতে ব্রতের পুতুল নিয়ে আলোচনা করতে করতে মন্তব্য

করেছেন : The *Dirgha Nikaya* (3rd-4th century B C. Mahasamaya Suttronta, Slokas 7 and 11) states that the serpent kings of the Sata hills (Rajmahal) were afraid of the Dwija-birds who used to kidnap them by force, Influenced by the teaching of Lord Buddha, Chitra and Suparna, the kings of the Bird-clan made friends with the the Serpent-kings, Even to-day, we have typical examples of terracotta statuettes of the Bird-mother from the districts of Pabna and Mymensingh,……right opposite to the Satali hills. She has a bird's (duck's ?) head with hooded *coiffure*. The lower part of her body, modelled in human form, is draped with ornamental *mekhala* (skirt) She holds children at her arms and on the thighs ·····She is our grand old Bird-mother from whom many of us have been "anthropologically" born. These figurines are now used simply as playthings of children and no cult importance is attached to them by the adults …A cult-object, having lost its primitive uses neturally became a toy at the hand of a child !"— P, 17-81,

ভারারতের আল্পনায় যে "হাতে-পো-কাঁখে-পো" মূর্তি দেখা যায়, "Bird mother' -এর কল্পনার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। ব্রতে বলা হয়েছে, খেমা-খেমী, গোদা-গদী, হেচী-করকচী ইত্যাদি পক্ষিদম্পতি থেকেই বাঙালীর উদ্ভব। ব্রতে সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে তাঁদের কাছে আবেদন করা হয়েছে ॥

১২·

পাখির দেবত্ব-জ্ঞাপন ও দেবমহিমা-খ্যাপন সমাপণ করলাম। এইবার অপদেবতা, অশুভকারী দেবতা, দৈত্য-দানব ও প্রেতিনী রূপে তার বিপরীত পরিচয় দিই। দৈত্য-দানব ও অপদেবতা রূপে পাখির পরিচয়ের মধ্যে বাহ্যত প্রশংসাই কিছু নেই বটে, কিন্তু আন্তর দিক থেকে একথা মানতেই হবে—এতে পাখির ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাই প্রকারান্তরে স্বীকৃত হয়েছে। লোকমানসের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্যও এই বৈপরীত্যের মধ্যে ধরা পড়ে : লোক মানস কখনোই সমভাবে চিরকাল কোনো বস্তুকে বা ভাবকে গ্রহণ করে না ; তাই যে পাখি এক দেশে বা এক যুগে শুভঙ্কর অপর দেশে ও যুগান্তরে সেই ভয়ঙ্কর। লোক মনস্তত্ত্বের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই পাখিকে যুগপৎ দেবতা ও অপদেবতা করে তুলেছে।

যে পাখিকে দৈত্য-দানব ও অপদেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে, পাখি দিয়েই সেই দৈত্য-দানবকে বিতাড়িত করাবার প্রয়াস ও বিশ্বাস দেখা যায়। বহু দেশেই বিশ্বাস আছে, সারা রাত পৃথিবী এক কালো দৈত্যের অধিকারে (যেহেতু রাত্রির অন্ধকার কালো) চলে যায়, ভোরে মুরগীর ডাকের ফলে সে দৈত্য বিতাড়িত হয়। (অর্থাৎ সকাল হয়)। দৈত্যকে বিতাড়িত করবার মধ্যে এ কারণেই সূর্যাস্ত কালকে বেছে নেওয়া (অর্থাৎ রাত্রি আসছে তখন) হয়; এবং যে মুরগিটিকে দৈত্যের তুষ্টির জন্যে উৎসর্গ করা হয়, তার রঙ অবশ্যই যেন কালো হয়। একেবারে পুরো Sympathetic Magic, দৈত্যের কালো রঙের সঙ্গে উৎসর্গীকৃত মুরগীর রঙটিকে মিলিয়ে দেওয়া। এই জন্যেই, কালো মুরগীর ডাকে দৈত্য-দানব টিঁকতে পারে না বলে কল্পনা করা হয়।

এই কারণেই সাদা মুরগীর ডাককে নিশাচর ভূত-প্রেত নাকি মোটেই আমল দেয় না; কালো মুরগীর ডাকে শয়তান নাকি উড়ে পালায়। মৃতের পরলোকে যাত্রাপথ দৈত্যশূন্য করবার জন্যে চীনদেশে শবাধারের ওপর একটি সাদা মোরগ দেওয়া হয়; এখানে কালো রঙের বদলে সাদা রঙটি লক্ষণীয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপের বহু অঞ্চলেই বিশ্বাস আছে, অনেক ডাইনীই কালো মুরগী নিয়ে ঘোরে। Encyclopedia of superstitions-এ বলা হয়েছে: "In oldenberg when any thing was bewitched the innards of a black cock were taken The heart, or lung or liver was stuck all over with needles, or marked with a cross-cut, and placed on a fire in a tightly-closed vessel. When the heart boiled, or was reduced to ashes, the witch would appear, having felt severe burning pains during the operation. She would ask for her release."—P. 41. এই অনুষ্ঠানের দর্শকদের সবাইকে তখন কঠোর নীরবতা পালন করতে হয়, নয়তো যাদু কার্যকরী হয় না। অনেকের অনুমান, মুরগী সম্পর্কে এবম্প্রকার সংস্কার-বিশ্বাস, ভারত থেকেই অন্যত্র এবং ইউরোপে গেছে। অথর্ব বেদে (৫.৩১.২) কুকবাকুর (মোরগ) অমঙ্গল নিবারণের মন্ত্র দেখা যায়।

মধ্যযুগে ইউরোপে বিশ্বাস ছিল, হংসীরা ডাইনীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং ডাইনীরা হাঁসের পিঠে চড়েই চলাফেরা করে থাকে। মরা হাঁসের মাথা সর্বদা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা উচিত বলে ইংলণ্ডে সংস্কার আছে, এতে হাঁসের মাথার ভেতর থেকে দুষ্টগ্রহ (Evil spirit) বেরিয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গের রাজবংশীদের একটি বিশিষ্ট অপদেবতার নাম 'গঙ্গাসাগর' বা 'গাহিলাদ্যাও'। এই অপদেবতা হাঁসের পিঠে বাস করেন। হাঁসকে লাথি মারলে ইনি রুষ্ট হয়ে তার ওপর প্রতিশোধ নেন। ফলে অপরাধীর মুখ বিকৃত হয়, হাত-পা বেঁকে যায়, দেহে অর্ধাঙ্গ রোগ হয়, এবং গর্ভবতী রমণী হলে সে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেয়। এই অপদেবতার তুষ্টির জন্যে যে পূজানুষ্ঠান করা হয়, তাতে একটি হাঁস প্রয়োজন হয়। পূজোর পরও হাঁসটিকে

কিছুক্ষণ ধরে রাখা হয় ; পুজো পেয়ে 'গংগাসাগর' বা 'গাহ্জী দ্যাও' তাঁর আপন স্থান হাঁসের পিঠে আশ্রয় নেন। রোগের উপশম হলে হাঁসটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

রাশিয়াতে বিশ্বাস আছে, ডাইনীর আত্মা কাকের রূপ ধারণ করে। কাকের সঙ্গে প্রেতের যোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ কাক মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা রূপে কল্পিত। গোটা বাঙলা দেশেই এই গল্পটি চলিত আছে: এক গৃহিণী রাতের বেলায় মাছ ভাজছিল ; হঠাৎ দেখতে পেল, একখানি অস্বাভাবিক হাত প্রসারিত হয়ে তার কাছে মাছ ভাজা চাইছে। গৃহিণী মাছের বদলে কিছু গরম তেল সেই হাতে ঢেলে দিল। পরদিন সকালে উঠে দেখতে পেল, সেখানে একটি কাক মরে পড়ে আছে।

পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলাতে প্রচলিত 'গার্শি'-ব্রতের একটি কাহিনী ও আচারকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন আমিষ খেতে নেই, খেলে অলক্ষ্মীর বাহন দাঁড়কাক ঘরে ঢুকে বিপদ সৃষ্টি করে। কাহিনীটি এই: স্ত্রী ও পুত্রবধূর বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও রাজা আশ্বিন সংক্রান্তির দিন মাছ খেলেন। এই পাপের অপরাধ খণ্ডাবার জন্যে শাশুড়ী ও পুত্রবধূ রাতে এক যাদুর আশ্রয় নিলেন: তাঁরা নিজেদের চুলে গিঁট বেঁধে, শাড়িতে-শাড়িতে গিঁট বেঁধে শুলেন ; রাতে একবারও ঘরের বের হলেন না। রাজার মাছ খাবার অপরাধে অলক্ষ্মীর বাহন দাঁড়কাক রাতে সত্যিই এসেছিল ; কিন্তু শাশুড়ী-বধূর ওই যাদুকর্মে ঘরে প্রবেশ করতে পারে নি। পরদিন দেখা গেল, ঘরের পেছনে একটি দাঁড়কাক মরে পড়ে আছে।

ঋগ্বেদে (১০. ১৬. ৬) শবদাহ ক্রিয়ায় কৃষ্ণপক্ষীর উল্লেখ আছে। কৃষ্ণপক্ষী হল কাক। এতে বলা হয়েছে, এই পাখি মৃতব্যক্তিকে তার জীবিতাবস্থায় যে যন্ত্রণা দিয়েছে, অগ্নি তার উপশম করুন। অথর্ববেদে (৭. ৬৬. ১, ২) এই পাখিকে অমঙ্গল-সূচক বলা হয়েছে। অথর্ববেদেই (১২. ৩. ১৩) বলা হয়েছে, যেখানে কৃষ্ণপক্ষী এসেছে, সে জায়গা জল দিয়ে পরিষ্কার করা হোক। এতে বোঝা যায়, এ পাখিকে অপবিত্র ও অশুচি বলে মনে করা হত।

পঁ্যাচা অশুভ পাখি, কারণ পঁ্যাচার বাচ্চারা নাকি মা-কে খেয়ে ফেলে। সেইজন্যে প্রবাদ আছে: 'The owl is an unfilial bird.' চীনে বিশ্বাস আছে: পঁ্যাচার কণ্ঠস্বর হল—এক দৈত্য ও প্রেতাত্মা কর্তৃক অপর দৈত্যকে আহ্বান। ইউরোপে মনে করা হয়, চার্চ বা গীর্জা সন্নিহিত অপদেবতারা পঁ্যাচা ও বাদুড়ের রূপ ধারণ করে। বেদুয়িনরা মনে করে, পঁ্যাচা এক নির্দয় বৃদ্ধা রমণীর আত্মা, আপন সন্তানকে একটি ঝাঁঝরি বা চালুনি আনতে ভুল করায় যে হত্যা করেছিল। প্রতি রাতে সে পঁ্যাচা হয়ে উড়ে বেড়ায়, বেদুয়িনদের ভয় চামড়ার তাঁবুতে যদি পঁ্যাচা এসে বসে, তবে ভেতরের শিশুর মৃত্যু হবে। এইজন্যে বেদুয়িনরা চামড়ার তাঁবুর ওপর একটি ঝাঁঝরি বা ফুটো করা সসপ্যান উল্টো করে রেখে দেয়, যাতে আপন সন্তান হত্যার কাহিনী মনে পড়ায় সে সেখান থেকে চলে যায়। রোমানদের মধ্যে বিশ্বাস

আছে, প্যাঁচা (The Screech owl) অল্প বয়সী শিশুদের রক্ত চুষে খায়। স্ত্রী প্যাঁচার চেয়ে পুরুষ প্যাঁচাই ইটালি, জার্মানি, রাশিয়া ও হাঙ্গেরীতে অধিকতর ভয়ংকর, অশুভ এবং মৃত্যুর আসন্নপূর্ণ। তাতারেরা প্যাঁচাকে দূরে রাখবার জন্যে প্যাঁচারই পালক পরিধান করে।

ঋগ্বেদে উলূককে হিংস্র পাখি (৭. ১০৪. ২২) এবং এর কণ্ঠস্বরকে অমঙ্গলসূচক ১০. ১৬৫. ৪) বলা হয়েছে। অথর্ববেদে (৬ ২৯. ১, ২) কপোত ও উলূককে অমঙ্গলের দূত বলা হয়েছে। কিন্তু অথর্ববেদেই (৮. ৪. ২২) জাতুমানকে বিনাশ করবার জন্যে উলূকের স্তুতি আছে। ঋগ্বেদে (৭. ১০৪ ১৭) বলা হয়েছে যে, রাক্ষসী খর্গলের মতো লুকিয়ে থাকে। খর্গল একরকমের প্যাঁচা, সম্ভবত হুতোম প্যাঁচা।

অথর্ববেদে (৬. ২৯ ২) কপোতকে অমঙ্গলের দূত বলা হয়েছে। কপোত বলতে ঘুঘু। বাজসনেয় সংহিতায় (২৪ ২০, ৩৮) নির্ঋতির উদ্দেশে 'কপিঞ্জলের নামোল্লেখ মেলে।

স্কটল্যাণ্ডে বাদুড় সম্পর্কে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে : বাদুড় যদি ওপরের দিকে উড়ে পরে নীচের দিকে নামতে থাকে, তবে সেই মুহূর্তটিই হলো মানুষের ওপর ডাইনীদের প্রভাব বিস্তারের মুহূর্ত। এই কুপ্রভাব থেকে কোনো মানুষই রেহাই পেতে পাবে না। বাদুড় সম্পর্কে এই বিশ্বাস স্কটল্যাণ্ড ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না।

আয়ার্ল্যাণ্ডে আবাবিল (The Swallow)কে বলা হয় 'Devil's bird'; ওদের বিশ্বাস, প্রত্যেক নর-নারীর মাথায় একটি বিশেষ চুল আছে, আবাবিল যদি সেই চুলটি তুলে নেয়, তবে তার চরম সর্বনাশ ঘটে। যাদুকর্মে ও নানা Black magic-এ (বিশেষ করে contagious magic-এ) চুল একটি বড়ো উপকরণ। রঙপুর থেকে সংগৃহীত "গোপীচন্দ্রের গানে" একটি অভিশাপ এই পাওয়া গেছে : "বেঁচু পংখী বাসা করুক মস্তকের উপব।" চীনে আবার বিপরীত ব্যাপার। আবাবিল পুড়িয়ে তার ছাই, একটি হলুদ পত্রে লিখিত বিশেষ মন্ত্র, তার পোড়া ছাই, এই সব জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে দৈত্যদানবের হাত থেকে পরিত্রাণ মেলে।

wren (এক ধরনের ক্ষুদ্র গায়ক পাখি) সম্পর্কে আয়ার্ল্যাণ্ডে বিশ্বাস আছে : যেহেতু এর পাখায় শয়তানের রক্ত লেগে আছে, অতএব "St. Stephen's Day"তে এ পাখি হত্যা করা উচিত। এর পেছনকার আসল কারণ এই মনে হয় : আইরিশ দ্রুয়িদ-রা এই পাখির ডাক থেকে নানা রকম শুভাশুভ নির্ণয় করত। দ্রুয়িদদের প্রতি মনোভাবের বিশেষত্বের জন্যেই wren-এর প্রতি এই প্রতিশোধ গ্রহণ।

প্রায় একই ধরনের বিশ্বাস ম্যাগপাই সম্পর্কে জার্মানীতে প্রচলিত আছে। জার্মানীতে মনে করা হয়, ডাইনীরা নিজেরাই ম্যাগপাইয়ের রূপ ধারণ করে, নয়তো ম্যাগপাই ডাইনীদের বাহন। এই জন্য খ্রীষ্টমাস ও Epiphany-র মধ্যবর্তী সময়ে (আসলে, এই সময় থেকে দিন বড়ো হতে থাকে, দৈত্যরূপী শীতের অবসান ঘটতে থাকে) ম্যাগপাই হত্যা করা সেখানে এক অবশ্য পালনীয় নিয়ম।

Buriat-রা মনে করে অপদেবতারা ডাইভার (পানকৌড়ি জাতীয় পাখি), রাজহাঁস, দাঁড়কাক ও ঈগলের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্যে Buriat এবং yakutরা কখনই ডাইভারের নীড় নষ্ট করে না, বা তাকে বিরক্ত করে না, পাছে ডাইভারের মধ্যে নিহিত অপদেবতার অভিশাপে কোনো সর্বনাশ ঘটে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও জার্মানীর পৌরাণিক সাহিত্যে দেখা যায়, ঈগল দৈত্য-দানবের প্রিয় হয়েছে। Edda-তে কথিত হয়েছে, আকাশের উচ্চদেশে উপবিষ্ট ঈগলরূপী এক দৈত্যের পাখার ঝাপটানিতেই পৃথিবীতে বাতাসের জন্ম হয়। সেখানে আরো বলা হয়েছে, ডাইনীদের বাহনের বল্গা হল—ঈগল। প্রসংগতঃ শ্যেন সম্পর্কে বিপরীত মনোভাবটি উল্লেখযোগ্য। শ্যেন ও ঈগল সমধর্মী পাখি, লোকমানসে এ দুটি পাখি মিলে গেছে পরস্পরের সঙ্গে। তথাপি, শ্যেন সম্পর্কে একটি পবিত্রতার বোধ আছে, যার ফলে শ্যেনের দেব-আসংগ বারংবার প্রদর্শিত হতে দেখা যায়।

উত্তরবংগের রাজবংশীদের মধ্যে 'মাশান' (<শ্মশান) নামে আঠারোটি অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে। তার মধ্যে একজন 'মাশানে'র নাম—'কুহুলীয়া মাশান'। কোকিলকে উত্তরবংগে বলে 'কুহুলী'; যে মাশান গাছের ডালে বসে, কোকিলের মতো মিষ্টকণ্ঠের অনুকরণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিপদে ফেলেন, তিনি 'কুহুলীয়া মাশান'।

সারা ভারতে যে অপদেবীর নাম সর্বাধিক, যার চেয়ে বেশি ভয় আর কাউকেই দেখে পাওয়া হয় না, সে 'চুরাইল'। প্রখ্যাত শিকারী Jim Corbett তাঁর 'Jungle lore' (অনুবাদ: অমিয়কুমার চক্রবর্তী: অক্টোবর, ১৯৬৬) বইতে এ নিয়ে বাস্তব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুন্দর আলোচনা করেছেন (পৃ. ২-৫)। জিম করবেটের মতে 'চুরাইল' হলো পঁ্যাচা বা ওই জাতীয় কোনো পাখি। জ্যোৎস্না রাতে তিনি একবার এ পাখি দেখেছেন এবং ডাক শুনেছেন তিনবার, তিনবারই রাতে। সোনালি ঈগলের চেয়ে এর আকৃতি একটু ছোটো, লম্বা-লম্বা পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, মাথাটি পঁ্যাচার মতো অতো বড়ো বা গোল নয়; ঘাড়ও তেমন ছোটো নয়; এর মাথায় কোনো শিং নেই; গায়ের রঙ চাঁদের আলোয় ঘোর খাদামী দেখায়। ঠিক আধ মিনিট অন্তর ডাকে, মাথাটি আকাশের দিকে তুলে, হাঁ করে। এই ডাকের ভয়াবহতা অবর্ণনীয়, যেন এক অপার্থিব লোকের ধ্বনি তা।

চুরাইল স্ত্রীলোকের বেশে দেখা দেয়। এর চোখের দিকে চাইতে নেই, কেননা চোখ দিয়েই সে মানুষকে সম্মোহিত করে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্যে তখন চোখ বন্ধ করে বা ঢেকে রাখতে হয়। চুরাইলের পায়ের পাতা উল্টো দিকে ফেরানো, কাজেই পেছন ফিরে হাঁটতে তার অসুবিধা হয় না। চুরাইলের নামোচ্চারণও করতে নেই, করলেই সে দেখা দেয়। জিম করবেট কুমাওয়ে বসন্তকালে চুরাইলের ডাক শুনেছিলেন॥

নবম অধ্যায়

পাখি : যাদু ও ইন্দ্রজাল

.. ১ ...

পাখির অন্তর্নিহিত যাদুক্ষমতাই তাকে দেবত্ব দিয়েছে। দেবত্বের দিক আলোচনা করেছি, এইবার যাদুক্ষমতার দিকটি প্রদর্শন করি।

'ম্যাজিক' শব্দটির সংগে ওঝা ও পুরোহিতের অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। প্রাচীন পারশি শব্দ 'Magus' থেকে গ্রীক শব্দ 'Magike' (Magos) শব্দ পাওয়া গেছে। শব্দটির মূল অর্থ ছিল—প্রাচীন পারশ্যের পুরোহিত। বহুবচনাত্মক শব্দ 'Magi', 'Magian' বলতে প্রাচীন পারশ্যের পুরোহিত ও যাদুকর সংক্রান্ত বিষয়। এই ওঝা ও পুরোহিতের নাম ও ভূমিকাটুকু আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

জাগতিক শক্তিকে ম্যাজিসিয়ান একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট যুক্তি, শৃংখলা ও কর্মপন্থার মধ্যে অবলোকন করতে চায়। যেমন, রসায়ন-শাস্ত্রে সমপরিমাণ বিভিন্ন অ্যাসিড মিশ্রিত করে, একই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে গেলে, সর্ব অবস্থাতেই তারা একই ও অভিন্ন ফল প্রসব করবে, ম্যাজিসিয়ানরাও সেই রকম মনে করে, সমপ্রকার পরিস্থিতিতে, সমপ্রকার প্রক্রিয়া ও আচারাদি অনুসরণ করলে, সর্বদা এবং সর্বত্রই তা অবশ্যম্ভাবীরূপে সমপ্রকার প্রতিফল প্রদান করবে। ওই শক্তির এমন কোনো ব্যক্তিত্ব ও চেতনা নেই, যাতে করে তা ভিন্ন আচরণ করতে পারে।

স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার একেই বলেছেন—'Sympathetic Magic', বাঙলায় বলা যেতে পারে "সমপর্যায়ী যাদু।" The Golden Bough বইতে ফ্রেজার এ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, বিশ্বের বহু জনের কাছেই আজ তা অতি পরিচিত কথা। এই 'সমপর্যায়ী যাদু'কে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন : সাদৃশ্যের ভিত্তিতে 'Homoeopathic Magic' এবং সংক্রামতার দিক থেকে 'Contagious Magic'. বাঙলায় প্রথমটিকে বলা যায়—'সাদৃশ্যমূলক যাদু', দ্বিতীয়টিকে 'সংক্রামক যাদু'। Homoeopathic Magic-কে তিনি 'Imitative Magic'-ও বলেছেন, আমরা একে বলব 'অনুকরণাত্মক যাদু'। ম্যাজিকের বাস্তব ও প্রয়োগগত দিককে অবলম্বন করে একে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন : একদিকে তার স্পষ্ট, প্রকৃত, বাস্তব রূপ,

একে বলেছেন 'Positive Magic' ; অন্যদিকে সেই সব প্রকৃত ও বাস্তব যাদু-অনুষ্ঠান না-করার দিক, একে বলেছেন 'Negative Magic' বা 'Taboo'. ম্যাজিসিয়ানের যাদু-অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে তার মধ্যে দুটি ভাগ লক্ষ করেছেন : যাদুকর যখন কোনো বিশেষ একজনের ভালো বা মন্দের জন্যে কোনো যাদুকর্ম করে তখন তা হল 'Private Magic' ; আবার যখন গোটা একটি গোষ্ঠীর জন্যে, সর্বসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যে সেই কর্ম করে, তখন তাকে বলেছেন 'Public Magic'. একটি গোষ্ঠীর মঙ্গলামঙ্গলের কর্তা রূপেই যাদুকররা পরিশেষে সেই গোষ্ঠীর মুখ্য ব্যক্তি বা রাজা নির্বাচিত হয়েছে ॥

...২....
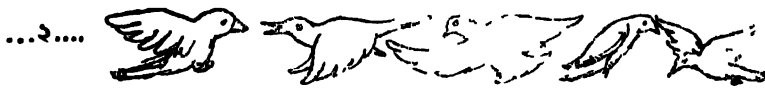
ভবিষ্যতে কী ঘটনা ঘটবে, পূর্বাহ্নেই গণৎকার ও যাদুকরের মাধ্যমে তা জানাকে বলে 'Divination', পূর্ববঙ্গের উপভাষায় একেই বলে 'আগাম কথা'। শিথিল ও ব্যাপকার্থে Divination বলতে তন্ত্র-মন্ত্র যাদু-কুহক এবং occultism বা নানা গূঢ় রহস্যাদির অনুধাবন ও অনুশীলন বোঝায়। কিন্তু ম্যাজিকের সঙ্গে Divination-এর একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যও আছে ; ম্যাজিকের মধ্যে যে 'coercion' বা জোর করবার দিক আছে, Divination-এ তা নেই। ম্যাজিকে ভবিষ্যৎ ঘটনাকে জোর করে ঘটানো হয়, ঘটতে বাধ্য করা হয় ; আর Divination-এ যে ঘটনা আপন নিয়ম অনুযায়ী ঘটবে, পূর্বাহ্নে কেবল তা জানা। Y. M. Sokolov তাঁর 'Russian Folklore' (New york, 1950) বইতে Divination ও ম্যাজিকের পার্থক্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন (P. 24।)।

Divination-এর আরো কয়েকটি দিক আছে, Sokolov যা নিয়ে আলোচনা করেন নি। Divination-এর মধ্যে এমন কয়েকটি দিক আছে, যা পাখির সঙ্গে জড়িত, এবং শিথিল অর্থে তা যাদুকর্মের অঙ্গীভূত ; অতএব, এই অধ্যায়ের প্রসঙ্গ হিসেবে তাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। Divination-এর সঙ্গে 'Oomancy', 'Rhabdomancy', 'Osteomancy' এবং 'Necromancy' যুক্ত, এবং এগুলোর সঙ্গে পাখিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। 'Oomancy' হল, ডিম দ্বারা, ডিম ভেঙে, ডিম নিয়ে নানা ক্রিয়াচার পালনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানবার প্রয়াস। 'Things Indian' (London : 1906) বইতে William Crooke 'Rhabdomancy'র সংজ্ঞায় লিখেছেন, "the taking of omens form wands or arrows" (P. 139). পাখির হাড় বা পালককে গুচ্ছবদ্ধ করে দণ্ডের মতো বেঁধে নিয়ে তাকে 'wand' মনে করে যাদু-অনুষ্ঠান এখনও করা হয়। সারা ভারতেই তা দেখা যায়।

'Osteomancy' হল পশু-পাখির হাড়ের সহায়তায় ভবিষ্যৎ ঘটনা জানবার

প্রয়াস। Crooke-এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন : "Osteomancy, or the inspection of the marks on a fresh shoulder-blade of a sheep, was, according to the Arab historian, Ali Sher kani, practised in Sind. It is now employed by the Tibetan Lamas, and we meet a modifcation of rhabdomancy and osteomancy among the kaJens of Burma, who devine by chicken-bones The thigh or wing-bones of a fowl are scraped till holes apper in the bone When the number of holes is even on one side of the bone, this is used. Pieces of bamboo are placed in the holes If these slant inwards the omen is unlucky ; if outwards, favourable—P. 139 ক্রুক লক্ষ করেন নি, তিব্বত ও ব্রহ্মে পশু-পাখির হাড় দিয়ে শুভাশুভ নির্ণয়ের এই ক্রিয়াচার চীন থেকে গৃহীত। আমরা একটু পরে তা নিয়ে আলোচনা করছি।

'Necromancy' হল মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগ রচনা করে, তারই ফলে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানবার যাদুবিদ্যা। পাখির মাধ্যমেও পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এইরূপ যোগস্থাপন করা যায়। পাখি বলি দিয়ে তার অন্ত্র পরীক্ষা করেও ভবিষ্যৎ ঘটনার শুভাশুভ নিরূপিত হয়।।

'Oomancy' আসলে 'Egglore'-এর অন্তর্ভুক্ত। লোকচারণায় ডিম অনেক আচার-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত, অনেক পুরাকথাও ডিম সম্পর্কে রচিত হয়েছে, যার ফলে 'Eggmyth'-এর জন্ম হয়েছে। ডিম সম্পর্কে কিছু আচার-সংস্কার-বিশ্বাসের কথা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ডিম বলতে পাখির ডিমকেই কেবল বুঝিয়েছি। ডিমের মধ্যে একটি পবিত্রতার ভাব আরোপ করবার জন্যেই অথবা তার মধ্যে একটি যাদু-রহস্য প্রত্যক্ষ করবার ফলেই ডিম দিয়ে বা ডিম ভেঙে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানবার প্রবণতা দেখা দেয়। ইংলণ্ডের ডার্বিশায়ারে বিশ্বাস আছে, রবিন পাখির বাসা থেকে ডিম চুরি করা বিশেষ দুর্ভাগ্যজনক। ওয়েলস্-এ বিশ্বাস আছে, ঈগলের বাসা থেকে ডিম চুরি করলে কেউ কোনো দিন সুখ-শান্তি পায় না।

ইজিপ্ট, পারস্য, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে ডিম পৃথিবীর প্রতীক, সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত; কখনো বা ডিম প্রাণ বা জীবন, আত্মা এবং গাছের প্রতীক। গল্-রাও ডিমকে পৃথিবীর প্রতীক বলে মনে করত। ইজিপশীয়দের কাছে ডিম হলো মহাপ্লাবনের পর মানবজাতির পুনর্জন্মের প্রতীক। খ্রীষ্টান সংস্কৃতিতে মানুষের এই পুনর্জন্মকে যিশুর পুনরুত্থান (মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর যিশুর কবর থেকে উত্থান ও স্বর্গারোহণ, এটিই 'Ascension Day') বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই জন্যেই

-ইস্টারের সময় ডিম খাওয়া গোটা ইউরোপেই চালিত হয়েছে। ডিম থেকে যেমন বাচ্চা বের হয়, কবর থেকে যেন তেমনি যিশুর পুনরুত্থান ঘটে: একেবারে খাঁটি Homoeo-Pathic Magic. কিন্তু বিশ্বাস আছে, গুডফ্রাইডে-তে পাড়া ডিম ভালো হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়ের Abipon-রা মুরগীর ডিম খায় না, পাছে তারা মুরগীর মতোই ভীরু হয়ে পড়ে।

ডিম সম্পর্কে Negative Magic বা Tabooরও সৃষ্টি হয়েছে। ডিম খাবার পর চামচ দিয়ে তা ফুটো করে দিতে হয়, না দিলে নানা বিপদ হতে পারে। A. R. Wright তাঁর 'English Folklore' (London : 1928) নামে বইটিতে লিখেছেন, "of the many people who break the bottom of an eggshell after the contents have been caten, few, Perhaps, remember that this was originally to Prevent its use by witches"—P. 51. তিনি এই প্রসঙ্গেই আরো লিখেছেন: "An odd number must be set under a hen (often, curiously, the otherwise unlucky number thirteen).". বীরহোড়দের বিশ্বাস: "A young Birhor may not eat an egg which sounds when shaken, as the eating of such an egg is believed to cause otorrhaea (a flow of pus from the ear) in the eater". (Man in India : Vol. 1. No. 2. June 1921.P. 153).

একটি আইরিশ বিশ্বাস এই: ঘোড়ার মালিকরা যেন জোড়ায়-জোড়ায় (বেজোড় সংখ্যায় নয়) ডিম খায়, নইলে ঘোড়ার অমঙ্গল হয়। উত্তর লিংকনশায়ারে বিশ্বাস আছে: সেদ্ধ ডিম খেয়ে তার খোলা আগুনে নিক্ষেপ করলে সেই মুরগি আর ডিম দেবে না। ডার্বিশায়ারে বিশ্বাস আছে: রাতের বেলায় ডিম সংগ্রহ করা বা আনা উচিত নয়। রবিবার দিন ডিম আনা উচিত নয়, সেদিন মুরগীকে ডিমের তা দিতে আরম্ভ করতে দেওয়াও উচিত নয়। এ বিশ্বাস লিংকনশায়ার ও নটিংহামশায়ারেও আছে।

নরফোকে একটি বিচিত্র বিশ্বাস আছে: মরশুমের প্রথম দিন বাড়িতে তেরো-র চেয়ে কমসংখ্যক প্রিমরোজ ফুল আনলে সে বছর বাড়ির হাঁস-মুরগীরা ঠিক সেই সংখ্যক মাত্রই ডিম পাড়বে, তার বেশি নয়।

ডিম খেয়ে যদি ডিমের খোলা না ভেঙে ফেলা হয়, কর্ণওয়াল ও ডিভনশায়ারে মনে করা হয়, ডাইনীরা তা নিয়ে সমুদ্রে যাবে, এবং ফলে জাহাজডুবি হবে। প্রাচীন রোমানদের এই বিশ্বাসটি ইংলণ্ডে যেতে পারে। একটা ঈগলের ডিম সেদ্ধ করে দু'জনে মিলে ভাগ করে খেলে ডাইনীরা তাদের কাছ ঘেঁষতে পারে না।

ডাইনী ও নানা অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে ডিমের খুব যোগ দেখা যায়। ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই বিশ্বাস আছে, অতিপ্রাকৃত প্রাণী বা সত্তার জীবন ও শক্তি নিশ্চিত ভাবে বিনাশ করা যায়, যদি দুরধিগম্য স্থানের কোনো এক বা একাধিক পশুর দেহে লুকোনো প্রাণ-প্রতীক ডিমটি ভেঙে দেওয়া যায়। অর্থাৎ আত্মাকে এখানে বিচ্ছেদ্য (Seperable) বলে বিশ্বাস করা হয়, বিচ্ছেদ্য আত্মার কল্পু-প্রতীকটি বিনষ্ট করে দিলে

প্রাণ বিনাশের এই ধরণের সংস্কার ও কাহিনী ইটালী, আইসল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড, বোহেমিয়া, ব্রিটানি ও ল্যাপল্যান্ড থেকে পাওয়া গেছে।

প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের মধ্যে ডিমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইউরোপে সাধারণ বিশ্বাস এই : একটি মদের গ্লাসের চারভাগের তিন ভাগ জলে পূর্ণ করে নিয়ে, পিন দিয়ে একটি ডিম ফুটো করে, তার শ্বেতাংশ তাতে ফেলে, তার কিছু অংশ মুখে করে নিয়ে বাইরে বা রাস্তায় যেতে হবে। রাস্তায় গিয়ে প্রথম যার নাম উচ্চারণ করতে শোনা যাবে, সেই হবে তার ভবিষ্যৎ স্বামী বা স্ত্রী। ইংলন্ড ও ডেনমার্কে New year's Eve-এর দিন (আমাদের দেশে চৈত্রসংক্রান্তির দিনেরও একটি বিশেষ যাদুগুণ আছে) যুবক-যুবতীরা নবজাত একটি ডিম পিন দিয়ে ফুটো করে তার জলীয় অংশের তিন ফোঁটা একটি জলভরা পাত্রে ফেলে। তা একটি বিচিত্র গাছের আভাস হয়ে দেখা দেয়। তাই থেকে হবু স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র ও তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সংখ্যা জানা যায়। স্পেনে এটি করা হয় Midsummer Eve-এ, স্কটল্যাণ্ডে Halloween-এর দিনে। ডিম কড়া করে পুড়িয়ে নিয়ে, তা থেকে কুসুমটুকু বাদ দিয়ে, বদলে নুন দিয়ে, রাতে শোবার আগে 'সাপার' না খেয়ে তাই খেয়ে শুলে হবু স্বামীকে স্বপ্নে দেখা যায়। সাদার্ণ ইউনাইটেড স্টেট্স্-এর নিগ্রোরা মনে করে, বাপ-মার বিছানায় ডিম রেখে দিলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হবে।

মানুষের রোগ ব্যাধি ঘটানো ও সারানোর জন্যও ডিমের সাহায্য নিতে দেখা যায়। বাঙলা দেশে বিশ্বাস আছে, হাঁসের ডিম খেলে বাত হয়। গ্রীস ও ইউরোপের অংশ বিশেষে বিশ্বাস আছে, নবনির্মিত নীড়ে সাদা রঙের মুরগী যদি Ascension Dayতে ডিম পাড়ে, সেই ডিম পেটের ব্যথা, মাথাব্যথা ও কানের ব্যথা দূর করতে সক্ষম হয়। কোনো শিশুর দেহের জন্মদাগ দূর করতে হলে সেই স্থানে পর-পর নয় দিন সকাল বেলায় টাটকা মুরগীর ডিম মাখিয়ে সেটা দরজার কাছে, সিঁড়ির তলায় পুঁতে রাখতে হবে। এইভাবে গলগণ্ড রোগও সারানো যায়। ম্যালেরিয়া বা কম্পজ্বর সারাবার জন্যে ডিভনশায়ার ও অন্যত্র এই করা হয় : গভীর রাতে, একাধিক রাস্তার সংযোগ স্থলে গিয়ে পর-পর পাঁচদিন একটি করে ডিম পুঁতে দিয়ে আসা হয়। এসব ক্ষেত্রে এই আচার Imitative Magic, রোগকে যেন ডিমের মধ্যে পুরে মাটিতে পুঁতে রাখা হল।

মদ্যাসক্ত ব্যক্তি ও মাতালের মদ্যপাত্রে পাঁচার ডিম ভেঙে রেখে দিলে সে মদ্যপানে বিরত হয় ও মদকে ঘৃণা করতে থাকে। স্পেনে এটি সারস সম্পর্কে শোনা যায়। গ্রীসে বিশ্বাস ছিল, পাঁচার ডিম পর-পর তিন দিন মদের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে মদের প্রতি বিরক্তি আসে।

নতুন নীড়ে সাদা মুরগী Ascension Dayতে যে ডিম পাড়ে, সেই ডিম শস্যক্ষেত্রে নিয়ে গেলে অনেকের কুনজরের হাত থেকে ক্ষেত রেহাই পায়, এবং আঙুরের ক্ষেতে নিয়ে গেলে, সেখানে শিলাবৃষ্টি হয় না।

নানা অনিষ্টকারী যাদুতে (Black Magic) ডিম ব্যবহৃত হয়। উড়িষ্যায় কোরাপুট জেলায় শবররা মন্ত্রপূত হাঁসের ডিম পথের নীচে পুঁতে রাখে ; অভীষ্ট

ব্যক্তি অজ্ঞাতে তা মাড়িয়ে গেলে তার বিশেষ বিপদ ঘনিয়ে আসে। ডিম দিয়ে শুভাশুভ নির্ণীত হয় নানা স্থানে, এমন কি অপরাধী পর্যন্ত নিরূপিত হয়ে থাকে। মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, পারদারিকতা প্রভৃতি অপরাধের অপরাধী নির্ণয়ের জন্যে গারো-রা মৃন্ময় পাত্রে মুরগীর ডিম সেদ্ধ করে তাই তুলতে বলে; উত্তোলনকালে সে ব্যক্তির হাতে ফোস্কা পড়লে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয় (গারোজাতির বিবরণ: বান্ধব, মাঘ: ১৩০৯, পৃ ৫৪৪: কুমুদচন্দ্র সিংহশর্মা)। খাসিয়া-রা ডিম ভেঙে কুসুমের রঙ ও আকৃতি থেকে শুভাশুভ নিরূপণ করে। যতক্ষণ না শুভচিহ্ন-জ্ঞাপক বর্ণ ও আকৃতি লাভ করে, ততক্ষণ ডিম ভেঙেই চলে। ইংলণ্ডে বিশ্বাস আছে, কারো বাড়িতে যে কোনো পাখির ডিম ঝুলিয়ে রাখা অশুভত্বের সূচক।

যে পাত্রে ডিম রেখে মুরগী ডিমে তা' দেয়, তা উল্টে যাওয়া সুলক্ষণ বলে ইংলণ্ডে মনে করা হয়। কখনোই বেজোড় সংখ্যক ডিমে মুরগীকে তা দিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহলে একটিও ডিম ফোটে না॥

Rhabdomancy এবং Osteomancy-র মধ্যে পার্থক্যটা বড়োই সূক্ষ্ম। অনেক সময় দুটো প্রায় একসঙ্গে মিশে যায়। আমরা দুটোকে একত্রে আলোচনা করছি।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব বেদে ও যাদুকররা পথে-পথে বাজী দেখিয়ে বেড়ায়, বাজী ও যাদু প্রদর্শনীর সময় তাদের হাতে থাকে পাখির ডানা ও হাড়। সাধারণত পাখির একদিকের গোটা ডানাটিই পালকসহ রাখা হয়; বাজীর ঝাড়-ফুঁক ও হাওয়া, পাখার মতো এটি দিয়েই দেওয়া হয়। হাড় সাধারণত পাখির পায়ের লম্বা হাড়। হাড় ও ডানা দুই-ই বৃহদাকার পাখির হয়ে থাকে।

প্রান্ত উত্তর বঙ্গের ওঝারা 'অনিষ্টকারী যাদু'তে (Black Magic) অভীষ্ট ব্যক্তিকে এক ধরণের 'বাণ' মারে, তাকে বলে 'জুগুনি বাণ' (<শকুনী বাণ)। এই মন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণে অভীষ্ট ব্যক্তি জীবন্ত অবস্থায় শকুন-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শকুন তার পাখা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে ঝাপ্টা মারে। শকুনের পাখাতেই অনিষ্টকারী শক্তি আছে, পাখাই এখানে যাদুদণ্ডের কাজ করে।

যাদকর্মে ফুঁ-হাওয়া একটি বড়ো উপকরণ। মনে হয়, পাখির ডানা সেই হাওয়ার দিকটিকেই তুলে ধরে। চীনে ফিনিক্স পাখির যে মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে, তা এই: সে দুই ডানা প্রসারিত করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রসারিত ডানা হাওয়া-বাতাসকে স্পষ্ট রূপে নির্দেশ করে।

দক্ষিণ ভারতের এক যাযাবর জাতি, 'বাওয়ারিয়া'; এরা ডাকাতি ও জালিয়াতি করে; ধরা পড়বার ভয়ে সঙ্গে নানা জিনিস রাখে, তার মধ্যে একটি হল, এক গোছা ময়ূর-পালক। ময়ূর-পালক এখানে যাদুদণ্ডের ভূমিকা নিয়ে থাকে।

মানদ্বীপের নাবিকরা বিশ্বাস করে, wren পাখির পালকের মধ্যে এমন এক যাদুশক্তি আছে, যা জাহাজডুবির প্রতিরোধক। একটি অনুষ্ঠানও অবশ্য এর পেছনে আছে : একটি wren পাখিকে তাড়া করে ধরা ও মারা হয় 'খ্রীষ্টমাস সন্ধ্যায়' ; একটি লাঠির মাথায়, দুটি ডানা প্রসারিত করিয়ে পাখিটিকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়। আসা-পথে প্রতিটি পালক নাবিকদের কাছে পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। কোনো নাবিকই তা কিনতে অস্বীকার করে না, যে কববে তার জাহাজ ডুববে। এই ভাবে পালক বিক্রয় করতে-করতে পাখিটি প্রায় পালকশূন্য ন্যাড়া হয়ে পড়ে। তারপর পাখিটিকে কোনো সমুদ্রতীরে বা পড়ো জমিতে সমাধি দেওয়া হয়। তা হলেই ওই পালকগুলো যাদুগুণ-সমন্বিত হয়ে ওঠে। ওগুলো সংগে থাকলে জাহাজ ডোবে না।

জীবনজী জামসেদজী মোদী 'The owl in folklore' (Journal of the Anthropological Society of Bombay : Vol XII, No 8, PP. 1014-1026) প্রবন্ধে লিখেছেন : "In the Avesta, the owl, which is spoken as Pesha Pers (Push), is represented, as having feathers which serve as a kind of amulet. If one rubs his body with the feathers, he is safe from the curses of his enemies. Both its feather and its bones, protect the person holding them from enemies. They bring him help and respect from others. He is so well protected by keeping these feathers or bones on his body that no enemy can smite him."

এ বিষয়ে J. M. Campbell-এর মন্তব্য (Notes on the spirit basis of belief and custom : The Indian Antiquary : August, 1895, P.221) আরো ব্যাপক ও তথ্য-নির্ভর : "The Modi or Korvi sorcerers of Belgaum wear feathers in their turbans. Hindu messengers used to wear a feather in their head-dress···The early tribes of Australia wear feathers,.. in their hair. The people of New Britain, east of New Guinea, deck their hair with gay feathers. The Melville Islanders fasten a feather in their hair. Feathers are worn on the head by the Harvey Islanders. The Motus of New Guinea wear the feathers of Cassowary as a head-dress. The Easter Islanders wear a crown of grass round which feathers are stuck The Niam-Niams of central Africa wear a plume of feathers. The wasagaras of the East African hills wear Vulture and Ostrich feathers in their hair. Many Africans and Americans wear plumes in their hair. In south Africa a Pink feather is a sure guard against lightming. The Dinkas of the white Nile wear ostrich feathers in their hair.

Feathers are worn by the priestesses of Dohomey. Among some American Indians a head-dress full of feather is sacred. In Russia. feathers are worn only on the head only by married ladies....The Pope is always accompanied with flabelli, or feather fans".

তাতারেরা পুরুষ প্যাঁচার পালক তাবিজ হিসেবে পরিধান করে। Khorda Avesta-তে বলা হয়েছে, Varethraghna প্যাঁচার পালক থেকেই শক্তি আহরণ করে থাকে। এই সব দৃষ্টান্তই Homoeopathic Magic-এর 'like produces like' এই নীতি অনুযায়ী,—যেহেতু প্যাঁচা অলক্ষুণে পাখি, অতএব তারই পাখা পরিধান করে দোষখণ্ডন করবার চেষ্টা।

Rhabdomancy-র প্রসঙ্গে আমরা পাখির পালকের কথাও আলোচনা করেছি। বস্তুত আমার মনে হয়, পাখির পালকের গোছা অথবা এক-একটি পৃথক পালককে 'wand' বা যাদুদণ্ড বলে মনে করা হয়। পালক যাদুদণ্ড হতে পেরেছে বলেই আকৃতির সাদৃশ্যে Phallicism-এর সঙ্গেও তা যুক্ত হয়েছে। Rhabdomancy-র আর একটি দিক—তীর নিক্ষেপ করে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানা। এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই উল্লেখযোগ্য যে, কঙ্ক ও ঈগলের পালক তীরের মাথায় লাগানো হয়। অবশ্য, বাতাসের মধ্যে তীরের গতি ঋজু রাখবার জন্যেই এ ব্যবস্থা কিন্তু এর পেছনে যাদু অবশ্যই ছিল, নইলে যে কোনো পাখিরই পালক কেন এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না?

. .ঙ....

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে Osteomancyর প্রসঙ্গে উইলিয়ম ক্রুকের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম। তাঁর মন্তব্যের প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম, এই প্রথা প্রধানত চীনের এবং চীন থেকেই তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এখন এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে।

পশুপাখির কাঁধের হাড়কে 'Oracle bone' হিসেবে ব্যবহার করা চীনীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ বিশেষত্ব। চীনের এই সংস্কৃতিকে 'Bone culture' বলা হয়েছে। 'Oracle bone' খুব অলংকৃত হয়। নানা দৃশ্য ও ঘটনা ওই সব হাড়ে খোদাই করা থাকে। ওই সব দৃশ্য ও ঘটনাগুলোই যাদুগুণান্বিত, অথবা, যাদু-সংস্কৃতির অনেক ইতিহাস ওগুলো থেকে অনুমান করা যায়। হাড় ছাড়া চীনে যাদুকর্মে ব্যবহৃত হত পেতলের বাসন-কোসন, এবং পাখির আকারে সবুজ রঙের এক ধরনের পাথর। এই সব পেতলের বাসনে, হাড়ের গায়ে যে সব চিত্র ও দৃশ্য খোদাই করা থাকত, পাখি তার মধ্যে একটি প্রধান উপকরণ। সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—এই সব বাদ্যু-কর্ম রাজপ্রাসাদ ও রাজপরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। যে শাং বংশ (shung dynasty) থেকে চীনের ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই শাং বংশের আমল থেকেই বাদ্যুকর্মের উপকরণ হিসেবে এগুলো পাওয়া গেছে।

এইসব পদার্থে Neolithic বা নব্যপ্রস্তরযুগের প্রাচীনতম যে প্রাণি-মূর্তি পাওয়া গেছে, তা হল পাখি ও বাঘের। shansia Tai-yuan-fu র দক্ষিণাঞ্চল থেকে এটি সংগৃহীত বলে কথিত হয়েছে। এক অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্টকারে এর পাখা ও পালক বোঝানো হয়েছে; কপোতের মতো মাথাটি গোল, ঝুঁটি নেই, স্ফীত চোখ, এবং বেঁটে-খাটো-মোটা ঠোঁট। পেতলের বাসনপত্রে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে চড়ুই ও মুরগীকে দেখা যায়।

বাঘ ও পাখির এই প্রাধান্য এবং সংমিশ্রণের মধ্যে চীনীয় সংস্কৃতির এক অধ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অনেকেই মনে করেন, প্রথমে ব্যাঘ্র-সংস্কৃতির পর চীনে পক্ষি-সংস্কৃতি দেখা দিয়েছিল।

চীনের রাজকীয় পাত্রাদিতে মোট চার রকমের পাখি দেখা যায় : প্রথমত, বাঁকাঝুঁটি ও দীর্ঘ ল্যাজওলা পাখি; এগুলো হয় 'পবন দেবতা' নয় 'the feng huang' ('ফেং-হুয়াং' চীনে ফিনিক্স পাখিকে বলে; দুটি শব্দ আছে বলে অনেকে এটিকে pheasant বা কুকো এবং ময়ূরের মিলিত রূপ বলেও মনে করেন), 'ফেং-হুয়াং হওয়াই সম্ভব; দ্বিতীয়ত, শিকারী পাখি; তৃতীয়ত, বৃহৎ শিকারী পাখি, সম্ভবত ঈগল-সম্ভূত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের পাখির মধ্যে আছে, শ্যেন-বাজ-উৎক্রোশ ইত্যাদি। চতুর্থ ধরনের পাখির মধ্যে আছে—ঝুঁটিবিহীন পাখি,—হাঁস, ঘুঘু, মুরগী।

উপরোক্ত হাড় ও পেতলের পাত্রাদি ছাড়া চীনের বিশ্বখ্যাত মাটির পাত্রেও পক্ষিমূর্তি গৃহীত হয়েছিল। চীনের 'Black Pottery People'-দের কাছে ওইসব পক্ষিমূর্তি নিশ্চয়ই কোনো প্রতীক বা সংকেতরূপে ধরা দিয়েছিল, যার ফলে চীনেমাটির পাত্রে পাখি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীকে দেখা যায় নি।

প্রাচীন কাল থেকেই চীনে প্রাকৃতিক জগতের এক-একটি দিকের সংগে পাখি জড়িত। 'Bird-deities in China' (Switzerland, 1952) বইতে Florance Waterbury লিখেছেন : "The wind-deity is depicted on the oracle bons as a bird with a triangular cre*t. The crest, ..may not be a true crest, but a "sign of honour". The wind-deity does not resemble the birds on the bronzes. Besids the mountain and the wind, the birds were spirits of lake and rivers."

"There are few instances of bird-sacrifice shown on the oracle-bons...Bird-sacrifices became frequent in the Chow Dynasty, when there was an officer of cocks, who Presented red Cocks to be

sacrificed to the anestors, or at other Yin sacrifice...Turtle doves were offered in sacriffice to old officers of the court; and the eggs of certain birds were offered...In some rits a Cock-Vase and a bird-Vase,.. represented a feng-huang were used"—p·84.

বিভিন্ন পাত্রাদিতে এবং oracle bone-এর ওপর পাখির যে প্রতিমূর্তি খোদাই করা হয়, তাতে পার্থক্য আছে। 'Ritual Vessel'-গুলিতে পাখির প্রতিমূর্তি প্রতীকধর্মী, স্পষ্ট ও প্রকৃত পাখি সেখানে থাকে না; কিন্তু 'oracle bone'-এ যে পবনদেবতাকে পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণতই পাখি।

এখন আমার প্রশ্ন, 'oracle bone'-এর ওপর কেন পাখি রূপে 'পবনদেবতা' কেই ঠাঁই দেওয়া হয়েছে? আমার মনে হয়, যাদু-অনুষ্ঠানের মূল উপকরণ হাওয়া ও 'ফুঁক'কে গ্রহণ করবার জন্যেই 'পবন দেবতা'কে নেওয়া! পাখিব পালকের যাদুগুণের প্রসঙ্গেও আমি এই বাতাস ও 'ফুঁকে'র কথা বলেছিলাম। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখলে পালক ও হাড় একই ভাবকে তুলে ধরে।

ম্যাজিক বা যাদুর পেছনে একটি প্রতীকতা বোধ অবশ্যই থাকে। মুরগী যে উর্বরতার প্রতীক, সেটি যতক্ষণ বা যতদিন না জনমানসে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে, ততদিন উর্বরতাবৃদ্ধির অনুষ্ঠানে মুরগীর আগমন ঘটতে পাবে না; প্রতীকতাব আর একটি দিক: পরিপূর্ণ রূপে একটি পাখিকে না নিয়ে তার অংগ বা অংশবিশেষকেই সম্পূর্ণ পাখির প্রতীক রূপে গ্রহণ করা। ম্যাজিক এখানে আরো গভীর রহস্য হয়ে ওঠে। osteomancyর মধ্যে অংশকেই সম্পূর্ণ মনে কববার সেই দিক প্রতিবিম্বিত হয়।

এইবার পাখির হাড়েব সংগে যুক্ত যাদু-অনুষ্ঠানের দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই।

শহর জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে, জমিদার পাড়া নিবাসী এক প্রৌঢ় ওঝা, নাম কুথা হাজরা, তার কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। কুথা হাজরা জাতিতে হাড়ী, অনেক তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক তার জানা আছে। বশীকরণ ও মামলা-মোকদ্দমার জেতবার জন্যে সে একটি মাদুলি দিয়ে থাকে। মাদুলিতে থাকে এই সব পদার্থ: 'সাত ভাইয়া' পাখির প্রত্যেকের (অর্থাৎ সাতটিরই) বাঁ দিকের জঙ্ঘার হাড় একটি-একটি করে নিয়ে তা ছোটো করে কেটে নেওয়া হয়; 'জীব পংখীরাজ' নামে অপর একটি পাখির হাড়ও তাতে দিতে হয়। সঙ্গে থাকে নানান গাছ গাছড়া: 'ছুটফটি,' 'মনঝুরি,' 'মোনামুনি' (মণ্ডুকপর্ণী), 'হাইআমলা,' ইত্যাদি। এই মাদুলি ধারণ করলে ধারণকারী অপরকে বশীভূত করতে পারে, মামলা-মোকদ্দমায় নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করতে পারে।

'জীবপংখীরাজ' পাখির পরিচয় এই: এটি আকারে খুবই ছোটো, দেখতে অনেকটা বাদুড়ের মতো, রঙ কালো। জলপাইগুড়ি জেলার শালবাড়ি ফরেস্টে এ পাখি খুবই দেখা যায়। সেখান থেকেই ওঝারা এ পাখি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। পাখিটি হত্যা করে তা শুকিয়ে একটি হাঁড়ী বা কৌটোর মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। কোনো ঔষধপত্র প্রয়োগ না করলেও আপন মহিমাবলেই দীর্ঘদিন পাখিটি অবিকৃত

থাকে, পড়ে যায় না। এই পাখির হাড়ের আশ্চর্য গুণ আছে। যদি দুটি দণ্ড বা লাঠি দু হাতে নিয়ে তিনবার এ পাখি হাড়ে ছোঁয়ানো যায়, তবে আপনা থেকেই লাঠি দুটি জোড়া লেগে যায়।

উত্তরবঙ্গেই 'আতিচোরা' (<রাতিচোরা) পাখির হাড় জ্বর সারায় বলে বিশ্বাস আছে। এখানে এই হাড় স্পষ্টতই যাদুদণ্ডের রূপ নিয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে পাওয়া একটি 'চোরচুন্নী'র গানের একটি স্তবকে আছে, চোরনীর রাতে-রাতে জ্বর হয়, চোর তাই 'রাতচোবা' পাখির হাড় অন্বেষণে যাচ্ছে :

তোর গো চুন্নী আতিতু জ্বর
আর না করু তোর ঘর ;
উয়াক পোওয়া নাই যাবে—
কালি হাতে আতিচোরা বৈরাগী হোবে ॥

যেহেতু রাতে-রাতে জ্বর হয়, অতএব রাতে যে সজাগ ও কর্মঠ থাকে, সেই 'রাত চোরা' পাখিব হাড়ই জ্বর দূর করতে সমর্থ—এ বিশ্বাসের মধ্যে Homoeopathic Magic আছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে পাখির হাড় সম্পর্কে 'Sympathetic Magic'-এর একটি ভালো উদাহরণ দিয়েছি : যৌনক্ষমতাহীন ব্যক্তি যৌনক্ষমতা অর্জনের জন্যে সঙ্গমকালে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আহৃত চড়ুই পাখির হাড় মুখে পুরে রাখে। চড়ুইয়ের যৌনক্ষমতা সুবিদিত ; তার হাড় লিঙ্গ হয়ে ওই ব্যক্তির যৌনক্ষমতা বাড়াবে। 'কামসূত্রে' বলা হয়েছে, ময়ূরের হাড় সোনায় মুড়ে ডান হাতে বেঁধে রাখলে, দ্রষ্টা ধারণকারীর দ্বারা সম্মোহিত হবে ॥

পালক ও হাড় ছাড়া পাখির চোখও নানা ধরণের যাদুকর্মের অঙ্গীভূত হয়েছে।

পাখির চোখ, বিশেষত শিকারী পাখির চোখ, বিশেষ সতর্ক ও তীক্ষ্ন। কথাতেই বলা হয়, 'Bird's eye view'. সব পাখির চোখ সম্পর্কে যেমন সংস্কার-বিশ্বাস গড়ে ওঠে না, তেমনি যাদুকর্মেও সব পাখির চোখ গৃহীত হয় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই।

কাকের চোখ সম্পর্কে নানা সংস্কার-বিশ্বাস ও পুরাকথা গড়ে উঠেছে। গোটা ভারতেই বিশ্বাস আছে, সীতার স্তনকে কোনো একটি ফল মনে করে ঠুকরে দেবার অপরাধে রামচন্দ্র কাকের একটা চোখ কাণা করে দেন, আজও কাক একটা চোখেই দেখে, তবে, সেই চোখটা সে ডান-বাঁ দিকে ইচ্ছে মতো ঘুরিয়ে দিতে পারে। সাধারণ ভাবে কাকেরা (যেমন, দাঁড় কাক বা ডোমকাক বা জঙ্গলী কাক) মড়ার চোখ ঠুকরে খায়, এ শুধু বিশ্বাস নয়, বাস্তব সত্য। বোহেমিয়ার কৃষকেরা বিশ্বাস

করে, কাক St. Lawrence (মতান্তরে St. Carlo Borromeo)-এর চোখ ঠুকরে দিয়েছিল ; এই অপরাধে কাক বসন্তকাল থেকে St. Lawrence's Day (মতান্তরে St. Bartholomew's Day) পর্যন্ত বনে গিয়ে বাস করতে ভয় পায়। যেহেতু কাক মড়ার চোখ খায়, অতএব কাকের চোখ খেলে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পাবে, "an effect resembles its cause", Imitative Magic-এর এই সূত্রটি এখানে কার্যকরী হয়। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী ভূমিয়া বাইগা-রা কাকের মাংস খায়। ওদের বিশ্বাস, এতে বৃদ্ধ বয়সেও চোখের দৃষ্টি প্রখর থাকে। সরাসরি চোখ খেয়ে দৃষ্টিবান্ হবার প্রয়াসের মধ্যে একটি তবু কার্য-কারণের যোগসূত্র আছে ; কিন্তু ওয়েলস্-এ বিশ্বাস আছে, কাকের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হলেই অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। যাদু এখানে আরো বেশি। কতকগুলি কাজে দক্ষতার জন্যে তীক্ষ্ম দৃষ্টি চাই, যেমন গুলি করে লক্ষ্য ভেদের কাজে। দৃষ্টি শক্তি থেকে দৃষ্টির তীক্ষ্মতা এবং কাকের চোখ থেকে তার হৃৎপিণ্ডে বিশ্বাসটির পরিবর্তনের ফলে এই czecho-slovak বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে : তিনটে কাকের হৃৎপিণ্ড পুড়িয়ে তার ছাই খেলে খুব বড়ো লক্ষ্যভেদী হওয়া যায়।

ময়ূরের 'চোখ' নিয়েও নানা সংস্কার-বিশ্বাস ও পুরাকথা গড়ে উঠেছে, এবং সেই কারণে তা নানা যাদুরও উপকরণ হয়েছে। ময়ূরের 'চোখ' থেকে পড়া অশ্রু বা বীর্য পান করেই ময়ূরী গর্ভবতী হয়, ভারতের সর্বত্রই এ বিশ্বাস আছে। ময়ূরের পাখায় যে অক্ষিবৎ বিশেষ গোলাকার চিহ্ন আছে, তা ইন্দ্রের সহস্রলোচন, বা খাসিয়া মতে সূর্যের ; ইউরোপেও একে ময়ূরের 'eyes' বলা হয়। যেহেতু ময়ূর-পালকে অনেক 'চোখ' আছে, এই জন্যে গ্রীসে বিশ্বাস ছিল, ময়ূরের পালক পুড়িয়ে তার ধোঁয়া চোখে লাগালে চোখের অসুখ ভালো হয়ে যায়।

প্যাঁচার চোখ সম্পর্কে সারা পৃথিবীতেই নানা বিশ্বাস আছে। আসলে প্যাঁচার চোখে পাতা নেই, তাই সে চোখ ভয়ংকর দেখায়। চোখের সঙ্গে ঘুমের যোগ আছে। প্যাঁচা রাতে ঘুমোয় না, সে নিশাচর। মরক্কোতে তাই বিশ্বাস আছে, যারা ঘুমকাতুরে, তারা যদি প্যাঁচার চোখ ডান বাহুতে বা মাথায় বেঁধে রাখে, কিংবা তা সেদ্ধ করে খায়, অথবা তা গুঁড়ো করে চোখে লাগায়, তবে তা থেকে রোগী মুক্তি পায়।

বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিশ্বাস আছে : রুপো এবং রাং দিয়ে মাদুলি তৈরি করে, তার মধ্যে প্যাঁচার চোখ পুরে, সেই মাদুলি মুখে রাখলে, মাদুলি ধারককে কেউ দেখতে পায় না। এখানে যাদুর কারণটি এই : যেহেতু প্যাঁচা রাতের অন্ধকারেও দেখতে পায়, সেই হেতুই ধারক অদৃশ্য থাকবে।

ভারতীয় ওঝা ও তান্ত্রিকেরা নানা মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণে প্যাঁচার চোখ ব্যবহার করে থাকেন। এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ (আদি কামরত্ন বা বশীকরণতন্ত্র : নাগভট্ট বিরচিত : ভোলানাথ বিদ্যানিধি দ্বারা সংশোধিত : ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩৬) থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই :

উলূকচক্ষুরাদায় গোরোচন সমন্বিতং।
বারিণাসহ দাতব্যং পানাদ্বশ্যকরং পরং॥

"পেচকের চক্ষু আনিয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে"—পৃ. ১০০।

উলূকনেত্র মাংসঞ্চ চন্দনঞ্চৈব রোচনং।
কুঙ্কুমং মৎস্যতৈলঞ্চ দেহাভ্যাঙ্গদ্বশাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ওঁ হ্রীং হ্রীং প্লং প্লং ফট্ নমঃ॥

"পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্ত চন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম এবং মৎস্যতৈল, এই সকল একত্র করিয়া ওঁ হ্রীং হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্রে স্বীয় শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পাবে"—পৃ. ১০৬।

চড়ুই পাখির চোখের কথাও আছে,

উলূকস্য তু কর্ণৌ দ্বৌ চটকস্য বিলোচনং।
তচ্চূর্ণং তিলকে পানে ভক্ষণে গন্ধপুষ্পয়োঃ।
ক্ষিপেদ্বা মস্তকে যস্য স বশ্যো জায়তে চিরাৎ॥

"পেচকের দুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু, এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পাবে। আর এই চূর্ণ কোনো ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পের সহিত আঘ্রাণ করাইলে কিংবা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেই ব্যক্তি বশীভূতা হইয়া থাকে।"—পৃ. ১০০।

চোখের সঙ্গে ঘুম ও জাগরণের সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি। গ্রীকরা বিশ্বাস করত, নিশাচর পাখি নাইটিঙ্গেলের মাংস খেলে রাতে জেগে থাকা যায়। ওখ নেই বিশ্বাস ছিল খরগোসের চামড়ায় কোকিল মুড়ে তা কাছে রাখলে ঘুম আসে। মধ্যযুগে বিশ্বাস ছিল, প্যাঁচার পালক সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দিলে সে ব্যক্তির ভালো ঘুম হয়॥

পাখির দেহের অন্যান্য অংশ ও অঙ্গের সঙ্গে যাদুকর্মের যোগের কথা এইবার বলি।

উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষদের মধ্যে এখনও বিশ্বাস আছে, প্যাঁচার জিহ্বা দ্বারা প্রস্তুত উপচারে মানুষকে বশীভূত বা সম্মোহিত করা যায়। পণ্ডিত রামগরীর চৌবে জানাচ্ছেন (North Indian Notes and Queaies: August, 1894, p. 88): "Bring the tongue of the Owl on Sunday and two-and-a-half

leaves of the nim tree. Powder them together with water and then apply the powder like antimony to your eyes. Then look on any other man or woman you please and you will be able to bewitch them"

উত্তর ভারতেরই অযোধ্যা অঞ্চলের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, স্বামীকে প্যাঁচার মাংস খাওয়ালে বশীভূত করা যায়। আজিজুদ্দীন আহ্মেদ এ বিষয়ে সেখানে প্রচলিত একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন (North Indian Notes and Queries : May, 1894, p. 36) :

জরুনে উস্‌কী উস্‌কো হায় উল্লু খিলা দিয়া,
হায় উস্ গরীব মরদ্‌কো উল্লু.বনা দিয়া ॥

এখানে যাদুকর্মটির পশ্চাতে 'উল্লু' শব্দটির আঞ্চলিক অর্থই মূল ভূমিকা নিয়েছে। উত্তর ভারতে, মারাঠী ও তেলেগু ভাষাতে 'উল্লু' শব্দের অর্থ 'মূর্খ'। প্যাঁচাও 'উল্লু' রূপে উল্লিখিত হয়। এই শব্দ-সাদৃশ্যই এখানকার Homoeopathic Magic হয়েছে।

উত্তর ভারতে প্যাঁচার যাদুগুণ সম্পর্কে William Crooke তাঁর "(The) popular Religion and Folklore of Northern India (Vol. I, third reprint, 1968, p. 279) বইতে মন্তব্য করেছেন : "Owl's flesh is a powerful love philter and the eating of it causes a man to become a fool and to lose his memory ··; On the other hand, the owl is the type of wisdom, and eating the eyeballs of an owl gives the power of seeing in the dark, an excellent example of sympathetic magic. If you put an owl in a room, go in naked, shut the door and feed the bird with meal all night, you acquire magical powers...Here we have···instance of the nudity charm. In the same way in Gujrat, if a man takes seven cotton threads, goes to a place where an owl is hooting, stripes naked, ties a knot at each hoot, and fastens the thread round the right arm of a fever patient, the fever goes away."

যাদুকর্মের সঙ্গে প্যাঁচা এতই বেশি যুক্ত যে, উত্তর আমেরিকার Kiowa Indian-রা মনে করে, ওঝারা মরেই প্যাঁচা হয় এবং প্যাঁচারা মরে হয় ঝিঁঝিঁপোকা ; ঠিক যেমন, Buriat-দের প্রথম ওঝা একটি ঈগলের সন্তান বলে কল্পিত। প্যাঁচার এই যাদুধর্ম বেড়ে-বেড়ে এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, যাদুকর্মে জীবন্ত প্যাঁচার উপস্থিতির বদলে মৃত প্যাঁচাও যথেষ্ট বলে মনে করা হত : "Among the Chippewa, a stuffed owl is set up to "watch" and superintend the

pounding of medicine roots by the medicine men"—Standard dictionary of folklore, mythology and legend, P. 838.

কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকায় প্যাঁচা সংক্রান্ত যতো যাদুকর্ম থাকুক না, ভারতের মতো তা এতোখানি বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা অর্জন করতে পারে নি। ভারতের 'মারণ' 'উচ্চাটন', 'বিদ্বেষণ' ও 'বশীকরণে'র ক্ষেত্রে প্যাঁচা এক অপরিহার্য উপকরণ। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে প্যাঁচার চোখের ভূমিকার কথা এ প্রসঙ্গে বলেছি। এবার প্যাঁচার দেহের অন্যান্য অঙ্গের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিই, দৃষ্টান্ত নিচ্ছি পূর্বোক্ত 'আদি কামরত্ন' গ্রন্থটি থেকেই।

ভরণ্যামঙ্গুলৈকন্তু উলূকস্যাস্থিকীলকং।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ॥
মন্ত্রস্তু। ওঁ দহ দহ হল হল স্বাহা।

"এক অঙ্গুলি প্রমাণ পেচকের হাড় ভরণী নক্ষত্রে লইয়া উক্ত মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত পূর্বক যাহার গৃহে পুঁতিয়া রাখা যায়, তাহারই উচ্চাটন হইয়া থাকে।"—পৃ. ৬২।

কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু হুত্বা অষ্টাধিকং শতম্।
যন্নাম্না মন্ত্র যোগেন সমস্তোচ্চাটনং ভবেৎ।
মন্ত্রস্তু। ও নমো ভগবতে রুদ্রায় হুং দ্রংষ্টাকরালায়
অমুকং সপুত্রবান্ধবৈসহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং
উচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ।

"বায়স ও পেচক পক্ষ দ্বারা উপরোক্ত মন্ত্রযোগে অষ্টোত্তর শতবার যাহার নামে হোম করা যায়, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে।"—পৃ. ৬৩.

এবার 'বিদ্বেষণ' বিধির উদাহরণ দিচ্ছি।

একহস্তে কাকপক্ষমূলূকস্য তথা পরে।
মন্ত্রয়িত্বা মিলিত্বাগ্রং কৃষ্ণসূত্রেণ বন্ধয়েৎ॥
অঞ্জলিঞ্চ জলে চৈব তর্পয়েদ্ধস্ত পক্ষ কৈঃ।
এবং সপ্তদিনং কুর্যাদষ্টোত্তরশতং জপেৎ॥
বিদ্বেষো জায়তে তত্র মহাকৌতুকমদ্ভুতম্॥

"এক করে বায়সের পক্ষ এবং অন্য হস্তে পেচকের পক্ষ গ্রহণ পূর্বক মহাভৈরবমন্ত্র পাঠ করতঃ ঐ দুই পক্ষের অগ্রদেশ একত্র করিয়া কৃষ্ণসূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। তৎপরে যাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের নাম পাঠ করতঃ ঐ পক্ষদ্বয় করে লইয়া সলিল দ্বারা তর্পণ করিতে হয়। সাতদিন এই প্রকার করিয়া মহাভৈরব মন্ত্র একশত আটবার জপ করিলে সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে মহাবিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" —পৃ. ৬৪।

কাক ও পেচক এখানে সুন্দর Composite symbol রচনা করেছে। উদ্দিষ্ট

দুই ব্যক্তির প্রতীক এখানে কাক ও পেচক ; 'কৃষ্ণসূত্রে'র কালো রঙ অকল্যাণকে নির্দেশ করছে।

একহস্তে কাকপক্ষমুলুকস্য তথা পরে।
দর্ভেণ ধারয়েদযত্নাৎ ত্রিসপ্তাহ জলাঞ্জলিম্।
রক্তাশ্বমারপুষ্পেক মন্ত্রযুক্তং জলাঞ্জলিম্।
নিত্য নিত্য প্রদাতব্যষ্টোত্তরসহস্রকম্।
পরস্পরং ভবেদ্দ্বেষং সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ।

ওঁ নমঃ কটিটনী প্রমোটনীকী গৌরী গৌরী অমুকস্য অমুকেন সহ কাকোলুকাদিবৎ কুরু কুরু স্বাহা।

"এক করে বায়সের পক্ষ, অন্য হস্তে পেচকের পক্ষ সযত্নে দর্ভসহ লইয়া, যাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ এক-একটি রক্তকরবী ফুলের সহিত অষ্টোত্তর সহস্রবার জলাঞ্জলি দিবে। এই প্রকার প্রতিদিন করিলে তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মে, সন্দেহ নাই।"—পৃ. ৬১-৬৫।

এখানে লক্ষ করবার বিষয় এইগুলি: কাক ও পেচকের চিরকালীন দ্বন্দ্বকে এখানে অনুকরণ ও প্রতিফলিত করা হয়েছে দুই ব্যক্তির মধ্যে, স্পষ্টই Imitative magic. ; দর্ভতৃণ ও রক্তকরবী ফুলের যাদুধর্ম ; অষ্টোত্তর সহস্রবার—এই সংখ্যার মধ্যে যাদুধর্ম ; এবং 'জলাঞ্জলি' ; তরল পদার্থ (যেমন, তেল, ঘি, রক্ত, জল) যাদুকর্মের একটি প্রধান উপকরণ।

'বশীকরণে'র আচার-অনুষ্ঠান এই প্রকার ঃ

মাংসং গ্রাহ্যমুলুকস্য কুঙ্কুমাগুরুচন্দনং।
গোরোচনং সমং পিষ্টং ভক্ষে পানে জগদ্বশং।
স্ত্রিয়ো বা পুরুষোবাপি সহস্রজপনাদ্ভবেৎ ॥
ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রঃ হ্রেঃ ফট্ নমঃ ॥

"পেচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্তচন্দন ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ ও পানে প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। ওঁ হ্রীং হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া এই কার্য করিবে, ইহাতে স্ত্রী কিংবা পুরুষ সকলেই বশীভূত হইয়া থাকে।"—পৃ. ১০০.

শেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' (চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) নাটকে ডাকিনীরা যে যাদুকরী পদার্থ তৈরি করেছিল, তাতে অন্যান্য বস্তুসহ ছিল, 'howlet's wing' অর্থাৎ পেচক-শাবকের পাখা।

পেচক ছাড়া অন্যান্য পাখিরও নাম মেলে। যেমন, 'মারণ বিধি'র মধ্যে কুক্কুট ও কাক :

কৃষ্ণচ্ছাগাশ্বপাদাস্য খুরস্থং রোমকঃ হরেৎ।
কৃষ্ণ কুক্কুটকাকস্য গ্রাহ্যং পক্ষচতুষ্টম্ ॥

সর্ব্বং দগ্ধা তু ভাণ্ডাস্তস্তদ্ভস্ম জল সংযুতম্ ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা বামহস্তকনিষ্ঠয়া ।
যৎশিরো নম্যতে তস্য বেধো ভবতি নিশ্চিতং ॥

কৃষ্ণবর্ণের অজ ও অশ্বের খুরস্থিত লোম এবং কৃষ্ণ কুক্কুট ও কাকের চারখানি পক্ষ, এই সকল দ্রব্য একত্র ভস্ম করিয়া সেই ভস্মে জল মিশাইয়া বাম করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ললাটে তিলক করতঃ নতমস্তক হইয়া যাহাকে প্রণাম করিবে, সেই ব্যক্তিই বিদ্ধ হইবে।"—পৃ. ৭০।

'বশীকরণে'র বিধিতে আছে,

বটপত্রং ময়ূর শিখয়া তুলং তিলকং লোকবশ্যকৃত।...

"বটপত্র ও ময়ূর-শিখা সমপরিমাণে লইয়া তিলক করিলে সর্বলোক বশীভূত হয়।...পৃ. ৯৯।

কলবিঙ্গশির স্তল্যং শ্বেতার্কস্য চ মূলকং।
মঞ্জিষ্ঠা খদিরং পানে দত্তে কান্তাং বশং নয়েৎ ॥

"চটক পক্ষীর মস্তক, শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা, ও খদির—এই সকল যাহাকে পান করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হয়।' পৃ. ১০২.

লেপয়েৎ কাকপিত্তেন কীলমঙ্গুল সম্ভবম্।
নিখনেদ্যস্য ভবনে তস্যোচ্চাটনং ভবেৎ ॥

মন্ত্রস্তু। ওঁ হ্রীং দণ্ডিন্ দণ্ডিন্ মহাদণ্ডিন্ নমোহস্তুতে ঠঃ ঠঃ।

এক অঙ্গুলি প্রমাণ একটি কীলকে বায়সের পিত্ত লেপিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার আলয়ে পুঁতিয়া রাখা যায়, তাহার উচ্চাটন হয়।—পৃ. ৬৩।

এ সবের মধ্যে যে জিনিসটা লক্ষ করতে বলি, তা হলো, প্রস্তুতের প্রক্রিয়াটি; দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে বিবিধ প্রাণী, ও গাছগাছড়ার সংমিশ্রণ।

পাখির সঙ্গে কুহকবিদ্যায় যোগ দু' ভাবে লক্ষ করা যায়: এক, একটি কাল্পনিক যোগ; দুই, বাস্তবিক যোগ। কাল্পনিক দিকটি বাস্তবিকটিরই পরবর্তী ও প্রসারিত দিক। কুহকবিদ্যার এই কাল্পনিক ও বাস্তবিক উভয় দিকই লৈখিক ও মৌখিক সাহিত্যে এবং দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠানে লক্ষ করা যায়। 'কাল্পনিক' দিক কোন্‌টাকে বলি? যেমন, শেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথে', বিভিন্ন রূপকথায়, অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে। মৈমনসিংহ গীতিকায় কমলা' পালায় চিকন-গোয়ালিনীর কুহককর্ম:

আর একটা ঔষধ শুনি আছে তার কাছে।
গিরধনীর কানে আর কাল-পনা মাছে ॥
কিছু কিছু পেঁচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
তিল পরিমাণ বড়ি করে রৌদ্রে শুকাইয়া ॥

এক এক বড়ির দাম পাঁচ খুরি কড়ি।
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী ।।

প্রায় এই রকমেরই আর একটি উদাহরণ পাই ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক-সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (৩য় খণ্ড, ১৯৭১)-র অন্তভুক্ত "ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী"র পালাতে,

কাণা মশা, ভালা মাছি, বাঘ-ভাল্লুকের আঁখি।
কাঁকড়ার ঠ্যাং, ইঁচার খড়া আর কাউয়া পাখি ।।
শনিবারে পেঁচার হাড্ডি, শেজা-মেজার কাঁটা।
শিরগালের জিহবা, সাপের ফণা, সরা গাছের আঠা ।।
শকুনার পিত্ত আর কালা বিলাইর হাড়।...

এই মন্ত্রোপকরণের তালিকা ও বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার ফলে মিশ্রণজাত বটিকার কথা হয়তো বা এখানে কাল্পনিক; কিন্তু সবটাই কাল্পনিক নয়, অন্তত এই ধরণের যাদুকর্ম ও তাতে বিশ্বাসটা যে বাস্তব, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বৈদ্য-ওঝারা এখনও এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন, এবং অনেক মানুষ তা বিশ্বাসও করে। এ সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে একটি শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল, বিভিন্ন তান্ত্রিক পুঁথি ও লৌকিক আচার-বিশ্বাসে তারই রেশটুকু রয়ে গেছে। এই সব মন্ত্রৌষধের উপকরণ রূপে সবচেয়ে বেশি মেলে পঁ্যাচা, শকুন ও কাককে।

'পূর্বঙ্গগীতিকা' (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬)-র অন্তর্ভুক্ত 'ভেলুয়া' পালাতে Homoeopathie Magic-এর একটি ভালো উদাহরণ পেয়েছি। ভেলুয়া নিজের পিঞ্জরের শারীর সঙ্গে শুকের মিলন ঘটিয়ে নিজের সঙ্গে সাধুর পুত্রের মিলনকে প্রত্যক্ষ করেছে ।।

নানা ধরনের রোগের উপশম করবার জন্যে এবং অন্যান্য নানা ঘটনা ঘটাবার জন্যে বিভিন্ন পাখির দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশ সেবন ও প্রয়োগ বরবার বিধি আছে। এর মধ্যে সর্বত্রই কিছু যাদু নেই। যেখানে কার্য-কারণের একটি যুক্তিসিদ্ধ সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কার করা যায়, সেখানে পক্ষিদেহ একটি ঔষধ মাত্র, তাতে কোনোই যাদু নেই। কিন্তু যেখানে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কার্য-কারণের যোগ লক্ষ করা যায় না, সেখানে তা অবশ্যই যাদু।

উদাহরণ প্রয়োগ করে এই পার্থক্যটি পরিস্ফুট করবার চেস্টা করছি। চড়ুই পাখি সঘন যৌনলীলায় প্রবৃত্ত হয় এবং এর যৌনত্তেজনাও বেশি,—এই বিশ্বাসের ফলে মরোক্কোতে যৌনক্ষমতা উদ্ধারের এবং কামোদ্দীপনের জন্যে চড়ুই পাখি খাওয়া হয় (Ritual and Belief : London : Macmillan and co., ltd, 1926 · vol II. P. 341 : Edward Westmarack)। ভারতে 'বাগৌড়ি' পাখি খাবার কথাও শোনা যায়। Andjra-তে আট-দশটি চড়ুই পাখি পুড়িয়ে গুঁড়ো করা হয়; তার পর স্ত্রবেরির মধু দিয়ে তা মেড়ে নেওয়া হয়। ৪০-টি ছোটো-ছোটো কাগজের টুকরো এতে মেশানো হয়। পর-পর ৪০ দিন সকালে খালিপেটে তা খেলে চড়ুই পাখির মতো যৌনক্ষমতা অর্জন করা যায়।

এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে পাখি খাওয়ার ফল হিসেবে দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হতেই পারে, কাজেই এ যতো না ম্যাজিক তার চেয়ে বেশি ঔষধ। একটি কার্য-কারণের যোগ ও যুক্তি এর পেছনে আছে; কিন্তু তথাপি এটি ম্যাজিক দুটি কারণে: প্রথমত, চড়ুইয়ের অনুরূপ যৌনক্ষমতা অর্জনের জন্যে কেবল চড়ুই পাখিই খাওয়া (অন্য কোন পাখি নয়), তার মধ্যে স্পষ্ট Imitative Magic রয়েছে; দ্বিতীয়ত, 'চল্লিশ' এই সংখ্যাটির রহস্যময়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ। আরবদের কাছে এবং ইসলামধর্মে 'চল্লিশ' সংখ্যাটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই দুটি দিক না থাকলে, এটি ম্যাজিক না হয়ে মেডিসিন হয়ে উঠত।

এই ধরনের আরো দু-একটি উদাহরণ বিচার করি। যেমন 'Zooiogical Mythology' (Vol. II. Londen : 1872) বইতে Angelo de Gubernatis জানিয়েছেন, "According to pliny, ..the head of a swallow that fed in the morning, was, when cut off at full moon and tied in linen and hung up, an excellent remedy for headache."—P. 241.

এখানে ম্যাজিকটি হল: পূর্ণিমার দিন আবাবিল কেটে তা ঝুলিয়ে দিলেই মাথাব্যথা সারাতে, রোগীর দেহের সঙ্গে সংযোগ ঘটছেই না; মনে হয়, পূর্বে হয় আবাবিলের বদলে অন্য কোনো পাখি কাটা হতো; নয়ত, আবাবিলকে রোগীর দেহ-সংস্পর্শে আনা বা প্রয়োগ করা হতো। কালক্রমে কেবল প্রতীকরূপে একটি আচার পালন করা: তা কেটে ঝুলিয়ে দেওয়া, স্পষ্টই একটি কালগত পরিবর্তন এতে লক্ষ করতে পারছি। আমার মতে, এই দৈহিক সংযোগশূন্যতাই এখানকার বড়ো ম্যাজিক; সংযোগ থাকলেই এটি ম্যাজিক হতো না।

অপর উদাহরণটিও Gubernatis থেকেই নিচ্ছি। "In the Monferrato it is believed that a black hen split open alive in the middle, and placed where one feels the pain of the mal di punta, will take away the disease and the pain, on condition that when this strange plaster is taken off, the feathers be burned in the house"—P, 289.

জীবন্ত কালো মুরগী চিরে রোগস্থানে প্রয়োগ স্বভাবতই একটি জৈব প্রভাব বিস্তার করে রোগটিকে দূর করতে সক্ষম—কাজেই তা ঔষধই বটে; কিন্তু ম্যাজিকটা হলো অন্যত্র : তা সরিয়ে নেবার সময় মুরগির পাখাটিও পুড়িয়ে ফেলাতে। অর্থাৎ রোগস্থান থেকে আপন প্রাণের বিনিময়ে কালো মুরগীটি যে রোগকে আকর্ষণ করে এনেছিল, তাকে আক্ষরিক ভাবেই ভস্মীভূত করে ফেলা হল। রোগ এখানে দেহের সংলগ্ন, অচেতন একটি অবস্থা নয়; বরং দেহে থেকে বিচ্ছেদ্য, সচেতন একটি প্রাণময় সত্তা, এবং তা হত্যা-যোগ্য, এই বিশ্বাসটুকু আছে বলেই এটি ম্যাজিক হল।

এই প্রসঙ্গে একটি চীনীয় প্রথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। চীনে মোরগের মাংস খাওয়া সাধারণ ভাবে ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হয়। নানা ধরণের মন্ত্র ও শপথ গ্রহণের কালে এবং বলি প্রভৃতিতে মোরগ অপরিহার্য বলেই সম্ভবত মোরগ খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। C. A. S. Williams তাঁর 'Encyclopedia of Chiness symbolism and art motives' (New york, 1960) বইতে জানিয়েছেন, "Blackboned fowles are called yao chi and much prized for making soup for persons suffering from consumption and general debility." —P. 197. এখানে ম্যাজিকটি হলো মুরগীর ওই কালো রঙের হাড়ের বিশেষত্বে, অনত্র নয়। তারপর: "Preparations of the male bird are prescribed for the female patients and vice versa" P. 197. এখানে ম্যাজিক বিপরীত লিঙ্গের ব্যবহারের মধ্যে।

ঘুঘুর ডান দিকের পাখার রক্ত নেত্রদাহ (sore eyes) কমায় বলে ইউরোপ-আমেরিকার কোথাও-কোথাও বিশ্বাস আছে; এখানেও আমার একই বক্তব্য : ওই 'ডান' দিকের (বাঁ দিক নয়) পাখাটির উল্লেখের ফলেই এটি ম্যাজিক, নয়তো মেডিসিন। মরক্কোতে যক্ষ্মা রোগের ঔষধ রূপে মুরগী ব্যবহৃত হয়, এ তথ্য মোটেই ম্যাজিক নয়। কিন্তু হাওড়া জেলার লোকেরা বলে, মুরগী প্রতিদিন এই বলে ডাকে : "যক্ষ্মাকাশ হোক"; তখন এই বৈপরীত্যই মুরগীর সঙ্গে যক্ষ্মা রোগের এক যাদুময় সম্পর্ক স্থাপন করে।

ওপরে আমার বিশ্লেষণ থেকে একথা নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হয়েছে, পাখির অঙ্গ-বিশেষ সেবন বা প্রয়োগ করলেই তা ম্যাজিক হয়ে ওঠে না। আবার, সর্বত্রই যে ফ্রেজার-কথিত Sympathetic Magic-এর বিভিন্ন দিকগুলি এতে থাকবে, তারও কোনো মানে নেই। ওপরে প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে, প্রথম উদাহরণটি ছাড়া অন্য কোথাও Sympathetic Magic-এর কোনো দিকের অস্তিত্ব নেই। অথচ, সব ক'টিতেই যে ম্যাজিক আছে, তা সম্ভবত স্বয়ং ফ্রেজারও অস্বীকার করবেন না।

এই জন্যেই, পাশ্চাত্য নৃতাত্ত্বিকেরা যে 'Animal curer'-এর কথা বলেছেন, আমার মতে তা সংশোধন করা দরকার। যেখানে, পশু-পাখির দেহ ও অঙ্গ প্রয়োগ

ও সেবন একটি কার্য-কারণের মধ্য দিয়ে রোগের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়, সেখানে তা ম্যাজিক নয়, মেডিসিন মাত্র। এই জন্যেই, আমার মতে 'মেডিসিন' হিসেবে যে উদাহরণগুলি, সেগুলিকে এই অধ্যায়ে স্থান দিই নি। Animal curer-এর ম্যাজিক ও মেডিসিন—এই দুটি দিক আছে,—এ কথা বলা দরকার।

এ কেবল দৈহিক রোগ সম্পর্কে। কিন্তু মানসিক ব্যাপারে, বশীকরণে, মারণ ও উচ্চাটন এবং বিদ্বেষণে, প্রেম ও সমধর্মী বিষয়ে পাখির প্রয়োগ মাত্রই ম্যাজিক॥

Animal curer-এর কতখানি ম্যাজিক, এবার তার দৃষ্টান্ত দেব। মানসিক ব্যাপারের মধ্যেও পাখি কোথায় যাদুধর্মী, প্রসঙ্গত তারও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

ঋগ্বেদে সূর্যের স্তবে প্রার্থনা করা হয়েছে (১. ৫০. ১২) যে, আমাদের হরিমান রোগ (পাণ্ডুরোগ) শুক ও শারিতে সংক্রামিত হয়।

বটের পাখি সম্পর্কে ইউরোপে এক পৌরাণিক সংস্কার আছে : এ পাখি সূর্য ও উত্তাপকে ভালোবাসে, চন্দ্র ও শৈত্যকে তেমনি ভয় পায় ও অপছন্দ করে। এরই ফলে প্রাচীনকালে একটি বিশ্বাসের জন্ম হয় : রাতের বেলায় বটের পাখি 'Hellebore' (গোলাপ জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ ; এক সময়ে এটি উন্মাদ রোগের ঔষধ বলে বিবেচিত হত) নামে বিষাক্ত গাছ খায়। যেহেতু বটের ওই গাছ খায়, অতএব বটের পাখি থেকে মৃগীরোগ ছড়ায় বলে বিশ্বাস আছে। মৃগীরোগীর ব্যবহার উন্মাদের মতো ; দ্বিতীয়ত, পাগলকে 'Lunatic' বলবার পেছনে একটি চান্দ্র (Lunar) ব্যাপার আছে। শুধু Hellebore গাছই নয়, চন্দ্রভীত বলেও বটের পাখির সঙ্গে মৃগীরোগ যুক্ত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে রোগ ঘটানোর সঙ্গে পাখির যোগ দেখা গেল।

কাঁদতে কাঁদতে মূর্চ্ছা যাওয়া অনেক শিশুর এক রোগ। কাক স্নান করেছে, এমন জল এনে সেই শিশুর গায়ে ছিটিয়ে দিলেই সে রোগমুক্ত হয় বলে হাওড়ার কোনো-কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস আছে।

ময়ূরের পাখায় রোগহরণের যাদু-ক্ষমতা আছে, তাই উত্তর ভারতে বেড়ালের হাড়, গাছের শেকড় আর ময়ূরের পাখা রোগীর গোড়ালিতে বেঁধে দেওয়া হয়—বাত, জ্বর ও ক্ষত-রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে (**Charming ligatures for snake-bite : Journal of the Anthropological Society of Bombay : Vol. X, No. 7, PP. 593-614**)।

নেত্রদাহ হলে ময়ূরের পালক মণিবন্ধে বেঁধে রাখা হয় (**North Indian Notes**

and Queries : February, 1895, P. 197)। অনেক সময় রোগের উপশমের জন্যে ময়ূরের পালক গোছা করে বেঁধে নিয়ে রোগীর সারা দেহে বুলিয়ে দেওয়া হয়, সর্ব দেহে পরিব্যাপ্ত রোগকে ময়ূর যেন রোগের বিষ আকর্ষণ করে নেয়। উত্তর বঙ্গের রাজবংশী ওঝারা জীবন্ত পারাবতের দুই পাখা জোড়া করে রোগীর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দেয়—এই একই উদ্দেশ্যে।

শ্যেন-বাজের ল্যাজের পালকের যাদু-ধর্মী ক্ষমতা আছে বলে চীন দেশে শিশুদের বসন্ত (Small Pox) হলে সে পালক গলায় বুলিয়ে দেয়।

স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মৃগীরোগ সারাবার একটি পদ্ধতি এই ছিল : রোগী যেখানে পড়ে গেছে ঠিক সেই জায়গাতেই একটি জীবন্ত কালো মুরগী পুঁতে দেওয়া। সঙ্গে রোগীর নখ ও এক গোছা চুলও দিতে হবে। এটি হল 'transference of evil' ; ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতকে এই রীতি চলিত ছিল। রোগীর দেহ থেকে দুষ্ট গ্রহকে পৃথক করে তাকে যেন সমাধিস্থ করে রাখা হল। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকাতেও এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে দেখা যায় —গ্রামে মহামারী লাগলে, সেই মহামারীর দুষ্টদেবতাকে একটি মুরগীতে রূপান্তরিত করে গ্রাম থেকে মুরগীটিকে দূর করে দেওয়া হয়। East Indian Island-এর Timor-land-বাসীরা রোগীর দেহে জীবন্ত মুরগীর পালক বুলিয়ে শেষে একটি জাহাজে করে সেটিকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় ; যেন রোগ নিয়ে সে মুরগী দূর সমুদ্রে চলে গেল। অনেকে মনে করেন, যেহেতু অ্যাপোলোর কাছে মুরগী বলি দেওয়া হত এবং অ্যাপোলোর রোগহরণের ক্ষমতা ছিল বলে বিশ্বাস করা হত, এ কারণেই এ সব ক্ষেত্রে মুরগী ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ উক্তি সহনীয় নয় দুটি কারণে : প্রথমত, অ্যাপোলো-সংস্কৃতির প্রভাব যে সব দেশে নেই, সেখানেও এ প্রথা চলিত আছে ; দ্বিতীয়ত, মুরগী ব্যতীত অন্যান্য পাখিকেও (যেমন, আগের দৃষ্টান্ত-গুলিতে ময়ূর ও পারাবত) পাওয়া যায়।

উগাণ্ডাতে কেউ বজ্রাহত বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে প্রবহমান স্রোতের কাছে মুরগী বলি দেওয়া হয়, রোগী তখন সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। ওই প্রবল স্রোতের বেগ বিদ্যুতের প্রতীক।

রামগরীব চৌবে গোরখপুর জেলায় প্রচলিত চিল সম্পর্কে কয়েকটি সংস্কারের কথা জানিয়েছেন (North Indian Notes and Queries : May 1894, P. 35)। এই চিল সাধারণ গোদা চিল বা ডোমচিল বলে মনে হয় না, কারণ এর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনা-প্রসঙ্গে এ চিলকে 'কালীচিল' (কালোচিল ?) বলা হয়েছে। এ কোন্ চিল ? এর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "We again find fowlers trade on the superstitious piety of the Hindus and Mahammadans which purchases for a pice the liberty of a kite caught for the express purpose of being whirled round

the head of a child on a Tuesday or Saturday and then let go. One not unoften hears the street cry of fowlers—"Kali chil Mongal Ka' ro'z," Black kite, today is Tuesday."

শনি ও মঙ্গলবারের বিশেষ যাদু-ক্ষমতা সারা ভারতেই স্বীকৃত হয়। বন্দী চিলকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে আপন সন্তানের মঙ্গল কামনায় তার মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে পুনরায় উড়িয়ে দেওয়ার পশ্চাতে ক'টি যাদু-বিশ্বাস কাজ করেছে, স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু গোরখপুরেই বিশ্বাস আছে: শিশুদের মাথা ন্যাড়া করবার পর কখনোই তা অনাবৃত রাখতে নেই; অনাবৃত মাথার ওপর দিয়ে চিল উড়ে গেলে মাথায় দাদ হয়। পয়সা দিয়ে সেই চিল কিনেই যখন শিশুদের মাথার চতুর্দিকে ঘোরানো হয়, তখন তাতে অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়ে: প্রথমত, দুই ভিন্ন রকমের চিলের কথা বলা হয়েছে কিনা; বন্দী চিলকে মুক্তি দেবার কথা লক্ষণীয়। মনে হয়, চণ্ডীচিল, শঙ্খচিল, গরুড়, ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের সশ্রদ্ধ মনোভাব এই চিলে সঞ্চারিত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, "দোষ দিয়েই দোষ খণ্ডন" করবার যাদু-প্রক্রিয়া এখানে থাকতে পারে।

এবার অন্য ধরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয়ত্রই কাকের বিজ্ঞতা ও দীর্ঘদর্শিতার কথা বিশ্বাস করা হয়; এই জন্যেই প্রাচীন কালে ইউরোপে বিশ্বাস ছিল, কাকের দেহের সার বা শ্রেষ্ঠ অংশ খেয়ে খাদক কাকের মতোই বিজ্ঞ হতে পারে। মুরগী শক্তি, সাহস ও শৌর্যের প্রতীক; এইজন্যে স্কটল্যাণ্ডে বিশ্বাস করা হয়, মুরগীর পেটে যে পাথর হয়, তা খেলে বীরত্ব অর্জন করা যায়। Missori Neg.ওরা প্রেমিক-প্রেমিকার মনে প্রেম উদ্দীপনের জন্যে ঘুঘুর হৃদপিণ্ড কাঁচাই গিলে খায়, যেহেতু ঘুঘু প্রেমের প্রতীক। Mike Tomkies নামে এক লেখক তাঁর একটি প্রবন্ধে (The Weird and Wonderful Heron : The Reader's Digest : June, 1974. PP. 105—112) লিখেছেন, "Such is the heron's lightning skill as a fisherman that for centuries evious anglers have rubbed heron's fat on their bait, maintaining that in some magical way it must attract fish. In fact, the secret of the heron's success is timeless patience, waiting for pray to come within range." যুক্তরাজ্যের চেশায়রে বিশ্বাস আছে, কেউ যদি পাঁ্যাচার নীড়ের ভেতরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে তারপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে বিষাদ-গ্রস্ত ও ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। তার কারণ, প্যাঁচা গম্ভীর ও বিষণ্ণ প্রকৃতির জন্যে কুখ্যাত। ইউরোপের ভোজসভায় ময়ূর পরিবেশন করা হত শুধু এই বিশ্বাসেই যে, ময়ূর যখন দেখতে সুন্দর, খেতেও নিশ্চয়ই সুস্বাদু হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার Basuto শিশুরা গলায় চিলের পা ঝুলিয়ে রাখে; চিল যেমন দ্রুত ও ক্ষিপ্রগতিতে উড়ে চলে, এই সব বালকেরাও যেন সকল প্রকার বিপদ থেকে ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে আসতে পারে।

ঈগলের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও শৌর্য-সাহস আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে Tryol-এর শিকারীরা ঈগলের পাখা গোছা করে দেহে পরিধান করে।

পাণ্ডুরোগ (অর্থাৎ ন্যাবা, কামলা রোগ, Jaundice) -এর উপশম সম্পর্কে ঃ "The Greeks...believed the a sight of the yellow hammer cured Jaundice. (The Indian Antiquary ঃ December 1900 ঃ P. 384 ঃ Spirit basis of belief and custom ঃ J. M. Campbell.) । Yellow-hammer পাখির হরিদ্রাভ মাথায় যেন পাণ্ডুরোগীর পাণ্ডু বর্ণ চলে যায়। রোগী ও পাখির রঙের সাদৃশ্যই এখানে যাদুর ভিত্তি। "The Crow-water society of the northern plains Black foot was a ceremonial organization for men and women, membership in which enabled persons to become wealthy and to cure the sick"—Standard dictionay of folklore, my thology and legend P. 266. এখানে কাকের গুণধর্ম ওই নামীয় সমিতির সভ্যবৃন্দে সঞ্চারিত হওয়ায় তারাও কাকের সদৃশ হয়ে ওঠার বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

এই সব দৃষ্টান্তই Homoeopathic বা Imitative Magic-এর দৃষ্টান্ত। একটি স্পষ্ট ও সহজগ্রাহ্য কারণ ও উদ্দেশ্য এদের পেছনে আছে। সাদৃশ্য ও অনুকরণ হল সেই কারণ ও উদ্দেশ্য। কিন্তু আর এক ধরণের ম্যাজিক দেখি, যার উদ্দেশ্য থাকলেও কোন্ কারণের ভিত্তিতে তা গৃহীত, সেটি বোঝবার সহজ উপায় নেই। সহজ উপায় নেই বলেই আমার মতে এখানে যাদুর রহস্যময়তা ওপরের দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় অধিক। যেমন, ঘুঘুর রক্তের মধ্যে এক বিশেষ যাদুশক্তিকে অনুভব করবার জন্যে প্রাচীন কালের শিকারীরা তাদের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের উদ্দেশ্যে বুলেটে ঘুঘুর রক্ত মাখিয়ে নিত। কেন তা করা হত, তার কারণ, একদা বোধগম্য হলেও আজ আর বোধগম্য নয়। ঠিক, তেমনি মাথা ব্যথা এবং বিশেষত মাথা খারাপ হলে ঘুঘুর পেট চিরে রোগীর মাথার ওপর বা তার পাশে রাখা কেন হয়, তাও বোঝা যায় না। হয়তো পাখিটিকে খৃষ্টান সংস্কৃতিতে পবিত্র বলে এই সব প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে এখানে ম্যাজিক হিসেবে এর গুরুত্ব বেড়েছে বই কমেনি।

এই ভাবেই, হামিংবার্ডকে কেন 'love charm' রূপে ব্যবহার করা হয়, তাও বুঝতে পারা যায় না। একটা ছোটো থলিতে একটি মরা হামিংবার্ড পুরে নিয়ে গলায় তা ঝুলিয়ে রাখা হয়, বিপরীত লিঙ্গের দ্রষ্টা ধারণকারীর প্রেমে পড়বে তাহলে; অথবা অভীষ্ট নর বা নারীর প্রেম অর্জন করতে হলে হামিংবার্ড শুকিয়ে গুঁড়ো করে তরল পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে তা দিতে হবে।

এসব ক্ষেত্রে Sympathetic Magic-এর কোনো বিশেষ দিক নেই, এখানে কেবল ম্যাজিক, ম্যাজিকের জন্যই ম্যাজিক, পাখির মধ্যে সেই যাদুশক্তিকে অনুভব করবার জন্যেই ম্যাজিক। এই মানসিক কারণের জন্যেই এমন বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, পাখি যাদুধর্মী অন্যান্য কাজও করতে পারে। যেমন হুপো সম্পর্কে। 'Springwort'

নামে এক বিশেষ ধরণের যাদুশক্তি সম্পন্ন লতাবৃক্ষ (যা ছোঁয়ালে যে কোনো বন্ধ জিনিস, যেমন, তালা-চাবি, গ্রন্থি ইত্যাদি খুলে যায়) হুপো নিয়ে আসে বলে Swabian-রা বিশ্বাস করে।

অতঃপর, অথবা এই কারণের আনুষঙ্গিক ফল হিসেবে, পাখি-সংক্রান্ত যাদুর এক প্রস্থ সূক্ষ্ম বিবর্তন ঘটেছে। এটাকেই পাখি-সংক্রান্ত যাদুর উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম স্তর বলতে বাসনা করি। শুধুই পাখির দর্শনটুকুই এখানে যাদুক্রিয়া করে। অথবা, অদর্শন থেকেও সে কেবল ডেকেই কোনো কাজ করতে পারে। যেমন, ওয়েলস্-এ বিশ্বাস আছে, প্যাঁচা ডাকলেই কোনো কুমারী তার সতীত্ব হারায়। অন্যত্র এ বিশ্বাস বিশেষ বলবতী। গীর্জা থেকে রাতের প্রথম দিকে যদি প্যাঁচা ডাকে, তবে ভাবতে হবে, কোনো অনূঢ়া তার সতীত্ব ইতিপূর্বেই বিসর্জন দিয়ে ফেলেছে। এ বিশ্বাসকে আমার বেশ আধুনিক বলে মনে হয়। কেননা, আদিম মানুষের সতীত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, সভ্য সমাজেই সতীত্বের কড়াকড়ি বেশি; দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে এই বোধ কাজ করে: যেহেতু প্যাঁচা নিশাচর এবং অবৈধ কর্মাদি রাতেই অনুষ্ঠিত হয় বেশি, অতএব প্যাঁচা তা দেখতে পায়। কিন্তু এই যুক্তি এখানে সচেতনভাবে খুঁজে বের করলেও সাধারণভাবে প্যাঁচার এক বিশেষ ও অসাধারণ ক্ষমতার ওপরেই গুরুত্ব প্রদান করবার ফলে এ বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে।

এই স্তরের অপর উদাহরণ এই: গর্ভবতী নারী যদি প্যাঁচাকে দেখে, তবে ওই দর্শনটুকুর ফলেই তার সহজ ও সুপ্রসব হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বিশ্বাস আছে, গর্ভকালে যদি কোনো রমণী বিশেষ পাখিকে 'খোঁপাদুলী' (খোঁপা দোলায় যে) বলে ডাকতে শোনে, তবে তার কন্যা হবে। অর্থাৎ এখানেও বুঝি, Imitative ও contegious Magic-এর স্তর পেরিয়ে তবে এই স্তরে আসা গেছে; পাখির দেহের অঙ্গ বিশেষ হয়তো আক্ষরিকভাবে একদা প্রসূতির দেহে প্রয়োগ করা হত; আজ প্রথাটি অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু সংস্কারটি রয়ে গেছে; আক্ষরিক বস্তু আজ আলংকারিক অর্থ প্রাপ্ত হয়েছে।

ঠিক এই রকমই আর একটি দৃষ্টান্ত এই: পুরীতে যে গরুড় স্তম্ভ আছে, সর্পদন্ট মানুষ কেবল তা আলিঙ্গন করলেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। অর্থাৎ, সর্প-শত্রু গরুড়ের নামেই ওই স্তম্ভটির সেই ক্ষমতা হয়েছে, যার ফলে স্পর্শমাত্রই রোগী আরাম পায়। এর পেছনেও পূর্বের সংস্কার কাজ করেছে: তখন (এবং এখনও) হয়তো পাখির দেহের কোনো অংশ বা অঙ্গ সাপকাটী রোগীকে সেবন করানো বা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হত; পরিবর্তনের ফলে আজ তা স্পর্শমাত্রে এসে ঠেকেছে।

এই রকম আর একটি দৃষ্টান্ত আসাম থেকে পেয়েছি। ডঃ নির্মলপ্রভা বরদলৈ তাঁর "অসমর লোকসংস্কৃতি" (১৯৭২) গ্রন্থে লিখেছেন: "ম'রচরাই মাঙ্গলিক চৰাই। ম'ৰা পাখীৰে সজা বিচনীৰ বাই রোগ নিৰাময় করে আৰু ম'ৰচৰাইৰ প্রতীক

যদি ঘৰৰ চালত লগাই থোৱা থাকে তেনেহলে ধূমুহা ববঘুণৰপৰা ঘৰটো ৰক্ষা হৈ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।"—পৃ ৪৬।

এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে চীনের একটি প্রথাকে। চীনে শাং রাজাদের আমলে প্যাঁচা পবিত্র পাখিরূপে পরিগণিত ছিল। Chow-রা যখন শাংদের জয় করে, তখন শাংদের প্রতীক প্যাঁচাকেও তারা গ্রহণ করে। এমন কি প্যাঁচার মাংস খাওয়াও এক আনুষ্ঠানিক কর্ম ছিল বলে মনে হয়। অনেকে মনে করেন, প্যাঁচা "বিদ্যুৎপাখি", বজ্রের সঙ্গে যুক্ত। প্যাঁচার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি ধাতব আওয়াজ শুনে অনেকে মনে করেন, প্যাঁচা হল "emblem of a royal clan of blacksmith". প্যাঁচার এই সম্মানের কিছু অংশ হয়তো 'হান' (Han) বংশ পর্যন্ত টি'কে ছিল। তখন, বিশ্বাস ছিল, প্যাঁচা গৃহ ও প্রাসাদকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই যে খুঁটি বা স্তম্ভের ওপর ছাদটি থাকে, সেখানে প্যাঁচার প্রতিকৃতি স্থাপন করা করা হত। চীনেরই একটি সংস্কার : "A fowl on the root of a house is regarded as a bad omen,.."

অর্থাৎ, ম্যাজিকের মধ্যেও বিবর্তন আছে। সেই বিবর্তন স্থূলতা থেকে সূক্ষ্মতায় ; বস্তু থেকে ভাব ও প্রতীকে ; আক্ষরিকতা থেকে আলংকারিকতায়, স্পর্শন থেকে দর্শনে ; প্রত্যক্ষতা থেকে পরোক্ষতায় ॥

১০.

ম্যাজিকের মধ্যে, আমার মতে, এক ধরণের 'Synecdoche' অলংকার আছে। অর্থাৎ এখানেও 'part signifys the whole, or, the whole signifys the part'—এই নীতি স্বীকৃত হয়। Imitative Magic-এর চাইতে contegious Magic-এ এটি যেন আরো বেশি করে দেখা দেয়। contegious Magic-এর মূল ভিত্তি, যাকে কেন্দ্র করে বা যার জন্যে যাদুকর্মটি অনুষ্ঠিত হবে, তার দৈহিক সংযোগ চাই ; এই সংযোগকে সংক্রামিত করাই যাদু। কিন্তু দেহের তাবৎ বা সার্বিক সংযোগ প্রার্থিত বা প্রয়োজনীয় নয় ; দেহের যে কোনো অঙ্গ, এবং এমন কি, প্রত্যক্ষ শারীর সংস্পর্শ ব্যতীত কেবল দেহের প্রতিকৃতির মাধ্যমেও এ যাদু করা হয়ে থাকে। এই যে অঙ্গই সর্বাঙ্গ হয়ে ওঠা, বা প্রতিকৃতিই আকৃতি হওয়া, এর মধ্যে বড়ো একটা প্রতীকতা আছে। Imitative Magic-এর মধ্যেও এটি মেলে। তবে, contegious Magic-এর মধ্যে ব্যক্তির অঙ্গ সর্বাঙ্গ হয়, Imitative Magic-এর মধ্যে পাখির অঙ্গ সর্বাঙ্গ হয়, তফাত শুধু এই। সম্পূর্ণ একটি পাখিকে যাদুকর্মে গ্রহণ না করে যখন তার অঙ্গ-বিশেষকে (যেমন, কেবল পাখা, কেবল হাড়, কেবল

রক্ত, কেবল চোখ ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়, তখন Imitative Magic-এর মধ্যেও ওই প্রতীকতা প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু এই প্রতীকতার মধ্যে রহস্যময়তা তেমন নেই ; বাস্তব শরীরের বাস্তব অঙ্গ গ্রহণ করাতে তেমন গভীরতা কোথায়। এইজন্যে Imitative Magic-এর আসল প্রতীকতা মানুষ যখন পাখির Imitation-এ নিজেই পাখি হয়ে ওঠে। এবার এই সব ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দিই।

প্রথমে Contegious Magic-এর উদাহরণ দেব।

আয়ার্ল্যাণ্ডে বিশ্বাস করা হয়, প্রত্যেক নর-নারীর মাথায় একটি বিশেষ চুল আছে, আবাবিল যদি দৈবাৎ সেই চুলটি দেহ থেকে উৎপাটিত করে নেয়, তবে সংশ্লিষ্ট নর-নারীরসমূহ সর্বনাশ উপস্থিত হবে। সাসেক্সে এই বিশ্বাস একটু অন্য রকমের। চুল কেটে কেউ ফেলে দিলে, যদি কোনো পাখি তা দিয়ে নীড় নির্মাণ করে, তবে তার মাথায় ফোঁড়া হয়। স্কটল্যাণ্ডের অঞ্চল বিশেষের বিশ্বাস এই : যদি কারো কাটা চুল হাওয়ায় উড়ে কোনো পাখির বাসার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে, অথবা, কোনো পাখি সেই চুল নিয়ে নিজের বাসায় রাখে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাথা ব্যথা করে। ম্যাগপাই পাখি যদি কারো কাটা চুল নিয়ে নীড় নির্মাণ করে, তবে সে এক বছরের মধ্যে মারা যায়।

যাদুকর্মে চুল (বিশেষত অনিষ্টকারী যাদুতে) সারা পৃথিবীতেই ব্যবহৃত হয়। এখানে যে দৃষ্টান্তগুলো পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পাখি একটি অনিষ্টকারী শক্তি রূপে প্রদর্শিত হয়েছে। যেহেতু চুল মাথার অংশ, সেই জন্য মাথাতেই ব্যথা বা ফোঁড়া হবার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ সংযোগ এখানে কারণ হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু যখন চুলই সর্বশরীরের প্রতীক হয়ে গোটা মানুষটির মৃত্যু ঘটাতে পারে, সেখানে প্রতীকতাবোধ আরও বেশি। বিশ্বাস হিসেবে এর মধ্যে একটি বিবর্তন দেখা যায়, নির্বিশেষ বিশেষ হবার ফলে : যা ছিল যে কোনো পাখির কাজ, ক্রমে তা সঙ্কুচিত হয়ে কেবল আবাবিল ও ম্যাগপাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এই বিশেষিকতার মধ্যে দুটি পাখি সম্পর্কে একটি জাতির মনোভাবটিও প্রতিফলিত হয়েছে। নৃতাত্ত্বিকদের এই ক্ষেত্রে বিচার করতে হবে, অন্যান্য পাখির তুলনায়, উক্ত অঞ্চলে, অমঙ্গল ও অনিষ্টকারী পাখিরূপে, এরা কতখানি ভূমিকা নিয়েছে। সেই সংখ্যাতত্ত্বের ওপরেই এর আসল কারণ নির্ভরশীল।

এইবার পাখির অনুকরণ করে মানুষই পাখির প্রতীক হয়ে যে সব যাদুকর্ম করে, তার কথা বলি। এটি আসলে 'Animal mime'-এর পর্যায়ভুক্ত। এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিভিন্ন কৃষি ও শস্যোৎসবে সুফল আদায় করবার জন্য 'Bird-dance' বা পক্ষিনৃত্যের অনুষ্ঠান করা। নিখিল বিশ্বেই এই পক্ষিনৃত্য আছে। পাখির পালক পরিধান করে, তারই গতি ও উড্ডয়নভঙ্গী অনুকরণ করে, পাখির যাদুক্ষমতা তার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করে নিয়ে উদ্দিষ্ট ফললাভের প্রয়াস। এই অভিনয় ও অনুকরণের ফলে পাখির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা ও অভিন্নতা যখন ঘটে, তখনই

মানুষ পাখির প্রতীক হয়ে যায়। যে সব পাখির যাদুক্ষমতা আছে, সাধারণত সেই সব পাখিরই অনুকরণ করা হয়, নির্বিশেষে সব পাখিই নয়। এক-একটি বিশেষ পাখিকে কিভাবে নির্দেশ করা হয়, তার মধ্যেও সেই সেই দেশের মানুষের প্রতীকতাবোধ কাজ করে থাকে। পাখিটিকে কি যথার্থ ও বাস্তব-রূপে প্রদর্শন করা হয়, নাকি পাখির বিশেষ একটি শারীর বিশেষত্বের মাধ্যমেই পূর্ণ পাখিটিকে তুলে ধরা হয়? অনেক সময় বিশেষ ও অভীষ্ট পাখিটির একটি বা কয়েকটি পালক পরিধান করেই পাখিটিকে নির্দেশ করা হয়, এতে পাখিটির সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও শারীরসংযোগ ঘটে, যাদুও তীব্ররূপে অনুভূত হয়। কিন্তু যখন কৃত্রিম বস্তু দিয়ে কোনো পাখিকে নির্দেশ করা হয়, তখন তা ততোখানি গাঢ়তা অর্জন করে না। এই যাদুকে বলা যায় 'Mime-magic'। নানা কারণে এই অনুকরণ করা হয়: ইষ্টসাধন ও অনিষ্টসাধনের জন্যে; উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে; রোগ হরণের জন্যে; কিংবা, যে পাখি কোনো গোষ্ঠীর 'টোটেম', তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। আমেরিকার Hopi-রা পাখির অনুকরণ বিশেষভাবে করে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেহটিকে মানুষের মতো অবিকৃত রেখে, কেবল 'Bird-mask' পরিধান করেও নৃত্যানুষ্ঠান করা হয়। আগেই বলেছি, এভাবেই 'Theriomorphic God'-এর উদ্ভব হয়েছে।

আকাশের দেবতা, নৈসর্গিক শক্তি এবং আকাশস্থ পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে অনেক ওঝারাই পাখি সেজে নেয়। যেমন, Tungu ওঝারা। ওই সময়ে ওদের মাথার পাগড়ি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে থাকে। উত্তর Tungu ওঝারা মাথায় একটি পেতলের ফ্রেমে একটি, তিনটি বা তারো বেশি পাখি বেঁধে নেয়। এই সব পাখিদের মাথা ছোটো, দেহটা ভারি, পাখাও ছোটো এবং ল্যাজ দীর্ঘ। কেউ কেউ মনে করেন, ওইসব পাখি হল ময়ূর, অথবা, শ্যেন বা কপোতের প্রতীক। শিরস্ত্রাণের মধ্যে রক্ষিত এইসব পাখিকে কখনো আবার ঘোরানো হয়, যেন তারা ওই অবস্থাতেই উড়ছে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার Kwa-Kiutt Indianদের ওঝাকেও এইভাবে যাদুকর্মকালে মাথায় রক্ষিত পাখিদের ঘোরাতে দেখা যায়। মেক্সিকোর কোনো কোনো অঞ্চলে Volador উৎসবে দেখা যায়ঃ একটি চৌকির ওপর দীর্ঘ একটি দণ্ড খাড়া করে, সেই চৌকির ওপর একজন নাচে। ওই খুঁটির চারদিকে (চারদিকের প্রতীক এরা) চারজন লোক ঘোরে (চড়ক?), প্রাচীন কালে ওরা পাখির পালক পরিধান করে পাখি হয়ে নিত। গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়াতে একটি খুঁটির চতুর্দিকে আবাবিল পাখিকে ঘোরানো হত, আবাবিল বসন্তের সূচনা করত। এই ঘূর্ণন আসলে বাতাসে পাখির উড্ডয়নের প্রতীক; ওঝা যেন সেই পাখিদের সঙ্গে নিজেও পাখি হয়ে আকাশের দিকে উড়ে চলে।

Yakut ওঝারা লোহার তৈরি পক্ষিমূর্তি তাদের শিরস্ত্রাণ বা পাগড়িতে লাগিয়ে নেয়। Goldi ওঝারা তাদের পাগড়িতে লোহার তৈরি ছোটো কোকিলমূর্তি ধারণ করে। Buriat ওঝারা লোহার, একমাথা বা দু মাথা-ওয়ালা পাখি ধারণ করে।

তাদের পায়ের জুতোগুলো ঠিক পাখির নখের মতো। Yenesei ওঝারা তাদের গলায় ঝোলানো থাকে যে ধাতব পেণ্ডেণ্ট্, তাতে মরাল বা ঈগলের মূর্তি এঁকে নেয়। Tungu এবং Yenesei ওঝারা এমন কোট পরে, যার পেছনের দিকটা দেখতে ঠিক পাখির (বিশেষ করে ঈগলের) ল্যাজের মতো হয় ; ঈগলের মতো এই জন্যে যে, ওঝার যাদুক্ষমতা ঈগলের কাছ থেকে পাওয়া বলে বিশ্বাস করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, Tungu ওঝারা ময়ূর, শ্যেন বা পারাবতের আকৃতি ধারণ করে নেয়। অনেকের ধারণা তা ময়ূর নয়, কারণ উত্তর এশিয়াতে ময়ূর নেই, ওটা কুকো বা মহোকো (pheasant) হবে। আফ্রিকার ওঝারা Onduva পাখির পালক পরিধান করে নেয় যাদু-অনুষ্ঠানের পূর্বে।

এই সব তথ্য ও দৃষ্টান্ত থেকে একথা বোঝা যায়, ওঝারা কিভাবে প্রকৃত পাখি, অথবা পাখির অঙ্গ, কিংবা পাখির প্রতিমূর্তি বা প্রতিরূপ শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত করে কী করে নিজেরাই পাখিতে পরিণত হয়ে যায়।

ওঝা ব্যতীত সাধারণ মানুষও নানাবিধ উদ্দেশ্যে পাখির অনুকরণ করে পাখি হতে চায়। জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক কলকাতার 'Statesman' (রবিবার, ২৯ জুন, ১৯২৬) পত্রিকায় "Basuto Doctor's stock in-trade" নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "Again a native, lost in the bush, has what he considers an infalliable guide if he is carrying the dried head and eyes of a vulture. He ties them on his head, and taking careful note of the direction in which they are painting, sleeps. He must dream of the place he wishes to reach, and if on waking he finds the head-dress pointing to the same way as overnight, he takes the road. If neither of these conditions is fulfilled he goes through the whole process again."

ওঝাদের পাখি হয়ে আকাশের দিকে উড্ডয়ন-প্রসঙ্গে, প্রেতাত্মা বা পূর্বপুরুষদের সংগে যোগাযোগ স্থাপনের কথাও তোলা যায়। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা 'Necromancy'-র কথা বলেছিলাম, কিন্তু তার আলোচনা করি নি বা দৃষ্টান্ত দিই নি। এবার তা করি।

বহুদেশেই বিশ্বাস আছে, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা পাখি হয়ে যায়। এই বিশ্বাসের পরবর্তী ও অপরিহার্য অঙ্গ হল আর একটি বিশ্বাস : মৃতাত্মার সঙ্গে যোগ-স্থাপন করতে হলে পাখির মাধ্যমেই তা করা যায়। এও এক যাদুকর্ম, একেই বলে 'Necromancy',— নানা ভবিষ্যৎ ঘটনা জানবার জন্যে এই যাদু অনুষ্ঠিত হয়। পাখি দুভাবে এই যোগ স্থাপন করে ; প্রথমত, বাস্তব ও প্রকৃত পাখিকে এ বিষয়ে নিয়োজিত করা, কিন্তু তাতে যেন যাদুর গৌরব ততখানি নেই। দ্বিতীয়ত, ওঝার নিজেই পাখির অনুকরণ করে, পাখি সেজে, পাখির সংগে অভিন্ন ও একাত্ম হয়ে যোগা-

যোগ স্থাপন করা ; অর্থাৎ Imitative Magic-এর প্রসারিত ফল হিসেবে Mime magic-এর অনুষ্ঠান করা। Florance Waterbury তাঁর "Bird-Deities in China" (Ascona, Switzerland : 1952) বইটিতে চীন দেশ থেকে এ বিষয়ে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (P. 85) : পাখির মাধ্যমেই চীনে মৃতাত্মাকে আহবান করা হয়। ওঝা এইজন্যে বিশেষ ধরণের পোশাক পরে নেয়। উঁচু মইতে উঠে, উত্তরাস্য হয়ে, সেই পোশাক পরবার জন্যে মৃতাত্মাকে নাম ধরে ডাকে। তিনবার এইভাবে ডাকবার পর, ওঝা নিজে মৃতের ব্যবহৃত পোশাক পরে। ওঝা যখন মৃতাত্মাকে ডাকে, তখন সে তার দু' বাহু ডান থেকে বাঁ দিকে দোলাতে থাকে। অর্থাৎ সে যেন তখন পাখি হয়ে গেছে, তার দুই বাহু উড়ন্ত পাখির দু'টি ডানা।

Wilfrid Dyson Hambly তাঁর 'Talking animals' (washington, D. C. 1949) বইতে আফ্রিকার এক ধরনের পাখি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "Esuvi is a bird which is greatly feared because it can catch spirits of the dead". P. 43. স্পষ্টই বোঝা যায়, মৃতের সংগে যুক্ত পাখি শভ ও অশুভ—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে লোকমানসে।

আমাদের দেশেও মৃতাত্মার সংগে যোগসাধনের জন্যে পাখির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। মৃতের উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য-পানীয় মৃতাত্মা গ্রহণ করলেন কিনা, তার প্রমাণ হল— ওই খাদ্য-পানীয় কাক বা মুরগী প্রদানমাত্রই ঠুকরে খেল কিনা। এও এক ধরণের মৃতাত্মার সঙ্গে যোগসাধন, পাখির মাধ্যমে।

পাখির মাধ্যমে মৃতাত্মার সংগে এই রকম সংযোগ স্থাপনের পেছনে পাখিকে 'Totem bird' এবং 'Ancestor bird' করে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশেই পাখির নামে মানুষের নাম রাখা হয় ; গোষ্ঠীর বিভাগ, পদবী ও গোত্রের বিশেষত্বও পাখির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়। পাখিকে Totem বলে স্বীকার করবার ফলেই দেহের বিভিন্ন অংশে Tatooing বা উল্কিচিত্র রূপে নানা পাখির আকৃতি এঁকে নেওয়া হয়। মধ্যভারতের বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে উল্কির বিচিত্র ব্যবহার প্রসংগে Capt. C. E. Luard তাঁর একটি সচিত্র নিবন্ধে (Tatooing in Central India : The Indian Antiquary : September, 1904 : PP. 219-228) মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পাখির বিভিন্ন প্রকারের মূর্তি এঁকে নেওয়া হয়, বিভিন্ন প্রকারের অশুভ ও শুভত্বের জন্যে। B. A. Grupte তাঁর একটি প্রবন্ধে (The Indian Antiquary : July, 1902, P. 297) জানিয়েছেন, পাঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা উল্কি হিসেবে বাহুতে ময়ূরকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে। অনেক সময়েই পাখি যে 'Animal Guardian' রূপে নানা বিপদে মানুষের সাহায্যকারী হয়ে দেখা দেয়, তা এইসব কারণের জন্যেই।

মৃত পূর্ব পুরুষের পুজো-উপাসনাকে বলে Manism ; প্রাচীন রোমানরা মৃত পূর্ব পুরুষের ক্ষমতা ও শুভাকাঙ্ক্ষাকে স্মরণ করে তাদের বলত 'Manes' বা 'Di-

Manes' (অর্থাৎ যে 'সুজন'), তার থেকেই 'Manism' অভিধার উদ্ভব হয়েছে। পাখি 'সুজন,' এবং মানুষের সঙ্গে অভিন্ন হবার ফলে, পাখিও শ্রদ্ধা-পূজা প্রাপ্ত হয়ে 'Ancestor' বা 'পূর্বপুরুষ' হবার গৌরব অর্জন করেছে।

উত্তর প্রদেশের 'থারু'-রা, বিশেষত নৈনিতাল তরাইয়ের 'থারু'-রা, মোঙ্গলীয় উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ালীর দিন তারা মৃত পূর্বপুরুষদের আহ্বান করে। এই অনুষ্ঠানের সময় তারা যে সব গান গেয়ে থাকে, তাতে তাদের পূর্ব পুরুষকে পাখি রূপে উল্লেখ করে। এস. কে. শ্রীবাস্তব এ বিষয়ে কিছু লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন (The Dewali among the Tharus : Man in India : Vol. XXIX, No. 1, January-March, 1949, P. 29-35)।

এই কারণেই, বাপ-মা মারা গেলে, সাঁওতালরা এই বলে কাঁদে : "মুরগীর ছানা এতোদিনে আশ্রয়শূন্য হলো" (সাঁওতালদের শ্রাদ্ধ প্রণালী : নব্য ভারত : মাঘ, ১২৯৮ পৃ. ৫২৭-৫৩২ : ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী)।

ভারতবর্ষে 'পূর্বপুরুষ' রূপে সর্বাধিক গৃহীত পাখি—কাক। মহারাষ্ট্রে ও কোঙ্কণে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে কাকের মাধ্যমেই পিতৃপুরুষকে খাদ্য নিবেদন করা হয় (Folklore of the Konkon : The Indian Antiquary : September, 1914. P. 84)। পিতৃপুরুষ বলে কল্পিত হবার দরুনই মধ্যপ্রদেশে কাকের সঙ্গমদৃশ্য দেখা নিষিদ্ধ (Man in India : Vol. III., March-June, 1923, P. 100)।

পূর্বপুরুষ বলেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নবান্নের উৎসবে কাককেই প্রথম অন্ন নিবেদন করা হয়। রেভঃ লালবিহারী দে তাঁর 'গোবিন্দ সামন্ত' বইটিতে বর্ধমান জেলার অঞ্চল বিশেষের নবান্ন উৎসবের যে বিবরণ উপস্থিত করেছেন, তাতেও এ সংবাদ মেলে। বরিশাল (পৌষ সংক্রান্তি ও নবান্ন : প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৮। পৃ. ৬০০-৬০২ : কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। বরিশালে নবান্ন : বঙ্গদর্শন : মাঘ, ১৩২০। পৃ. ৭২১-৭২৬ : মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা) জেলাতে এ বিষয়ে রীতিমত আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ফরিদপুর জেলাতে নবান্নের পূর্বদিন গলবস্ত্র হয়ে দাঁড় কাককে নবান্ন গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীর সপ্তম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই একটি মন্তব্য করেছিলেন : 'ঐতরেয় আরণ্যকে' বঙ্গবাসীকে যে পাখির জাত বলা হয়েছে, শাস্ত্রী মশাই মনে করেন, তা বাঙালীর প্রতি ঈর্ষা ও ঘৃণা বশত আর্যদের উক্তি। শরৎচন্দ্র রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে (Cast, Race and Religion : Man in India : Vol. XVIII, No. 2+3, April-September, 1938, PP. 85-105) সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের মতে, বাঙালীর প্রতি এই উক্তি আলপাইন জাতির প্রভাবের ফল রূপে করা হয়েছে। বঙ্গবাসীর সঙ্গে আলপাইন জাতির একটি যোগের কথা অনেকেই একদা অনুমান

করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাঙলা পটচিত্রে 'ক্ষেমা-ক্ষেমী' নামে দু'টি পাখির নামোল্লেখ করা যায়। পদ্ম সরোবরে উপবিষ্ট এই পাখি দু'টির চিত্র 'The Ritual art of the Bratas of Bengal' (January, 1961) বইতে সুধাংশুকুমার রায় দিয়েছেন (Plate XVII, fig. b)। পাখি দু'টিকে 'Ancestor birds' বলা হয়েছে।

আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা নবতর কোনো প্রাণীতে পরিণত হয়। এই দেহান্তর প্রাপ্তিকে বলা হয় 'Metempsychosis'। J. H. Hutton তাঁর 'Metempsychosis' প্রবন্ধে (Man in India : XII., No 2+3, April-Septenfer, 1932, pp. 73-76) দেখিয়েছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বিশ্বাস আছে, দেহ থেকে প্রাণ যখন নির্গত হয়ে যায়, তখন তা 'উড়ে' যায়। এই 'ওড়া' থেকে আত্মা পাখি রূপেও কল্পিত হয়ে যায়। বাঙলায় আমরা যখন 'প্রাণ-পাখি' ; 'মন-পাখি' ; প্রভৃতি রূপকের কথা বলি, কিংবা যখন বলি 'আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হওয়া,' তখন অজ্ঞাতেই যে আত্মাকে পাখি বলে স্বীকার করে নিই,—অনেক সময়েই সে বিষয়ে আমরা সচেতন থাকি না ॥

.১১.

নানাবিধ অমঙ্গলকে দূরে করবার জন্যে কিংবা বিভিন্ন প্রকার কু-প্রভাব ও কু-নজর এড়াবার জন্যে, যে মন্ত্র বা ক্রিয়াচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিশ্বের সর্বত্র, তাকে বলা হয়, 'Apotropaism' ; পূর্ববঙ্গের উপভাষায় একে বলে 'দিষ্টি কাটানো', উত্তরবঙ্গের উপভাষায় বলে 'নজর কাটানো'। পাখির মাধ্যমে এই 'Apotropaic Remedy'-র নানা দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

প্রাচীন ভারতে শুক-সারিকা প্রলাপন একটি 'কলা' বলে বিবেচিত হত। পাখি পড়ানো সব দেশেই অল্প-বিস্তর আছে, এখন পর্যন্ত তা বেশ দেখা যায়। পাখি পড়ানোর একটি প্রচলিত বাঙলা ছড়া এই : "কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম-রাম / পড় বাবা গঙ্গারাম"। "গঙ্গারাম" হলো শুক-সারিকার আদরের নাম, নির্বিশেষ ভাবে পাখির নাম, ঠাকুর-দেবতার নামে পাখির নাম। পাখির 'রুত' অর্থাৎ কন্ঠধ্বনির মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণকে গ্রহণ-বর্জনের সংস্কার এর পেছনে আছে বলে মনে করি। পক্ষি-প্রলাপন 'কলা' হিসেবে পরবর্তী কালে স্বীকৃতি পেয়েছে, আগে এটি ছিল Apotropaism-এর উদাহরণ। পাখির কন্ঠস্বরের মাধ্যমে ঠাকুর-দেবতার নামোচ্চারণ (এও পরবর্তীকালের, পূর্বে বিশুদ্ধ পক্ষি-কণ্ঠেই নির্ঘাতি দূর করত, এখনও তার প্রমাণ পাওয়া যায়) করিয়ে যেন অকল্যাণকে পরিহার করবার প্রয়াস। পাখির কন্ঠধ্বনির মধ্যে এখানে যাদুক্ষমতাকে

দেখা হয়েছে। অন্যভাবেও এটির ব্যাখ্যা করা যায়ঃ পাখি যাতে অকল্যাণকর কিছু উচ্চারণ করে না ফেলে (পাখি যা উচ্চারণ করে, তা সত্য হয়, এই ভয়ের ফলে, এতেও পাখির যাদুক্ষমতা স্বীকৃত), তাই তার বাগ্‌যন্ত্রটিকে দেবনাম উচ্চারণের অভ্যাসের মধ্যে বন্দী করে গৃহস্থের আপন মনের ভয় ঢাকবার চেষ্টা এখানে।

পাখির সঙ্গে Apotropaism-এর যোগ দুই বিপরীত দিক থেকে লক্ষ করা যেতে পারে : এক, পাখির বিশিষ্ট দুষ্ট ক্ষমতার ফলে বা কু-নজর পতিত হওয়াতে যে অকল্যাণ বা অমঙ্গল সংঘটিত হয়, তা দূর করা বা পরিহার করা ; দুই, অপর কারো কু-নজরের ফলে অমঙ্গল বা অকল্যাণ সংঘটিত হলে, পাখির মঙ্গলকারী ক্ষমতা দ্বারা তা দূর করা ও পরিহার করা। এখন এই দুই বিপরীত দিকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বাঙলা ও বিহারে কাক ও পেচক অলক্ষুণে পাখি, দু'টিই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, পৃথিবীর বহু দেশেই তাই। এইজন্যে কাকের ডাক শুনলেই বাঙলা দেশের অঞ্চল বিশেষের স্ত্রীলোকেরা বলে থাকেন : "আঁষবটি দিয়ে তোর নাক কাটব, গঙ্গাজলে মুখ ধো'গে যা !" বোম্বাইয়ের পারশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রায় এই ধরণের আচার আছে। জীবনজী জামসেদজী মোদী জানিয়েছেন (Omens among the Parsees : The Journal of the Anthropological Society of Bombay : Vol. 1, No 5, PP. 289-295) : "Another peculiar kind of cawing, especially that of the 'kagri,' i. e., the female crow, portends some evil. A crow making such peculiar noise is generally driven away with a remark, "Go away, bring some good news."

বিহারবাসীরা কাকের রব শুনলেই বলে—"সীতারাম"। তেমনি প্যাঁচার ডাক শুনলে বলে "রাম-রাম"। ওড়িশাতে প্যাঁচা ডাকতে থাকলেই তাকে স্ত্রীলোকেরা এই বলে গাল দেয়ঃ "ভাশুরখাগী, চোর।" এ শুনেই নাকি প্যাঁচা দূর হয়ে যায়।

বাড়ির যে স্থানে কয়েকটি কাক মিলিত হয়ে কলহ করে, বাঙলা দেশের স্ত্রীলোকেরা সেই স্থানটি জল দিয়ে ধুয়ে দেন, কারণ, কাকের কলহ গৃহে কলহের সূচনা করে।

কাক-দ্বারা সংঘটিত অকল্যাণের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে প্রাচীন ভারতের অবলম্বিত একটি আচার সম্পর্কে 'Encyclopedia of Superstitions' গ্রন্থে এই মন্তব্য করা হয়েছে : "An ancient book of magic, entitled Kausika Sutra, describes a way of getting rid of ill fortune by fastening a hook to the left leg of a crow, attaching a sacrificial cake to the hook, and letting the bird fly away in a south-westerly direction while the priest or magicion, recites the customary formula"—P. 94.

আঁতুড় ঘরের কাছে রাতের বেলায় প‍্যাঁচার ডাককে অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করা হয়। এ ডাক এতই অশুভ যে তাতে শিশুর প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে। প‍্যাঁচার এই কু-নজর এড়াবার জন্যে মুর্শিদাবাদ জেলার স্ত্রীলোকেরা নানা মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। উনুনের পোড়ামাটির চারটে ঢেলা নিয়ে, নীচের মন্ত্রটি তিনবার বলে, তাতে ফুঁ দিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে বাড়ির চারদিকে একটি একটি করে ছুঁড়ে দেয়। একে বলে "বাড়ি বন্ধ করা।" মন্ত্র-পড়া এক-একটি ঢিল যতদূর যাবে, তার মধ্যে প‍্যাঁচা আসতে পারবে না। মন্ত্রটি এই :

জাল জাল ইন্দ্রর জাল,
ওপর বন্ধ চৌদ্দ তাল—
নামু বন্ধ—স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ॥
এই জাল পড় তুই—
বাড়ির চার কোণ চেপে পড়্
এই আগন্যার চার কোণ চেপে পড়্
এই ঘরের চারকোণ চেপে পড়্ ॥
এই জাল পড়বি তোর
যাট দিন, যাট রাতের মতো পড়্ ।
—কার দোহাই ?
—মা কালীর দোহাই ॥

মন্ত্রটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক মোহাঃ রাহাতুল্লা সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছি। এটি তাঁদের পরিবারেই (সাং অনন্তপুর, পোঃ মহুরুল অনন্তপুর, মহকুমা লালবাগ, জেলা মুর্শিদাবাদ) অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন তিনি। এই আচারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক এই ক'টি: উনুনের পোড়ামাটি, নিশ্বাস বন্ধ করা ও তিনবার ফুঁ দেওয়া।

মুর্শিদাবাদেরই সরমস্তপুর থেকে আবেদা বিবির (বয়স ৫০) কাছ থেকে হট্টিটি বা হো-টি-টি পাখির ডাক-জাত অমঙ্গল এড়াবার একটি আচার জানা গেছে : এক জোড়া হো-টি-টি যদি কোনো বাড়ির ওপর দিয়ে জোরালো গলায় ডাকতে-ডাকতে উড়ে যায়, তবে সেই বাড়িতে বিশেষ বিপদ আসন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই বাড়ির গৃহিণী ডাক শোনা মাত্রই আঁষ-কাটা বঁটি এবং মুড়ো ঝাঁটা হাতে করে আঙিনায় বেরিয়ে আসেন তৎক্ষণাৎ। তারপর, বঁটি আর ঝাঁটা পাখি দুটির উদ্দেশে নাড়িয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন: "তোর নাক-চুল কেটে বিদেয় দেব, ঝাঁটা-খাকী দূর হ!" তারপর সেই বঁটি আর ঝাঁটা জলে ধুয়ে তবে ঘরে তোলেন। হো-টি-টি পাখির রব-জাত অকল্যাণ যেন বঁটি ও ঝাঁটাতে সঞ্চারিত হয়েছে, পরিবারস্থ লোকদের মঙ্গলে, তাই জল দিয়ে ধোয়া হল; কিংবা বঁটি ও ঝাঁটা সেই অকল্যাণকে দূর করবার জন্যে অপবিত্র হয়ে গেছে, তাই ধোয়া হল। মানুষের প্রতি প্রযোজ্য বিপদ যখন জড় বস্তুর

প্রতি সংক্রামিত হয়, তখন জড় বস্তুর প্রাণ আছে বলেই কেবল কল্পিত হয় না, মানুষ ও জড়বস্তু অভিন্নত্বও সূচিত হয়, যার ফলে মানুষের বিপদ জড়বস্তু আপনার যাদু-ক্ষমতা দিয়ে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নেয়।

পূর্ব ও উত্তর বাঙলায় একটি নিশাচর ও অকল্যাণকর পাখি হলো—'কোক'। এই ক্ষুদ্রকায় পাখিটি এই বলেই ডাকে, এর ডাক যেমন গম্ভীর, তেমনি ভয়াল। পূর্ব ও উত্তর বাঙলায় এ পাখির আধিক্য যেমন লক্ষিত হয়, তেমনি এ পাখির রবজাত অমঙ্গল এড়াবার আচারগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাতের বেলায় এ পাখি ডাকতে আরম্ভ করলেই গৃহিণীরা অকথ্য ভাষায় একে গালাগালি করতে থাকেন; কেউ তৎক্ষণাৎ একটি লোহার শিক জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দেন। এর কারণ দুটি হতে পারে: প্রথমত, কোক পাখির রবজাত অমঙ্গলকে অগ্নিদগ্ধ করা; দ্বিতীয়ত, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত হয়ে অন্য কোনো বস্তুতে রূপ নিতে পারে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, লোহার শিকটিকে পাখিটির আত্মা মনে করে তাকে পুড়িয়ে মারা। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার একটি বিশিষ্ট রাজবংশী পরিবারে এ বিষয়ে একটি আচার পালন করা হয় (কালপ্যাঁচা ডাকলেও এটি করা হয়): পায়রা কেটে তা আগুনে ঝলসাবার জন্যে যে বাঁশের তীক্ষ্ম মুখ কাঠি ব্যবহৃত হয় রাজবংশী পরিবারে, গৃহিণীরা সদর্পে রান্নাঘর থেকে তা বের করে, উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে, পাখির উদ্দেশে তা নাড়িয়ে, উচ্চরবে বলেন: "জাগিস, জাগিস, জাগিস!" অর্থাৎ এই অগ্নিস্পৃষ্ট তীক্ষ্ম মুখ বংশশলাকা তোর হৃদয়ে বিদ্ধ হল, এতে তুই সচেতন ও সাবধান হ, অলক্ষুণে কথা উচ্চারণ করতে বিরত থাক্। আগুনে লৌহশলাকা প্রদান এবং অগ্নিস্পৃষ্ট বংশশলাকা প্রদর্শন আসলে একই আচার।

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ—উভয়ত্রই প্যাঁচা বা কোক পাখির রব-জাত অমঙ্গলকে খণ্ডাবার জন্যে সংখ্যা সমূহ বিপরীত দিক থেকে গণনা করা হয়। এটি সাধারণত পুরুষেরাই করে থাকেন। কেউবা একশ' থেকে (যেমন, ৯৯, ৯৮, ৯৭···), কেউ বা দশ থেকে (৯, ৮, ৭···) ইত্যাদি বিপরীত ক্রমে সেই গণনা করে থাকে। লোকাচার ও লোকসংস্কৃতিতে যা কিছুই 'বিপরীত' তাই বিশেষ যাদুগুণ সমন্বিত বলে কল্পিত। উপরন্তু, যখন এই সংখ্যা-গণনা এক নিশ্বাসে করতে হয়, তখন ওই নিশ্বাস রোধের নিষেধাজ্ঞায় আর এক প্রস্থ মন্ত্র-মণ্ডিত হয়ে ওঠে তা। এখানে এই বিশেষ সংখ্যাগুলিই যেন মন্ত্রবৎ হয়ে যায়।

শঙ্খরবকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করবার দরুণ অনেক সময় প্যাঁচা ইত্যাদি অমঙ্গলকারী পাখিকে তাড়াবার জন্য, অথবা, রবজাত অকল্যাণ খণ্ডাবার জন্যে অনেক সময় শঙ্খও বাজানো হয়।

প্যাঁচার কুনজর এড়াবার বিভিন্ন প্রথা ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা যায়। প্যাঁচার ডাক শুনলেই পকেট উল্টে দেওয়া, অথবা, যে কোনো বস্ত্রের ভেতরের দিকটি উল্টে বাইরের দিকে করে দেওয়া; রুমালে গেরো দেওয়া;

কিংবা জ্বলন্ত উনুনে খানিকটা নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বস্ত্রাদি উল্টে দেওয়া আর ভারতের বিপরীত ক্রমে সংখ্যা-গণনা এক ব্যাপার; এ হলো Homoeopathic Magic, কোনো জিনিস উল্টে দিয়ে অমঙ্গলটিকেও উল্টে অর্থাৎ নাকচ করে দেওয়া। রুমালে গেরো দেওয়াও তাই, গ্রন্থিবৎ পাখির কণ্ঠকে রুদ্ধ করা অথবা, অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। আগুন ও উনুনের ভূমিকা সর্বত্রই দেখা যায়। নুন এখানে অকল্যাণকারী পাখিটির life token হতে পারে, তাকেই পোড়ানো হল। যদি এ ব্যাখ্যাই ঠিক হয়, তবে এও মানতে হবে, আচারটি ভারত থেকে গেছে। কারণ, মৃতদেহ দাহ করবার প্রথা ভারতেই সর্বাধিক।

এ ছাড়া, প্যাঁচার কুনজর কাটাবার জন্যে প্যাঁচারই চোখ-ধারণের প্রথার কথা আগেই বলেছি। প্যাঁচা যাতে বসতে না পারে, সে জন্যে মরক্কোতে তাঁবুতে কালো কাপড় টাঙিয়ে রাখা হয়; প্যাঁচা ডাকলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেওয়া হয়: 'তোর অভিশাপ তোর ঝুলিতেই ফিরে যাক্।' আরব ও আফ্রিকার বেদুয়িন মায়েরা প্যাঁচার কুনজর থেকে নিজের শিশুদের রক্ষা করবার জন্যে, সন্তানদের মাথার ওপর কোনো পেতলের পাত্র রেখে তাতে প্রস্রাব করে। যেন, ওই প্রস্রাব দ্বারা প্যাঁচাকে অপমানিত করা হল।

শুধু একটি মাত্র ম্যাগপাই দেখা ইংলণ্ডে অমঙ্গলজনক ("one for sorrow") বলে বিবেচিত হয়। এই দোষ খণ্ডাবার জন্যে হয় ম্যাগপাইটির উদ্দেশে মাথা নত করা হয়, কেউ বা ক্রুশ চিহ্ন আঁকেন, নয়ত তার উদ্দেশে থুথু ফেলা হয়। যে কারণে প্রস্রাব করা হয়, সেই কারণেই থুথু ফেলা হয়।

প্রসঙ্গতঃ, অমঙ্গল দূর করবার জন্যে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞার কথাও স্মরণ করা যায়। যেমন, "The meat of the Suia bird is a taboo to unmarried young Birhor men aud women. It is believed that the eating of such meat by an unmarried person will result in the failure of all negotiations for his or her marriage"—Man in India : Vol. 1, No 2, June, *1921*, *P. 153.*

এতক্ষণ পাখি-কর্তৃক সংঘটিত অকল্যাণকে দূর করবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম। এইবার, অপরের দ্বারা সংঘটিত অকল্যাণকে কি ভাবে পাখির দ্বারা দূর করা হয়, তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এ বিষয়ে অবশ্য আগেই নানা প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে এসেছি। কাজেই তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। পাখির চোখ, পালক, হাড়, রক্ত প্রভৃতি দেহের সব অঙ্গই বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হবার উপায় হিসেবে অবলম্বিত হয়ে থাকে। সব ক'টিরই দৃষ্টান্ত আগে দিয়েছি। আরো ক'টি দৃষ্টান্ত এই।

J. M. Campbell লিখেছেন (Spirit basis of belief and custom : The Indian Antiquary : December, 1900, P. 384) : "A brass cock is

a common ornament on Neopolitan harness;...A bird is one of the elements out of which the favourite compound child's guard against the Evil Eye of the Neopolitan cima ruta or rue spray is composed".

'Cima ruta'-র পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন: "Cima ruta or Rue Spray is a popular and complex child's ornament and amulet against the Evil Eye in Naples".

মিশরে অপদেবতার প্রভাব ও কুনজর এড়াতে এই আচার পালন করা হয়: যে স্ত্রীলোককে অপদেবতা প্রভাবিত করেছে, প্রৌঢ়া ওঝা নিজের সঙ্গে তাদের নাচায়। পাখির, বিশেষত গৃহপালিত পাখির রক্ত তাদের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। নাচতে-নাচতে তারা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে ওই মহিলা-ওঝা তাদের শরীর থেকে অপদেবতাকে বহিষ্কৃত করে দেয়॥

·১২...

পাখির সঙ্গে সাপ সংমিশ্রিত হয়ে যে composite symbol রচনা করেছে, সারা পৃথিবীতে তা একটি ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা এর আগে করেছি।

এই সংমিশ্রণের ফলে, সর্পদংশনের চিকিৎসায় যে মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাতে পাখিকে পাওয়া যায়। মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বলে একেও আমরা পাখির যাদুধর্ম ও যাদুগুণের একটা দিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এতে কোথাও কোথাও আবার পুরোপুরি Sympahetic Magic-কে পাই। যেমন, যেহেতু ময়ূর সাপ খায়, অতএব ময়ূরের দেহ সর্পদংশনের যন্ত্রণা হরণ করতে সমর্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। পাঞ্জাবে সাপ-কাটাকে ময়ূরের পাখা পুড়িয়ে তার গন্ধ শোঁকানো হয়। গরুড় সাপ খায় বলে, গরুড়ের নাম তিনবার উচ্চরবে উচ্চারণ করলে সাপ ভয় পেয়ে দূরে যায়। শকুন মড়া খায়, এবং সাপও বাদ দেয় না। গ্রীসে বিশ্বাস ছিল, শকুনের পালক-পোড়া গন্ধ সাপ সইতে না পেরে দূরে পালিয়ে যায়।

এই বিশ্বাস সম্ভবত ধনেশ পাখিতেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ফলে ধনেশ পাখির লালা সর্পদংশনের ঔষধরূপে বিবেচিত হয়েছে। উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের ওঝা ও বেদেরা এক বিচিত্র উপায়ে ধনেশ পাখির লালা সংগ্রহ করে। প্রথমে পাখিটিকে খুব তাড়া করে। এভাবে তাড়া খেয়ে পাখিটি ক্লান্ত হয়ে যায়। বেদেরা বিশেষভাবে চেষ্টা করে পাখিটিকে কোনো নদী বা জলাশয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে। ক্লান্ত হলে ধনেশ পাখির মুখ থেকে এক ধরণের লালা বের হয়। এই লালা জলে পড়া মাত্রই

তা জমে শক্ত হয়ে যায়। সাপকাটীতে ওই লালা বিশেষ উপকারী বলে ওদের বিশ্বাস। ওঝারা এই উদ্দেশ্যে ধনেশ পাখি ধরেও থাকে।

এই সব দৃষ্টান্তগুলির পেছনে একটিই Homoeopathy কাজ করছে: পাখি সাপ খায় বলে তার দেহ সর্ব দংশনের উপশমকারী হতে পারে।

কিন্তু কালক্রমে এই ম্যাজিকের মধ্যে বিবর্তন এসেছে। যা ছিল সত্যি-সত্যিই প্রয়োগ করা, তা কেবল নমোচ্চারণে ও নামোল্লেখে পর্যবসিত হল। যে পাখির বিভিন্ন অংগ নানা ভাবে সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে বাস্তবিকই প্রয়োগ করা হত, কালক্রমে তা আর না করে, কেবল মন্ত্রের মধ্যে পাখির নাম উল্লেখ করে বিষ অপসারণের প্রয়াস দেখা দিল। অর্থাৎ, পাখির যাদুক্ষমতা তখন এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বাস্তব প্রয়োগও অনাবশ্যক বিবেচিত হয়েছে, নামমাহাত্ম্যেই বিষ অপসৃত হয় বলে বিশ্বাস বলবতী হয়েছে। ক'টি দৃষ্টান্ত দিই।

সাপের ওঝারা গরুড়ের প্রসাদেই রোগীকে সর্প-বিষ-মুক্ত করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এই জন্যে সাপের ওঝাদের 'গারুড়িক', 'গারুড়িয়া', 'গারুড়ী' ইত্যাদি পদবী গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন, মনসা-মঙ্গলের "শংকর গারুড়ী"। মাণিক গাঙ্গুলীর "শ্রীধর্মমঙ্গলে" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-কর্তৃক প্রকাশিত) এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' "গরুড়মণি"র উল্লেখ পাওয়া যায়। এ হলো "মরকতমণি", যা গরুড়তুল্য সর্পভয় নিবারক। গরুড় থেকেই "গারড়ী মন্ত্রে"র সৃষ্টি হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৩০)-র অন্তর্ভুক্ত 'মাঞ্জুর মা' পালাগানটিতে মণির ওঝা-র এই মন্ত্র জানা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

গাডরী মন্তর জানে রে
আরে ভালা কিবা মন্ত্রের ধারা।
পল পাত্যা আন্যা পানি রে
ওরে ওঝা দেয় জল ঝাড়া।

"গারুড়ী মন্ত্র" প্রসঙ্গে পাদটীকায় দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন: "গরুড়ের সাধনা দ্বারা লব্ধ মন্ত্র।"

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার শবর জাতীয় মানুষেরা সাপ নাচিয়ে বেড়ায়। শবরদের মধ্যে চলিত বোড়া সাপের 'আড়াই পটি ঝাড়নে'র মন্ত্রে পাই,

ফিঙ্গা বলে, ফিংগ লো, হেরে দেখ রঙ্গ।
ফিঙ্গার বাপ-ঝিয়ে লেগে গেছে সঙ্গ ॥
ফিঙ্গার বচনে ফিঙ্গি পাতিলেন বিষ।
ভস্ম যারে কালকুট সাপের বিষ ॥
মনসা দেবীর আজ্ঞায় রুং রাং রিং সোহায় ॥

মন্ত্রটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ফিঙ্গের বাপ-ঝিয়ের সঙ্গমের কথা লক্ষণীয়। মনসা মঙ্গলের কাহিনীতেও কন্যার প্রতি পিতার রিরংসার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে সেটি ফিঙ্গে পাখির প্রতি আরোপিত হয়েছে। সাপের বিকল্পে পাখি এসেছে।

সাপের মন্ত্রে বা মনসার আবাহনে পাখির নামোচ্চারণ সীমান্ত বাঙলাতেও (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ধলভূম, সিংভূম) লক্ষ করা যায়। ডঃ সুধীরকুমার করণ তাঁর "সীমান্ত বাঙলার লোকযান" (প্রথম সং ফাল্গুন : ১৩৭১) গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন ও উদাহরণ দিয়েছেন। সীমান্ত বাঙলায় মনসার আবাহন হয় এই মন্ত্রে :

> শুক ডালে শুকনী ডালে
> ডাকে শুকনীর গুণ রে—
> মায় তো হাড়ীর জন্ম
> বাপে তো চণ্ডাল রে। পৃ. ৭৮।

শুক-শুকনী অর্থাৎ শকুন-নকুনী।

সাপের বিষ ঝাড়বার সময় সীমান্ত বাঙলার ওঝারা সর্পাহত ব্যক্তির সর্বাঙ্গে ফুঁ দিয়ে, মন্ত্র আউড়ে, তারপর বলে,

> বগী চরে হেঁটে,
> পানি পড়ে পিঠে।
> যদি বগা কারণ করে
> তিন ভুবনের বিষ আলন করে—
> নাম্ নাম্ বিষ বগার আজ্ঞায় নাম্ ॥ পৃ. ৭৮।

বকের আজ্ঞায় বিষ "আলন করা" (অর্থাৎ নামানো)-র প্রসঙ্গে মনে হয়, গরুড়-শকুনের সঙ্গে বক মিশ্রিত হয়ে গেছে।

উড়িষ্যার ভুঞাদের করম অনুষ্ঠানে, ফসলের প্রাচুর্যের কামনায়, করম গাছের বিবাহ দেওয়া হয় : তারপর সেই পূজা-প্রাঙ্গণে পাখি ও সাপকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়, সাপের মুখ অবশ্য বন্ধ করা থাকে। সাপ ও পাখি উভয়েই উর্বরতার প্রতীক ; এদের যুগ্ম উপস্থিতিতে সেই উর্বরতাকে দ্বিগুণিত করবার জন্যেই এই যাদুকর্মের অনুষ্ঠান করা হয় ॥

·১৩·

পাখি কেবলই যাদুর উপকরণই হয় না, পাখির নিজের সম্পর্কেও অনেক যাদু আছে।

জলপাইগুড়ির এক রাজবংশী ওঝার মুখে একটি মন্ত্র শুনেছিলাম। কোনো পাখিকে বন্দী করতে চাইলে মন্ত্রটি আওড়াতে হবে। অভীষ্ট পাখিটি যখন কোনো

মন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট আছে, তখন নিশ্বাস বন্ধ করে, তিনবার পাখিটিকে প্রদক্ষিণ করতে-করতে মন্ত্রটি বলে যেতে হবে : "ওঁ ভূষং ভূষং নাস্তি স্বস্তি ভূষং দ্রাং দ্রাং"। তা হলেই পাখিটি ওড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং তার ফলে পাখিটি ধরা সম্ভব হয়!

স্কটল্যান্ড এবং ব্রিটেনের উত্তরাঞ্চলে বিশ্বাস আছে, ভরত পাখির ডাকের ভাষা বোঝবার জন্যে, ডাক শোনামাত্রই চিত হয়ে ক্ষেতে শুয়ে পড়তে হয়। যদি একটি সূঁচ তাপ দিয়ে লাল করে নিয়ে ভরত পাখির চোখে ঢুকিয়ে তাকে অন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে সেই ভরত নাকি খুব সুন্দর গান গায়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গোটা ইংলন্ডের সর্বত্র, হাজার-হাজার ভরত পাখি ধরে, এই ভাবে অন্ধ করে, ছোটো ছোটো খাঁচায় করে বিক্রয় করা হতো। শুধু ভরত পাখিই নয়, সঙ্গে অন্যান্য বন্য পাখিও এইভাবে অন্ধ করে বিক্রয় করা হতো। শেষে আইন করে এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বোবা হলেই যেমন কালা হয়, তেমনি অন্ধ হলেই গায়ক হয়, এ বিশ্বাস বহু স্থানে আছে, ভারতেও আছে। "অন্ধ গায়ক" কথাটি ভারতে তো খুবই প্রচলিত ॥

.১৪....

এই অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা পাখির সঙ্গে কুহকবিদ্যার যোগের দুটি দিকের কথা উত্থাপন করেছিলাম : একটি, কাল্পনিক দিক; অপরটি, বাস্তবিক দিক। কাল্পনিক দিকটি কল্পনাময় বলে কিন্তু সর্বৈব অবাস্তব নয়; বাস্তবতার ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত হয়েই উদ্বৃত্ত অংশটুকু কেবল কাল্পনিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই কাল্পনিক যাদু "হলেও হতে পারত" গোছের একটি সত্য; অর্থাৎ, ঠিক এটিই সত্য না হলেও, এই ধরণের যাদু সত্য ও বাস্তব হয়ে থাকে।

এরই ফলে সাহিত্যে যাদুময়তার কথা এসে পড়ে। সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা সাহিত্য থেকে কাল্পনিক যাদুর দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। লোকসাহিত্যের মধ্যে যাদুর প্রভাব সর্বাধিক দেখা যায়,—লোককথায়। এইবার লোককথা থেকে পাখি-বিষয়ক কাল্পনিক যাদুর আলোচনা করে এই অধ্যায় সমাপ্ত করব।

লোককথার নানা Motif-এর মধ্যে একটি প্রধান Motif হল 'রূপান্তর' (Transformation)। কাহিনীর বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার মানবেতর প্রাণী বা অপ্রাণিবাচক সত্তায় রূপগ্রহণই এর প্রধান কথা; বিপরীত ক্রমে, মানবেতর প্রাণী বা অপ্রাণিবাচক সত্তার মানবীকরণও এর মধ্যে পড়ে। রূপান্তর গ্রহণের মধ্যে নায়ক-নায়িকার পক্ষিমূর্তি গ্রহণ বা পাখির মানবমূর্তি গ্রহণ একটি

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এটি আবার হতে পারে দু-ভাবে: প্রথমত, নায়ক-নায়িকা স্বেচ্ছায়, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে পক্ষিমূর্তি গ্রহণ করতে পারে; এতে কোনো জটিলতা বা সমস্যা নেই। দ্বিতীয়ত, নায়ক-নায়িকাকে অভিশাপ দিয়ে, তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তাদের অনিষ্ট সাধনের জন্যে, পাখি করে দেওয়া। স্বেচ্ছায় পক্ষিমূর্তি ধারণের মধ্যে একটি শুভশক্তির খেলা আছে; কিন্তু অপকার সাধনের জন্যে যেখানে পক্ষিমূর্তি জোর করে আরোপ করা হয়, সেখানে স্বভাবতই অশুভ শক্তির অভিভবে কুহকবিদ্যার প্রভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে বলা যায়, Transformation Motif-টির সবটাই যাদু-ঘটিত ব্যাপার।

লোককথার আর একটি বিশিষ্ট Motif হলো "যাদুময় দ্বন্দ্ব" ("Magic Conflict")। এই দ্বন্দ্বে দেখা যায়, Transformation বা "রূপান্তর" গ্রহণ কালে পর-পর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুর রূপ ধারণ করা হচ্ছে। আমরা কেবল পাখির কথা বলছি। যেমন, রঙপুর থেকে সংগৃহীত "গোপীচন্দ্রের গানে" (তৃতীয় সং, ১৯৬৫: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। মানিকচন্দ্র রাজার প্রাণ হরণ করে যখন গোদা যম চলে যাচ্ছে, তখন রানী ময়নামতী তাকে তাড়া করে। দু'জনেই পর-পর ক্রমান্বয়ে রূপান্তর গ্রহণ করে যাদুময় দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে থাকে। যেমন, যখন "কইতর হৈয়া গোদা যম সগুগে উড়াইল", তখন ময়নামতী—"লক্ষ গণ্ডা হাড়িয়া বাজ হৈল কায়া-বদলিয়া।' গোদা যম সরষে হল, ময়না তখন "লৈক্ষ গণ্ডা ঘুঘু-কৈতর হৈল।" গোদা যম পুঁটি মাছ হলো, ময়না "লক্ষ গণ্ডা জটিয়া বক" হয়ে তা খেয়ে ফেলল। গোদা যম "টোরা গোছি মাছ" হল, ময়না তখন "লক্ষ গণ্ডা পানকৌড়ি বানোয়ার" (=মৎস্যজীবী পাখি বিশেষ) হলো। আরব্য উপন্যাসের মধ্যেও এই Magic conflict-এর চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা সে দৃষ্টান্ত তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদের একেবারে শেষে দিয়েছি।

ছয়খণ্ডে সম্পূর্ণ 'Motif index of folkliterature' বইতে স্টীথ থম্পসন 'Transformation'-এর বিভিন্ন দিক লক্ষ করেছেন।

লোককথায় অনেক সময়েই দেখা যায়, রাক্ষসী বা শয়তানী পক্ষিরূপ ধারণ করেছে স্বেচ্ছায়। ওই পাখিটিই তার Life index বা Life token. পাখিটির মৃত্যুই তার মৃত্যুর সূচক। এমন কি, পাখিটির যে অঙ্গ বিকৃত বা কর্তিত হয়, ওই রাক্ষসী বা শয়তানীরও সংশ্লিষ্ট অংগাদি কর্তিত বা বিকৃত হয়। এই প্রসঙ্গে সিংহলে প্রচলিত এক বিশেষ ধরণের মন্ত্রের কথা বলা যায়। DR. O. Pertold তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে (A study of Sinhalese Magic : The Journal of the Anthropological Society of Bombauy : Vol. XII, No 5, PP. 594-609) এ বিষয়ে মনোরম আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সিংহলের "পিল্লি" মন্ত্র এক প্রধান ও প্রখ্যাত মন্ত্র। মোট আঠারো রকমের "পিল্লি" মন্ত্র আছে। এক-একটি

"পিল্লি" মন্ত্রের শক্তিতে রাক্ষসেরা এক-একটি রূপাকৃতি গ্রহণ করতে পারে। তার মধ্যে দু'টি পাখি-ঘটিত।

১. Koli pilli : রাক্ষস এখানে মুরগীর আকৃতি ধারণ করে ;

২. Garunda pilli : রাক্ষস এখানে ময়ূরের আকৃতি ধারণ করে।

লক্ষ করা দরকার, লোককথায় রাক্ষস-রাক্ষসীরা যে পাখির ছদ্মবেশ ধারণ করে, তা নিতান্তই কল্পনার জগতের এক অবাস্তব ধারণা মাত্র ; কিন্তু সিংহলে চলিত "পিল্লি" মন্ত্রের ফলে যে ছদ্মরূপ ধারণের কথা বলা হয়েছে, তা আজও বাস্তব জগতে সম্ভব বলে বিশ্বাস করা হয়।

'গরুড় পিল্লি'র সঙ্গে বাঙলা দেশের "গারুড়ীমন্ত্রের" তুলনা করা যেতে পারে।

লোককথায় পাখির কথা বলা ; নায়ক-নায়িকাকে বিপদে সাহায্য ও পরামর্শদান ; মৃতের প্রাণদান ; প্রার্থীকে ধন-রত্ন ও রাজ্য প্রদান ; পাখির প্রতিকৃতি-অঙ্কিত সাজ পোশাক পরবার ফলে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, —ইত্যাদি বহু ব্যাপারে যাদুর দিকটি ধরা পড়ে।

William Crooke তাঁর 'Things Indian' (London : 1906) বইটিতে মারাঠা-নায়ক শিবাজী এক ডাইনীর দ্বারা কি ভাবে ভীত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন (PP. 519-520)। ঘটনাটিকে বলা যায়, এক ব্যক্তির জীবনের প্রতীক রূপে অপর এক ব্যক্তি হয়ে ওঠা, একের আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরের দেহে সংযুক্ত হয়ে যাওয়া। ডাইনীটি একটি মোরগ ও একটি মুরগী এনে, মুরগীটির গলা মুচড়ে দিতেই আপনা থেকেই মোরগটিরও গলা মুচড়ে গেল। ডাইনীটি জানাল, মুরগীর মৃত্যু যেমন মোরগের মৃত্যুর কারণ হল, তেমনি, ওই ডাইনী স্ত্রীলোকটির মৃত্যুও শিবাজীর মৃত্যুর কারণ হবে। শিবাজী ভীত হয়ে স্ত্রীলোকটির সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ॥

দশম অধ্যায়

পাখি : শুভাশুভ

১....
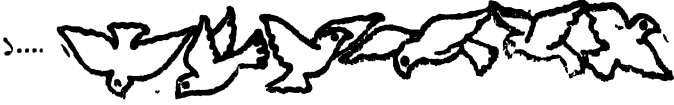
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাখিকে অবলম্বন করে নানা লিখিত ও মৌখিক শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। পাখিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল 'শকুন বিদ্যা' বা 'শকুন শাস্ত্র' বা 'শাকুন'-এর। 'কথাসরিৎ-সাগরে (অনুবাদ : মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির : দ্বি. সং, ১৮২৫ শকাব্দ। দুই খণ্ড) 'শকুনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা'র কথা (১২৪. ১১১) বলা হয়েছে। যিনি এই শাস্ত্রে পারঙ্গম, সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে 'শকুনজ্ঞ' (৩১.৫৩)। শকুনিকুশল ব্যক্তিকে পাণিনিতে (৫.২. ৬৪) বলা হয়েছে 'শাকুনিক'।

'শকুন' শব্দের অর্থ একদা ছিল : যে "দূরগমনে সমর্থ" ; যে "দূরদর্শনে সমর্থ" ; গৃধ্র বা শকুনের এই ক্ষমতা আছে বলে কল্পিত হত। যেহেতু সে দূরগমনে ও দূরদর্শনে সমর্থ, অতএব সে দীর্ঘদর্শী ও প্রাজ্ঞ, অজানা ভবিষ্যৎ তার কাছে পূর্বাহ্নেই পরিচিত হয়ে যায়। এই বিশ্বাস থেকেই এই শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

কয়েকটি শব্দের ব্যবহার থেকে মনে হয়, প্রথম-প্রথম পাখি কেবল শুভলক্ষণগুলিই জানাত, অশুভলক্ষণ যেন এ শাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল না। 'কথাসরিৎ-সাগরে' (৩২.৪৭) 'শকুন' বলতে 'শুভশংসী নিমিত্ত,' 'শুভলক্ষণ'-কে বোঝানো হয়েছে। মাঘের 'শিশুপালবধে' (৯.৮৩) 'অ-শকুন' শব্দ থেকে মনে হয়, 'শকুন' বলতে কেবল শুভ-নিমিত্ত'কেই বোঝাতো। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় (৮৬.৫) অবশ্য শুভ ও অশুভ উভয় প্রকার ফলসূচক পাখিদের 'শকুন' বলা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় 'শকুন' দু'ভাগে বিভক্ত : 'সু-শকুন' (good omens) এবং 'কু-শকুন, (ill omens)। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "শিশুপালবধে"র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "অ শকুন" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

শাকুনিকগণ 'শকুনিবাদ' অর্থাৎ বিভিন্ন পাখির কণ্ঠরব থেকে মূলত মানুষের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের ইঙ্গিত আকর্ষণ করতেন। কালক্রমে "শকুনশাস্ত্রের" পরিধি বেড়ে গিয়ে, পাখি ছাড়া অন্যান্য পশুরও লক্ষণ ও রব থেকে শুভাশুভ নিষ্কাশনের প্রথা এসে যায়। 'বৃহৎসংহিতা'র মন্নবতিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে একটি শব্দ

মেলে 'রুতজ্ঞ'। 'রুত' শব্দের অর্থ হল—ধ্বনি, শব্দ, রব। পশুপাখির রবমাত্র শুনেই যিনি শুভাশুভ নির্ণয়ে সমর্থ হতেন, তাঁকেই বলা হত "রুতজ্ঞ" বা "রুতবেত্তা"।

কালক্রমে আরো বিবর্তন ও পরিবর্তন এলো। কেবল পশু-পাখির রবমাত্রই নয়, তার অন্যান্য আচরণও শুভাশুভের ফলসূচক হয়ে উঠল। পশু-পাখির রব ও অন্যান্য আচরণ শুভাশুভের কারণ বা হেতু বলে ওই সব লক্ষণাদিকে বলা হত "নিমিত্ত"। সেই নিমিত্তাদি যিনি 'পাঠ' করতে অর্থাৎ বিচার করতে সক্ষম, তাঁকে বলা হত 'নিমিত্তপাঠক,' বা 'নৈমিত্তিক' বা "নিমিত্তশাস্ত্রাধ্যেতা"। "বৃহৎসংহিতা"র পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের ৬০-সংখ্যক শ্লোকে "নিমিত্ত" বলতে 'মূলশকুন' বা "প্রথম দৃষ্ট শকুনে"র কথাও বলা হয়েছে। "নিমিত্ত"ও "সুনিমিত্ত" এবং "দুর্নিমিত্ত" এই দু'ভাগে বিভক্ত। 'শকুনবিদ্যা' বা 'নিমিত্তজ্ঞান'-কে প্রাচীন ভারতে চৌষট্টি কলার মধ্যে চতুর্বিংশতি স্থান দেওয়া হয়েছে।

পাখি থেকে পাখির দেহ বিশেষের মধ্যে এ শাস্ত্র কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। তাই পাখির হাড় ও পালক এবং অন্যান্য অঙ্গ অতঃপর শুভাশুভ নির্ণয়ের অবলম্বন হয়ে ওঠে। চীনের নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাখির হাড় দিয়ে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্যে চীনের 'Bone culture' আজ বিশ্ববিখ্যাত বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

ইউরোপেও প্রাচীন কাল থেকে এ শাস্ত্র পরিচিত ছিল। ইংরেজিতে একে বলে 'Ornithomancy' বা 'Augury'। প্রসঙ্গত 'Auspice' এবং 'Omen' শব্দ দু'টিও লক্ষণীয়।

"Strictly speaking, augury should be limited to the observation of auspices (Latin avis, bird, and specia, view) but commonly it is applied to divination in general, since the Roman augurs themselvs used other omens than thosc from birds. The most usual omen birds are the crow or raven, and the hawk or eagle ..—Standard Dictionary of Folklore Legend and Mythology (New york, 1949), P. 90-91.

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, ভারতবর্ষে যেমন 'শকুনবিদ্যা' মূলত পাখিকে অবলম্বন করে অবশেষে তার পরিধি প্রসারিত হয়ে যে-কোনো পশুতে গিয়ে ঠেকেছে, ইউরোপেও তাই। এতে পাখির গুরুত্ব বেড়েছে বই কমে নি। দ্বিতীয়ত, রোমানদের মধ্যে এই শাস্ত্রের প্রচলনের কথাও স্পষ্ট। পক্ষিলক্ষণ দেখে যাঁরা শুভাশুভ নির্ণয় করতেন, রোমান ভাষায় তাঁদের বলা হত 'Auspex'। প্রাচীন রোমান স্মৃতি ইংরেজী শব্দ 'Auspice' শব্দের মধ্যে সঞ্জীবিত আছে।

জীবনজী জামসেদজী মোদী তাঁর একটি প্রবন্ধে (Journal of the

দল বেঁধে কোনো বন ছেড়ে চলে যায়, তবে দেশে বড়ো রকমের দুর্ভিক্ষ বা মহামারী ঘনিয়ে আসে। নর্স সংস্কৃতি ও পুরাণে দাঁড়কাক দেবতা ওডিন-এর সহচর ও সংবাদ-দাতা। নানা দেশের 'শ্রমণ' (The shamans) ওঝারা কাককে, বিশেষত দাঁড়কাককে, বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন।

এই সব কারণেই কাকেই সঙ্গে শুভময়তা জড়িত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমেই এলো কাক সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব। এই বিরূপ মনোভাবের বিশেষ প্রমাণ মেলে কাকের গাত্রবর্ণ সম্পর্কে নানা কাহিনী-কিম্বদন্তী সৃষ্টিতে। লোকমানসের প্রতীক চেতনাও এতে প্রকাশিত হয়েছে। শ্বেত বর্ণ শুভবস্তুর এবং কৃষ্ণ বর্ণ অশুভত্বের প্রতীক, এই বোধ এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশেই তাই এই কাহিনী চলিত আছে: কাক পূর্বে শ্বেত কাকই ছিল. বিশেষ অপরাধ বা অন্য কোনো কুকর্মের জন্যেই সে কৃষ্ণকায় হয়েছে। অ্যাপোলোর সহচারী রূপে, ওডিনের সহকারী রূপে কাক শ্বেত-কায়ই ছিল। কাক সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবেই জন্যই নোয়ার 'আর্ক' থেকে প্রেরিত কাককে কর্তব্যবিস্মৃত হীন প্রাণিরূপে চিত্রিত করে, অভিশাপগ্রস্ত কৃষ্ণকায় পাখি রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। অথচ, কাক সম্পর্কে একদা যে উচ্চ ধারণা ছিল, নোয়া-কর্তৃক কাককে প্রেরণ করাই (এবং কাককে এর মাধ্যমে নবতর সৃষ্টিকার্য করতে বলা) তার বড়ো প্রমাণ। নইলে কাককে প্রেরণ করাই হত না, বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে। সপ্তদশ শতকের শেষেও তাই আয়র্ল্যাণ্ডে বিশ্বাস ছিল, শ্বেতপক্ষ দাঁড়কাক কারো ডান হাতের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় যদি ডেকে ওঠে তবে তা মঙ্গলসূচক হয়। কিন্তু ভারতে কাকের শুক্লতা অশুভ।

কাকের এই বর্ণ-ভেদ যেমন তার শুভ-অশুভ, উন্নত ও অধঃপতিত দুই বিপরীত অবস্থা ও মনোভাবের সূচনা করে, তেমনি তা দিক-ভেদেও প্রসারিত হয়েছে: কাক ডানদিকে ডাকলে এক ফল, বাঁয়ে ডাকলে অন্য; ঊর্ধ্বমুখে; সম্মুখে, পশ্চাতে; আট দিকের বিভিন্ন দিকে,—যতো রকম ভেদ সৃষ্টি করতে পারা যায়, মায় দণ্ড-প্রহর-ক্ষণ, তার সবগুলিই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ভেদ দুই ভিন্ন মনোবৃত্তির সূচক। যেমন গুজরাটে কাকের বাঁ দিকে ডাকা সুলক্ষণ, কিন্তু দক্ষিণ মুখে ডাকা কুলক্ষণ। দক্ষিণ দিকে যমের দুয়ার কল্পিত হয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোথাও-কোথাও যাদুবোধ। বহু স্থলেই তা Homoepathic magic' বা 'Imitative magic'-এর উদাহরণ এবং এ ক্ষেত্রেও লোকমনস্তত্ত্বই ক্রিয়াশীল। যেমন, শুকনো ডালে বসে কাক ডাকলে তা নিষ্ফলতা ও অকল্যাণের প্রতীক বলে গ্রহণ করা, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে ইউরোপে একই মনোবৃত্তির প্রকাশ, যেহেতু শুকনো ডালে ফুল ফলে না, ফল ধরে না, অতএব সেই বন্ধ্যাত্বই এখানে নিষ্ফলতা ও অকল্যাণের সূচক হয়ে উঠেছে।

কাকের সংখ্যাও লক্ষণীয় এখানে। একটি বা নিঃসঙ্গ কাক প্রায় সর্বত্রই দুঃখ,

নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও অকল্যাণের সূচক, এবং তার থেকে যে কোনো বেজোড় সংখ্যার তা সঞ্চারিত ; অথচ, দুই বা জোড় সংখ্যক কাকের মধ্যে দুই ভাবের বৈপরীত্য সূচিত করে। সংখ্যার মধ্যেই এখানে যাদুশক্তি অনুভব করা হয়েছে বটে, কিন্তু এর একটি বাস্তব দিক আছে, এবং আসল Homoeopathic যাদুটা সেইখানেই : একটি নর বা নারী সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি একটি কাকও কোনো সুফল 'প্রসব' করতে পারে না, এখানে সেই বোধটি কার্যকরী হয়েছে। এই জন্যেই প্রত্যুষে জোড়া কাক দর্শন শুভ।

মহারাষ্ট্রে আবার বিপরীত নিয়ম : "It is a great sin, in the eyes of a Maratha, to see a couple of crows sitting together". (Notes on Maratha Folklore : The Indian Antiquary : November, 1891, p. 308 : Y. S. Vavikar). কিন্তু এখানে জোড়-সংখ্যক কাককে অন্য দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। কাকের রতিক্রিয়া দর্শন অন্যায় ও অশুভ, এই বোধ এখানে কার্যকরী হয়েছে। লোকমানস কতো বিচিত্র ভাবে কাজ করে, এ উদাহরণ থেকে তা বোঝা যায়।

নানা প্রকার মন্ত্র, ঔষধ, ইন্দ্রজাল ইত্যাদির প্রসঙ্গেও কাক সম্পর্কে দুই বিরুদ্ধ মতবাদ মেলে। একদিকে কাকের প্রতি প্রীতি-পরায়ণ হলে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি তার দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পায়, এখানে কাকের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব ; অপর দিকে, কাককে অশুচি-অপবিত্র বলে মনে করে নানা কাহিনী-সৃষ্টি। যেমন, মধ্য ভারতের গোঁড়দের (রেওয়া ষ্টেটের) মধ্যে চলিত একটি কাহিনীতে : রাহা বেদেনী নামে এক স্ত্রীলোকের গাত্রমল-জাত মন্ত্রপূত একটি কাক অকালে সকাল ঘোষণা করে চিরকালের জন্যে অশুভ পাখিতে পরিণত হয়েছে (Myths of Middle India, 1959 : V. Elwin : p. 187-188).

কাকের শুভময়তার সংগে যাত্রা, গমনাগমন বিশেষভাবে জড়িত। বিভিন্ন সময়ে ও ভংগিতে কাকের ডাক কি ভাবে মংগলামংগলের নির্দেশ দেয়, তার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। যাত্রা থেকে 'আগমনে' ভাবটি বিবর্তিত হয়ে, 'আগমন' থেকে 'অতিথি'র প্রসংগ এসে গেছে তাতে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাকের মংগলময়তা। অতিথি এদেশে শ্রদ্ধার্হ ও মাননীয়, তিনি দেবতুল্য। দেবতার গৃহাগমন শুভ। এই ভাবে কাকের রব বিশেষ ক্ষেত্রে অতিথির আগমন সূচনা করে।

'অতিথি'র প্রসংগটি এক দিনেই এসে পড়ে নি। কাকের শিশুকে আহারদান গৃহস্থের ভবিষ্যৎ সন্তানের আগমন সূচনা করে। আদিম সমাজে কৃষিকাজ ও শিকারের জন্যে জনবলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এই জন্যে সন্তানের আগমন এক বিশেষ আনন্দের ও মংগলের ব্যাপার বলে গণিত হত। সন্তান প্রতিদিন আবির্ভূত হয় না, অতএব জনবলের জন্যে অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনের ওপর নির্ভর করতে হতো ; অতঃপর গৃহাগত অপরিচিত জনও পরিজন হয়ে উঠেছে। এই ভাবে কাকের ডাক আত্মীয় ও অতিথির আগমন-সূচক হয়ে উঠেছে।

একদিকে কাক-কর্তৃক মঙ্গলময় আত্মীয়-পরিজনের আগমন-সংবাদ ব্যক্ত করা, অপরদিকে স্বয়ং সেই কাকেরই গৃহে আগমন পরম অমঙ্গলময় বলে বিবেচনা করা।

কাকের এই শুভময়তার জন্যেই বিশ্বাস আছে,. কাক কারো মুখের সম্মুখে এসে ডাকলে বাড়িতে আত্মীয়-অতিথি আসে ; মালদহের মুসলমান সম্প্রদায়ে বিশ্বাস আছে, কাক যদি বাড়িতে লাফালাফি ডাকাডাকি করে তবে কুটুম্ব-পরবাসীর আগমন হয়। কাকের ভরাট ও পূর্ণ কণ্ঠস্বরে অতিথির আগমন ঘটে বলে বোম্বাইয়ের পারশী সম্প্রদায়েরও বিশ্বাস। মধ্যভারতের 'চেরো'রা বিশ্বাস করে, দরজার সম্মুখে কাক বসলে কেউ একজন বাড়িতে আসে। গুজরাটে আবার কেবল স্ত্রী-কাকের ডাকের ফলেই এটি ঘটে বলে মনে করা হয়।

'পূর্ণনদী জাতক' (সং ২১৪)-টি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। রাজপুরোহিত বোধিসত্ত্বকে বিতাড়িত করে দিয়ে বারাণসী-রাজের খুব অনুতাপ হল। তিনি বোধিসত্ত্বকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কাকের মাংস রান্না করে একটি সাদা কাপড়ে তা ঢেকে, তাতে রাজমুদ্রিকা এঁকে, গাছের পাতায় একটি গাথা রচনা করে বোধিসত্ত্বের কাছে তা পাঠালেন। বোধিসত্ত্ব এ পেয়ে বুঝলেন, রাজা আবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন ; কেননা, কাক প্রিয়জনের আগমন সূচনা করে। এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যেও বিরোধকে অন্বেষণ করা যায় : কাক কেবল মৃত স্বজনেরই দুঃখজনক সংবাদ বহন করে না, জীবিতাবস্থায় তাকে উপস্থিত করতেও পারে।

অপরদিকে, স্বজনাগমনের শুভসংবাদ বহনকারী সেই কাকই যদি স্বয়ং গৃহে প্রবেশ করে, তবে মারাঠারা গৃহ অপবিত্র ও অশুচি হল বলে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে থাকে।

যা কিছুই অস্বাভাবিক, লোকমানস তার ওপরেই একটা-না-একটা বিশেষত্ব বা গুরুত্ব আরোপ করে বসে। কৃষ্ণকায় কাক দেখতেই তারা অভ্যস্ত, অতএব শ্বেতকায় কাক হয় খুব শুভ, নয় খুব অশুভ, দুই বিপরীত কোটিতে এই মন সঞ্চারিত। কাকের স-বিরাম ডাকের মধ্যে তেমন কিছু নেই, অবিরাম ডাকের মধ্যেই যতো ভালো-মন্দ ॥

কাক সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলো করা হল, তা অল্পবিস্তর প্রায় সব পাখি সম্পর্কেই খাটে। তবে, কয়েকটি পাখী সম্পর্কে এই বিরুদ্ধ ও বিপরীত সংস্কারের প্রাবল্য অনুভূত হয়ে থাকে। এবার সে রকমের ক'টি পাখির কথা বলি।

শকুনশাস্ত্রে কাকের পরেই উল্লেখযোগ্য হল প্যাঁচা। প্যাঁচার প্রসঙ্গে 'বৃহৎ

সংহিতায় বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। 'পিঙ্গলা' নামে বিহারে এক ধরনের প্যাঁচা দেখা যায়, সংস্কৃতে একেই বলা হয়েছে 'পিঙ্গলাক্ষ'। পিঙ্গলার রব সম্পর্কে একটি সংস্কৃত শ্লোক এই ঃ

উল্লাসঃ কিল্বিলে চৈব চিলপিল্যা ভোজনং তথা।
বন্ধনং খিটিখিট্টিস্যাক্কুর্কুর্শব্দৈর্মহদ্ভয়ং ॥

এর হিন্দী ভাষ্যে পেয়েছি ঃ যাত্রাকালে পিঙ্গলার 'কিল-বিল' শব্দ হলে ভোজন প্রাপ্তি ; 'খিট খিট' শব্দ হলে বন্ধনভয় এবং 'কুর্ কুর্' শব্দ হলে মহাভয়ের সূচনা করে থাকে। পশ্চিম ভারতের কোঙ্কণ অঞ্চলেও পিঙ্গলার 'বিল্‌বিল্' 'চিল্‌বিল্' ও 'খিট্ খিট্' রব থেকে নানা অর্থ গ্রহণের প্রথা আছে। একটি মাত্র পিঙ্গলার ডাক গৃহে মৃত্যুর সূচনা করে বটে, কিন্তু একজোড়া পিঙ্গলার ডাক মঙ্গলজনক বলে মনে করা হয় (Folklore of the Konkon : The Indian Antiquary, 1914 (Supple, pp. 58-59)।

কাকদের মধ্যে দাঁড় কাক ও পাতিকাকের যে ভেদ লক্ষ করা হয়েছে, প্যাঁচার মধ্যেও তেমনি : লক্ষ্মীপ্যাঁচা, হুতোম প্যাঁচা, কালপ্যাঁচা ইত্যাদি। এদের মধ্যে লক্ষ্মীপ্যাঁচা সর্বত্রই শুভ, নামের মধ্যেই তার পরিচয় আছে। লক্ষ্মীপ্যাঁচার স্বেচ্ছায় কারো গৃহে আগমন ধন-সম্পদের দিক থেকে শুভ ; জোড়ে এলে শুভতর। জোড়-সংখ্যক পাখির শুভময়তা সর্বত্রই দেখা যায়। হুতোম প্যাঁচা বা ভৌতিল পাখি (২৪ পরগণা) সর্বদাই অশুভসূচক, মৃত্যুর সূচনা করে থাকে। বসন্তকালে হুতোম প্যাঁচার কান্না সর্বপ্রথম শুনতে পেলে সিসিলির ক্ষেত-মজুররা মনিবের কাছে গিয়ে জবাব দিয়ে আসে। এ পাখি কোনো বাড়িতে এসে ডাকলে সে বাড়ি পরিত্যাগ করতে হয়। যথার্থই যে কেউ-কেউ পরিত্যাগ করেছেন, এমন খবর পাওয়া গেছে। বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, হুতোম-হুতোমনী নিজেরা বসবাস করবার জন্যে বাড়িটা চায়, তাই এসে ডাকাডাকি করে।

কিন্তু কালপ্যাঁচা সম্পর্কে বিরুদ্ধতা দেখা যায়, যা লক্ষ্মীপ্যাঁচা বা হুতোমপ্যাঁচা সম্পর্কে লক্ষ করি না। শেষোক্ত দু'টি পাখি হয় শুভ, নয় অশুভ, শুভাশুভের সংমিশ্রণ সেখানে নেই। তা আছে কালপ্যাঁচা সম্পর্কে।

একটি ইংরেজী লোকসঙ্গীতে প্যাঁচাকে 'রাজকন্যা' বলা হয়েছে, ঈশপের একটি গল্পেও এ কথা বলা হয়েছে। জাতকে, কথা-সরিৎসাগরে প্যাঁচাকে রাজারূপে সাময়িক ভাবে নির্বাচিত হতে দেখা গেছে। একটি ইংরেজী ছড়াতে পাচ্ছি ঃ "Of all the gay birds that e'er I did see, / The owl is the fairest by far to me...এগুলো প্যাঁচা সম্পর্কে ভালো ধারণার পরিচায়ক। এথেন্সের জ্ঞানদেবী এথেনার প্রিয় পাখি ছিল প্যাঁচা, কারণ, প্যাঁচা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে কল্পিত হয়, সে অন্ধকারেও দেখতে পায়। অজ্ঞতার অন্ধকারে সে প্রজ্ঞাময় দৃষ্টিবান্। এথেন্সে প্যাঁচা পবিত্র পাখি বলে পরিগণিত হত তাই। কোনো-কোনো উপজাতি প্যাঁচাকে

রাত্রির রক্ষক বলে মনে করে থাকে। প্যাঁচা তাই "A bird of wisdom"। প্যাঁচা যদি অলস, নিষ্ক্রিয় ও জড় ভঙ্গিতে গৃহ-ছাদে না বসে সচেষ্ট ও সক্রিয় ভঙ্গিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বসেই উড়ে যায়, তবে অচিরে গৃহে আত্মীয় কুটুম্বের আগমন ঘটে। এখানে Homoepathic magicটি হল,—প্যাঁচার দীর্ঘক্ষণ ধবে জড় ভঙ্গিতে বসা মৃত্যুর নিশ্চলতার প্রতীক, সেই জন্যই প্যাঁচা মৃত্যুর সূচক বলে কথিত। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য বসা এবং তা সচেষ্ট-সক্রিয় ভঙ্গিতে, সেটা জীবন্ত সত্তার প্রতীক। আগেই বলেছি, মৃত্যু-সংবাদের বিপরীতে অতিথিকে মেলে, নিষ্ক্রমণের বিরুদ্ধে যেন প্রবেশ। যাওয়ার বিপরীতে আসা। তেমনি, শীর্ণকায় প্যাঁচার গৃহছাদে উপবেশন বাঙলাদেশে মঙ্গলজনক বলে গৃহীত হয়।

কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই প্যাঁচার প্রতি বিরূপ মনোভাবকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। পৃথিবীর সব দেশে প্যাঁচার ডাক মরণকে স্মরণ করায়। এর পেছনেও সেই একই যাদুবোধ: প্যাঁচা যেহেতু শূন্য, নির্জন, পরিত্যক্ত স্থলে থাকে এবং নক্তচারী, সেই হেতুই সে মৃত্যুর বিষাদের সঙ্গে জড়িত। প্যাঁচার নীড়ের দিকে যে দৃষ্টিপাত করে, জীবনে সে বিপদগ্রস্ত অবস্থাতেই থাকে বলে হেশোয়ারে কথিত হয়। বাঙলাদেশ, ভারত এবং আরব, পারশ্য ও ইজিপ্টে সর্বত্র বিশ্বাস আছে, গর্ভস্থ শিশু বা সদ্যপ্রসূত শিশুকে প্যাঁচা হত্যা করে ফেলে। এর ঠিক বিপরীতেই পাই, Buriatরা শিশুদের রক্ষা করবার জন্যে গৃহে পোষা প্যাঁচা রাখে! পারশ্যে এ পাখি বহুদিন ধরেই অলক্ষুণে বলে বিবেচিত হয়ে আসছে, এবং তার সমর্থনে গল্পাদিও সেখানে রচিত হয়েছে।

গ্রীসে যেমন প্যাঁচা পবিত্র, রোমে তেমনি অপবিত্র ও অশুভ পাখি। ইউরোপেও অশুভ পাখি। ইউরোপ ও আমেরিকাতে সাধারণভাবে প্যাঁচা এক অলক্ষুণে অশুভ পাখি। নিশাচর প্যাঁচাকে দিবসে দর্শন করা পরম অশুভ বলে স্কটল্যাণ্ডে মনে করা হয়, যেমন দিবসচারী কাককে রাতের বেলায় ডাকতে শুনলে। সময়গত অস্বাভাবিকতা এই অশুভময়তার কারণ।

'The Science of Folklore' (Methuen and Co, ltd : Reprint : 1962) বইতে A. H. Krappe একটি প্রশ্ন তুলেছেন: প্যাঁচা সম্পর্কে সংস্কার-বিশ্বাসাদি ইউরোপে কেল্ট ও টিউটনরা মধ্য যুগীয় গ্রন্থাদি থেকে নিয়েছে, না নিজেরাই সৃষ্টি করেছে, তা ভেবে দেখা দরকার। আমার কাছে এ প্রশ্নের উত্থাপনা অবান্তর ও অর্থহীন বলে মনে হয়। প্যাঁচা সম্পর্কে তাবৎ বিশ্বের সংস্কার-বিশ্বাসাদির সামান্য পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, সেগুলো কেল্ট-টিউটানিক সংস্কৃতির সৃষ্টি নয়, এবং মধ্যযুগীয় গ্রন্থাদিতে যে সংস্কারগুলো আছে, নিখিল বিশ্বের লোকমানসেও তা আছে।

যেমন, একটি উদাহরণ দিই: রোমে দিনের বেলায় হঠাৎ করে কোনো গৃহে বা গৃহের ছাদে প্যাঁচা বসলে তা রীতিমতো ধোয়া-মোছা করা হত; এমন কি, শোনা যায়, অ্যাসিড দিয়েও সে অপবিত্র স্থান ধোয়া হত। ধৃত হলে এ পাখি পুড়িয়ে তার ছাই

নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। একই ব্যাপার ভারতে এখনও দেখা যায়: পশ্চিম ভারতের কোঙ্কণে গৃহে বা গৃহের ছাদে পঁ্যাচা বসলে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও প্রায়শ্চিত্তাদি অবশ্যই করতে হয়, না করলে পরিবারের ওপর সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসে বলে মনে করা হয়।

মহারাষ্ট্রীয়রা পঁ্যাচার দর্শন দূরে থাক, রব শ্রবণকেই অ-মঙ্গলজনক বিবেচনা করে। রাজপুতনার অন্তর্গত কোটা-র জালিম সিং তাঁর প্রাসাদ পরিত্যাগ করে তাঁবুতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন, কেবলমাত্র এই কারণেই যে, তার ছাদে পঁ্যাচা ডেকেছিল। 'Things Indian' (London : 1906) বইতে উইলিয়ম ক্রুক এ সংবাদ দিয়েছেন (p. 352)। ঋগ্বেদে (১০. ১৬৫. ৪) উলূকের রব অমঙ্গলসূচক। বাজসনেয়ি সংহিতায় (২৪. ২৩. ৩৮) 'নির্ঋতি' অর্থাৎ অমঙ্গলের প্রসঙ্গে উলূকের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

কোঙ্কণের নিকটবর্তী 'চৌক' নামক স্থানে পঁ্যাচার মধ্যে এক অশরীরী 'আত্মা'কে লক্ষ করা হয়। 'উম্বার গাঁও' নামক স্থানের লোকেরা পঁ্যাচার উদ্দেশে কখনই ঢিল ছোঁড়ে না। তারা মনে করে, ঢিল ছোঁড়া হলে পঁ্যাচা গিয়ে ওই ঢিলটার ওপর বসে বা গা ঘষে দেয়। তারপর দিনে-দিনে ওই পাথরের মতোই ঢিল নিক্ষেপকারীর দেহ শীর্ণ ও শুষ্ক হতে থাকে। এ পুরোপুরিই ম্যাজিক, সহজেই তা বুঝি। কিন্তু এতে আরো একটি দিক আছে: পঁ্যাচা-হত্যা সম্পর্কে taboo ; এই tabooই কি প্রমাণিত করে না, পঁ্যাচা একদা দেবতার স্তরের বা উন্নত ও সম্মানিত এক স্তরের পাখি ছিল? এই জন্যেই কি জাতুমানকে বিনাশ করবার উদ্দেশে অথর্ববেদে (৮. ৪. ২২) উলূকের স্তুতি আছে?

চিল, শ্যেন, শকুন, ঈগল ইত্যাদি শিকারী ও হিংস্র পাখি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই অধিক, এবং সেই হেতু এদের সঙ্গে অকল্যাণকে সহজেই যুক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু বিপরীত ব্যাপার এখানেও আছে।

চিলের মধ্যে গোদাচিল বা ডোমচিল সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব থাকলেও শঙ্খচিল বা চণ্ডীচিল বা ঠাকুরচিল বা মদনচিল বা 'ফতা' চিলকে মঙ্গলকারী শক্তিরূপে ভক্তিমান্য করা হয়। 'মা শঙ্খেশ্বরী' বলে এদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করা হয়। এই চিলের সঙ্গে মঙ্গল ও কল্যাণ নানা ভাবে যুক্ত। যেমন দর্শনজাত মঙ্গল ও অমঙ্গল . পূর্ব-বঙ্গে বিশ্বাস আছে, 'মদনচিলে'র বুক দেখলে সেদিন সুখাদ্য জোটে। মাদ্রাজে কাকের সঙ্গে চিলের দিক-বৈপরীত্য দেখা যায়। কাককে বাঁ দিকে এবং শঙ্খচিলকে ডান দিকে দেখা সেখানে অশুভ বলে বিবেচিত হয় (The Indian Antiquary : January, 1876 : p. 23)। কানাড়ী ও তেলেগু ভাষাতে শঙ্খচিলকে পৌরাণিক 'গরুড়'ই বলা হয়। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুদের কাছে সকালবেলায় প্রথমেই এ পাখি দর্শন, বিশেষত রবিবার দিন, বিশেষ শুভজনক। শুভত্ব অর্জন করবার জন্যে, গরুড়ের দর্শন মিলবেই এমন স্থানে, তা দূরবর্তী হলেও, অনেকে সেখানে হেঁটে চলে যায়। গরুড়

বিষ্ণুর বাহন এবং পাখিটির সংগে কৃষ্ণের আসংগ আরোপিত হয়ে থাকে বলে একটি ধর্মীয় আবরণ এসে পড়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। রবিবার দিনটির গুরুত্বের কথা মনে করে এতে সূর্যকেই প্রাধান্য দিতে হয়। উড়িষ্যাতেও চিল দর্শন শুভফলদায়ক।

কোনো স্থানে যাত্রাকালে বা যাত্রাপথে মাথার ওপর দিয়ে শঙ্খচিলের উড়ে যাওয়াকে হাওড়া জেলাতে মঙ্গলসূচক বলা হয়। গৃহছাদে শঙ্খচিলের উপবেশনকে দক্ষিণবঙ্গে সৌভাগ্য সূচনাকারী বলে মনে করা হয়। শঙ্খচিলের শঙ্খবৎ শুভ্রতা এখানে তাকে মঙ্গলকারী হয়ে উঠতে বহুলাংশে সাহায্য করেছে।

এই চিলের প্রসঙ্গেও বিরুদ্ধতা লক্ষ করি উত্তর ভারতে। গোরখপুর জেলাতে শিশুর মাথা ন্যাড়া করবার পর কখনোই তা অনাবৃত রাখা হয় না; কেননা, অনাবৃত মাথার ওপর দিয়ে চিল উড়ে গেলে তার দাদ হয়। অথচ, এই চিলকে যদি কারো বাঁ দিকে খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে দেখা যায়, তবে দর্শনকারীর পক্ষে তা শুভফল-দায়ক হয়। এই শুভলক্ষণের কথা তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিত-মানসে'ও উল্লেখ করেছেন। যে চিলের ছোঁয়াতে শিশুদের দাদ রোগ হতে পারে, শনি-মঙ্গলবারে পাখি শিকারিদের কাছ থেকে সেই চিল কিনে নিয়ে শিশুর মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তারই দৈহিক শুভকামনায়! হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এটি করে থাকে। উল্টোদিকে, একটি নির্মীয়মাণ গৃহে একটি চিল এসে বসেছিল বলে দ্বারভাঙার মহারাজা সেটি পরিত্যাগ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

ভারতীয় সংস্কারে বাঁ দিককেই সাধারণ ক্ষেত্রে অমঙ্গল ও অকল্যাণের প্রতীক বলে মনে করা হয়, যদিও নারীর ক্ষেত্রে ডান দিককেই অশুভ বলা হয়। ওপরের উদাহরণ-গুলোতে আমরা এই নিয়মেরই ব্যতিক্রম দেখতে পাবো। রামায়ণে উক্ত হয়েছে, বিবাহ-যাত্রাকালে পাখির বাঁ দিকে উড়ে যাওয়া এক কুলক্ষণ। সীতার অপহরণকালে রামের বাঁ দিকে পাখি ডেকেছিল (রোমান সংস্কার ঠিক এর বিপরীত; বাঁ দিককেই সেখানে সুলক্ষণের হেতু বলা হত। উইলিয়ম ক্রুক তাঁর 'Things Indian' (London: 1906) বইতে লিখেছেন: "The most important Hindu omens are those of meeting. By the Romans the left was regarded as the lucky side, but Indo-Europeans preferred the right. With them the feeling originally did not depend on the paints of the compass, but was based on the superiority of the right hand to the left."—P, 350. ক্রুকের এই ধারণা আংশিক ভাবে সত্য। একটু পরেই প্রদর্শিত উদাহরণগুলোতে দেখব, ডান-বাঁ উভয় দিককেই ভারতে যুগপৎ শুভ-অশুভ বলা হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য অংশেও রোমান-পন্থা অনুসারে বাঁ দিককেই শুভময় ও কল্যাণকর বলে মনে করা হয় না। আসলে অপর একটি সূত্রে ঠিক বিপরীত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে: বাঁ দিকই রোমে দুর্ভাগ্যজনক বলে বিবেচিত হত। রোমে যুদ্ধ-শিবিরের বাঁ দিকে অনেক কাক

উড়তে থাকলে তারা তাই পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। রোমানদের সেই আমল থেকেই ব্রিটেনের গ্রামাঞ্চলের লোকদের কাছেও বাঁ দিক অশুভ বলে মনে করা হতে থাকে। রোমান অধিকারের পূর্বে প্রাচীন ব্রিটেনে পাখিকে নিয়ে সংস্কার-বিশ্বাসের প্রমাণ-পরিচয় তেমন পাওয়া যায় নি। রোমান অধিকারের পর ব্রিটেনে পাখির ডান দিকে ওড়া শুভ এবং বাঁ দিকে ওড়া অশুভ রূপে গৃহীত হয়।

শকুন সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কোথাও প্রীতিপূর্ণ মনোভাব নেই বটে, কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে এরও ব্যতিক্রম আছে; 'মৃগালোপ জাতক' (সং ৩৮৩) 'গৃধ্রজাতক' (সং ৪২৭) প্রভৃতি জাতকে বোধিসত্ত্বকে গৃধ্ররূপে জন্ম নিতে দেখা যায়। নিশ্চয়ই গৃধ্র সম্পর্কে তখন শুভ ধারণা ছিল, নইলে এ কল্পনা করাই হত না। ক্লাসিক সাহিত্যে শকুন বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত এক পবিত্র পাখি, Herakles-এর প্রিয় পাখি। গ্রীকো-ল্যাটিন ঐতিহ্যানুসারে, ভারতবর্ষের মতোই, শকুন বীরত্বের প্রতীক। Romulus, Caesar এবং Augustus-এর রাজ্যের সার্বভৌমত্বের ঘোষণাকারী।

শকুনের প্রসঙ্গে গৃধ্রের কথা ওঠে। ঋগ্বেদ (১ ১১৮. ৪) এবং অথর্ববেদে (৭. ১০০. ১) গৃধ্রকে আকাশবিহারী বলা হয়েছে। সায়ণ একে 'শ্বেতবর্ণ' পক্ষী বলেছেন। ঋগ্বেদে (১০. ১২৩ ৮) বলা হয়েছে, এর চঞ্চু তীক্ষ্ম, এবং এরা বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪. ৪. ৭) পঞ্চভূয়স্কৃৎ ইষ্টক স্থাপনের মন্ত্রে এবং ওই গ্রন্থেই (৫. ৫. ২০) আকাশের জন্যে গৃধ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এইসব তথ্য থেকে গৃধ্রের মহিমা, গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব অনুধাবন করা যায়।

কিন্তু ঋগ্বেদ (৭. ১০৩. ১২) এবং অথর্ববেদেই (১১. ১১. ৯; ১১. ১২. ৮, ২৪; ১২. ১০. ১) গৃধ্রকে হিংস্র ও মৃতদেহ ভক্ষণকারী রূপে উল্লেখ থেকে এর অশুভতা অনুমেয়। এই জন্যেই এখনও বিশ্বাস আছে, কারো মাথার ওপর দিয়ে শকুন উড়ে গেলে বা বিষ্ঠাত্যাগ করলে তার অসুখ হয়, মৃত্যু ঘনিয়ে আসে এবং স্বস্ত্যয়নাদির প্রয়োজন হয়। শকুনের গা থেকে নাকি উকুনের মতো পোকা পড়ে। কোনো গৃহছাদে বসলে অপবিত্র জ্ঞানে সে স্থান জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়। গৃধিনী বা গিন্নীশকুন, মাথায় লাল ঝুঁটি থাকবার দরুণ কোনো-কোনো অঞ্চলে যাকে বলে 'ফুল-শকুন', অমঙ্গল সাধনের ক্ষমতা তারই বেশি বলে কল্পিত হয়। হাওড়া জেলাতে এর দৃষ্টিকে বিশেষভাবে কু-দৃষ্টি বলা হয়।

গৃধিনীর এই কু-নজরের কারণের পেছনে Contagious magic-এর প্রভাব আছে বলে মনে করি। কথিত হয়, ভাগাড়ে মড়া পড়লে ফুল-শকুন এসে যতক্ষণ না মড়ার কেবল চোখ দুটো খেয়ে নিয়ে সরে যায়, ততক্ষণ অন্য কোনো মড়াখেকো পাখি মড়া স্পর্শ করে না। যেহেতু গৃধিনী কেবলমাত্র চক্ষু-ভক্ষণকারী, অতএব তারই ফলে তার দৃষ্টিও অমঙ্গলকারী বলে কথিত। এর দৃষ্টি থেকে সকলেই তাই আড়ালে থাকতে চায়, কিন্তু ঋগ্বেদেই বলা হয়েছে, এ বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিকে নিন্দা করবার জন্যে তাই বলা হয় 'শকুনের দৃষ্টি' বা 'শকুনের মতো চোখ'।

ক্লাসিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে চিল-শকুন-শ্যেন-ঈগল প্রভৃতি পাখির গুণ-ধর্ম-বৈশিষ্ট্যাদি প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল, এবং এদের ভূমিকাও সেখানে অভিন্ন। এই জন্যে একের দোষগুণ অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পড়েছিল। এইসব শিকারী পাখিদের মধ্যে একটি শুভবোধ সম্ভবত প্রাচীনেরা লক্ষ করেছিলেন। তাই এদেরই দেখা যায় দেবতাদের ও কাহিনী-নায়কদের মিত্র ও বন্ধু হতে। রামায়ণে সীতাহরণ ও উদ্ধারে জটায়ু ও সম্পাতির ভূমিকা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য বিভিন্ন পৌরাণিক সাহিত্যে শ্যেন ও ঈগল কোথাও-কোথাও ভিন্ন ভূমিকা নিয়েছিল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও জার্মানীর পৌরাণিক সাহিত্যে দেখা যায়, সেখানে শ্যেন যখন উজ্জ্বলমূর্তিতে প্রকাশমান, বীর নায়কেরা তখন তাকে পছন্দ করেছে; ঈগল সেখানে অনুজ্জ্বল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্তি নিয়ে দৈত্য-দানবের প্রিয়তা অর্জন করেছে। অপরদিকে শ্যেন দেবমহিমার সপক্ষে, যা হীন ও দানবীয় তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

এর মধ্যেই শ্যেনের মঙ্গলময়তা স্পষ্টরূপে বিধৃত রয়েছে। গ্রীক বা হেলেনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে শ্যেন তাই বিশিষ্ট গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। শ্যেন অ্যাপেলোর দ্রুত সংবাদ-বহনকারী, দেবরাজ জিউসের প্রিয় পাখি। শ্যেন ও ঈগলের এই ভিন্নতা কোথাও ঘুচে-মুছে গেছে। তাই জিউসের অনুচর রূপে ঈগলকেও কখনো উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এদের অভিন্নতা অন্যত্রও: জিউসের যেমন ঈগল, তেমনি দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচর শ্যেন। দুই দেবরাজের দুই অনুচর এমনভাবে অভিন্ন এবং এই দেব-আসঙ্গ এদের শুভময় দিক।

জিউসের ঈগল মাংসাশী নয়, তৃণভোজী। যতদিন জিউস মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন, ততোদিন ঈগলও দেব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৌরাণিক সাহিত্যে ঈগল তাই বীর্য ও বিজয়ের প্রতীক, বীর নায়কদের লালন ও রক্ষাকারী এবং তাঁদের জন্যে ত্যাগ স্বীকারকারী। হেলেনীয় পুরাণে ঈগল আলোক আনায়নকারী, পূজ্য ও মান্য; সে সুখ-শান্তি ও উর্বরতার সূচক। জিউস যখন প্রমিথিউস-এর ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেন, ঈগলও তখন প্রমিথিউস-এর বুকে নখরাঘাত করেছে। জিউসের সঙ্গে-সঙ্গে ঈগলের সম্পর্কেও ধারণা খারাপ হতে থাকে।

ঈগলের এই বিরুদ্ধ রূপ নানা উপজাতির নানা আচারের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে অস্ট্রেলিয়ার কোনো-কোনো উপজাতির মধ্যে 'ঈগল উপাসনা,' Ostiak-দের মধ্যে ঈগল ও ঈগল-বাসকারী বৃক্ষকে পূজা-শ্রদ্ধা করা, উত্তর আমেরিকার কোনো-কোনো উপজাতির মধ্যে ঈগল-হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া, এবং শস্য রক্ষার জন্যে ক্ষেতে ঈগলের পাখা রাখা; অপর দিকে, ক্যালিফোর্নিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঈগল হত্যা করা কিংবা নিউগিনির লোকদের বিশ্বাস: ঈগলের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে কলাগাছ রোপণ করলে তার ফলন ভালো না হওয়া।

জিউসের সঙ্গে-সঙ্গে যেমন ঈগল সম্পর্কে এক বিরূপতার ভাব এসে গিয়েছিল,

ইন্দ্রের সঙ্গেও তেমনি শ্যেনের একটি বিবর্তন সম্ভবত এসে পড়েছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্র শ্যেন রূপে প্রতিভাত। শ্যেনরূপী ইন্দ্র অন্যান্য শ্যেনের চেয়ে দ্রুতগামী, তিনি 'সুপর্ণ,' দেবতাদের 'হবিঃ' তিনি মানুষের জন্যে নিয়ে আসেন (৪.২৬.৪)। তিনি শত লৌহদুর্গে আবদ্ধ, তথাপি তিনি সেখান থেকে মুক্ত হতে সমর্থ (৪.২৭.১)। তিনি তাঁর নখে করে জীবন-প্রদায়িনী অমৃত বহন করতে পারেন (১০.১৪৪.৫)। তাঁর লৌহবৎ নখর দ্বারা তিনি দস্যুদের হত্যা করতে পারেন (১০.৯৯.৮)। ঠিক এরই পাশে একটি বিরুদ্ধ চিত্র: অমৃত বহনকালে তিনি তীরন্দাজ কৃশানুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন (৯. ৭৭. ২)। শৌর্যের পাশেই এই দুর্বলতা শ্যেন সম্পর্কে ধারণা পাল্টে দেয়। বৈদিক ইন্দ্রও ক্লাসিক যুগে পরিবর্তিত হয়ে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে, এক অকল্যাণকারী অশুভ শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সম্ভবত শ্যেনও ॥

৯....
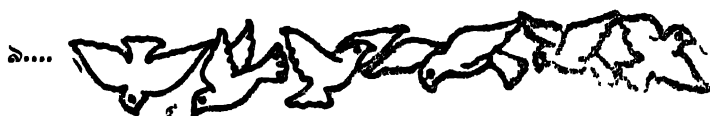
প্রাচীন ভারতীয় শকুনশাস্ত্র ও লোকাচারে খঞ্জন একটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। খঞ্জন সম্পর্কে নানা শুভ ও অশুভ লক্ষণ নিয়ে বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা'য় আলোচনা করেছেন। এখন দু-একটি অন্য দিক নিয়ে আলোচনা করি।

খঞ্জন-দর্শনের শুভাশুভত্ব সম্পর্কে চণ্ডেশ্বর 'কৃত্যরত্নাকর' (মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক-সম্পাদিত, ১৯২৫) নামক গ্রন্থে প্রায় আট পাতা (pp. 366-373) আলোচনা করেছেন। এটি চতুর্দশ শতাব্দীতে মিথিলায় পালিত আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ। ষোড়শ শতকের আর দু'খানি গ্রন্থেও খঞ্জন-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা আছে, তবে এ দু'টিতে দু-এক পাতার বেশি আলোচনা নেই। এর একটি 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' (কমলকৃষ্ণ কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯০২), অপরটি রঘুনন্দনের 'তিথি-তত্ত্ব'। 'কৃত্যরত্নাকর' অবলম্বনে খঞ্জনদর্শনের ফলাফল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাচ্ছে।

আশ্বিন বা কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী বা দ্বাদশী তিথিতে অথবা পূর্ণিমার দিন, 'নীরাজনাশান্তি' অনুষ্ঠানের পর, খঞ্জন যে দিকে উড়ে যায়, সেই দিক থেকে শত্রুকে আক্রমণ করলে, সহজেই তাকে দমন করা যায়। বৎসরের যে সময়ে সূর্য হস্তা নক্ষত্রে অবস্থান করে, খঞ্জন সেই সময় প্রথম আবির্ভূত হয়; এবং সূর্য যখন রোহিণী নক্ষত্রে পৌঁছয়, খঞ্জন তখন অদৃশ্য হয়। যে খঞ্জন স্থূলকায়, দীর্ঘগ্রীব, গলা-মুখ কৃষ্ণ বর্ণের, সেই খঞ্জন দর্শনই মঙ্গলজনক। যে সব খঞ্জনের গলায় কালো ফোঁটা আছে, যার পক্ষাগ্র ও পদাগ্র সাদা, তাকে বলে 'চিত্রকূত';

যে সব খঞ্জন বেশ হলুদ, তাদের বলে 'গোপীত'। সাধারণত, চার রকমের খঞ্জন আছে : 'সমস্ত ভদ্র' (গলার সবদিক কালো, বুক ও মাথাও কালো), 'প্রভদ্র' (মাথা ও বুক কালো কিন্তু ঘাড় ও পিঠ সাদা), 'অনুভদ্র' (ঘাড় ও বুক কালো) এবং 'অম্বর ভদ্র' বা 'আকাশভদ্র' (ঘাড়ে কালো ডোরা, কিন্তু মুখটি সাদা)। প্রত্যেক ধরণের খঞ্জন অব্যবহিত পরবর্তী ধরণের খঞ্জন অপেক্ষা শুভকর্ম ও সাফল্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী। 'আকাশভদ্র' খঞ্জন কর্মে ব্যর্থতার সূচক; 'গোমূত্রে'র মতো পীত ('গোপীত') বর্ণের খঞ্জন সকাল বেলায় দেখলে দর্শনকারী বৎসরকাল দুঃখ পায়। সাধারণত সূর্যোদয়কালে খঞ্জনদর্শন শুভত্বসঞ্চারী, কিন্তু সূর্যাস্ত কালে তাদৃশ নয়। খঞ্জনের পাখা কাঁপানো এবং জলাশয় থেকে জলপানের দৃশ্য দর্শন অমঙ্গলজনক। মৃত, বিক্ষত, রোগাক্রান্ত ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় দেখলে দর্শনকারীরও তাদৃশ অবস্থা হয়। নৌকোর ওপর বসে থাকতে দেখলে গৃহপ্রাপ্তি ঘটে। অপর কেউ যদি দ্রষ্টাকে এ দৃশ্য দেখিয়ে দেয়, তবে সেই প্রথম ব্যক্তি নারী-সঙ্গ লাভ করে। 'অগস্ত্য' নক্ষত্র যখন দিগন্তে অবস্থিত, তখন খঞ্জন দর্শন করলে খঞ্জনকে মাথা নত করে প্রণাম করে মন্ত্রসহ অর্চনা করতে হয়, কারণ তা মনোবাঞ্ছা পূরণ করে। মন্ত্রের সারাংশ এই : "খঞ্জন, তুমি ঋষিপুত্র, যোগসাধনপর, গ্রীষ্মাগমে তুমি অদৃশ্য হও, বর্ষাশেষে তোমার পুনরাগমন ঘটে ; তুমি আশ্চর্য, আমি তোমায় প্রণাম করি।"

খঞ্জনের নামোচ্চারণ এবং আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে দেখা দূরদেশ যাত্রীর পক্ষে মঙ্গল। খঞ্জন দর্শন-জাত অমঙ্গল এড়াবার জন্যে পূজার্চনাদি করতে হয় ; এক সপ্তাহ নারীসঙ্গ করা, আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ; ভূমিশয্যা গ্রহণ, স্নান ও যজ্ঞাদি করা প্রয়োজন।

কালো, মোটা, দীর্ঘকণ্ঠ খঞ্জন দেখা শুভজনক। গলায় কালো, সঙ্গে সাদা ডোরা দাগ থাকলে তা নৈরাশ্যের সূচক হয়। এখানে সাদা-কালো এই রঙের ভেদ আশা-নৈরাশ্যের সূচক হয়েছে, সাদৃশ্য-বৈপরীত্যের নিরিখ ধরে। তবে, সম্পূর্ণ রূপে কালো গলা ও মথাওলা খঞ্জন শুভজনক বলে কথিত হয়েছে। মিষ্টি ও সুগন্ধ ফল পূর্ণ বৃক্ষে উপবিষ্ট খঞ্জন ; পুকুর-পাড়ে, হস্তী-অশ্ব ও সর্পফণার ওপরে উপবিষ্ট খঞ্জন ; গোচারণভূমিতে, যজ্ঞস্থলে, হাতী-ঘোড়ার অবস্থান ক্ষেত্রে, রাজা বা ব্রাহ্মণের নিকট ; ছত্রোপরি বা পতাকার ওপর ; দধিভাণ্ডে, শস্য ক্ষেত্রে বা স-পদ্ম পুষ্করিণীতে উপবিষ্ট খঞ্জন-দর্শন শুভ। খঞ্জনকে কর্দমের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে দেখলে মিষ্টদ্রব্য প্রাপ্তির সূচনা করে। সবুজ ঘাসের ওপর খঞ্জনকে উপবিষ্ট দেখলে নববস্ত্র প্রাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। খঞ্জনকে শকটের ওপর উপবিষ্ট দেখলে দেশধ্বংস হয় ; পর্ণকুটীর বা অট্টালিকার ওপর উপবিষ্ট দেখলে দ্রষ্টার ধনক্ষয় হয় ; কোটরে উপবিষ্ট দেখলে বন্দীদশা ঘটে ; (এই 'কোটর' এখানে 'কারাগারে'র প্রতীক বলে মনে হয়) ; অপরিষ্কার স্থানে উপবিষ্ট দেখলে দ্রষ্টার রোগ উপস্থিত হয় (অপরিষ্কার স্থান রোগের উৎপত্তিস্থল বিবেচনা করে)। মেষের ওপর উপবিষ্ট দেখলে দ্রষ্টার প্রিয়জনের

আগমন ঘটে। কিন্তু যদি মহিষ-উট-গাধার পিঠে, শ্মশান ভূমিতে, গৃহচালের কোণে, পর্বত বা কূপের ওপরে, ভস্মস্তূপ বা কর্তিত কেশের স্তূপে উপবিষ্ট দেখা যায়, তবে দ্রষ্টার মৃত্যু বা বিপদ আসন্ন বুঝতে হবে। পাখা কাঁপিয়ে এ পাখিকে উড়তে দেখাও অমঙ্গলজনক; তবে কোনো নদী বা জলাশয় থেকে জলপানরত অবস্থায় দেখা মঙ্গলজনক। সূর্যোদয় কালে এ পাখির দর্শন কল্যাণকর কিন্তু সূর্যাস্তকালে নয়। খঞ্জন যে দিকে উড়ে যায়, রাজার যুদ্ধযাত্রা কালে সেই দিক থেকে যাত্রারম্ভ করা উচিত, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি শত্রুদমনে সক্ষম হবেন। স্ত্রী ও পুরুষ খঞ্জন যে স্থলে রতিক্রিয়া সম্পাদন করে, সেখানে গুপ্তধন মেলে। খঞ্জন যেখানে বমন করে, সেখানে কাঁচ পাওয়া যায়; যেখানে বিষ্ঠাত্যাগ করে সেখানে অঙ্গার পাওয়া যায়। মৃত ও খুঁতসম্পন্ন খঞ্জন দর্শন করলে দ্রষ্টার মৃত্যু, রোগ ও অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে (এখানে পুরোপুরিই Homoepathic Magic লক্ষ করি)। শুভক্ষণে শুভস্থলে কোনো রাজা খঞ্জন দর্শনের পর খঞ্জনকে সুগন্ধ ফুল ও ধূপ দিয়ে অর্চনা করলে রাজার ধন-সম্পদ অবশ্যই বৃদ্ধি পায়। অশুভ ক্ষণে এবং অশুভ স্থলে খঞ্জন দর্শনজাত দোষ সাতদিন মাংসাদি না খেলে খণ্ডানো যায়। বছরের প্রথম খঞ্জনদর্শন-জাত ফল ফল বছরের যে কোনো সময়ে কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু একই বছরে যদি দ্বিতীয়বার দর্শন ঘটে, তবে ওই দ্বিতীয়বার দর্শনজাত ফলাফল কেবল সেই দিনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় কবিগণও খঞ্জন দর্শনজাত শুভাশুভ বিচার করেছেন। আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ চট্টগ্রাম থেকে এমনই একটি পুঁথির সন্ধান পান (পুঁথির বিবরণ: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৩০৯+১৩১০। পৃ. ১-২৬৮)। এর মধ্যে ১১০ সংখ্যক পুঁথিটি ছিল 'খঞ্জন-বচন'। সংকলকের মন্তব্য: "ক্ষুদ্র সন্দর্ভ; ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘীর। ইহাতে খঞ্জন দর্শনের ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে।" অতঃপর পুঁথির আরম্ভ অংশটি উদ্ধৃত করেছেন:

> পক্ষী মধ্যে বিধাতাএ সৃজিলা খঞ্জন।
> তার ভাল মন্দ কহি শুন দিআ মন ॥
> ছঅ মাস থাকে পক্ষী সমুদ্রের কূলে।
> প্রথম যে ভাদ্র মাসে নিকলে সংসারে ॥

শেষাংশে আছে,

> বৈশাখ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
> সর্বথাএ ধন লভ্য জানিবা কারণ ॥
> জ্যৈষ্ঠ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
> ছঅ মাসে না মরিলে বৎসরে মরণ ॥

জেবা গাএ জেবা শুনে খঞ্জনের বচন।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে গমন॥

বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রেও খঞ্জনের কথা বলা হয়েছে। দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর খঞ্জন দর্শন বিশেষ শুভজনক বলে কথিত হয়েছে (আশ্বিন মাসে খঞ্জন দেখলে এখনও পাবনা জেলার লোকেরা প্রণাম করে থাকে)। সূর্যোদয়কালে আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে খঞ্জনকে উড়ে আসতে দেখা মঙ্গলজনক। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে খঞ্জন দর্শনের ফলাফলও ব্যক্ত হয়েছে। জীমূতবাহন বলেন, খঞ্জন দর্শনজনিত মঙ্গল এক বৎসর স্থায়ী হয়; খঞ্জন দর্শনজনিত অমঙ্গল দূর করবার জন্য নানা পূজানুষ্ঠানের কথাও স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে।

ওপরে সংকলিত এই সব বিবরণ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি দিক স্বতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, কেবল ব্যক্তিগত শুভাশুভই কথিত হয় নি, দেশ-গ্রাম ও গোষ্ঠীর শুভাশুভও ব্যক্ত হয়েছে; তা ছাড়া, রাজার মঙ্গলামঙ্গলের মধ্য দিয়েও ব্যক্তিগত ভাবে রাজার তো বটেই, উপরন্তু রাজ্যের সকলের কথাও এসে পড়েছে। দেশ, রাজ্য ও গোষ্ঠীর এই উল্লেখ থেকে সেই প্রাচীন দিনের সমাজে চলে যাওয়া যায়, যখন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খুব বেশি বিকশিত হয় নি। দ্বিতীয়ত, খঞ্জনের গাত্রবর্ণ, অপরিষ্কৃত স্থানে তাকে দর্শন, ইত্যাদির ফলাফল ব্যক্ত করবার মধ্যে যাদুবোধ ক্রিয়াশীল। তৃতীয়ত, দিগ্‌ভেদ, স্থানভেদ, উপবেশন ও উড্ডয়ন ভঙ্গির বৈচিত্র্যের ফলে একই পাখির মধ্যে শুভাশুভকে লক্ষ করবার জন্যে নানা বিরুদ্ধভাব প্রায় সব দেশের সব পাখি সম্পর্কেই মেলে, আগেই তা বলেছি। চতুর্থত, খঞ্জনের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর (যেমন, হস্তী, অশ্ব, মেষ, সাপ ইত্যাদি) সংমিশ্রণ জাত ফলাফল; এদের মধ্যে এক ধরণের প্রতীকতা আছে বলে মনে করি। বিশেষ করে পাখি ও সাপের composition তো এক পুরাতন ও বিশ্বব্যাপী বস্তু। পঞ্চমত, খাদ্য ও বস্ত্রের প্রাপ্তিযোগের কথা। এটি একান্ত ভাবেই ভারতীয়। অন্য দেশের শকুনশাস্ত্রে অন্য যারই কথা থাক, খাদ্যবস্ত্রের উল্লেখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভারতীয় জ্যোতিষ ও স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতাগণ পাখির মধ্যে এতো মহতী শক্তিকেই লক্ষ করেছিলেন যে, পার্থিব জগতের কোনো প্রয়োজনকেই তাঁরা পাখিকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে ছাড়েন নি।

কৃষিকর্মের সঙ্গেও বছরে খঞ্জনের প্রথম দর্শনজাত ফলাফল জড়িত। বিহারে বিশ্বাস আছে, কৃষিকর্মের ভালো-মন্দের বিবরণ জানতে রামচন্দ্রই ধরাধামে প্রতি বৎসর এ পাখিকে প্রেরণ করে থাকেন। তথ্যাদি নিয়ে এ পাখি ফিরে গেলে তবেই তিনি পরের বছরের ফলশস্যোৎপাদনের ব্যবস্থাদি করে থাকেন।

প্রথম খঞ্জন দর্শনমাত্রই কৃষক জানতে পারে সে বছর তার কী পরিমাণ শস্য হবে। সে যদি পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে থাকাকালে, কোনো নদীর তীরে খঞ্জনকে প্রথম দেখে, তবে তা তার পক্ষে শুভজনক; সে যদি পাখিটিকে একটি গোরুর ওপর উপবিষ্ট দেখে; কিংবা একটি সাপ ব্যাঙ মুখে করে নদীস্রোতে ভেসে চলেছে,

এবং খঞ্জন তার মাথায় বসে রয়েছে, তা দেখতে পায়, তবে তার পক্ষে পরম সৌভাগ্য জনক। এমন কি, সে রাজাও হয়ে যেতে পারে!

এটির মধ্যে লক্ষণীয় হল: কৃষিকার্যের জন্য জল ও গোরুর উল্লেখ; 'গোধন' শ্রেষ্ঠ ধন রূপে প্রাচীন ভারতে বিবেচিত ছিল। সাপ ও ব্যাঙের সংমিশ্রণ, সঙ্গে জল। প্রসঙ্গত, পূর্ববঙ্গের একটি বিশ্বাস এখানে উল্লেখযোগ্য: সেখানে অনেকে বর্ষাকালে কচুবনে ব্যাঙের 'লালা' খুঁজে বেড়ায়; কারণ, তা 'সাত রাজার ধন' বলে গণিত হয় (দ্রঃ আশরাফ সিদ্দিকী-সম্পাদিত 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী': ঢাকা ১৯৬৮, ভূমিকা, পৃ. ২৬)। পাখির সঙ্গে ধন-বৈভব ও রাজত্বের আসঙ্গ আর একবার দেখা গেল। "প্রথম দর্শনে"র মধ্যে এক বিশেষ 'mana' অনুভব এর শেষ কিন্তু সর্বপ্রধান বিশেষত্ব।

জোড়া খঞ্জন অঙ্গনে এসে নাচা বিশেষ শুভ ফলদায়ক; এখানেও জোড়-বন্ধন যেন সুফল 'প্রসবে'-র ইঙ্গিতবাহী। নৃত্যই খঞ্জনের বিশেষত্ব, সেই খঞ্জন যদি না নেচেই সম্মুখ থেকে চলে যায়, দিনাজপুরে তা বিশেষ অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়। এখানে অস্বাভাবিকতার মধ্যে অমঙ্গলময়তাকে লক্ষ করা হয়েছে। 'খঞ্জন নেত্র' এবং 'খঞ্জন নৃত্য' ভারতীয় চারুকলা ও সাহিত্যকলায় বিশেষভাবে পরিচিত॥

....১০....

ইউরোপীয় 'Augury' এবং 'Ornithomancy'-তে পাখির ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করে দেখবার মতো। ইউরোপ ও আমেরিকাতে শুভাশুভ গৃহীত হয় প্রধানত কোকিল, পাতিকাক ও দাঁড়কাক, শ্যেন-বাজ ও ঈগলের কাছ থেকে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা হত, বাস্তব জীবনেও তার বিশেষ ভূমিকা ছিল, ফলে সেখানেও শকুনশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা ইউরোপে কোকিলকেই দেওয়া হয়েছে সর্বাধিক।

জার্মানীতে আবাবিল (the Swollow)-কে বলে 'the birds of the madonna'; আবাবিল নাকি ভগবানকে আকাশ তৈরিতে সাহায্য করেছিল। জার্মানী ও হাঙ্গেরীতে আবাবিল হত্যা বা তার নীড় নষ্ট করা এক মহাপাপ, কেউ তা করলে, হয় তার গোরু দুধ দেবে না, নয়তো দুধের সঙ্গে রক্ত পড়বে। এইজন্যে সেখানে সর্বদাই জানলা খোলা রাখা হয়, যাতে আবাবিল সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিকে ঘরে ডেকে আনতে পারে। কথিত হয়, ঘুমন্ত আলেকজান্ডারকে তাঁর আসন্ন পারিবারিক দুর্যোগ সম্পর্কে আবাবিল পূর্বাহ্নেই সচেতন করে দিয়েছিল, তাঁর শিয়রে ডেকে উঠে। যুদ্ধের সময় আবাবিল দূত ও সংবাদবহনকারী রূপে ব্যবহৃত হতো প্রাচীন কালে; এইসব কারণেই জার্মানী ও ইটালীয় Augury-তে আবাবিলের স্থান খুব উচ্চে।

Augury-র সঙ্গে যাদুর যোগের কথা বারবার বলেছি। এই জন্যেই, ইউরোপীয় অনেক লোককথায় দেখা যায়, ডাইনীর যাদু-মন্ত্রে কুমারী-কন্যারা আবাবিলে রূপান্তরিত হচ্ছে। আবাবিল সম্পর্কে এখানে প্রীতিপূর্ণ মনোভাব ধরা পড়েছে, যা তার কল্যাণকামী দিকটিকে তুলে ধরে। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পৌরাণিক গ্রন্থ Edda-তে দেখা যায়, সাতটি আবাবিলের পরামর্শ অনুসারেই সিগার্ড (Sigurd) দানবকে হত্যা করে স্বর্ণ-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে। এই সব কারণেই বিশ্বাস আছে: আবাবিল কারো গৃহে নীড় নির্মাণ করলে তা মঙ্গল ও ভাগ্যজনক; কিন্তু বাসা তৈরি করতে আরম্ভ করে যদি অন্যত্র চলে যায় তবে তা দুর্ভাগ্যজনক। যে বাড়িতে আবাবিল বাসা বাঁধে, সে বাড়িতে আগুন লাগে না, বা তা ঝড়ে-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আবাবিলের মধ্যে এ ব্যাপারে 'Soul staff' বা 'Mana' লক্ষ করা হয়েছে।

চীনেও আবাবিলের আগমন এবং নতুন জায়গায় তার বাসা নির্মাণ করাকে সে বাড়ির বাসিন্দাদের সাফল্য ও সমৃদ্ধির সূচনা করে বলে বিশ্বাস আছে। এই শুভ ধারণার জন্যেই চীনে নারীর কণ্ঠস্বরকে আবাবিলের ডাকের সঙ্গে উপমিত করা হয়, বাঙলায় যেমন বলা হয় 'কোকিল কণ্ঠী'।

এ হেন আবাবিলকে অশুভংকর বলা হয়েছে। একটি গ্রীক প্রবাদে আছে, ঘরে যেন আবাবিলকে বাসা বাঁধতে না দেওয়া হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে আবাবিলকে বলে 'Devil's bird',—এর ল্যাজে নাকি শয়তানের তিন ফোঁটা রক্ত লেগে আছে। এই বিরুদ্ধ সংস্কারের হেতু কী? শীতপ্রধান দেশে আবাবিলকে বসন্তের সূচনাকারী বলে মনে করা হয়। সেইজন্যে শীতে এ পাখি অশুভংকর, কিন্তু বসন্তে শুভংকর। হয়তো শীতে এ পাখির পালক পরে গিযে কুৎসিত-দর্শন হয় এবং বসন্তে পালক গজিয়ে সুদর্শন হয় বলেই এই বিপরীত সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে পাখির দৈহিক আকৃতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যই শুভাশুভের হেতু হওয়াতে ম্যাজিককে লক্ষ করা যাচ্ছে। আবাবিল সম্পর্কে বিরূপ ধারণার ফলেই প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল, আবাবিলের স্বপ্ন দেখাও অমঙ্গলজনক।

আবাবিল সম্পর্কে সংস্কার-বিশ্বাসগুলোর অধিকাংশই কোকিল থেকে সঞ্চারিত, এই জন্যেই কোকিলের কথা আগে উল্লেখ করেছি। শুভাশুভের ক্ষেত্রে অনেক পাখিই এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে, কোকিল ও আবাবিল তেমনি। কোকিল যেমন বসন্তের সূচক, আবাবিলও তাই। শীত প্রধান দেশে এই জন্যে কোকিলের খুব আদর। এই জন্যে কোকিলকে দুর্লভ, দুর্লক্ষ্য ও রহস্যজনক বলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি শুভ ধারণার জন্যেই কল্পনা করা হয়েছে, কোকিল অমর; গুজরাটে তাই কোকিলরব শ্রবণ কল্যাণকর। এর জন্মকথাও নানা রহস্যে পূর্ণ, বসন্ত ঋতুতে এর আবির্ভাব-তিরোধান নিয়েও নানা দেশে নানা কল্পনা। যাযাবর পাখিদের মধ্যে কোকিলই নাকি সর্বাগ্রে আসে এবং সর্বাগ্রেই, সকলের অলক্ষ্যে, রহস্যময় ভঙ্গিতে অন্তর্ধান করে। এ সবই কোকিলের প্রতি গুরুত্বারোপের ফল।

শকুনশাস্ত্রের বিশিষ্ট রচনা পদ্ধতির দিক থেকে কোকিলের সঙ্গে খঞ্জনের তুলনা করা যেতে পারে। একমাত্র এইখানেই ইউরোপীয় শকুনশাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বৎসরে প্রথম খঞ্জন দর্শন ; প্রথম খঞ্জন রব শ্রবণ এবং তার দিগ্‌ভেদে ফলভেদ যেমন লক্ষ করা হয়েছে, একমাত্র কোকিলের ক্ষেত্রে তেমনি ইউরোপে ঘটেছে, অন্য কোনো পাখি সম্পর্কে নয়। যেমন :

ওয়েলস্‌-এ বিশ্বাস আছে, ৬ই এপ্রিলের পূর্বে কোকিল দর্শন বা তার রব শ্রবণ অমঙ্গলজনক ; কিন্তু ২৮শে এপ্রিল যদি প্রথম দেখা যায় বা তার রব শোনা যায়, তবে তা সৌভাগ্যসূচক ! বছরের প্রথম কোকিল রব যদি শ্রোতা তার ডান দিক থেকে শোনেন তবে তা শুভ, কিন্তু বাঁ দিক থেকে শুনলে বছরের বাকী অংশ তার পক্ষে দুর্ভাগ্যময় হবে। ডান দিক থেকে প্রথম কোকিল রব আসবার সময় শ্রোতা যদি কোনো বাসনা প্রকাশ করেন, যুক্তিসঙ্গত হলে তা চরিতার্থ হয়। নরফোক্‌-এ বিশ্বাস আছে, প্রথম কোকিল রব শোনবার সময় শ্রোতা যে কাজ করতে থাকেন, সারা বছর প্রধানতঃ তিনি তাই করবেন। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে বিশ্বাস আছে : বছরের প্রথম কোকিলের ডাক শোনবার সময় শ্রবণকারীর পকেটে যদি টাকা-পয়সা না থাকে, তবে তা দুর্ভাগ্যজনক। প্রথম কোকিল রব শুনেই যদি টাকা-পয়সা শুদ্ধ নিজের পকেটটি উল্টে দেওয়া যায়, তবে পরের বছর, কোকিলের পুনরাগমনকাল পর্যন্ত, টাকা-পয়সার অভাব হয় না। সমার সেট্‌-এ বিশ্বাস আছে : 'Mid-Summer Day'-এর (আগে Mid-Summer হত ৬ই জুলাই) পরও কেউ যদি কোকিলের রব শোনেন, তবে তাঁর পক্ষে তা পরম দুর্ভাগ্যময় ব্যাপার, কেননা, সেই তাঁর জীবনের শেষ কোকিল রব শোনা (অর্থাৎ পরের বছর পর্যন্ত তিনি আর বাঁচবেন না)।

শ্রপ্‌শায়ার-এ একদা ক্ষেত ও কারখানার মজুররা কোকিলের ডাক প্রথম শুনেই কাজ-কর্ম ছেড়ে এসে সেদিনটা খুব আমোদ-আহলাদে কাটাতো। ইউরোপের অন্যত্র ঘাসে গড়াগড়ি দেবার প্রথাও ছিল। একেই বলে 'Cuckoo-ale'। ওক গাছে রব শুনেই কৃষকেরা চাষবাস আরম্ভ করে বহু ক্ষেত্রে। কোকিলের ডাকের সংখ্যার দ্বারা কুমারীর বিবাহকাল ও বৃদ্ধের আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হয় বলে গোটা ইউরোপে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস আছে। কোকিলের রব সম্পর্কে এইসব বিশ্বাস জার্মানী, ডেনমার্ক ও সুইডেনেও চলিত আছে।

কোকিলের "প্রথম রব" সম্পর্কে 'taboo', 'magic' ও 'Mana'কে এখানে লক্ষ করা গেল।

বিহারে বিশ্বাস আছে, বাড়ির নিকটবর্তী কোনো গাছে বসে কোকিল ডাকলে তা বহুদূরগত প্রবাসী বাঞ্ছিত জনের আগমন সূচনা করে। এই 'বাঞ্ছিত জন' কোকিলের phallic দিকটিকে পরিস্ফুট করে।

অতঃপর বিপরীত ব্যাপার, কোকিল এক অশুভকারী শক্তিতে পরিণত তখন। কোকিল তার পাখা উল্টে ধরলে, চাষী বউরা বাড়ির ডিম সম্পর্কে সতর্ক হয়।

কোকিলের আসা-যাওয়া বিলম্ব ঘটলে কৃষকদের পক্ষে তা দুঃখের কারণ হয়ঃ 'Cuckoo oats and woodcock hay, make the farmer run away' কোকিল অকৃতজ্ঞ, নীড়-নির্মাণে কুণ্ঠ, অলস, দুশ্চরিত্র ও পরপুষ্ট বলে কথিত হওয়াতেই এবম্বিধ বিরূপ কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। জার্মানীতে বিশ্বাস আছে, St John's Day-র পরও যদি কোকিল ডাকতে থাকতে তবে সহজে সে বছর আঙুর পাকে না। কোকিল এতই অলস, বসন্ত এসে গেলেও, চিল গিয়ে নিয়ে না আসা পর্যন্ত কোকিল নাকি আসে না। Aristophanes এই জন্যেই জড়, অলস ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কোকিলের প্রতিশব্দ "Kokkuges" আখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রাচীন রোমে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্যে মুরগীর ব্যবহার ছিল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে মুরগীর মাধ্যমেই তারা শুভাশুভ নির্ণয় করে নিত। নানা দেশের নানা লোকাচারে মুরগী ব্যবহৃত হয় বা হত বলেই মুরগীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট 'শক্তি'কে অনুভব করা হয়েছে। ভারতে ও পারশ্যে মুরগীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত, ভারতে ও রাশিয়াতে মুরগী হত্যা অপবিত্র কর্ম বলে মনে করা হত, এবং চীনে এজন্যে সাধারণ ক্ষেত্রে মুরগী আহার নিষিদ্ধ ছিল। এই শুভ মনোভাবের জন্যেই 'কুক্কুট জাতকে' (সং ৩৮৩) বোধিসত্ত্বকে কুক্কুট যোনিতে জন্ম নিতে দেখা যায়। জার্মানী ও হাঙ্গেরীতে মুরগীকে 'Weather Prophet' বলে সম্মান জানানো হয়, বহু দেশে বিবাহ-কালীন আচারে মুরগীর প্রয়োজন হয়। নানা প্রকার অশরীরী ও অমঙ্গলকারী আত্মা ও দৈত্য মুরগীর ডাকে দূরীভূত হয়। মুরগীর প্রত্যূষকালীন রবের সঙ্গে সূর্য জড়িত, এবং প্রত্যূষ-কালীন রবের সংগেই যিশুর জন্ম এবং মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তাঁর পুনরুত্থান ঘটেছিল বলে কথিত হয়। এই সব কারণেই শুভাশুভ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুরগীকে এখন পর্যন্ত বহুদেশে প্রধানতম ভূমিকা নিতে দেখা যায়।

মুরগীর বর্ণভেদে ফলাফল ভেদ ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা হয়েছে প্রায় সব দেশেই। লাল, কালো ও সাদা—এই তিন রঙের মুরগীর তিন প্রকার শক্তি লক্ষ করা হয়েছে। এই বর্ণচেতনার পেছনে একদিকে প্রতীকচেতনা অপরদিকে যাদুবোধ কাজ করেছে। যেমন, মানুষের জীবনে দৈহিক বিপদের ফলে রক্তপাত হতে পারে, এবং রক্তের লাল রঙ বিপদসূচক বলে সর্বত্র স্বীকৃতও বটে,—অতএব লাল রঙের মুরগীর ডাক বিপদের ইঙ্গিত দেয়; এই লাল রঙ রক্ত থেকে আগুনের রক্তিমাভায় পরিবর্তিত হয়েছে, তাই লাল মুরগী আগুনের সূচনা করে বলে বিশ্বাস। উল্টোদিকে চীনে আগুনের ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই বাড়ির দেওয়ালে প্রায়ই লাল মোরগের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়।

কালো মুরগীর ডাকের মধ্যেও এই বৈপরীত্য আছে। মুরগীর ডাকের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রহর বা ক্ষণ আছে, অসময়ে সব পাখির ডাকের মধ্যেই লোকমানস গুরুত্ব আরোপ করে থাকে, অশুভটাই তার মধ্যে বেশি, মুরগীর ডাকেও তাই। এই জন্যে দিনের বেলায় মুরগীর ডাক আত্মীয়-বান্ধবের মঙ্গলময় আগমনের সূচনা করে,

রাতে ডাকলে মৃত্যুর সূচক (আগেই বলেছি, মৃত্যু-সংবাদের বিনিময়ে সর্বত্রই অতিথি আগমনকে দেখা যায়) এবং রাতে যদি কালো মুরগী ডাকে তবে তা বিশেষ অশুভ জনক। এখানে রাত্রির কালো রঙ, মৃত্যুর কালো রঙ, অশুভ ঘটনার ফল হিসেবে বিষাদ-নৈরাশ্যের কালো রঙ, মুরগীর কালো রঙের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়ে Homoeopathic magic-এর চমৎকার দৃষ্টান্ত রচনা করেছে। বিপরীত ভাবে, সেই কালো মুরগীর মধ্যে একটি শুভংকর শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে: কালো মুরগীর ডাক শোনা মাত্রই নিশাচর ও অমঙ্গলকারী ভূত-প্রেত-আত্মা দূরে সরে যায়। কালো মুরগীর নানা রোগ-হরণের ক্ষমতা আছে বলে এবং অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের কোনো-কোনো অঞ্চলে কালো মুরগীকে সুলক্ষণ যুক্ত বলে মনে করা হয়।

তেমনি সাদা মুরগীকে সৌভাগ্যসূচক বলা হয়, যেহেতু সাদা রঙের মধ্যে একটি অকলংক পবিত্রতা আছে বলে মনে করা হয়। সাদা মুরগীর সোনালী রঙের বাচ্চা হওয়াকে ইউরোপে খুব সুলক্ষণ বলে মনে করা হয়। 'সোনালী' রঙ এখানে সোনার প্রতীক।

সর্বপ্রকার অস্বাভাবিকতাই লোকমানসে পরম কৌতূহল নিয়ে লক্ষিত হয়। প্রহরে-প্রহরে যে মুরগী ডাকে, সেই মুরগী যদি আদৌ না ডাকে, তবে তা বিশেষ অকল্যাণের লক্ষণ বলে গৃহীত হয়। ইউরোপে মনে করা হয়, পৃথিবীর শেষ দিন ও শেষ বিচারের দিন আসন্ন, মুরগীর কণ্ঠ তাই স্তব্ধ। আসামের আহোমরা মনে করে, মুরগীর অসময়ের ডাক মৃত্যু ও নানা বিপদপাতের সূচক। ইটালী, জার্মানী ও রাশিয়াতে ব্যাপক ভাবে বিশ্বাস করা হয়, মুরগী যদি মোরগের মতো ডাকতে থাকে, তবে তা অমঙ্গল সূচক। এজন্যে তৎক্ষণাৎ সে মুরগীটিকে মেরে ফেলা হয়। পারস্যে এর বিপরীত মনোভাব দেখা যায়। সেখানে মনে করা হয়, মুরগীটির মধ্যে এক শুভংকর ও শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যে দৈত্যদানবকে হত্যা করতে সমর্থ হবে। সমাধিস্থলে এজন্যেই সেখানে মুরগী ছেড়ে দেওয়া হয়, মৃতের স্বর্গযাত্রায় পথরোধকারী দৈত্যকে সে হত্যা করে ফেলবে, এই আশায়। এর বিপরীত চিত্র আবার Tyrol-এ মেলে। সেখানে সাত বছরের বেশি কোনো কালো মুরগীকে বাঁচতে দেওয়া হয় না ; কারণ, সপ্তম বর্ষে প্রসূত তার ডিম থেকে এক শয়তান দৈত্যের জন্ম হবে।

মুরগীর অসময়ের ডাক কেন অমঙ্গল সূচক, এ বিষয়ে পারস্যে একটি কাহিনী চলিত আছে: রাজা Kayomar তাঁর বৈকালিক নমাজ পাঠের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময়, অকালে, মুরগী ডেকে উঠতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই জন্যে মুরগীর অকাল-ডাক অশুভ। রাজা Kayomarকে নিয়ে কথিত আর একটি 'কথা'য় দেখানো হয়েছে, কেন মুরগী শুভফল-দায়ক। মুরগীর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মুরগী হত্যা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে আবার মুরগীর যে কোনো সময়ের ডাককেই অশুভ বিবেচনা করা

হয়। বাড়ির কাছে, ঝোপের ভেতর, কয়েকটি মুরগীর সমবেত ডাক বাড়িতে ঝগড়ার সৃষ্টি করে,—মুরগীর 'কলহে'র সাদৃশ্যে এখানে মানবের কলহ কল্পিত হয়েছে। এবং,

A whisting maid and a crowing hen
Are neither good for God nor men.

আবার, মুরগীর রব-জাত অমঙ্গল দূরে করবার জন্যে কেউ যদি 'মোরগে'র কণ্ঠস্বর নকল করে ডাকে, তবে তার অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু হয়। এর মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এই : ক) মোরগের তুলনায় মুরগীর কণ্ঠস্বর অমঙ্গলময়; খ) মুরগীর রবজাত অমঙ্গলের Apotropaic Remedy হল মোরগের কণ্ঠস্বর, সুতরাং এর মধ্যে যাদু আছে ; গ) toboo অর্থাৎ Negative Magic : মোরগের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করতে নেই, করলে মরণ আসন্ন হয়।

কিন্তু ইয়র্কশায়ারে এর বিপরীত বিশ্বাস দেখা যায় : নব বিবাহিত দম্পতির গৃহে কেউ যদি 'মুরগী' (মোরগ নয়), নিয়ে গিয়ে ডাকায়, তবে ওই দম্পতির বিবাহিত জীবন সৌভাগ্যময় হয়। বিবাহের প্রসঙ্গে মুরগী সর্বত্রই মঙ্গলময়। ডেভন এবং কর্নওয়ালে বিশ্বাস আছে, মুরগী যদি অস্বাভাবিক কণ্ঠে ডেকে ওঠে, তবে বাড়িতে 'অপরিচিত' অতিথির আগমন হয়। এখানে কণ্ঠস্বরের 'অস্বাভাবিক'তা 'অপরিচিত'-তায় রূপ নিয়েছে। এ বিশ্বাসের মূল হল ল্যাংকাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের এই বিশ্বাস : দরজার দিকে মুখ করে মুরগী ডাকা অচেনা অতিথির আগমনের নিশ্চিত ইঙ্গিত। এখানে 'দরজা' আসবার পথকে যেহেতু নির্দেশ করে, সেই হেতুই কারো আগমনের প্রসঙ্গ এসে গেছে।

রোমানরা যেমন মুরগী দিয়েই ভবিষ্যতের ফলাফল নিরূপণ করত, তা এখনও বিশ্বের বহু অঞ্চলে পালিত হয়। ভারত থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দিই। আহোমদের মধ্যে মোরগ বা মুরগীর পা কেটে ভবিষ্যৎ গণনার রীতি চলিত আছে। আবোর-দের একটি ভাগ 'মিরি'-রা বনদেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন পাখি বলি দিয়ে তার অন্ত্র পরীক্ষা ক'রে ভবিষ্যতের শুভাশুভ নির্ণয় করে। আসামের 'দফলা'-দের পুরোহিতরাও মুরগীর অন্ত্র পরীক্ষা করে, শুভাশুভ নির্ণয় করে। ত্রিপুরা জেলার আদিবাসীরা নতুন ধান ঘরে উঠলেই দেবতার ('রুন্দক'-এর) সম্মুখে দুটি মুরগী ('তক্জুক্') বলি দেয়। এক-একটি মুরগী বলি দেবার পর কলা-পাতার ওপর ফোঁটা-ফোঁটা করে রক্ত ফেলা হয়। রক্ত টকটকে লাল হলে ফসলের পক্ষে তা সুলক্ষণ ব'লে ধরা হয়। বলি দেওয়া মুরগীর পেট চিরে, তার অন্ত্র বের করেও শুভাশুভ পরীক্ষা করা হয়। যদি অন্ত্রের সংযোজক ঝিল্লিটি ছিঁড়ে যায়, তবে সেটিকে অমঙ্গলজনক বলা হয়। এই পদ্ধতিতে শুভাশুভ লক্ষণ বিচারকে তিপ্রা ভাষায় বলে "ছেমানাইঅ"।

শুভাশুভ জ্ঞাপনকারী অপর প্রখ্যাত পাখি—ম্যাগপাই। অবশ্য খ্যাতি যতো, কুখ্যাতি তার চেয়ে ঢের বেশি। সমালোচকদের মধ্যে সকলেই এক মত যে, ম্যাগপাই-সংক্রান্ত সংস্কার-বিশ্বাস সবই কাক বা দাঁড় কাক থেকে সঞ্চারিত। আমি সে

সিদ্ধান্তের আংশিকতায় বিশ্বাস করি। দেখাব যে, কাকের কয়েকটি ভালো-মন্দ দিক ম্যাগপাইতে আছে বটে, কিন্তু সর্বাংশে নয়। দ্বিতীয়ত, একই ধরণের সংস্কার-বিশ্বাস একাধিক পাখির মধ্যেই আছে, কাজেই ম্যাগপাইয়ের মধ্যেও আছে, অতএব কেনই বা তা কেবল কাক থেকেই সংক্রামিত হবে!

'The Folk-lore of birds' (London: 1958) বইতে এডওয়ার্ড এ. আর্মস্ট্রং এ প্রসঙ্গে গুটি দুই প্রমাণ দিয়েছেন (P. 73)। তাঁর প্রথম প্রমাণ, দাঁড় কাক যেমন একই সঙ্গে শুভ ও অশুভকারী, ম্যাগপাই-ও তাই, অতএব দাঁড়কাক ও ম্যাগপাই অভিন্ন। এর উত্তরে আমি বলব, যুগপৎ শুভাশুভ সাধনের ক্ষমতা কেবল কাক বা দাঁড় কাকেরই নেই, অন্যান্য প্রায় সব পাখিরই আছে, আমার বর্তমান আলোচনা থেকেই তার নিঃসংশয়িত প্রমাণ একাধিক বার মিলবে। আর্মস্ট্রংয়ের দ্বিতীয় যুক্তি বিশেষ দুর্বল: ম্যাগপাইয়ের সংখ্যার ওপর তার শুভাশুভত্ব নির্ভরশীল। বলা দরকার, কাকের শুভাশুভত্ব প্রসঙ্গে কোনো সংখ্যা নেই; কেবল জোড়-বিজোড় সংখ্যার কথায় শোনা যায়। প্রায় একই ভুল Angelo De Gubernatis করেছেন তাঁর 'Zoological Mythology' (London: 1872; Vol II: P 260) বইতে। তাঁর মতে, ম্যাগপাইয়ের দুই বিপরীত রঙ—সাদা-কালো—তাই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। উপযুক্ত কারণেই আমি তা স্বীকার করি না। তবে, Gubenatis কাকের সঙ্গে ম্যাগপাইয়ের সাদৃশ্যের একটি দিক লক্ষ করেছেন, যা উল্লেখযোগ্য: বিভিন্ন পৌরাণিক ও লোককথাতে কাককে সোনা-রুপো প্রভৃতি চুরি করতে দেখা যায়, ম্যাগপাইও উজ্জ্বল পদার্থ ভালোবাসে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'Animal thief' এই Motif-এর মধ্যে শুক ও আবাবিলও আছে। ম্যাগপাইয়ের সঙ্গে কাকের যদি কোনো সম্পর্ক থেকেই থাকে, সর্বপ্রথমেই যা লক্ষ করা উচিত ছিল, তা হল, উভয়ের কণ্ঠস্বর: কাকের কর্কশরব ও ম্যাগপাইয়ের নিরবচ্ছিন্ন কণ্ঠরব বেশ তুলনীয়। 'ম্যাগপাই' নামটিও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়: Margaret (>Mag+pie) নাম্নী জনৈকা বাচাল স্ত্রীলোকের নামানুসারে পাখিটির নামকরণ হয়েছে, এখন যে কোনো বাচাল লোককে নির্দেশ করতে নিন্দার্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। গ্রীক ও ল্যাটিনদের বিশ্বাস অনুসারে ম্যাগপাই মদ্য-দেবতা Bacchus-এর প্রিয়, কারণ, মাতালরা বাচাল হয়। যে ভাবেই দেখা যাক না, এই নামকরণ ও দেব-আসঙ্গ, কোনোটার মধ্যেই ম্যাগপাইয়ের প্রতি প্রীতি প্রদর্শিত হয় নি। এখানেই এই পাখির অশুভত্বের মূল, যদিও তার গায়ের সাদা-কালো রঙের কথাও এখানে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

জার্মানীতে বিশ্বাস আছে, ম্যাগপাই নেকড়ের আগমন-সংবাদ দেয়, অতএব তা অবধ্য, এবং বধ করলে দুর্ভাগ্য আসন্ন হয়। শেয়াল ও সশস্ত্র মানুষকে আসতে দেখলে ম্যাগপাই ডেকে উঠে সাবধান করে দেয়। ফ্রান্স, চীন ও ভারতের বিভিন্ন অংশে ম্যাগপাই হত্যা করা অশুভ ব্যাপার। ম্যাগপাইয়ের মধ্যে শুভত্বের দিক লক্ষ

করেই অনেকে বাড়িতে খাঁচায় ম্যাগপাই পোষে, দু-একটি কথাও বলতে পারে। চীনা ভাষায় ম্যাগপাইয়ের যে প্রতিশব্দ, তার আক্ষরিক অর্থ হল "আনন্দের পাখি"। সেখানে তাই বিশ্বাস করা হয়, বাড়ির কাছে ম্যাগপাই বাসা বাঁধলে বাড়ির সকলের পক্ষেই তা শুভ। বাড়ির সম্মুখ অংশে ম্যাগপাইয়ের ডাক অতিথির অচির আগমনের কথা ব্যক্ত করে। কোনো কাজ আরম্ভ করবার কালে কিংবা কোথাও যাত্রাকালে এ পাখির ডাক হঠাৎ শুনতে পেলে তা সাফল্যের ইঙ্গিত বলে ধরে নেয়। কিন্তু ইংলণ্ডে যাত্রাকালে ম্যাগপাই-দর্শন অশুভ। চীনের মাঞ্চুরা সর্বদাই ম্যাগপাইকে শুভ ও পবিত্র পাখি বলে মনে করে, তাদের প্রাচীন উদ্ভব-ইতিহাসের সঙ্গে এ পাখি জড়িত। ইউরোপে বিশ্বাস আছে, ঘরের চালে ম্যাগপাই বসলে সে ঘরবাড়ি জলে কোনদিনই বিনষ্ট হবে না। ল্যাংকাশায়ারে বিশ্বাস আছে: যাত্রাকালে দুটি ম্যাগপাইকে একত্রে দেখলে বেশি পরিমাণে মাছ ধরা যায়।

কিন্তু ম্যাগপাইয়ের সঙ্গে অমঙ্গল ও অকল্যাণেরও যোগ আছে। নরওয়েতে এ পাখি হত্যা করা অশুভ বলে বিবেচিত বটে, কিন্তু May dayতে এ পাখির ডিম চুরি করা হত আনুষ্ঠানিক ভাবে! অর্থাৎ যে মাস থেকে এ পাখি অশুভ বলে বিবেচিত হত। জার্মানীতেও এ পাখি হত্যা করা অশুভ, কিন্তু 'বড়দিনে'র সময় বারো দিন ম্যাগপাই হত্যা এক আবশ্যিক কর্ম ছিল। আমার মতে, মে মাস ও খ্রীষ্টমাসে ম্যাগপাই সম্পর্কে এই বৈরিতার দুই বিপরীত কারণ আছে: কঠোর শীতের পর বসন্তের আগমনে এবং মে দিবস থেকে দিন বড়ো হতে থাকে—এই দুই দিন এ পাখির প্রতি নিষ্ঠুরতার দুটি বিরুদ্ধ কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। জার্মানীতে আবার ম্যাগ-পাইকে নরকের অপবিত্র পাখি বলে মনে করা হয়, ডাইনীরা নাকি এ পাখিরই রূপ ধারণ করে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ম্যাগপাই অশুভ পাখির রূপেই চিহ্নিত।

ম্যাগপাইয়ের মধ্যে শুভাশুভের এই যুগপৎ অধিষ্ঠান দেখেই হয়তো চীনে এই প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে: 'its Voice is good, but its heart is bad,' তাই ম্যাগপাই ডাকলে হয় শুভ ঘটনা রূপে অতিথি আসে, নয়তো অশুভ ঘটনা রূপে মৃত্যু সংবাদ আসে (অতিথি আগমনের বিকল্পে মৃত্যু সংবাদের আগমনের ইঙ্গিত অন্যান্য পাখির ডাকেও মেলে)। ম্যাগপাই সম্পর্কে অতি-পরিচিত ছড়াটি লক্ষ করলে এই দ্বিকল্পভাব আরো পরিস্ফুট হয়: One for sorrow/Two for mirth/Three for a wedding/Four for death ঠিক বিপরীত ভাবে দুঃখ-আনন্দ, বিবাহ ও মৃত্যুর কথা পর-পর বলা আছে। ইয়র্কশায়ার ও ল্যাঙ্কশায়ারে শেষ পঙ্‌ক্তিটির কথান্তর মেলে: Four for a birth, তাও মৃত্যুর ঠিক বিপরীতে। ম্যাগপাই দর্শন-জাত অমঙ্গল এড়ানোর পদ্ধতির মধ্যেও বৈপরীত্য আছে: একদিকে টুপী খুলে ম্যাগপাইকে স-সম্ভ্রম অভিবাদন বা ক্রস চিহ্ন অংকনের বিনয়-নম্রতা; অপর দিকে, ম্যাগপাইয়ের উদ্দেশে নিষ্ঠীবন ত্যাগ॥

...১১...

কপোত, ঘুঘু, হাঁস, মরাল, সারস ও ময়ূর প্রভৃতি পাখিকে নিয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শুভাশুভ নিরূপণের বহু আচার-নিয়ম-পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা জাতির দিক থেকে কপোত ও ঘুঘুকে একই শ্রেণীর বলে মনে করেন, এবং লোকচারণাতেও দেখা যায় উভয়ে অভিন্ন হয়ে গেছে। কপোত ও ঘুঘুকে খ্রীষ্টান সংস্কৃতি ও ধর্মে যতখানি উচ্চ ও মঙ্গলময় স্থান দেওয়া হয়েছে, ভারতীয়, বিশেষত বঙ্গীয় সংস্কারে, ততখানি নয়। বরং কোথাও কোথাও কপোত-ঘুঘুর মধ্যে এক অশুভকারী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই মনোভাবের পার্থক্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই দু'টি পাখির সম্পর্কে শুভাশুভত্বের প্রকার ও পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। খ্রীষ্টান সংস্কৃতিতেও ঘুঘু সম্পর্কে বিরুদ্ধ বিশ্বাস রয়েছে: Turtle dove যেখানে মানুষকে বজ্র-বিদ্যুৎ, আগুন ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে, Mourning dove (নামের মধ্যেই বিষাদ!)-এর অবিশ্রান্ত ডাক সেখানে পরিবারে কারো মৃত্যুর সূচনা করে।

তবে, পরিমাণের দিক থেকে সেখানে কল্যাণকারী দিকটিই বেশি দেখা যায়। ঘুঘু স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, শয়তান অন্য সব প্রাণীর রূপ ধরতে পারে, কেবল ঘুঘুর রূপ ছাড়া। প্রাচীন ঈজিপ্‌শীয়ানদের কাছে কপোত-ঘুঘু "নিষ্কলঙ্কতা"র এবং চীনায়দের কাছে 'দীর্ঘজীবিতা'র প্রতীক রূপে গণিত ছিল। Noah-র Ark; যিশুর জন্ম ও পুনরুত্থান, ইত্যাদির সঙ্গে ঘুঘুকে জড়িয়ে তার মহিমা বৃদ্ধির মূলে আছে এ পাখির সম্পর্কে শ্রদ্ধা-সম্মত প্রাচীন মনোভাব। প্রেম, উর্বরতার দেবতা (যেমন, Ishtar, Aphrodite প্রভৃতি)-দের প্রিয় বলে তাঁদের কাছে ঘুঘু বলি দেওয়া বা উৎসর্গ করা হত। বহু দেশেই এরই ফলে নানা মন্ত্র ঔষধ এবং শুভাশুভ নিরূপণের ক্ষেত্রে ঘুঘুর ব্যবহার দেখা যায়। শ্বেত বর্ণের মধ্যে পবিত্রতার অস্তিত্ব কল্পিত হবার দরুণ কারো মাথার ওপর দিয়ে শ্বেত পারাবত (ঘুঘু, কপোত) উড়ে যাওয়া বিশেষ শুভলক্ষণ রূপে গৃহীত হয়। ঘুঘুর স্বপ্ন দেখাও এই জন্যে সুখ-শান্তির ইঙ্গিত বলে ধরা হয়। বছরে প্রথম ঘুঘুর ডাক শুনেই কেউ যদি তিনটি বর প্রার্থনা করে, তবে বাস্তবে তা ফলে। এই বিশেষ দিকটি কোকিল সম্পর্কেও উক্ত হয়, আগেই তা দেখেছি।

ইংলণ্ড এবং ইউরোপ আমেরিকার বহু অঞ্চলে ঘুঘু মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়, যা ঘুঘুর অমঙ্গলময় দিকটিকে নির্দেশ করে। ওয়েলস্‌-এর কয়লাখনির কর্মীরা খনির ওপর দিয়ে ঘুঘু উড়ে যাওয়াকে পরম বিপদের ইঙ্গিত বলে মনে করে। ঘুঘুর বর্ণ ভালোমন্দের সূচক হয়েছে, অন্যান্য পাখির মতোই। তাই শ্বেত কপোত পবিত্রতা ও নানা কাব্যময় শুভবোধের প্রতীক, কিন্তু লাল বা গাঢ় বর্ণের কপোত-ঘুঘু ভালো-মন্দয় মিশ্রিত

নানা অনুভূতির প্রতীক। ঋগ্বেদে যে ধূসর ও গাঢ় বর্ণের কপোতের কথা আছে, ওই বর্ণের জন্যই তা মৃত্যুর সূচকরূপে কথিত হয়েছে। যুদ্ধরত দুই ঘুঘুকে (The Ring-dove) দেখা বা তার রব শ্রবণ গুজরাটে অলক্ষণ বলে গৃহীত হয়। বঙ্গদেশে ঘুঘুর নিরন্তর ডাক পরিবারের সকলের মৃত্যুর সূচক—এই জন্যেই বলা হয় কারো "ভিটেয় ঘুঘু চরানো"।

প্রাচীন ভারতে কপোতকে সুনজরে দেখা হয়নি, বর্তমান ভারতেও নয়। অথর্ববেদে (৬. ২৯. ১, ২) কপোত ও উলূককে অমঙ্গলের দূত বলা হয়েছে। প্যাঁচার সঙ্গে কপোতের একত্র উল্লেখ কপোতের অমঙ্গলকারিতাকেই সপ্রমাণ করে। ঋগ্বেদে (১০. ১৬৫. ১৫) কপোত দর্শনের ফলে অমঙ্গল নিবারণের জন্যে স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। বাজসনেয়ি সংহিতায় (২৪. ২৩, ৩৮) মিত্র বরুণ এবং নির্ঋতির উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫. ৫. ১৮) নির্ঋতির উদ্দেশে কপোতের উল্লেখ মেলে। কপোত অগ্নিস্পর্শ করলে তা মহাঅমঙ্গলের সূচনা করে বলে উক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাভারতের শ্যেন-কপোতের বহু-পরিচিত উপাখ্যানে শ্যেন হলো ইন্দ্র, এবং কপোত অগ্নি।

লৌকিক আচারেও কপোত (পারাবত) সম্পর্কে বিরুদ্ধ বিশ্বাস দেখা যায়। 'তিন গুণ তের দোষ / জেনে-শুনে পায়রা পোষ।' তিন গুণের মধ্যে আছে: পারাবতের ডানার বাত সে বাত রোগ সারে; গৃহের লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি করে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু দোষের পরিমাণ অনেক বেশি। নিষ্ঠাবান হিন্দু পায়রার মাংস খান না বা তাঁর রান্নাঘরে রাঁধা হয় না। কিন্তু বিহারে গোঁড়া হিন্দুও পায়রার মাংস খেয়ে থাকেন। পায়রা চায়, কেবলই এর বংশবৃদ্ধি হোক এবং গৃহ জনশূন্য হোক। অনেকেই এই ভয়ে স্বেচ্ছায় পায়রা পুষতে চান না। কিন্তু পায়রা যদি স্বেচ্ছায় কোনো গৃহে এসে বসবাস করতে থাকে, তা বিশেষ সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। তখন পায়রাকে আশ্রয় না দিলে বিশেষ অমঙ্গল হয়। 'কপোত বৃত্তি', 'পারাবত বৃত্তি' ইত্যাদি পদে কপোতের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশিত হয় নি।

পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কার ও সাহিত্যে কপোত-ঘুঘু পরিশেষে হাঁস, রাজহাঁস, মরালে রূপান্তরিত হয়েছে। মাঝে-মাঝে যাদু-মন্ত্রগুণে হাঁস বা রাজহাঁস অকল্যাণ-জনক কর্মে লিপ্ত হলেও মূলত এরা শুভংকর ও শুভ ফলদায়ক। উত্তর-পশ্চিম সাইবেরিয়ার Ostiak-দের মধ্যে হাঁস দেবতারূপে গণিত হয়। ভারতের ব্রহ্মা হংসারূঢ়, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের সাধনার স্তরানুযায়ী 'হংস' বা 'পরম হংস' বলা হয়। গ্রীস, ইজিপ্ট ও রোমেও হাঁস দেবত্ব অর্জন করেছিল। হংস-দম্পতি পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠাবান বলে প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে হাঁস মাঙ্গলিক বস্তুরূপে চিহ্নিত হয় চীনে এবং অন্যত্র। হাঁসের মধ্যে একটি মহিমা লক্ষ করবার দরুণই হাঁসের জন্ম সম্পর্কে নানান কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল: যেমন এক ধরণের সামুদ্রিক গাছ

থেকে হাঁসের (Barnacle goose) জন্ম হত ; কিংবা মাতা বসুন্ধরা Tomam-এর জামার আস্তিন থেকে।

হাঁসের সঙ্গে সূর্যের, এবং ফলে উর্বরতা ও প্রাচুর্যের নিবিড় যোগ আছে। উর্বরতা ও প্রাচুর্যের সঙ্গে কৃষি ও অর্থ-সম্পদের কথাও এসেছে। ইংল্যান্ডের শ্রপশায়ারে মাঠ থেকে শস্যের শেষ অংশ কেটে নেয়াকে বলে 'Cutting the gander's neck', এবং তা করলে পরের বছর প্রচুর শস্য মেলে ; ফসল কাটার পর আর এক উৎসবের নাম 'The Inning Goose'। ইংলন্ডের পল্লীগ্রামে 'Michaelmas Day'-তে অর্থাৎ ২৯শে সেপ্টেম্বর, হাঁস খাওয়া সৌভাগ্যসূচক এবং সেদিন হাঁস খেলে সে বছর, কোনো দিনই অর্থাভাব হবে না বলে বিশ্বাস আছে। ডেনমার্কে 'St. Martin's Day' অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর তা খাওয়া হয়। হাঁস খাওয়া কিন্তু হাঁসের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করা নয়, বরং ঠিক তার উল্টো, হাঁসের কল্যাণকর শক্তিকে অর্জন করবার প্রয়াস,—'Contagious magic-এর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। ইজিপ্শীয় পুরাণে সূর্য-দেবতা Ra একটি ডিম থেকে জন্মেছিলেন, তারই প্রভাব আছে এর পেছনে।

হাঁসের এই কল্যাণকারিতার ফলে হাঁস ও হাঁসের ডিমকে রক্ষা করবার জন্যে নানা লোকবিশ্বাসেরও সৃষ্টি হয়েছে। সীজার ব্রিটেনে গিয়ে দেখতে পান, সেখানে হংসী ভক্ষণ নিষিদ্ধ, শেক্সপীয়ারের কালেও তা অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হত। এই রীতি স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে সেখানে যেতে পারে। নর্সদেরও হংসী ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। পূর্ব প্রাশিয়াতে বিশ্বাস আছে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, St. Mathew's Day-তে চাষী-বউরা যদি সুতো কাটতে বসে, তবে গৃহপালিত হাঁসের পক্ষে তা ক্ষতিকারক। গাছের সঙ্গে হাঁসের সংযোগ আগেই লক্ষ করেছি, ওরচেস্টশায়ারে বিশ্বাস আছে, কাউকে এক মুঠোর কম ভায়োলেট বা প্রিমরোজ ফুল দিলে, তার বাড়ির হাঁসের বাচ্চাদের পক্ষে তা অকল্যাণজনক। রাটল্যান্ডে মনে করা হয়, সূর্যাস্তের পর অপরের বাড়িতে ডিম নিয়ে গেলে তা ফোটে না—হাঁসের সঙ্গে সূর্যের যোগ এই বিশ্বাসে স্পষ্টতর হয়।

কিন্তু কল্যাণের পাশেই অকল্যাণ : কেল্ট্ এবং অন্যান্য অঞ্চলে মনে করা হয়, হাঁস যদি মেটে রঙের ডিম পাড়ে, গৃহস্থের পক্ষে তা অমঙ্গল, সে অমঙ্গল খণ্ডাবার জন্যে হাঁসটিকে মেরে ফেলা হয়। এখানে রঙের অস্বাভাবিকতাই অমঙ্গলের কারণ রূপে গৃহীত হয়েছে। ওয়েলস্-এ বিশ্বাস করা হয় : হাঁস যদি একটি নরম ডিম ও একটি শক্ত ডিম পাড়ে, কিংবা একই দিনে দু'টি ডিম, তা হলে পরিবারে দুর্ভাগ্য ঘনায়। এখানে দু'রকম ডিমের বৈসাদৃশ্য অস্বাভাবিকতারূপে গৃহীত হয়।

ওয়েলস্ এই বিশ্বাস আছে : হাঁস বাসা ছেড়ে অন্যত্র ঘুরে বেড়ালে বাড়িতে আগুন লাগবার সম্ভাবনা। আশ্চর্যের কথা এই, হাঁসের সঙ্গে আগুনের যোগ প্রাচীন ভারতেও লক্ষ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে (১. ৬৫. ৯) গৃহে অগ্নি-সংঘটনকে

জলমধ্যে হংসের সন্তরণ বলা হয়েছে। এই আগুন আসলে সূর্য, যে সূর্যের সঙ্গে হাঁসের যোগের কথা বারংবার বলেছি। বাজসনেয়ি সংহিতায় (১৯. ৭৪) আদিত্যকে আলোকস্বরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট হংস বলা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪. ২০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে আদিত্য 'শুচিপদ' (শ্বেতপাদ) হংস রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। রামায়ণে আকাশকে এক হ্রদ বলা হয়েছে, সূর্য যেন সেই হ্রদের উজ্জ্বল এক হংস। এই সূর্য-সম্পৃক্ততাই হাঁসকে এক কল্যাণকারী প্রাণীতে পরিণত করেছে।

হাঁস থেকে অতঃপর রাজহাঁস-মরাল এবং সারসে এর পরিণতি ঘটেছে। চীনে সারস দুই বিরুদ্ধ সংস্কারসহ গৃহীত হয়েছে। একদিকে সারসকে দীর্ঘ জীবিতার প্রতীক বলে মনে করা, অপরদিকে চৌ বা পরবর্তী হান বংশের আমলে সারস উপাসনাকে অকল্যাণজনক বলে বিশ্বাস করা। গ্রীক চাষীরা সারসের সঙ্গে কৃষি-কাজকে জড়িয়ে নিয়েছিল: সারসেরা দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করবার পর প্রতি বছর শরৎকালীন চাষ তারা আরম্ভ করত। গুজরাটেও সারসের দক্ষিণ দিকে উড়ে যাওয়া শুভ ঘটনা বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে সারসকে স্পষ্টতই সৌরপাখি রূপে স্বীকারের কথা আছে, যা হাঁসের সঙ্গে তাকে অভিন্ন করে। Alabamaর নিগ্রোরা মনে করে, বাড়ির ওপর দিয়ে তিনবার সারস চক্র দিয়ে উড়লে, পরিবারের কেউ মারা যাবে। লোককথাতেও সারসের সাহায্যকারী ও হিংস্র লোভী দুই বিপরীত চরিত্র মেলে। সারসের সঙ্গে সাদা কাক (Heron)-এর কথা আসে। সাদা কাক গুলি করে হত্যা করা অমঙ্গলজনক বলে ইংলণ্ডে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়। সাদাকাক যদি বিশেষ ধরনের কাক (Rooks)-কে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেয়, তবে ওই Rookery-র মালিক-পরিবারে অমঙ্গল ঘনিয়ে আসে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের এক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে আইরিশদের মধ্যে রাজহংস বা বা মরাল হত্যা নিষিদ্ধ। রাজহংসকে সেখানে বলা হয়, 'The Children of Ler'। Ler হলেন গল্-দের সমুদ্র-দেবতা; তাঁর প্রথমা পত্নী Aebh-এর গর্ভজাত চারটি সন্তানকে ঈর্ষাবশত তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী Aeife তিনি Aebh-এরই সহোদরা) চারটি রাজহংসে পরিণত করে দেন। দেবতা ও মিলেশিয়ানরা প্রতি বৎসর এই রাজহংসদের দেখতে আসতেন। মিলেশিয়ানরা চিরংবে এই নিয়ম করে দেয়, আয়ার্ল্যাণ্ডে কেউ কোনো দিন মরাল হত্যা করতে পারবে না।

সূর্যের প্রসঙ্গে ময়ূরের কথা এলো। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ময়ূর দুই বিপরীত মনোভাব দ্বারা গৃহীত হয়েছে। ভারত এবং এশিয়া এবং এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে গ্রীস ও রোমে ময়ূর শুভ ফলদায়ক; কিন্তু খৃষ্টোত্তর কালে গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ময়ূর এক অলক্ষুণে পাখি। ভারতে ময়ূরের সঙ্গে দেবতা, রাজা, ধন-সম্পদ, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ের যোগ আমরা পূর্বেই লক্ষ করে এসেছি, এবং ওই বিষয়সমূহের পক্ষে ময়ূর মঙ্গলসূচক প্রাণিরূপে ব্যাপক ও নির্দ্বন্দ্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে দেখেছি। নানা প্রকার রোগহরণের ক্ষমতার মধ্যেও ময়ূরের মাহাত্ম্য স্বীকৃত

হয়েছে। পূর্ণরূপে বিস্তৃত ময়ূরের কলাপদর্শন গুজরাটে কর্ম-সাফল্যের ইঙ্গিত দেয়। এখানে কলাপের 'পূর্ণতা' কর্মের 'পূর্ণতায়' রূপ নিয়েছে। ময়ূর দর্শনও হিন্দুদের কাছে শুভ বলে কথিত হয়েছে (Omens among the Hindus : Jounal of the Anthropological Society of Bombay : Vol. I No 5, pp. 295-299 : John De Cunha)। এর মধ্যে তাই যাদুশক্তির অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে।

গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতিতে জুপিটার-প্রিয়া দেবরাণী জুনো বা হেরা-র প্রিয় পাখি ময়ূর প্রাক্‌খ্রীষ্ট যুগে মঙ্গলকারী পাখি রূপে স্বীকৃত ছিল। ময়ূরের পাখার 'সহস্র' বা 'শত' 'চোখে'র কারণ রূপে ভারতে যেমন ইন্দ্র জড়িত, ইউরোপে তেমনি জুনো। এই জন্যেই ময়ূরকে সেখানে বলে 'Avis Junonia' বা 'Ales Junonia'। রোমানদের কাছে দেবত্বের মর্যাদা-প্রাপ্ত ময়ূর খ্রীষ্টানসংস্কৃতির প্রাথমিক যুগেও 'অমরতা' ও 'অসীমতা'র বাঞ্ছনীয় প্রতীক ছিল, যার জন্যে রোমের ভূগর্ভস্থ সমাধিস্তম্ভে ময়ূর-মূর্তি প্রদত্ত হত।

কিন্তু কালক্রমে ইউরোপে ময়ূর এক অশুভকারী শক্তিতে অধঃপতিত হল। বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখা বিশেষ অমঙ্গলের কারণ বলে মনে করা হয়। এমন কি, ময়ূরের ছায়া বা ছবিও অকল্যাণকারী রূপে বিবেচিত হয়। এর ফলে কুমারীর বিয়ে বিলম্বিত হয়, এবং নারীর সন্তান হয় না, অথচ ভারতে উর্বরতার সূচক হল ময়ূর। নাটকাভিনয়ের মঞ্চে ময়ূর-পালকের অবস্থিতি ওই নাটকের অভিনয়ে সাফল্যের পক্ষে বিরাট বাধাস্বরূপ। ময়ূরের এই অশুভতার জন্যেই নানা কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়, ময়ূরের পাখায় আছে দেবদূতের সৌন্দর্য, কণ্ঠে শয়তানের স্বর এবং তার চলন-ছন্দ চোরের মতো। শ্রীমতী Marian Emily Roalfe Cox (১৮৬০-১৯১৬) তাঁর 'Introduction to Folklore' (1897 Edition, p. 17) বইতে একটি প্রচলিত কাহিনী দিয়েছেন : ঈশ্বর যখন ময়ূরকে সৃষ্টি করলেন, তখন সাতটি ভয়ংকর 'পাপ' (Sins) ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে ময়ূরের সুন্দর ও রঙীন পালকের দিকে চাইল। সাত 'পাপে'রা ময়ূরের সৌন্দর্যের জন্যে বিধাতার কাছে অনুযোগ করলে। বিধাতা তখন ঈর্ষার পীত চোখ, হত্যার লাল চোখ, অসূয়ার সবুজ চোখ, এবং অন্যান্য অপগুণের অন্যান্য রঙ ময়ূরের পাখায় ঢেলে দিয়ে তাকে উড়িয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে সাত শয়তানের পাপময় চোখও ময়ূরের পাখায় জুড়ে দিলেন। তাদের চোখ উদ্ধার করবার জন্য আজও সেই সাত শয়তান ময়ূরের পেছু-পেছু ছুটে চলেছে। এই জন্যেই ময়ূরের পালক দিয়ে যখন কেউ অঙ্গসজ্জা করে, তখন দুর্ভাগ্য ও বিপদ চতুর্দিক থেকে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বলে ইংরেজদের মধ্যে বিশ্বাস আছে।

ময়ূর-সম্পর্কে এই বিরূপ মনোভাবের কারণ কী ? প্রথমত, ময়ূর ইউরোপীয়দের কাছে একটি বিদেশী পাখি, ভারত থেকেই তা ইউরোপে নীত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শীতকালে ময়ূরের পালক পড়ে গিয়ে সে কুৎসিত-দর্শন হয়ে যায়, কাকের সঙ্গে তখন কণ্ঠস্বর ও দৈহিক আকৃতিতে তার কোনো তফাত থাকে না, কাক সম্পর্কেও সেখানে

উচ্চ ধারণা নেই। বর্ষাকালে কাকেরও ঘাড়ের পালক খসে পড়ে। তৃতীয়ত, ময়ূরের সঙ্গে শয়তানের সংযোগ মুসলিম সংস্কৃতিতেও বিশ্বাস করা হয়। ময়ূরই স্বর্গের দুয়ার খুলে দেওয়াতে শয়তান স্বর্গে গিয়ে প্রবেশ করেছে। এমন কি, যে ইয়েজিদি-রা (The Yezidis) ময়ূরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করে, তারাও আসলে এভাবে শয়তানেরই উপাসনা করে। চতুর্থত, গ্রীস-রোমে ময়ূর পবিত্র বলে বিশ্বাস থাকা কালে ময়ূর-পালক দিয়েই মন্দির সজ্জিত করা হত, পুরোহিত ব্যতীত অপর কারো তাতে হাত দেবার অধিকার ছিল না, হাত দিলে যে পাপ হত, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ছিল। এই মৃত্যু-সংযোগের ফলেই কালক্রমে তা চরম অশুভতায় রূপ নেয়। পঞ্চমত, খ্রীস্টান সংস্কৃতি ময়ূরকে সুনজরে দেখে নি॥

...১২...

সব ধরণের পাখিরই আচার-আচরণ থেকে শুভাশুভ আদায় করা হত বটে, তবে তাতে প্রধান-অপ্রধানের একটা ভেদ দেশ ও সংস্কৃতির ভেদ অনুযায়ীই এসে গিয়েছিল। প্রধান পাখিদের কথা এতক্ষণ বললাম, এবার অপ্রধান পাখিদের প্রসঙ্গে আসি।

ডাইভার (Diver) বা ডুবুরি পাখির মধ্যে জল-হাওয়া সম্পর্কে নানা প্রাজ্ঞ-দৃষ্টি, নানা প্রকার আত্মা-প্রেতাত্মার অস্তিত্ব লক্ষ করবার দরুণ Buriat এবং Yakut-রা কখনই ডাইভার হত্যা করে না, বা তার নীড় নষ্ট করে না। Tungu-রা এর মধ্যে এতোই যাদু-ক্ষমতা লক্ষ করেছে যে, তারা এর নামোচ্চারণ পর্যন্ত করে না, অমঙ্গলের ভয়ে। অবশ্য, মরাল, সারস ও গাংচিল সম্পর্কেও এই বিশ্বাস রয়েছে। নরওয়ের লোকেরা ডাইভার হত্যা খুব অপবিত্র কর্ম বলে মনে করে। এস্কিমোরা ডাইভারের মাথা ও চামড়ার মধ্যে নানা 'শক্তি'র অস্তিত্ব অনুভব করে থাকে,—একে মঙ্গলকারী জ্ঞানে।

রবিন পাখি কারো হাতে নিহত হলে তার হাতটি কাঁপতে থাকে, কিংবা কেউ হত্যা করলে ডান হাতে মাংস পিণ্ড উঁচু হয়ে ওঠে, যাতে সে কোনো কাজ করতে না পারে। আর্যাল্যাণ্ডে এ বিশ্বাস আছে। কোন ব্যক্তি 'Wren' (এক ধরণের ক্ষুদ্র গায়ক পাখি) হত্যা করলে কিংবা তার নীড় নষ্ট করলে এক বছরের মধ্যে তার হাড় ভাঙবে, এটি প্রসঙ্গত তুলনীয়। ইয়র্কশায়ারের চাষীদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, রবিন হত্যা করলে বাড়ির গোরু রক্তবর্ণ দুধ দেবে। এ বিশ্বাস আবাবিল সম্পর্কেও চলিত আছে। রবিনের সঙ্গে দুধ ও লালবর্ণের যোগটি অনুধাবন করতে হবে এই ভাবে : 'রবিন-রেড-ব্রেস্ট্' এই নামের মধ্যেই তার লাল বুকের কথা আছে ; যিশু খ্রীস্টের ক্রস-কাঠের কাঁটা তুলতে গিয়েই তার বুক লাল হয়েছে ; এবং হত্যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকায় লাল রঙ সহজেই এসে যায়। দুধের শ্বেতবর্ণ রবিনের পবিত্রতার দিককে নির্দেশ

করছে। সাদা পদার্থ লাল হল, পবিত্র বস্তু হত্যার অপরাধে অপবিত্র হল। কিন্তু ওয়েলস-এর খনি এলাকাতে বিশ্বাস আছে, খনির ওপর দিয়ে রবিন উড়ে যাওয়া বিপদের সূচনা করে ; পবিত্র ঘুঘু সম্পর্কেও এই একই বিশ্বাস আছে অন্যত্র। দেখা যাচ্ছে, রবিন 'Wren' আবাবিল ও ঘুঘুর সঙ্গে এখানে একাত্ম হয়ে গেছে।

নাইটিঙ্গেল গায়ক ও 'বিদ্বান' বলে কল্পিত হলেও এর মধ্যে অকল্যাণকারী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। আমেরিকার কনেক্টিকাটে Humility পাখি হত্যা করা অমঙ্গলজনক বলে কথিত হয়। 'হিউমিলিটি' শব্দের আক্ষরিক অর্থটি এখানে লক্ষণীয়। এ পাখি খুব উঁচুতে উঠতে পারে না, এবং ওই শব্দ উচ্চারণ করেই ডাকে ; এই ডাকটি কল্পনা করবার মধ্যেই এ পাখির প্রতি প্রীতি ধরা পড়েছে।

বছরে যাযাবর পাখির প্রথম ডাক শ্রবণ ও দর্শন সম্পর্কে বেশ কিছু সংস্কার অনেক দেশেই আছে, ভারতেই এর ব্যাপকতা সর্বাধিক। বসন্তকালীন পাখি 'whip-poor-will' পাখি সম্পর্কেও এমন বিশ্বাস আছে : এ পাখির প্রথম ডাক শোনবার কালে শ্রবণকারী সেই দিন, সেই স্থানে, যে কর্মে রত থাকে, পরবর্তী বছরেও সে সেই দিন, সেই স্থানে একই কর্মে রত থাকবে। প্রথম রব শ্রবণ কালে যে বর প্রার্থনা করা যায়, তা ফলে। এ সব ক্ষেত্রে প্রথম রবের ওপর যাদু আরোপ করা হয়।

হুপো (Hoopoe) ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াতে দেখা যায়, সুতরাং সে সব দেশেই এর সম্পর্কে সংস্কারাদি গড়ে উঠেছে। ইটালীতে হুপো বসন্তের সূচনাকারী ; ক্ষেতে খেঁক শিয়াল লুকিয়ে থাকলে ডেকে উঠে জানিয়ে দেয়, কখন বৃষ্টি হবে, তাও তার ডাক থেকে পল্লীবাসীরা বুঝে নিতে পারে ; আঙুর পেকে ওঠবার আগেই হুপোর ডাক শোনা গেলে প্রাচীনেরা মনে করে, সে বছর খুব আঙুর আর মদ হবে। নানা রোগহরণের ক্ষমতা আছে বলে আরবরা একে "ডাক্তার পাখি" বলে।

হুপোর বিশেষত্ব এর মাথার ঝুঁটি। কথিত আছে, রাজা সলোমন হুপোর প্রাজ্ঞতায় খুশি হয়ে পুরস্কার হিসেবে তার ঝুঁটি করে দেন। এ কাহিনী গড়বার পেছনে হুপোর প্রতি সপ্রশংস মনোভাব লক্ষ করি। এর সম্পর্কে অন্যান্য লোককথাতেও একে মমতাময় ও কর্তব্যপরায়ণ দেখানো হয়েছে, যদিও বিপরীত চিত্রও আছে। এর মাথার ঝুঁটির জন্যে তুর্কীস্থানে একে বলে 'রাণার', ডাক-বহনকারীরা একদা হুপোর মতো ঝুঁটি রাখত। এর অপর ফল, ওই ঝুঁটিকে সৈনিকের শিরস্ত্রাণ বলে মনে করা। সুইডেনে একে তাই ভয় করা হয়, সেখানে এ পাখি বিরল-দর্শন, দর্শন দিলেই মনে করা হয়, দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগবে। ইংলণ্ডেও হুপো অকল্যাণকারী, সেখানেও এটি বিরল-দর্শন। দেখা যাচ্ছে, বিরল-দর্শন বলেই এর মধ্যে অকল্যাণকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারে বাটান (Plover) পাখিকে অলক্ষুণে বলা হয় ; সাতটি বাটানকে একত্র দেখা অকল্যাণসূচক। এখানে 'সাত' এই বেজোড় সংখ্যাটি লক্ষণীয়, অধিকাংশ স্থলেই বেজোড় সংখ্যা অমঙ্গলজনক। যে ইহুদি-রা বিশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করতে

সাহায্য করেছিল, বাটান পাখির রূপ ধরে আজও তারা বেঁচে আছে। এদের তাই বলা হয় 'wandering Jews'. এদের সংখ্যাগত দিকটিই প্রধান, নইলে যিশুর আসংগ তো খুব বেশি পুরোনো নয়।

টিট্টিভ বা টিটি পাখি দর্শন স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে অশুভসূচক বলে কথিত হয়। তবে, এর পেছনে সংস্কার অপেক্ষা রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালের একটা ঘটনা রয়েছে। আরববা মনে করত, যে বছর ঝাঁকে-ঝাঁকে টিট্টিভ পাখি দেশে দেখা যাবে, সে বৎসর খুব দুর্বৎসর, শস্য হানি ও অন্যান্য অভাবের বৎসর। এতই দুর্বৎসর যে, মানুষকে বিছানা-পত্রও বেঁচে দিতে হয়। কিন্তু যে বছর Sterling পাখি পরিমাণে বেশি দেখা যাবে, সে বছর চাষবাস ও ফসল খুব ভালো হবে। এই সব সংস্কারের পেছনে যে যুক্তি কাজ করে, তা হল 'Post hoc, ergo propter hoc' (=After this, therefore, on account of this)।

দীর্ঘকায় সমুদ্র-চারী পাখি অ্যালবাট্রস জাহাজের কাছে-পিঠে উড়তে থাকলে মন্দ আবহাওয়ার লক্ষণ বলে নাবিকরা মনে করে। অ্যালবাট্রস হত্যা করা দুর্ভাগ্যজনক, কোলরিজের প্রখ্যাত কবিতায় তা বলা হয়েছে ॥

…১৩…

ভারতীয় অপ্রধান পাখিদের মাধ্যমে শুভাশুভ নিরূপণের মধ্যেও বৈচিত্র্য বড়ো কম নেই। 'দর্শন'-ঘটিত শুভাশুভই ভারতীয় শকুন-শাস্ত্রের সব চেয়ে বড়ো দিক। 'দর্শনে'র পর রব 'শ্রবণ'। আমার মতে কিন্তু শ্রবণ-জাত শুভাশুভই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; কারণ, দর্শন-জাত শুভাশুভ পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই বেশি পরিমাণে মেলে। বলা দরকার, ভারতের মতো এতো বৈচিত্র্য আর কোথাও নেই, অন্তত আমার চোখে পড়ে নি।

দর্শন-জাত শুভাশুভের কয়েকটি নির্দশন এই : নীলকণ্ঠকে শুভ ও পবিত্রজ্ঞানে প্রণাম করা হয়, দর্শন মাত্রই। বিজয়া দশমীর পর বা সরস্বতী পুজোর পর নীলকণ্ঠ দর্শন মংগলজনক। নীল রঙ এখানে মাঙ্গল্যের কারণ হয়েছে। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে এ বিশ্বাস আছে। 'টেটারি' বা 'টেসকোনা' বা 'টেসুকোনা' নামধের নীলকণ্ঠ পাখিও বিজয়া দশমীর দিন দেখলে শুভ হয়। এই দিন সূর্যাস্তের মধ্যে মাণিকজোড় পাখি দর্শন করা বীরভূমের কৃষক-সম্প্রদায়ের এক আবশ্যিক কর্ম। শীত-প্রধান ইউরোপে কাঠঠোকরা শীত ও বৃষ্টির সূচনাকারী বলে কাঠঠোকরা সেখানে অশুভকারী পাখি রূপে গণিত হয়। ডায়মণ্ড হারবার থানার কোনো-কোনো অঞ্চলে (যেমন জিয়ণ্ড গ্রামে) বিশ্বাস আছে, ছাতারেয়া প্রস্থান করলে অর্থাৎ 'অদর্শন'

হলে গ্রামে কলেরা দেখা দেবেই। যাত্রা-পথে 'হাঁড়িয়া-কোকা' পাখির দর্শন অশুভ। ডাঃ জীবনজী জামসেদজী মোদী জানিয়েছেন, সুরাটের স্ত্রীলোকেরা কুকো বা মহোকার (সেখানে বলে 'কাকরয়ো কুমার') দর্শনকে শুভ ঘটনা বলে মনে করেন। এমন কি, অসুস্থ মানুষ যদি এ পাখি কেবল চোখেই দেখে, তবেও সে নীরোগ হয়ে যায় (Zest in life: The Journal of the Anthropological Society of Bombay: Vol. XIII, No 8, p. 814)। এ পাখি দর্শনের ফলে এক বছরের মধ্যে গৃহীত সকল কর্মে সাফল্য আসে। পারশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিশ্বাস আছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুদের কাছে চড়ুই দর্শন শুভ। ঋগ্বেদে (১০.৯৭.১৩) নীল চাষ পাখি এক অশুভ, ক্ষয়রোগ সৃষ্টিকারী প্রাণী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সকাল বেলায় চাষকে বাঁদিক থেকে ডান দিকে উড়ে যেতে দেখা গুজরাটে মঙ্গলজনক বিবেচনা করা হয়।

রব-শ্রবণ জাত কয়েকটি শুভাশুভ: ফিঙেগর কণ্ঠরব অমঙ্গলের প্রতীক, কেননা, এ পাখি এই বলে ডাকে: 'ঘর পুড়ুক, ছাই খাই'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিশ্বাস এই: সকাল ছাড়া অন্য সময় ফিঙে ('ঝেঁচু') ডাকলে তা অকল্যাণ-সূচনা করে। কাঠঠোকরা যদি বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যেতে-যেতে ডাকে, যশোহরে তবে বিশ্বাস করা হয়, বাড়িতে আত্মীয় অতিথি-কুটুম্ব আসবেই। এই ভাবে ডাকতে-ডাকতে উড়ে যাওয়াকে সেখানে বলে "তুড়ুই হাঁকা"। হলদে পাখি বা কুটুম পাখি বা ইষ্টি-কুটুম পাখির ডাকের ফলে অতিথি-আত্মীয়ের আগমন ঘটে, এ বিশ্বাস বাঙলা দেশের সর্বত্রই আছে। 'হাঁড়িচাঁচা' বা 'পাতিলচাঁচা' বা 'হাঁড়িখুঁড়ী' পাখির ডাক সন্তানবতী নারীর পক্ষে শোনা অমঙ্গল বলে নোয়াখালিতে বিশ্বাস আছে। এ পাখির ডাক শুনেই, বিশেষত রান্না করতে-করতে, সন্তানের শুভকামনায় তাঁরা উনুনে একটু জল ঢেলে দেন। অন্যত্র বিশ্বাস আছে, বাড়ির কাছে হাঁড়ীচাঁচা ঝগড়া করলে বাড়িতেও কলহ-বিবাদ উপস্থিত হয়। হাওড়াতে এ বিশ্বাস ছাতারে সম্পর্কে আছে। হট্টিটি যদি সন্ধ্যে বেলায় ডাকতে-ডাকতে কোনো বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তবে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, বিশেষ অশুভ ঘটনা বলে মনে করে। মালদহে মনে করা হয়, বাড়িতে কলহ-বিবাদ হবে। সে জন্যে এ পাখি উড়ে যাবার চেষ্টা করলে বাধা দেওয়া হয়; আর যদি উড়েই যায়, তবে ঘরের চালে জল ছিঁটিয়ে সে দোষ খণ্ডন করে নেওয়া হয়। মুসলমান পরিবারেও এই আচার পালিত হয়। মুর্শিদাবাদের একটি মুসলমান পরিবার থেকে পাওয়া তথ্য এই: হট্টিটি বা হো-টি-টি যদি রাতের বেলায় কোনো গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় কেবল মাত্র একবার ডাকে, তাহলে সমস্ত গ্রামের পক্ষেই তা চরম অশুভ বলে মনে করা হয়। পারিবারিক দিক থেকে এর কুফল এই: গৃহস্থের ঘরে চুরি-ডাকাতি হওয়া, আগুন লাগা কিংবা অন্য যে কোনো প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি হওয়া। কিন্তু হট্টিটি যদি একাধিক বার ডাকতে-ডাকতে উড়ে যায়, তবে তা অশুভ বলে মনে করা হয় না। হট্টিটি

সম্পর্কে এই বিশ্বাসটিকে প্রাচীন বলেই মনে হয়; কারণ, এর শুভাশুভ কেবল ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে নি, গ্রাম ও গোষ্ঠীতে তা প্রসারিত আছে। আর দুটি বিশেষত্ব হল: ডাকের সংখ্যার ওপর শুভাশুভত্বের নির্ভরশীলতা ও ডাকের কুফল এড়াবার জন্যে ঘরের চালে জল ছিটোনো।

'কথাসরিৎ সাগরে'র চতুর্বিংশত্যধিক-শততম তরঙ্গে আছে, যাত্রাপথের ডান দিকে কপিঞ্জলের ডাকা অশুভকর; বর্তক বা বটের পাখী সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকেই নানা বিশ্বাস আছে। ঋগ্বেদে (১, ১১২, ৮) আছে, বর্তিকা বা বর্তক নেকড়ে দ্বারা আহত হলে অশ্বিদ্বয় তাকে উদ্ধার করে। এতে এ পাখির সঙ্গে সূর্যের আসঙ্গ স্পষ্টতর হয়। এ পাখি চাঁদ ও শীত অপেক্ষা সূর্যকে পছন্দ করে। গ্রীক ও ল্যাটিনরা বর্তককে ল্যাটোনা (Latona)-র প্রিয় পাখি বলে। জোভ (Jove) একটা বটের পাখির রূপ ধরে ল্যাটোনার শয্যাসঙ্গী হন, এবং তারই ফলে অ্যাপোলো (সূর্যদেবতা) ও ডায়না (চাঁদ)র জন্ম হয়। সূর্যের সঙ্গে জড়িত বলেই বটের শস্যের সঙ্গেও জড়িত। টাসকানির কৃষকরা বটের পাখির ডাকের সংখ্যার ওপর সেই বছরের শস্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগাযোগ লক্ষ করে। বটের পাখির ডাকের সংখ্যাধিক্য শস্যের অধিক ফলনের সূচক।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় মনে করে, 'মাহাবারিক' নামে ক্ষুদ্রকায় এক পাখি উত্তর দিকে 'কাঁদলে' লোক মারা যায়, দক্ষিণ দিকে 'কাঁদলে' বাড়িতে চুরি হয়। ছেলে-পুলে দোষ ত্রুটি-অপরাধ করলে রাতের বেলায় এসে তার গায়ে আঁচড় দেয়। ভাদ্রমাসে 'কুরুয়া' (কুরর) 'কাঁদলে' দেশে আকাল পড়ে। পয়লা ভাদ্রের রাতে কেউ যদি 'কুরুয়া'-র কান্না শোনে, তবে সেই ব্যক্তির সেই বছর অবশ্যই কঠিন পীড়া হবে। সন্ধ্যেবেলায় দয়েল ডাকলে আসন্ন বিপদের সূচনা করে; এবং মধ্যরাতে ডাকলে অবশ্যই মনে করতে হবে, বাড়িতে চোর-সাপ-বাঘ শেয়াল ঢুকেছে।

পাখির স্পর্শন-জাত মঙ্গলও উল্লেখযোগ্য। একটি উদাহরণ দিই। স্ত্রী বা পুরুষ, যে কোনো চড়ুই উড়তে-উড়তে কারো দেহ স্পর্শ করে গেলে কিংবা নিমেষের তরে তার মাথার ওপর উপবেশন করলে তা সাফল্য ও শুভত্বের সূচনা করে (Some Hindu Superstitions, No. 2: The Journal of the Anthropological Society of Bombay: Vol XIV No 4, P. 495 : S. S. Mehta, B. A)। চড়ুই হত্যা অমঙ্গলজনক—ইউরোপে সাধারণভাবে এই বিশ্বাস চালিত আছে।

গুজরাটের হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, ভরত পাখি কারো বাঁ দিকে ডাকলে, তিতির একসঙ্গে পর পর তিনবার ডাকলে, তা শুভজনক হয়।

উপর্যুক্ত সংস্কার-বিশ্বাসগুলোর পেছনে যে যুক্তি ও মানসিকতা ক্রিয়াশীল, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতেই সে বিষয়ে আলোচনা করেছি বলে এখানে তার পুনরুক্তি করি নি॥

১৪·

শুভাশুভের ক্ষেত্রে পাখির গুণ-বৈপরীত্য কি ভাবে নানা বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করে, ওপরের একাধিক পরিচ্ছেদে তা প্রদর্শন করেছি। এই বৈপরীত্য ও বিরুদ্ধতার অন্যান্য দিকও আছে : যেমন, যা পুরুষের পক্ষে শুভ, নারীর পক্ষে তা শুভ নয় : লিঙ্গ ভেদে বাম-দক্ষিণ ভেদ এখানে বড়ো একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার একই লিঙ্গের ব্যক্তির পক্ষে এক সময়ে বা এক পরিস্থিতিতে যা শুভ, পরে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাই হয়তো অশুভ। এই ভাবে, বিশেষ পেশা বা বৃত্তিধারীদেরও নিজস্ব ও বিশিষ্ট এক-একটি শুভাশুভের নিয়ম-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

যেমন নাবিকরা। তারা মাছরাঙা, গাংচিল বা অ্যালবাট্রস সম্পর্কে যে সংস্কার পোষণ করে, অন্যের পক্ষে তা গ্রাহ্য বা পোষণযোগ্য নাও হতে পারে, এবং বস্তুতই তাই। নাবিকরা বিশ্বাস করে, তিনটি গাংচিল (Seagull) একত্র মাথার ওপর ওড়া আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত দেয় ; তেমনি সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের সাধারণ বিশ্বাস, গাংচিল হত্যা করতে নেই। চীনের "Black Pottery People"রা মৃণ্ময় পাত্রে যে পক্ষিমূর্তি উৎকীর্ণ করে দিত, তা ওই কুম্ভকারদের নিজস্ব গোষ্ঠীর এক দেবতা স্থানীয় পাখি, অথবা তাদের 'টোটেম', যে রূপেই দেখা যাক না, তা একান্ত ভাবেই একটি পেশা বা বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত।

ভারতীয় ঠগী, চোর ও ডাকাতদের মধ্যেও এই রকম কিছু পেশাগত বিশ্বাস-সংস্কার আছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

দক্ষিণ ভারতের যাযাবর জাতি, 'Basui' বা 'Bawarupa'রা ডাকাতি বা মুদ্রা জালিয়াতির জন্যে যাতে ধরা না পড়ে যায়, তার জন্যে সর্বদা সঙ্গে ময়ূর পালকের গোছা রাখে। ময়ূর-পালকের 'চোখ' সব প্রকার কু-নজর থেকে তাদের রক্ষা করবে। ময়ূর-পালকের মধ্যে এক রক্ষাকারী 'শক্তি' ও 'ক্ষমতা'কে তারা প্রত্যক্ষ করে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ঠগে'রা উড়ন্ত চিল পছন্দ করে না। কিন্তু উড়ন্ত চিলকে মলত্যাগ করতে দেখলে তাকে শুভ ঘটনা বলে গ্রহণ করে। এতে লুটে রুপো এবং কাপড়-চোপড় মেলে। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় ইটালী ও জার্মানীর একটি সংস্কার : কারো মাথায় পাখির বিষ্ঠা পতন সৌভাগ্যের লক্ষণ।

গাছে-বসা কাক এদের কাছে ভাগ্যের লক্ষণ, বিশেষত সে গাছ যদি কোন নদী জলাশয়ের তীরবর্তী হয়। এ দৃশ্য দেখলে মূল্যবান সামগ্রী মেলে। কিন্তু যদি কোনো কাককে কোনো মহিষের পেছনে-পেছনে ভাবতে দেখা যায়, কিংবা কোনো শুকর ছানার, অথবা মৃত প্রাণীর কঙ্কালের পেছন থেকে, তবে তা খুবই

দুর্ভাগ্যের সূচক। এখানে মহিষ ও শূকরের কালো রঙ, যা হতাশা বিষাদের প্রতীক বলে পরিচিত, তাই কাজ করছে। কোন কোনো ঠগীদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, গোরুর পিঠে বসে কাককে ডাকতে দেখা সুলক্ষণ যেহেতু গোরু সব সময়েই কালো রঙের হয় না। চতুষ্পদ প্রাণী, জল ও গাছ এই তিনের সংস্পর্শে শুভাশুভ নির্ণয়ের প্রথা একান্ত ভাবেই ভারতীয়, খঞ্জনের বেলাতেও এগুলো দেখে এসেছি। পাতিকাক সম্পর্কে ঠগীদের তেমন কোনো সংস্কার নেই, দাঁড় কাকই ওদের সু ও কুলক্ষণের নির্দেশক ও নিয়ামক।

অলস ও অবসন্ন ভঙ্গিতে পঁ্যাচাকে বসে থাকতে দেখা বিশেষ কুলক্ষণ, ওই নিশ্চলতাই এখানে কর্মহীনতার প্রতীক, অতএব কুলক্ষণের। ছোটো পঁ্যাচা যদি নিম্নকণ্ঠে পর-পর তিন-চার বার ডেকে ওঠে, তবে তা দোষের; খিক্ খিক্ করে নীচু গলায় যাত্রাকালে যদি বড়ো পঁ্যাচা ডাকে, তবে বুঝতে হবে, বিপদ আসন্ন। কাজেই এ জন্যে যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। যদি দুটি বড়ো পঁ্যাচাকে তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করতে শোনে যাত্রা কালে, তবে সেদিন সব রাহী-যাত্রীদের অব্যাহতি দিতে হয়। এই বিশ্বাসের সমর্থনে ওদের মধ্যে একটি কাহিনীও চলিত আছে।

ঝাঁসীর ডাকাতদের মধ্যেও এই ধরনের বিশ্বাস চলিত আছে: কাককে মাটিতে বসে ডাকতে শুনলে ব্যর্থতার সূচক বলে মনে করা হয়। কিন্তু অন্য কোনো বৃহদাকার প্রাণীর পিঠে বসে কিছু খাচ্ছে, এমন দৃশ্য দেখা সাফল্যের ইঙ্গিতবাহী; ডান দিকে কাক ডাকা নিশ্চিত ও বৃহৎ সাফল্যের সূচনা করে। যাত্রাপথের ডান দিকে তিতিরের ডাক কিন্তু অমঙ্গল ও বৈফল্যের প্রতীক। যাত্রাপথে কোলাহলরত একাধিক শামা পাখি-দর্শন কুলক্ষণ; কিন্তু বাঁ দিকে দেখা সুলক্ষণ, বিশেষ করে, সবুজ-সতেজ গাছে বসে থাকলে। যাত্রাকালে মাথার ওপর শকুন ওড়া কুলক্ষণ, সাধারণ গৃহস্থের বেলাতেও তাই। যাত্রাপথে 'রূপা' পাখিকে বসে থাকতে দেখা ভালো, এর রজতশুভ্র পালকই এই বিশ্বাসের কারণ। যাত্রাপথে বাঁ দিকে প্যাঁচার ডাক শুভ। সতেজ-সবুজ গাছে নীলকণ্ঠ পাখিকে উপবিষ্ট দেখা অথবা উড়ে যাওয়াকে 'শুভযাত্রা' বলে মনে করা হয়।

অত্যন্ত স্বল্প দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া এই উদাহরণগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়,—যে যুক্তি, স্বাদুবোধ ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা সাধারণ গৃহস্থের শুভাশুভ নির্ণীত হয়, এখানেও তাই। চোর-ডাকাত বলে তাদের যুক্তি ও মনস্তত্ত্ব ভিন্ন পথে চালিত হয় নি॥

...১৫...

পরিশেষে, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গের উল্লেখ করি।

পাখির সঙ্গে অতিথি আগমনের বিশেষ সংযোগের কথা ওপরে বারবার লক্ষ করেছি। বিভিন্ন উদাহরণ প্রসঙ্গে দেখিয়েছি, মানুষের মৃত্যু বা মৃত্যুসংবাদ অতিথি আগমনের বিকল্পে উল্লিখিত হয়েছে। এটি সারা বিশ্বেই দেখা গেছে। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যেও এ বিশ্বাস আছে। নিগ্রোরা প্রতিগ্রামেই অতিথিদের জন্যে পৃথক গৃহ নির্মাণ করে রাখে। আশ্রয়হীন কোনো পথিক পথ দিয়ে হেঁটে গেলেই, একটা পাখি বলে ওঠে, 'where will the guest stay, where! where! where!' পাখির এই ডাক শুনেই গ্রামবাসীরা বোঝে, গ্রামে অপরিচিত কেউ এসেছে, এবং তার আশ্রয় প্রয়োজন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, অতিথি মঙ্গলকারী ও মঙ্গলময় বিবেচিত না হলে এটি সম্ভব হত না। সে বিশ্বাস খুব প্রাচীনও নয়। আসলে প্রতি ঋতুতে, যাযাবর পাখি বহুদূর দেশ থেকে পুনরায় যখন একটি ভূখণ্ডে আসে, তখন সে তার পূর্বপরিচয়কে বিসর্জন দিয়ে, 'অপরিচিত' এক ব্যক্তি হিসেবেই আসে যেন: এবং যেহেতু তারা স্থায়ী হয় না, 'অতিথি'র মতোই নির্দিষ্ট কাল পর অবধারিত নিয়মে অদৃশ্য হয়, অতএব 'অতিথির' সঙ্গে পাখির একাত্ম হয়ে যাওয়া সম্ভব।

শুধু লোকঐতিহ্যেই নয়, অভিজাত সাহিত্যের মধ্যে পর্যন্ত এই সংস্কার শেকড় বিস্তার করেছে। 'রক্তকরবী'র নন্দিনী বিশুপাগলকে বলেছে: "আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। আমি সন্ধ্যে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে।" বিশুপাগল তার উত্তরে বলেছে: "লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভ চিহ্ন আছে।" এখানে আতিথ্য, আগমন, বিজয় ও শুভত্ব—মিলিত হয়েছে।

কিন্তু কেন পাখির ডাকের ফল হিসেবে হয় অতিথির আগমন, নয় মৃত্যু-সংবাদের দূর-দেশ থেকে আগমন? এই বিকল্প ও বৈপরীত্যের কারণ কী? পাখি যেমন মঙ্গলকারী ও মঙ্গল-সংবাদ আনায়নকারী, তেমনি সে অমঙ্গলকারী। লোকমানস সর্বদাই সামঞ্জস্য খোঁজে, কাজেই যে মঙ্গল করতে পারে, সে অমঙ্গল সাধনেও সক্ষম। বহু উদাহরণ দিয়েছি, আর দুটি স্মরণ করি। চীন দেশে বিশ্বাস আছে, দেশ যখন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছয়, ঠিক তখনই ফিনিক্স পাখির আবির্ভাব ঘটে। বাঙলাতে 'সুখের পায়রা' ঠিক এমনিই ব্যাপার। কারো সুখ-সমৃদ্ধি চলে গেলে এইসব পারাবত আপনা থেকে উড়ে অন্যত্র চলে যায়। এটি এখন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এরই উল্টো দিকে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্বাস : ঘরে খড়-কুটো পুরে মৃত পাখি অর্থাৎ stuff-করা পাখিও রাখতে নেই ; তা হলে বাড়ির সুখ-শান্তিও 'মৃত' হবে। কাজেই 'অতিথির' আগমন মৃত্যু বা দুঃসংবাদ আগমনের বিকল্প হয়েছে।

পাখির এই শুভাশুভত্ব কোন্ দৃষ্টিতে বিচার্য, Alexander H Krappe তাঁর একটি প্রবন্ধে (Warning Animals : Folklore (London): Vol. LIX, March, 1948 : pp 8-15) যে সব উদাহরণ দিয়েছেন এবং যে ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন, তাতে মনে হয়, পাখির ওড়া-ডাকা-দর্শনদাতা হওয়ার ফলাফল রূপে অতীতে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, তারই শুভাশুভত্বের অনুসরণে পরবর্তী কালে ওই সব পাখিদের নিয়ে সংস্কার গড়ে উঠেছে। ক্র্যাপ এ সবের মধ্যে একটি সাধারণ-গ্রাহ্য যুক্তি খুঁজেছেন। লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞান ও যুক্তির অনুসরণকারী, 'The Science of Folklore' (Reprinted 1962) এই গ্রন্থনাম থেকেই তাঁর দৃষ্টিকোণ বোঝা যায়। উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে এবং এই গ্রন্থটিতে (P. 246) ক্র্যাপ্ দেখাতে চান, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'false analogy' এবং 'false logic' কাজ করেছে ; পাখি যে পূর্বাহ্ণেই লোকটিকে সতর্ক করে দেয়, তার মানে এই নয়, ওই পাখিটি ওই ব্যক্তির 'টোটেম' বা এই ধরনের কিছু।

ক্র্যাপের এই মন্তব্য ভারতীয় জীবনের ও পক্ষিশাস্ত্রের আলোকে গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। কারণ যে সব পাখির ওড়া-ডাকা-চলে যাওয়াকে একটি ঐতিহাসিক ও বাস্তব ঘটনার ইঙ্গিত বা ফল বলা হয়েছে, তা একান্ত ভাবেই ইউরোপের ; কিন্তু ভারতে তা না ঘটলেও ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ ঠিক একই মন্তব্য করেছেন। সুতরাং ইউরোপীয় কোনো ঘটনা ঘটবার ফল হিসেবেই পাখি-বিশেষ সম্পর্কে কোনো সংস্কার গড়ে উঠেছিল, ক্র্যাপের এ মত টেকে না। তাছাড়া, যে এসব ঐতিহাসিক ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তার বহু পূর্বেই ভারতে শকুনশাস্ত্র সংকলিত হয়ে গেছে। অন্যান্য দেশেও পাখি সম্পর্কে সংস্কার গড়ে উঠেছে ওই সব ইউরোপীয় ঘটনার কথা সেখানে পৌঁছবার পরেই অথবা সেখানে আজও পৌঁছয় নি ; তবে, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবার ফলেই যে পাখির শুভাশুভ নিরূপিত হয়, তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আমার বক্তব্য, সর্ব দেশেই এটা ঘটে না। দ্বিতীয়ত হয়, 'টোটেমে'র প্রসঙ্গ। পক্ষিরব বা ডান-বাঁ দিকে ওড়ার ফলে যে শুভাশুভ নির্ণীত হয়, তা প্রাথমিক যুগে কেবল একটি গোষ্ঠীকে বা একই টোটেমধারীদের কেন্দ্র করেই আলোচিত হত বটে, কিন্তু কালক্রমে তাতে ব্যক্তির প্রসঙ্গ এসে পড়ল ; কাজেই টোটেম রূপে গৃহীত কোনো পাখি কর্তৃক কোনো গোষ্ঠীর সকল মানুষকে সতর্ক করবার কথা আর ওঠে না। তাছাড়া, আরো পরে, একই গ্রামে হয়তো একাধিক টোটেম-ধারী পরিবারের বাস ছিল, কিন্তু পক্ষিরব জাত শুভাশুভ সকলকেই স্পর্শ করত।

তবে ক্র্যাপের আর একটি মন্তব্য (p. 248) আংশিক ভাবে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। পশু-পাখিকে অবলম্বন করে যে সব সংস্কার-বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, তা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় ধরণের মানুষদের মধ্যে দু'টি ধারায় প্রবহমান। শিক্ষিতদের মধ্যে কাজ করে নানা প্রাচীন বই-পুঁথিতে লেখা পশু-পাখি সম্পর্কে সংস্কার আর অশিক্ষিতদের প্রভাবিত করে পুরুষানুক্রমে পালিত বিশ্বাস। কিন্তু যে সব বই-পুঁথি পড়ে ওই সংস্কারাদির জন্ম হয়, সেই বইগুলোই কোনো বিজ্ঞান-ভিত্তিক নয়। তাই প্রাচীন কালের Aristotle, pliny বা Aelion প্রভৃতির প্রাণিজগৎ সম্পর্কে লিখিত অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি শিক্ষিতদের বিভ্রান্ত করে আজও। তারই ফলে শিক্ষিতদের মধ্যেও অনেক কাল্পনিক বিশ্বাস স্থান পেয়ে গেছে।

লোকচারণার ক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের এই ভেদ কল্পনা বোধ হয় ঠিক হয় নি। কেননা দু'জনের ক্ষেত্রেই বিশ্বাসপ্রবণ মনটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'বিশ্বাস প্রবণতা'ই যেখানে শেষ লক্ষ্য, সেখানে সেটি বই পড়া থেকে এলো, কি পুরুষানুক্রমিক আচার থেকে এলো, সে প্রশ্নই অবান্তর। ক্র্যাপ পশু-পাখি সংক্রান্ত সংস্কারগুলোর পেছনে সত্যতা, বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অন্বেষণ করেছেন; আমি, সেটিকে গ্রহণ করে যে মন, মানসিকতা ও মনস্তত্ত্ব, তাকেই প্রধান বলে মেনেছি, এবং সেই দিক থেকেই শুভাশুভত্ব বিচার করেছি। ক্র্যাপ্ ও আমার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। তিনি ওই সব সংস্কারের সত্যতা যাচাই করেছেন; কিন্তু সেই সব সংস্কার সত্য-মিথ্যে যাই হোক, যে মন তার নিজস্ব বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব দিয়ে তা গ্রহণ-বর্জন করেছে, তাকেই আমি লক্ষ করেছি॥

॥ বিহঙ্গচারণা : দ্বিতীয় খণ্ড ॥

বঙ্গীয় বিহঙ্গপুরাণ বা বিহঙ্গকথা···

॥ সঙ্কলন ও সমীক্ষা ॥

১

অনেকদিন আগে, 'গ'সাই' (গোঁসাই, ভগবান) এই পৃথিবী সৃষ্টি করবার পর, পাখিদের সৃষ্টি করলেন। সব পাখিই তখন দেখতে একই রকম ছিল। সকলেরই একই স্বভাব, একই চরিত্র। জলের পাখি আর ডাঙার পাখিতে ভেদ নেই। দিনের পাখি আর রাতের পাখিতে ভেদ নেই। কাক যেমন, কোকিলও তেমনি। এতে পাখিদের মধ্যে নানান অসুবিধে হতে লাগল। তখন পাখিরা 'গ'সাই'-কে বলল, তাদের এক-এক দলকে এক-এক রঙের করে দিতে। 'গ'সাই' বললেন, তাই হবে। পরদিন সকালে যেন পাখিরা সবাই আসে। তিনি রঙ নিয়ে বসে থাকবেন। যে যতো আগে আসবে, সে ততো বেশি রঙ পাবে। পরদিন সকালে সকলের আগে এল ময়ূর। গ'সাই-য়ের রঙের পাত্রে তখন নানা রঙ ভরা রয়েছে। তাই তিনি ময়ূরের গায়ে লাগিয়ে দিলেন। তাই ময়ূরের গায়ে সাত রঙের সমারোহ। অতো রঙ একসঙ্গে আর কোনো পাখির নেই। এই জন্যেই ময়ূর সবার চেয়ে সুন্দর। ময়ূরের পর এল মুরগী। তাই মুরগীর পালকেও নানা রঙ দেখা যায়। এইভাবে যে পাখি যতো দেরীতে আসতে লাগল, সেই পাখির গায়ে রঙের পরিমাণ ততো কমতে থাকল। দেখতেও তারা বিশ্রী হতে থাকল।—মনুলাল সিংহ (জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, সুখানি)।

মন্তব্য : প্রায় এই একই 'কথা' সাঁওতালদের মধ্যেও চলিত আছে। তবে তা পাখির কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা বিষয়ক : দ্রঃ ৮৭-সংখ্যক কথার মন্তব্য ১, ২ ও ৩। সাপ সম্পর্কেও ঠিক এই 'কথা' চলিত আছে : যে সাপ যতো দেরীতে এসেছে, তার ভাগের বিষের মাত্রাও তত কম হয়েছে। সবার শেষে গিয়েছিল ঢোঁড়া। বিধাতার বা অপর কারো আহ্বান এবং তাবৎ প্রাণীর সগোষ্ঠী উপস্থিত হওয়া—লোককথার একটি Motif। যত আগে তত ভালো—এই সূত্রটি এখানে Structure-এর ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়েছে।

২

গাঙ্-টিটি পাখির এক গর্ব ছিল : স্বর্গ, আকাশ আর পৃথিবীর ভার সে বহন করতে পারে। এই গর্বের কথা সে সব পাখিদের কাছে সব সময় বলে বেড়াত। পাখিরা তাই শুনে-শুনে তার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল। শেষে একদিন সব পাখি মিলে গেল ব্রহ্মার কাছে : এই গর্বের বিহিত করতে হবে। ব্রহ্মা সব শুনে এই অভিশাপ দিলেন : বংশ-বৃদ্ধির জন্যে তাকে আকাশ বহন করতে হবে : ডিমে 'উসুম' (উষ্ম, তা') দেবার সময় তাকে আকাশের দিকে দু'পা তুলে ধরে থাকতে

হবে। এই জন্যেই এ পাখির দেহের তুলনায় পা বেশি লম্বা। তার গর্বের জন্যেই মাছ-খেকো পাখিরা একে নিন্দা করে থাকে।—সুরেন্দ্রনাথ রায় (জলপাইগুড়ি, ধাপগঞ্জ, গড়ালবাড়ি)।

মন্তব্য: সগোষ্ঠী কোনো প্রাণীর সমবেত হওয়ার Motif এখানেও মেলে। 'অভিশাপ' এর আর একটি Motif, সে হিসেবে এটি 'অভিশাপ'-গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।

৩

'চিট্‌কন' (খঞ্জন) পাখির আকৃতি আগে ছিল বিরাট। দেহ এতই বিরাট ছিল যে, তার প্রতি মুহূর্তে ভয় হত, পৃথিবী হয়তো তার ভার সইতে পারবে না। তার ভারেই হয়তো পৃথিবী ভেঙে পড়বে। এজন্যে তার মনে ছিল বিশেষ গর্ব। সবাইকে সে তা বলে' বেড়াত। অন্যান্য পাখিরা তার সে গর্ব সহ্য করতে পারল না। একদিন তারা সবাই মিলে দেবতার কাছে গেল। দেবতা সব কথা শুনে চিট্‌কন্‌কে অভিশাপ দিয়ে করে দিলেন ছোটো একটি পাখি। কিন্তু আজও 'চিট্‌কন' পাখি তার আগের অভ্যাসটি ভুলতে পারে নি। তাই মাটিতে নেমেই 'চিট্‌কন' তার ল্যাজটি ঘন-ঘন নাচিয়ে ছুঁইয়ে দেখে, পৃথিবী তার ভার সইতে পারবে কি না। এ জন্যেই এ পাখির আর এক নাম 'ভূঁইদম্‌কা' অর্থাৎ ভূমিতে ল্যাজের দাপট দিয়ে সে ভূমির বহন-ক্ষমতা আন্দাজ করে।—সুরেন্দ্রনাথ রায় (জলপাইগুড়ি, ধাপগঞ্জ, গড়ালবাড়ী)।

মন্তব্য: খঞ্জনকে 'চিত্রকৃত', বলা হয়, তার গায়ে কালো-সাদার কারুকাজ দেখে। 'চিট্‌কন' এসেছে 'চিত্র+খঞ্জন' বা 'চিত্র+মদন' থেকে। চট্টগ্রামে 'চিত্তনা মনা' (<চিত্র+মদনিকা) শব্দ চলিত আছে।

কথান্তর ১: 'চিট্‌কন্' বা খঞ্জনের সঘন ল্যাজ নাড়বার ব্যাখ্যা হিসেবে অপর 'কথা' এই: 'চিট্‌কন' মাটিতে নেমে, কোনো খাদ্য পাক আর নাই পাক, ল্যাজটি নাচিয়ে মাটি ঠুকরে দেখে। যেমন, শত্রুকে অনেক কষ্টের পর বাগে পেয়ে লোকে তর্জনী নাড়িয়ে এবং কোমর দুলিয়ে রেগে বলতে থাকে "এইবার তোকে পেয়েছি", চিট্‌কনও তেমনি বলে 'এইবার তোক্ পাইসু'। এই জন্যই বলা হয়, 'চিট্‌কন পোখি কটি দম্‌কায়' (খঞ্জন কটি আন্দোলন করে)।—ললিতকুমার বর্মণ (দিনাজপুর বোদা থানা, সাকোয়াভাঙ্গা পাড়া)

কথান্তর ২: বৃহদাকার খঞ্জনের ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে যাবার সম্পর্কে আসামের লোহ্‌তা নাগাদের মধ্যে এই 'কথা' চলিত আছে: বহুদিন পূর্বে একবার এক বিরাট অন্ধকার এই পৃথিবীকে গ্রাস করলে পাখিদের মধ্যে এক সভা আহূত হয়: রাত্রি ও দিনের স্থায়িত্বকাল নিয়ে। খঞ্জনের জবাব দেবার পালা এলে খঞ্জন বলল:

অন্ধকার ও দিন পালাক্রমে হোক। "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হোক", এই অনুমোদনাত্মক ভঙ্গিতে সব পাখিরা ঠোঁট দিয়ে খঞ্জনের পিঠ চাপড়ে দিলে। সেই চাপড়ানিতেই খঞ্জন ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে গেল, নইলে তারা ময়ূরগীর মতো বড়ো ছিল।—J. P. Mills : The Lhota Nagas (Macmillan and co., Ltd. London), P. 196-197.

কথান্তর ৩ : 'ধমধ্বজজাতকে' (সং ৩৮৪) এক ভণ্ড কাককে দেখা যায়, সে সর্বদাই এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কারণ, তার ভয় হত, সে দু'পা এক সংগে পৃথিবীর ওপর রাখলে পৃথিবী তা সইতে পারবে না।

মন্তব্য : সব পাখির সমবেত হওয়া ও অভিশাপ এই Motif-গুলি ২-সংখ্যক 'কথা'তেও মেলে। দ্রঃ ৮৮-সংখ্যক কথা।

৪

এক-এক মাসের এক-এক রাশি। শ্রাবণ মাসের কর্কট রাশি। শ্রাবণ মাস বর্ষার মাস। বর্ষায় অনেক কাঁকড়া মরে। সেটা কর্কট রাশির মাস বলেই মরে। যতো কাঁকড়া তার অধিকাংশই মরে তখন। এই মরণ চলে সিংহ রাশি অর্থাৎ ভাদ্র মাস পর্যন্ত। কাঁকড়া মরলে তাদের দাহ করে কে?—পাখিরা। সব পাখি তখন 'ইন্দ্র'-গাছের ডাল-পল্লব ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যায়। সেই কাঠেই হয় দাহকাজ। এতো কাঠ বইতে-বইতে শেষে পাখিদের ঘাড়ের পালক যায় খসে। এই জন্যেই দেখা যায়, বর্ষা কালে অধিকাংশ পাখিরই ঘাড়ের পালক খসে পড়েছে। বর্ষা চলে গেলে, কাঁকড়াদের জন্যে আর কাঠ বইতে হয় না বলে, পাখিদের ঘাড়ে আবার পালক গজায়।—জীবন বন্ধু লাহিড়ী (লোধাপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি থেকে সংগৃহীত)।

মন্তব্য ১ : 'ইন্দ্র' গাছ বলতে ফণিজ্ঝবৃক্ষ, কাঁটা জামীর গাছ বোঝায়। 'ইন্দ্রদারু' বলতে দেবদারু, অর্জুন গাছকে বোঝালেও মঞ্জিষ্ঠা বা কর্ট ফলের গাছকে বোঝানো হয়েছে। কর্কট রাশিতে, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চতুর্থ নক্ষত্র 'রোহিণী' নক্ষত্র। এই রোহিণী নক্ষত্র শকটাকৃতি, পঞ্চতারাত্মক, প্রধান তারার বর্ণানুসারে লোহিতবর্ণা। 'রোহিণ' শব্দের আর দুটি অর্থ : রক্তপুনর্ণবা বৃক্ষ, গল রোগ বিশেষ। 'ইন্দ্র' গাছের ডালও গল রোগের আকৃতি বিশিষ্ট, এবং তা থেকে লোহিত রস ক্ষরিত হয়। এই প্রসঙ্গে কাঁকড়া শিঙা (<কর্কট শৃঙ্গিকা) গাছের কথাও মনে হয়।

মন্তব্য ২ : 'ইন্দ্র' সংবর্তাদি মেঘের অধীশ্বর, আদিত্য বিশেষ। মেঘ বর্ষার সঙ্গে জড়িত, সূর্য বর্ষার সংঘটক।

মন্তব্য ৩ : 'কর্কট' শব্দের অর্থ যেমন একদিকে কাঁকড়া, অপর দিকে তেমনি পক্ষি বিশেষ। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 'কর্কট' নামে পাখির উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে আলোচিত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে পাখির সঙ্গে কাঁকড়াকে যুক্ত হতে দেখেছি। শ্রাবণ-ভাদ্রে কাঁকড়ার মৃত্যু নৈসর্গিক জগতের এক সত্য ঘটনা।

৫

একদিন সব পাখি সভা ডেকে স্থির করল, অন্যান্য পশু-প্রাণীর মতো তাদেরও একজন রাজা চাই। কাকে রাজা করা হবে, তাই নিয়ে নানান আলোচনা হল। শেষে ঠিক হল, যে পাখি সব চেয়ে ভালো করে সেজে-গুঁজে আসতে পারবে, সেই হবে রাজা। সবাই রাজা হতে চায়, এই জন্যে সেদিন সকলেই খুব ভালো করে সাজতে লাগল। কেউ সাজতে লাগল নানান রঙের পালক দিয়ে, কেউ বা মাথার ঝুঁটি সুন্দর করে নিতে লাগল। কিছুতেই আর কারো সাজা শেষ হয় না! ফিঙে খুব চটপটে পাখি, কিন্তু দেখতে কালো। সে উঁচু-নীচু হয়ে, ঢেউয়ের ভঙ্গিতে আকাশে ওড়ে। সে করল কি, ঢেউয়ের মতো নীচের থেকে হঠাৎ ওপরে এসে পড়ল, সবাই দেখলে সে সকলের উঁচুতে। এতো উঁচুতে যে সাজ-পোশাক ভালো করে বোঝা যায় না। সেই জন্য তাকেই সবচেয়ে সুসজ্জিত বলে বিবেচনা করা হল। সেই হল রাজা। ফিঙের এই গতিভঙ্গির তালে-তালে মৈমনসিংহ জেলার বালকেরা তাই ছড়া কাটে: 'ফেচুয়া রাজা—ফেচকুচু, ফেচুয়া রাজা—ফেচকুচু।' অন্য সব পাখির সাজতে-গুঁজতে বিলম্ব হবার জন্যেই ফিঙে রাজা হয়ে গেছে। তাই বলা হয়: 'সাজতে-গুঁজতে ফেচুয়া রাজা!'

—মৈমনসিংহ অঞ্চলে চলিত। শ্রীকামিনীকুমার রায়ের সৌজন্যে।

মন্তব্য: এখানে Motif: সব পাখির সভা ডাকা ও সমবেত হওয়া। Structure: যে যত ভালো সাজবে, সেই রাজা হবে। তু ১-সংখ্যক 'কথা'র Structure.

৬

"সাজতে গুঁজতে ফিঙে রাজা: কথিত আছে যে, এক সময়ে বিধাতা পক্ষীদিগকে বলিয়াছিলেন, কল্য প্রভাতে যে আমার নিকট অগ্রে উপস্থিত হইবে, তাহাকেই আমি পক্ষীদিগের রাজা করিব। শালিক প্রভৃতি পাখিরা প্রভাতের পূর্ব হইতেই বিধাতার নিকট যাইবার জন্য আপনাদের দেহ সজ্জিত ও চিত্রিত করিতে লাগিল। কিন্তু চতুর ফিঙে পাখি কোনোরূপ সাজসজ্জা না করিয়া কেবল সর্বাঙ্গে ঘন কালি তাড়াতাড়ি মাখিয়া বিধাতার নিকট উপস্থিত হইল। সর্বাগ্রে উপস্থিত হওয়ায় সে পাখিদের রাজা হইল, অন্যান্য পাখিদের সাজসজ্জাই বৃথা হইল।..."

—সুবলচন্দ্র মিত্র-সঙ্কলিত "সরল বাঙলা অভিধান" (পঞ্চম সংস্করণ), পৃ. ১৫৭৬।

মন্তব্য ১: বিধাতা সব পাখিদের ভালোভাবে সেজে যেতে বলেছিলেন। ভালোভাবে সাজতেও হবে, সবার আগে যেতেও হবে।

৭

পাখিদের মধ্যে রাজা কে হবে, একবার এ নিয়ে কথা উঠল। তখন সভা করে স্থির করা হল, যে সবার চেয়ে বেশি ওপরে উঠতে পারবে, সেই হবে পাখিদের রাজা। শুরু হল নির্দিষ্ট দিনে সেই প্রতিযোগিতা। তখন ফিঙে (‘কইল’) করল কি, খানিকটা উড়েই শকুনের পিঠের ওপর চেপে বসে পড়ল। শকুন টেরই পেলে না যে তার পিঠের ’পরে ফিঙে বসে রয়েছে। ফিঙে হাল্‌কা আর ছোটো বলেই শকুন তা বুঝতে পারে নি। অনেক দূর পর্যন্ত অনেক পাখিই উড়লে, শেষে এক-দুইয়ে সবাই সরে পড়ল। আর উড়তে পারে না। রইল কেবল তখন শকুন। সে নিজেকেই জয়ী বলে যেই আর উঁচুর দিকে না উঠে নীচুর দিকে নামতে গেছে, অমনি ফিঙে তার পিঠ থেকে আরো খানিকটা উঁচুতে উঠে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত করলে। সেই থেকে ফিঙে পাখিদের রাজা হয়ে আছে।—সাহাবুদ্দীন আহ্‌মেদ (মালদহ, কালিয়াচক; গ্রাম: বাথলা, পোঃ মেহেরাপুর)।

॥ পাখি ঃ টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ॥

৮

“পাপিয়াকে একটি টাকা ধার দিয়াছিল অন্য একটি পাখী, তৎপরিবর্তে সে দিয়াছিল তাহাকে এক কানাকড়ি, আর বলিয়াছিল যে শীতকালে সে তা’র টাকা পরিশোধ করিবে। শীত যখন শেষ হইল তখন সেই পাখীটি তা’র টাকা পাওয়ার জন্য পাপিয়ার খোঁজে বাহির হইল কিন্তু তাহার দেখা সে আর পাইল না। তাই সে নানা দেশ খুঁজিযা চৈতমাসে (চৈত্রমাসে) আমাদের দেশে আসিয়া পাপিয়াকে টাকার জন্য অনুরোধ করে। আবার ঋণদাতা পাখীর শ্বশুরের নাম ছিল পপী। আমাদের দেশে শ্বশুরের নাম লওয়া অন্যায়, তাই আমাদের দেশের ঐ পাখীটিও পাপিয়াকে ‘চৈতার বৌ’ বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ময়মনসিংহে একটি ছড়া আছে—চৈতার বৌ গো তোর কড়ি নে, মোর টাকা দে গো।’ সে বারবার তাহাকে “চৈতার বৌ চৈতার বৌ” বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সেই পাপিয়ার নাম হইল ‘চৈতার বৌ’!” —খালেক দাদ। প্রবাসী: শ্রাবণ, ১৩২২, পৃঃ ৫১৭-৫১৮।

৯

“কোন গ্রামে এক বৃদ্ধা বাস করিত। সংসারে তার আপন বলিতে কেহ ছিল না। সে সারা জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া শেষ জীবনের সম্বল সামান্য কিছু

অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঞ্চিত অর্থের সন্ধান গ্রামের অন্য কেহ জানিত না, জানিত শুধু একজন—চৈতা নামে এক গৃহস্থ ছিল,—তার বউ। চৈতার বউ একদিন তার সপত্নী পুত্রকে আপন ছেলে বলিয়া বৃদ্ধার নিকট বন্ধক রাখিয়া তাহার টাকাগুলি লইয়া সরিয়া পড়িল, আর খোঁজ পাওয়া গেল না। এদিকে বৃদ্ধা সারা জীবনের কষ্টসঞ্চিত টাকাগুলি হারাইয়া অর্থ-শোকে অনাহারে মারা গেল। মরিয়া সে হইল পাপিয়া পাখী। এখনও বনে বনে ঘুরে আর ডাকে,—"চৈতার বউ গো! টাকা দে গো! তোর পোলা নে গো! ইত্যাদি।"—পূর্ণেন্দু ভূষণ দত্তরায়। প্রবাসী: অগ্রহায়ণ, ১৩৩১, পৃ. ২৪৬। (পূর্ববঙ্গে চলিত)

কথান্তর: পূর্ববঙ্গেই শোনা যায়, শাশুড়ী তার ছেলের বউয়ের কাছে টাকা জমা রেখেছিলেন; শাশুড়ী সেই টাকা ফেরত চাইলে বউ তা দিতে অস্বীকার করে। শাশুড়ীর তাগিদের হাত এড়াবার জন্য বউ পাখি হয়ে উড়ে যায়,—শাশুড়ীও পাখি হয়ে 'চৈতার বউ গো, টাকা দে গো' বলতে-বলতে তার পিছু-পিছু উড়তে থাকে।

১০

এক ছিল কৃপণ। তার ছিল অনেক টাকা। টাকা সে সুদে খাটাতো, এই ভাবেই সে টাকা করেছে। একদিন সে এক ঘাতককে দিল টাকা ধার। সে ঘাতক বলেছিল, একদিন না একদিন এ টাকা সে শোধ করে দেবেই দেবে। তা সে যেমন করেই হোক না। গায়ে খেটেই হোক বা টাকা দিয়ে হোক। আর কিছু না হোক, টাকার বদলে হয় মেয়ে, নয় বউকে [পুত্রবধূকে] সে দেবে। এমনি করেই দিন গেল। ঘাতক আর টাকা দেয় না। টাকা না দিয়ে একদিন সে মরেই গেল। কিন্তু কৃপণ মহাজন তার টাকা ছাড়বে কেন। সেও একদিন গেল মরে। দু'জনেই মরে গেল। কিন্তু কৃপণ মহাজন তার টাকার কথা ভোলে নি। মরে সে হয়েছে হুতোম প্যাঁচা। আজও সে গেরস্থ বাড়িতে এসে রাতের অন্ধকারে ডাকে: 'ঝি দিবি না বউ দিবি?'

—২৪ পরগণা অঞ্চলে চলিত।

মন্তব্য: শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূর সম্পর্ক নিয়ে একাধিক বিহঙ্গ-পুরাণ রচিত হয়েছে। এটিকে একটি Motif বলা যায়। এ বিষয়ে বউ-শাশুড়ীর সম্পর্ক বিষয়ক বিহঙ্গ পুরাণগুলি তুলনীয়। দ্বিতীয়ত, আপন সন্তানও এ বিষয়ে একটি ভূমিকা নিয়েছে।

১১

আগের জন্মে ডাহুক পাখি ছিল মানুষ। অনেক পরিশ্রম করে সে জমিয়েছিল এক কুড়ি টাকা। সেই টাকা সে একজনকে ধার দেয় (মতান্তরে হারিয়ে ফেলে)। যে ধার নেয়, সে সেই এক কুড়ি টাকা তাকে ফেরত দেয় নি (অথবা, হারিয়ে যাবার পরে সে টাকা আর ফিরে পায় নি)। এই টাকার শোকেই সে মারা যায়। মরে গিয়ে সে হয় ডাহুক পাখি। আজও সে সেই খোয়া যাওয়া টাকার জন্যে বিলাপ করে। সারারাত ধরে ডাহুক তাই গলা ফাটিয়ে এই বলে কাঁদে: "কোয়াক্, কোয়াক্, কুড়িক্ কুড়িক্" অর্থাৎ—কোথায় কুড়ি কুড়ি টাকা!

—নিতাই দাস (গদাইপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া)।

১২

সাদা বক আর 'কালা' বক। 'কালা' বক মানে ছাই রঙের বক, মাথায় ঝুঁটি বা 'টিকি' আছে। 'কালা' বক ছিল রাজা বক, মাথায় তাই ঝুঁটি। যতো 'হাওর-বিল' সবই ছিল 'কালা' বকের। 'হাওর-বিলে'র যতো মাছ আর পোকা, সবই খেত তাই 'কালা' বকই। একদিন 'কালা' বকের বাপ-মা মারা গেল। সে সহায়-সম্পত্তিহীন হয়ে পড়ল। অবস্থা পড়ে গেল। 'বিল-হাওর' আর রাখতে পারল না। টাকার অভাবে তা বাঁধা দিলে সাদা বকের কাছে। এখন 'বিল-হাওর' সাদা বকেরই হয়ে গেছে, 'কালা' বক আজও টাকা শোধ করতে পারে নি। তাই এখন দেখা যায়, সাদা বক জলায় চরছে, 'কালা' বক ডাঙায় চরছে, জলায় যাবার তার অধিকার নেই। টাকা শোধ না করবার লজ্জাতে 'কালা' বক সাদা বকের কাছ ঘেঁষে না। এজন্যেই সাদা বক আর 'কালা' বককে একত্র চরতে দেখা যায় না।—মুকুন্দলাল দাস (ফরিদপুর, মাদারীপুর, গ্রাম ঃ মহেন্দর দি, পোঃ রাজৈর)।

মন্তব্য ঃ বর্ষাকালে আদিগন্ত প্লাবিত হয়ে গেলে এ জন্যেই পূর্ববঙ্গে তাকে বলে 'বগা ঢল', অর্থাৎ থৈ থৈ করা জলকে বকের পাখার মতো সাদা বলে মনে হয় তখন।

১৩

মহম্মদপুর নামে এক গ্রামে এক বুড়ো আর বুড়ি থাকত। তাদের অনেক ধান-পাট-তিল-সরষে ছিল, গোয়ালে ছিল অনেক গোরু-মোষ। কিন্তু হলে হবে কি, তাদের কোনো ছেলে-পুলে ছিল না। কাজেই দুজনের মনে খুবই দুঃখ ছিল। বয়স যতই বাড়তে লাগল, ধন-সম্পদে এল বৈরাগ্য। তাই তারা একদিন সব ছেড়েছুড়ে তীর্থ করতে বের হল।

ধান পাট-তিল-সরষে ঘরে যত মজুত ছিল, দিল সব বেচে। গোরু-মোষ, এমন কি, ঘটি-বাটি খাট-পালঙ্ক পর্যন্ত সবই বেচে ফেলল। বিক্রি করে যে টাকা মিলল তা দু'টি মাটির কলসীতে পুরে গোয়াল ঘরে মেঝেতে পুঁতে রেখে গেল।

তারপর একদিন তীর্থ করতে বের হল। বেশ ক' বছর নানা তীর্থ ঘুরে শেষে একদিন ফিরে এলো তাদের সেই পুরোনো গ্রামে। কিন্তু গ্রামে এসে তারা তাদের ছেড়ে-যাওয়া পুরোনো ভিটেই চিনতে পারল না। ভিটে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই টাকা ভরা দু'টি মাটির কলসীও আর খুঁজে পেল না। অনেক খুঁজে তারা টাকার শোকে অভিভূত হয়ে গেল। ভগবান তাদের দু'টি প্যাঁচাতে পরিণত করে দিলেন। তারা কাছেরই একটি বটগাছে উড়ে গেল। পুরুষ পাখিটি বলতে থাকল "তুই খুলি, না মুই খুলি?—তুই খুলি।" স্ত্রী পাখিটি তার জবাবে বলে: "তুই খুলি না মুই খুলি? —তুই খুলি।" আজও তারা লুকোনো টাকা খুঁজে পায় নি এবং আজও সেজন্যে দু'জনে দু'জনকে দোষারোপ করে চলেছে।

—'মুকুল', চৈত্র ১৩০২, পৃ. ৩০৬-৩১১।

মন্তব্য: পাবনা জেলাতে এই জন্যে বিশ্বাস, হুতোম প্যাঁচা ও প্যাঁচানী পূর্ব জন্মের লুকোনো টাকা খুঁজে না পেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাতে এ পাখিকে "ধনহারা" পাখি বলে।

১৪

আগেকার দিনে লোকেরা ধন-রত্ন রাখত মাটির তলায়। হাঁড়ি-কলসীর মধ্যে ধন-রত্ন পুরে, রাতের অন্ধকারে নির্জন জায়গায় গর্ত করে লুকিয়ে রাখত। হুতোম প্যাঁচা আর তার বন্ধু (মতান্তরে তার বউ) নদীর পাড়ে গর্ত করে তাদের সব টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখলে রাতের বেলায়। তারপর তারা যায় বিদেশে। অনেকদিন পর ফিরে এসে পোঁতা টাকার খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু দু'জনে টাকা পুঁতেছিল রাতের বেলায়। ঠিক কোন্ জায়গায় টাকা পুঁতেছিল আজ কারো তা মনে নেই। এ দেয় ওর দোষ, ও দেয় এর দোষ। তাই আজও রাতের বেলায় ওরা টাকা খুঁজতে আসে। না পেয়ে বলে: তুই খুলি না মুই খুলি?

অন্য মতে 'কথা'টি এই: হুতুম প্যাঁচা আর প্যাঁচানী আগে ছিল চাষী আর চাষীবউ। ওরা গুপ্তধন পেয়েছিল। সেই ধন নদীর পাড়ে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ওরা দিন-কানা, দিনের বেলায় কোনো রকমে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন মরে যক্ষ হয়ে সেই জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর না পেয়ে দু'জনে দু'জনকে দোষ দিচ্ছে।

১৫

এক ছন্নছাড়া লোক ছিল। সে নানা রকম 'ভেল্‌কি' (যাদু) জানত। এক-এক দিন এক-এক রকম রূপ ধরে গ্রামের লোকদের নানাভাবে বিরক্ত করত। কখনো বাঁদর হয়ে ফল খেত, কখনো ভোঁদড় হয়ে পুকুরের মাছ খেত। গ্রামের লোক উত্যক্ত হয়ে ভাবল, ব্যাটার বিয়ে-থা দিয়ে দিতে পারলে তবে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। সবাই মিলে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিলে।

বিয়ের আগে লোকটা খুব কুমীর হত। কাউকে কুমীরে ধরলে সবাই ভাবত, ভেল্‌কিবাজ লোকটাই বুঝি কুমীর হয়ে ধরেছে। বিয়ের পর একদিন তার বউ বললে, তুমি কুমীর হয়ে আমায় দেখাও না! এখন আর লোকটা ভেল্‌কি দেখাতে চায় না। শেষে বউয়ের অনেক পেড়াপীড়িতে নিমরাজী হল। বললে, ভাদ্দর-আশ্বিন মাসে সে কুমীর সেজে দেখাবে।

একদিন ভাদ্দর মাসে ভেল্‌কিবাজ লোকটা রোদে পুড়ে খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে এসেছে। বউ তখন গামছা দিয়ে তার ঘাম মোছাতে গেল। মোছাতে গিয়েই দেখলে, তার কানের গোড়ায় ছোট্ট একটা শিশি গোঁজা। ওটা কী, ওটা কী, বউয়ের তো দারুণ কৌতূহল হল। ভেল্‌কিবাজ বললে, ওই শিশিতে আছে মন্ত্র-পড়া জল। সে যখন পশু-পাখি হয়, তখন সেই জল ছিটিয়ে দিলেই সে ফের হয়ে যায় মানুষ। তারপর বউয়ের অনুরোধে সেদিন রাতে পাখি হয়ে ভেলকি দেখাবে বলে কথা দিল।

রাতের বেলায় ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। লোকটা পাখি হবে, আর বউ তখন শিশির ছিপি খুলে সেই ওষুধ তার গায়ে ঢেলে দেবে, ঠিক হল। লোকটি পাখি হতেই বউ তাই দেখে ভয়ে-বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল। এদিকে ছুটোছুটি করতে গিয়ে প্রদীপের শিখাতে পাখির ল্যাজটি গেল পুড়ে। চোখ দিয়ে সে বারবার বলছে, মন্ত্র-পড়া ওষুধ তার গায়ে ঢেলে দিতে। বউ ভয় পেয়ে হাত কাঁপিয়ে শিশির ছিপি খুলল বটে, কিন্তু ওষুধ সবই গেল মাটিতে পড়ে। লোকটি আজও তাই পাখি হয়ে আছে। তাই আজও ঘরের কাছে ঝোপঝাড়ে ঘোরে।

এ পাখিই কুকো পাখি। এ পাখি ডাকে হঠাৎ করে 'কুক্' বলে। যেন কেউ জোরে কোনো শিশির ছিপি খুলছে। ল্যাজটি পুড়ে গেছল বলে, আজও তা কালো হয়ে আছে।—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকার (মেদিনীপুর, ঘাটাল, বোরে ডাঙ্গি গ্রাম)।

মন্তব্য: ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই সে ভেলকি দেখিয়েছিল; এ সময়েই এ পাখির প্রজনন-ঋতু।

প্রায় এই একই ধরণের কথা কামাখ্যার এক ভেলকিবাজ সম্পর্কে শোনা যায়। সেখানে কুমীর হবার কথা আছে। কুমীর হবার কথা এখানেও অবশ্য আছে। দ্রঃ নদেরচাঁদ ঘাট: মানসী॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। পৃ. ১৬৫-১৭০: অশ্বিনী কুমার সেন। দ্রঃ ৫০-সংখ্যক কথা।

১৬

এক গ্রামে এক বুড়ো চাষীর পরমা সুন্দরী এক কন্যে ছিল। কন্যের নাম পুতি। পুতির রূপ দেবীর মতো। তার চোখ দু'টি বড়ো-বড়ো, কান পর্যন্ত তা ছড়ানো। অমন দেবীর মতো রূপ দেখে কেউ তার কাছ ঘেঁষত না। ভয়ে-সম্ভ্রমে সবাই দূরে দূরে থাকত। এই দেবীর মতো রূপ বলেই পুতির বিয়েও হয় নি।

এদিকে রাজার বাড়িতে রাজপুত্রের চোখ নেই। সে অন্ধ, চোখে দেখে না। রাজা দেশের যতো বৈদ্য-ওঝা-পণ্ডিত, সব্বাইকে ডেকে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। বৈদ্য-ওঝা-পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন, তার নাম 'সবজান্তা বুড়ো'। সেই বললে, মহারাজ যদি কোনো দেবীর মতো রূপসী মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দেওয়া যায়, তবে রাজপুত্রের চোখ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু সেই কন্যের চোখ হওয়া চাই কান পর্যন্ত ছড়ানো। তখন, রাজার লোক-লস্কর খুঁজে-খুঁজে সেই বুড়ো চাষীর কন্যে পুতির খবর দিলে। একদিন রাজপুত্তুরের সঙ্গে পুতির বিয়ে হয়ে গেল।

দিন যেতে লাগল, কিন্তু সবজান্তা বুড়োর কথা মতো রাজপুত্তুরের চোখ ভালো হল না। সবাই নানা কথা বলাবলি করতে লাগল। সবজান্তা বুড়ো তখন পুতিকে বললে, তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকো যাতে তোমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়ে রাজপুত্রের চোখ ভালো হয়ে যায়। পুতি তাই করলে। আর দিনে-দিনে সে নিজে যতই অন্ধ হতে থাকল, রাজপুত্রের চোখও তেমনি ভালো হতে লাগল। চোখের ব্যথায় পুতি চিৎকার করতে থাকল, 'চোখ গেল।' তাই শুনে রাজপুত্র কখনই আর নিজের চোখ ভালো করতে চাইল না। দুঃখে রাজপুত্র কেঁদে উঠল।

তখন সেই সবজান্তা বুড়ো মন্ত্র দিয়ে দু'জনকেই পাখি করে দিলে। তারা ডাকে 'চোখ গেল।'

মন্তব্য : লোকসাহিত্যে যেমন একজনের প্রাণ অপর ব্যক্তি বা বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, এখানে তেমনি চোখের অসুখটির বিনিময় করা হয়েছে। যেন রোগ স্থানান্তরিত করা যায়, দেহ থেকে তাকে বিযুক্ত করা যায় ; যেন রোগ একটি object বা বস্তু-বিশেষ এবং তার স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে। এটি একটি Motif।

দ্বিতীয়ত, দুঃখ-যন্ত্রণা অশান্তির পটভূমিকায় অপর কেউ মানুষকে পাখি করে দেয়। মানুষের পক্ষিরূপ প্রাপ্তির পেছনে তিনটি পন্থা আছে : ক. অভিশাপ দিয়ে ; খ. আশীর্বাদ রূপে, শান্তি কামনায় ; গ নিজের ঐকান্তিক বাসনায়, নিজে-নিজেই। বর্তমান ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাটি ক্রিয়াশীল হয়েছে, এটাই এখানকার Motif। দ্রঃ ১৯-২৩-সংখ্যক কথা।

তৃতীয়ত, পাখির সঙ্গে চোখের সংস্পর্শ লক্ষণীয়। এ বিষয়ে 'চোখ গেল' পাখিকে কেন্দ্র করে রচিত 'কথাগুলি' দ্রষ্টব্য।

১৭

ল্যাজেকাঠি পাখি আগের জন্মে যখন মানুষ ছিল, তখন সে সুঁচ চুরি করেছিল। সেই সুঁচটাই বিরাট আকারের হয়ে তার ল্যাজ হয়ে আছে, লাঠির মতো। এইজন্যে এ পাখির আর এক নাম 'সুঁইচোরা'। সুঁচ চুরি করে এ পাখি গর্তের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল। শিশু আর অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আগের জন্মেও দেখতে পারত না। তাই এখনও কোনো ছোটো ছেলেমেয়ে রাতের বেলায় তাড়াতাড়ি না ঘুমুলে সে এসে তাদের চোখে সুঁচ ফুটিয়ে দেয়।

—তারক চক্রবর্তী। খুলনা অঞ্চলে চলিত।

মন্তব্য: এ পাখির অপর নাম 'বাঁশপাতি'। জলপাইগুড়ি-রঙপুরে একে বলে 'সুঁইচোনা'। বাঁশপাতার মতোই রঙ সবুজ। মাটিতে গর্ত করে বাস করে। দ্রঃ ৫০-সংখ্যক কথা।

১৮

জেলের মধ্যে যে কয়েদীরা থাকে, তাদের দু'পা থাকে এক সঙ্গে বাঁধা। হাঁটতে গেলে হাঁটা যায় না। তাই নড়তে-চড়তে তাদের জোড়া পায়ে লাফ দিয়ে-দিয়ে যেতে হয়। জেলে অসুখ হলেও এইভাবে থাকতে হয়। আর সেই অবস্থায় অনেক সময় অনেক কয়েদীর মৃত্যুও হয়।

যে সব কয়েদীর এই ভাবে মৃত্যু হয়, তারাই মরে হয় চড়ুই পাখি। এই জন্যেই চড়ুই পাখিরা দু' পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে।—সুরেন্দ্রনাথ রায় (জলপাইগুড়ি, ধাপগঞ্জ, গড়ালবাড়ী)।

মন্তব্য: জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-রঙপুর ও দিনাজপুরে কালীপুজোর সময় 'চোর-চুন্নী'র গান নামে এক ধরণের গান হয়। চোর ও চোরনী, স্বামী-স্ত্রী, চৌর্য-বৃত্তিকে পটভূমিকা রেখে জীবন ও সমাজ সমালোচনা করে। চোর-চোরনীর জীবন-কথা ওই অঞ্চলে প্রায় Myth-এর মর্যাদা পেয়েছে। মনে হয়ে এই 'চোর'-এর কথাই শেষে এই পাখি সম্পর্কীয় Myth-সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

১৯

"এক গৃহস্থের সাত ভাই, তাদের সাত বউ।...কেবল ছোট বউ কর্মিষ্ঠ, সেই রাঁধে, সেই বাড়ে।... ছোট বউর স্বামী বেশী কিছু জানে না, তাই তার গঞ্জনা ...। একদিন ছোট বউ রেঁধেছে, তাতে ভাত কিছু বেশী হয়েছে।...আর একদিন অমনি ছোট বউ কিছু ঠিক না পেয়ে ভাত কম রেঁধেছিল; নিজে আধপেটা খেয়ে শাশুড়ী, ননদ ও জা'দের ভরপুর খাইয়েছিল। আবার একদিন হঠাৎ ছোট বউর হাত ফসকে একটা বাটি পড়ে ভেঙে গেল।...তখন ছয় বাঘিনী তেড়ে এসে ছোটবউকে কিল চাপড় লাথি মারল।...মনের দুঃখে ছোট বউ আস্তে আস্তে হাঁড়ি চেঁচে, হাঁড়ীর কালো ঝুল গায়ে মেখে খিড়কী দিয়ে বনে পালিয়ে গেল।...তার কষ্ট দেখে দেবতার মনে বড়ই কষ্ট হলো। তিনি নিজে এসে বললেন, "মা, তুমি কেঁদ না। তোমায় বর দিলাম, যাও তুমি পাখি হয়ে উড়ে যাও।...সেই থেকে সে হাঁড়িচাচা নাম ধরে' গাছে গাছে থপ্ থপ্ করে উড়ে বেড়ায়।"—রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও জগদ্বন্ধু পাল : প্রবাসী। চৈত্র, ১৩২৮। পৃ. ৮০২-৮০৩।

মন্তব্য : এই জন্যে বহু অঞ্চলে হাঁড়িচাচাকে 'কুটুম পাখি' বলে। এ পাখি ডাকলে বাড়িতে কুটুম আসে।

দ্রঃ ১৬-সংখ্যক 'কথা'র পাদটীকায় আমার মন্তব্য। পক্ষিরূপ প্রাপ্তির পেছনে তিনটি পথকে লক্ষ করা যায়। এই গুচ্ছের 'কথা'গুলিতে দেখা যায়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি বিধানের জন্যে তাকে পাখি করে দেওয়া হচ্ছে। পক্ষিরূপ প্রাপ্তি এখানে আশীর্বাদ স্বরূপ।

২০

গেরস্থঘরের এক বউ। তার ছিল এক পাখি। সে পাখি রোজ উড়ে এসে তার কাছে বসত। বউ তাকে খেতে দিত, হাতে নিয়ে আদর করত। পাখিটাকে বউ খুব ভালো বাসত। পাখিটারও দিন খুব সুখে কাটছিল। তাকে আর কষ্ট করে খাবার খুঁজতে হত না। রোজ এসে সে বউয়ের খোঁজ নিয়ে যেত। সেদিন পাখি এসেছে, রোজদিন যেমন আসে। কিন্তু সেদিন কেউ তাকে ডাকল না, আদর করল না, খেতেও দিল না। এমন কি বউটিও নয়। ঠাহর করে দেখলে, ঘরের ভেতর বউ মরে আছে, আর সবাই বউকে ঘিরে কাঁদছে। বউ কথা কইছে না। পাখি তখন বউয়ের কাছে গিয়ে বললে, বউ কথা কও! বউয়ের দুঃখেই পাখি কাতর হয়ে আজও ওই বলে ডাকছে।

—আনিসুর রহমান। বর্ধমান অঞ্চলে চলিত।

২১

এক জন্ম চাষী। চাষীর বউ গেল মরে। রেখে গেল ছোটো মেয়ে 'খুমতি'কে। চাষীকে আবার বিয়ে করতে হল। বছর ঘুরতেই চাষীর ঘরে আবার একটি মেয়ে হল। গায়ের রঙ হলুদ বলে নাম রাখল 'করমতি'।

দু' বোন লাঙ্গা [জিনিসপত্র মাথায় বয়ে নেবার বাঁশের তৈরি পাত্র বিশেষ] মাথায় জুমে গেল একদিন। ছোটো বোন করমতি জুমে গিয়ে তরকারি তুলে লাঙ্গা ভরতি করতে লাগল ওদিকে বড়ো বোন খুমতি বেছে বেছে ফসল তুলেছে—আর দা দিয়ে কেটে কেটে খেয়ে ফেলেছে। করমতি দিদিকে বলল, 'দিদি আমার লাঙ্গা তো ভরে গেছে, চল এবার বাড়ী যাই।' খুমতি বলল, 'তোর লাঙ্গা থেকে আমাকে কিছু দিয়ে দে। না হলে বাড়ীতে গিয়ে আমি কি দেখাব।' দিদির কথায় করম বেশ বিরক্ত হল। বলল, 'রোজ তুমি তরকারি না তুলে আমার কাছ থেকেই চেয়ে নাও। আজ আমি তোমাকে একটিও দিচ্ছি না।'

দু' বোন নীরবে বাড়ীর পথে চলতে লাগল। খানিকটা পথ এগিয়ে গেলেই একটা নদী। নদীর পারে এসে খুমতি বলল, 'চল্ করম এখানে আমরা একটু জিরিয়ে নিই।' করম দিদির কথায় রাজী হল। যে গাছটার নীচে ওরা বসেছিল, সেটা একটা বটগাছ। ডালপালাগুলো নদীর ওপর পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। খুমতি একটা লতা এনে গাছের ঝোলানো ডালটায় বেঁধে একটা দোলনা বানিয়ে ফেলল। প্রথমে খুমতি দোলনায় দোল খেল। খুমতি নেমে এল। করম দোলনায় চেপে বসলে খুমতি দোলাতে লাগলো। আচমকা দোলনাটাকে একটা ধাক্কা দিল। করম নদীর জলে পড়ে গেল। জলে ছিল মস্ত একটা বোয়াল মাছ। খাবার ভেবে করমকে মুখে পুরে দিল। কাঁচা হলুদ বরণ করমতির ছোঁয়া পেয়ে নদীর সবটা জলই হলুদ হয়ে গেল।

খুমতির ঠাকুরমা বুড়ী নদীতে চান করতে গেছে। ঘাটের তক্তার ওপর বুড়ী যেইমাত্র কাপড় কাচতে গেছে, অমনি কে যেন করমতির সুরে বলে উঠল 'ও ঠাকুর মা, আমার পায়ে লাগছে যে।' আবার কে বলে উঠল, 'ও ঠাকুরমা, আমার বুকে লাগছে যে।' আবারও কে বলে উঠল, 'ও ঠাকুরমা আমার মাথায় লাগছে যে।' ঠাকুরমা ঘাটের কাঠটা সরিয়ে ফেলতেই দেখল একটা বোয়াল মাছ করমতিকে গলা অব্দি গিলে ফেলেছে। বুড়ী সমস্ত শক্তি দিয়ে মাছটাকে ডাঙায় টেনে তুলল। তারপর একটা কাস্তে দিয়ে মাছটার পেট চিরে করমতিকে বের করে আনা হল। তারপর বাড়ীতে গিয়ে বুড়ী একে-একে সব কথা জানাল। সবাই খুমতিকে বকতে লাগল। কিন্তু খুমতির বাবা ওকে কঠিন শাস্তি দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

পরদিন খুমতির বাবা বাঁশ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা খাঁচা বানাল। খাঁচা বাঁধা শেষ হলে খুমতিকে ওর বাবা ডেকে বলল, 'ভেতরে গিয়ে দেখতো দাঁড়াতে পারিস কিনা।' খুমতি ভেতরে ঢুকতেই ওর বাবা খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর খাঁচাটিকে উঠোনের ওপরেই প্রকাণ্ড একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। খাঁচার ভেতর

থেকে খুমতি কেঁদে-কেঁদে বাবাকে অনেক মিনতি করে নামিয়ে দিতে বলল। কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। খাঁচার ভেতরেই খুমতির দিন কাটতে থাকল। খিদের খাবার আর তৃষ্ণায় একবিন্দু জলও পেল না খুমতি।

সেদিন রাত ভোর হতেই বাড়ীর সবাই জুমের কাজে চলে গেল। করমতি বাড়ীতে রইল। খুমতি করমতির কাছে একটু জল চাইল। করমতি কিছু 'মায়দুল' (ভাতের মোচা) আর এক চোঙা জল তাকে দিল।

দুপুরে সবাই জুমে চলে গেলে খুমতি আকাশের দিকে চেয়ে উড়ন্ত নাঐ পাখিদের দেখত। সে ভগবানের কাছে নাঐ পাখিদের মতো উড়ে বেড়ানোর শক্তি প্রার্থনা করত। একদিন করুণ সুরে গান গেয়ে পাখিদের বলল,

ওগো আমার নাঐ পাখি, বারেক ফিরে চাও।
নীল আকাশে উড়তে সাধ, পালক এনে দাও॥

পাখিরা দল বেঁধে এসে সবাই একটি-একটি পালক দিয়ে গেল। এমনি করেই গান গেয়ে একদিন চাইল ঠোঁট, একদিন চাইল নখর। পাখিরা তাই দিয়ে যেতে লাগল। তারপর ঠাকুরমার কাছ থেকে সূঁচ আর সুতো জোগাড় করল। সেই সূঁচ-সুতো দিয়ে, নাঐ পাখিদের দেওয়া পালক-ঠোঁট-নখর জোড়া দিয়ে একটি নাঐ পাখির পোশাক তৈরি করল। তারপর একদিন ভোরে সেই নাঐ পাখির পোশাক পরে, খাঁচাটি ভেঙে বেরিয়ে এল। দু'টি পাখা নেড়ে উড়তে থাকল বাড়ীর ওপরে। নাঐ পাখিদের ডেকে বলল,

ওই আকাশে ক্ষণেক দাঁড়াও, আমায় নিয়ে যাও।
উড়ে যাবো নীল আকাশে, ডানায় শক্তি দাও॥

খুমতির বাবা-মা আকাশের দিকে চেয়ে বারবার খুমতিকে ফিরে আসতে বলল। খুমতি বলল, আমাকে খিদেয় খেতে দাও নি, তৃষ্ণায় জল দাও নি। করমকে মেরে ফেলার ইচ্ছা আমার ছিল না। করমতিকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই আমাকে খেতে দিয়েছিস, জল দিয়েছিস। তোর মঙ্গল হবে, তুই সুখী হবি। তোর হলুদ বরণ দেহের ছোঁয়ায় নদীর জল হলুদ হয়ে গিয়েছিল। তাই আজ থেকে সে নদীর নাম হোক 'তৌয় করম' বা 'হলুদ বরণ নদী'।

খুমতির ডাকে দলে-দলে নাঐ পাখিরা উড়ে চলে এল। নাঐ পাখিদের বলল,

দূর আকাশের নাঐ পাখি, দূর আকাশেই যাও।
দেহের যত ময়লা আছে, ওদের গায়ে দাও॥

এই কথা শুনে সব নাঐ পাখিরা মলত্যাগ করল। তা গিয়ে পড়ল খুমতির বাবা-মার গায়ে। খুমতি আকাশে উড়ে গেল।

সুদূর পাহাড়ের গায়ে 'তৌয় করম' নদী আজও দু'বোনের সেই করুণ কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয়।—ত্রিপুরার রূপকথা (উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৮০ পৃ. ১৩০-১৩৮)।

২২

এক চাষীর দুটি মেয়ে। একদিন মেয়ে দু'টি পাহাড়ের ঢালে জুম-ক্ষেতে গেল শাক তুলতে; শাক তুলে ফিরে আসছে, এমন সময়ে পাহাড়ী নদীর ধারে দেখতে পেল একটি গাছ। তারা গাছটিতে দোলনা বেঁধে দু'জনে মিলে দোলা খেতে লাগল। আগে বড়ো বোন দোলা খেল। এবার ছোটো বোনের পালা। বড়ো বোন খুব জোরে-জোরে তাকে দোলা দিতে লাগল। ছোটো বোন তাতে ভয় পেল। বড়ো বোন সে কথা না শুনে আরো জোরে দোলা দিতে লাগল। শেষে একবার এমন জোরে দোলা দিল যে, ছোটো বোন গিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। নদীতে ছিল একটি বোয়াল মাছ। মাছটি তৎক্ষণাৎ তাকে গিলে ফেলল। কিন্তু তার মাথাটি মাছটির মুখের থেকে একটু বেরিয়ে রইল।

ছোটো বোনকে ওই ভাবে ফেলে রেখে বড়ো বোন বাড়ি ফিরে এল। একটা যেমন-তেমন ওজর দেখিয়ে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেল। বাপ-মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা ছোটো বোনকে সারারাত ধরে খুঁজলে। পরদিন সকালে যখন ওদের মা গেছেন নদীর ঘাটে 'পাটে'র ওপর কাপড় কাচতে, তখন তিনি শুনতে পেলেন 'পাটে'র তলায় কে যেন ক্ষীণ গলায় কাঁদছে। শেষে দেখলেন, কান্না আসছে বোয়াল মাছের মুখের ভেতরে ঢুকে থাকা একটি বালিকার কণ্ঠ থেকে। তখনি বঁটি এনে সেই বোয়াল মাছের পেট কেটে ফেলতেই, দেখতে পেলেন তার ছোট মেয়েকে। তারপর মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর, সব কথা ফাঁস করে দিলে।

ব্যাপার শুনে বাপ-মা বড়ো মেয়েকে কঠোর সাজা দিতে চাইলেন। একটি শুয়োরের খোঁয়াড় তৈরি করে, নানা ছল-ছুতো করে বড়ো মেয়েটিকে দিলেন তাতে পুরে। বাইরে থেকে দরজা শক্ত করে বন্ধ করে দিলেন। মেয়েটি বন্দী হয়ে সেভাবেই রইল।

দিন কয়েক এভাবে থাকবার পর বড়ো মেয়েটি একদিন লক্ষ করলে, মথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক 'নাওয়া' পাখি উড়ে যাচ্ছে। ছোটো বোনের কাছ থেকে সে একটি ছুরি জোগাড় করে এনেছিল। তাই দিয়ে খোঁয়াড়ের দরজার বাঁধন কেটে সে বাইরে এল। বাইরে এসে পাখিদের কাছে চাইল তাদের কয়েকটি পালক। সেই পালক জোড়া দিয়ে দিয়ে সে দু'টি ডানা তৈরি করলে। শেষে নিজের দুই বাহুতে সেই ডানা দু'টি লাগিয়ে নিয়ে সে পাখির মতো উড়ে গিয়ে বসল এক উঁচু ঘরের চালে।

খবর পেয়ে তার বাপ মা, আত্মীয়-স্বজন সবাই ছুটে এল। সবাই তাকে ফিরে আসতে অনুরোধ করলে: কিন্তু সে কারো কথাই শুনলো না। সে বললে, সে ঠিক করেছে, নাওয়া পাখিদের সঙ্গেই সে পাখি হয়ে চলে যাবে। তার বাপ-মা অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দিয়েছে, তাই চলে যাচ্ছে সে। অবশেষে সকলের অনুরোধে সে বললে, প্রতি বৎসর 'য়ামিতা' উৎসবের সময় সে একবার দেখা দেবে। 'য়ামিতা' উৎসব হয় নবান্নের সময়। আজও তাই 'নাওয়া' পাখিদের বছরের ওই

সময়েই দেখতে পাওয়া যায়।—দ্রঃ 'শিশুসাথী' : চৈত্র ১৩৩২, পৃ ৪৫৮-৪৬৬।
(ত্রিপুরা জেলাতে চলিত)।

মন্তব্য : সংস্কৃত লাব>নাওয়া।

২৩

বসন্ত নামে একটি লোক ছিল। সে খুব ভালো গান গাইতে পারত। গ্রামের বউ-ঝিরা তার গান শুনতে খুব ভালোবাসত। বসন্তর বাপ-মা কেউ ছিল না। গ্রামের লোকেরা সবাই মিলে তাকে একটি কুঁড়ে ঘর করে দিয়েছিল, সে তাতেই একা-একা থাকত। কারো বেড়া বেঁধে দিত, কারোর বা ঘর ছেয়ে দিত। কেউ তাকে খেতে দিত, কেউ তাকে পরতে দিত। এভাবেই তার দিন চলে যেত। সে মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়াত।

গ্রামের লোকেরা তখন বসন্তকে সংসারী করে দেবার কথা ভাবল। কিন্তু পরের কৃপায় যার দিন চলে, তাকে মেয়ে দেবে কে? তখন একটা কাক এসে বললে, তোমরা কেউ বসন্তর বিয়ে দিয়ে দিতে পারছ না? আচ্ছা, এসো, আমিই ওর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

পুবের দিকের এক গ্রামে থাকত এক বুড়ি, সঙ্গে থাকত তার নাতনী। কাক করলে কি, সেই বুড়ির ঘরের চালে গিয়ে রোজ কা-কা করে ডাকতে থাকত। বুড়ি খুব রেগেমেগে তার নাতনীকে বললে, কাকটাকে বিদেয় করতে পারিস? কাক যাতে আর ঘরের চালে বসতে না পারে সেজন্যে নাতনী পরদিন ঘরের চালটাতেই দিলে আগুন ধরিয়ে। বুড়ি তখন বাড়ি ছিল না। এসে দেখে, চাল পুড়ে ছাই। নাতনী খুশি হয়ে বলল, এবার থেকে কাক আর চালে বসতে পারবে না। বুড়ি ভাবলে, এমন বোকা মেয়ে নিয়ে বিপদ। যতো তাড়াতাড়ি হোক বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতেই হবে। বুড়ির ভাবনা হল, ফের কেমন করে ঘরের চাল ছাওয়া যায়। কাক তখন এসে বুড়িকে বললে, নাতনীর বিয়ে দাও। বুড়িও আর বে-আক্কেলে নাতনীকে ঘরে রাখতে চায় না। কিন্তু ঘরের যে চাল নেই, বিয়ে হবে কেমন করে? কাক বললে, কোনো চিন্তা নেই তোমার নাতজামাই এসে ঘর ছেয়ে দেবে।

কাক এসে তখন বসন্তকে বললে, বুড়ির ঘরের চাল ছেয়ে দিতে। বসন্ত পরদিনই কিছু খড়-কুটো জোগাড় করে দিলে চালটা ছেয়ে। পাড়ার লোকেরা তখন সবাই মিলে নানারকম জিনিস দিয়ে বসন্তর বিয়ে দিয়ে দিলে। ওই বুড়িরই নাতনীর সঙ্গে। এদিকে বসন্তর ঘরটা বড়োই ছোটো। বউ এসে তাতে থাকতে-শুতে পারে না। কোথায় কি করবে, ভেবে পায় না। বসন্ত বউয়ের জন্যে ঘরের সামনে পুকুর কেটে দিলো। কিন্তু বউ পুকুর-ঘাটে যায় না। বলে, তোমার আছে কী যে ধোব! শুনে

বসন্তর মন খারাপ হয়ে যায়। সে আর গান গায় না। গ্রামের বউ-ঝিরা বলে, না গো, বসন্তর বিয়ে দিয়ে কাজটা ভালো হয় নি।

পরদিন রাতের বেলায় বসন্ত ঘুমুচ্ছিল। বউ তখন করল কি, রাগ করে তার কৌটোর সব সিঁদুর স্বামীর দু'গালে মাখিয়ে দিলে। দিয়ে বলল, তুমি বউ সেজে থাকো, আমি চললুম ঠাকুমা'র কাছে। বলে সে সত্যিই চলে গেল। বসন্ত ঘুম থেকে উঠে দেখে, বউ নেই। চারিদিক খুঁজে-পেতে দেখল, কিন্তু কোথাও বউকে দেখতে পেল না। তখন বউয়ের খোঁজে সে গেল শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলে, ঘর-বাড়ি তালা-বন্ধ, বাড়িতে কেউ নেই। বউ ঠাকুরমার কাছে এসে দেখল, ঠাকুমা গঙ্গাসাগরে যাচ্ছে। সেও তখন ঠাকুমার সঙ্গে গঙ্গাসাগরে গেল।

ঘরে তালা-বন্ধ দেখে বসন্ত পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগলে। আমি তো বউকে কিছু বলি নি, তবু সে চলে গেল কেন? কাক সে কান্না শুনে ঘরের চালে এসে বসলো। সেই খবর দিলে, বউ তার ঠাকুমার সঙ্গে গেছে গঙ্গাসাগরের মেলাতে। কিন্তু গঙ্গাসাগর তো সেখান থেকে অনেকটা দূরে। অতদূরে এখন বসন্ত গিয়ে পৌঁছবে কেমন করে? কাক বললে, তোমায় দু'টি শেকড় এনে দিচ্ছি। একটা খেলেই তোমার পাখির মতো দু'টো ডানা গজাবে, তুমি উড়ে সেখানে যেতে পারবে। আর একটা শেকড় খেলেই তুমি ফের মানুষ হতে পারবে। বসন্ত হাত বাড়িয়ে সে শেকড় দু'টি নিলে। তারপর একটা শেকড় খেয়ে সে পাখি হল। অন্যটা ঠোঁটে করে নিয়ে সে উড়ে গেল সেই গঙ্গাসাগরের মেলাতে। কাকও গেল সঙ্গে।

সেখানে গিয়ে দেখল, বুড়ি আর তার নাতনী গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে আসছে। এদিকে হয়েছে কি, যে শেকড়টি খেয়ে ফের মানুষ হওয়া যায়, সেটি পথে যেতে যেতে তার ঠোঁটের থেকে পড়ে হারিয়ে গেল। সে তাই পাখি হয়েই গাছের ডালে বসে ওদের আসতে দেখে 'টুক্‌টুক্' করে ডাকলে। শুনে বুড়ির নাতনী 'ক্যাক্-ক্যাক' করে উঠল। রেগে বললে, ওই দ্যাখো, এখানেও এসেছে পাখিটা জ্বালাতে। রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে বুড়ির নাতনীর পেল খুব জল তেষ্টা। কাক তখন পাখি হবার একটি শেকড় এনে টুক্ করে বউটির সামনে ফেলে দিলে। তেষ্টা মেটাবার জন্যে বউ তখুনি সেই শেকড়টা কুড়িয়ে নিয়ে তার রস চুষে খেলে। খেয়ে নিতেই সে হয়ে গেল একটি পাখি। তখন সে ডালে-বসা পাখিটির সঙ্গে মিলে উড়ে চলে গেল। এরাই 'বসন্ত বৌরী' পাখি। বসন্ত আর তার বউ।—শংকরনারায়ণ ঘোষ। বীরভূম অঞ্চলে চালিত।

২৪

দুই ভাই। তাদের ঘর-বাড়ি ছিল না। একদিন তারা ঠিক করলে, দুই ভাই মিলে বাড়ি তৈরি করবে। কুড়ুল নিয়ে তাই তারা বনে গেল কাঠ কাঠতে। অনেক খুঁজে-পেতে একটি গাছ ঠিক করলে। তাই থেকেই কাঠ চেরাই করে বাড়ি হবে। যে গাছটি তারা ঠিক করলে, তা একটি বুড়ো গাছ। গাছটি কাটতে উদ্যত হতেই সে বললে : আমি বুড়ো, আমায় কেটো না। কিন্তু সে নিষেধ দু' ভাই শুনল না। তারা গাছ কেটেই চলল। তখন সেই বুড়ো গাছ তাদের দু' ভাইকে অভিশাপ দিলে : আমি বুড়ো হওয়া সত্ত্বেও যেমন তোরা আমায় কাটলি, তেমনি তোরাও কোনো দিন বাড়ি করতে পারবি না আমার অভিশাপে। সে অভিশাপ শুনেও দু' ভাই গাছটি কাটল। গাছ কেটে কাঠ বয়ে তারা বাড়ি আসছে। আসবার পথেই অপঘাতে মারা গেল এক ভাই। বাকী এক ভাই আর সেই কাঠ চেরাই করতে পারল না, কেননা কাঠ চিরতে দু' জন লাগে। তখন বাড়ি করতে না পারার দুঃখে সে ভাই পাখি হয়ে গেল। পাখি হয়ে সে গাছেই বাড়ি করতে চাইল। সে পাখিই কাঠঠোকরা। বাড়ি করবার জন্যেই আজও সে কাঠ চেরাই করছে তার ঠোঁট দিয়ে। গাছ পেলেই সে ঠুকরে চলে। তার এক ভাই মরে গেছে বলেই দেখা যায়, কাঠ-ঠোকরা সর্বদাই একা। কখনোই দুটি কাঠঠোকরাকে তাই একত্র দেখা যায় না।—শ্যামল ভৌমিক (জলপাইগুড়ি)।

২৫

এক বেশ্যা ছিল। একদিন তার ঘরে কেউ এল না। তখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক 'ঋষি-মুনি'। সে তাঁকেই তার ঘরে আসতে বললে। এই আহ্বান শুনে 'ঋষি-মুনি' খুব রেগে গেলেন। তাঁর অভিশাপে বেশ্যাটি হল 'তেলতেলানী' পাখি। 'ঋষি-মুনি' আরো বললেন : বেশ্যাদের যেমন দেহ-সজ্জা করবার জন্যে গায়ে-মাথায় তেল দিয়ে তৈল-চিক্কণ হতে হয়, এ পাখিও তাই হবে। এই জন্যে আজও এ পাখিকে দেখলে তৈলচিক্কণ বলে মনে হয়, নাম তাই 'তেল তেলানী', যেন বেশ্যাবৃত্তি করবার জন্যে দেহ-সজ্জা করেছে। বেশ্যাদের যেমন, যেদিন ঘরে লোক আসে সেদিন তৈলপক্ক খাদ্য জোটে, অন্যদিন জোটে না ; এ পাখিরও তেমনি। সবদিন এ পাখি নাকি খায় না। যেদিন খায় সেদিন বেশি খায়।—সুরেন্দ্রনাথ রায় (জলপাইগুড়ি, ধাপগঞ্জ, গড়ালবাড়ী)।

কথান্তর ১ : 'বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা :

নভেম্বর, ১৯৭৫) বইতে আবদুল হাফিজ ঢাকা (গ্রাম ও পোঃ বড়ইবাড়ি) জেলা থেকে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাতেই সংগৃহীত এই 'কথা'র কথান্তর দিয়েছেন (পৃ. ১৬০-১৬২)। সেখানে এটি তিতির পাখির সম্পর্কে বলা হয়েছে। কথার সার এই : শেখ ফরিদ (স্যাক ফরিদ) পথে-পথে বিচরণ করতে-করতে এক সন্ধ্যায় এক নির্জন কুটীরে এলেন। কুটীরটিতে থাকত একজন বেশ্যা। সে ফকিরকে ঘরে ডেকে আনল। নিজের পাপ-বৃত্তির কথা প্রকাশ করে শেষে সে বললে, এখন সে ফকিরকে বিয়ে করে নরক থেকে উদ্ধার পেতে চায়। ফকির তাকে এড়াবার জন্যে বাইরে গেলেন এবং ফিরলেন না। বেশ্যাটি তাঁর ফিরে আসবার প্রতীক্ষায় থেকে-থেকে সারা রাত কাটিয়ে দিলে। শেষে মতালের মতো বলতে থাকল : 'স্যাক ফকির বড় বেদরদ ! স্যাক ফকির বড় বেদরদ !!'

"এমনে করতে করতে আগত সুন্দর রূপসী কন্যা বনের পংখী অইয়াই গেল। তহন থিক্যাই তার নাম অইল তিতির।"

মন্তব্য ১ : জলপাইগুড়ি জেলার ধাপগঞ্জ অঞ্চল থেকেই একটি পাখির ডাক মেলে : 'চিত্ ফ্যাদেরেত্, চিত্ ফ্যাদেরেত্'। 'স্যাক ফকির বড় বেদরদ' ডাকের সঙ্গে তার মিল লক্ষণীয়।

২৬

'কুরগাল' (কুরর) পাখি আগের জন্মে ছিল মানুষ। সে এক গর্হিত কর্ম করেছিল। সেই কর্মের জন্যেই দেবতারা তাকে অভিশাপ দিয়ে পাখি করে দেয়। তাকে এই অভিশাপ দেওয়া হয় : দিনে সে একবারের বেশি খেতে পারবে না। প্রহরে-প্রহরে সে ডাকে। সেই ডাক শুনে জলের ওপর মাছ বা অন্য যা কিছুই ভেসে উঠবে, দিনে একবার মাত্র তাই খাবে। এ পাখি গাছের খুব উঁচুতে বসে তাই ডাকে। সারা দিনে যদি কোনো কিছুই ভেসে না ওঠে, তবে সে সারা দিনেও কিছু খায় না।—হরিশঙ্কর মুন্সী (শিকারপুর, চট্টগ্রাম)।

২৭

এক ব্রাহ্মণ ছিল, তার ছিল একটি 'বাসুয়া' (ব্রাহ্মণের ঔরসে, ব্রাহ্মণেতর স্ত্রীলোকের গর্ভজাত অর্ধ-অবৈধ সন্তান ; সেবক ভৃত্যরূপে বাড়িতে থাকে)। 'বাসুয়া'র ওপর ভার ছিল, ব্রাহ্মণের গোরুগুলিকে জল দেবার। কিন্তু বাসুয়াটি ছিল ভারী অলস। গোরুকে ঠিক মতো জল দিত না। কচুর পাতায় করে একটুখানি জল নিয়ে গোরুগুলোর মুখের সামনে ধরতো। তাতে ওদের তৃষ্ণা মিটত না। ব্রাহ্মণ রোজদিন তাঁর বাসুয়াকে জিজ্ঞেস করতেন, 'গোরুক জল দেখাইছিত্ ?' বাসুয়া উত্তর দিত, 'হ্যাঁ, দেখাইসু।' এই অনাচার আর মিথ্যাচার গোরুদের আর সইল না। তারা বাসুয়াকে অভিশাপ দিল : আমাদের মতো তুইও তৃষ্ণার্ত হয়ে থাক। মরে তুই পাখি হয়ে যা। এক ফোঁটা জলের জন্যে আকাশের মেঘের কাছে জল চাইতে চাইতে বুক তোর ফেটে যাক। দীঘির জলে তৃষ্ণা যেন না মেটে তের। ঘাড় নুইয়ে জল যেন না খেতে পারিস তুই। গোরুদের অভিশাপে বাসুয়া পাখি হয়ে 'ফটিং জল ফটিং জল' বলতে থাকল। বাসুয়াই মরে 'ফটিক জল' পাখি হয়েছে।—ললিত বর্মণ (দিনাজপুর, বোদা থানা [অবিভক্ত ভারতের জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্ত], সাকোয়াডাঙ্গা পাড়া)।

কথান্তর ১ : দক্ষিণ ভারতে এটি ধনেশ পাখির প্রসঙ্গে শোনা যায় : "In Southern India ..the hornbill is belived to have been a cowherd before its transformation by Vishnu as an everlasting punishment for cruelly refusing a drink of water to the sacred cow when she was thirsty. In the transformation, a beak was provided for the bird that would enable it to quench its thirsts only by looking up whenever it rained" "Bird Mythology" : The Calcutta Review (No. CXIII, July 1901), P. 73 : By : "R. R. P."

কথান্তর ২ : "…অ্যাগ গিরস্তের আচাল অ্যাক চাকর। তার পরদান কামই আচাল গরু রাকা আর গরু বেই যোগান যত্তন করা। ..ইদিকে চাকর করে কি—পর্তি দিনই গরু রাইব্যা আক হাইঞ্জ বাদেতে গরু নিয়া আহে বাইরে। কোনো কোনোদিন পানি খাওয়ায়, আবার বেশীর বাগই পানি না খাওয়াইয়াই গরু গোয়াইলে দ্যায়।…গরু বাচুর খালি দিন দিনই কাহিল অওয়া শুরু করচে। ..অ্যাগদিন হাইঞ্জেস সুমে গিরস্ত গোয়াইল্ ঘর মুহী এওগিয়া গেচে ইমুন সুমে অ্যাকটা গাই দৌড় দিয়া গিরস্তের বুগলে আইয়া ঠাস্ অইয়া পইড়া গেচে।…বউয়ে পানি আইন্যা যেই মাত্তর গাইয়ের হুমুকে দরচে অমনেই অ্যাক চুমুকে গাইয়ে ব্যাকফুটি পানি খাইয়া ফালাইচে। ..তক্ষণ তক্ষণি হ্যা চাকররে ডাগ দিল।…হ্যা হগল কতাই বাইংগ্যা চুইড়্যা কওয়া শুরু কলল।… আমি হাচাই কইর‍্যাই গরুগোনাবে পানি খাওয়াই নাই।…অহন অপনেরা

যা মুননয় করা হাবেন। ··গিরস্তে তারে বর দোয়া দিল যে,···চির জীবনেও ইজর্মেও তুই এই দুইন্যার পানি চাইয়া পাবি না,···। আছমান থন পানি পলুলে সেন তুই খাইবার পারবি। হেইত্থনে চাকড্ডা পইক অইয়া গেল আর তান নাম অইল হট্টিটিয়া বা চাতক। হেই যে ফুটু ফুটু দাও কইয়্যা হ্যা বাইর অইল আর ফুট পানি চাওয়া শেষ অইল না। ·" বাঙালা দেশের লৌকিক ঐতিহ্য (বাঙলা একাডেমি, ঢাকা: নভেম্বর, ১৯৭১): আবদুল হাফিজ। পৃ. ১৬৪-১৬৬। 'চাতক'কে 'ছাতক' বলা হয়েছে। ঢাকা জেলা (গ্রাম ও পোঃ বড়ইবারি) থেকে সংগৃহীত।

২৮

"এক সহরে বাস করত এক গয়লা।···সহরের লোক তার দুধের নাম দিয়েছিল—সাদা জল।···মৃত্যুর পর গয়লাকে হাজির করান হল ধর্মরাজের দরবারে। তার বিচার হবে।···ধর্মরাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর কঠোর কণ্ঠে বললেন—তুই এবারে এক রকম পাখি হয়ে জন্মাবি।···কেবল বর্ষায় মেঘের জল পান করে' তুই জীবন ধারণ করবি। অন্য সময় বা কোন জলাশয়ে তোর জলপানের শক্তি থাকবে না। তোর তেষ্টা কিছুতেই মিটবে না। · সেই অবধি সে গয়লা চাতক পাখী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। সে কেবল মেঘের জল পান করে। অসংখ্য জলাশয়ের দিকে চেয়ে থাকে—তেষ্টা পেলেও তাদের জলপান করবার তার শক্তি নেই। গ্রীষ্মকালে দারুণ তেষ্টায় যখন তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, ছাতি ফেটে যায়, তখন তাকে আকাশ ফাটিয়ে করুণস্বরে কাঁদতে শোনা যায়—ফটিক জল, ফটিক জল!' —দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার। প্রবাসী: ভাদ্র, ১৩২৯, পৃ. ৭০৭-৭০৮।

একবার দেশে হল ভীষণ খরা। এক ফোঁটা বিষ্টি নেই, রোদে পুড়ে ছিষ্টি খাক হয়ে গেল। জলের এমনি অভাব হলো যে খাবার জলটুকু পর্যন্ত নেই। সারাদিন চেষ্টা করে হাজা-মজা নদী থেকে কয়েক ফোঁটা জল পাওয়া যেত মাত্র। জলের অভাবে দেশ থেকে রান্নার পাট উঠে গেল। সবাই সব জিনিস পুড়িয়ে খেতে লাগল।

একদিন এক বিধবা ময়ের একমাত্র ছেলে পোড়া খেয়ে মা-র কাছে জল খেতে চাইল। জল কোথায়, বাড়িতে এক ফোঁটা জল নেই। মা চলল সেই হাজা-মজা নদীতে, যদি এক ফোঁটা জল মেলে। অনেক চেষ্টার পর একটু জল নিয়ে সে যখন বাড়ি এল, ছেলে তখন তেষ্টায় মরে গেছে। পুত্রশোকে বিধবা পাগল হয়ে গেল।

সে মনে করত, ছেলে তার মরেনি, জল খাবার জন্যে এখনও বেঁচে আছে। সেই জন্যে প্রত্যেক দিনই সে জল জোগাড় করে আনত। কিন্তু কেউ সে জল চাইলে তাকে সে দিত না। একদিন আর এক বিধবার ছেলের অমনি দশা হল: এক্ষুণি জল চাই। পুত্রশোকী বিধবার কাছে জল থাকা সত্ত্বেও সে এক ফোঁটা জল দিল না ওই ছেলেটিকে। তখন শনি ঠাকুর ওই বিধবাকে অভিশাপ দিলেন: তুই রুক্ষু পাখি হয়ে থাকগে। সেই অভিশাপেই বিধবা তখন একটা পাখি হয়ে আকাশে উড়তে থাকল। আর সেই থেকে সে বলে চলেছে: ফটিক জল, ফটিক জল!—শংকরনারায়ণ ঘোষ।

মন্তব্য: পুত্রশোকাতুর জননীর পক্ষিরূপ ধারণ অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় ঘটেছে, কোনো অভিশাপে নয়।

৩০

"এক নগরে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার একটিমাত্র পুত্র ছিল, আর দ্বিতীয় কোন আত্মীয়-স্বজন তাহার ছিল না।...একদা বৃদ্ধা জ্বর রোগে আক্রান্ত হইল। ...একদিন বৃদ্ধা মুমূর্ষু অবস্থায় জলপান করিতে চাহিল; কিন্তু বালক 'দেই' বলিয়া খেলা করিতে লাগিল এবং জল দেওয়ার কথা ভুলিয়া গেল। ..এদিকে বৃদ্ধা শেষ অবস্থায় উপনীত।...অত্যল্প কালমধ্যে বৃদ্ধা রমণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।"

"পুত্রটি অনেকক্ষণ পরে ঘরে আসিয়া দেখিল জননীর দেহে প্রাণ নাই।. জননী জল-পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এই কথা ভাবিয়া বালক বড়ই অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিল।...অবশেষে একদিন প্রবল জ্বররোগে বৃদ্ধার স্মৃতিচিহ্ন পুত্রটিও জননীর নিকট চলিয়া গেল।"

"বালকের মৃত্যু হইলে ধর্মরাজের রাজসভায় পাপ-পুণ্যের বিচার আরম্ভ হইল।... ধর্মরাজ অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন,—"তুই পরজন্মে পাখী হইয়া জীবন ধারণ করিবি", এবং তোর জননীর মত শুষ্ককণ্ঠে "জল, জল, ফটিক জল" বলিয়া চিৎকার করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইবি—বৃষ্টিপাত না হইলে কখনও জলপান করিতে পারিবি না, এবং তোর তৃষ্ণাও মিটিবে না।"

"সেই অবধি অভিশাপগ্রস্ত বালক চাতকপাখী হইয়া আকাশপথে উড়িয়া বেড়ায়.."

—নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রবাসী: আশ্বিন, ১৩২৯, পৃ. ৮৭০।

কথান্তর ১: প্রায় এই একই কথা মাছরাঙা প্রসঙ্গেও শোনা যায়: মা জল খেতে চেয়েছিল, ছেলে জল দিতে পারে নি, ভুলে গিয়েছিল। মরণকালে মা তাই ছেলেকে অভিশাপ দেয়: তুই আর এ জীবনে জল খেতে পারবি না। সেই থেকে ছেলে জল খেতে পারল না, তার বুক-গলা শুকিয়ে গেল। কেবল বৃষ্টির জল খেতে পারে সে। তাই সে এই বলে ডাকে: 'মেঘ কর্, মেঘ কর্'। আর খায় মাছ। ঠোঁট দিয়ে জল

থেকে মাছ তুলে, সেই মাছ ভালো করে ঝেড়ে নিয়ে তবে মাছরাঙা মাছ খায়। কেননা, মা অভিশাপ দিয়ে গেছে, বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য কোনো জল সে যেন খেতে না পারে। মাছরাঙা সেই জন্যে মাছ না ঝেড়ে খায় না।—প্রিয়বালা ঘোষ (ফরিদপুর, মাদারীপুর, গ্রাম : কার্তিকপুর)।

দ্রঃ ২৯-সংখ্যক 'কথা'।

৩১

...অনেক আগের দিনে দূর পাহাড়ের গাঁয়ে এক গেরস্ত জুম চাষ করত। তার নাম ছিলো কচাক রায়। স্ত্রীর নাম ছাম্পারি। ছাম্পারি কাজে-কর্মে খুবই ভাল।

...কচাক কিন্তু এদিকের কুটোটি ওদিকে নেয় না। রাজ্যের সেরা আলসে। মদ পেলে তো কথাই নেই। তা না পেলে বারান্দায় দাওয়ায় বসে সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি বাঁশি বাজাবে।...

...ছাম্পারির একটি ছেলে হল। ছেলে তো নয় যেন একটি সোনার চাঁদ—'মগদাম' (ভুট্টা)-এর মত গায়ের রং। ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে ছাম্পারি রোজ কাজে যায়।...

সেদিন কি জানি কেন ছাম্পারির মন জুমে যেতে সরছিল না।...ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও ছাম্পারি ছেলের দিকে নজর রাখতে কচাককে বলে গেল।...

এদিকে ছাম্পারিও ঘর থেকে বেরিয়েছে—কচাকও রোজ দিনের মত পশ্চিমের বারান্দায় বাঁশি নিয়ে বসল। ওদের গায়ারিঙের দরজা ছিল পুব দিকে। ওদিক দিয়েই ছিল টং ঘরে আসা-যাওয়ার পথ।

ওদের ঘর থেকে খানিক দূরেই ছিল একটা বাঁশ ঝাড়। সেখান থেকেই ঘন বনের শুরু। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল একটা ভালুক। সুযোগ বুঝে এক সময় এসে দোলনা থেকে ছেলেটিকে মুখে নিয়ে দে ছুট। ওদিকে বাঁশি নিয়ে মশগুল কচাকও বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারল না।...

ছাম্পারি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। এসেই দোলনার পাশে। 'কোথায়—কোথায় আমার জুমের লাল ফলটি' বলে ছাম্পারি ডুকরে উঠল।...ছাম্পারি স্বামীকে বলতে লাগল—'আর জীবনে তুমি পাখি হয়ে জন্মাবে। তোমার ঠোঁট দু'টো বাঁশির মতোই লম্বা হবে। গলার স্বরও হবে খুব কর্কশ। তোমার ছেলে মেয়েরা বড় না হওয়া অব্দি ওদের বুকে নিয়েই তোমার স্ত্রী বসে থাকবে। ছেলে হয়েও তুমি হবে আলসের একশেষ। তাই আসছে জীবনে ছেলেপিলেদের নিয়ে বসে-থাকা স্ত্রীকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে খাবার এনে খাওয়াবে। এভাবে দিনভর খেটে তুমি ক্লান্ত হবে। তোমাকে সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।...

সেদিন থেকে ধনেশ পাখির বাচ্চা হলে মা পাখিটি তার ছেলে-পিলেদের আগলে গাছের বড় গর্তে বসে থাকে সারাদিন। পুরুষ পাখিটির নাওয়া নেই, খাওয়া নেই —সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে ওদের খাবার জোগাড় করে ক্লান্ত হতে থাকে।—ত্রিপুরার রূপকথা (উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা: ১৯৮০। পৃ. ৬২-৬৪)।

মন্তব্য: এই কথাটিতে 'পুত্রশোক' এবং 'অভিশাপ' (কর্তব্যে অবহেলার ফলে) – দু'টিই Motif হিসেবে বর্তমান আছে।

॥ কর্তব্যপরায়ণতা: আশীর্বাদ, অভিশাপ

৩২

কোড়াল পাখি মাছ খেতে খুব ভালোবাসত। তার মায়ের একবার খুব অসুখ হয়। কোড়াল একদিন পুকুরে গেছে, মাছ তুলে খাবে। পুকুরে গিয়ে নেমেছে, এমন সময়ে একজন এসে খবর দিলে, তার মা মারা গেছে:

কোড়াইল্যা রে কোড়াইল্যা,
তর মা মর্‌ছে—
মাছ খাইতে না কর্‌ছে॥

এই কথা শুনে কোড়াল আর মাছ খেল না। সে খুব মাতৃভক্ত ছিল। তাই আজও দেখা যায়, কোড়াল জল থেকে মাছ তোলে, কিন্তু তা খায় না।—প্রিয়বালা ঘোষ (ফরিদপুর, মাদারীপুর, গ্রাম: কার্তিকপুর)।

৩৩

এক বুড়ী-মা তার ছেলের জন্যে জল-খাবার সাজিয়ে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে তখন মাঠে হাল দিচ্ছে। 'চাকি' (সূর্য) ঠিক মাথার ওপরে। মাটিতে পা রাখা দায়। পায়ে ফোস্কা উঠছে বুড়ীর। ওদিকে মাঠেও ছেলে তেষ্টায় মরছে। বুড়ী জল-খাবার নিয়ে গেলে ছেলে তবে জল খাবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মাঠে নবে যাচ্ছে বুড়ী।

মাঠে এসে বুড়ী দেখলে, ছেলে তার দূরের একটা গাছের ছায়ায় 'আলা হয়ে' (ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে) পড়ে রয়েছে। আর চষা জমির ওপর বলদ জোড়া শুয়ে আছে। বলদের কাঁধের ওপর বসে রয়েছে কাক, ঠোঁট দিয়ে বলদের কাঁধের চামড়া আর মাংস ঠুকরে নিচ্ছে। ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে। একটা প্যাঁচা বারবার সেই কাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিচ্ছে। কাকও সমানে লড়াই 'দিয়ে' প্যাঁচাকে হারিয়ে দিচ্ছে। এই না দেখে বুড়ী কাককে অভিশাপ দিলে: নরলোকে সব্বাই তোকে 'দূর ঝাঁটা' 'মার্ ঝাঁটা' করবে। মড়া আর নোংরা খেয়ে বেড়াবি তুই। হলোও তাই।

আর প্যাঁচাকে দিলে বর: আজ থেকে তুই মা-লক্ষ্মীর বাহন হবি। রাত্তিরের অন্ধকারই তোর দিনের বেলা হবে। পোড়া কাকের মুখ আর তোকে দেখতে হবে না।

প্যাঁচা সেই থেকে মা লক্ষ্মীর বাহন, দিনের বেলা বের হয় না। আর কাক দিনভর শুধু খা' খা' করে মরে।

—কুলদা বাউরী (হুগলী, তারকেশ্বর, মোজপুর গ্রাম): বেণুপদ ঘোষ।

মন্তব্য: কাক-পেঁচার দ্বন্দ্ব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এক পরিচিত ঘটনা। পেঁচা সম্পর্কে যে সশ্রদ্ধ মনোভাবে এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মনে হয়,—এ পেঁচা লক্ষ্মী পেঁচা।

মানুষই এখানে অপরাধের জন্য পাখিকে অভিশাপ দিয়েছে। কাজেই মানুষ পাখির রূপ ধারণ না করে, পাখিকেই অধিকতর দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

৩৪

অনেক, অনেক দিন আগের কথা। কাঠঠোকরা তখন ছিল মানুষ। সেই তখনকার কথা। এক গ্রামে বাস করত এক সুদর্শন যুবক। যুবকটির বিয়ে হল। বিয়ে করে বউ নিয়ে সবে শ্বশুরবাড়ি ফিরেছে, মাথায় তখনও তার টোপর পরা। তার ছোটো বোন (মতান্তরে মা) ছুটে এসে জানাল, ঘরে মোটেই জ্বালানী কাঠ নেই। কাজেই রান্না-বান্না হওয়া সম্ভব নয়। যুবকটি ছিল খুবই কর্তব্য পরায়ণ এবং মাতৃভক্ত। কাঠ না এনে দিলে তার মায়ের খুবই অসুবিধে হবে বুঝতে পারল। সে তৎক্ষণাৎ বর বেশেই বেরিয়ে পড়ল কুড়ুল হাতে। তারপর এসে পৌঁছল বনে। গভীর বন, সুন্দরী কাঠের গাছের ঘন বন। একটা গাছ পছন্দ করে যেই কুড়ুলের আঘাত হেনেছে, অমনি গাছ তাকে অভিশাপ দিল: বিনি দোষে তুই আমাকে আঘাত করলি, তুই, তোর মা-বউ-বোন সবাই মিলে পাখি হয়ে যা, পাখি হয়ে কষ্ট পা। যুবক তার নিজের কর্তব্য করছিল। তাই সে ভয় না পেয়ে পাল্টা অভিশাপ দিল: আজ থেকে তোদের অশেষ দুর্গতি হবে। যে গাছের ছায়ায় লোকেরা বিশ্রাম করবে, সেই গাছই লোকেরা কাটবে। আর, আমরা পাখি হয়ে তোদের গায়ে দিনরাত ঠোক্কর মেরে-মেরে যন্ত্রণা দেব, কেউ তোদের সহানুভূতি জানাবে না।

গাছ ও যুবক—কারো অভিশাপই ব্যর্থ হল না। দেখতে দেখতে যুবকটি একটি পাখিতে পরিণত হয়ে গেল। পাখি হয়ে হল কাঠঠোকরা পাখি। তার মাথার টোপরটা হল কাঠঠোকরার ঝুঁটি, হাতের কুড়ুলটা হল তার ঠোঁট। কাঠঠোকরার গায়ে থাকে রং-বেরঙের পালক। দেখলে মনে হয় একটা বর।

—মদনমোহন হালদার। ২৪ পরগণা (পূর্ব গোবিন্দপুর, বড়িষা) অঞ্চলে এবং নিম্ন বঙ্গের বহুতর অঞ্চলে চলিত।

কথান্তর ১ : হুগলি ও হাওড়াতে এই কাহিনী একই রূপে মেলে ; তবে, সেখানে বর বেশী যুবকের মৃত্যু গাছের অভিশাপে ঘটে নি। অপঘাতে তার মৃত্যু হলে, সে পাখি হয়ে যায় ; এবং যেহেতু কাঠ কাটতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়, সেই হেতু সে কাঠঠোকরা পাখি হয়ে যায়।—ফণীন্দ্রনাথ দাস (মহিষরেখা, কুলগাছিয়া, হাওড়া)।

কথান্তর ২ : নোয়াখালি জেলাতে এই কথার যে রূপ মেলে, তাতে গাছটিকে ‘সত্যগাছ’ বা ‘সত্যের গাছ’ বলা হয়। ‘সত্যগাছে’র অভিশাপেই যুবকটি কাঠঠোকরা হয়। ওই কথায় যুবকটিকে পিতার একমাত্র পুত্র বলা হয়েছে। এটিতেও পরস্পরকে অভিশাপ দেবার কথা আছে।

কথান্তর ৩ : এক বর বিয়ে করে বাড়ি ফিরছিল। পথেই তার মনে হল, বউভাতের রান্না করবার কাঠ নেই, তাই কাঠ সঙ্গে নিয়েই সে ফিরবে মনে করল। তখন ঠিক ভরা দুপুর। কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে যেতেই বনদেবতা তাকে ভরা দুপুরে গাছ কাটতে বারণ করলেন। পরে এক সময়ে গাছ কাটতে বললেন। কিন্তু বরটি কোনো নিষেধই শুনল না। তখন দেবতা তাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই পাখি হয়ে যাও। তখনও তার মাথায় ছিল টোপরটি। তাই হল কাঠঠোকরা পাখির ঝুঁটি। আজও সে টোপরটি মাথা থেকে নামাতে পারে নি। বরটিও বনদেবতাকে অভিশাপ দিল। আজও তাই কাঠঠোকরা গাছের দেহ ঠুকরে ঠুকরে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।—গোবর ডাঙা, ২৪ পরগণা, থেকে সংগৃহীত।

মন্তব্য : পারস্পরিক অভিশাপ এখানে Motif হয়েছে। পাখির সঙ্গে বিবাহ নানা ভাবে যুক্ত। ‘পাখি ও বিয়ে’ বিষয়ক কথাগুলি (সং ৪৯-৫২) এ ব্যাপারে দ্রষ্টব্য।

৩৫

এক জেলে আর জেলেনী ছিল। তাদের ছিল একটি ছেলে। জেলে রোজ মাছ ধরতে যেত, সঙ্গে থাকত তার ছেলেটা। জেলে খুব শিঙি-মাগুর মাছ খেতে ভালোবাসত, আর মাছের চেয়ে ভালোবাসত মাছের মুড়ো খেতে। কিন্তু জেলেনী কোনো দিনই জেলের পাতে মুড়ো দিত না, মুড়ো দিত ছেলের পাতে। জেলের খুব লোভ হত মুড়ো খেতে, একদিন মুখ ফুটে সে বলেই বসল, ছেলেকে মুড়ো না দিয়ে আমাকেই দাও! কিন্তু অত করে বলা সত্ত্বেও জেলেনী মাছের মুড়ো ছেলের পাতেই দিলে। জেলে এতে ভারি রেগে গেল। পরদিন সে ছেলের আগে-আগে বাড়ি এল, এবং ছেলের আগেই খেতে বসল। ভাবল, আজ নিশ্চয়ই জেলেনী তাকে মাছের মুড়ো দেবে। কিন্তু আজও জেলেনী স্বামীকে মাছের মুড়ো না দিয়ে তা ছেলের জন্যে তুলে রাখল। এ দেখে জেলের রাগ চরমে গিয়ে উঠল। ছেলের জন্যেই সে মুড়ো খেতে পায় না, পরদিন তাই মাছ ধরতে গিয়ে ছেলেকে সে মেরে ফেলল। মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। বাড়িতে এসে বউয়ের কাছে ভাত চাইল। ছেলের কথা বলল, ছেলে আজ আর বাড়ি আসবে না। মুড়ো আমাকেই দাও। এক রকম জোর করেই সে মুড়ো চাইল। জেলেনী সেই প্রথম স্বামীর পাতে মাগুরের মুড়ো দিলে।

মাগুরের মুড়ো খেতে মোটেই কিছু ভালো নয়। একবার চুষেই জেলে ভাবল, এরই জন্যে এতকাল সে রাগ-দুঃখ করেছে! আর, এরই জন্যে আজ সে নিজের হাতে ছেলেকে হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে! বুক তার ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যেতে লাগল। দুঃখে সে হয়ে গেল একটি পাখি। সে হলো একটি হাঁড়ি-খুঁড়ী পাখি। পাখি হয়ে সে নদীর ধারে, ঝোপের দিকে দৌড়তে লাগল, যেখানে তার ছেলেকে সে হত্যা করেছে। আর মুখে বলতে থাকল: 'উত, উত!' (হুত্‌-হুত্‌=পুত্‌-পুত্‌)। তাকে ওইভাবে পাখি হয়ে চলে যেতে দেখে জেলেনীও পেছু-পেছু পাখি হয়ে বলতে থাকল, 'কী উত্‌, কী উত্‌?'

আজও হাঁড়ি-খুঁড়ি পাখি ঝোপ-জঙ্গলে নিজের ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনও পুরুষ হাঁড়ি-খুঁড়ী বলে, 'উত্‌ উত্‌'! আর স্ত্রী পাখিটা বলে, 'কী উত্‌, কী উত্‌?'

—মলিনবরণ চক্রবর্তী-ঠাকুর (গ্রাম, পোঃ সোমপাড়া ; নোয়াখালি, সদর)।

মন্তব্য ১ঃ পূর্ববঙ্গে মাগুর মাছের মুড়ো খাওয়া সম্পর্কে নানা রকম সংস্কার এখনও চালত আছে।

বথান্তর ১ঃ "...অ্যাগ গ্যারামে আচাল অ্যাগ গিরস্ত, তার বউ, আর তার

অ্যাক পোলা।…পোলাডায় মাচ খাইতে বালা বাসত, তাই পর্তি পর্তি গিরস্ত ব্যাটা ওসা, পল এগন্যা নিয়া মাচেরে যাইত।…গিরস্তের পোলার আবার আচাল এই রহম যে, খালি বাইচ্যা বাইচ্যা বড় বড় মাচের মুড়ি খাইত। গিরস্তেরও মইদ্যে মইদ্যে মাচের মাতা খাইব্যার আউশ অইত, তা পোলার জ্বালায় আর পারত না।…এ্যাকদিন গিরস্তের মাচেরে যাইব্যাস সুমেই অ্যাকটা দাও নইয়া গেচে। মাচ-টাচ মাইর‍্যা ফিরব্যাস সুমে বড় বড় মাচের মাতাডি ব্যাকটি পতে কাইট্যা থুইয়া গেচে, বুলে দেহি আইজক্যা পোলার কিমুন করে।…[ছেলেটি] খাইব্যার বইয়াই যহন পাতে মাচের মাতা নাই দেখচে তহনই তো গইর্জ্যা উটচে।…ইয়াই নি দেইক্যা খাপের সহ্যি অইল না ;…একু থাপ্‌পরে পোলা অজ্ঞান অইয়া মইর‍্যা গেল।…মায় তহন পুতপুত বুল্যা কান্দন শুরু কইর‍্যা দিল ;…এমুন কি হ্যাষ-ম্যাষ পুত্র শোগে পাগল অইয়্যা হ্যা পইক অইয়া গেল।…" বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : নভেম্বর, ১৯৭৫) ; আবদুল হাফিজ। পৃ. ১৬৩-১৬৪। কোন্‌ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত, তা অনুল্লিখিত।

কথান্তর ২ : "কানাকুয়া পাখী পূর্বে মানুষ ছিল। প্রত্যেকদিন সে কই মাছ ধরে আনতো। কিন্তু তার স্ত্রী সব সময় ওদের একমাত্র পুত্রকে কই মাছের মাথা খেতে দিত। ছেলের পিতা কই মাছের মাথার লোভে একদিন ছেলেকে মাছ ধরতে নিয়ে গেল এবং বিলের পানিতে তাকে ডুবিয়ে মারলো। বাড়ী ফিরে এলে স্ত্রী ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলো। সে উত্তর করলো যে ছেলেকে সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। মা মনে করলো ছেলে নিশ্চয়ই পথে কোথাও খেলা করছে। অতঃপর স্বামী মনের আনন্দে অনেকগুলো কই মাছের মাথা নিয়ে খেতে বসলো। কিন্তু মাথা মুখে দিয়ে মাথার মধ্যে কিছু নেই দেখে সে দুঃখে ডুকরে কেঁদে উঠলো এবং স্ত্রীকে তার অপরাধের কথা বলে "পুত পুত" করে বেরিয়ে পড়লো। আজও বাঁশঝাড় থেকে সেজন্য পুরুষ কানাকুয়া যখন 'পুত পুত' করে বের হয়, তার পিছে-পিছে স্ত্রী কানাকুয়াটিও অনুরূপ সুর করে বেরিয়ে আসে।"—ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন (দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৭৪। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। পৃঃ ৩৮১। কোন্‌ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত, তা অনুল্লিখিত) : ডঃ মযহারুল ইসলাম।

মন্তব্য ২ঃ পুত্রশোক এই 'কথা'র মূল Motif। তবে তা অনুশোচনাজাত। এই সন্তানশোক পিতা-মাতা উভয়েরই, তবে মাতারই বেশি (দ্রঃ ৬৩-৬৬-সংখ্যক কথা)। বহু কথাতেই দুজনেরই (বউ-শাশুড়ী, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন) পাখি হয়ে প্রশ্নোত্তরমূলক সংলাপ বলবার ইঙ্গিত দেখি—এও এক Motif। কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বা ফিরে আসবার পথে একজনের (পিতা-পুত্র, শ্যালক-ভগ্নীপতি, দুই বোন) মৃত্যু, অপমৃত্যু, আত্মহত্যা দেখা যায়, এবং প্রায় অপরিহার্য নিয়মে বাড়ীতে এসে সেজন্যে মিথ্যে যুক্তি দেওয়া হয়। আমরা এটিকে বিহঙ্গকথার একটি Motif বলে মনে করি।

৩৬

এক তাঁতীর বউ। তার খুব সাধ—রঙ-চঙে নানান ধরণের শাড়ি পরবার। স্বামী তার তাঁত চালায়, কত কাপড় কত শাড়ি বোনে, কিন্তু তাকে দেয় না একখানা। শাড়ির সাধ এতই যে, স্বামীর রঙীন সুতোর গোছা থেকে নানা রঙের সুতো চুরি করে গোলা পাকিয়ে লুকিয়ে রাখে চালের বাতায়। স্বামী রোজই তাঁত চালাতে এসে দেখে, সুতোর গোলার গোড়ার দিকের খানিকটা সুতো নেই, গোলাও এলোমেলো হয়ে রয়েছে। রোজই এই ব্যাপার ঘটে। রোজই তাঁতী এ নিয়ে রাগারাগি করে। এভাবে তাঁতী বাড়ির সকলকেই সন্দেহ করত। একদিন তাঁতী-বউয়ের ননদ চালের বাতায় কি একটা রাখতে গিয়ে দেখে তার দাদার হারানো সব সুতো গোলা করে-করে কে চালের বাতায় লুকিয়ে রেখেছে। এ যে বউয়েরই কাজ, সহজেই তা বোঝা গেল। সবাই মিলে তাঁতী-বউকে তখন খুব গঞ্জনা দিতে লাগল। শাশুড়ী ছিল খুব রাগী মানুষ। সে তখন রান্নাঘরে চেলা কাঠ জ্বেলে রাঁধছিল। তারই একখানা জ্বলন্ত চেলা কাঠ ছুঁড়ে বউকে মারলে। সঙ্গে-সঙ্গে বউয়ের সর্বাঙ্গ পুড়ে কালো হয়ে গেল। সারা গায়ে তার আগুন জ্বলছে, সে আগুন নেভাতে সে নদীতে গিয়ে ঝাঁপ দিলে। তাকে আর দেখা গেল না।

এদিকে রাত্রের বেলায় তাঁতীর মনে পড়ল তার বউকে। আহা, অমন বউ। কী বা চেয়েছিল—একটা রঙীন শাড়ি পরতে, তাই তো নানা রঙের সুতো লুকিয়ে রাখত। এজন্যে এতো বড়ো শাস্তি দেওয়া উচিত হয় নি। এই সব ভাবতে-ভাবতে তাঁতী নিশুতি রাতে ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। তারপর গেল বনের মধ্যে, যেখানে নদীর জলে বউ তার ডুবে মরেছে। যাবার সময় চালের বাতা থেকে বউয়ের লুকিয়ে রাখা সেই নানা রঙের সুতোর গোলা, নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি, তাও নিয়ে গেল। তারপর একটা গাছের তলায় সেই সব রঙীন সুতো আর ন্যাকড়া ছড়িয়ে দিয়ে সে আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। তখনো ভালো করে ভোর হয় নি। তাঁতী একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখতে পেলে, সুতো আর ন্যাকড়াগুলো নেই। কে নিলে, কে নিলে! এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেল, একটা কালো রঙের পাখি সেগুলো নিয়ে গভীর আগ্রহে নাড়াচাড়া করছে। তবে এই তার বউ! সেই-ই পাখি হয়ে গেছে! ভাবতে-ভাবতে তাঁতী নিজেও পাখি হয়ে গেল। তারপর দু'জনাতে মিলে একসঙ্গে উড়ে বনের ভেতর চলে গেল।

এই পাখিই হল গুয়ে-ন্যাকড়া আর গুয়ে-নেকড়ী। শাশুড়ী জ্বলন্ত চেলা কাঠ দিয়ে মেরেছিল বলেই আজো এর দেহটি কালো রয়ে গেছে। আজো এই পাখিদের নোংরা আবর্জনা ঘাঁটতে এবং ন্যাকড়া-সুতো ইত্যাদি দিয়ে বাসা বানাতে দেখা যায়। আজও পুরুষ পাখিটা যেন বলে: 'আমার সুতো কে নিলে?' স্ত্রী পাখিটি বলে: 'আমি, আমি।' ভোরের বেলায় স্বামী-স্ত্রীতে মিলন হয়েছিল, তাই এ পাখি কাকেরও আগে জাগে ও ডাকে।

—শংকরনারায়ণ ঘোষ। ২৪-পরগণা (হাড়োয়া থানা) অঞ্চলে চলিত।

মন্তব্য : দাম্পত্যপ্রেম (দ্রঃ ৫৩-৬০-সংখ্যক কথা), বউ-শাশুড়ীর অবাঞ্ছিত সম্পর্ক (দ্রঃ ৬৮-৭০ সংখ্যক কথা), জ্বলন্ত চেলা কাঠ ছুঁড়ে হত্যা (দ্রঃ ৪৭-সংখ্যক কথা), অত্যাচারের ফলে জলে ঝাঁপ দেওয়া (দ্রঃ ৭০-সংখ্যক কথা), দু'টি চরিত্রের এক সঙ্গে পাখি হয়ে সংলাপ বলা (দ্রঃ ৩৫-সংখ্যক কথার পাদটীকায় আমাদের মন্তব্য) প্রভৃতি দিক বা উপকরণ এই বিহঙ্গ-কথাটির Motif.

৩৭

এক শাশুড়ী তার ছেলের বউয়ের ওপর ভারি অত্যাচার করত। তাকে খেতে-পরতে দিত না, নানা ভাবে খাটিয়ে নিত, মারধোর পর্যন্ত করত। একদিন রান্নায় ভুল করায় শাশুড়ী বউকে ভীষণ মারধোর করে। মারের চোটে রান্না ঘরেই বউয়ের মৃত্যু হয়। বউ মরে যেতেই শাশুড়ীর খুব অনুশোচনা হতে লাগল—সে বারবার বউকে ডাকতে লাগল, বউ তখন পাখি বলে আর কথা কয় না। তখন শাশুড়ী করল কি, বউয়ের মতো এক মূর্তি গড়লে : হাঁড়ি-কড়া মোছবার ন্যাতা, শিল থেকে মশলা তোলবার সুপুরি গাছের বাকল, ভাত নাড়বার খেজুরের ডাল—এই সব উপকরণ দিয়ে একটা পাখি তৈরি করে তাকে দিলে উড়িয়ে। শাশুড়ীর সাধ হল, বউয়ের সঙ্গে কথা কয়। সেই জন্যে সে নিজেও পাখি হয়ে বলতে লাগল : বউ কথা কও!

—সুরেন্দ্রনাথ আইচ। বরিশাল অঞ্চলে চলিত।

কথান্তর ১ : "অ্যাকখানে আচাল অ্যাগ গিরস্ত। তার আচাল অ্যাকটা পোলা, বউ আর তার পোলার বউ।…অ্যাগদিন পোলাডায় অ্যাকটা কাটাল পাইর‍্যা আইন্যা বাইত্ থুইচে, কাটলডা পাকচে। হরিয়ে (শাশুড়ী) জানি কহনে ব্যাড়িবার গেচে, ইমুন সুমে অবসর পাইয়া বউডায় ক্ষরচে নাকি কাটাল বাইংগা খাওয়া শুরু করচে। যেই মাত্র দুই তিন রোয়া কাটল খাইচে, অমনেই হরি (শাশুড়ী) বাইত্তে আইয়া আজির।…দেইক্যাই তো রাইগ্গ্যা টঙ।…দৌড় দিয়া গিয়া বউয়ের গায়ে মারচে দুই ঠুকনা।…কিছুক্ষণ বাদে বউ মইর‍্যাই গেল।…হরিয়ে (শাশুড়ী) অহন চিন্তা করে—আরে মর, বউ তো দেহি হাচাই কইর‍্যাই মইর‍্যা গেল।…হ্যা (সে) খালি তাগাদা করবান্ নইল বুলে বউ, কতা কও? বউ, কতা কও?…হেই বউয়ের শোগে হরিও (শাশুড়ীও) পাগল অইয়্যা গেল। ইমুন কি হ্যা বনের পংখী অইয়্যাই উইড়্যা উইড়্যা, ঘুইড়্যা ঘুইড়্যা খালি অ্যাকই কতা আইজ তকও কইয়াই ফিরচে।"—বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। নভেম্বর, ১৯৭৫) : আবদুল হাফিজ। পৃ. ১৬৬-১৬৮। ঢাকা জেলা (গ্রাম পিপড়াছিট, পোঃ বড়ইবাড়ী) থেকে সংগৃহীত।

মন্তব্য ঃ স্ত্রীলোক-কর্তৃক স্ত্রীলোককে অত্যাচারের উপকরণ মোটামুটি রান্নাঘর থেকে (জ্বলন্ত চেলাকাঠ, কেলে হাঁড়ী, নদী-পুকুরঘাট) সংগৃহীত। অনুশোচনাও সেই অনুষঙ্গ থেকে গৃহীত উপকরণ অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। এই অনুষঙ্গ ও উপকরণ এখানে Motif হয়ে ওঠে।

৩৮

এক বেনে আর তার বউ ছিল। বেনের বউ অনেকদিন বাপের বাড়ি যায় নি, তাই বাপের বাড়ি যাবার তার সাধ হল। একদিন পৌষ মাসে সে তার স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ি রওনা হল। বাপের বাড়ি পাঁচ ক্রোশ দূরে। শীতে আর ক্ষিদেয় কাতর হয়ে দশ মাইল হেঁটে অনেক রাতে তারা সেখানে গিয়ে পেঁছিল। বাড়িতে পেঁছেই বউ চলে গেল ভেতর মহলে। অনেকদিন পর বাপ-মা ভাই-বোনদের দেখতে পেয়ে সে তাদের সঙ্গেই মনের আনন্দে কথা কইতে লাগল। এদিকে বাইরের উঠোনে শীতের মধ্যে স্বামী তার দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা সে ভুলেই গেল। অন্য কাউকে দিয়ে ঘরে ডাকিয়ে আনবার কথাও তার মনে হল না। স্বামী বেচারী ঠাণ্ডায় ও ক্ষিদেয় বাইরে দাঁড়িয়ে কষ্ট পেতে লাগল। কেউ তাকে ভেতরে যেতে ডাকল না। ডাকবে কি, তারা তো জানেই না যে সে-ও এসেছে সঙ্গে। এদিকে বউ খেয়ে-দেয়ে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারী বেনে সারারাত পৌষের কড়া শীতে ঠায় দাঁড়িয়ে কষ্ট পেতে লাগল। অবশেষে ক্লান্তিতে ঠাণ্ডায় ক্ষিদেয় সে মরে গেল। মরে সে হয়ে গেল একটি হুতোম পঁ্যাচা।

সকালে উঠেই বউয়ের মনে পড়ল তার স্বামীর কথা। সে আর তার মা দু'জনে বাহির-মহলের উঠোনে ছুটে এল। দেখতে পেল বেনে মরে একটি হুতোম প্যাঁচা হয়ে গেছে। তাদের দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল : "হুঁ, উত্তম" (অর্থাৎ, হুঁ, এ উত্তম-রূপে অন্যায়)। বউ তখন দুঃখে-অনুতাপে জর্জরিত হয়ে নিজেও হয়ে গেল একটি হুতোম প্যাঁচা। তারপর দু'জনে একসঙ্গে উড়ে চলে গেল।

যখন গ্রামের লোক সকলে এলো সেখানে, তখন পুরুষ পাখিটা বলল, 'হুঁ উত্তম, হুঁ উত্তম'। এর থেকেই পাখিটার নাম হয়ে গেল—'হুতুম'।

—দ্রঃ উমেশচন্দ্র নাগ-লিখিত "আজগুবী জন্ম কথা" (শিশির পাবলিশিং হাউস, কলকাতা : ১৩২৯), পৃ. ১৯-২৬।

মন্তব্য ঃ এখানেও দু'টি চরিত্রের পাখি হয়ে সংলাপ বলবার Motif পাওয়া যাচ্ছে। এই ধরনের সব ক'টি কথারই Structure মূলত এক : প্রথমে অন্যায় বা অপরাধ ; পরে অনুশোচনায় এবং স্বেচ্ছায় পাখি হয়ে যাওয়া।

৩৯

"...এক গেরস্ত ছিল। তাদের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম চিতু। এখন একদিন বাড়ীর যে গিন্নী, সে চিতুর দিদিমা; সে একদিন চিতুকে এক পোয়া তিল বাছতে দিয়েছিল। চিতু তিল বেছে ভাল তিলগুলি নিয়ে আর খারাপগুলি সেইখানে রেখে ভালগুলি দিদিমাকে দিলে। দিদিমা সেই আধপো তিল দেখে চিতুকে বল্লে যে, আর তিল কি হল? চিতু বল্লে যে আর তিল কোথা পাব? এই যেই বলেছে, চিতুর দিদিমা রেগে এক চড় তার গালে মারলে। সেই চড় মারতেই চিতু মরে' গেল। এদিকে চিতুর দিদিমা চিতু যেখানে তিল বেছেছিল, সেখানে খারাপ তিলগুলি পড়ে' আছে দেখ্‌লে। তখন সে খারাপ আর ভালগুলি মেপে দেখে যে এক পোয়া হল। তখন সে বল্লে—উঠ রে চিতু পুরপুর। এই না বলে' সমস্ত তিলগুলি সে নিজের গায়ে ছড়ালে। ছড়াতেই চিতুর দিদিমা পাখী হয়ে ঐ কথা বলতে বলতে উড়ে গেল।"—সরলাদেবী। প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯, পৃ. ৩৯৯।

কথান্তর ১: সিংহলে এটি এইভাবে পাওয়া যায়: "A woman Put Out to dry some flowers of the *Bassia longifolia* (*mimal*) and asked her little son to watch them; when they got dry they stuck the ground and could not be seen. The mother found them missing and killed the child for his negligence. A shower of rain just then showed to her the parched herbs, and in remorse she killed herself and was born a spotted dove (*alukobeyiya*) who now laments, "*mimal latin daru nolatin Pubbaru Pute Pupu*" (I got back my mi-flowers but not my child; O my young son, my young son)"—Glimpses of Singhalese social life: The Indian Antiquary: September, 1904, P 231: Arthur A. Perera.

কথান্তর ২: এক গেরস্থর ছিল বউ আর ছোটো একটি মেয়ে। একদিন বউটি মারা গেল। গেরস্থ ফের বিয়ে করলে। নতুন বউ তার সতীন-ঝিকে দেখতে পারত না মোটেই। একদিন নতুন বউয়ের তিলের নাড়ু খাবার ভারী সাধ হল। তাই তিলগুলো 'চুরে' (তিলের খোসা ঘষে ছাড়ানো) আনার জন্যে সতীন-ঝিকে বলল। ডালায় ভরে এক ডালা তিল তাকে 'চুর'তে দিলে। তিল 'চুরে' আনবার পর বউটির মনে হল, পরিমাণে তিল বেশ কমে গেছে। নিশ্চয়ই সতীন-ঝি কিছু পরিমাণে তিল খেয়ে ফেলেছে বা নষ্ট করেছে। রাগে সে সতীন-ঝির মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করলে, তাতে মেয়েটির মৃত্যু হল। কিন্তু বউটির রাগ এতেই পড়ল না। সে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পাড়া-প্রতিবেশিনীদের এই অপরাধ ও শাস্তির কথা বলতে লাগল। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশিনীরা যখন বলল, তিল ঘষে পরিষ্কার করতে গেলেই খোসা চলে যায় বলে পরিমাণেও কমে যায়, তখন বউটির অনুশোচনা ও অনুতাপের সীমা রইল না।

সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল এই বলে : 'হতি-ঝি গ', পুর পুর' (সতীন-ঝি গো, তিলের হিসেব পূর্ণ হয়েছে)। এই কথা বলতে-বলতেই সে হয়ে গেল একটি পাখি। ঘুঘু পাখি। আজও ঘুঘু বা 'ঢুপী' পাখি এই কথা বলেই তার পূর্ব জন্মের অপরাধের থেকে মুক্তি পেতে চাইছে।—বিভূতি চৌধুরী (আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, রামনগর)।

কথান্তর ৩ : এক কপ্‌তুর (কবুতর, পায়রা) পাখি আর তার বাচ্চা ছিল। একদিন বাচ্চাকে সে তিল ভাণ্ডতে দিয়ে অন্য জায়গায় যায়। এসে দেখল, মাপে যে পরিমাণ তিল সে দিয়ে গিয়েছিল, সেই পরিমাণ তিল পাওয়া যাচ্ছে না। তখন সে মনে করল, তার বাচ্চা বুঝি কিছু পরিমাণ তিল খেয়ে ফেলেছে। রাগে সে বাচ্চাকে ঠুকরে-ঠুকরে মেরে ফেলল। তারপর যেই না খোসা-সমেত তিল একসঙ্গে মাপল, অমনি দেখা গেল—পরিমাণে তিল ঠিকই আছে। সেই থেকে কপ্‌তুর পাখির ডাক এই হল : "পুতু, উঠ না উঠ না, তিল পুরিল।"—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ভট্ট, পাঁচকড়ি ভট্ট (মেদিনীপুর, রামপুর, পিংলা থানা)।

মন্তব্য : ঘুঘুর বদলে এখানে কবুতর-এর কথা বলা হয়েছে। 'কবুতর' ফারসী শব্দ, কাজেই তা বাঙলার নিজস্ব কথার উপকরণ না হওয়াই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, ঘুঘু-কে যে 'কপোত' বলা হয় ('কপোত' বলতে ঘুঘু এবং পারাবত দুইই) তা থেকেই 'কপ্‌তু' এবং পরবর্তীকালে 'কবুত'র শব্দের প্রভাবে 'কপ্‌তুর' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখানে মানুষ থেকে পাখিতে রূপান্তরের কথা বলা হয়নি ; পাখিই কথাটিতে রূপায়িত হয়েছে।

কথান্তর ৪ : সৎমা চাল-ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে মেয়েকে বাছতে দিয়েছিল। চাল-ডাল আলাদা করে বাছতেই দুই-ই পরিমাণে ঠিক অর্ধেক হয়ে গেল। কিন্তু সৎমা তা না বুঝে সতীন-কন্যাকে আঘাত করে মেরে ফেলল। পরে যখন চাল-ডাল একত্র করে দেখল, তখন হিসেবে ঠিক হল। সতীন কন্যার শোকে সৎমা তখন পাখি হয়ে গেল। সে এই কথা তখন বলতে থাকল—'মা, মা, চাইলে-ডাইলে পুর, পুর।' —প্রিয়বালা ঘোষ (ফরিদপুর, মাদারীপুর, গ্রাম : কার্তিকপুর ; ডিঙামাণিক থানা)।

কথান্তর ৫ : ওড়িশাতে এইভাবে এটি মেলে : একদা স্ত্রী-ঘুঘু তার ছেলে আর মেয়েকে কিছু ধান ভানতে বলে। ধান ভেনে মেয়েটি চালগুলো রাখলে ওপরে, আর তুষগুলো রাখলে নীচে। আর ছেলেটি দু'টি আলাদা ঝুড়িতে ওপরে রাখল তুষ, নীচে রাখল চাল। তারপর দুজনে সেগুলো তাদের মায়ের কাছে নিয়ে গেল। মেয়ের ঝুড়িটা দেখে মা খুব খুশি, কারণ তলায় তুষ দিয়ে ওপরে চাল দেওয়াতে তা পরিমাণে অনেক দেখাচ্ছিল। কিন্তু ছেলে ঝুড়িতে ওপরে তুষ দেখে মায়ের খুব রাগ হল। রেগে ছেলেকে মেরে ফেলল। তারপর মা যখন ছেলের ঝুড়িটা উপুড় করল, তখন তুষের তলায় চাল দেখতে পেল। তখন তার অনুতাপের শেষ থাকল না।

সেই থেকে ঘুঘুনী এই বলে কাঁদে : "উঠ রে পুত, চাল পুরিল।"—A study of Orissan folklore (Visva Bharati, Santiniketan, 1953) : Kunja Behari Dass, P 88.

কথান্তর ৬ : "মায়ের আদেশ মত ঘুঘু আর তার বোন জিতু ধান ভানতে যায়। মা তাদেরকে বলে দিয়েছিল যেন উভয়ের চাল সমান সমান হয়। চাল নিয়ে ফিরে এলে দেখা গেল ঘুঘুর চাল ঠিকই আছে, কিন্তু জিতুর চাল কম পড়েছে। মা ক্রুদ্ধ হয়ে চাল মাপার কাঠা দিয়ে জিতুকে আঘাত করে, ফলে জিতু মারা যায়। আসলে ঘুঘুর চাল ছিল অপরিষ্কার, কাজেই কাঠাটি পূর্ণ ছিল। অন্যদিকে জিতু তার চালটুকু পরিষ্কার করে নিয়ে আসে, ফলে তার কাঠাটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল না। জিতু মারা যাবার পরে তার মা কথাটি বুঝতে পারে। আর সেই থেকে ঘুঘুর মা, "ঘুঘু ঘু জিতু ওঠো, কাঠা পূর্ণ" বলে কাঁদে।—বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : নভেম্বর ১৯৭৫) : আবদুল হাফিজ। পৃ ১৪৪। কোন্ অঞ্চলে প্রচলিত, তা অনুল্লিখিত।)

মন্তব্য : সব ক'টি কথান্তর লক্ষ করলে দেখা যায়, নারীই (মা, দিদিমা, বিমাতা) এখানে হত্যাকারিণী এবং অনুশোচনায় ও স্বেচ্ছায় পাখিতে পরিণত। কখনো বা মানুষের না হয়ে পাখিরই জীবনে তা ঘটেছে। মায়া-মমতা এবং কতকগুলি চিরন্তন বৃত্তি সব বিহঙ্গকথাতেই প্রাধান্য পেয়েছে। 'তিল' ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও (ধান, চাল-ডাল, ছাতু) মেলে. তবে তিলই বেশি। ৪১-সংখ্যক কথা ও তার কথান্তর একটু বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছে। নারীর বদলে এখানে পুরুষকে পাওয়া যাচ্ছে।

৪০

এক দেশে এক বদরাগী স্ত্রীলোক বাস করত। তার ছিল একটি সতীন-ঝি। একদিন সে তার সতীনের মেয়েকে তিল ঝাড়তে আর কুঁড়তে দিল। মেয়েটি সৎমার কথামতো তিল ঝাড়তে আর কুঁড়তে লাগল। তিল কোঁড়া শেষ হলে সৎমা দেখল, তিলের পরিমাণ কমে গেছে। নিশ্চয়ই মেয়েটা তা লুকিয়ে রেখেছে। এই মনে করে সৎমা মেয়েটার মাথায় চ্যালা কাঠ দিয়ে মারল, মেয়েটা তাতে মরে গেল। তখন সৎমা খুব ভয় পেল। তারপর সেই পরিমাণ তিল নিয়ে নিজেই কুঁড়তে বসল। দেখল, তিল কমে গিয়ে সতীন-ঝির সমানই হয়েছে। তখন সে মাথায় হাত দিয়ে বসল। কারণ তার স্বামী ছিন্দিকী (সিন্দিকী) বাড়ীতে ফিরে এলে সে কী জবাব দেবে। এই ভয়ে সে তখন ঘুঘু পাখি হয়ে গেল। আর গাছের ডালে-ডালে বসে এই বলে ডাকতে লাগলে : কুড়্-কুড়্-কু-কু ..ছিন্দিকারে কইস্, কইস্, কইস্।—গৌরী দত্ত (কেরোপাড়া, চট্টগ্রাম)।

৪১

এক বুড়ি আর তার ছেলে। তারা ছিল খুব গরীব, ভিক্ষে করে দিন চলত। একদিন ভিক্ষেয় যাবার আগে বুড়ি তার ছেলেকে এক পো' ছোলা মেপে দিয়ে গেল। শিল-নোড়াতে বেটে ছাতু করতে বলে গেল। দুপুরে বুড়ি ফিরে আসতেই ছেলে ছাতু নিয়ে এল। কিন্তু বুড়ির মনে হল, ছাতু পরিমাণে কম, হয়তো ছেলেটা কিছু খেয়ে নিয়েছে। রেগে গিয়ে বুড়ি ছেলেকে নোড়া ছুঁড়ে মারলে, সেই আঘাতে ছেলেটি মরে গেল। কিছুক্ষণ পর বুড়ির রাগ পড়ে যেতেই মনে হল, ছেলেটা তো খোসা ছাড়িয়ে তবে ছোলার ছাতু করেছে, খোসাশুদ্ধ মেপে দেখলে কেমন হয়? মাপতেই হিসেব মিলল। তখন বুড়ি ছেলের দুঃখে শিলের ওপর মাথা ঠুকতে লাগল। মুখে বলতে থাকল: 'হায় পুত্, হায় পুত্'। এমনি করতে-করতে বুড়িটা মরে হয়ে গেল একটি কুকো পাখি ঃ এখনও তাই বলেই কুকো পাখি ডাকে। যেন খুব তাড়াতাড়ি কেউ বলছে: 'পুত—পুত্—পুত্—পুত্'!—রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (মেদিনীপুর, ঘাটাল, দাসপুর, সেকেন্দারী গ্রাম)।

কথান্তর ১: এক চাষী। সে ক্ষেতে চাষ করে, ছেলে গিয়ে রোজ তার ভাত-জল দিয়ে আসে সেখানে। একদিন চাষীর ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। এদিকে তখনও তার ছেলের আসবার নাম নেই। অনেক পরে ছেলে এল খাবার নিয়ে। ঢাকা খুলতেই দেখে, অন্যদিনের তুলনায় ভাত পরিমাণে অল্প: এই অল্প ভাতে তার ক্ষিদে যাবে না। রাগে একটি বাঁশের খণ্ড দিয়ে সে ছেলেকে আঘাত করল। সে আঘাতে তৎক্ষণাৎ ছেলের মৃত্যু হল। সে দিকে চাষীর ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তখন গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। খেতে-খেতে দেখল, ভাত আর ফুরোয় না। এ যে অনেক ভাত, অন্যদিনের চেয়ে বেশিই ভাত। আসলে ছেলেটি পাত্রের মধ্যে খুব চেপে-চেপে ভাত এনেছিল, তাই পরিমাণে অত কম দেখাচ্ছিল। তখন চাষীর মনে এল অনুতাপ আর অনুশোচনা। কেন মারলাম ছেলেকে, একথা ভাবতে-ভাবতেই সে হয়ে গেল একটি পাখি। আর মুখে বলতে থাকল: 'পুত্, পুত্, পুত্'। আজও তাই বলে চলেছে।—সুধীর সেন (ঢাকা-বিক্রমপুর, সেনহাটি)।

৪২

এক গেরস্থের সাত ছেলে। সাত ছেলের সাত বউ। বউরা খেতে বসলেই বাড়িতে অতিথি আসত। শাশুড়ী তখন বউদের ভাতই অতিথিদের খেতে দিত, আলাদা করে আর রাঁধত না। খিদের জ্বালায় বউরা তখন নদীর ঘাটে জল আনতে যাবার ছলে 'অমর্ত ফল' ('অমৃত ফল') খেত। তাই খেয়েই পেট ভরাত। শাশুড়ী দেখত, বউরা ভাত খায় না, অথচ তারা দিব্যি আছে। একদিন শাশুড়ী তার মেয়েকে (বউদের ননদকে) বউদের পেছন-পেছন জলের ঘাটে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে বলল। ননদ গিয়ে দেখে, বউরা সব 'অমর্ত ফল' খাচ্ছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়িতে এসে মা-কে সে কথা জানিয়ে দিল। তখন বউদের শাশুড়ী তার মেয়েকে (বউদের ননদকে) বলল, ফলগুলো বাসি ছাই দিয়ে উড়িয়ে দিতে। মেয়ে তাই করল। ফলগুলো তখন তেতো হয়ে গেল। পরদিন বউরা জল আনবার ছলে নদীর ঘাটে ফলগুলো খেতে গিয়ে দেখল, সেগুলো তেতো হয়ে গেছে। সেদিন তারা খেতে পেল না। কলসীতে জল ভরে বাড়ি এল। তারপর মনের দুঃখে হলুদ বেটে গায়ে মাখল। মাথায় নিলে কালো-পোড়া 'পাতিল' (হাঁড়ি)। তারপর একগাল পান খেয়ে পাখি হয়ে উড়ে গেল। গাছে উঠে ওরা বলতে লাগল, 'কুটুম আয়'। পান খেয়ে গিয়েছিল বলেই 'কুটুম' পাখির মুখ-ঠোঁট আজও লাল। কালো হাঁড়ির জন্যে মাথাটি আজও কালো।—প্রিয়বালা ঘোষ (ফরিদপুর, মাদারীপুর, গ্রাম: কার্তিকপুর)।

মন্তব্য: 'অমর্ত ফল' মানে 'মাকাল ফল'। এই ফলের ভেতরটা ছাই-মাখা পদার্থের মতো।

এই গুচ্ছের সব ক'টি 'কথা'তেই ভারতীয় জীবনের একটি বিশেষ মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল: অতিথি নারায়ণ স্বরূপ, দ্বিপ্রহরে অতিথি এলে নিজে অভুক্ত থেকেও অতিথিকে অন্নদান করতে হয়। যে সব শাশুড়ী বধূর ওপর অত্যাচার করেছেন, তাদের অতিথিপরায়ণতাকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। অনেক বিহঙ্গকথায় শাশুড়ীর অত্যাচারী মূর্তি থাকলেও, বধূর প্রতি মমত্ববশত, অনুশোচনায় তাঁরাও পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

অনেক লোককথাতেই দেখা যায়, অত্যাচারিত নায়ক বা নায়িকা গৃহে অভুক্ত থাকলেও অন্যত্র তারা খেতে পায়, একদিন ধরা পড়ে, এবং তারপর কাহিনী নতুন দিকে মোড় নেয়। Structure-এর দিক থেকে বলা যায়, এটি কাহিনীর মধ্যবিন্দু। আলোচ্য কথাটিতেও এই motif-টি মেলে।

এই গুচ্ছের সব ক'টি কথাতেই দেখা যায়, নায়িকা স্বেচ্ছায় পাখিতে রূপান্তরিত হচ্ছে,—অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে।

৪৩

"এক গিন্নীর অনেকগুলি বৌ ছিল। গিন্নী ছোট বৌকে মোটে দেখিতে পারিত না। বাড়ীতে যখনি কোনো অতিথি-অভ্যাগত আসিত, গিন্নী ছোট বৌ-র বরাদ্দ ভাত তাহাদিগকে জোর করিয়া দেওয়াইত। তারপর আর ভাত রাঁধিত না। সুতরাং ছোট বৌকে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হইত। একদিন বাড়ীতে এক আত্মীয় আসিয়াছে ; ছোট-বৌ তাহার ভাতগুলি তাহাকে ধরিয়া দিল। তাহার জন্য আর রান্নাও হইল না। তাহাকে সমস্তদিন উপবাস করিতে হইল।"

"শাশুড়ীর অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া ছোট-বৌ একদিন সর্বাঙ্গে হলুদ মাখিয়া এক ভুসো মাখা কালো হাঁড়ি মাথার উপর চাপাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, আর যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—"কুটুম আয়, কুটুম আয়।" প্রবাদ—এই বৌ বেনে বউ পাখি হইয়াছে। বেনে-বৌ পাখির রঙ হলুদে আর মাথা কালো।" —শরৎচন্দ্র মিত্র। প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩১, পৃ. ৮১২। ফরিদপুর (মাদারীপুর) জেলায় চলিত। অপর একটি রূপ মেলে ঃ 'শিশুসাথী' : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, পৃ. ৭৭-৭৯।

কথান্তর ১ ঃ বেনে বউ পাখি বা হলুদে পাখি বা খোকা হোক পাখিকে বলে 'ইষ্টি কুটুম' পাখি বা 'কুটুম-ময়না'। শাশুড়ী ছোটো বউয়ের ওপর অত্যাচার করে, খেতে-শুতে দেয় না। সেদিন বাড়িতে 'ইষ্টি' বা কুটুম এসেছে। শাশুড়ী বউকে বলল, তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করতে। কিন্তু ভেজা কাঠ, জ্বলে না ; কাঠ যদি বা জ্বলল, তো রান্না গেল পুড়ে। শাশুড়ী এসে বউকে গালাগালি দিল, বেদম মার দিল। বউ তখন রাগে দুঃখে, রান্নার হাঁড়িটা মাথায় দিয়ে, আর রান্নার জন্যে পেষা হলুদ গায়ে মেখে বাড়ি থেকে বনে গিয়ে এক পাখি হয়ে রইল। তাই এ পাখির মাথাটা কালো, গায়ের বর্ণ হলদে।—পূর্ববঙ্গে চলিত।

কথান্তর ২ ঃ বাড়িতে কুটুম এসেছে। শাশুড়ী বউকে ভালো করে রাঁধতে বলল। আগেই রাঁধতে গেল ডাল। ডালে যতই হলুদ দেয়, ঠিক মনের মতো রঙ খোলে না। এদিকে শাশুড়ী এসে ঘন-ঘন খোঁজ নিচ্ছে, রান্না কতদূর এগোলো। ভয়ে আর বিরক্তিতে বউ শেষে সেই হলুদ দেওয়া ডাল কড়া-শুদ্ধ দিল নিজের সর্বাঙ্গে ঢেলে। সর্বাঙ্গ গেল হলুদ হয়ে। রান্না ঘরের আনাচে-কানাচে ছিল কালো ঝুল, তাই নিল মাথায় মেখে। শেষে ডালের কড়াটা মাথায় উপুড় করে চাপিয়ে দিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল একটা পাখি হয়ে। সেই পাখিই কুটুম পাখি।—পূর্ববঙ্গে চলিত।

কথান্তর ৩ ঃ 'শিশুসাথী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ৭৭-৭৯) যে 'কথা' মেলে তাতে গেরস্থকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে। সুতরাং 'বেনে বউ' পাখি এখানে 'ব্রাহ্মণী'। এ 'কথা'তে পুত্রবধূ পাখি হয়ে যাওয়াতে শাশুড়ীও 'বউ কথা কও' পাখিতে পরিণত হয়েছে। 'বেনে' শব্দ পশ্চিম বঙ্গের।

কথান্তর ৪ ঃ গৃহস্থ সঙ্গতিপন্ন, বাড়িতে তাই ঘন ঘন অতিথি আসে, বউকে তা সামলাতে হয়। বউ এজন্যে বিরক্ত। একদিন যখন অতিথি এসেছে, রাগ করে

সব তরকারীতে প্রচুর পরিমাণে হলুদ দিল। সে তরকারী অখাদ্য হয়ে গেল। অতিথি তা মুখে দিতে পারল না। অতিথি বুঝল, সে গেরস্থ বাড়িতে অবাঞ্ছিত। তাই না খেয়ে, কাউকে কিছু না বলে সে গেরস্থ বাড়ি থেকে চলে গেল। এদিকে শাশুড়ী বুঝতে পারল, বউয়ের রান্না অখাদ্য হয়েছে বলেই অতিথি নারায়ণ বাড়ি থেকে চলে গেছে। ভীষণ রেগে গিয়ে শাশুড়ী তখন রান্নার হাঁড়িটা বউয়ের মাথায় দিল ভেঙে। সারা শরীর তার হলুদ বর্ণ হয়ে গেল, মাথায় লেগে গেল হাঁড়ির তলাকার কালি। অতিথি আর শাশুড়ীর ওপর প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে বউটির মরণ হল। সে হল হলদে পাখি। মুখে বলতে থাকল : 'কুটুম আলি, কটুম আলি।' আজও তাই বিশ্বাস এ পাখি ডাকলে বাড়িতে কুটুম আসে।—বিভূতি চৌধুরী (আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, রামনগর)।

কথান্তর ৫ ঃ এক সঙ্গতিপন্ন গেরস্থের এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বড়ো ঘরে সে মেয়ের বিয়ে হল। বিয়ের এক বছর পর মেয়ে-জামাই বাপের বাড়িতে এসেছে। গেরস্থ-বউ খুব ঘটা করে জামাইকে ঘরে আনলেন। রান্নাবান্নায় যেন কোনো খুঁত না থাকে, এজন্যে গেরস্থ-বউ নিজেই রান্না করতে গেলেন। সেদিন তখন ডাল রাঁধছেন, জামাই খাবে। তিনবার ডালে হলুদবাটা দিয়েও ডালের রঙ তার মনোমতো হল না। শেষে রান্না ঘরে যতো হলুদ ছিল সবই দিলেন, তাও মনের মতো হল না। শেষে রাগে-দুঃখে গেরস্থ-বউ সেই ডালের কড়াটি ভেঙে নিজের মাথায় চাপিয়ে দিলেন। সারা গায়ে ডালের হলুদ রঙ লেগে গেল। শেষে একটি হলদে পাখি হয়ে উড়ে চলে গেলেন (তুলনীয় : কথান্তর ২)।—দ্রঃ উমেশচন্দ্র নাগ-সংকলিত "আজগুবী জন্মকথা" (শিশির পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩২৯), পৃ. ১৫-১৮।

কথান্তর ৬ : বাড়িতে 'ইষ্টি' অর্থাৎ কুটুম এসেছে, শাশুড়ী বউকে রাঁধতে বলল। বউয়ের ছিল সেদিন ভীষণ জ্বর। সেই জ্বরের ঘোরেই সে তরকারীতে দিয়ে ফেলে বেশী হলুদ, শাশুড়ী রাগ করে বউয়ের গায়ে তা ছুঁড়ে মারে।...

কথান্তর ৭ : "এক বেনেবাড়ির সাত ছেলের সাত বৌ।...সাত ভাই এক সঙ্গে খেতে বসে। সাত বৌকে সাত রকম ব্যঞ্জন রাঁধতে হয়। বৌদের মধ্যে যার রান্না যেদিন খারাপ হয় সে মার খায় সাত ভাইয়েরই হাতে।...সেদিন ডাল রাঁধার ভার ছিল বেনেদের ছোটো বৌয়ের।.. এখন ছোটো বৌ ডালে যতই হলুদ দেয় কিছুতেই আর রঙ হয় না।...এদিকে ছোটো ছেলে ভয়ানক গোঁয়ার গোবিন্দ। ডালে রঙ না হলে মহা হুলুস্থুলু করে।...সেই ছোটো ছেলের বৌ তারই কিনা আজ ডালে রঙ হচ্ছে না।...শেষে ভয়ে ও মনের দুঃখে ওই ডালের হাঁড়ি দু'হাতে উপরে তুলে নিজের মাথায় মেরে ভাঙতেই ছোটো বৌ একটি পাখি হয়ে উড়ে গেল। সেই পাখিই বেনে বৌ। যেসব জায়গায় পোড়া হাঁড়ির কালো দাগ লেগেছিল সেসব জায়গা কালো, আর বাকি ডালের পাকা হলুদ রঙ।"—অজয় হোম ঃ বাঙলার পাখি, প্রথম খণ্ড (আশ্বিন, ১৩৮০), পৃ. ২১৯-২২০। পশ্চিমবঙ্গে চলিত।

৪৪

অনেকদিন আগে, এক বনে এক ধার্মিক সন্ন্যাসী থাকতেন। তিনি একতারা বাজিয়ে খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। দিনের কাজ-কর্ম, পুজা-প্রার্থনা সেরে তিনি একতারা নিয়ে গান গাইতে বসতেন। আর তখন বনের যত পশু-পাখি, সেই গান শোনবার জন্যে তাঁর চারদিকে ঘিরে বসত।

বনের ঠিক সম্মুখেই ছিল একটি পাহাড়। আর পাহাড়ের উল্টোদিকে জনবসতি। প্রতি বৎসর শরৎকাল এলেই সন্ন্যাসী একবার সেই জনবসতিতে যেতেন তাঁর বাৎসরিক পরিক্রমার জন্যে। শরৎ শেষে আবার ফিরে আসতেন।

একবার ভাদ্রমাস পড়তেই তিনি তাঁর একতারাটি হাতে নিয়ে পাহাড়ের পরপারে লোকালয়ে গেলেন তাঁর বার্ষিক পরিক্রমায়। প্রথম দিনেই, দিনের শেষে এসে পেঁছিলেন একটি গ্রামে। এ গ্রামটিতে আগে কখনো তিনি আসেন নি। একটা কুটীর দেখতে পেয়ে তিনি তাতে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন, একটা খিটখিটে মেজাজের বুড়ি রান্না করছে। সন্ন্যাসী তাঁর কাছে রাতের খাবার ও আশ্রয় চাইলেন। বুড়িটা সরাসরি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে। সন্ন্যাসী তখন বলল, খেতে না দাও, একটু জল দিতে পারবে? একথাতেও বুড়ি রেগে গিয়ে বলল, ঘরে জল নেই।

সন্ন্যাসী খুব রেগে গেলেন। তিনি বুড়িকে এই বলে অভিশাপ দিলেন : তুই আমায় খেতে দিস নি, জল দিস নি। তুইই খিদে তেষ্টায় কষ্ট পাবি। গাছের ডালে ঠুকরে ঠুকরে তোকে তোর খাবার জোগাড় করতে হবে। তেষ্টার জন্যে নদীর জল খেতে পাবি না, বৃষ্টি হবে তবে সেই জল খাবি।

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হতে না হতেই বুড়িটা একটা লম্বা ঠোঁট-অলা কাঠ-ঠোকরা পাখি হয়ে একটা বেলগাছে গিয়ে বসল। তারপর গাছটা ঠুকরোতে থাকল। আজও এ পাখির তৃষ্ণা মেটে বৃষ্টির জলে, অন্য জলে নয়। বৃষ্টি না হলে তৃষ্ণার্তই থাকে।

—দ্রঃ "কাঠঠোকরার জন্ম কথা" : 'মৌচাক', ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ. ৪৪৮-৪৫১।

মন্তব্য : কাঠঠোকরার উদ্ভব সম্পর্কে সারা পৃথিবীতেই যতো 'কথা' পাওয়া যায় তার সবগুলিতেই কাঠঠোকরাকে অন্যায়কারী ও অপরাধাকারী রূপে দেখানো হয়েছে ; সর্বত্রই দেবতার অভিশাপে তার এই রূপান্তর ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, কাঠঠোকরা সম্পর্কীয় 'কথা' হয় প্যাঁচা (ইউরোপে) নয় 'ফটিক জলে'র (ভারতে) সঙ্গে মিশে গেছে। ভারতীয় 'কথা'তে 'ফটিকজলে'র সঙ্গে কাঠঠোকরা মিশ্রিত হয়ে যাওয়া আবার ইউরোপীয় 'কথা'র সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিলে যায়। সর্বত্রই কাঠঠোকরার সঙ্গে জল বা বৃষ্টির জলের যোগ-সম্পর্ক লক্ষ করা হয়েছে। ইংলণ্ডে সবুজ কাঠঠোকরাকে তাই Rain

bird, Rain Pie, Rain foul প্রভৃতি বলা হয়। শ্রপ্‌শায়ারে একে 'Storm cock' বলে। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা বিশেষ এক ধরণের কাঠঠোকরাকে বলে Rain bird'। কাঠঠোকরা ডাকলে বৃষ্টি হয়, এ বিশ্বাস পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই আছে। এর ডাক যেন মেঘের ডাক, তাই একে বলে 'thunder bird'।

কাঠঠোকরার অপরাধ ও বিরুদ্ধাচারণের কয়েকটি নিদর্শন এই: ইউরোপ এবং ইউরোপের বাহিরে বিশ্বাস আছে যে, ঈশ্বর যখন প্রথম এই পৃথিবী সৃষ্টি করতে গেলেন, তখন তিনি সব পাখিদের আদেশ দিলেন, ঠোঁট দিয়ে মাটি কাটতে। যাতে নদী, দীঘি, পুকুরের সৃষ্টি হয়, জল রাখা যায়। কাঠঠোকরা ছাড়া সবাই এই আদেশ পালন করলে। অতঃপর ঈশ্বরের অভিশাপ, এবং তারই জের হিসেবে আজও সে ঠোঁট দিয়ে শুকনো গাছ কুপিয়ে জল চাইছে। পানীয় জলের আধার সৃষ্টি করতে সহায়তা করেনি বলেই কাঠঠোকরা বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল পান করতে পারে না। এই হতভাগ্য পাখি তাই মেঘের দিকে তাকিয়ে বলে 'Plui, Plui'। এই জন্যেই তার মুখ সর্বদাই ওপরের দিকে থাকে। জার্মানীতে চলিত 'কথা'তেও আছে, পুরুষ কঠঠোকরা তার পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে বলে ঈশ্বরের আদেশে কুয়ো খুঁড়তে চায় নি। (দ্রঃ ৩৪ সংখ্যক কথা। কাঠঠোকরাকে এতে সুসজ্জিত বর বলা হয়েছে)। ঈশ্বরের অভিশাপে আজও সে দীঘির জল খেতে পারে না, বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করে এই বলে 'giet, giet' (giess, giess)। এস্‌থোনিয়াতে চলিত 'কথা'তেও দেখা যায়, ঈশ্বর কাঠঠোকরার পোশাকের এই গর্বের জন্যে তার পাখাকে ঝুলকালির মতো কালো করে দিয়েছেন অভিশাপ দিয়ে। কালো, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের কাঠঠোকরা দেখা যায়। সবগুলির মধ্যেই অপরাধ ও বিরুদ্ধাচরণকে লক্ষ করা যাবে। একটি মোঙ্গল "কথা'তে দেখা যায়, মোজেস-এর ভৃত্য বিরুদ্ধাচারণ করায় অভিশাপের ফলে সে হল কাঠঠোকরা; একটি রাশিয়ান কথায় দেখা যায়, রবিবার দিন কাজকর্ম করে ঈশ্বরকে অস্বীকার করবার অপরাধে এক ব্যক্তি হল কাঠঠোকরা।

একটি নর্স 'কথা'য় (এটি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চলিত, এবং এটিই আমাদের বর্তমানে আলোচ্য 'কথা'র মূল) দেখা যায়ঃ যখন প্রভু যিশু এবং সেন্ট পিটার তাঁদের নরদেহ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছেন, সেই সময়কার কথা। একদিন তাঁরা ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলেন, এক বুড়ি ঘরের ভেতর রুটি-কেক সেঁকছে। তার নাম গারট্রুড (Gertrude)। তার মাথায় একটি লাল খোঁপা। যিশু ও পিটার ক্ষুধার্ত হয়ে গারট্রুডের কাছে রুটি চাইলেন। বুড়ি একটা 'নেচী' নিয়ে রুটি করতে গিয়ে দেখল, সেটি বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। অত বড়োটা দিতে মন সরল না। তখন তার চেয়ে একটু ছোট 'নেচী' নিলে। সেটাও বড়ো হলো, তৃতীয়বারও তাই। কোনটাই সে দিতে চাইল না। অভুক্ত প্রভু তখন গারট্রুডকে এই বলে অভিশাপ দিলেন (তুলনীয়ঃ তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া। শিথিল অর্থে দুইই এক) সে যেন অতি কষ্টে গাছের দেহ ঠুকরে-ঠুকরে তবে তার খাদ্য আহরণ করে। বৃষ্টির জল ছাড়া

অন্য জলে তৃষ্ণা না মেটে। অভিশাপে বুড়ি তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল একটি কালো কাঠঠোকরা। এই জন্যেই এ পাখির অপর নাম—'Gertrude's bird'। সে রান্না ঘরের চিমনীর ফাঁক দিয়ে উড়ে গেল, যাবার সময় খানিকটা ঝুলকালি (তুলনীয় : হলদে পাখি ও কুকোর মাথায় রান্না করবার হাঁড়িকড়ার কালো রঙ) তার গায়ে লেগে গেল বলেই তার পাখা জোড়া কালো। মাথার সেই লাল খোঁপাটা (তুলনীয় : বরের টোপর) ছিল, তাই হল কাঠঠোকরার লাল ঝুঁটি। উত্তরে ওয়েলসে-এও এই একই 'কথা' চলিত আছে।

এই খাদ্য-পানীয় না দেবার অপরাধে কাঠঠোকরার 'কথা' অতঃপর টিটিভ বা টিটি পাখিতে, ফটিক জলে, প্যাঁচাতে ও কোকিলে সঞ্চারিত হয়, প্রথম দুটি পানীয় সম্পর্কে, শেষের দুটি খাদ্য সম্পর্কে। ফটিক জলের 'কথা' (দ্রঃ সং ২৭-৩০) বাঙলা দেশে মেলে। আর টিটিভ সম্পর্কীয় কথা রাশিয়াতে চলিত আছে। প্রসঙ্গত স্মরণ কথা যেতে পারে, পূর্ববঙ্গে বিশ্বাস আছে—তৃষ্ণার্তকে জল না দিলে সে ব্যক্তি মরে টিটিভ বা টি-টি পাখি হয়। সুতরাং রাশিয়া ও পূর্ববঙ্গের সংস্কার এখানে অভিন্ন। খাদ্য না দেবার অপরাধে কোকিল হবার 'কথা' চেকোশ্লোভাকিয়াতে চলিত আছে : জনৈক স্ত্রীলোক ক্ষুধার্ত যিশুকে একখানা রুটি দিতে হয়, এই ভয়ে ঘরের ভেতর লুকিয়ে ছিল। যিশু যখন অভুক্ত অবস্থায় চলে গেলেন, তখন জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে স্ত্রীলোকটি বললে : 'Guc-kuck' অর্থাৎ 'Look, Look'। অতঃপর সে একটি কোকিল হয়ে উড়ে চলে গেল।

৪৫

এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার প্রকৃতিটি বড়ো ভালো ছিল। কিন্তু তার ব্রাহ্মণী মোটেই ভালো ছিল না। সে ছিল নীচমনা এবং স্বার্থপর। একদিন তাদের বাড়িতে এক অতিথি এলেন। তিনি ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাত্তিরটা থাকবেন। ব্রাহ্মণ তো মানুষ ভালো, তা অতিথির কথাতে রাজী হয়ে গেল। রাতের বেলায় ব্রাহ্মণ আর সেই অতিথি, দুজনে এক সঙ্গে খেতে বসলেন। ব্রাহ্মণী মাথায় ঘোমটা টেনে সব দিচ্ছে-থুচ্ছে। ব্রাহ্মণীর তো লজ্জা-শরম নেই, সব ভালো-ভালো রান্না দিচ্ছে স্বামীর পাতে, আর খারাপ-মন্দ জিনিস দিচ্ছে অতিথির পাতে। অতিথি তো এ ব্যাপার দেখে ভারী অসন্তুষ্ট হলেন। তার অপমান হল বলে তিনি মনে করলেন। রাগে তিনি কিছু খেলেনই না। না খেয়ে সেই রাতেই ব্রাহ্মণের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার সময় ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী দুজনকেই দিয়ে গেলেন অভিশাপ। ব্রাহ্মণকে বললেন, মরে তুই কাক হবি। আর ব্রাহ্মণীকে বললেন, মরে তুই বাদুড় হবি।

অতিথির কথাই ফলল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মরে হলো কাক আর বাদুড়। দুজনের

স্বভাবে মিল ছিল না। তাই আজও কাকের সঙ্গে বাদুড়ের মিল নেই। দেখা হলেই কাকে-বাদুড়ে মারামারি লেগে যায়।—পূর্ববঙ্গে চলিত। কাকের মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্যে এটি কথিত হয়।

মন্তব্য: দ্রঃ ৪৩-সংখ্যক কথা,—কথান্তর ৪।

৪৬

এক মুসলমান গেরস্থ। সে ছিল সজ্জন। একদিন তার বাড়িতে অতিথি হয়ে এক পীর এলেন। গেরস্থর ঘরে তখন এমন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ন করা যায়। পীরকে ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে রেখে সে গেল খাবার-দাবার জোগাড় করতে। কিন্তু সহজে খাবার-দাবার জোগাড় করা গেল না। এখানে-ওখানে ঘুরে তবে তা জোটাতে হল। এতে অনেকটা দেরী হল। এদিকে খিদে-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পীর বসে আছেন তো আছেনই। গেরস্থ ফিরছে না। তাঁর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তখন। কাতর হয়ে তিনি অন্যত্র গেলেন খাবারের জন্যে। যাবার সময় তিনি গেরস্থকে অভিশাপ দিয়ে গেলেন: সে যেন পাখি হয়ে যায়। আর, বাড়িতে ফিরে এসেই সে যে কথা উচ্চারণ করবে, তাই যেন হয় তার মুখের বুলি। হলও তাই। অনেক কষ্টে, নানান জায়গা থেকে খাবার জোগাড় করে গেরস্থ বাড়িতে এসে দেখে, পীর নেই। সে বলে উঠল: "পীর কি হৈল্" (পীরের কি হল?) পীরের অভিশাপে তৎক্ষণাৎ সে একটি পাখী হয়ে গেল। আর মুখে বলতে থাকল: 'পীর কি হৈল্?' 'পীর কি হৈল্'?—ললিত বর্মণ (দিনাজপুর, বোদা থানা, সাকোয়াডাঙ্গাপাড়া)।

মন্তব্য ১: যে অঞ্চল থেকে 'কথা' টি সংগৃহীত সেই অঞ্চলে পাখিটির অপর বুলি চলিত আছে: 'পিরিতি হোক!' 'পীরে'র সঙ্গে 'পিরিতি' বেশ মিলে গেছে। এ পাখি হোল—পাপিয়া, বা 'পিউ কাঁহা,' বা 'চোখ গেল'।

মন্তব্য ২: অতিথির আপ্যায়নের ত্রুটি পৃথিবীর অনেক বিহঙ্গপুরাণের মূল বিষয়। যিশুখৃষ্ট (মতান্তরে খৃষ্ট সাধক)-ও এই রকম আতিথ্য নিয়ে সমাদর পান নি, তিনিও অভিশাপ দিয়েছেন। দ্রঃ ৪৪-সংখ্যক কথার পাদটীকা।

৪৭

চড়ুই দু' রকমের : মাঠ চড়ুই আর ঘরচড়ুই। মাঠচড়ুই থাকত মাঠে, ঘরচড়ুই গেরস্থের ঘরের চালে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু রাতদিন চলা-ফেরায় আর খড়কুটোতে গেরস্থের ঘর-দোর নোংরা হত। গেরস্থের ঘরে ছিল বউ আর শাশুড়ী। শাশুড়ী বড়ো ভালো মানুষ, দয়া-মমতা আছে। সে তার বউকে বলে, না গো বউ, চড়ুইকে মেরো না, তাড়িয়ো না। আহা, আছে থাক্, ঘর-দোর নোংরা করে করুক। কিন্তু এদিকে ঘর-দোর নোংরা থাকলেই আবার বউকে দিত গঞ্জনা। বউয়ের তাই ঘর-চড়ুইয়ের ওপর ছিল ভীষণ রাগ।

এদিকে মাঠচড়ুই রোজ এসে ঘরচড়ুইকে ডাকে। তার খুব ইচ্ছে ঘরচড়ুই মাঠে এসে তার সঙ্গে ঘর করুক। রোজই এসে ডাকে : এসো না মেয়ে! কিন্তু ঘর-চড়ুইয়ের ঘর ছাড়তে মন নেই। মাঠে জল-ঝড়ের ভয়, আশ্রয় নেই। সেখানে কে যেতে চায়।

সেদিন মাঠচড়ুই এসেছে ঘরচড়ুইকে ডাকতে, রোজ দিন যেমন আসে। বউ তখন উঠোনে উনুন জেলে মাটির হাঁড়িতে ধান সেদ্ধ করছে। বউ বহুদিন থেকে তক্কে তক্কে ছিল। আজ দু'জনাতে বসে যখন কথা কইছে, অমনি বউ করলে কি, একখানা জ্বলন্ত চেলা কাঠ ছুঁড়ে মারলে। সেখানা গিয়ে পড়ল সোজা মাঠ-চড়ুইয়ের গায়ে। তার গা খানিক খানিক পুড়ে গেল। কিন্ত যেটুকু আগুন তার পাখায় লেগেছিল, ছুটোছুটি করতে গিয়ে সে আগুন খড়ের চালে লেগে গেল। ঘর পুড়ে ছাই হল। ঘরচড়ুই তো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে উড়ে পালাল। আজও তাই দেখা যায়, পরুষ চড়ুইয়ের গায়ে ঘন পাটকেলে দাগ। সেই আগুনের পোড়া দাগ, ভালো করে পোড়েনি বলেই অমন পাটকেলে দেখায়। আজও তাই কথায় বলে : 'মাঠচড়ুই আর ঘরচড়ুই, ঘর পুড়ে ছাই।'—শঙ্কর নারায়ণ ঘোষ।

কথান্তর : সিংহলেও কথাটি চলিত আছে এই ভাবে : "Once upon a time a house, where a pair of sparrows (ge kurullo) had built their nest, caught fire. The hen flew away, but tried to save his young and scorched his throat. This scar can still be seen."—Glimpses of Singhalese Social life : The Indian Antiquary : September 1904, P. 230 : Arthur A. Perera.

৪৮

এক দেশে বাস করত এক দইয়াল। তার গায়ের রঙ ছিল খুব কালো। কিন্তু সে যে দই তৈরি করত, অমন সাদা দই সে তল্লাটে আর কেউ তৈরি করতে পারত না।

ওই দেশের লোকেরা তার দই পেলে অন্য কারো দই খেত না। অন্য গয়লারা চেষ্টা করেছিল, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার দই তৈরির কায়দাটা শিখে নেবে। কিন্তু সে বিয়ে করে নি।

সেই রাজ্যের রাজা একদিন একটি পরমাসুন্দরী কন্যেকে দেখলেন। গায়ের রঙ সোনার মতো। বুড়ো রাজা সেই অল্প বয়সী কন্যেকেই বিয়ে করতে চাইলেন। মন্ত্রী তখন চালাকি করে বললেন, মা যশোরেশ্বরী তাঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন, কন্যেটিকে স্পর্শ করলেই রাজার অমঙ্গল হবে। রাজা সে কথা শুনে কন্যেকে রাণী করে অন্য একটি পুরীতে বন্দী করে রাখলেন। তাকে ছুঁলেন না।

রাণী দই ছাড়া ভাত খেতেন না। মন্ত্রী রাজাকে সেই দধিয়ালের খবর দিলেন। রাজা দধিয়ালকে ডেকে পাঠালেন। দধিয়াল দেখতে অত্যন্ত কালো, সুতরাং রাজা কোনো সন্দেহ করলেন না, দধিয়ালকে রোজ নিজের হাতেই রাণীর কাছে দই দিয়ে আসতে বললেন। দধিয়াল হুকুম মতো রোজ রাণীর হাতে দই তুলে দিয়ে আসত। রাণীর অমন রূপ দেখে দধিয়াল দিনে-দিনে মোহিত হতে থাকল। সে মনে-মনে ঠিক করলে, একমাত্র রাণীর হাতেই সে দই তুলে দেবে, অন্য কারো হাতে নয়। এমনি করে রাণীর সঙ্গে দধিয়াল প্রেমে পড়ে গেল। দাসী গিয়ে সব কথা রাজার কাছে বলে দিল। রাজা তখন হুকুম দেন, দধিয়ালকে আর দই দিতে হবে না। রাণীর সঙ্গে দধিয়ালের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হল।

দধিয়াল উদাসী হয়ে গেল। আর দই তৈরি করে না, দই বেচে না। কাউকেই সে দই দিত না। সারাদিন উদাসী হয়ে নিজের বাড়িতেই বসে থাকত, বের হত না। এদিকে, দই আর দধিয়ালকে না পেয়ে রাণীর সোনার অঙ্গে কালি ধরল। এমনি করে কিছুদিন গেল।

অনেকদিন পর, একদিন গভীর রাতে দধিয়াল এল রানীর পুরীর কাছে। দু'হাতে দু'টি কালো হাঁড়িতে দই বুকের কাছে ধরে নিয়ে এল। নিয়ে এসে বললে, আমি এসেছি। রানী সেই ডাক শুনে ব্যাকুল হয়ে ছটফট করতে থাকলেন। রানী মা-যশোরেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, দধিয়ালের কাছে তাঁকে পেঁছে দেবার জন্যে। এদিকে দধিয়ালও তাকে ব্যাকুলভাবে চলে আসতে বলছে। দধিয়ালের ডাকে রানী তখন একটি পাখি হয়ে 'পিক্' করে ডেকে গাছে গিয়ে বসল। দধিয়ালও তখন পাখি হয়ে তার পাশে গিয়ে বসল। তারপর দু'জনেই উড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেল।

এরাই দধিয়াল বা দয়েল পাখি। সেই দইয়ের সাদা আর হাঁড়ির কালো রঙ এখনও দোয়েলের বুকে দেখা যায়।—শঙ্করনারায়ণ ঘোষ। যশোহর জেলাতে চলিত।

৪৯

একটি ছেলের বিয়ে ঠিক হল। কনে তার মনের মতো। বিয়েব দিন গুণছে সে। যথারীতি বিয়ের আগে তার গায়ে হলুদ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ের ঠিক আগের দিনই হঠাৎ তার মৃত্যু হল। মরে সে হল হলদে পাখি। গায়ে হলুদ হয়েছিল বলেই, তার গা'টি আজও হলদে রঙের থেকে গেছে। —সুরেন্দ্রনাথ রায় (জলপাইগুড়ি, ধাপগঞ্জ, গড়ালবাড়ী)।

মন্তব্য ১ঃ জলপাইগুড়িতে হলদে পাখিকে বলে 'হলদিয়া গ্রাম', 'হলদিরাম' পাখি। অনেকের মতে, ওই ছেলেটির নাম ছিল 'রাম'। এই পাখির এই উৎসের 'কথা' চলিত থাকবার দরুণ জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের মধ্যে একটি সংস্কার সৃষ্ট হয়েছে ঃ গায়ে হলুদ হ'য়ে যাবার পর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত, পাত্র-পাত্রীরা বিশেষ ভয়ে-ভয়ে থাকে, পাছে জীবন নাশ হয়। এইজন্যে গায়ে হলুদ হয়ে-যাওয়া পাত্রদের তার বন্ধুরা তাকে এই বলে ঠাট্টা করে : 'তুই হলদিরাম হবো রে?' অর্থাৎ বিয়ের আগই মরবি রে?

মন্তব্য ২ঃ বাঙলা দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, বাড়িতে হলদে পাখি এলে বা ডাকলে অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়।

কথান্তর ১ঃ মধ্য ও পূর্ববঙ্গে চলিত 'কথা' : পাখিদের রাজা কে হবে, তা নিয়ে সভা হল। হলদে পাখিকে করা হল রাজা। তাকে হলুদ মাখিয়ে সিংহাসনে বসানো হল। সেই জন্যে আজও তার দেহটি হলদে।

দ্রঃ ৮৬-সংখ্যক কথা।

৫০

হন্দ গরীব এক চাষা। না ছিল বাড়ি-ঘর, না বাপ-মা। দিনে-দিনে বয়স বাড়ে, বিয়ের সাধ হল তার। কিন্তু বিয়ে সে করবে কেমন করে। অনেক টাকা লাগে যে। যে বাপের কাছেই বিয়ের কথা পাড়ে, সেই-ই কুড়ি-কুড়ি হিসাবে টাকা যায়। মনের খেদে সে তাই এখানে-সেখানে উদাসী-বিরাগী হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

হেথায়-সেথায় এমনি করে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন তার ভারী জল-তেষ্টা পেল। কোথায় জল, কোথায় জল। ঠা ঠা রোদ, পেটে আগুন। অনেকটা পথ ভাঙবার পর দেখতে পেলে একটা পুকুর, সেখানে গেল জল খেতে।

পুকুর ঘাটে দেখে, গেরস্থ ঘরের এক ডাগর-সোমত্থ মেয়ে। পরণে সবুজ রঙের শাড়ি, যেন ধানের ক্ষেত। তার চোখ-মুখ যেন কথা বলে। সে এসেছে ঘাটে বাসন ধুতে। চাষার ছেলে তার রূপ দেখে জল খেতে ভুলে গেল। সে কনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কন্যে বলে, কই গো ছেলে, জল খাবে তো খাও। খেয়ে সরে যাও, আমি ঘাটে নাবব। চেয়ে দেখছ কি অমন করে?

চাষার ছেলে বলে, আহা, অমন ডাগর-ডোগর মেয়ে, পেলে যে বিয়ে করি!

কন্যে বলে, আমায় বিয়ে করবে তুমি, পণ দিতে পারবে?

চাষার ছেলে মিথ্যে করে বললে, হ্যাঁ, এবারে ধান উঠলেই দেব। একবারে না পারি, দু'বারে দেব।

কন্যে বলে, আমি 'মাওড়া' মেয়ে, ঘরে মা নেই! আমি যা বলব, বাপ তাই শুনবে। টাকা দিলে তা তো বাপ পাবে। আমি চাই একটি 'গুঁজিকাঠি', রুপোর 'গুঁজিকাঠি'। তা পেলে খোঁপায় গুঁজি। আর কিছু চাই নে।

চাষার ছেলে ভালো করেই জানে, গুঁজিকাঠি দেওয়া তার 'কম্ম' নয়। কোথা থেকে দেবে সে। তবু সে বলে বসল, হ্যাঁ তাই দেব। তাই আনতে যাচ্ছি।

কন্যে উত্তর দিলে, গুঁজকাঠি নিয়ে এসে বাপকে বোলো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

এই বলে কন্যে তো ঘরে গেল। চাষার ছেলে তখন চিন্তা করতে বসল। চিন্তা আর ফুরোয় না। "গুঁজিকাঠি-গুঁজিকাঠি" করতে করতে সে নানান জায়গায় ঘুরতে লাগল। শেষে এসে পড়ল এক সন্ন্যাসীর কাছে।

সন্ন্যাসীঠাকুর মন্তর জানতেন। কী করে মন্তর আউড়ে মানুষ থেকে পাখি হওয়া যায়, আর ফের পাখি থেকে নিজে নিজেই মানুষ হওয়া যায়, তা তাঁর জানা ছিল। চাষার ছেলে গুঁজিকাঠির জন্যে তাঁর পায়ে কেঁদে পড়ল। সন্নিসি ঠাকুর বললেন: কী করে পাখি হওয়া যায় আর পাখি থেকে মানুষ হওয়া যায়, সে মন্তর তোকে শিখিয়ে দিই। তাহলেই তুই গুঁজিকাঠি পাবি। কিন্তু সাবধান, মন্তরটা ভুলিস নি যেন। ভুললেই সর্বনাশ। মন্তরটা পড়ে নিজেই পাখি হবি। পাখি হয়ে পুকুর ঘাটে যাবি খুব সকালে। পুকুরঘাটে আসে রাজবাড়ির 'ছাওয়াল'রা। বউ-ঝিরা আসে। তাদের মাথায়, থাকে সোনা-রুপোর গুঁজিকাঠি। তুই পাখি হয়ে 'ছোঁ-পাখলে' তাদের কারো মাথা থেকে গুঁজিকাঠি নিয়ে আসবি। তারপর ফের মন্তর আউড়ে মানুষ হয়ে বউকে সেটা দিবি। কিন্তু সাবধান, মন্তরটা ভুলিস নি।

এই কথাতেই চাষার ছেলের মনের ভেতরটায় ভারী ভয় ঢুকে গেল। এই ভয়েই তার শেখা মন্তর বারবার ভুল হতে লাগল। চোপররাত ধরে মন্তরটা মুখস্থ করে, কাক মাটিতে নাবার আগে পুকুর ঘাটের কাছে একটা গাছে পাখি সেজে বসে রইল।

অতো ভোরে রাজার বাড়ির 'ছাওয়াল'রা কেউ ঘাটে আসে নি। এসেছে এক দাসী। তাই তার খোঁপায় সোনার রুপোর গুঁজিকাঠি। চাষার ছেলে এখন পাখি, উড়ে গিয়ে 'ছোঁ-পাখলে' দাসীর খোঁপা থেকে গুঁজিকাঠিটা নিয়ে এল। দাসী দেখল, একটা পাখি তার গুঁজিকাঠি নিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

চাষার ছেলের মনে আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু ওই আনন্দই তার কাল হল।

তাইতেই সে মন্তর ভুলল। চি'হি চি'হি করে কতো আকুলি-বিকুলি করতে লাগল সে, কিন্তু কিছুতেই পাখি থেকে মানুষ হবার মন্তরটা তার মনে পড়ল না। পাখি হয়েই রইল সে। কন্যের বাড়ির কাছে রোজ সকালে সে ডাকে। যদি হঠাৎ করে মন্তরটা তার মনে পড়ে যায়। যদি কন্যে তাকে দেখে চিনতে পারে, এই আশায়।

এদিকে অনেক দিন চলে গেছে। কন্যে আছে অপেক্ষা করে, কবে তার সাধের গুঁজিকাঠি নিয়ে চাষার ছেলে আসবে। ততোদিনে তার বাপও মরেছে, সংসারে কেউ নেই তার। সোনার অঙ্গ মলিন হয়ে গেছে।

একদিন সকাল বেলায় কন্যে দেখতে পেলে, একটা পাখি চি'হি-চি'হি করে তার মুখের পানে এসে ফিরে-ফিরে ডাকছে। তখন অঘ্রাণ মাস। ধানে পাক ধরেছে, তবু সবুজ আছে বটে। সেই ধানের মতো সবুজ একটি পাখি। ল্যাজটা কাঠির মতো খানিকটা ঝুলে বেরিয়ে আছে। ডাক শুনেই কন্যের মনে হল, এতো সেই-ই। ওই তো তার গুঁজিকাঠি!

কন্যে আর ঘরে থাকতে পারল না। পরনে ছিল সেই সবুজ শাড়িটা। পাখিটার ডাক শুনে সেও একটা পাখি হয়ে তার কাছে উড়ে চলে এল।

ওটাই 'ল্যাজেকাঠি' পাখি। সেই গুঁজিকাঠিটাই তার লম্বা ল্যাজ হয়ে ঝুলে রয়েছে আজও। সবুজ ধানের রঙ বলে, তাকে কেউ কেউ বলে 'ধানচড়াই', ধানই খায়, অঘ্রাণ মাসেই তাই দেখা যায়। সকাল বেলায় পাখি সেজেছিল বলে, সকালেই ডাকে। মেয়ে-পাখিটা তো গুঁজিকাঠি পায়নি, তাই পুরুষ পাখিটার মতো মেয়ে-পাখিটার ল্যাজ আজও লম্বা নয়।—সিদ্ধব্রত রায় [শঙ্করনারায়ণ ঘোষ] (খুলনা, মাদারীপুর মহকুমায় চলিত)।

মন্তব্য : দ্রঃ ১৫-সংখ্যক কথা। চৌর্যবৃত্তির জন্য ১৭-সংখ্যক কথা দ্রষ্টব্য।

৫১

এক গ্রামের এক মোড়ল, কূটবুদ্ধিতে ভারী ওস্তাদ। সে ছিল আটকুঁড়ে। এ জন্যে বউয়ের সঙ্গে তার দিনরাত ঝগড়া-ঝাঁটি চলত। বউ বলত, কী পাপ করেছিলে, তাই সন্তানের মুখ দেখলে না।

একদিন মোড়ল গেছে দূর গ্রামে। সে গ্রামের এক বাড়ির ঝগড়া মেটাতে। হাতে হুঁকো, থলেতে তামাক-টিকে। ফেরবার পথে তার কল্কের 'ঠিকরে' (যে নুড়ি বা মাটির ঢেলা কল্কেতে দেওয়া হয়) গেল হারিয়ে। 'ঠিকরে' খুঁজতে-খুঁজতে মোড়ল এসে পড়ল এক চাষী গেরস্থর বাড়িতে। চাষীর অবস্থা খুবই ভালো। গেরস্থ মোড়লকে জল-মুড়ি আর তামাক দিলে।

গেরস্থর সাতটি গোলা। তার সাত ছেলে, তাই প্রত্যেকের নামে একটি করে গোলা। মোড়াল তাই শুনে বললে, ছেলেদের বিয়ে হয় নি, বউ আসে নি। বউরা

না এলে তো ঝগড়া হবার কারণ নেই। কেনই বা সাতটি গোলা করা। তার চেয়ে সাতটি মিলিয়ে একটি 'ধর্মগোলা' কর। সাতটিতে লক্ষ্মীপুজো না করে, তখন কেবল একটিতে করলেই চলবে। কিন্তু চাষীর বউ সাতটি গোলাই রাখতে চায়।

চাষী-গেরস্থর বাড়ি থেকে মোড়ল যখন চলে আসছে, তখন পথে দেখা পেলে এক কুষ্ঠরোগীর। সে মোড়লের কাছে ভিক্ষে চাইছে। কুষ্ঠরোগী বললে, তোমার সন্তান নেই। শীগ্গিরই তোমার একটি মেয়ে হবে। মোড়ল তাই শুনে বললে, তা হলে দুধ দিয়ে তোমার মুখ ধুইয়ে দেব।

বাড়ি ফিরে দেখে, বউয়ের 'শরীর খারাপ'। তারপর যথাকালে মোড়লের বউ একটি পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করলে। মেয়ের বয়স হতেই মোড়ল-গিন্নী মেয়ের বিয়ের জন্যে মোড়লকে তাগিদ দিতে থাকল। মোড়লের তখন মনে পড়ল, সেই চাষী-গেরস্থের কথা, যার সাত ছেলে। তারই কাছে গেল মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

চাষীর সাত ছেলে, হিসেব মতো বড়ো ছেলের সংগেই মেয়ের বিয়ে হবার কথা। কিন্তু সাত ভাই-ই সমবয়সী, প্রত্যেকেই চায় ওই কন্যেকে বিয়ে করতে। তখন আরম্ভ হল তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। ও ধরে এর খুঁত, এ ধরে ওর খুঁত। মেজো বললে বড়োর কপাল কাটা; সেজো বললে, মেজোর পা কাটা। বড়ো বললে, সে সব ক'টা ধানের গোলা পুড়িয়ে দেবে। অন্যরা বললে, তাতে তারা বাধা দেবে। এমনি ভীষণ ঝগড়া লেগে গেল।

এদিকে বিয়ে নিয়ে এই ঝগড়া দেখে তাদের বাপ-মা, চাষী আর চাষী-বউ একদিন রাতে খিড়কীর দোর দিয়ে গেল পালিয়ে। গেল তারা অজয়-কেঁদুলিতে। সেখানে গিয়ে তারা হল বাউল আর বাউলনী।

ওদিকে সাত ভাইরা তাতে কিছুমাত্র দমল না। দল বেঁধে তারা প্রতিদিন মোড়লের বাড়িতে আসতে থাকল। প্রতিদিনই মেয়ের বাড়িতে এসে কে তাকে বিয়ে করবে, এনিয়ে ঝগড়া করতে থাকল। মোড়লের মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হল—সে কাকে বিয়ে করবে। সবাই এক রকম দেখতে, কাজেই মোড়লের মেয়েও মনস্থির করতে পারে না।

সাতভাই প্রতিদিন সকালে মোড়লের উঠোনে এসে এমনি করে ঝগড়া করতে থাকল। দেখে মোড়লের ভারী রাগ হল। রাগে আর বিরক্তিতে একদিন মোড়ল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে: ঠাকুর, আমাদের মুক্তি দাও। ঠাকুর তাই শুনে মোড়ল, মোড়ল-বউ আর তাদের মেয়েকে বরে দিলেন তিনটি প্যাঁচা। তারা উড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে পরদিন সকালে সাত ভাইরা সকলে মোড়লের উঠোনে এসে দেখে, বাড়িতে কেউ কোথাও নেই। সারা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। মোড়লের মেয়েকে সারা বাড়িতে তারা আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল। এমন কি, খড়-বিচালিও পা দিয়ে সরিয়ে দেখতে লাগল। এমনি করেই সাত ভাই এক সঙ্গে হয়ে গেল সাতটি ছাতারে পাখি। আজও তারা তেমনি সাত ভাই মিলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। সাত ভাই ঝাঁক বেঁধে

আজও এক সঙ্গেই আছে। আজও তাই পা দিয়ে সব জিনিস সরিয়ে খ‍ুঁজে দেখে, কন্যে কোথায় গেছে।—শংকরনারায়ণ ঘোষ (বীরভূম, লাভপ‍ুর অঞ্চলে চলিত)।

মন্তব্য : কোনো জিনিসকে বিশৃংখল ও এলোমেলো করে দেওয়াকে বীরভূমে বলে 'ছত্রে' দেওয়া। অনেকে মনে করে এই পাখি পা দিয়ে মাটি-ঘাস-পাতা সরিয়ে বা 'ছত্রে' দেয় বলেই একে বলে 'ছাতারে'। এ পাখির অপর নাম—'সাত ভাই', 'সাত ভেয়ে' 'সাত ভাইরা', তা এই 'কথা'টির সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপ‍ূর্ণ। ইংরেজীতে কিন্তু 'Seven sisters'।

৫২

এক কৃপণ ছিল। তার খ‍ুব বিয়ে করার সাধ। কিন্তু বিয়ে করতে গেলেই টাকা খরচ করতে হয়, তা সে করতে নারাজ। কাজেই তার বিয়েও হচ্ছে না। গ্রামের যেখানেই বিয়ে হয়, শাঁখ বাজে, উল‍ু দেয়, সে সেখানেই গিয়ে আড়াল থেকে 'গ্রাম্ভারী' গলায় বলে : "হ‍ুঁ হ‍ুঁ, আমারও হবে।" কিন্তু বিয়ে আর হয় না। এদিকে বয়স বেড়ে বেড়ে প্রায় ব‍ুড়ো হতে চলল। তখন তার বন্ধ‍ু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা বললে, এ ভাবে চললে কোনো দিনই ওর বিয়ে হবে না। চল, আমরাই ওর বিয়ে ঠিক করে দিই। এমন জায়গায় বিয়ে ঠিক করব, যেখানে ওর এক পয়সাও খরচা হবে না।

এদিকে সে গ্রামে ছিল আর এক কেপ্পণ। তার ছিল একটা মেয়ে। সে মেয়ের আজও বিয়ে দেয় নি। কারণ বিয়ে দিতে গেলেই টাকা খরচা হয়, কিন্তু সে তা করবে না। দিনে দিনে মেয়েব বয়স অনেক হল। এখন তার বিয়ের বয়সও যায়-যায়। মেয়েটির কিন্তু বিয়ের খ‍ুব সখ। যেখানেই বিয়ে হয়, শাঁক বাজে, উল‍ু দেয়, সে সেখানেই গিয়ে 'গ্রাম্ভারী' গলায় আড়াল থেকে বলে "হ‍ুঁ হ‍ুঁ, আমারও হবে।"

শেষে একদিন এই মেয়েটির সংগেই ওই কেপ্পণ লোকটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এক কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার রাতে দ‍ু'জনার বিয়েও হয়ে গেল। বিয়ের সময় প‍ুর‍ুষটি 'গ্রাম্ভারী' গলায় বললে : 'হ‍ুঁ হ‍ুঁ, আমারও হচ্ছে।' মেয়েটিও সেই রকম গলায় উত্তর দিলে : 'হ‍ুঁ হ‍ুঁ, আমি ছিল‍ুম, তাই হচ্ছে।'

তারাই মরে আজ হয়েছে হ‍ুতোম আর হ‍ুতোমনী। ওরা বাড়ি খ‍ুঁজে বেড়াচ্ছে, সংসার পাতবে বলে। টাকা বিনে বিয়ে হয়েছে, বাড়ি-টাড়ি হয় নি। এই জন্যে রাতের অন্ধকারে গিয়ে দ‍ু'জনাতে আলোচনা করে। এই জন্যে হ‍ুতোম প‍্যাঁচারা বাড়িতে ডাকলে সে বাড়ি পরিত্যাগ করতে হয়।

—শংকরনারায়ণ ঘোষ। বারাসাত-বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে (বিশেষত আড়বেড়েতে) চলিত।

মন্তব্য : নদীয়াতে এই জন্যেই এ পাখিকে বলে 'হ‍ুঁ-হ‍ুঁয়ে' পাখি। খ‍ুলনা ও নিম্নবঙ্গের অন্যত্র, হ‍ুতোম-হ‍ুতোমনীর সংলাপ এই : হ‍ুতোম বলে—'ব‍ুঝলি ব‍ুঝলি'। হ‍ুতোমনী বলে—'ব‍ুঝলাম, ব‍ুঝলাম'।

৫৩

এক ভাই, আর তার এক বোন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বোনকে ভাই নানা কারণে নিয়ে আসতে পারে না। এক বার ভাই গিয়েছে বোনকে আনতে। ভাইয়ের নাম—নন্দ ঘোষ। বোনকে নিয়ে নন্দ ঘোষ সকাল বেলাতেই রওনা হল। বেলা শেষ হল, পথ তবু ফুরোয় না। সন্ধ্যের সময় ওরা এক বনের মধ্যে এসে পেঁছিল। সেখানে আবার বাঘের ভয়। এদিকে নন্দর ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে। কাছে-পিঠে কোথাও খাবার জল নেই। নন্দ তার বোনকে বললে, বোন, ওই দূরে আম গাছ দেখা যায়, আমি আম আনতে যাই। তাই খেলেই জল পিপাসা যাবে। এই বলে নন্দ গেল গভীর বনে আম পেড়ে আনতে। যেই সেখানে গেছে, অমনি মস্ত এক বাঘ বেরিয়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলল। এদিকে বোন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে বুঝল তার ভাইকে বাঘে খেয়েছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে আসছে, বোন তখন কাঁদতে কাঁদতে একাই বাড়ীতে এল। বাড়িতে এসে ভাইয়ের বউকে বলল, বউ দরজা খোলো। কিন্তু বউয়ের কোনো উত্তর নেই। সে আগেই টের পেয়েছে, স্বামীকে তার বাঘে খেয়েছে। দুঃখে তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। বোন যতই বলে, বউ দরজা খোলো, ততই ভাই-বউ শোকে পাথর হয়ে যাচ্ছে। দুঃখে তখন বোন নিজেই হয়ে গেল একটি পাখি। সে উড়ে উড়ে বলতে থাকল, বউ কথা কও!—প্রিয়বালা ঘোষ (ফরিদপুর, মাদারীপুর, গ্রাম : কার্তিকপুর)।

মন্তব্য : 'বউ' শব্দটিকে নানা পারিবারিক সম্বন্ধের পটভূমিকায় দেখা হয়েছে। কখনো স্বামীর স্ত্রী, কখনো শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধূ, কখনো বা স্বামীর ভ্রাতা-ভগ্নীর 'বউদি' থেকে 'বউ'। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কেবল একজন নয়, সঙ্গে অপর একজনও পাখি হচ্ছে। নামটির মধ্যে মধ্যমপুরুষের যে অনুজ্ঞা-বাচকতা আছে, তাতে দুটি চরিত্রেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই পাখি হওয়া প্রায় সর্বত্রই স্বেচ্ছাক্রমে,—দুঃখ-শোক-যন্ত্রণাকে ভুলতে। দ্বিতীয়ত, এ পাখির অনুষঙ্গ হিসেবে আছে গ্রীষ্ম-কালীন ফল (আম, কাঁঠাল, কাফল) এবং সরষে (বৈশাখ মাসে অক্ষর তৃতীয়া তিথিতে সরষে কুটে কাসুন্দী তৈরি করবার প্রথা পূর্ববঙ্গে আছে)। দ্রঃ ৫৪-সংখ্যক কথা।

৫৪

সত্যযুগে ছিল এক গেরস্থ আর তার ঘরের বউ। বউকে স্বামীটি ভারী ভালোবসত। একবার বউকে সে বাড়িতে রেখে বিদেশে গেল টাকা উপার্জন করতে। বউয়ের বয়স খুবই কম, বালিকা বললেও হয়। শাশুড়ীর কাছে থাকে, স্বামীর কথা ভেবে

দিন যায়। এমনি করেই এল বৈশাখ মাস, বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষ, শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি, যার নাম 'অক্ষয় তৃতীয়া'। সেদিন সরষে কুটে কাসুন্দি তৈরি করতে হয়। শাশুড়ী বউকে বললে গোলা থেকে সরষে বের করে আনতে। বউ গেল সরষে বের করে আনতে। বের করতে গিয়ে গোলার ভেতর পড়ে গেল। কেউ তার ডাক শুনতে পেল না। গোলার ভেতরেই সে মরে পড়ে রইল। দু-তিন দিন বাড়ির লোক এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করলে। শেষে খুঁজতে-খুঁজতে বউয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেল গোলাঘরের ভেতরে।

এদিকে বিদেশ থেকে পরবাসী স্বামী তখন ফিরে এসেছে। এসেই শোনে বউ তার মারা গেছে। বউয়ের শোকে স্বামী তখন পাগল-পারা। স্বামী তখন 'সত্যগাছে'র কাছে তার দুঃখের কথা বলল। 'সত্যগাছ' দুঃখে কাতর হয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই পাখি করে দিলেন।

এরাই 'বউ সস্যে (সরষে) কোট্' পাখি। বৈশাখ মাস এগিয়ে এলেই এদের মানব-জন্মের কথা মনে পড়ে। তখন, পুরুষ পাখিটি বলে: 'বউ, সস্যে কোট্'। অনেকে বলে, না স্বামী না, শাশুড়ীই বউকে বলে: 'বউ সস্যে কোট্!' কেউ বা আবার বলে, স্বামীটিই কেবল পাখি হয়ে গেছে, বউটা মানুষই আছে। স্বামীটিই বউকে এই কথা বলে।

—শ্রীমতী নির্মলা মুখোপাধ্যায় (খুলনা, বাগেরহাট মহকুমা, গ্রাম: বিষ্ণুপুর। পোঃ চিরুলিয়া)। যশোহর জেলাতেও প্রচলিত।

মন্তব্য. পূর্ববঙ্গের লোককথাগুলির একটি বড়ো Motif 'সত্যের গাছ'। 'সত্যের গাছ' বলতে বেল, অশ্বত্থ এবং বটের গাছ। গাছকে এখানে সত্যদ্রষ্টা নিরপেক্ষ চরিত্র বলে মনে করা হয়। লোককথার আর এক Motif ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর আলাপন। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর অধিষ্ঠান মূলত বৃক্ষে। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীও ভবিষ্যতের ঘটনা নিজের সত্যদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টিতে দেখতে পায়। এইভাবে পাখি ও গাছ সমীকৃত হয়েছে। তবে তফাত এই,—ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভবিষ্যতের কথা বলে; আর 'সত্যের গাছ' জিজ্ঞাসিত হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বলে। 'সত্যের গাছে'র মধ্যে একটি প্রাণ শক্তিকে দেখা হয়েছে আলোচ্য কথাটিতে। দ্রঃ ৬৫-সংখ্যক কথা।

৫৫

ছেলে মানুষ বউকে বাড়িতে রেখে স্বামী গেছে পশ্চিম দেশে, বাণিজ্য করতে। বউ আছে তার শাশুড়ীর কাছে। বউতে আর শাশুড়ীতে মিল নেই। দু'জনের রাত-দিন ঝগড়া। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। শাশুড়ী জানত তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক। বউয়ের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে একদিন শাশুড়ী করল কি, তুকতাক করে বউকে করে দিল

একটি পাখি। বউ পাখি হয়ে গাছে-গাছে উড়তে থাকল। এদিকে টাকা উপার্জন করে স্বামী ঘরে ফিরল। এসে দেখে বউ নেই। তার মা গাছের একটি পাখি দেখিয়ে বললে, ওই তোর বউ। স্বামী তখন পাখিকে লক্ষ্য করে বললে, বউ কথা কও! কিন্তু পাখি কথা কয় না। তখন বউয়ের শোকে স্বামী নিজেই একটি পাখি হয়ে বলতে থাকল: বউ কথা কও! স্বামীর কথা শুনে পাখিও বললে, বউ কথা কও। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে উড়ে চলে গেল।—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (ফরিদপুর, মাদারী হাট)।

মন্তব্য ১: স্বামীর বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনের পরই পাখি-রূপে গোপন থাকা বউয়ের আত্মপরিচয় দেওয়া হল। এই জন্যেই বিশ্বাস করে হয়, এ পাখি ডাকলে বাড়িতে কুটুম আসে। মনে হয়, হলদে পাখি ও বউ কথা কও মিশ্রিত হয়ে গেছে এখানে।

মন্তব্য ২: স্বামী বা প্রিয়জনের অনুপস্থিতে দুর্বল প্রতিপক্ষকে সবলের পাখি করে রাখা বাঙলা লোক-কথার এক প্রিয় Motif. মেদিনীপুরের একটি লোককথাতে পাই, সাত ভাই বাণিজ্যে গেলে তাদের বউরা একমাত্র ননদকে পাখি করে রেখেছে। বর্তমান সংকলনের ৭৪-সংখ্যক কথা এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। এই রকম, স্বামী বিদেশে গেলে দুর্বল ও কনিষ্ঠ রানীকে জ্যেষ্ঠ রানী পাখি করে রাখে। কিংবা, স্বামী বিদেশে গেলে তার স্ত্রীরা তাদের দেবরকে (ঠিক ননদের মতো) পাখি করে রাখে।

৫৬

যইত্যা 'হিলারী' (অর্থাৎ 'শিলারী', মন্ত্রবলে যে শিলাবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে) নামে এক 'হিলারী' ছিল। শিলাবৃষ্টিতে প্রতি বছর সে অঞ্চলের ফসল নষ্ট হত। একবার যইত্যা মন্ত্রবলে আকাশের সব শিলা আকর্ষণ করে নিল। কিন্তু সেই শিলা স্তূপেই তার মৃত্যু হল। যইত্যার স্ত্রী তখন গর্ভবতী। যইত্যার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর সন্তান হল, তার নাম—বচা। জন্মের পরই বচার মারও মৃত্যু হল। বচাকে গ্রামের সবাই খুব ভালোবাসত। সে প্রচণ্ড শক্তিশালী, দেখতে কালো দৈত্যের মতো, দেহ অনুযায়ী মাথাটি তার ছোটো এবং বুদ্ধিতে খাটো। ধীরে ধীরে সে বড়ো হতে লাগল। এইবার একটি বউ চাই তার। কিন্তু কে দেবে তাকে মেয়ে! তার রূপ-গুণ কোনোটাই নেই। তার দূর সম্পর্কের দিদিমা তাকে বললে, ভাগ্যে তার বউ নেই। তখন বিবাগী হয়ে সে পথে-পথে, দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকল। শেষে পাহাড়ের ঢালে এক গ্রামে এসে দেখলে, কুল গাছের ওপর বসে রয়েছে পরমা সুন্দরী এক কন্যে। লক্ষ্মীই কন্যের রূপ ধরে এসেছে। মেয়েলোক কুলগাছে চড়ে কুল পাড়ছে দেখে বচার খুব আশ্চর্য লাগল। তারপর কাছে গিয়ে কথা বলল, পরিচয় করল, তাকে কুল পেড়ে দিতে বলল। এমনি করে দু'জনাতে ভাব হল। বচা একদিন কন্যে কে বললে, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। কন্যো রাজী হয়ে গেল।

এদিকে, কন্যের ছিল 'নিদ্‌দুলি' রোগ। তার মানে ঘুমোলো তো ঘুমোলোই, মাসেক ধরে ঘুমোলোই। তখন তারা দু'টিতে গেল আয়ী বুড়ির কাছে, সে যদি কন্যের এ রোগ সারিয়ে দেয়। আর সেই সঙ্গে যদি বচার বেসুরো গলার স্বরটাকেও একটু মিঠে করে দেয়। আয়বুড়ি সব শুনে বললে, পাহাড়ের ওপরে ক্ষীরঝোরার পাশে এক মাস সাধনা করতে হবে বচাকে। আঁজলা করে সেই জল খেতে হবে, দিনে ঘুমুবে রাতে জাগবে, আর কিচ্ছুটি খেতে পারবে না। তা হলেই তার গলার স্বর মিঠে হয়ে যাবে। বচা তাই করলে।

এক মাস পরে সে পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে নেবে এলো। সর্বনাশ হয়ে গেছে এর মধ্যে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষেত-খামার নিশ্চিহ্ন, গ্রামের চিহ্নও নেই। কিন্তু একটি গাছের তলায়, খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে নিদ্‌দুলি রোগী কন্যে। পাশে দাঁড়িয়ে আয়ী-বুড়ি। আয়ীবুড়ি বচাকে দেখেই তাকে জড়িয়ে কেঁদে বললে, কন্যেকে ডাকো। ডাকতে গিয়ে বচা দেখলে, কন্যে অনেক দিন আগে মরে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। দুঃখে বচা কেঁদে উঠল। আয়ীবুড়ি তখন সে দুঃখে কাতর হয়ে হলুদ-পড়া মন্ত্রজল দুজনের গায়ে ছিটিয়ে দিলে। দু'জনেই দু'টি হলুদ পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে বসল কাছের একটা গাছে। আজও দেখা যায় মরা কন্যেকে উদ্দেশ করে পাখিটা বলে, বউ কথা কও! বহুক্ষণ পর ছোটো পাখিটা একটা উত্তর দেয়, তা শুনতে ঠিক মনে হয়ঃ 'কি গো!'

—শংকরনারায়ণ ঘোষ।

মন্তব্য ঃ ৫৪-সংখ্যক কথায় 'সত্যের গাছ' মানুষকে পাখি করে দিয়েছে, আলোচ্য কথায় তেমনি 'আয়ীবুড়ী'। আয়ীবুড়ীর চরিত্র অনেকটাই যাদুকরীর। বচাকে সে সাধনার পথ বলে দিয়েছে। স্বেচ্ছাক্রমে পাখি হওয়া ছাড়া, অন্যভাবে (কারো অভিশাপে বা আশীর্বাদে পাখি হলেই, সেই চরিত্রটির একটি বিশেষত্ব বা বিশেষত্ব পূর্ণ ভূমিকা থাকে। আমরা সেই বিশেষত্বটিকেই একটি Motif বলব।

৫৭

এক গ্রামে একটি লোক বাস করত। তার বাপ-মা কেউ ছিল না। ছিল শুধু একটু জমি। সেই জমিতে যেটুকু ফসল হত, তা দু'জনের মতো, কিন্তু সে একাই সবটা খেয়ে ফেলত। তার বিয়ে হয় নি। তার সমাজে বিয়ে করতে হলে মেয়ে কিনে আনতে হয়। বউকে খাওয়াবার মতো ফসল তার ছিল না, পণ দিয়ে মেয়ে কিনবার ক্ষমতাও তার ছিল না। সেইজন্যে কোনো মেয়ের বাপই তাকে মেয়ে দেয় নি। লোকে বলত, তুমি জোয়ান মানুষ, রোজগার বেশি করে করতে পার না? বন্ধুরাও তার সঙ্গে মিশত না, এড়িয়ে যেত। একদিন তার এক বন্ধু বললে, তুই একটা 'মাওলা'

(মা-বাপ মরা) মেয়ে বিয়ে কর। সে তখন সেই রকম একটি মেয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। অনেক পথ চলবার পর, এক জায়গায় এসে দেখলে, একটি মেয়ে পুকুর-ঘাট থেকে জল নিচ্ছে। মেয়েটি তাকে শুধাল, তুমি যাচ্ছ কোথা? সে বললে, কাজের খোঁজে। মেয়েটি ফের বললে, তোমার কী আছে। আমায় খাওয়াতে পারবে? তা হলে তোমায় আমি বিয়ে করি। সে তখন বললে, আমার মা-বাপ নেই। মেয়েটি বললে, আমারও নেই। ছেলেটি তারপর বললে, আমার যা জমি আছে, তাতে দু'জনার হয়ে যাবে। মিথ্যে বরে বললে, কারণ একাই সে দু'জনার ভাত খেত। মেয়েটি বললে, কাল সকালে আমি তোমার বাড়িতে যাবো। আমি তো তোমার মতো তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারি না, তাই আজ গেলাম না। বেলা নেই।

পরদিন ঘরে তার বউ আসবে, এই কথা মনে করে সে রাঁধল মৌ-কলমা চালের ভাত। বউ এলে দু'জনে এক পাতে খাবে বলে সে বসে রইল। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো, কনের তখনও দেখা নেই। সে আসবে বলেও তার মনে হল না। তখন সে একাই হাঁড়ির সব ভাত খেয়ে নিলে। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন একজন এসে তাকে খবর দিলে, হাট-তলায় একটি মেয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে তক্ষুনি বুঝল, এ সেই কনে। কিন্তু এখন সে তাকে কি খেতে দেবে? সব ভাত তো একাই খেয়ে নিয়েছে সে। ভারী চিন্তা হতে লাগল তার। তখন সে হাতা দিয়ে হাঁড়ি চাঁচতে লাগল। ঘরের ভেতর থেকেই একটুখানি উঁকি দিয়ে সে দেখতে পেল, মেয়েটি প্রায় এসে গেছে। সে আরো জোরে-জোরে কর্‌র্‌ কর্‌র্‌ করে হাঁড়ি চাঁচতে লেগে গেল।

মেয়েটি দোর-গোড়াতে এসে সেই হাঁড়ি চাঁচার শব্দ শুনতে পেলে। সে এসেই বললে, আমি আট 'কোশ' রাস্তা হেঁটে এসেছি। ভারী খিদে পেয়েছে আমার। আমাকে কিছু 'খাওয়াবা'? কিন্তু সে হাঁড়ি চাঁচতে এমনিই মগ্ন যে কনের এ কথা শুনতে পেলে না। আরো জোরে জোরে হাঁড়ি চাঁচতে লাগল। মিথ্যে কথা বলবার জন্যে দেবতার অভিশাপে সে হয়ে গেল একটি পাখি। ক্রমাগত হাঁড়ি চাঁচবার জন্যে হাঁড়ির কালি তার ডানার নীচে এখনও লেগে রয়েছে। এ পাখিই হাঁড়িচাঁচা পাখি। পাখি হয়ে আজও সে হাতা দিয়ে হাঁড়ির ভাত চেঁচে বেড়াচ্ছে কর্‌র্‌ কর্‌র্‌ করে। মেয়েটিও তার সঙ্গে সঙ্গে পাখি হয়ে যায়। সে 'খাওয়াবা-খাওয়াবা' এই কথা বলতে-বলতে পাখি হল। আজও তাই মেয়ে হাঁড়ি চাঁচার ডাক কাকের মতো 'আ-আ' অর্থাৎ 'খাওয়াবা-খাওয়াবা'-র মতো শোনায়।—শঙ্করনারায়ণ ঘোষ। খুলনা জেলায় চলিত।

মন্তব্য: পূর্ব বঙ্গে 'হাঁড়ি'কে 'পাতিল' বলে, এই জন্যে সেখানকার অনেক অঞ্চলে এ পাখির নাম 'পাতিল চাঁচা'। কোথাও বা বলা হয় 'আঁড়ি কুক্কা' (হাঁড়িকুক্কা)।

কথান্তর: নদীয়া জেলাতে বিশ্বাস, খেজুরের রস সংগ্রহ করবার জন্যে গাছের সঙ্গে বাঁধা হাঁড়ি'র রস ঠোঁট দিয়ে 'চেঁচে' নিয়ে এ পাখি খেয়ে ফেলে। সে জন্যেই এর নাম 'হাঁড়িচাঁচা'।—মিলনেন্দু বিশ্বাস (ধর্মদা, নদীয়া)।

মন্তব্য : নিজের কথার খেলাপ করবার জন্যে দেবতার অভিশাপে পাখি হবার দৃষ্টান্ত এখানে মেলে। সেই হিসেবে অভিশাপ এই Motif-টি এখানে দেখা যায়। দু'জনের এক সঙ্গে পাখি হওয়া এবং সংলাপ বলা এর অপর Motif।

৫৮

গেরস্থ ঘরের এক যুবতী বউ। সে খুব সুন্দরী, রূপের জন্যে বড়োই দেমাক তার। সাজ-গোজেরও খুব সখ ছিল। কিন্তু হলে হবে কি, স্বামী তার বড়োই গরীব। কোনো সখই মেটাতে পারে না। একদিন সেই বউটি শিব রাত্তিরের মেলা দেখতে গিয়েছে তার স্বামীর সঙ্গে। মেলাতলা তাদের বাড়ি থেকে ঠিক তিন ক্রোশ দূরে। মেলায় গিয়ে বউটি দেখে, খুব ভালো ভালো নানা রঙের মাথার ফিতে বিক্রি হচ্ছে। তার খুব সাধ হল, অমন দু'টি ফিতে কিনতে। কিন্তু তার গরীব স্বামী সঙ্গে করে অতো পয়সা আনে নি। তখন ফিতে-আলার খুব মায়া হল। সে বললে, সে ধারে দু'টি ফিতে দিতে রাজী আছে, কিন্তু আজ রাতেই তিন ক্রোশ পথ ভেঙে বাড়ি গিয়ে পয়সা এনে দিতে হবে। দু'জনেই তাতে রাজী হয়ে গেল তক্ষুনি। মাথায় ফিতে পরে বউটির রূপ আর আনন্দ যেন ধরে না। খুশিতে সে ডগমগ। স্বামীকে বললে, হ্যাগা, আজ বাড়ি না গেলেই নয়! এসো না, আজ সারারাত মেলা দেখি। তারপর কাল বাড়ি গিয়ে পয়সা এনে দিলেই চলবে। স্বামীটি বললে, না, না, সে কি, কথা দিয়েছি, আজ রাতেই যে করে হোক পয়সা এনে দিতে হবে। দু'জনে তাই বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ীতে এসে স্বামী পয়সা নিয়ে ফের রওনা হল মেলাতলার দিকে। তখন অনেক রাত। একা একা পথ চলছে সে। পথে পড়ে একটি 'ডহর'। আর তার পাশে রয়েছে একটা ঘন বাঁশ ঝাড়। একটি নারকেল গাছের গুঁড়ি ওই 'ডহর'টার ওপর ফেলা, সেটাই সাঁকোর কাজ করে। নিশুতি রাতে স্বামীটি যখন সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে 'ডহর' পেরোচ্ছে, তখন সে পা ফসকে 'ডহরে'র মাঝখানে পরে ডুবে গেল। কেবল তার ঘাড়ের গামছাটি কি করে একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে জড়িয়ে রইল। যেন ওটা একটা চিহ্ন হয়ে থাকল, মানষটা কোনখানে ডুবেছে।

পরদিন বউটি এই খবর পেলে। খবর পেয়ে সে দৌড়ে এলো কাঁদতে কাঁদতে। মাথায় তখন সে ফিতে দু'টি পরা। সেই যেখানে রয়েছে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে জড়ানো স্বামীর গামছাটি, সেখানে মাথা নীচু করে গভীর আগ্রহে খুঁজতে থাকল তার স্বামীর মৃত-দেহটি। এইভাবে খুঁজতে-খুঁজতেই সে হঠাৎ হয়ে গেল একটি পাখি। সে হল 'ফিতে বুলবুল' পাখি। সেই ফিতে দু'টিই আজও তার ল্যাজে লেগে রয়েছে। আজও এ পাখি জলের ওপর কী যেন খোঁজে, যেন স্বামীর মৃতদেহ। বাঁশের সঙ্গে গামছা জড়িয়ে গিয়েছিল বলে এখনো এ পাখি বাঁশঝাড় ছাড়ে নি, বাঁশঝাড়ের কাছাকাছিই এ পাখিদের দেখা যায়।—শঙ্করনারায়ণ ঘোষ। নদীয়া জেলায় (মাঝগ্রাম) চালিত।

মন্তব্য : এই পাখিটির পরিচয় সম্পর্কে আমার কিছু সন্দেহ আছে। শ্রীঅজয় হোম-লিখিত 'বাংলার পাখি' (আশ্বিন, ১৩৮০) বইতে (পৃঃ ৭১-৭৪) 'কথিত' শা-বুলবুল' পাখির সঙ্গে এই কথার 'ফিতে বুলবুলির সাদৃশ্য আছে। বিশেষত, ইংরেজীতে একে 'উইডো বার্ড', বা 'রিবন বার্ড' বলা হয় যখন। আমি যাঁর কাছে কথাটি পেয়েছি, তিনি পাখিটির যে গায়ের রঙের কথা বলেছিলেন, তার সঙ্গে 'শা-বুলবুলে'র মিল নেই। শা-বুলবুল সাদা রঙের, সে জন্যেই হিন্দী ও গুজরাটীতে একে বলা হয় 'দুধরাজ'।

শ্রীহোমের উক্ত গ্রন্থেই (২১৫-২১৭) 'ভীমরাজ' পাখির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভীমরাজেরও দুদিকের 'শেষ পালকের প্রান্ত থেকে বেরিয়েছে সরু ফিতের মতো পালক' আমার কথকটি ফিতে বুলবুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে এই ভীমরাজের মিলও আছে। তিনি 'দুধরাজ' আর 'ভীমরাজ' মিলিয়ে ফেলেন নি তো? তাছাড়া, শ্রীহোম জানিয়েছেন, ভীমরাজ ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গা ও বাঁশবন ভালোবাসে, যা এই 'কথা'র সঙ্গে মিলে যায়।

দ্রঃ ৫০-সংখ্যক কথা। 'ফিতে'র সঙ্গে 'কাঠির'র যোগ আছে। দু'টিতেই নায়িকা 'মাওড়া'।

মানুষের পাখি হওয়ার পরিস্থিতি দু'টি : এক, তার জীবন্ত অবস্থাতে, পরম দুঃখ-শোকের মধ্যে ; দুই, তার মৃত্যুর পর। মৃত্যুর পর আত্মা নানা প্রাণীতে রূপ নেয় বলে পৃথিবীর নানা দেশে বিশ্বাস আছে। মানুষের আত্মার এই রকম মানবেতর প্রাণীর রূপ ধারণাকে নৃতত্ত্বের ভাষায় বলে—'Metempsychosis'।

৫৯

এক স্বামী-স্ত্রী। দু'টিতে খুব ভাব। মনসার থানে তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোনদিন তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না। এক জনের যদি আগে মরণ হয়, আরেক জনও তবে তার সঙ্গে মরবে।

একদিন বউটির বাপের বাড়ি থেকে খবর এল—তার মায়ের খুব অসুখ। বাঁচে কি না বাঁচে। তখন সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলাতেই রওনা হতে হবে নৌকো করে। দেরী করলে হয়তো মাকে জীবিত দেখতেই পাবে না।

এখন, সেখানকার নিয়ম হল, রাতের বেলায় নৌকো চালালে জলের দেবতার ঘুম ভাঙে, তিনি রুষ্ট হন। রুষ্ট হয়ে নৌকো আর যাত্রীর ক্ষতি করেন। জলের মধ্যে যে ধান ক্ষেত, সেই ক্ষেতে লক্ষ্মীও রাতে ঘুমোন। তাঁরও বিরক্তি এতে। জলের অপদেবতা আর লক্ষ্মী যাতে রুষ্ট না হন, সেই জন্যে সন্ধ্যের পর কোথাও যাত্রা করতে হলে "আচরণ" করতে হয়। "আচরণ" করতে হয় 'পঞ্চভূত'-কে উদ্দেশ করে। বাড়ির কোনো বয়স্ক লোক এটি করেন। জলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'পঞ্চভূত'-কে উদ্দেশ

করে বলতে হয়ঃ বিশেষ দরকারে আমরা যাচ্ছি, রাত্রিতে তোমাদের বিরক্ত করব, তোমরা এতে রুষ্ট হয়ো না।

এই বর-বউটির বাড়িতে অন্য কোনো বয়স্ক লোক ছিল না। এরা এজন্যে নিজেরাই একে অন্যের 'আচরণ' করলে। "আচরণ" করে স্বামী দিলে স্ত্রীর গায়ে জল, স্ত্রী দিলে স্বামীর গায়ে জল। "আচরণে'র জলের ছিঁটে গায়ে দিয়ে দিলে সারারাত নৌকোতে সে আপদমুক্ত থাকে। আর 'আচরণ' না করে রাতের বেলায় নৌকোতে উঠলে ভূতেরা সারারাত গায়ে জল ঢেলে দেয়। তাতে নানা অকল্যাণ হয়।

যাই হোক, এমনি ভাবে 'আচরণ' করে ওরা সন্ধ্যে বেলাতে নৌকোতে উঠল। সকলেই বললে, নৌকোর "গলুই চেপে" বসতে। তা হলে ঝড় উঠলেও নৌকো ডুববে না। দু'জনে নৌকোর দু' মাথাতে বসলে।

নৌকো ছাড়বার অল্পক্ষণ পরেই এল ভীষণ ঝড়। সেই ঝড়ে পড়ে নৌকো দিক্‌ভ্রষ্ট হল। পথ ভুলে এলো-মেলো চলতে থাকল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দু'জনে নৌকোর দু' মাথায়, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। গায়ে কে যেন জল ছিঁটিয়ে দিচ্ছে। বউটি বারবার বলতে লাগল, এ ঝড় বৃষ্টির জল, ভূতের জল নয়।

এমনি করে রাত পোহাল। সকাল হলে বউটি দেখল, নৌকোর অন্য দিকে স্বামী তো নেই। স্বামীর শোকে বুক তার ভেঙে গেল। দুঃখে সে হয়ে গেল একটি ঘুঘু পাখি। জলের রঙ সন্ধ্যায় যে রকম হয়, সেই রকম রঙ হল তার গায়ের। আজও ঘুঘুর ডাক শুনলে তাই মনে হয়, করুণ ভাবে সে কাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।—শঙ্করনারায়ণ ঘোষ। মৈমনসিংহ কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে চলিত।

মন্তব্যঃ রাতের বেলায় নৌকো না চালাবার Taboo এবং সে জন্যে যে ক্রিয়াচার, তা আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাবজাত।

পক্ষি-কথার রচনারীতি বিচার করলে, এ কথায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই পাখি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

৬০

অনেকদিন আগে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে ছিল এক রাজা। রাজার ছিল এক শ' রাণী। কিন্তু একমাত্র পাটরাণী ছাড়া অন্য কোনো রাণীরই ছেলে-পুলে হয় নি। দিনে-দিনে পাটরাণীর সেই একমাত্র ছেলে বড়ো হতে লাগল। সে কিন্তু অন্যান্য রাজার ছেলেদের মতো নয়। সে রাতদিন পুঁথি পড়ে, আপন মনে কতো কি ভাবে। বিয়ের কথা মুখেও আনে না। পুঁথিপত্রেই সে ডুবে থাকে।

এ দেখে রাজা-রাণী কারো মনেই সুখ নেই। রাজপুত্র এমনি যে তার বন্ধু-

সখাও নেই। রাজা-রাণীর ভয় হল—তাদের একমাত্র ছেলে কি তবে বিবাগী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবে।

তারপর দিনই রাজা তাঁর খুড়ো মন্ত্রীকে ডাকলেন। মন্ত্রী সব শুনে বললেন, রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হোক, যে কন্যে রাজ পুত্রের মনকে ফেরাতে পারবে, রাজা তারই সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দেবেন। তা সে কন্যে যে বংশেরই হোক, আর দেখতে যেমনই হোক।

পরদিনই রাজ্যে এই বলে ঢেঁড়া পড়ল। সে রাজ্যের যতো কুমারী কন্যা আর সুন্দরী যুবতী সবাই সেজে-গুঁজে এসে রাজপুত্রের মন বাঁধতে চাইল। সারাদিন রাজপুত্রের আর রেহাই নেই। শুধু একটি কন্যে, সে হাসে না, কথা কয় নয়, কিছু চায় না। রাজপুত্র তাই একদিন তাকে সে কথা জিজ্ঞেস করায় সে কন্যে বললে, তুমি আমার ভালোবাসার জন। ভালোবাসার মানুষের কাছে কিছু কি চাওয়া যায়! শুনে রাজপুত্রের মন নতুন হয়ে গেল। সেই দিনই তার মন বাঁধা পড়ল, ওই কন্যের কাছে। রাজপুত্র সেদিন বাড়িতে এসেই বললে, আমি বিয়ে করব। ওই সেই কন্যেকে।

রাজপুরীতে আনন্দ ধরে না। সাতদিন সাত রাত্তির ধরে শানাই-নহবৎ বাজিয়ে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু ফুলশয্যের রাতেও কন্যে চুপ করে আছে, কথা কয় না। মুখখানা মলিন। রাজপুত্র কাছে গিয়ে মিঠে গলায় তার কারণ শুধোতেই কন্যে বললে, ঘর আমার ভালো লাগে না। আমি চাই বন-বাদাড়, জল-জঙ্গল। সেখানেই তোমায় ভালো লাগবে আমার। চলো, ঘর ছেড়ে বাইরে যাই দু'জনাতে। রাজপুত্র তখুনি বললে, হ্যাঁ, তাই চলো তবে।

সেই তারা দু'টিতে ঘর ছাড়লে। বিয়ের বেশ ছাড়লে। সবাইয়ের নজর এড়িয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল পথে-ঘাটে। কতো পথ, কতো ঘাট, তারা হেঁটে পেরিয়ে গেল। মাঠ দিয়ে, বাদা দিয়ে, ঘাট দিয়ে, পথ দিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে দেখতে পেল, কে একজন ছুটে আসছে তাদেরই পানে। ছুটে আসছে চীৎকার করতে করতে: সাবধান, সাবধান, পালাও, পালাও। বান আসছে, সাগরের বান। চীৎকার করে একথা বলতে-বলতে সে লোকটা ঘন গাছ-পালার আড়ালে হারিয়ে গেল। ঠিক তারই পেছু-পেছু ছুটে এলো বাঘের মতো বান। পাহাড়ের মতো উঁচু জল, ঘোড়ার মতো ছুটে আসছে।

তখন রাজপুত্র আর কন্যের মনে এলো ভীষণ ভয়। চিন্তা করবার সময় নেই। নিমেষের মধ্যে জল এসে পড়বে। প্রাণের ভয়ে রাজপুত্র বললে, কন্যে গাছে ওঠো, নয়তো দুজনাতেই 'বান-ভাসী' হব। এই না বলেই রাজপুত্র গাছে উঠে বসল, সে তো ব্যাটা ছেলে। কিন্তু কন্যে তো গাছে উঠতে জানে না। সে কিছু করবার আগেই বাঘের মতো বান এসে তাকে ডুবিয়ে-ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে গেল নিমেষে। শুধু দূর থেকে তার গলার আওয়াজ ভেসে এল: রাজপুত্র আমি আছি, আমায় খুঁজে নিয়ো!

তারপর এক সময় বানের জল থিতিয়ে এল। জল সরে-সরে গেল। যেদিকে তাকাও, কেবল কাদা আর পলি। সেই পলিতে ঢাকা পড়েছে সব কিছু। কন্যেও নিশ্চয় ওই পলিতে ঢাকা পড়েছে! দুঃখে-বিরহে রাজপুত্রের বুক ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। কন্যের কথা ভাবতে ভাবতেই সে হয়ে গেল একটি পাখি। কী পাখি?—কাদা-খোঁচা। কন্যে যে বলেছিল, 'আমায় খুঁজে নিবো'—তাই সে পাখি হয়ে কাদা-পলি খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আজও সেই কন্যের অন্বেষণ করে চলেছে। লোকে বলে কাদা খোঁচা, তারা তো জানে না, এ হল বউ খোঁজা!—শংকরনারায়ণ ঘোষ (সুন্দরবন, গোসাবা, ধুমঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে চলিত)।

মন্তব্য: রাজপুত্রের মন ভোলাবার জন্যে রাজ্যের সকল কুমারীকে আহ্বান—'সিণ্ডেরেলা' কথার সঙ্গে ক্ষীণভাবে সাদৃশ্য-যুক্ত।

নিম্নবঙ্গে প্রচলিত অনেক বিহঙ্গকথাতেই বর্ষাজাত বন্যা এবং সামুদ্রিক বন্যার ভয়ংকর ফল প্রদর্শিত হয়েছে। বঙ্গীয় বিহঙ্গপুরাণের এটি একটি Motif। দ্রঃ ৬৪ ৬৫-সংখ্যক কথা।

॥ পাখি : সন্তান কামনা ॥

৬১

"...রাজ্যে মহামারী;... রাজ্যের ওপর শনির যে কোপদৃষ্টি পড়েছে তা কাটাবার জন্য রাজা কত যাগযজ্ঞ করলেন, কিছুতেই কিছু হল না। শেষে রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দিরে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রাজা হত্যা দিলেন।...তিন দিনের দিন ভোর রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, দেবী বলছেন, "মহারাজ, কুমারই তোমার রাজ্যের শনিস্বরূপ।...রাজ্যের যদি মঙ্গল চাও ত রাজ্যের বাইরে কোথাও তাকে পাঠিয়ে দাও, কক্ষণও তাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পাবে না।...সে যদি সেখান থেকে 'খোকাহোক', পাখী ধরে' নিয়ে এসে রাজ্যে ছেড়ে দিতে পারে তো তার কুদৃষ্টি কেটে যাবে।...(রাজপুত্রকে বনবাস দেওয়া হল)...রাজপুত্র অবাক হয়ে পেছন ফিরে দেখলেন, নিবিড় গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক বুড়ী—কেমন সুন্দরী! ..."আয় বাপু, আমারি কাছে থাকবি। তোর ভয় কি?" —এই না বলে বুড়ী তার কুঁড়ে ঘরে রাজপুত্রকে নিয়ে গেল।...তিন তিনটি বছর বলে গেছে। রাজপুত্র এখন বুড়ীকে মা বলে জানেন...। রাজপুত্র সামনে না থাকলে বুড়ী তার ছোট্ট কুঁড়ে

ঘরখানি আশীর্বাদে আশীর্বাদে ভরিয়ে তোলে—"বাবা তোর খোকা হোক, খোকা হোক…" কতবার যে এই আশিস্ বুলিটি বুড়ী আওড়ায়, তার সংখ্যা নেই।…

"রাজপুত্র রোজ যেমন তার (বুড়ীর) জন্যে গাছ-গাছড়া খুঁজতে নদীর তীরে যেতেন—আজও গেলেন। সেখানে পৌঁছে বিস্মিত হয়ে দেখলেন, এক পরমা সুন্দরী মেয়ের দেহ। তার কতকটা ভাসছে নদীর নীরে, কতকটা পড়ে নদীর তীরে। এ তো রাজকন্যে না হয়ে যায় না।·· রাজপুত্র ধীরে ধীরে মেয়েটির অচেতন দেহ তুলে শুকনো ডাঙ্গায় এনে রাখলেন।. পরিচয়ে রাজপুত্র নিজের পরিচয় দিলেন। রাজপুত্রের বাকী সমস্ত জীবনসূত্রটা এই বনের সঙ্গে গাঁথা আছে শুনে রাজকুমারীর চোখে জল এলো।

"রাজপুত্র রাজকন্যাকে সঙ্গে করে' কুঁড়েয় ফিরে দেখেন সর্বনাশ হয়েছে। বুড়ী-মা মারা গেছেন।…

"তাঁরা (রাজপুত্র ও রাজকন্যা) ছিলেন অশোক গাছের তলায়। গাছের ওপর থেকে কে বলে' উঠ্‌ল—"খোকা হোক্, খোকা হোক!".. দেখলেন গাছের একটা উঁচু ডালে কেমন ছোট একটি সুন্দর পাখী!. রাজপুত্র তুড়ি দিয়ে আদর করে' ডাকলেন, "আয় পাখী আয়, আদরে রাখিব তোরে সোনার খাঁচায়!" পাখী সত্য-সত্যই উড়ে এসে তাঁর কাঁধের ওপর বসল। রাজপুত্র তাকে ধরে খাঁচায় পুরলেন।

"এদিকে রাজা রাজপুত্রকে বনে পাঠানোর পর সর্বমঙ্গলা দেবীর পুজোয় মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন।· দুপুর রাত্রে স্বপ্নে সর্বমঙ্গলা দেবী রাজার শিয়রের পাশে আবির্ভূত হয়ে হাসতে হাসতে রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আপনার কুমারের সঙ্গে মালব-রাজকন্যার বিবাহ হয়েছে। কুমার এখন মালব দেশে। সে বন থেকে 'খোকা হোক' পাখী ধরে এনেছে। শীঘ্রই মালব-রাজ্যে যাও। মহা সমারোহ করে' নব-দম্পতীকে এ রাজ্যে নিয়ে এস!".. পরদিনই তিনি হাতী ঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে মালবরাজ্যে যাত্রা করলেন।. রাজ্যে এসে মহাসমারোহে "খোকা হোক" পাখীর পুজো করে রাজকুমার তাকে ছেড়ে দিলেন।"

"এই গল্পটি অনেকেই জানেন। তাঁরা বলেন যে, রাজপুত্রের "খোকা হোক্" পাখীরই বংশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে, রাজপুত্রের "খোকা হোক" পাখী তার বুড়ীমাই। রাজপুত্রের মায়া কাটাতে না পেরে "খোকা হোক"—এই বুলি নিয়ে মরার পর পাখির মূর্তি নিয়েছিল—আবার কেউ কেউ বলেন যে রাজপুত্রের "খোকা হোক" পাখী একটা পাখীই। রাজপুত্রের বুড়ীমার কুঁড়ে ঘরের আঙ্গিনায় অশোক গাছে সে বাস করত। সেখানে বসে' বুড়ীমার "খোকা হোক" আশীর্বাদটি অনবরত শুনে শুনে সে বুলি সে ভুলতে পারে নি।· বুড়ীমার মরার পরই সে রাজপুত্রের নজরে পড়ে।…

—দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৯, পৃঃ ৮৬৫-৮৬৯।

মন্তব্য : সন্তানকে অমঙ্গলকারীরূপে ঘোষণা, 'খোকা হোক' পাখি নিয়ে আসতে পারলে সেই অমঙ্গলের ক্ষয়, সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাত্রী বুড়ী, দেবীর স্বপ্ন প্রদান, মৃতপ্রায় রাজকন্যার সাক্ষাৎ, বুড়ীরই মবে 'খোকা হোক' পাখী হওয়া,—ইত্যাদি নানা Motif এতে দেখা যায়। রাজ্যের অমঙ্গল-ক্ষয়কারীরূপে 'খোকা হোক' পাখিকে দেখা যেন একটি Apotropaic Remedy। কথাটিতে রূপকথার প্রভাব স্পষ্ট। অনেক রূপকথাতেই থাকে—সন্তানের অভাবে রাজা-রাণীর মনে সুখ নেই। এটাই কি এখানে 'অমঙ্গল' রূপে প্রদর্শিত হয়েছে? একদিকে সন্তানের অভাবে রাজার মনে অশান্তি, অপরদিকে সন্তানকেই অমঙ্গলকারী রূপে ঘোষণা,—দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। মনে হয়, একাধিক কথা এখানে মিশ্রিত হয়ে গেছে। দ্রঃ ৬২-সংখ্যক কথা।

৬২

এক গেরস্থের ঘরে ছেলে হত না। সে পরিবারে একের পর এক কেবলই মেয়ে হত। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সাত মেয়ে একে-একে মরে গেল। এমনিতেই ছেলে নেই বলে গেরস্থের মনে দুঃখের শেষ নেই। রাত-দিন একটি ছেলের জন্যে তার কামনার শেষ ছিল না। ছেলে না হলে বংশরক্ষা হবে কেমন করে। তারপর যখন একে-একে সাতটা মেয়েই তার মরে গেল, তখন দুঃখ হল অবর্ণনীয়।

এখন, সেই বাড়ির কাছে থাকত একটা পাখী। পাখি রোজ তাদের খোঁজ-খবর নিত। গেরস্থের ওপর তার একটা মমতা ছিল। গেরস্থও পাখিটাকে খুব আদর-যত্ন করত। পাখিটা সেদিন এসে দেখল, গেরস্থর শেষ মেয়েটাও মরে গেছে। শোকে সে পাগল হয়ে গেছে। তখন গেরস্থর শোকে, পাখি বলে উঠল : 'গেরস্থর খোকা হোক, খোকা হোক।' বলতে বলতে পাখী উড়ে চলে গেল। আজও সে মানুষের সন্তান কামনায় বলে বেড়াচ্ছে : 'গেরস্থের খোকা হোক।'

—আনিসুর রহমান। বর্ধমানের একটি বৃদ্ধা সাঁওতালের (বর্ধমান সদরের জামালপুর থানার বেরুগ্রাম) কাছ থেকে সংগৃহীত।

৬৩

এক সুখী ব্রাহ্মণ ছিল। তার অবস্থাও ছিল ভাল। ব্রাহ্মণ নিজেই মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। সেই বউকে নিয়ে সুখেই তার দিন কাটছিল। এমন সময়ে পাশের একটি সুন্দরী যুবতীকে দেখে তার মন ভুলল। শেষে একদিন সেই সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করে ঘরে আনলে। তখন ব্রাহ্মণের বড়ো বউ তার দু' চোখের বিষ হয়ে উঠল। বড়ো বউ শেষে বাড়ির দাসী হল, আর ছোটো বউই হল বাড়ির গিন্নী।

বড় বউয়ের একটি ছেলে ছিল। বয়স তার বেশি নয়। একদিন ছোট বউ সেই ছেলেকে করবী ফুলের বিচি খাইয়ে মেরে ফেলল। বড় বউ দাসী, সে তখন রান্না ঘরে রান্না করছিল। সে সবে তখন ভাতের হাঁড়ীটি উনুনে চাপিয়েছে, এমন সময় বাড়ির রাখাল-ছেলে এসে তার ছেলের মৃত্যু-সংবাদ দিলে। বড় বউ ছুটে এসে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে বুক ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। ওই ছেলেই ছিল তার শেষ সম্বল। তার স্বামী গেছে, সংসার গেছে। এদিকে উনুনে চাপানো ভাত ততক্ষণে পুড়ে-ঝুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। রেগে গিয়ে বাড়ির গিন্নী ছোটো বউ তখন সেই ভাতের হাঁড়ীটা দিয়েই বড় বউয়ের মাথায় আঘাত করলে। এই অত্যাচার দেখেও ব্রাহ্মণ কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলে না বা ছোটো বউকে কিছু বললে না। একে পুত্রশোক, তার ওপর স্বামী ও সতীনের এই ব্যবহার, হাঁড়ির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বড়ো বউয়ের মরণ হল। সে 'পুত্ পুত্' এই কথা বলতে বলতে মরল।

তারপর দিন থেকেই গ্রামের লোক দেখতে পেলে, একটা পাখি, মাথাটি তার কালো, হেঁসেল বা বাঁশবনে, ঝোপেঝাড়ে ঘোরা-ফেরা করছে। বড় বউ মরেই সে পাখি হয়েছে। এখনও সে পুত্রের জন্যে বিলাপ করে 'পুত্ পুত্' বলে। এ পাখিরই নাম হাঁড়ী-খুঁড়ী পাখি। এ পাখির ডাক শোনা আজও সন্তানবতী নারীর পক্ষে অমঙ্গলজনক। রান্না করতে করতেই যদি কোনো সন্তানবতী এ পাখির ডাক শোনে, তবে তার শান্তি কামনায় আজও তাঁরা উনুনে একটু জল ঢেলে দেন।

—বিরজাসুন্দরী ভৌমিক (নোয়াখালি, ফেনী মহকুমা, ঈশ্বরাগপুর, ফুলগাজী)।

মন্তব্য : এই পাখিকেই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় : 'আড়ী কুঁড়ি' ; 'আঁড়ি কুক্কা', প্রভৃতি।

কথান্তর : সন্তানহারা মায়েরা যেমন করুণভাবে আর্তনাদ করে, এ পাখির ডাক ঠিক তেমনি। ঠিক জোয়ার আসবার সময় এ পাখি এই বলে ডাকে : "ভাটায় গেলি, জোয়ারে আলি না, পুত্ পুত্।" ভাটায় মাছ ধরতে গিয়ে জোয়ারে যে রমণীর সন্তান ফিরে আসে নি, তারই শোকে সে পাখি হয়ে এই ডাক ডাকে।—জ্ঞানবিকাশ চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম, পোটিয়া থানা, সাতবাড়িয়া গ্রাম।)

মন্তব্য : ছোটো বউয়ের বিশেষত্ব, রানী হয়েও বড়ো বউয়ের দাসীবৎ হওয়া, বিমাতা ও সতীনের অত্যাচার, প্রভৃতি এই কথার Motif। বড়ো বউ জীবিত অবস্থাতেই পাখি হয় নি, মৃত্যুর পর হয়েছে। এই দু'টি অবস্থার (জীবিত ও মৃত) পার্থক্য বিহঙ্গপুরাণ বিচার কালে মনে রাখতে হবে।

এ পাখির ডাক শোনা মাত্রই এখনও যে সন্তানবতী নারী উনুনে খানিকটা জল ঢেলে দেয়—এই ক্রিয়াচার পালনের মধ্যে 'মিথ্'টিকে সত্য ও বাস্তব বলে বিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। অনেকেই মনে করেন, 'মিথে'র একটা লক্ষণ, ক্রিয়াচারের মধ্যে তাকে সত্য ও বাস্তব বলে মেনে নেওয়া।

৬৪

এক বউ ছিল, সে খুবই শান্ত। কিন্তু শাশুড়ী তাকে দেখতে পারত না। রাতদিন খাটাত। ভালো করে খেতে দিত না। একদিন সে নদীতে গেল কাপড় কাচতে। যাবার সময় কোলের ছেলেটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেল। নদীর ধারে ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে সে কাপড় কাচতে থাকল। কাপড় কাচতে-কাচতে তার খেয়ালই ছিল না যে নদীর পাড়ে ছেলে শুয়ে আছে। এদিকে কখন জোয়ার এসে ছেলেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তা সে টের পায় নি। যখন টের পেল, তখন সে ছেলের জন্যে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। এদিকে ঘরে স্বামী-শাশুড়ীর ভয়ও আছে। বাড়ীতে গিয়ে কি জবাব দেবে। ভয়ে-দুঃখে সে হয়ে গেল একটা পাখি। কি পাখি, না হাঁড়ীকুড়ী পাখি। ছেলের জন্যে কান্নার ফলেই এ পাখির চোখ আজও লাল। পাখিটা এই বলে ডাকে, 'জোয়ারে গেলি ভাডায় ন আলি, পুত্-পুত্-পুত্!' —গৌরী দত্ত (কেয়োপাড়া, চট্টগ্রাম)।

মন্তব্য : দ্রঃ ৬০-সংখ্যক কথার পাদটীকায় আমার মন্তব্য। ৬৩-সংখ্যক কথার কথান্তর দ্রষ্টব্য।

৬৫

'কানাকুকো' বা 'কানাকুয়ো' পাখি সত্যযুগে ছিল গেরস্থ। তার ছিল একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটি সাঁতার জানত না। জলে পড়ে সে ডুবে মরল।

বাপ যখন জানতে পারলে, ছেলে তার জলে ডুবে মরেছে, তখন শোকে আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না কাঁদতে লাগল। সে 'সত্যের গাছে'র কাছে গিয়ে বললে—পুত্রহীন জীবন নিয়ে সে কী করবে। সে আর মানুষ থাকতে চায় না। ভগবান তার মনের কামনা পূরণ করলেন। মরে সে হল 'কানাকুয়ো' পাখি। কিন্তু মরা ছেলের কথা আজও সে ভোলে নি। তাই যখনই নদীতে জোয়ার-ভাটা আসে, তখনই সে এই বলে ডাকে : "ভাটায় রাখলাম পুত, জোয়ারে নিল পুত,—পুত্-পুত্-পুত্।"

—শ্রীমতী নির্মলা মুখোপাধ্যায় (খুলনা, বাগেরহাট মহকুমা, গ্রাম : বিষ্ণুপুর ;

পোঃ চিরুলিয়া)। গোটা নিম্নবঙ্গ জুড়েই কাহিনীটি চলিত। পশ্চিমবঙ্গের যে সব অঞ্চলের নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, সেখানেও চলিত।

মন্তব্য : এই 'কথা'টিতে সন্তানের পিতাই শোকে পাখিতে পরিণত। কথান্তরে দেখা যায়, মা-ই সন্তানশোকে পাখি হয়েছে। পাখির ডাকটির মধ্যেও মেয়েলি বাগ্‌-বিন্যাস লক্ষ করা যায়।

দ্র : ৫৪-সংখ্যক কথার পাদটীকায় আমার মন্তব্য। দু'টি কথাই একই মহিলার কাছ থেকে সংগৃহীত।

৬৬

নিতাই বাওয়ালি নামে এক বাওয়ালি ছিল। সুন্দরবনে 'বাওয়ালি' মানে—যারা গাছ কাটে বা কাঠুরে। নিতাই বাওয়ালি বনে বনে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করত। বনের প্রান্তে একটি কুঁড়ে ঘরে থাকত সে আর তার মা। নিতাই খুব কাঠ কাটতে পারত। একাই সে দশজন বাওয়ালির কাঠ কাটত রোজ। রোজদিন খুব সকালে উঠে কুড়ুল নিয়ে সে চলে যেত জঙ্গলের ভেতরে কাঠ কাটতে, ঠিক সূর্যাস্তের সময় মস্ত এক বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে ফিরে আসত। প্রত্যেক দিন বিরাট এক বোঝা কাঠ কাটা ছিল তার অভ্যাস। একদিন নিতাই ঠিক সেই পরিমাণ মাঠ কেটে উঠতে পারল না। এদিকে তখন বেলা শেষ হয়ে আসছে। আর সামান্যই বাকী আছে, নিতাই ভাবল—সন্ধ্যা হয়ে এলেও সেটুকু না কেটে সে বাড়ি যাবে না। সে তাই করল। এদিকে তখন চারদিক জুড়ে সন্ধ্যা নেমেছে, আঁধার আরো গাঢ় হয়ে এসেছে। এমন সময় মস্ত একটা বাঘ এসে নিতাইকে পেছন থেকে কামড়ে ধরল। পেছন থেকে কামড়ে ধরবার জন্যেই নিতাই কুড়ুল দিয়েও বাঘকে রোধ করতে পারল না। বাঘের কামড়ে তার প্রাণ গেল। সে জায়গাটি রক্তে রক্তে ভরে উঠল।

একদিকে নিতাইয়ের মা কুঁড়ে ঘরে নিতাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। নিতাইয়ের জন্যে বুড়ি ভাতে-ভাত রেঁধে রেখেছে। সূর্য ডুবল আঁধার হল, তবু নিতাই ফিরে এল না। মহা দুশ্চিন্তায় তার রাত কাটল। পরদিন ভোর হতেই সে গেল বনের ভেতরে নিতাইয়ের খোঁজে। কাঠ কাঠবার জায়গাটিতে গিয়ে দেখল কুড়ুলটি পড়ে আছে, চারদিকে রক্ত ছড়ানো। বুড়ি বুঝল, ছেলেকে তার বাঘে খেয়েছে।

পুত্রশোকে বুড়ির সেখানেই মৃত্যু হল। মরে সে হল একটি পাখি—ডাহুক পাখি বা 'ডাহুক পায়রা'। সে পাখি আজও সকাল সন্ধ্যা ছেলেকে উদ্দেশ করে ডাকে। যেন ছেলেকে সাবধান করে দেয়। সকালে এ পাখির ডাক : 'কোপ্ কর্, কোপ্ কর্,' অর্থাৎ কোপ দিয়ে কাঠ কাটতে আরম্ভ কর। আর বিকেলে ডাকে এই বলে : 'কোপ্ ছাড়্, কোপ্ ছাড়্', অর্থাৎ কাঠ কাটা এইবার বন্ধ কর্।—রবীন্দ্রনাথ সেন। 'শিশুসাথী.' কার্তিক, ১৩২৯. পৃ. ৩৩০-৩৩২।

মন্তব্য : এখানেও মা জীবিতাবস্থায় পাখি হয় নি, হয়েছে মৃত্যুর পর।

৬৭

দুই সতীনের ঘর। কেউ কাউকে দেখতে পারে না, নিশিদিন ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি। বড়ো সতীন একদিন করল কি, ছোটোর চোখ উপড়ে দিলে। স্বামী ছোটো বউকেই বেশী ভালো বাসত। ছোটো বউয়ের চোখ উপড়ে দেওয়াতে স্বামী বড়োর ওপর খুব রেগে গেল। অথচ, বড়ো সতীন ভেবেছিল, ছোটোর চোখ উপড়ে দিলে আর বুঝি স্বামীর ভাগ নিয়ে ঝগড়া হবে না। এখন সেই স্বামীই তার ওপর দিনে দিনে বিরক্ত হতে থাকল। দুঃখে অভিমানে বড়ো সতীন একদিন তাই নিজের পেটে লম্বা ছুরির দাগ টেনে করল আত্মহত্যা। মরার পর সে হল একটা পাখি। পাখি হয়ে সে "চোকউদানী" গাছের ফল খেতে লাগল। 'চোকউদানী' গাছ ছোটো গাছ, এর ফল ঈষৎ লাল, দেখতে ছোটো কুঁচ ফলের মতো। এর ফল বিষ, যে খায় সেই মরে। বড়ো সতীন পাখি হয়ে ওই বিষফল খেতে লাগল। কিন্তু বিষফল খেয়েও তার মরণ নেই। ফল খায়, আর বলে 'কূট, কূট!' (অর্থাৎ: বিষ, বিষ। এ ফল খেয়ো না)। বড়ো সতীন ছোটো সতীনের চোখ উঠিয়ে দিয়েছিল, তাই সে যখন পাখি হল, তখন তার নাম হল: 'চোকউদানী' (চোখউঠানী) পাখি। তার মাথার খোঁপাটা হয়েছে এ পাখির ঝুঁটি। আর ছুরি দিয়ে পেট কেটে আত্মহত্যা করেছিল তো, তাই পাখিটির পেটের দিকটায় সাদা রঙের ওপর একটা লম্বা লাল দাগ দেখা যায়। ওটা হলো সেই ছুরি দিয়ে কাটার রক্তের দাগ।—প্রতিমা ভট্টাচার্য। বরিশাল, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে চলিত।

মন্তব্য ১ঃ 'চোখ উদানী' পাখি 'কিচ্-কিচ্'- করে ডাকে, তা 'কূট-কূট' হয়েছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের পেছনে সংস্কৃত শব্দের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।

মন্তব্য ২ঃ 'চোখউদানী' পাখি যে গাছের ফল খায়, সে গাছেরই নাম "চোখউদানী" গাছ হয়ে গেছে, পাখির সঙ্গে গাছের যোগের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এটি। 'চোখউদানী' ফল আসলে ফুলই। এই ফল ছিঁড়লে তার ভেতরের অংশ ফুলের পাপড়ীর মতো খসে পড়ে। পাপড়িগুলো দেখতে পদ্মের পাপড়ীর মতো। এই পাখি আকারে ছোটো।

মন্তব্য ৩ঃ এই 'চোখউদানী' গাছের মতো আর এক ধরণের গাছ সম্পর্কে যশোর জেলাতে নীলকণ্ঠ পাখিকে নিয়ে একটি 'কথা' চলিত আছে। এই গাছ আড়াই-তিন হাত উঁচু, ফণীমনসার মতো দেখতে, ছোটো ছোটো পাতা আছে। এ গাছের রস অতি বিষাক্ত, যে কেউ খেলে মরণ তার নিশ্চিত। একমাত্র নীলকণ্ঠ পাখি এই বিষাক্ত রস খেয়ে থাকে। শিব যেমন সমুদ্র-মন্থনজাত নীল বিষ আপন কণ্ঠে ধারণ করে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন, 'নীলকণ্ঠ' নাম-সাদৃশ্যে এবং ওই পাখির বিষপান করেও জীবিত থাকায়, এই 'কথা'র উদ্ভব হয়েছে।

৬৮

'চোখ গেল' পাখি আগের জন্মে ছিল এক গেরস্থ ঘরের বউ। শাশুড়ীর সঙ্গে মোটেই তার বনত না। রাত-দিন দু'জনের ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকত। দোষ কারোই কিছু কম ছিল না: বউ ইচ্ছে করেই শাশুড়ীর কথা শুনত না। একদিন বউ শাশুড়ীর কথা না শোনায় শাশুড়ী ভীষণ রেগে গেল। রেগে গিয়ে, তারপরে, গরম ছাঁকুনি (মতান্তরে 'খুন্তাবাড়ি') দিয়ে দিলে বউয়ের চোখ গেলে। একে চোখের জ্বালা তারপর গরম জিনিসের ছেঁকা। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বউ একটা পাখি হয়ে উড়ে গেল। এখনও সে জল চাইছে। এখনও এ পাখি তাই এই বলে ডাকে: 'চোখ গেল, জল ঢালো', 'চোখ গেল, জল ঢালো'। কখনও বা বলে: 'শিব জল! শিব জল!' --২৪ পরগণা ও হুগলি অঞ্চলে চলিত।

৬৯

'চোখ গেল' আর 'বউ কথা কও' এই দু'টি পাখি আগের জন্মে ছিল যথাক্রমে পুত্রবধূ ও শাশুড়ী। দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। কেউ কাকে দেখতে পারত না। একদিন বাড়িতে মুড়ি ভাজা হয়েছে। শাশুড়ী বউকে বললে, হাঁড়ির ভেতর মুড়ি তুলে রাখতে। বউ মুড়ি তুলতে গিয়ে লোভে পড়ে কিছুটা মুড়ি খেয়ে ফেলল। শাশুড়ী তা দেখে ফেলে। শাশুড়ী ভীষণ রেগে গিয়ে মুড়ি ভাজবার 'কুঁচি' (নারকেল পাতার শিরদাঁড়া বা বাঁশের শলাকার গোছা, যা দিয়ে 'খোলা'র চাল নাড়া হয়) দিয়ে বউয়ের চোখ গেলে দিলে। যন্ত্রণায় বউ 'চোখ গেল' বলতে বলতে একটি পাখি হয়ে উড়ে গেল। বউ পাখি হয়ে উড়ে গেল দেখে শাশুড়ীর ভারী অনুতাপ হল। দুঃখে তারও মৃত্যু হল। দেবতারা তাকেও করে দিলে পাখি। সে তখন পুত্রবধূকে উদ্দেশ করে বলতে থাকল, বউ কথা কও! —হাওড়া (রামরাজাতলা) অঞ্চলে চলিত।

মন্তব্য ১: ২৪-পরগণার অঞ্চল বিশেষে (বসিরহাট) বিশ্বাস আছে, 'চোখ গেল' এবং 'বউ কথা কও' পাখি দু'টি সাধারণত একত্রই থাকে, অনেক সময় দেখা যায়—একই গাছে বাসা বাঁধে। 'বউ কথা কও' কয়েকবার ডাকলেই নাকি 'চোখ গেল' পাখি ওই বলে ডেকে ওঠে। সেখানে এ কথার যে রূপ মেলে তাতে দেখা যায়, শাশুড়ী বউয়ের চোখে গরম বিষজল ঢেলে দিয়েছিল। মুড়ি ভাজার প্রসঙ্গ নেই।

মন্তব্য ২: 'চোখ গেল' পাখির এই ডাকের একটি আধুনিক ও নীতিগন্ধী ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে: বসন্তকালে মানুষের যৌনবোধ বেড়ে ওঠে, মানুষ অনেক অনাচার-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ পাখি এই সব অনাচার-ব্যভিচার দেখতে পারে না, তাই

বলে—'চোখ গেল !'—ফণীন্দ্রনাথ দাস (হাওড়া, কুলগাছিয়া, মহিষরেখা)। দ্রঃ ৯১-সংখ্যক কথা।

কথান্তর ১ঃ 'চোখ গেল' পাখি আগে গেরস্থের বৌ আছিল। একদিন তার শাশুড়ী ভাত নাড়ুইন্যা নাকইর না পাইয়া বৌর সাথে খুব রাগারাগি করে। বৌ কিছুতেই নাকইয়ের কথা কইতে পারে না। তহনে হাশুড়ী নিজেই এঘর-ওঘর তালাশ কইর‍্যা নাকইর পায়। দর্জাল হাশুড়ী আইস্যা বৌডার চোখে খুচা দ্যায় ঐ নাকইরডা দিয়া। তেগ কইর‍্যা বৌডা পাখি অইয়্যা যায়। আইজও সে কয়, 'চোখ গেল', 'চোক গেল'।'—বাঙলা দেশের লৌকিক ঐতিহ্য (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : নভেম্বর ১৯৭৫): আবদুল হাফিজ। পৃ. ১৫৩-১৫৪। ঢাকা (জিয়নপুর, দৌলতপুর, মাণিকগঞ্জ) জেলা থেকে সংগৃহীত। 'চোখ গেল' পাখির নামান্তর আবদুল হাফিজ এই দিয়েছেন : 'পিত্তি ঘোষ, দই তোল'।

মন্তব্য ৩ঃ দ্রঃ ৭৫-সংখ্যক কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শাশুড়ীই বধূর চোখে আঘাত করেছে। আলোচ্য কথাটিতে দেখা যায় সতীনপুত্র বিমাতার চোখে আঘাত করেছে, অপরাধের শাস্তি হিসেবে।

৭০

পানকৌড়ি পাখি আগে ছিল এক গেরস্থ ঘরের বউ। তার গলাটা ছিল বেজায় লম্বা, আর গায়ের রঙ ভারি কালো। রূপের 'ছিরি' দেখে স্বামী তাকে ভালোবাসত না, শাশুড়ী নানারকম অত্যাচার করত। বউটি মাছ খেতে খুবই ভালোবাসত, কিন্তু বাড়িতে মাছ রান্না হলেও শাশুড়ী তাকে মাছ খেতে দিত না। একদিন বাড়িতে অনেক মাছ রান্না হয়েছে। কিন্তু রোজদিনকার মতো সেদিনও শাশুড়ী তাকে মাছ খেতে দিলে না। অথচ বউটির ভারি লোভ হল মাছ খেতে। রাগে দুঃখে সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলে। ডুবে মরবার পর সে হল পানকৌড়ি পাখি। সে কালো বউ ছিল, তাই পানকৌড়ির রঙও কালো; বউটির গলার মতোই পানকৌড়ির গলা লম্বা। শাশুড়ী মাছ খেতে দিত না বলেই পানকৌড়ি সাধ মিটিয়ে কেবল মাছই খায়। পানকৌড়ি ডুবে মরবার পরই শাশুড়ীর খুব অনুতাপ হয়। শাশুড়ী তাকে বারবার জল থেকে উঠে আসতে বলে। তাই ছড়া আছে,

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো না,
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোটো না ॥

সেই কালো বউটি খুব পান খেত। সেইজন্য আজও পানকৌড়ির ঠোঁট লাল।

—জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মধ্যবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অংশ বিশেষে চলিত।

মন্তব্য ঃ এই ধরনের কথাগুলিতে বউয়ের একটি করে দোষ (যেমন, খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লোভ) দেখানো হয়। শাশুড়ীর অনুশোচনা এই সব কথার আর একটি Motif। এবিষয়ে 'অপরাধ-অনুশোচনা' (সং ৩৫-৪১) গুচ্ছটি তুলনীয়।

৭১

এক চাষী গেরস্থ, আর তার বউ। গেরস্থের শ্বশুরবাড়ির আর কেউ নেই, তাই তার শালাও তার সঙ্গে থাকে। বেশ সুখেই চলছিল শালা-ভগ্নিপতির সংসার। কিন্তু সে সুখ তাদের কপালে বেশিদিন সইল না। চাষী গেরস্থটির শত্রু হল। একদিন সে যখন মাঠে কাজ করছে, তখন তার শত্রুরা তাকে হত্যা করল। হত্যা করে পাঁক বা কাদায় পুঁতে রাখল। তার শালা কিন্তু দূরের থেকে সবই দেখতে পেল। মনের দুঃখে সে বাড়ি চলে এলো। তখন ভরা দুপুর, ভাত খাবার সময়। এই সময়েই রোজ মাঠের কাজ শেষ করে শালা-ভগ্নিপতি ফিরে আসে। তারপর স্নান সেরে ভাত খায়। আজও চাষী গেরস্থের শালা এসে দিদিকে বললে: 'ছোড়দিদি রে, ভাত দে।' স্বামীকে সঙ্গে না দেখতে পেয়ে ছোড়দি বলে: 'তিনি কোথায়?' ভাই তার উত্তরে বলে: 'তিনি প্যাঁকো।' অর্থাৎ তাকে মেরে পাঁক বা কাদায় পুঁতে ফেলা হয়েছে। মনের দুঃখে তখন ভাই-বোন দুটি পাখি হয়ে গেল। ভাই আজও বলে: 'ছোড়দিদি রে ভাত দে'। বোন তার জবাবে বলে: 'তিনি কোথায়?' ভাই উত্তর দেয়: 'তিনি প্যাঁকো'। কাদা বা পাঁকের মতোই পাখিগুলির গায়ের রঙ। ডাক অনুযায়ীই পাখির নাম হয়েছে 'প্যাঁকো-প্যাঁকো' পাখি। সাধারণত হেমন্তকালে, যখন জল সরে গিয়ে কাদা জেগে ওঠে, তখন এই পাখিদেরও দেখা যায়।

—যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (গ্রাম: দীর্ঘগ্রাম; পোঃ জয়কৃষ্ণপুর; থানা, নবাবগঞ্জ: ঢাকা সদর, ঢাকা)।

৭২

"অনেকদিন আগে কাঁটাল পাখী ('বউ কথা কও') নাকি মানুষ ছিল। এক গেরস্থের ঘরে ছিল মেয়ে আর একটি ছেলে। গেরস্থের বাড়ী থেকে অনেক দূরে মেয়েটির বিয়ে হয়। বিয়ের পর অনেকদিন আর তাঁদের ভাই-বোনের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। তারপর এক বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-কাঁঠাল পাকলে সেই ছেলে একজন লোকের সঙ্গে তার বোনের বাড়ীতে তত্ত্ব নিয়ে যায়। বোনের শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে ভাই বোনকে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। বোন চলল পাল্কী চড়ে, আর ভাই সেই পাল্কীর ধারে-ধারে হেঁটে চলল।"

"পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ; পথের দুই ধারে নিবিড় বন।...হঠাৎ জঙ্গল থেকে মস্ত একটা বাঘ বেরিয়ে এল। পাল্কী বেহারারা নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে পালাল, সেই ছোট ছোট ভাই-বোন দু'টির দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। কিন্তু ভাই

আপন বোনকে ফেলে ত আর পালাতে পারে না ; তারা ভাই-বোনে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে রইল ! বাঘ এসে বোনের বুক থেকে ভাইকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেললে, কিন্তু বোনকে ছুঁল না। বোন সেই মরা ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে সেইখানেই মরে গেল।"

"বোনের সেই হৃদয়ভেদী কান্না শুনে ভগবান তাকে পাখী বানিয়ে দিলেন আর সে আজ পর্যন্ত সেই মরা ভাইয়ের শোকে পাগল হয়ে গেয়ে বেড়ায়—

কাঁটাল পাখী, 'নাইওর' যাইতে
ভাইকে খাইল বনের বাঘে—"

—জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫। শ্রীহট্ট অঞ্চলে চলিত।

কথান্তর ১ঃ "কৃষ্ণগোকুল পাখি ডাকে, "কাঁঠাল পাকুক, জামাই আসুক।' এর কারণ হল এক শাশুড়ী গাছের পাকা কাঁঠাল পাড়ে এবং জামাইকে কাঁঠাল খাওয়ানোর জন্য ডাকতে যায়। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে শাশুড়ী দেখতে পায় যে তার জামাই মারা গেছে। তখন থেকে শাশুড়ীর মনোবেদনাকে "কাঁঠাল পাকুক, জামাই আসুক" বলে প্রকাশ করে কৃষ্ণগোকুল পাখি।"—বাঙলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : নভেম্বর ১৯৭৫): আবদুল হাফিজ। পৃ. ১১। কোন্ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তার উল্লেখ করা হয় নি।

দ্রঃ ৭৮-সংখ্যক কথা।

মন্তব্যঃ বোনের জীবিতাবস্থাতেই বোন পাখি হয়েছে। স্বেচ্ছাক্রমে পাখি হয় নি, ভগবান করে দিয়েছেন।

৭৩

পূর্বজন্মে কোকিলরা ছিল দুই ভাই-বোন। একদিন ওদের দুই ভাই-বোনকে বাড়িতে একা রেখে ওদের বাপ-মা গেল হাটে। অমন ওদের বাপ-মা প্রায়ই যেত। সেদিন বাপ-মা চলে যেতেই ওরা খেলতে আরম্ভ করলে। কী খেলা, না 'নুকাটুনু' (লুকোচুরি) খেলা। খেলতে খেলতে একবার বোন লুকোলো, ভাইয়ের সে বার তাকে খুঁজে বের করবার পালা। এদিকে বোন সেবার খুঁজে পেতে এমন একটা জায়গায় লুকিয়েছে যে, সে আর সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। বোনকে ভাই খুঁজতে লাগল। ভাই মনে করলে, বোন বুঝি খেলবার জন্যেই ইচ্ছে করে লুকিয়ে আছে। বহু খুঁজেও সে বোনকে বের করতে পারল না। বার বার বলতে লাগল : 'টু-উ, টু-উ'। এমনি করতে করতেই ভাই হয়ে গেল একটি কোকিল

পাখি। আজও ভাই-বোনে লুকোচুরি খেলছে। আজও ডাকছে: 'টু-উ, টু-উ!'
—সুরেন্দ্রনাথ রায় (জলপাইগুড়ি, ধাপগঞ্জ, গড়ালবাড়ী)।

কথান্তর: আলবানিয়া-তে এই 'কথা'টি এইভাবে চলিত: "There were once two brothers and a sister, so runs the story, and the later accidentally killed one of former by piercing him to the heart with her scissors. She and the surviving brother grieved so long and passionately that they were tured into cuckoos. The brother cries out to the lost one by night, gjon, gjon, and she by day Ku Ku, Ku Ku, which means "where are you?"—"Bird mythology" (The Calcutta Review: Vol. No. CXIII, July 1901), PP, 72-73, By: "R R.P".

মন্তব্য: "The cuckoo is the derider; when children play at hide and seek, they are accustomed in Germany and in Italy, as well as in England, to cry out Cuckoo to him who is to seek them in vain, as is hoped'—Angelo De Gubernatis: Zoological Mythology OR the legends of animals (London: 1872), Vol. II: P. 233.

লুকোচুরি খেলায় চোখ বন্ধ করবার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ চোখ যেন সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যায়। হাওড়া জেলার কোনো-কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস আছে: ছোটো ছেলেমেয়েরা যদি কোকিলের ডাককে ব্যঙ্গ করে নকল করতে থাকে, তবে তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তারা যাতে এ কাজ না করে সেজন্যে পিতামাতার খুব তৎপর থাকেন।

৭৪

এক গ্রামে সাত ভাই আর এক বোন বাস করত। ছোটো ভাইয়ের বিয়ে হয়নি। একদিন সাত ভাই গেল বাণিজ্য করতে। তাদের বউরা রইল বাড়ীতে। বাণিজ্য করে বড়ো ছয় ভাই যেদিন ফিরে আসবে, তাদের বউরা গেল তাদের এগিয়ে আনতে। ছোটো ভাইকে এগিয়ে আনতে গেল তাদের একমাত্র বোন।

ছয় বউ তাদের ননদকে দেখতে পারে না। সাত ভাইকে এগিয়ে আনতে গিয়ে তারা একটি নদীর ধারে বসল। তারপর উকুন বাছার ভান করে ছোটো বোনকে গভীর জলে ঠেলে ফেলে দিল। সে জলে ডুবে মরে গেল। বউরা বাড়ী ফিরে এল।

এদিকে সাত ভাই তখন বাড়ীতে ফিরছে। বাড়ীতে ফেরার আগে নদীতে নাইতে গেল। একে-একে সাত ভাইই নদীতে নামল। সেই সময়ে শুনতে পেল, জলের ভেতর কে যেন শীতে 'চু-চু-চু' করে কাঁপছে। একে-একে সব ভাই বলল: 'যদি

বাইরের লোক হও, তবে আমার বাঁ দিকের ঝোলায় এসো। আর যদি ঘরের লোক হও তো ডান দিকের ঝোলায় এলো। একে-একে সব ভাই নদী পার হয়ে গেল। এইবার ছোটো ভাইয়ের পালা। যেই সে পার হতে গেছে, অমনি তার ডান দিকেব ঝোলায় এসে ঢুকল একটা 'চিকৌক' পাখি। ছোটো ভাই সেই সুন্দর পাখিটাকে বোনকে দেবে বলে বাড়ীতে নিয়ে গেল।

বাড়ীতে এসে যখন খেতে বসেছে, তখন বাড়ীর বেড়াল ছোটো ভাইকে বলল, সে যদি বেড়ালকে ভাত দেয়, তবে ওই পাখিটার একটা হাড় তাকে দেবে। ছোটো ভাই বুঝল, তার আনা পাখিটাকে বউরা মেরে ফেলেছে।

ছোটো ভাই বেড়ালকে ভাত দিলে বেড়াল সেই পাখিটার একটা হাড় ছোটো ভাইকে দিল। ছোটো ভাই সেই হাড়টি কিছু তুলোর মধ্যে জড়িয়ে বেখে দিল। হাড়টি একটু-একটু করে বাড়তে থাকলে। শেষে সাতদিন পরে দেখা গেল, হাডটি ঠিক ছোটো বোনের মত হয়ে গেছে।

ছোটো বোন তখন সব কথা বলে দিলে। তাই শুনে ছয় ভাই ছয় বউকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। কিছুদিন পর ছয় ভাই আবার নতুন বিয়ে করল। আলাদাভাবে সংসার পাতল। ছোটো বোন থাকল ছোটো ভাইয়ের কাছে। ছোটো বোন বড়ো হয়ে উঠলে ছোটো ভাই তার বিয়ে দিয়ে দিলে। নিজেও বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকল। ছোটো বোনের মৃত্যুর পর সে হয়ে গেল একটি চিকৌক পাখি।—শ্রীরঙ্গে টোটো (টোটোপাড়া, মাদারীহাট, জলপাইগুড়ি)-র কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন বিমলেন্দু মজুমদার (শিল্প সমিতিপাড়া, জলপাইগুড়ি)। 'কথা'টি 'টোটো' উপজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। টোটো ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন : শ্রীমুক্তারাম টোটো।

মন্তব্য : ছোটো ভাই, ছোটো বোন বা ছোটো বউকে, বড় ভাই বা স্বামীর অনুপস্থিতিতে পাখি করে রাখা লোককথার একটি Motif। সর্বক্ষেত্রেই দোষীব সাজা হয়।

৭৫

এক ভাই, এক বোন, আর তাদের সৎমা। মেয়েটাকে সৎমা তবু একটু ভালোবাসে। কারণ, সে মায়ের মুখে-মুখে তর্ক করে না, কথা বলে না, সব সময়ে ভয়ে-ভয়ে থাকে, কাজকর্ম করে। তার নাম কনকচাঁপা। কিন্তু ছেলেটাকে সৎমা দু'চোখে দেখতে পারে না। একদিন দুপুরবেলায় ছেলেটার খুব খিদে পেয়েছে। সে সৎমার কাছে খেতে চাইল। একটা বড়ো কাঠের সিন্দুকের ভেতর খাবার রাখা ছিল। সৎমা সেখান থেকে খাবার নিয়ে ছেলেটিকে খেতে বললে। ছেলেটি হেঁট হয়ে যেই সিন্দুকের ভেতর থেকে খাবার নিতে গেছে, অমনি সৎমা সিন্দুকের ডালা চাপা দিয়ে ছেলেটিকে মেরে ফেলল। ছেলেটির আত্মা তখন একটি পাখি হয়ে উড়ে চলে গেল। উড়তে উড়তে সে শেষে গিয়ে পেঁছিল এক মালীর বাড়িতে। মালী তখন ফুলের মালা গাঁথছিল। সেখানে গিয়ে সে বললে ঃ

মায়ে মারল ছেলে, খোঁজ নিল না বাপে।
কেঁদে মরল কনকচাঁপা, বলে না মায়ের দাপে ॥

মালী তাকে দিল একটি ফুলের মালা। তারপর সে গেল এক সঁ্যাকরার কাছে। সেখানে দিয়ে সেই একই কথা বললে : মায়ে মারল ছেলে···

সঁ্যাকরা তার গলায় একটি সোনার হার পরিয়ে দিলে। তারপর সে গেল একটি কামারের বাড়ি। কামার তখন সুঁচ গড়ছিল। কামারের কাছে গিয়েও সে বললে : মায়ে মারল ছেলে···

শুনে কামার তার পায়ে কয়েকটি সুঁচ আটকে দিলে। তারপর, ফুলের মালা সোনার মালা, আর সুঁচ নিয়ে উড়তে উড়তে পাখিটা তার নিজের বাড়িতেই ফের ফিরে এল। ফিরে এসে পাঁচিলের ওপর বসে সেই কথাই বলতে থাকল : মায়ে মারল ছেলে···

ছড়াটি শুনেই তার বাপ বুঝতে পারল, এই পাখিই তার সেই মরা ছেলে। একেই তার দ্বিতীয় বউ মেরে ফেলেছে। তখন তার এবং কনকচাঁপার খুব দুঃখ হতে লাগল। তাদের সেই দুঃখ দেখে পাখিটি সোনার মালাটি পরিয়ে দিলে বোনের গলায়। আর ফুলের মালাটি দিলে বাপের গলায়। আর সেই সুঁচগুলো, তা দিলে সৎমার চোখে বিঁধিয়ে। সেই যন্ত্রণায় সৎমা গেল মরে। মরে হয়ে গেল একটি পাখি। আর চোখের যন্ত্রণায় বলতে থাকল ঃ 'চোখ গেল, চোখ গেল'! আজও সেই কথাই বলে পাখিটি। তাই এর নাম 'চোখ গেল' পাখি।—শ্রীমতী শুভ্রা বসু (খুলনা, সাতক্ষীরা)।

মন্তব্য ১ ঃ Cumulative Folktale-এর ঈষৎ ও অসম্পূর্ণ আভাস এতে মেলে।
দ্রঃ ৬৯-সংখ্যক কথা।

এক গেরস্থের পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। অমন সুন্দরী মর্তে বড়ো একটা দেখা যায় না। গেরস্থ ছিল বড়োই গরীব। কিন্তু সে বলে বেড়াত, সে যদি কখনো তার মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রাজার ঘরেই দেবে, নয়তো নয়। এতো রূপ রাজার ঘর ছাড়া কি মানায়? এক দৈবজ্ঞ সেই বামুন গেরস্থকে একদিন তাই শুনে বললে, মেযের রূপ নিয়ে অতো গর্ব করতে নেই। তাতে দেবতারা রুষ্ট হন। দম্ভের ফল কেনো-দিন ভালো হয় না। কিন্তু গেরস্থ দৈবজ্ঞের উপদেশে কান দিলে না।

এদিকে, এক কথায় দু' কথায় কন্যের সেই রূপের কথা রাজার কানে উঠল। রাজা কন্যেকে তার ছেলের বউ করবার জন্যে মন্ত্রীকে পাঠালেন। মন্ত্রী হাতীতে চড়ে গেরস্থের উঠানে এসে দাঁড়ালেন। কন্যের হাতী দেখতে খুব ভালো লাগে, সেও আব সবাইয়ের সঙ্গে হাতী দেখতে বাইরে এল। সেই সময় মন্ত্রীও কন্যেকে দেখে নিলেন। সত্যিই রূপসী মেয়ে। ধরাতলে অমন দেখা যায় না, মানুষের অতো রূপ হয় না। মন্ত্রী তক্ষুণি তো কন্যেকে পছন্দ করে ফেললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা ভেবে মনটা তাঁর বড্ডো খারাপ হয়ে গেল। এই গরীব ঘরের রূপসী কন্যা একবার যদি বউ হয়ে রাজবাড়িতে ঢোকে, তো চিরকাল সেখানেই কাটাতে হবে তাকে, জন্মেও ফের বাপের বাড়িতে আসতে পাবে না। বাপ-বেটীতে আর দেখাই হয়তো হবে না। মন্ত্রী তখন গেরস্থকে ডেকে বললেন, দেখ বাপু, মেয়ে তোমার সত্যি সুন্দরী, তাকে আমি রাজার ছেলের বউ হিসেবে পছন্দ করলাম। কিন্তু ভেব দেখ, রাজার ঘরে মেয়ে দিলে কোনোদিনই হয়তো আর মেয়ের মুখ দেখতে পাবে না। সে কি তোমার সইবে? তখন গেরস্থের মনে এল দ্বন্দ্ব—মেয়ে দিই কি না দিই। মাথা একবার 'হ্যাঁ' হয়, একবার 'না' হয়। দ্বিধায় মাথা তার দুলতে থাকল। শেষে বিয়ে দেওয়াই ঠিক করলে সে।

বিয়ের দিন বিয়ে করতে এসে রাজপুত্রের খুব কষ্ট হতে লাগল তার শ্বশুরের জন্যে। আহা রে, মেয়েকে আর জীবনে একটি বারও দেখতে পাবে না। রাজপুত্রের মনটা ছিল নরম। সে তার শ্বশরকে চুপি চুপি একধারে ডেকে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, সুযোগ পেলেই গোপনে তার বউকে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়িতে আসবে। কিন্তু যেদিনই সে আসুক, সেটা হবে পূর্ণিমার রাত। পূর্ণিমার রাত ছাড়া অন্য কোনো রাতে তারা আসবে না।

বিয়ে হল, মেয়ে-জামাই চলে গেল। গেরস্থের ঘর শূন্য, মন ফাঁকা। অনেকদিন কেটেও গেল, গেরস্থের একবারটি তার মেয়েকে দেখতে ভারি [illegible] হল। গেরস্থ প্রতি পূর্ণিমার রাতে মেয়ে-জামাইয়ের দেখা পাওয়ার আশা [illegible]। সাধ্যমত খাবার-দাবার জোগাড় করে ঘরে গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখে। সারা রাত [illegible] [illegible]ক্ষা করে। প্রতীক্ষা

করতে করতে শেষে রাত ভোর হয়ে যায়। কিন্তু, প্রতি পূর্ণিমার রাতে ঠিক তেমনি আয়োজন করে তেমনি আশা নিয়ে বসে থাকে পথ চেয়ে। শেষে একদিন, এক পূর্ণিমার রাতে ঘটল এক ঘটনা। সেদিনও সে বাড়ির বাইরে, নানা খাবার-দাবার নিয়ে প্রতীক্ষা করছে মেয়ে-জামাইয়ের। গভীরভাবে মেয়ের মুখখানা চিন্তা করতে-করতেই তার মনে হল, আচ্ছা সে যদি পাখি হত! তা হলে তো উড়ে গিয়ে সহজেই মেয়েকে দেখে আসতে পারত! তখন নিশুতি রাত। চারদিকে জ্যোৎস্না থই-থই করছে। কেউ কোথা নেই। গেরস্থ একমনে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটি পাখি হয়ে গেল। সেই পাখিই কাঠঠোকরা বা কুটুম পাখি। তাই এ পাখি ডাকতে-ডাকতে বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে গেলে আজও গেরস্থরা ভাবে—বাড়িতে কুটুম আসবে। মেয়ের বিয়ে রাজার ঘরে দেবে কি না চিন্তা করবার সময় গেরস্থর মাথা যেমন ডানে-বাঁয়ে দুলছিল, আজও তেমনি কাঠঠোকরা কাঠ ঠোকরাবার সময় মাথা ডানে-বাঁয়ে দুলিয়ে থাকে। আজও বিশ্বাস করা হয়, পূর্ণিমার রাতেই এরা এক গাছ থেকে আর এক গাছে যায়।—শংকরনারায়ণ ঘোষ। যশোর জেলাতে চলিত।

মন্তব্য : 'কুটুম পাখী' বলতে সাধারণতঃ হাঁড়িচাঁচা, কখনো হলদে পাখি। এখানে কাঠঠোকরাকে বলা হয়েছে। আসলে একাধিক পাখির ডাকের ফলে কুটুমের আগমন হয় বলে বিশ্বাস সৃষ্ট হয়েছে। আলোচ্য কথার কাঠঠোকরার ডাক হল ক-রু-রু-রু-রু। তাই ডাকতে-ডাকতে বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়াকে যশোহরে বলে 'তুড়ুই হাঁকা'। মনে হয় 'তড়িৎ' গতিতে, 'ত্বরান্বিত' ভঙ্গিতে কুটুমের আগমন 'হেঁকে' যাওয়া।

৭৭

...পাহাড়ের এক গাঁয়ে এক জুম চাষী থাকত। তার দু'টি মেয়ে—ভারী সুন্দরী। ...ওদের দেখলে 'মাইলুমা' (বনের দেবী), 'খুলমা' (তুলোর দেবী) যেন নেমে এসেছে বলে মনে হত।...বাপ-মা'র চিন্তার শেষ নেই।.. মেয়ে দু'টিও ওদের বাবা মাকে খুব ভালোবাসে। ভালোবাসে ওদের ছোট 'গায়ারাং'টিকে (টঙ ঘরটিকে)।...

(সেদিন) মেয়েদের শুইয়ে রেখে চাষী নিশ্চিন্তে জুমে গেল।. এমনি সময়ে রাজার লোকেরাও গাঁয়ে এসে হাজির। টং ঘরের এক কোণে দুবোন বসে আছে ভয়ে জড়সড়।..বড় বোন ছোট বোনকে বলছে—ওই শোন্ আপদগুলো এসে গেছে দেখছি। কথা বলিস না, চুপ করে থাক্।..দিদি কথা বলছে দেখে ছোট বোন দিদিকে কথা বলতে নিষেধ করছে। ছোটবোন কথা বলছে, বড়বোন আবার ছোট বোনকে বারণ করছে। এভাবে এ ওকে বলতে বলতে কখন যে ওদের গলার সুর চড়ে গেছে বুঝতেই পারে নি। টংঘরের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল রাজার লোকেরা।...রাজার লোকেরা টং ঘরের ওপরে উঠে এল।..দুবোনকে ধরে অন্দরে নিয়ে গেল। দু বোনকেই দাসী করে রাখল রাজার অন্দর মহলে।

কাজ থেকে ফিরে এল চাষী আর চাষীর বউ। ঘরে ঢুকে দেখল ঘর অন্ধকার।... মেয়েদের শোকে দু'দিন বাদেই মরে গেল চাষী আর চাষীর বউ।

ওদিকে মেয়ে দু'টির মনেও সুখ নেই। রাজবাড়ীর জাঁকজমক এদের মন ভোলাতে পারল না। · দিন রাত কেঁদে কেঁদে একদিন মরেই গেল ওরা।

...দু' বোন মানুষ হল না—পাখি হয়ে জন্মাল। (আগের) জীবনে কথা বলেছিল বলে রাজার লোকেরা ওদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল ;...তাই এ জীবনে ওরা 'কথা বলো না, কথা বলো না' বলে সবাইকে ওদের অতীত জীবনের দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।—ত্রিপুরার রূপকথা (উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ, আগরতলা, ত্রিপুরা : ১৯৮০। পৃ: ৩৯-৪১)

৭৮

এক গেরস্থের একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটি তার বড়ো আদরের। মেয়েও তার বাপকে ভীষণ ভালোবাসে। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে ভিন্ গাঁয়ে। তাই বাপের বাড়িতে আসতে পারে না। মন পড়ে থাকে বাপের বাড়িতে। প্রায়ই বাপের বাড়িতে যাবার বায়না ধরে সে। শ্বশুর-শাশুড়ী বলেন,—আগে কাঁঠাল পাকুক, তারপর না হয় যেয়ো। মেয়েটি আশায় আশায় বসে থাকে, কবে কাঁঠাল পাকবে, কবে বাপের সঙ্গে দেখা হবে।

এভাবে দিন যায়। ক্রমে কাঁঠাল পাকার দিন এসে গেল, এল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। এ বছর তার বাপের বাড়ি যাওয়া হল না। তার বড়ো জা' পোয়াতী, তাকেই সংসার আগলাতে হবে, আঁতুড়ে ভাত-জল দিতে হবে। তার ওপর চাষ-আবাদের মরশুম পড়ল। ধান লাগানো, ধান কাটা, ধান তোলা, ধান শুকোনো, ধান ভানা—এসব করতে করতে বছর ঘুরে গেল। আবার কাঁঠাল পাকবার কাল। কিন্তু এবার এসময় বাড়িতে এল অতিথি। তাই শেষবার তার আর বাপের বাড়ি যাওয়া হল না।

এমনিভাবে পর-পর ক'টি কাঁঠাল পাকবার সময় পেরিয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ি যাওয়া হল না। তার মনে হল, জীবনে বুঝি আর তার বাপের বাড়ি যাওয়াই হবে না। রাতদিন এই ভাবনা ভাবতে-ভাবতে সে খুব অসুখে পড়ল। মেয়েটি বুঝতে পারল, সে আর বাঁচবে না। তখন সে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে তার ইচ্ছে সে ব্যক্ত করল : পাড়ার বউ-ঝিদের সঙ্গে একবার সে দেখা করতে চায়। শ্বশুর-শাশুড়ী অনুমতি দিলেন।

পাড়ার বউ-ঝিরা এলে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকল, এই পরিবারে বিয়ে হয়ে তার বাপকে সে চিরদিনের মতো হারিয়েছে। তার বাপও হয়তো মেয়েকে না দেখতে পেয়ে কতো যন্ত্রণাই পেয়েছে : সেই সব দুঃখ নিয়েই সে আজ জীবনত্যাগ করছে। মৃত্যুর পর সে একটি পাখি হয়ে যেখানে যতো বউ-ঝি আছে, সবাইকে

"কাঁঠাল পাকুক, কাঁঠাল পাকুক" বলে কাঁটাল পাকবার সময়টা জানিয়ে দেবে। জানিয়ে দেবে, তাদের বাপের বাড়িতে কাঁঠাল পেকে উঠেছে, এইবার তাদের বাপের বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। বলতে বলতেই তার মৃত্যু হল। আজও যেন কাঁঠাল পেকে ওঠবার সময় সেই মেয়েটিই পাখি হয়ে ডাকে: 'কাঁঠাল পাকুক, কাঁঠাল পাকুক।' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সে ডাক শুনে পাড়াগাঁয়ের সব বউ-ঝিদের মনে বাপের বাড়ি না যেতে পারার দুঃখটা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।—বিভূতি চৌধুরী (আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, রামনগর)।

মন্তব্য: পূর্ববঙ্গের একাধিক অঞ্চলে 'বউ কথা কও' পাখিকে 'কাঁঠাল পাখি', 'কাঁট্টল পাইখ', 'কাঁডাল পাগান্নী' ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। জামাই ষষ্ঠীতে জামাইকে কাঁঠাল খেতে দিতেই হয়। এ সময়ে মাবাপের বাড়িতে অর্থাৎ বালক-বালিকারা মামার বাড়ি যায়। এই সব স্মরণ করেই পূর্ববঙ্গের একটি ছড়াতে বলা হয়:

শুনছ মাগো কাঁঠাল পেকেছে—
দেখছ না গো, বাবা আসবে
নিয়ে যাবে—কাঁঠাল খাবো ॥

এই রীতির সঙ্গে পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের সধবাদের মধ্যে প্রচলিত একটি রীতির বিশেষ মিল দেখা যায়। ভাদ্র মাসে যে ভাদু উৎসব পালিত হয়, তখন সধবাদের পিত্রালয়ে আসা একটি আবশ্যিক কর্ম।

চট্টগ্রামে বিশ্বাস আছে, এ পাখি কেবল রাতেই ডাকে। উত্তর ও মধ্যভারতে এবং হিমালয়ের পাদদেশে এ পাখি খুব দেখা যায়। বাঙলা দেশের 'কাঁঠাল পাকুক'-এর মতো চুম্বী উপত্যকার আহেল বাসিন্দারা বলে 'কুপুল পক্কি'। মুসৌরিতে বলা হয় 'কাফল পাকেকা'। 'কাফল' হল একধরনের ছোটো, লাল, ঈষৎ অম্ল অথচ মধুর স্বাদের ফল। ওই অঞ্চলের লোকদের বিশ্বাস, এ পাখি ডাকে বলেই বছরের ওই সময়ে 'কাফল' পেকে ওঠে, বাঙলাদেশে যেমন বিশ্বাস—এ পাখি ডাকে বলেই কাঁঠাল পেকে ওঠে। কারো মতে, পাকা কাঁঠালের যেমন ঈষৎ হলুদাভ রঙ হয়, পাখিটির গায়ের রঙও তেমনি, তাই এই নাম।

ভারতে আগত ইউরোপীয়ানরা এ পাখির নাম দিয়েছিল, 'Mango bird', কারণ এ পাখির ডাকের সময়েই আম পাকে। সম্ভবত তারা কাঁঠাল খেয়ে দেখেনি, তাই আমের সঙ্গে এ পাখিকে যুক্ত করেছে।

দ্রঃ ৭২-সংখ্যক কথা ও কথান্তর।

৭৯

হিরণ্যকশিপু ছিলেন দৈত্যরাজ। ব্রহ্মা এঁকে একটি বর দিয়েছিলেন : সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো প্রাণী তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। হিরণ্যকশিপু তাঁর দৈত্য-বলে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল জয় করে নেন। তারপর সকলের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। অন্যদিকে তিনি ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুর শত্রু হয়ে ওঠেন।

হিরণ্যকশিপুর মন্ত্রীর নাম কয়াধু, পুত্র প্রহ্লাদ, সংহলাদ আর অনুহলাদ। পুত্র প্রহলাদ পরম ভক্ত, ওই পিতৃশত্রু বিষ্ণুরই ভক্ত। এজন্যে পুত্র প্রহলাদের প্রতি হিরণ্যকশিপু একের পর এক অত্যাচার করে চলেছেন। প্রহলাদকে একবার বিশেষভাবে পীড়ন করতে উদ্যত হলে ভক্ত প্রহলাদের আকুল প্রার্থনায় বিষ্ণু স্তম্ভভেদ করে নরসিংহ রূপ ধরে আবির্ভূত হলেন। হিরণ্যকশিপু নৃসিংহরূপী বিষ্ণুকে দেখে ভীষণ ভয় পেলেন। ভয়ে তিনি হয়ে গেলেন একটি পাখি। এই পাখিকে বলে 'নৃসিংহ' পাখি। এখনও এ পাখি ''কড়াৎ-কড়াৎ, কড়্-কড়্ কড়াৎ'' এই বলে ডাকে। নৃসিংহের আবির্ভাবে যেমন হিরণ্যকশিপুর পরম বিপদ ঘটেছিল, হিরণ্যকশিপুরূপী এই নৃসিংহ পাখির ডাকে তেমনি নানা অনর্থপাতের সূচনা করে।—সৌদামিনী দেবী (যশোহর : বায়না, শত্রুজিৎপুর)।

মন্তব্য ১ : শ্রীমদ্ভাগবতের বহুশ্রুত কাহিনীর ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছে এখানে। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, কিন্তু আলোচ্য 'কথা'-য় হিরণ্যকশিপু ভয়ে পক্ষিরূপ ধারণ করে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। নিহত হবার পর হিরণ্যকশিপু পক্ষিরূপ ধারণ করে কিংবা জীবিতাবস্থাতেই, আলোচ্য কথার কথয়িত্রী আমার সে প্রশ্নের জবাব দেন নি।

মন্তব্য ২ : বিষ্ণুর মহিমা প্রচার করবার জন্যে পাখিটির নামকরণে বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে : হিরণ্যকশিপু পাখি হয়ে 'নৃসিংহ' নাম পেয়েছেন : যেন বিষ্ণু-দ্বারা অবদমিত হয়ে হিরণ্যকশিপু নিজেই 'নৃসিংহ' হয়ে গেলেন! লোকমনস্তত্ত্বের একটি চমৎকার বিশেষত্ব এখানে মেলে।

'নৃসিংহ' পাখি আকারে ক্ষুদ্র, নিশাচর। বহুদিন পর-পর (কথয়িত্রীর মতে দশ-পনেরো বছর পর-পর ; চীনে যেমন বিশ্বাস আছে, দেশের পরম সমৃদ্ধির সময়, পাঁচশ' বছর পরপর ফিনিক্স [ফেং হুয়াং] পাখির আবির্ভাব হয়) গভীর রাতে কোনো উঁচু গাছের আগডালে (সাধারণত তেঁতুল গাছে), এসে বসে। তারপর "কড়াৎ কড়াৎ, কড়্ কড়্ কড়াৎ" করে ডাকে! সে ডাকের এমনই বিশেষত্ব যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভয় পায়। এ পাখির আগমন ও ডাক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক ধ্বংসের সূচনা করে বলে বিশ্বাস।

মন্তব্য ঃ কথাটিতে পাখির রূপ ধারণের পশ্চাতে এই Motif আছে : জীবিতাবস্থায়, ভীত হয়ে পাখি হওয়া। দ্রঃ ৮২-সংখ্যক কথা। সেখানে আছে : ভয় এবং তজ্জনিত লুকোনো।

৮০

মহারাজ দশরথের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, রামচন্দ্র অনুপস্থিত। দশরথের প্রেতাত্মা সীতার কাছে পিণ্ড চাইল। সেই সময় তুলসী, শিমুল, ব্রাহ্মণ, প্রদীপ, বটগাছ, ফল্গু নদী এবং শঙ্কর চিলকে সাক্ষী রেখে তিনি পিণ্ডদান করলেন। পরে রামচন্দ্র ফিরে এলে, সীতা জানালেন, তিনি দশরথের প্রেতাত্মাকে পিণ্ডদান করেছেন। কিন্তু কেউ সীতার এই কথার প্রমাণ হিসেবে সাক্ষ্য দিল না। সীতা এদের সকলকে অভিশাপ দিলেন। ফলে, প্রদীপ নিবলে গন্ধ বের হয়, শিমুল ফুলের গন্ধ নেই, ফল্গু বালুকাস্তরা ঢাকা, বটের ফল অখাদ্য, ব্রাহ্মণ লক্ষ টাকার ভিখিরি, তুলসীমূলে শেয়াল-কুকুর প্রস্রাব করে। এবং সীতার অভিশাপেই শঙ্কর চিল কদর্য বস্তু খায়।—রামরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর, ঘাটাল, খুকুড়দহ)। প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতেই চলিত।

মন্তব্য ঃ এই পৌরাণিক কথাটির Motif 'অভিশাপ', কাজেই এটি বর্তমান সংকলনের 'অভিশাপ' গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।

৮১

"আপাত দৃষ্টিতে কাকের দুইটি চক্ষু দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার মাত্র একটি চোখের মণি। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত জনপ্রবাদ সুপ্রাচীনকাল হইতে মালাবারে প্রচলিত। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ অনুজ লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাদেবী সহ চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। দণ্ডকারণ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া তাঁহারা তথায় বসবাস করিতে থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র বন্য জন্তু শিকার করিয়া আনিতেন।…মাংস যাহাতে পচিয়া না যায় তজ্জন্য রৌদ্রতপ্ত করা হইত। মাংসের লোভে কাকের দল তথায় ভিড় জমাইত। একদিন সীতাদেবীর রক্ত-কমল সদৃশ পদ-পল্লবকে মাংসখণ্ড মনে করিয়া কাক কঠিন চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র শরাঘাতে কাকের একটি চোখের মণি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া বর দেন, প্রয়োজনানুসারে কাক একচক্ষু হইতে অপর চক্ষুতে অক্ষত মণিটি সঞ্চালিত করিতে পারিবে।"—মালাবারে লৌকিক সংস্কার : ননীগোপাল চক্রবর্তী। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৮, পৃঃ ৪২৮-৪৩১।

মন্তব্য : প্রকৃতপক্ষে রামায়ণোক্ত এই কাহিনী সারা ভারতবর্ষেই প্রচলিত আছে, বাঙলা দেশেও আছে। তবে অঞ্চল ভেদে আঞ্চলিক রূপগুলিতে ঈষৎ পরিবর্তন দেখা যায়।

কথান্তর ১ : বাঙলাদেশ এবং ভারতের অনেক অঞ্চলে এই 'কথা'র যে কথান্তর মেলে তাতে দেখা যায়, সীতাদেবীর স্তনদ্বয়কে এক জোড়া ডালিম মনে করে কাক ঠোঁট দিয়ে আঘাত করেছিল। ডালিম ছাড়া অন্যের ফলেরও নাম শোনা যায়।

কথান্তর ২ : সীতাদেবীর স্তন কাক ঠুকরে দেওয়াতে সীতাই কাককে অভিশাপ দেন যে, কাক যেন এক চোখে দেখতে না পায়। এই অভিশাপেই কাক আজও বাঁ চোখে দেখতে পায় না।—রামরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর, ঘাটাল, খুকুড়দহ)।

কথান্তর ৩ : নরসিংহ পুরাণেও এ 'কথা'টি আছে। দণ্ডকারণ্যে যখন রাম-সীতা দিন যাপন করছিলেন, তখন একদিন সীতা গাছতলাতে ঘুমুচ্ছিলেন, রামচন্দ্র তীর-ধনুক হাতে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেই সময় গাছ থেকে একটি কাক নেমে এসে সীতার স্তন ঠোকরাতে থাকলে রামচন্দ্র তীর মেরে কাকের এক চোখ কানা করে দেন। কাক সীতাকে এখানে মৃতদেহ মনে করে থাকতে পারে।

কথান্তর ৪ : ওড়িয়া রামায়ণে আছে : একটি পাকা ফল ভেবেই কাক সীতার স্তন ঠুকরে দেয়। রামচন্দ্র তীর-ধনুক দিয়ে কাককে হত্যা করতে উদ্যত হলে সীতার অনুরোধে তিনি ক্ষান্ত হন। সীতাই কাককে অভিশাপ দিয়ে একচক্ষু করে দেন।

দ্র : কথান্তর—১।

কথান্তর ৫ : বনবাস কালে একদিন সীতার কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম করছিলেন রামচন্দ্র, তখন কাকাসুর একটি কাকের রূপ ধরে এসে সীতার স্তন ঠুকরে দিলে রামচন্দ্র বাণবিদ্ধ করে কাকাসুরকে একচক্ষুতে পরিণত করেন।

মন্তব্য : অপরাধজনিত অভিশাপ এবং অভিশাপের তীব্রতা হ্রাস এ কথাটির Motif।

৮২

"লঙ্কার রাজা রাবণ এমন পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁর ভয়ে দেবতারা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন; তাঁর হুকুমে সূর্য প্রচণ্ড তাপ দিতে পারিতেন না, চন্দ্র প্রতিরাতেই পূর্ণিমার মতন সম্পূর্ণ উদয় হইতে বাধ্য হইতেন, বায়ু মৃদু ও শীতল হইয়া বহিতেন; যমরাজ—যাঁর ভয়ে সকল প্রাণী আকুল—তাঁকে পর্যন্ত বারণবাজা বন্দ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, যমরাজকে রাবণের ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটিতে হইত। ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ, তিনি রাবণের হাতে অপমানের ভয়ে সদাই চিন্তিত হইয়া গা-ঢাকা দিয়া থাকিতেন।"

"এমন সময় রাজা মরুত্ত যজ্ঞ করেন। দেবতারা সেই যজ্ঞে পূজা লইতে উপস্থিত হইয়াছেন। হঠাৎ সেই যজ্ঞস্থলে রাবণ আসিয়া উপস্থিত। দেবতারা যে পূজা লইতে আসিয়াছিলেন তার জন্য রাবণের ভয়ে সকলে যে যেখানে পাইলেন লুকাইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র লুকাইবার জায়গা না পাইয়া ময়ূরের পুচ্ছের আড়ালে গিয়া গা-ঢাকা হইয়া রইলেন।"

"রাবণ চলিয়া গেলে ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন,—তুমি আমায় বিপদকালে আশ্রয় দিয়া বন্ধুর কাজ করিয়াছ। আমার বরে তোমার পুচ্ছ আমার শরীরের ন্যায় সহস্রলোচন হইবে।"

"সেই থেকে ময়ূরের পুচ্ছ চন্দ্রকশোভা সহস্রচক্ষুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া আসিতেছে।"—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৮, পৃ. ৪০৭।

মন্তব্য : ময়ূরপুচ্ছের 'সহস্রলোচন' সম্পর্কে ভারতে ও গ্রীসে নানা 'কথা' প্রচলিত আছে।

আলোচ্য 'কথা'টির Motif : সাহায্য-জনিত আশীর্বাদ। তুলনীয় ৭৯-সংখ্যক কথা।

৮৩

রাজা কংস ছিলেন মথুরার রাজা। ইনি কৃষ্ণের মাতুল বটে, তবে শত্রুও ছিলেন। কংসের বাপের নাম উগ্রসেন আর শ্বশুরের নাম জরাসন্ধ। কংসের বোনের নাম দেবকী, আর দেবকী হলেন কৃষ্ণের মা। কংস একবার দৈববাণী শুনতে পেলেন, দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত পুত্র তাঁর প্রাণনাশ করবে। এই কথা শুনে কংস বসুদেব আর দেবকীকে কারারুদ্ধ করেন। দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণকে জন্মমাত্রই গোকুলে নন্দের ঘরে রেখে নন্দ-যশোদার কন্যাকে দেবকীর কাছে এনে রাখা হয়। পরদিন যশোদার কন্যাকে পাথরের ওপর আছড়ে কংস যেই মারতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি সেই শিশু-কন্যাটি একটি চিল হয়ে উড়ে যায়। যাবার সময় বলে যায় : তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

এই জন্যেই এই চিলকে 'চণ্ডীচিল' বলা হয়! দেখলেই লোকে দুর্গা মনে করে উদ্দেশে প্রণাম করে। অনেকে একে চণ্ডীর বার্তাবহ বলে মনে করেন।—রামরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর, ঘাটাল, খুকুড়দহ)।

মন্তব্য : এই 'কথা'টি বাঙলাদেশের সর্বত্র তো বটেই ভারতেরও বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত আছে।

কথাটির Motif : অন্য রূপ ধরে পলায়ন ও ভবিষ্যদ্বাণী।

৮৪

মুরগী ছিল কংসের অনুচর। কংসই মুরগীর দেখাশোনা করত, মুরগী তার প্রিয়পাত্র ছিল। কংস ছিল অত্যাচারী রাজা, কাজেই তাঁর ছিল অনেক শত্রু। তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করবার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। স্থির হলো, সূর্যোদয়ের ক্ষণে, ব্রাহ্মমুহূর্তে কংসকে হত্যা করা হবে। এদিকে কংসের প্রিয় অনুচর মুরগী কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা টের পেয়েছে। সে জানত, তার প্রভু কংসের মৃত্যু হলে কেউ তাকে দেখবে না। ষড়যন্ত্রকারীরা ব্রাহ্ম মুহূর্তে যেই কংসকে হত্যা করতে আসবে তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায়, অমনি মুরগী এই বলে ডেকে উঠে তাকে সাবধান করে দিলেঃ 'কংস রে, সারু সারু' (কংস রে, সরে যা, সরে যা)। মুরগীর সে ডাকে কংস সে যাত্রা বেঁচে যায়। আজও প্রভুকে চেতন করাবার জন্যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মুরগী ওই বলেই ডাকে।—ললিতকুমার বর্মণ (দিনাজপুর, বোদাথানা, সাকোয়াডাঙ্গা পাড়া)।

কথান্তর ১ঃ পূর্ববঙ্গে বলা হয়ঃ 'কংস রে, ওঠ্, ওঠ্'।

মন্তব্য ১ঃ মুরগীর ডাকের অনুরূপ বাক্যাবলী নানা অঞ্চলে শোনা যায়। যেমন, জলপাইগুড়ি-দিনাজপুরেঃ কুক্কুরুক্ কুরুক্, আতি পোহাইলু রে তুরুক, চ্যাট্ খা' রে তুরুক। পশ্চিমবঙ্গেঃ 'কোঁ-কোঁ-কোঁরু-কোঁক্ঃ অর্থাৎ 'যক্ষ্মকাশ হোক।
—নিতাই দাস (হাওড়া, উলুবেড়িয়া, গদাইপুর)।

মন্তব্য ২ঃ মুরগীর দেব-আসঙ্গ সম্পর্কেঃ পূর্বে মুরগী স্বর্গের অধিবাসী ছিল। মুনি ঋষিদের সে প্রহর ঘোষণা করে উপকার করত। কিন্তু একদিন মুরগী কর্তব্যে অবহেলা করে, সেজন্যে সে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। এখানে পাখি থেকে মানুষে রূপান্তরিত হবার দৃষ্টান্ত লক্ষ করি। দ্রঃ ৮৭-সংখ্যক কথার মন্তব্য-৫।

মন্তব্য ৩ঃ তেমনি গাছ থেকেও মুরগীতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়ঃ দক্ষিণ বিহারের গঙ্গা জেলার আহেল বাসিন্দা 'কাহার'দের মধ্যে চলিত 'কথা' এইঃ গঙ্গা জেলার উত্তর প্রান্তে গিরিয়াক নামক স্থানে একটি মীনার তৈরি করেন রাজা জরাসন্ধ। এটি এখনও "জরাসন্ধের বৈঠক" নামে পরিচিত। এর কাছেই ছিল একটি উদ্যান। রাজা জরাসন্ধ ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি এক রাত্রির মধ্যে গঙ্গা থেকে খাল কেটে জলধারা এনে উদ্যানটিকে রক্ষা করতে পারবে, তিনি তারই সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। সঙ্গে দেবেন অর্ধেক রাজত্ব। কাহাদের এক প্রধান এই কাজে ব্রতী হল। এক রাত্রির মধ্যেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল, রাজা জরাসন্ধ বিপদে পড়লেন। শর্ত অনুযায়ী একজন তুচ্ছ কাহারের হাতেই এবার তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে হবে! তখন একটি অশ্বত্থগাছ তাঁকে বাঁচাল। গাছটি একটি মুরগীতে রূপান্তরিত হয়ে ডেকে উঠল, যেন সকাল হয়ে গেছে।—L. S. S. O' Mally : Gazetteer of the Ganga district (Calcutta : The Bengal Secretariat book depot, 1906), P. 94.

মন্তব্য ৪ : 'কালিকাপুরাণে' এই কাহিনী কাক সম্পর্কে কথিত হয়েছে। দেবী কালিকাকে রাজা নরক বিয়ে করতে চাইলে দেবী শর্ত আরোপ করেন : এক রাত্রির মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সানুদেশ পর্যন্ত পাথরের সিঁড়ি তৈরি করে দিতে হবে। কথা মতো কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন কাকেরা ডেকে উঠে সকাল ঘোষণা করে দিলে। দেবীর মান বাঁচল।

মন্তব্য ৫ : প্রায় এই ধরণের কথা বীরভূম জেলার মল্লারপুরে প্রচলিত আছে। সেখানে শর্ত ছিল : এক রাতের মধ্যে খাল কেটে দিতে হবে। কাক অকস্মাৎ প্রভাত ঘোষণা করে।—ডঃ মানস মজুমদার (মল্লারপুর, বীরভূম)।

Motif : কর্তব্যবোধ, প্রভুকে সতর্ক করা, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া। কথান্তর-গুলির Motif : শর্তভঙ্গ, মান বাঁচাবার জন্যে অকালে প্রভাত ঘোষণা, কর্তব্যে অবহেলার জন্য অভিশাপ, বিবাহ।

৮৫

নদীর ধারে, গর্তের ভেতর সারো (শালিক) বাচ্চা দিয়েছিল। দিনে দিনে সে বাচ্চা বড়ো হতে লাগল। এখন যেমন সারো-র গলার চারদিকে পোড়া কালো দাগ থাকে, তখন তেমন ছিল না। তখন সারো-র গোটা গা'টাই ছিল গাঢ় খয়েরি রঙের। সারোর সেই বাচ্চাদের দেখে গোখরো সাপের ভারি খাবার ইচ্ছে হল। গোখরো সাপকে শ্রীকৃষ্ণ আগেই দমন করেছিলেন। কাজেই কৃষ্ণের কাছে সে তেজ দেখাতে পারত না। তা ছাড়া কৃষ্ণের গোরুর খুরের কালো দাগ গোখরের মাথায় এখনও আছে। একদিন মা-সারো যেই গেছে খাবার খুঁজতে, গোখরো ভাবল, যাই ওর বাচ্চাগুলো খেয়ে আসি। কিন্তু কৃষ্ণঠাকুর জানতেন, গোখরোর মতলব কী। সারো-র বাচ্চাদের তিনি পাহারা দিতেন। হলে হবে কী, ঠাকুর যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন, গোখরো অমনি গিয়ে সেই বাচ্চাদের 'ফাঁও' (ছোবল) দিল। সাপের ফণায় তো আগুন আছে, সেই আগুনে সারো-র বাচ্চাদের কাঁধ-গলা পুড়ে কালো হয়ে গেল। এদিকে ফণা তুলে ছোবল দেওয়া মাত্রই ঠাকুরের চেতনা এল। তিনি তৎক্ষণাৎ গোখরোকে নিষেধ করলেন এবং পাখিদের বাঁচালেন। গোখরো ফণাতে সারোদের কাঁধ-গলা পুড়ে কালো হয়ে গেছে বলে প্রান্ত উত্তরবঙ্গে এখনো শালিকদের বলা হয় 'পড়া সারো', অর্থাৎ 'পোড়া সারো'।

—বিজয় ফকির। পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি।

মন্তব্য : কৃষ্ণের সঙ্গে একাধিক পাখির সংযোগ লক্ষ করা যায়। চণ্ডীচিল (সং ৮৩), মুরগী (সং ৮৪), শালিক (সং ৮৫), হলদে পাখি (সাং ৮৬), কাক (সং ৮৭), খঞ্জন (সং ৮৮)। এর মধ্যে খঞ্জন ও হলদে পাখির সঙ্গে তাঁর বিরূপতার সম্পর্ক।

৮৬

হলদে পাখি পূর্বজন্মে ছিল এক কুমারী। সে কৃষ্ণের প্রেমে পড়েছিল। কৃষ্ণও তার প্রেমে মজে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। যথারীতি বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। দিন-ক্ষণ-লগ্ন সবই স্থির। বিয়ের জন্যে খুব ঘটা করে কুমারীর গায়ে হলুদ হল। কিন্তু কী সর্বনাশ, কৃষ্ণ মত পরিবর্তন করলেন। গেল সেই বিয়ে ভেঙে। কোনো দিনই আর সে বিয়ে হল না। দুঃখে কন্যে হয়ে গেল হলুদ রঙের একটি পাখি—গায়ে হলুদ হয়েছিল কি না, তাই। কন্যে কিন্তু প্রেমিক কৃষ্ণকে ক্ষমা করতে পারল না। সব চেয়ে বড়ো অভিশাপ: মরণের পর নরকের কীট হওয়া। কন্যে কৃষ্ণকে সেই অভিশাপ দিতে থাকল তার সারা জীবনে। তখন সে তার নিজের ডাক ভুলে গিয়ে কেবলই বলতে থাকল: "কৃষ্ণ পোকা হোক, কৃষ্ণ পোকা হোক!"—বেণুপদ ঘোষ। বীরভূমের উত্তরাঞ্চলে চলিত।

মন্তব্য: হলদে পাখির অপর ডাক 'গেরস্থের খোকা হোক' আর 'কৃষ্ণ পোকা হোক'—একই। কৃষ্ণের পীত ধড়া আর হলদে পাখির হলদে রঙ বেশ মিলে যায়। কোথাও কোথাও এ পাখির ডাক হল: 'কৃষ্ণ গোকুলে',—সেটাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

দ্রঃ ৪৯-সংখ্যক কথা। Motif হিসেবে পাই: বিয়ে, শর্ত ভঙ্গ, অভিশাপ।

৮৭

যমুনার এক পারে মথুরা, আর পারে বৃন্দাবন। অক্রূর এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা পরম বিরহে দিনপাত করতে থাকলেন। বিরহে তাঁর দিন আর কাটতে চায় না। এদিকে অনেক দিন শ্যামের কোনো সংবাদ নেই। শ্রীরাধার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কী করেন, কী করেন। সংবাদ এনে দেবার কেউ নেই। অষ্টপ্রহর নয়ন ঝুরে। শেষে শ্রীরাধা তাঁর নয়নের কাজল দিয়ে তৈরি করলেন এক কাক। সেই কাক তাঁর বেদনার দূতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ নিয়ে এল।

শ্রীরাধার নয়ন-কাজল থেকেই এমনি ভাবে ধরায় কাকের সৃষ্টি হল। কাকের দেহবর্ণ তাই কাজলের মতো কালো। শ্রীরাধার দূতীগিরি করবার জন্যেই কাকের সৃষ্টি হয়েছিল বলে আজও কাক মানুষকে শুভাশুভ নানা সংবাদ এনে দেয়।—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি (২৪ পরগণা, পূর্ববয়ার সিং)। কাঁথি (মেদিনীপুর) অঞ্চলেও চলিত।

মন্তব্য ১: কাকের রঙ কেন কালো, সে বিষয়ে একটি ব্যাখ্যাত্মক 'কথা' আসামের সেমা নাগাদের মধ্যে চলিত আছে: গিরগিটি ও টুনটুনির রেষারেষিতে পাখি আর সরীসৃপদের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ বাধল; যুদ্ধের এক স্তরে ঈগলের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে শংখচূড় ঈগলের হাতে নিহত হল। নিহত শংখচূড়ের মাংস বিজয়ী পাখির দল সবাই ভাগ করে খেল। কাক শংখচূড়ের পিত্তটা খেয়েছিল, তাই তার রঙ হল কালো।—J. H. Hutton : The Sema-Nagas (Macmillan and Co., Ltd, London, 1921), PP. 312-313.

মন্তব্য ২ : আও-নাগাদের মধ্যে চলিত 'কথা' এই : সৃষ্টির আদি যুগে সব পাখিদের রঙই এক ছিল। তারপর একদিন পাখিদের রাজা দীর্ঘচঞ্চু এক রাজ ধনেশ সব পাখিদের এক এক রঙের জলে ডুবিয়ে এক এক রঙের করে দিলো। কাকের ছিল ভারী সুন্দর রঙ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, হঠাৎ সে পড়ে যায় কালো রঙের পাত্রে, তারপর থেকেই সে হয়ে গেছে কালো—J. P. Mills : The Ao-Nagas (Macmillan and Co. Ltd. London, 1926), P. 313. দ্রঃ ১-সংখ্যক কথা।

মন্তব্য ৩ : সেমানাগা ও আওনাগাদের 'কথা' দুটিতে কাক পূর্বে কাকই ছিল; পরে তার রঙ পরিবর্তিত হয়। উত্তর আফ্রিকার মরক্কো অঞ্চলের মুসলমানেরা কাকের রঙ কালো হওয়া সম্পর্কে যে 'কথা' উদ্ভাবন করেছে, তাতে কাক প্রথমে মানুষ ছিল : এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির কিছু জিনিস-পত্র গচ্ছিত ছিল। সেই ব্যক্তি যখন তার গচ্ছিত দ্রব্যাদি ফেরত চাইল, তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করল। তার এই অন্যায় কর্ম ও অপরাধে সে একটি কালো রঙের কাকে পরিণত হল, কারণ, পাপের রঙ কালো।—E. Watermarack : Ritual and belief in Morocco (Macmillan and Co., Ltd, London, 1926), Vol II, PP. 331-333.

মন্তব্য ৪ : ছোটোনাগপুরের মুণ্ডারীদের মধ্যে চলিত 'কথা' : মানুষেরা আগে স্বর্গেই থাকত, সেখানে থেকেই সিং বোঙ্গার সেবা করত। একদিন আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে সিং বোঙ্গার চেহারার সঙ্গে নিজেদের সাদৃশ্য লক্ষ করে আর তাঁর সেবা করতে চাইল না। সেই অপরাধে সিং বোঙ্গা মানুষকে স্বর্গ থেকে লাথি মেরে দূর করে দিলেন। যে জায়গায় মানুষেরা এসে পড়ল সে জায়গায় অনেক আকরিক লৌহ পেয়ে তা গালাতে লাগল। দিনরাত চুল্লী জ্বলতে থাকায় সবকিছু গেল পুড়ে। তাদের সেই আগুন নেভাতে তিনি কাককে প্রেরণ করলেন। কাকেরা তখন সাদা ছিল, সেই আগুনে পুড়েই তারা কালো হয়ে গেছে।…—E. T. Dalton : Descriptive ethnology of Bengal (Reprinted : June, 1960), P. 185.

মন্তব্য ৫ : হেলেনীয় পুরাণে দেব-দৈত্যের যুদ্ধে দেবতা অ্যাপোলো কাকের মূর্তি ধরে ছিলেন। অ্যাপোলো সূর্যের দেবতা, সূর্য অন্ধকারের বিপরীত, অর্থাৎ, শুভ্র, এবং গ্রীকরা সূর্যের উদ্দেশে শ্বেত কাকই নিবেদন করত, অতএব মনে হয়, অ্যাপোলো শ্বেত কাকের মূর্তিই ধারণ ধরেছিলেন। ওই পুরাণ অনুসারে কাকেরা পূর্বে সাদাই ছিল, কিন্তু একবার ভুল সংবাদ দেবার অপরাধে অ্যাপোলো অভিশাপ দিয়ে কাকদের কালো করে দেন। দ্রঃ ৮৪-সংখ্যক কথার মন্তব্য ২।

৮৮

মহাপ্রভু নীলাচলে যাচ্ছেন। মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে তিনি উড়িষ্যার পথ ধরেছেন। ভাবের ঘোরে দু বাহু তুলে নাচতে নাচতে তিনি যাচ্ছেন। এমন সময় এক ছোঁড়া তাঁকে ব্যঙ্গ করে অমন করে নাচতে লাগল। এই অশোভন কাজের জন্যে দেবতা বালকটিকে অভিশাপ দিলেন। অভিশাপ দিয়ে কি করলেন? করে দিলেন খঞ্জন পাখি। সেই বালকটি খঞ্জন হয়ে আজও অবিরাম নেচে চলেছে। খঞ্জনের ল্যাজ নাড়ানো কোনো সময়েতেই তাই থামে না। মেদিনীপুরে তাই এই পাখিকে বলে 'নোটো' পাখি, যে 'নটুয়া'র মতো নেচেই চলেছে।—শংকর নারায়ণ ঘোষ।

Motif : অপরাধজনিত অভিশাপ। দ্রঃ ৩-সংখ্যক কথা ও কথান্তরসমূহ।

॥ বিচিত্র ॥

৮৯

হাটের দিন। সেদিন খুব রোদ উঠেছে। হাটের পথে সবাই গাছ তলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে, রোদে পথ চলা যাচ্ছে না। গাছ-তলায় বসে জিরোচ্ছে এক বরাগী (বৈরাগী, বৈষ্ণব), এক মৌলভী, আর এক তরকারিওয়ালা। তরকারীওয়ালা হাটে হাটে যাচ্ছে 'মরিচ' (লংকা), পেঁয়াজ এবং আদা বেচতে।

পথের ধারেই ঝোপজঙ্গল। হঠাৎ সেখানে থেকে 'শ্যাতফরিত' ('শ্বেতপত্র' পাখি) পাখি এই বলে ডেকে উঠল: 'চিত্‌ফ্যাদেরেত্‌, চিত্‌ফ্যাদেরেত!' বৈষ্ণবটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল্—পাখি বলছে: আম-লক্ষণ-জশরথ' (রাম-লক্ষ্মণ-দশরথ)। মৌলভী বলল, পাখি বলছে: 'আল্লা-নবীন হজরত' (আল্লা-নবী-হজরত)। আর তরকারিওয়ালা বলল, না, না, পাখি বলছে: 'মইচ-পিয়াঁজ-অদরথ' (মরিচ-পেঁয়াজ-আদ্রক)।—ললিতকুমার বর্মণ (দিনাজপুর, বোদা থানা, সাকোয়া ভাঙ্গাপাড়া)।

মন্তব্য: পাখির কণ্ঠস্বরকে অবলম্বন করে মানুষ তার মনের মতো ভাষা আরোপ করে থাকে। এ তারই নিদর্শন।

৯০

এক জ্যাঠা আর তার ভাই-পো। তারা কাঠুরে। বনের কাঠ কেটে দিন চালায়। একদিন তারা দু'জনে গেছে গভীর বনে কাঠ কাটতে। অনেক খুঁজে একটি গাছ পাওয়া গেল। খুব ওপরের দিকে দু-একটি মরা ডাল আছে। জ্যাঠা তাই ভেঙে আনবার জন্যে গাছের ওপরে উঠলে। ভাই-পো রইল গাছের তলাতে। জ্যাঠা গাছে উঠতে

উঠতে অনেক ওপরে উঠলো ; ঘন পাতারআবরণে তাকে আর নীচের থেকে দেখা গেল না। জ্যাঠা উঠতে-উঠতে, ওপরের দিকে একটি কাণ্ডের মধ্যে দেখতে পেল একটি বড়ো কোটর। কৌতূহলী হয়ে সে তাতে ঢুকে পড়ল। তারপর সেই কোটর ধরে সে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল। নীচে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, শেষ আর হয় না। এখন, সেই কোটরের পথটা চলতে চলতে শেষে গিয়ে ঠেকেছে পাতালে। 'জ্যাঠা চলতে চলতে শেষে পাতালে গিয়ে পেঁছিল। তার আর ওপরে আসা হল না। এদিকে তার ফিরতে দেরী হচ্ছে। মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাইপো বলতে লাগল : জ্যাঠো গে, ফির্, ফির্, ফির্, ফির্।' এমনি করে বলতে বলতে সে হয়ে গেল একটি 'কুর্য়া' (কুরর) পাখি ! আজও কুর্য়া জ্যাঠাকে ফিরে আসবার জন্যে ডেকে থাকে : 'জ্যাঠো গে, ফির্ ফির্।'—সুরেন্দ্রনাথ রায় (জলপাইগুড়ি, ধাপগঞ্জ, গড়ালবাড়ী)।

মন্তব্য ১ : সুরেন্দ্রনাথ রায়ের মতে. কুররের এই ডাক ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে শোনা যায়। শ্রীমতী পুষ্পণী আড়ীর (জলপাইগুড়ি, টুপামারী) মতে এ পাখি 'কুর্য়া' নয়। ছোটো এক ধরনের পাখি। তাঁর মতে পৌষ মাসের ৭ই বা ৯ই আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এই ডাক ডাকতে-ডাকতে এ পাখি চলে যায়।

মন্তব্য ২ : পৃথিবীর বহু লোককথাতেই এই ভাবে কোনো গর্ত (যেমন,কুয়ো, গাছের শেকড়ের গর্ত) দিয়ে পড়ে গিয়ে ভিন্ন এক জগতে চলে যাবার কথা দেখা যায়। গ্রীমভাইদের 'মাদার হোলে' এই রকম একটি লোককথা।

কথান্তর : জ্যাঠো নিজেই কৌতূহল বশত কোটরে না ঢুকে, হঠাৎ করে তাতে পড়ে যায়।

Motif : হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া, অন্য জগতে চলে যাওয়া, এবং তাকে অন্বেষণ করা।

৯১

এক কুলবধূ ছিল কুলটা, দুশ্চারিণী। সে এক পরপুরুষকে দেহদান করেছিল, গ্রাম থেকে বহুদূরে, গভীর অরণ্যের মধ্যে। সে ভেবেছিল, এই পাপময় দৃশ্য কেউ দেখে নি, কেউ এর খবরও জানতে পারবে না কোনো দিন। কিন্তু গাছের ডালে বসে এক পাখি এই পাপময় দৃশ্য দেখেছিল। এই দৃশ্য দেখেই নাকি তার চোখ জ্বলতে থাকে, সে তখন থেকে সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের কথা বলতে থাকে এই ডাক ডেকে : 'পাপ দেহ', 'পাপ দেহ'। এই পাখিই 'চোখ গেল' পাখি।—রেণুপদ ঘোষ। বর্ধমান অঞ্চলে চলিত। সেখানে পাখিটির নামও 'পাপদেহ পাখি'।

মন্তব্য : 'চোখ গেল' পাখির এই ডাকের আর একটি ব্যাখ্যা মিলেছে ফণীন্দ্রনাথ দাশের (মহিষ রেখা, কুলগাছিয়া, হাওড়া) কাছে। এ পাখি কোনো অনাচার ও

ব্যভিচার চোখে দেখতে পারে না, দেখলেই সে যন্ত্রণায় এই বলে ডেকে ওঠে। 'পাপদেহ' পাখির সঙ্গে জড়িত পাপাচারের কাহিনী এবং 'চোখ গেল' এই ব্যাখ্যা বেশ মিলে যায়। দ্রঃ ৬৯-সংখ্যক কথার ২-সংখ্যক মন্তব্য।

৯২

একবার বাদুড়ের খুব অসুখ হয়। কাক তখন ছিল বৈদ্য। কাক অনেক ওষুধ-পত্র দিয়ে বাদুড়কে সারায়। কাক তখন বাদুড়ের কাছে তার পারিশ্রমিক চায়। পারিশ্রমিক কি, না বাদুড়ের দেহের খানিকটা মাংস। বাদুড় সে মাংস দেয় নি। তাই কাকের ভয়ে আজও সে দিনের বেলা বের হয় না। বের হলেই কাক ঠুকরে তার গায়ের মাংস তুলে নেবে!—শ্যামল ভৌমিক।

মন্তব্য ১ঃ কাক-বেড়ালের শত্রুতা সম্পর্কেও বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে এই 'কথা' শোনা যায়ঃ আগে বেড়াল ছিল রাণী, আর কাক ছিল পাল্কী বেহারা। রাণী একদিন পাল্কী ভাড়া করলে, কিন্তু পাল্কীওয়ালার ভাড়ার টাকা দিল না। মরবার পর রাণী হল বেড়াল, আর পাল্কীওয়ালা হল কাক। পাল্কীওয়ালা আজও তার ন্যায্য পাওনার কথা ভোলে নি। তাই আজও কাক বেড়ালের ল্যাজ ঠুকরে দেয় দেখা মাত্রই।

মন্তব্য ২ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংগৃহীত "টুনটুনির কথা"র একটি কথায় দেখা যায়, কাক চড়ুয়ের 'বুক' খেতে চেয়েছে। একটি তিব্বতীয় 'কথা'য় দেখি, কাক ব্যাঙকে খেতে চাইছে॥

সমাপ্ত

❋ ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

গন্থাদর্শে গন্থ শিল্পী ১০.০০

❋ ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক

বাংলা ধাঁধার ভূমিকা ৮০.০০

বিহঙ্গচারণা ৬০.০০

ফিচারধর্মী গ্রন্থ

❋ আবদুল জব্বার

বাংলার চালচিত্র (২য় পর্ব) ৩৫.০০

❋ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

হতাশ হবেন না ৩০.০০

ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক

❋ ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাবু গৌরবের কলকাতা ১৬.০০

নদীর তীরে নগরী ১৮.০০

❋ কান্তিরঞ্জন ঘোষ

গোরাদের কলকাতা ১০.০০

❋ নারায়ণ দত্ত

সুরাট থেকে সুতানুটি ৩০.০০

❋ কমল কুমার স্যানাল

মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১ম / ২য় ১০.০০ / ১০.০০

❋ ধ্রুব মজুমদার

হিমালয় বিচিত্রা (১ম/১য়) ২৫.০০/৩০.০০

ডঃ বিশ্বনাথ রায়

বিজ্ঞাণ রথের সারথি ২৫.০০